ফকির লালন সাঁই

দেশ কাল এবং শিল্প

৫৭/২ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

ফকির লালন সাঁই
দেশ কাল এবং শিল্প

প্রচ্ছদ— রামকিঙ্কর বেইজ-এর স্থাপত্য অবলম্বনে
অলঙ্করণ— প্রদীপ আইচ

প্রথম প্রকাশ — বইমেলা ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

সংবাদ
৫৭/২ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

অক্ষর সংস্থাপন
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

যাঁরা সন্তানস্নেহে আমাকে লৌকিক সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিয়েছিলেন —প্রয়াত বানাউল্লা ফকির (ধরমপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ), পারুলবালা পাল (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ), দেবানন্দ গোস্বামী (নন্দনপুর, করিমপুর, নদীয়া) এবং অন্যান্য সাধুদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

প্রবেশক

ডক্টর শ্রীমান শক্তিনাথ ঝা অনেক দিন ধরে বাউলসম্প্রদায় সম্বন্ধে গবেষণা করে চলেছেন, তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ এই বিষয়ের একটি দিকনির্দেশক দৃষ্টান্ত। বাউলসাধনা, তত্ত্ব ও কবিত্ব এবং বাউলসমাজের বাস্তব তথ্য সন্ধানের জন্য তিনি দুই বাংলার বহু বাউলের সঙ্গ করেছেন, তাদের পুঁথিপত্র পরীক্ষা করেছেন, গূঢ়-গুহ্য সাধনপ্রণালীও ব্যাখ্যা করেছেন। বাউলসাধনা মাটির সাধনা, যার পিছনে শুধু অধ্যাত্ম চিন্তা নেই, আছে বাস্তব প্রত্যয়ের বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিচয়, তা তিনি বহু বাউলকেন্দ্র ঘুরে, হিন্দু-মুসলমান, সাঁই দরবেশ ফকির সম্প্রদায়ের সঙ্গ করে এই গোপনচারী সমাজের সাধনপ্রণালী অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। আমার কাছে তিনি গবেষণা করেছেন বটে কিন্তু তাঁর উৎস ও উপাদান গ্রন্থাগারের প্রকোষ্ঠে বন্দী বই নয়, বাউল-আখড়াও নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাঁকে পথের বাউলের সঙ্গে একাত্ম করেছে।

বাউলগান, সাধনভজন ও তত্ত্বদর্শন নিয়ে এদেশে এবং পশ্চিম বিশ্বে, এই বঙ্গে ও বাংলাদেশে অনেক গবেষক, কবি ও রসিক ছোট বড় নানা বই লিখেছেন। কিন্তু এ-সমস্ত আলোচনার উৎস হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যা। তৃণমুল থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন দু-একজন তাত্ত্বিক গবেষক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষভাবে বাউলসাধনার সঙ্গে জড়িত নন, মাঝে মাঝে এদেশে আসেন, কলকাতার কাছাকাছি বাউলের আখড়ায় যান, কিছু কিছু রহস্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তারি উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেন যেমন সুপরিচিত এডোয়ার্ড ডিমক। বাউলপন্থীরা সাধারণত 'উল্টাপন্থী', নিজেদের আচার-আচরণ, সাধনভজন, গূঢ় গোপন কথা সম্প্রদায়ের বাইরে কাউকে বলেন না, সাহেবদের তো নয়-ই। বাঙালি ভদ্রলোকসমাজে এদের কদাচারী অঘোরপন্থী বলে অশ্রদ্ধা করে, যাদের আচারে-আচরণে অশনে-বসনে, পারিবারিক ও বিবাহজীবনে সদাচার অনুসৃত হয় না, যারা জাতপাত মানে না, স্মৃতিশাস্ত্র সরিয়তও স্বীকার করে না, যাদের কাবা-কাশী নেই, যারা মালা ও তসবি জপে না, কোনো এক মনের মানুষের সন্ধানে নেচে গেয়ে সংসারটাকে 'ধুলোট-উৎসবে' পরিণত করে, সেই সমস্ত বে-সরাপন্থী শাস্ত্রবর্হির্ভূত আউল-বাউলদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখা কি সম্ভব? তাই উনিশ শতকের ইংরেজিনবিশ মধ্যবিত্ত সমাজ এই সমস্ত লোকযানের প্রতি খড়্গাহস্ত হয়েছিল, এমনকি, এদের অসামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগও করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এই সমস্ত অপাংক্তেয় সম্প্রদায় কদাচারী নয়, ঈশ্বরসাধনার একটি উচ্চতম সোপানে অবস্থিত। এদের সাধনায় পুঁথিপত্রের বালাই নেই, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নেই, স্ত্রী-পুরুষেরও পার্থক্য নেই। গানই এদের সাধ্যসাধনা, এরা নিত্যদিন মনের মানুষের সন্ধান করে, যিনি আছেন প্রত্যেকের হৃদয়ে। তবে কখন তিনি আসেন, কখন চলে যান—সেই সন্ধানে থাকতে হয়। তিনিই পরমগুরু 'সাঁই'। ''কভু মিলে, কভু না মিলে—দৈবের লিখন''। তাই দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের শেষে কোনো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি এদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন; কুষ্টিয়ার হরিনাথ মজুমদার ('কাঙাল হরিনাথ বা ফিকিরচাঁদ বাউল) বাউলগানের সঙ্গীতরীতি ও তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নতুন বাউলের দল গঠন করেন, ঐ আদর্শে বহু গান রচনা করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্র, দীনেন্দ্রনাথ রায়, জলধর সেন—অনেক শিক্ষিত বাঙালি তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিদর্শনে গিয়ে বাউল গান, তত্ত্ব ও লালন শাহের সন্ধান লাভ করেন। তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র কোনো কোনো গানে বাউল তত্ত্বের শৈল্পিক প্রভাব আছে, তাঁর হেপাজতে লালন-গানের দু'খানি খাতা ছিল। বাউলের উচ্চ অধ্যাত্ম সাধনার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কারণ তিনিও সেই পথের পথিক ছিলেন, তাঁর হিবার্ট বক্তৃতাবলী ('The Religion of Man') পড়লেই তা বোঝা যাবে। তাঁর গানে ও নাটকে একাধিকবার বাউল চরিত্র ঘুরে ফিরে এসেছে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব-সংগৃহীত বাউল সঙ্কলনে

('হারামণি') তিনি একটি অনবদ্য ভূমিকা লিখে দেন, যার মলাটে অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নৃত্যগীতরত আবিষ্ট বাউলের ছবি ছিল। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে শিক্ষিতসমাজ নতুনভাবে বাউল সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা করতে লাগলেন।

হির্বার্ট বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকের দল এই সম্প্রদায়, তাদের সাধনভজন ও গানের প্রতি কৌতূহলী হলেন। তাঁরা বাউল গানকে লোকগানের এক বিচিত্র শাখা বলে মনে করলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় যেমন দুর্গম অঞ্চলে নানা ধরনের উপধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, খ্রীস্টান নিগ্রোরাও নানা ধরনের রহস্যবাদী আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়েছে, সেই রকম হয়তো হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের একান্তে একদল গুহ্যপন্থী সাধক লোকচক্ষুর অগোচরে নিজ নিজ সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের আধুনিক গবেষকেরা বাউলসম্প্রদায় ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন, কিন্তু মূল তত্ত্ব কতটা ধরতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ আছে। কোনো কোনো বাউল আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐভাবে তাঁদের তত্ত্ব ও সাধনা ব্যাখ্যা করা যায় না, ছাপার অক্ষরে যা ছাপা হয়, তার অধিকাংশ লেখকদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রসূত। বাউলের সঙ্গে মিশে তাঁদের সঙ্গে এক না হলে সেসব গুহ্যসাধনা জানা যায় না। গবেষকেরা প্রচুর পরিশ্রম করেন, কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টির অভাবে সমস্ত আলোচনা এক ধরনের বুদ্ধির ব্যায়ামে পরিণত হয়। কেউ কেউ আবার সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার বেষ্টনী লঙ্ঘন করতে পারেন না, অথবা চান না। কেউ-বা একচক্ষু হরিণের মতো মৌলবাদের (এ শব্দটি যথোপযুক্ত নয়, সাময়িক পত্রের দেবতাদের সৃষ্টি) মারফতে এই সম্প্রদায়ের কতটা ইসলাম, আর কতটাই বা বে-সরাপন্থী অনৈস্লামিক কদাচারের অঙ্গীভূত, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লালনফকিরের গানের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন 'গীতাঞ্জলি' কি লালনগীতিকার রসভাষ্য, ইত্যাদি সমস্যা একালের পাঠককে প্রশ্নমনস্ক করেছে। যে লালন জাতপাতের চালাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, পরিতাপের বিষয়, তাঁকে সেই ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে স্থাপনের চেষ্টা চলেছে। লালন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নন, হিন্দু নন, মুসলিম নন, তিনি বিশ্বমানব, বিশ্বনাগরিক—একথাটা উচ্চকোটির হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিতেরা বুঝতে চান না। সাম্প্রদায়িক ধর্মমত আমাদের কতটা সীমাবদ্ধ করে ফেলে, একালে লালন-গবেষণাই তার প্রমাণ।

লালনের গানের সুর যেমন মাঠের সুর, তাঁর তত্ত্বও তেমনি ভূমিতলচারী। অবশ্য স্থূল বস্তুপিণ্ডের উপরে তার প্রতিষ্ঠা হলেও গতি তার ঊর্ধ্বমুখী। প্রাগ্‌বৈদিক থেকে আর্যেতর সমাজে এক ধরনের দেহাশ্রিত সাধনার কথা সমাজের অন্তরালে প্রচলিত ছিল। ভারতের বাইরেও তার সন্ধান মিলবে। দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত হওয়া, দেহের মধ্যেই অজর অমর হয়ে থাকা, এই দেহসরোবরে সহস্রার সন্ধান করা—এসব প্রাচীন সংস্কার। এখনও মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী এবং আমেরিকার নিগ্রোসমাজে দেহকেন্দ্রিক সাধনার কথা শোনা যায়—যথা Voodooism। মোক্ষ, নির্বাণ, মুক্তির স্বরূপ কী, এবং কীভাবে তা আয়ত্ত করা যায় তাই নিয়ে শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও—আমেরিকা, য়ুরোপে, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার কোনো কোনো আদিবাসীসমাজে দুর্জ্ঞেয় আচার-আচরণ প্রচলিত আছে। এইসব আচার-অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের মূলে আছে যৌনাসক্ত ও প্রজননক্রিয়া। এই স্থূল ভাব ক্রমে রহস্যবাদী সূক্ষ্ম তত্ত্বে পরিণত হয়। এক সময়ে খ্রীস্টান সঙ্ঘের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপনীয় ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হত। তবে তার সঙ্গে দেহগত কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। মার্টিন লুথারের পরে এই সমস্ত রহস্যবাদী খ্রীস্টান উপসম্প্রদায় Antichrist বা খ্রীস্টবিরোধী বলে নিন্দিত এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তা কি সমূলে ধ্বংস হয়েছিল? এখনও য়ুরোপে শয়তান-পূজারীদের গুপ্ত আস্তানা আছে। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলে এমন দল-উপদল আছে যারা খ্রীস্টতত্ত্বের সঙ্গে আদিম সংস্কার মিশিয়ে এক ধরনের রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রাগ্‌বৈদিক ও উত্তরবৈদিক সাধারণ সমাজে দেহাসক্তিমূলক কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। শিব-শক্তি, অর্থাৎ Phenomenon ও nonmenon-এর সমরসসম্ভূত যুগনদ্ধরূপ

তন্ত্রাচারে স্বীকৃত। দেহের মধ্যেই দুই সত্তার মিলন। তার জন্য স্ত্রী-পুরুষের শরীর মিলনের সাহায্যে তুরীয় আনন্দের অবস্থালাভ করা কোনো কোনো গোপনচারী উপসম্প্রদায়ের লক্ষ্য। কি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, আর কি বৌদ্ধতন্ত্র—সর্বত্র মর্ত্যদেহের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে কতকগুলি দেহচর্যার শরণ নিতে হয়। তন্ত্রের পঞ্চমকার, শিবশক্তিতত্ত্ব, কুলকুণ্ডলিনীর উর্ধ্বায়ন, বিন্দু রক্ষা, সহজিয়া বৌদ্ধদের 'এ-বং', 'আলি-কালি', 'প্রজ্ঞা-উপায়'—এ সমস্ত রহস্যবাদী মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-আচরণে সহজযান ও বজ্রযানের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চমকার, লতাসাধনা প্রভৃতি দেহকেন্দ্রিক অনুশীলনকে রূপকের আবরণে ব্যবহার করা হলেও তার স্থূল রূপও পুরো ঢাকা পড়েনি। হঠযোগে বিন্দু ধারণই প্রধান। তন্ত্রের মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুনের প্রতীক তাৎপর্য থাকলেও তার বহিরঙ্গকেও অস্বীকার করা যায় না। একশ্রেণীর বাউলদের 'চারচন্দ্রভেদ' রসরতির (ডিমক সাহেব কথিত 'Hidden moon') পিছনে যে স্থূল দেহের প্রভাব আছে, তা স্বীকার করতে হবে। নাথপন্থদের 'কায়াসাধনায়' পিণ্ডদেহকে সূক্ষ্মদেহে পরিণত করার পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত গুহাহিত তমসাবৃত লোকচর্যা বহু শতাব্দী ধরে নানা ধর্ম, উপধর্ম, লোকধর্মের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে চর্যাগানের যুগ (১০ম-১২শ খ্রীঃ অব্দ) থেকে সহজিয়া বৈষ্ণব ও অন্যান্য রহস্যবাদী সাধনা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোপনে অনুসৃত ও অনুশীলিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর আলোকিত যুগেও গ্রামে ও শহরতলীতে নর-নারীর দেহাসক্তিমূলক আচার-আচরণ শিক্ষিত সমাজেও প্রচলিত ছিল। সেই পিচ্ছিল পথে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত ব্যাপারও গোপনে গোপনে ছাড়পত্র পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের শিল্পরূপ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার দেহমানসিক চর্যাকে পরিহার করেছেন। কোথাও নিন্দা করেছেন, তাঁর বিরস মন্তব্যটি উল্লেখ করি। "একদা পাড়াগাঁয়ে (অর্থাৎ শিলাইদহে) যখন বাস করতুম, তখন সাধুসাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত। তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদের কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গ পথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুশনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড় বড় চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।"

বাউলের পথ 'ক্ষুরস্য ধারা', 'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি নড়িতে কাটিএ দেহ'। বাউল সাধনার দেহচর্যা বাদ দিয়ে তার গানের রসচর্চা একালের রসিক পাঠককে সর্বাধিক আকর্ষণ করে। এক সময়ে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাউলসম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন, লালন ফকিরকে গুরুবৎ মান্য করতেন, তাঁর গান শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করতেন, নিজেরাও ঐ ধরনের গান রচনা করেছিলেন। তবে বাউলের সূক্ষ্ম তত্ত্বই ছিল তাঁদের অবলম্বন, তাকেই বলা যাবে অধ্যাত্ম রসায়ন, রবীন্দ্রনাথ যার ইঙ্গিত লালনের গানে লক্ষ করেছিলেন। একালে লালন গানের অনেকগুলি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর দর্শন ও তত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, গানের শিল্পও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু দেহচর্যাঘটিত আচার-আচরণ সর্বদা অন্তরালে রাখা হয়েছে। কারণ সেই গুহ্য ব্যাপারে 'অনধিকারী'-র কোনো অধিকার নেই। তার তত্ত্ব দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত, কিন্তু আচরণমার্গ হচ্ছে তত্ত্বকে বাস্তব প্রতীতির মধ্যে উপস্থাপনা করা। একটি Theoritical, অপরটি Practical। সে যাই হোক, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও সাগরপারের পণ্ডিতেরা লালন ফকির, বাউলসম্প্রদায়, তাদের গান, সমাজ, তত্ত্ব ও সাধনার বাস্তবতা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। লালনের বহু গান উভয়বঙ্গের বাউলেরা কণ্ঠে রক্ষা করেছেন, অবশ্য কোনো কোনো গানের প্রামাণিকতা নিয়ে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছে। লালনের গানের দুখানি খাতা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন। ডঃ শক্তিনাথ ঝা লালন গীতিসংগ্রহের আর একটি খাতা পেয়েছেন। সেটির মালিক ছিলেন জোলাপরিবারের এক বাউলসাধক। নাম ভোলাই শা (১৮৪৫-১৯৪০), যিনি লালনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। লালনের প্রয়াণের পর ভোলাই শা 'ছোট ফকির' নামে লালন-আখড়ায় প্রাধান্য লাভ করেন।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে জগৎ বিশ্বাস নামে আর এক ব্যক্তি লালনের খাতা থেকে যে নকল প্রস্তুত করেন, সেটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত উক্ত লালন-আখড়ায় ছিল। এই সংগ্রহ অবলম্বন করে শক্তিনাথ ঝা নতুন সঙ্কলন সম্পাদনে প্রস্তুত হয়েছেন। পাণ্ডুলিপিটি আধুনিককালের হলেও, ডঃ ঝা মনে করেন, এটিই লালনের সবচেয়ে প্রাথমিক সংগ্রহ। এটি নাকি ১৩১৬ বঙ্গাব্দের পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে, এবং আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছেই ছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে এর কোনো কপি নেই। এই সংগ্রহে একাধিক ব্যক্তির হাতের লেখা ছিল। শক্তিনাথের সংগ্রহ এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে রক্ষিত খাতায় অনেক পার্থক্য আছে। অতি জনপ্রিয়তার জন্য লালন গানের যে নানা রূপান্তর হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। সম্পাদক ডক্টর ঝা নানা প্রমাণ সন্ধান করে এই সঙ্কলন সম্পাদনা করেছেন। যাঁরা এ বিষয়ে কৌতূহলী তাঁরা এই গ্রন্থের ভূমিকা ও সঙ্কলিত গানগুলির তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করলে একটি অনাবিষ্কৃত জগতের সম্মুখীন হবেন। ভারতে, বাংলাদেশে ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকমহলে বাংলাদেশের রহস্যবাদী যান-উপযান সম্পর্কে বহু আলোচনা হচ্ছে। দেহ-তন্মাত্রের প্রতি কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা থাকাই স্বাভাবিক। ডঃ ঝা আলোচনার স্বরূপ নির্ণয়ে মূলত দেহাত্মবাদী। "দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন" এবং "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার দেবালয়ের প্রদীপ করো"—এই দুই সীমান্তকে কীভাবে সংযুক্ত করা যায়, পঞ্চ মহাভূত এবং সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, অর্থাৎ সাংখ্যের 'পঞ্চতন্মাত্র'—এসব দার্শনিক তত্ত্বকথা বাউলদের আচার-আচরণে কতটা স্বীকৃত হয়েছে, এরা আত্মবাদী, না বস্তুবাদী—এই সমস্ত জটিল তত্ত্বে শক্তিনাথ নতুন মাত্রাযোগ করেছেন। যাঁরা এ পথের পথিক, এরসের রসিক, এ জগতের অধিবাসী, তাঁরা এই আলোচনা থেকে নতুন পথের সন্ধান পেতে পারেন। তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও এমন সুসম্পাদিত গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যে অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই সঙ্কলন বাংলা গবেষণা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। যুরোপ-আমেরিকার প্রাক্-খ্রীস্ট আদিম ধর্মবিশ্বাস, যা এখনও নিগ্রোসমাজে প্রচলিত আছে, তার তাৎপর্য নিয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে, কত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় সেরকম চেষ্টার বিশেষ অভাব আছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই লোকচর্যাকে গবেষণার রূপ দিয়েছিলেন। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী তন্ত্রের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু চর্যার রূপক প্রতীকের যথার্থ তাৎপর্য, তার সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব ও দেহঘটিত গুহ্যচারের কতটা যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় গভীর আলোচনার এখনও অভাব আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই তত্ত্বের গভীরে ততটা প্রবেশ করতে পারেননি, তাঁদের খ্রীস্টীয় সংস্কার তার বাধাস্বরূপ হয়েছে। উপরন্তু পল্লবগ্রাহী অভিজ্ঞতা মৌলিক তত্ত্বজ্ঞানের কিছু পরিপন্থী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বাউলসম্প্রদায়ের সঙ্গে বাস না করলে, তাদের জীবনধারা ও আচার-আচরণের সম্যক পরিচয় না নিলে—সর্বোপরি তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না করলে এ সমস্ত আলোচনা নিতান্তই বুদ্ধিগত ব্যায়ামে পর্যবসিত হবে। শক্তিনাথের পন্থা স্বতন্ত্র। তিনি হিন্দু ও মুসলমান বাউলদের গ্রামে বাস করে, তাদের ভাবভাবনার শরিক হয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন। এ ধরনের গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান এদেশে দুর্লভ। এর জন্য তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকবে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন বিভাগীয় অধ্যক্ষ,
বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৪.৮.১৯৯৪

সূচিপত্র

গানের বর্ণানুক্রমিক সূচি

খ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত লালন গীতিকা গ্রন্থে অসঙ্কলিত আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে লভ্য পদ—৪, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৫০, ৬১, ৬৪, ৮৬, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১/১০৩, ১০২/১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১৯, ১২৫, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৯, ১৪১, ১৪৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৮ (ক ও খ), ১৭৬, ১৮৬, ১৯১, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮, ২১৫, ২৩৬, ২৩৯ ২৪০, ২৪২, ২৪৪, ২৫৩, ২৫৭, ২৫৯ (২৬৬), ২৬২, ২৬৪, ২৭৪, ২৯৬, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬৮

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত পদগুলি রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত খাতায় নেই ঃ—

৪, ২৩, ২৫, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪৫, ৪৭-৫১, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৬৪, ৬৬-৭০, ৭২, ৭৪, ৭৮, ৮১-৮৩, ৮৬, ৮৭, ৯০-৯৬, ৯২-১০৪, ১০৬, ১০৮-১১২, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২০-১২২, ১২৫, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬-১৪৪, ১৪৬-১৪৮, ১৫২, ১৫৬, ১৫৯, ১৬৩-১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৫, ২২৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮-২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ২৬৪-২৬৭, ২৭০, ২৭৪, ২৭৫, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ৩০৭-৩০৯, ৩১২-৩২১, ৩২৩, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩৯-৩৪২, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৮, ৩৬৬-৩৬৯।

* চিহ্নিত ২০ টি পদ, রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী এর, হারামণিতে প্রকাশ করেছিলেন (১৩২২, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ—মাঘ)

ভোলাইএর

গানের খাতা

প্রথম পর্ব

শ্রী মালম সাহেদর বেসের তালেব

শ্রী ভোলাইনা ফকির - বাহির মালিক

সাকিন মৌজে. - জন -

খরচ - সর্ব্ব - রোজ -

সাল ১১৯৩ সাল ৩ — ১৫ কার্ত্তিক

রোজ সোমবার। —

শ্রী —

Likhok

Jogot Biswas

Galaf Sha Fakir X

68

MS of Baul Songs
(collected by Tagore?)
File

১নং

গুরু সুভাব দেও আমার মনে।। তোমাএ জন ভুলি নে।। গুরু তুমি নিদয়ে জার প্রতি ও তার সদাএ ঘটে কুমতি তুমি মন রতের [মন-রথের] সারতি [সারথি] জতা [যথা] ন্যেও জাই শেইখানে।। গুরু তুমি তন্ত্রের তনপরি [তন্ত্রী] তুমি মন্ত্রে মন্তরি গুরু তুমি জন্ত্রের জততরি [যন্ত্রী] না বাজাও বেজিবে [বাজিবে] কেনে।। আমার জনম অন্দা [অন্ধা] মন নয়ন তুমি বোদ্দ [বোদ্ধা!] সচেতোন চরন দেখিবো আসাএ কএ নালন স্বেন অঞ্জন দেও নয়নে।।

২ নং

গুরু পদে নিষ্টে জমন [যেমন] জার হবে।। জাবে তারো সব অশুসার অমুর্ল [অমূল্য] ধোন হাতে শে হি পাবে।। গুরু জারে হয়ে কাণ্ডারি চালায়ে শে অঢালা তোরি তুফান বলে ভয়ে কি তারি নেচে গে [গেয়ে] ভব পারে জাবে।। আগমে নিগমে এই কয়ে [কহে] গুরুরূপে দিন দয়াময়ে অশোমার [অসময়ের] সখা শে হয়ে অধিন হোয়ে জে তারে ভজিবে।। গুরুকে মন্যুস জ্ঞেন জার অধপতে [অধঃপথে] গতি হয়ে তার নালন তাই আজ আমার ঘটীল বুজি [বুঝি] মনের কুসাভাবে [কুস্বভাবে]।।

৩ নং

গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার ল্যেও গো শুপতে [সুপথে]। তোমার দয়া বিনে তোমাএ সেদি [সাধি] কি মতে। তুমি জারে হও গো সদাএ [সদয়] শে তোমাএ সাদনে পায়ে বিবাদি তার সব শেরএ [শেষ হয়] তোমার ক্রেতে [কৃপাতে]।। জন্ত্রেতে জন্ত্রি জমন জেমত বাজাএ বাজে তমন তনি [তমনি] জন্ত্রো আমারি মন বোল [বোল] তোমার হাতে।। জগাই মাদাই দস্য ছিল তারে গোউর ক্রেপা হোল অধিন নালন দোহাদি [দোহাই দি] শেহি আশাতে।।

৪ নং

এমন মানুস[১] জনম আর কি হবে।। মন জা কর তরাএ কররে। তরাএ কর এই ভবে।। অনান্ত রূপ ছিষ্টী কোলেন সাই। শুনি মানবের তুলুনা[২] কিচুই নাই দেহ দেবতা গোন। করে আরাধন জনম নিতে মানবে। কত ভাগ্যের ফলে না জানি মন রে পেয়েচো এই মানব তরনি। বেএ জাও তরায়ে তরি শুধারায়ে জেন ভারা না ডোবে।। মানুশ্যে[৩] হবে মাধোজ্য [মাধুর্য] ভজন তাই তে মানুষ[৪] রূপ আজ গটীল [গঠিল] নিরাঞ্জন এবার ঠোকিলে আর না দেখি কেনার নালন কয়ে কাতর[৫] ভাবে।।

[৩২ নং খ পদে পাঠান্তর (১) মানব (২) উত্তম (৩) এই মানশে (৪) মানব (৫) তাই ভাবে। বানানগত ভিন্নতাও আছে]

এমন মানুষ জনম আর কি হবে।। মন জা কর ত্বরায় কর রে।
ত্বরায় কর এই ভবে।। অনন্ত রূপ ছিষ্টি কোরলেন সাঁই।
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই দেব দেবতা গোন।
করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে।। কত ভাগ্যের।
ফলে না জানি মনরে পেয়েছো এই মানব তরণী।
বেয়ে জাও ত্বরায় তরিদ্রি ধারায় জেন ভারা না ডোবে।
মানুষে হবে মাধুর্য ভজন তাইতো মানুষ রূপ আগ
ঠন নিরঞ্জন এবার ঠকিলে আর না দেখি।
কেনার লালন কয় কাতর ভাবে।।

৩৪.
একি আএন নবি কোরেত জারি ।। পাছে মারা জাই —
যাএন নাবুঝে আয়ে সাদা ভাসা ভারি ।। শোরিয়ত
আর মারফত আদায়ে, নবির আপনে এই দুই হুকুম
সদায়েন নজর এক দিগ জায়ে আর দিগ আদার
এই দুই বাপ কিরূপ চিক্কারি ।। নবুয়তে আদে মাঝিয়ান
যাহে বেলায়ে বাপের নিসান সেরা নবুয়ত বেলায়েত
মারফত জেন্তে হএ গাস্তিরি ।। সবাকে সব দোস নেখাওয়া
বস্তু মারফত সেটাকা আছে তাহে সব দোস থুইতুলে
থাকি দেই ফেলে নানা বস্তু ভিকারি । —

৫ নং

নবি না চিনে কি আল্লা পাবে।। নবি দিনের চাদ আজ দেখনা রে ভেবে।। জার নুরে হয়ে সয়াল সংসার শে আজ কলির ভাবে নবি পয়গম্ববর হাটের গোলেমালে তারে চিনিলে না ভবে।। বাতুনেরো ঘরে নুরনবি পুরুস কি প্রকিতির ছবি পড় দেল কোরান কররে বিধান মনের অন্দকার জাবে। বোজা কঠীন [কঠিন] কুদরতি খিয়াল আমার নবিজি গাছ সাইজি ফল শে ফল জে পাড় ওই গাছে চড় নালন কয়ে কাতর ভাবে।।

[৫৩ নং পদটিতে দু'চারটি শব্দগত ভিন্নতা আছে]

৬ নং

একি আএন নবি কোল্যে জারি।। পাছে মারা জাই য়াএন না বুজে আঁয়ে [আইন] সাদ ভাসা [সাধুভাষা] ভারি। শোরিয়ত আর মারফত আদায়ে, নবীর আএনে এই দুই হুকুম সদায়ে, নজর একদিগ জায়ে আর দিগ আদার [আঁধার] হএ দুইরূপ কিরূপ ঠিক করি।। নবুয়তে অদেখা ধিয়ান য়াছে [আছে] বেলায়ে [বিলায়তে] রূপের নিসান সরা নবুয়ত বেলায়েত মারফত জেন্তে [জানতে] হএ গম্ভিরি।। সরাকে সরপোস লেখা স্দ‌এ বস্ত মারূফত সে ঢাকা আছে তায়ে [তাহে] সরপোস থুই তুলে ওকি দেই ফেলে নালন বস্তু ভিকারি।।

৭ নং

জা জা ফানার ফিকির জেনি গে [জার্ন গে] জারে। জদি দেখা বাঞ্ছা হয়ে শে চাদেরে।। না জানিলে ফানার ফিকিরি তার আর কিশের ফিকীর কিশের ফকিরি নিজে হও ফানা ভাব রব্বানা দেখে জাক [যাক] শোমন ফিরে। ফানার ফিকির মুরসীদের ঠাই তাইতে মুরসীদ ভজন আয়েন ভেজিলেন সাই ছেরাজ সাইর ক্রেপাএ [কৃপায়] নালন কএ জাজন কস্ট সার ঘরে।। নিজরূপ মুরসীদের রূপ মাঝার আগে ফানার বিধি মন রে আমার পীছে মুরসীদ রূপ মনরে সে স্বরূপ মিসাও সাইর অটল নুরে।।

৮ নং

পড় রে দাএমি নামাজ এদিন হোল আখিরি।। মাশুক রূপ রিদয় রেখে (কনে) দেখ আশুক বাতি জেলে কিবা সকাল কি বৈকালে দাএমির নাই অবধারি।। ছালেকেরো বাজ্যপানা মজ্যুবি আসক দেওনা আসোকে দেল করে ফানা মাশুক বৈ অর্ন [অন্য]; দেলে না আশাঝুলি লোয়ে শে না মাশুকের চরণ ভিকারি।। কেফায়া আএনি জিনিয়েহ ফরজ জাত নিসানিদামি ফরজ আদাএ জে করে তার নাই জেতের ভএ [ভয়] জাত এলাহি ভাবে সদাএ মেশেই জাতের নুরি। আয়েনির অদেখা তরিক দাএমির বরজকে নিরিখ ছেরাজ সাই দরবেশের চরণ ভেবে কএই ফকির নালন দাএমি নামাজি জে শোন সমন তারো আর্গেকারী [আজ্ঞাবহ]।।

৯ নং

ভুলিব না, বেলি [বলি] কাজের বেলাএ ঠিক থাকে না।। আমি বলি ভুলিব না রে সভাবে ছাড়ে না মোরে কটাকে [কটাক্ষে] মন পাগল করে দিব্বু জ্ঞেনে [দিব্য জ্ঞানে] দিএ হানা।। সংঙ্গ গুনে রংঙ্গ ধরে জানিলেম কাজ্য ওনুস্বারে [অনুসারে] কুসংঙ্গে সমগ্র পুড়ে শুমতি মোর গেল ছেড়ে খাবি খেলেম আপাএ পোড়ে এ লর্জা [লজ্জা] ধুলেও তো জাএ না।। জে চোরের দাএ দেসন্তারি [দেশান্তরী] সেও চোর দেখি সংঙ্গধারি মদন রাজার ডাঙ্কা [ডঙ্কা] ভারি কাম জালা দেএ অন্তস্য পুরি ভুলে জাএ মোর মন কাণ্ডারি কি কোরবে গুণারি জোনা ঃ। রঙ্গে মেতে সং সাজিএ বশে আছি মগ্ন হয়ে সুসাকারে সঙ্গ করে জেন্তেম [জানতেম] জদি সুসঙ্গেরে নালন বলে তবে কিরে ছেঁছোড়ে মারে মালখানা।।

১০ নং

মুরশিদ বিনে কি ধোন আর আছে রে মন এ জগতে।। জে নাম সরনে হারে তাপিত অঙ্গ সিতল করে ভব বন্দন ছুটে জাএরে জপ ওই নাম দিবরাতে।। মুরসিদের চরনে শুধা পান করিলে জাবে খুদা [ক্ষুধা] কোর নারে দেলে দিদা [দ্বিধা] জেহি মুরসিদ শেহি খোদা বোজ অলি এল মুরীসিদা আয়েত লেখা কোরানেতে।। আপনি খোদা আপনি নবি আপনি শে আদম ছফি অনান্ত [অনন্ত] রূপ ফরে ধারন কে বোজে [বোঝে] তার নিরাকারন নিরাকার হাকিম নিরাঞ্জন মুরসিদ রূপ ভজন পথে। কুন্নে সাই মহিত আর আলাকুন্নে সাই কাদিরো পড় কালাম নিহাজ কর তবে সব জানিতে পার কেনে নালন ফাকে ফের ফকিরি নাম পাড়াও মিথ্যে।।

১১ নং

রেখিলে সাই কুবজল [কূপজল] কোরে।। আদেলা পুখুরে [পুকুরে]।। হবে সজল বরসা রেখেছি শেই ভরশা আমার এই ভগর্ন [ভগ্ন] দশা জাবে কত দিন পরে এবার জদি না পাই চরন আবার কি পড়ি ফেরে।। নদির জল কুবজল হএ বিলে বাঙ্গড়েতে রয় সার্দ্ধ [সাধ্য] কি গঙ্গাতে জাএ গঙ্গা না আলে পরে। জিবের তমনি ভজন ব্রথা তোমার দআ [দয়া] নাই জারে।। জন্ত্র পড়িএ অন্ত্র [অত্র/অন্তর] রএ জদি লক্ষ বতসর জন্ত্রি বিহানে [বিহনে] জন্ত্র কবু না বাজিতে পারে আমি জোন্ত্রো তুমি জোন্ত্রি শুবল ধরাও মোরে।। পতিত পাবন নামটী সাস্ত্রে শুনেচি খাটি পতিত না তরাও জদি কে ডাকিবে আর নাম ধরে অধিন নালন বলে তরাও গো সাই এ ভব কারাগারে।।

১২ নং

জে পতে [পথে] সাই চলে ফেরে॥ তার খবর কে করে সে পতে য়াছে [আছে] সদাএ বেসম কালরাগীনির ভয়ে জদি কেউ কেউ আজগবি জাএ ওমনি উটে [উঠে] ছো মারে পলক ভরে বিস খাএ তার ওটে ব্রমার অন্দরে [ব্রহ্মরন্ধ্রে]॥ জে জানে উল্ট মন্ত্র খাটিএ শেহি তন্ত্র গুরু রূপ করে নজর বিস ধোরে ভোজন করে তার করন রিতী সাঁই দরদি দরসন দিবে তারে॥ সেহি জে অধর ধরা জদি কেউ চাহে তারা চৌইতর্ন্ন [চৈতন্য] গুনিন জারা গুন সেখে তাদের দারে সাম্যানে কী পারি জেতে [যেতে] শেই কুকাপের ভিতরে॥ ভএ পেএ জন্মাবদি [জন্মাবধি] শে পতে না জাএ জদি হবে না সাদন সিদ্দি তাও শুনে মন ঝোরে নালন বলে জা করে সাই থেকিতে হএ সেই পত [পথ] ধোরে॥

১৩ নং

থাক না মন একান্ত হোয়ে॥ গুরু গোঁসাইর বাগ লোয়ে॥ চাতকের প্রন জদি জাএ তভুকি [তবুকি] ওর্ন্ন [অন্য] জল খাএ উর্দ্ধ মুখ থাকে সদাএ নবঘোন জল চেয়ে তোমনি মত হোলে সাদন সিদ্দি হবে এই দেহে॥ এক নিরিক [নিরিখ] দেখ ধোনি শুজ্যগতো [সূর্যগত] কমলীনি দিনে বিবাসিত তমনি নিসিতে মদিত রহে এমনি জেন ভক্তের লখন [লক্ষণ] একরূপে বাদে [বাঁধে] হিয়ে॥ বহু বেদ পড়াশুনা সন্নিতে [শনিতে] পাএরে মনা সদাএ সিব জগী [যোগী] শে না কিঞ্চিৎ ধ্যেন কোরিএ॥ গুরু ছেড়ে গোউর ভজি তাতে নরকে মজি দেখ না মন পুঁথি পাঁজি সত্য কি মিথ্যা কহে মন তোরে বুজাব কত নালন কয়ে দিন জাএ বোয়ে [বহে]॥

১৪ নং

কোন রশে কোন রোতির খেলা জেন্তে হএ এই বেলা॥ সাড়ে তিন রতি বটে লেখা জাএ সাস্ত্রোপাটে সার্দ্দির [সাধ্যের] মুল তিন রস ঘটে তিন সও [শত] সাট রশের বালা জেনিলে শে রসের মরম রসিক তারে জাএ বলা॥ তিনরস সাড়ে তিন রতি বিভাগে কোরে স্থিতি গুরুর ঠাই জেনে পাতি সাদন করে নিরালাএ তার মানব জনম সাপল [সফল] হবে এড়াবে সোমন জালা [শমন জ্বালা]॥ রসরতি নাই বিছাখন [বিচারণ] আন্দাজি করি সাদন কি শে হএ প্রাপ্ত কি ধোন ঘচে [ঘুচে] না মনের ঘোলা, আমি উজাই কি ভেটেলে পড়ি ত্রিপীনির তির নালা॥ শুদ্দ রস রসিক হৌলে রস রতি উজন চলে ভিয়ানে সদ্দ ফলে অম্রতো [অমৃত] মিছিরিওলা অধিন নালন বলে আমার কেবল শুদই [শুধুই] জল তোলা ফেলা॥

১৫ নং

একদিনে পারের কর্ত্তা ভাবলি নেরে॥ পার হব হিরের সাক [সাঁকো] কেমন কোরে॥ এক দোমের ভরসা নাই কখন কি করিবে রে সাই তখন কার দিবি দোহাই কারাগারে॥ বিনেকড়ির সদায়ে কেনা মুখে সাঁইর নাম জপনা তাইতে কি অলসপানা দেখি তোরে॥ ভাসাও ওনুরাগ তরি বসাও মুরসিদ কান্ডারি লালন কএ সেই শেন পাড়ি জাবে শেরে [সেরে / সারিয়া]॥

১৬ নং

পার কর দয়াল আএ [এসে] কেশে ধরে।। পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে।। মনত্রোনি [মন্ত্রনাকারী] ছএ [ছয়] জোন সদাএ অশেশ কুকাণ্ড বাদাএ ডুবালে ঘাট অঘাটাএ আজ আমারে।। ভবকুপেতে আমি ডুবে হৌইলাম [হৈলাম] পাতালগামি অপারের [অপারগের] কাণ্ডার তুমি লেও [নাও] কেনারে।। আমি কার কেবা আমার বুজে বুজিলাম না এবার অসারকে ভাবিএ সার পোলেম ফেরে।। ছারিএ সকল উপাই [উপায়] সেশে তোর দিলাম দোহাই নালন কয়ে দয়াল নাম সাঁই জেনিব তোরে।।

১৭ নং

বল কারে খুজিস খেপা দেশ বিদেশে।। আপন ঘর খুজিলে রতন পাএ অনাসে [অনায়াসে]।। দড়দড়ি [দৌড়া-দৌড়ি] দিল্লি লহর [লাহোর] আপনার কোলে এ ঘোর নিরূপ আলেক সাঁই মোর আত্তা [আত্মা] রূপ সেএ।। জে নিলে [লীলা] ব্রম্মাণ্ড পর সেই নিলে ভাণ্ড মাজার ঢাকা জমন চন্দ্র আকার মেঘের পাশে।। আপনাকে আপনি চেনা সেহি বটে উপাসোনা নালন কএ আলেক বেনা হএ তার দিশে।।

১৮ নং

শুদ্দু প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়ঃ। জারো নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়ঃ।। রোসিক রষ [রস] অনুসারে নিগূঢ় ভেদ জেন্তে [জানতে] পারে রতিতে মতি ঝরে মূল খণ্ড হয়ঃ।। নিরে নিরাঞ্জন আমার আদ [আদি/সাধ] নিলে করে প্রেচার [প্রচার] হলে আপন জন্মের বিচার সব জানা যায়ঃ। আপনার জনমো লতা খুজগে তার মুলটী কোতা [কোথা] নালন কয় হবে সেতা [সেতা] সাইর পরিচায় [পরিচয়]ঃ।।

১৯ নং

ওশে ফুলের মরমো জেন্তে হয়ঃ।। জে ফুলে অটাল বেহার বলতে লাগে বিসম ভয়ঃ।। ফুলে মধু প্রফুল্লতা ফলে জার অম্রেতো সুধা এমন ফুল দিনদুনিয়ায় পয়দা জানিলে দুর্গতি জায়ঃ।। চিরোদিনে সেই জে ফুল দিন দোনিয়ার মগবুল জাতে পয়দা দিনের রছুল জানিলে দুর্গতি জায়ঃ।। জন্মপথে ফুলের ধজা [ধ্বজা] ফুল ছাড়া নয় গুরু পূজা ছিরাজ সাই কয় এ ভেদ বোজা নালন ভেড়োর কায্য [কার্য] নয়ঃ।।

২০ নং

নৈরেকারে ভেষচেরে এক ফুলঃ।। শে জে বিধি বিষ্টু হর আদি পুরন্দর তাদেরো সে ফুল হয় মাতৃকুলঃ।। বোলবো কিশে ফুলের গুণ বিচার পঞ্চমুখে সিমা দিতে নারে হর জারে বলি মূলাধার শেহি ত অধার ফুলে আছে ধরা চোর শোমাতুল [সমতুল]ঃ।। নিলে নিত্ত [নিত্য] পাত্র স্থিতি সেই ফুলে সাধকেরো মূলবস্তু এ ভুমগুলে শে জে বেদের অগোচোর সে ফুলের নাগর সাধুজোনা ভেবে কোরছেরে উল ঃ।। কোথা ব্রক্ষ হারে কোথায় রে তার ডাল তরঙ্গে পড়ে ফুল ভেষচে চিরোকাল শে জে কখন এশে অলী মধু খায় শে ফুলী [ফুলে] নালন বলে চেইতে [চাইতে] গেলে দেয় হুল।।

২১ নং

এ কি আজগোবি এক ফুল ঃ।। ও তার কোথায় ব্রক্ষ [বৃক্ষ] কোতায় আছে মুল ঃ।। ফুটেছে ফুল মান সরোবর সর্ন গোফায় [স্বর্ণগোম্ফায়] ভেমরা [ভ্রমর] তার কখোন মিলন হয় রে দোহার রসিক হলে জানা জায় রে স্থুল ঃ।। সুম্বু বিম্বু নাই শে ফুলে মধুকর কেমনে খেলে পড়ো সহজ প্রেম ইসকুলে জ্ঞানের উদয় হবে জাবে ভুল ঃ।। সনি সুক্কুল এরা দুজোন সে ফুলে হইল শের্জ্জন [সৃজন] ছিরাজ সাই বলে রে নালন ফুলের ভেমর কে তা কোর গে উল ঃ।।

২২ নং

একফুলে চার রং ধরেছে ঃ।। ওশে ভাবনগর ফুলে কি আজব শোভা করেছে মুল ছাড়া সে ফুলের লতা ডাল ছাড়া তার আছে পাতা এ বড় অকৈতপ [অকৈতব] কথা কে পেতেবে [প্রত্যয় করবে] কৈ কার কাছে ঃ।। কারণ বারির মধ্যে সে ফুল ভেশে বেড়ায় একুল ওকুল শেত বরন এক ভেমর ব্যাকুল শে ফুলের মধুরো আশে ঃ।। ডুবে দেখ মন দেল দোরিআয় জে ফুলে নবীর জনম হয় সে ফুল ত সামান্য ফুল নয় নালন কয় জার মূল নাই দেশে ঃ।।

২৩ নং

কে ভাশায় ফুল প্রমের [প্রেমের] ঘাটে ঃ।। অপার মহিমা তারো ফুলে বটে ঃ। জাতো জগোতের গঠন শে ফুলের হয় না জতন বারে বারে তাইতে ভ্রমন ভবের হাটে ঃ।। মাসান্তে ফোটে শে ফুল কোথায় গাছ কোথায় রে মূল ঃ জানিলে তাহারো উল ঘোর জায় ছুটে ঃ।। গুরু কৃপা জার হৈল ফুলের মূল সেই চিনিল নালন আজ ফেরে পোল ভক্তী চটে ঃ।।

২৪ নং

প্রেমের সন্দী আছে তিন সড়ো রোশীক বিনে জানা হয় কটীন ঃ।। প্রেম, বল্লে কী হয় না জেনে শে প্রম পরিচয় আগে সন্দী বোজো প্রেমে মজো সন্দীস্থলে সে মানুষ অচিন ঃ।। পংকো জল ফুল সন্দী বিন্দু আদ্য মুল তার শুক্ষু সিন্দু [সিন্ধু] ও শে সিন্দু মাঝে আলেক পেচে উদয় হোচ্চে সদায় রাত্রদিন ঃ।। সরল প্রেমের প্রিমী হলে চাঁদ ধরা জায় সন্দী খুলে ভেবে নালন ফকির পায় না ফিকির হোয়ে আছে সদায় ভজন হিন ঃ।।

২৫ নং

আইজ আমার অন্তরে কী হলো ওগো সোই ঃ।। আইজ ঘোমের [ঘুমের] ঘরে চাঁদ গৌর হেরে ওগো আমি জন [যেন] আমি নই ঃ। আইজ আমার গৌরপদে মন হরিলো আর কিছু লাগে না ভাল সদায় মনের চিন্তা ঐ আমার সর্ব্বশ্বো ধোন [সর্ব্বস্ব ধন] চাঁদ গৌরাঙ্গ ধোন সে ধোন কিসে পাই গো তাই শুধাই ঃ।। জদি মরি গৌর বিচ্ছাদ বানে গৌর নাম সুনাইও কর্ণে সবঙ্গে [সব অঙ্গে] লেখো নামের বই এই বর দে গো সবে আমি জনমে, জন ঐ গৌর পদে দাশী হই ঃ।। বোন পোড়ে তা সবায় দেখে মনের আগুন কে বা দেখে আমার রশোরাজ চৈতন্য বৈ গোপীর এন্নী দশা ও কি মনন [মরণ?] দশা অবোদ নালনরে তোর সে ভাব কই ঃ।।

২৩শ —

পাগোল দেওয়ানের মন কি কোন দিয়ে পাই:।। — বলি আমার ২।
আছে কি কোন আমার সাধ্য মনে ২ তারি তেই:।। দেহ মন বিনা
দিতে হয়, সেও কোন তারে আমার তো নয়, আমি মইচম্প —
চালাই, আবার ভেবে দেখি আমি বাকী — ওগো তাতেও আমার —
হিসাব নাই:।। ওসে পাগলা বেটার পাগলা খিজি নয় সামান্য/কোনে —
রাজি কোন ভাবে কোন ভাব হিসাই, পাগলা ভাবনা যে দেওয়াদ —
ভায় সমানে পাগোল হইকী অসে মেখলে দ্যাই:।। —
ওসে পাগোল ভেবে পাগোল হইনাম, সেই পাগোল হবে —
সবল হেলায় আপন পরতো ভুলিনাই অধিন লালন বলে —
আপনার আত্মী-তো নে ঘটে প্রেম পাগোলের তন্ত্রী বাই:।। —

১৭নং

আমারে একী কবারকথা আপন বলে আপ্নী মরি:।। গৌর এসে হৃদয় —
গোপে করে আমার মন চুরি:।। কিবা গৌর রূপ নয়ন গোচে বিস্তুরি —
দেখলো কেটে নরু ভয় সব পলায় দূরে জখন ঐ রূপ মনে করি:।। —
গৌর দেখা দিলে ধোমের ঘোরে, চেতন হোয়ে পাইনে তারে, পালাইল —
কোন সহরে নবদনের রশ বেপারি:।। মেঘে জমন চাতোকেরে দেখা —
দিয়া ফাকি করে লালন বলে তাই আমারে কচ্ছেন গুরু বরাবরি:।। —

২৬ নং

পাগোল দেওয়ানের মন কি ধোন দিয়ে পাই ঃ।। বলি আমার ২ আছে কি ধোন আমার সদায় মনে ২ ভাবি তাই ঃ।। দেহমন ধন দিতে হয় সেও ধোন তারি আমার তো নয়, আমি মুটে মট [মোট] চালাই আবার ভেবে দেখি আমী বা কী ওগো তাও তো আমার হিসাব নাই ঃ।। ওসে পাগলা বেটার পাগলা খিজি নয় সামান্য ধোনে রাজি কোন ভাবে কোন ভাব মিসাই পাগলা ভাব না জেনে জদি জায় সসানে পাগোল হয় কী অঙ্গে মেখলে ছাই ঃ।। ওসে পাগোল ভেবে পাগোল হইলাম সেই পাগোল কই সরল হৈলাম আপন পর তো ভুলি নাই অধিন নালন বলে আপনার আপ্নী ভোলে ঘটে প্রেম পাগোলের এম্নী বাই ঃ।।

২৭ নং

আমার একী কবার কথা আপন বেগে আপ্নী মরি ঃ।। গৌর এসে রিদয় [হৃদয়] পোসে [প্রবেশে] করে আমার মন চুরি ঃ।। কি বা গৌররূপ লমপোটে, [লম্পটে] ধয্যডুবি [ধৈর্য ডোর] দেয় গো কেটে লর্জ্জা ভয় সব পলায় ছুটে জখন ঐ রূপ মনে করি ঃ।। গৌর দেখা দিল ঘোমের ঘোরে চেতন হোয়ে পাই নে তারে পালাইল কোন সহরে নবদলের রশ বেহারি ঃ।। মেঘে জমন চাতোকেরে দেখা দিয়া ফাকি করে নালন বলে তাই আমারে কল্যেন [করলেন] গুরু বরাবরি ঃ।।

২৮ নং

খেলছে মানুষ নিরে খিরে [ক্ষীরে] ঃ।। আপন ২ ঘর বোজো মন আমার কেনে হেতড়ে [হাতড়িয়ে] বেড়াও কোনের (কোলের) ঘোরে ঃ। সর্ন দেসে মেঘেরো উদয় নিরদ বিন্দু বোরিসোন [বর্ষণ] তায় তাতে ফোলচে ফল রং বিরঙ্গ হাল আজব কুদরতি কল ভাবের ঘরে ঃ।। নিরনদি গোভিরে ডোবা কটীন হয় ডুবলে কত আজব দেখা যায় ওসে নিরভাণ্ড পোরা ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড বলতে আমার নওন ঝোরে ঃ।। ইন্দ্রডাঙ্কা নাই সে রাজ্জে [রাজ্যে] সহজ ধারা ফেরে সহজে ছিরাজ সাইর বচন মিথ্যা নয় নালন একবার ডুবে দেখ সরূপ দ্বারে ঃ।।

২৯ নং

মানসের করন সে কি রে সাধরন জানে রসিকো জারা ঃ।। টলে জীব বিবাগী অটল ঈশ্বর রাগী সে ও রাগ লেখে বৈদিগ রাগেরো ধারা ঃ।। জদি ফুলের সন্দী ঘরে বিন্দু পড়ে ঝরে আর কী রোসিক ভেয়ে [ভাই] হাতে পায় তারে ঃ।। নিরে খিরে মিশায় সে পড়ে দুর্দ্দসায় না মিসলে হিন অঙ্গ বিফলো পারা ঃ।। হলে বানে বান ক্ষেপনা বিশের উপজ্জনা [উপার্জন] অধপতে গতি উভয় শেষখানা পঞ্চ বানের ছিলে প্রেম অস্ত্রে কাটীলে তবে হবে মানশের করোন [কর্ম] করা ঃ।। ও সে রসিকো সিখরে জে মানুষ বাশ করে হেতু সর্ন [শূন্য] করন সে মানশের দ্বারে নিরহেতু বিশ্বাশো মেলে সে মানুশো অধিন নালন ফকির হেতু কামে জায় মারা ঃ।।

গজল ৩০৭.

রোসিক বিনেকেবা তা বেঝেনে জারো নাম অধারা:॥ সাস্তে সন্তী বুজে —
সেরুপে শেভজে বস্তু বেরো বিষ্টু রূপ নেহারা:॥ করে পঞ্চ তত্ত তত্তানি —
পঞ্চরূপ বাখানি রোসিক বলে সেও তো নিনে রূপ পনি বেদ বিদিতে —
জার নিলের নাই প্রচার নিগুঢ়ো সহরে সাইজী মেরা:॥ —
বলে সপ্ত পাত্তীর মতো সপ্ত রূপ ব্যাক্ষীত, রোসিকেরো মন —
নয়ন জতে রত, রোসিকেরো মন বশেতে মানে, রূপ রশো জানিয়া
মেনহে তারা:। জেজোন ব্রক্ষ তত্তা নিরুয় শেওতো কথায় কয়
না দেখে নাম ব্রক্ষ সারকরে বিদয়, সরূপ রূপ দর্পনে রূপ দেখে —
নওনে লালন বলে রসিক দিপ্ত কারা:॥ —

৩০ নং

সড়রোসিক [ষড়রসিক] বিনে কে বা তারে চেনে জারো নাম অধারা ঃ।। সাক্ত সক্তী বুজে সে রূপে শে ভজে বষ্টবেরো [বৈষ্ণবের] বিষ্টুরূপ নেহারা ঃ।। করে পঞ্চ তত্ত [তত্ত্ব] জ্ঞানি পঞ্চরূপ বাখানি রোসিক বলে সেওতো নিলে রূপ গনি বেদ বিদিতে [বিধিতে/বিদিত] জার নিলের [লীলার] নাই প্রচার নিগুমো সহরে সাইজী মেরা ঃ।। বলে সপ্ত পাস্তীর মতো [সপ্তপষ্টীর মত!] সপ্তরূপ ব্যাক্ষীত [ব্যাখ্যাত] রোসিকেরো মন নয় তাতে রত রোসিকেরো মন রশেতে মগনো রূপ রশো জা নিয়া খেলছে তারা ঃ।। জে জোন ব্রহ্মজ্ঞানি [ব্রাহ্ম] হয় শেও তো কথায় কয় না দেখে নাম ব্রহ্ম সার করে রিদয় সরূপ রূপ দর্পনে রূপ দেখে নওনে [নয়নে] নালন বলে রসিক দিপ্তকায়া ঃ।।

৩১ নং

রূপের ঘরে অটল রূপ বেহারে চেয়ে দেখনা তোরা ঃ।। ফনি মনি জিনি রূপেরো বাখানি দুই রূপে আছে সেইরূপ হল করা ঃ।। জে জোন অনুরাগী হয় রাগের দেশে জায় রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায় রাগেরি করন বিধি বিস্বরন নিত্ত নিলের [নিত্যলীলার] ও পার রাগ নেহারা ঃ।। ও শে অটল রূপ সাই ভেবে দেখো তাই সে রূপেরো কভু নিলে নিত্ত নাই জে জোন পঞ্চতত্ত্ব জজে নিলে রূপে মজে সে কি জানে অটল রূপ কী ধারা ঃ।। আছে রূপের দরোজায় শ্রীরূপ মহাশয় রূপের তালা ছোড়ান তার হাতে সদয় [সর্বদা] জে জোন ছিরূপ [শ্রীরূপ] গতো হবে তালার ছোড়ান [চাবি] পাবে অধিন নালন বলে অধার ধরবে তারা ঃ।।

৩২ নং

সাই কে বোজে তোমার অপার নিলে ঃ। তুমি আপ্নী ডাকো আল্লা বলে ঃ। নৈরেকারে তুমি নুরি ছিলে ডিম্বু অবোতোরি, তুমি নিগোমেরি ফুল, আগোমে রছুল এশে আদমেরো ধড়ে জান হৈলে ঃ।। নিরাকার নিগম্ব ধনি, সেও তো সর্ত্ত সবায় জানি, তুমি সাকারে সের্জ্জন কল্লে ত্রীভুবোন আবার আকারে চোমতকার ভাব দেখালে ঃ।। আপ্তুতত্ত্বে [তত্ত্বে] ফাজিল জারা, নিগুড় নিলে দেখছে তারা তুমি নিরে নিরাঞ্জন অকৈতপের ধন নালন খোজে বোন জঙ্গলে ঃ।।

৩৩ নং

কোন শুখে সাই করেন খেলা এই ভবে ঃ। দেখ শে আপ্নী বাজে আপ্নী বাজায় আপ্নী বাজে মজে সেই রবে।। নামটী লা সরিকালা, সবের সরিক সেই একেলা, আপ্নী তরং আপ্নী ভেলা, আপ্নী খাবি খায় ডুবে ঃ।। ত্রিজগতে জে রাইরাঙ্গা, তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা, হায় কী মজার আজব রোঙ্গা, দেখায় ধনি কোন ভাবে ঃ।। আপন চোরা আপন বাড়ি, আপ্নী শে লয় আপন বেড়ী, নালন বলে এ নাচাড়ি কৈনে [কহিনে] থাকী চুবচাবে ঃ।।

৩৪ নং

আজ রোগ বাড়ালী সঙ্গ কুপত্তী [কুপথ্যি] কোরে ঃ।। ঔশুধ খেএ আপোজসটী [অপযশটি] কল্লী কবিরাজেরে ঃ।। মেনলে [মানলে] কবিরাজের বাক্য তবে তো রোগ হয় আরাজ্ঞ [আরোগ্য] মধ্যে নিজে বিজ্ঞ হএ গোল বাদালি রে ঃ।। অম্রতো [অমৃত] ঔশুধি [ঔষধ] খালি, তাতে মক্তী [মুক্তি] নাহি পালি, লোব লালোশে ভুলে রলী, [রইলি] ধিক তোরো লালোশে রে ঃ।। লোভে পাপো পাপে মরন তাকী জানো নারে ও মন, নালন বলে জা জা এখন মোরবে ঘোর বিগারে [বিকারে] রে ঃ।।

৩৫ নং

মন কী তুই ভোড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া ঃ।। সদরের সাজ কোরচো সদয় পাচ বাড়িতে নাই বেড়া ঃ।। কোতা [কোথা] বস্তু কোথা রে মন চৌকী পারা [পাহারা] দেও হামেশ খোন, [ক্ষণ] কাজ দেখি পাগলের সুমন কথায় জমন কাট [কাঠ] ফাড়া ঃ।। কোন কোনায় কি হচ্চে ঘরে, একদিনে তো [তুমি] দেখিলী না রে পৈত্রীকি ধন গেল চোরে হলিরে তুই ফোকতাড়া (কোকতাড়া) ঃ।। পাচ বাড়ি অটলা করো, ঘর চোরারে চিনে ধরো নালন বলে নৈলে তোরো থেকবে না মল [মূল] এক কড়া ঃ।।

৩৬ নং

মানুষ তর্ত্ত [তত্ত্ব] জার সর্ত্ত [সত্য] হয় মনে ঃ। শে কী অন্য তর্ত্ত মানে ঃ। মাটীর ঢিপী কাটের ছবি ভুত ভেবিষ [ভবিষ্যৎ] আর দেবাদেবি. ভোলে না শে এসব রূপী মানুষ ভজে দিব্বু জ্ঞানে ঃ।। জোরই শোরই ললা ঝোলা, পেচোপাচী এল ভোলা তাতে না শে ভোলনে আওলা জে মানুষ রতোন চেনে ঃ।। ফেউ ফেপী ফেকশা জারা ভাকা ভুকোয় ভোলে তারা নালন তন্নী চটা মারা ঠিক দাড়ায় না একখানে ঃ।।

৩৭ নং

হোত্তে চাও হুজুরের দাশী ঃ। মনে গীল্লাত পোরা রাশী রাশী ঃ।। না জানো শেবা সাধনা, না জানো প্রম উপশোনা, সদয় দেখি ইতর পানা, প্রভু রাজী হবে কিশি ঃ।। কেশ বিষে বেষ [বেশ] কল্যে কি হয়, রশোবোধ না জদি রয় রশোবতি কে তারে কয় কিবল মুখে কাষ্ঠ হাশী ঃ।। কৃষ্ণপদে গোপী শুজোন, কোরেছিল দাস্য সেবন, নালন বলে তাই কি রে মন পারবি ছেড়ে শুক [সুখ] বিলাশী ঃ।।

৩৮ নং

জেও না আন্দাজি পথে মন রশোনা ঃ।। কুপেচে কুপাকে পলে [পড়লে] প্রান বেচপে [বাচবে] না ঃ।। পথেরো পোরিচয় কৈরে, জাও না মনের সন্দ [সন্দেহ] মেরে লাব লোকস্বান বুজিরো দ্বারে জায় গো জানা ঃ।। ওজন [উজান] ভেটেল পথো দুটী, দেখো নওন কোরে খাটী, দেআ [দেখ!] জদি মন গড়া বাটী কুল পাবা না ঃ ।। অনুরাগ তোরোনি করো, ধার চিনে ওজনে [উজান] ধরো, নালন কয় শে করতে পারো মুল ঠেকেনা [ঠিকানা] ।।

৩৯ নং

কে বুজিতে পারে আমার সাইর কুদরতি ঃ।। অঘাতো [অগাধ] জলেরো মাঝে জোলছে বাতি ঃ।। বিনে কাষ্টে আনল জলে [জ্বলে] জল রয়েছে বিনে স্থলে আখের হবে জল আনোলে [অনলে] প্রলয় অতি ঃ।। আনলে জল উষ্ণ হএনা, জলে শে আনল নেভে না এম্নী শে কুদরত কারখানা, দিবোরাতি ঃ।। জে দিন জলে ছেড়বে হংকার ডুবে জাবে আগুনের ঘর নালন বলে সেইদিন বান্দার হয় কী গতি ঃ।।

৩৯ নং (খ)

জেখানে সাইর বারামখানা ঃ। সনিলে প্রান চুমকে [চমকে] ওঠে দেখে জন ভুজঙ্গনা ঃ। জা ছুইলে প্রানে মরি, এ জগোতে তাই তে তোরি, বুজে তো বুজিতে নারি, কি করি তার নাই ঠেকেনা ঃ।। আপ্ততত্ত জে জেনেছে দিব্ব জ্ঞানি শেই হইয়েছে, কুব্রেক্ষে শুফল পেএছে আমার মনের ঘোর গেলো না ঃ।। জে ধোনের উতপতি [উৎপত্তি] প্রানধোন, শে ধোনের হলো না জতন, অকর্মের ফল কাপায় (পাকায়) নালন দেখেশুনে জ্ঞান হলো না ঃ।।

৪১ নং

আমার মন পাখি আইজ পড়ো রে হরে ঃ। কৃষ্ণ, হরে ঃ এ এ এ ঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ জে নামেতে কৃষ্ণ হরে ঃ এ এ এ ঃ। পড়ো পাখি কৃষ্ণ পক্ষ ছেড়ে লহ কৃষ্ণপক্ষ ঃ মন কদম্ব প্রধান ব্রক্ষ [ব্রহ্ম] বশে ডাকো উচ্চস্বরে ঃ। আজন্ম পুশীলাম তোরে, মধুর বুলী সনাবার [শুনাবার] তরে, চলো জাই জার্ননবির স্ত্রে [জাহ্নবীর তীরে] জেতে হবে অন্য পুরে ঃ এ এ এ ঃ।। ওইরে আমার পোষাপাখী, কাজোল বরন হিঙ্গুল আখি আমারে দিও না ফাকী পীজরা ভেঙ্গে ছিকলি [শিকল] মেরে ঃ। তিলক তুলোশীর মালা ত্রীভবনের জেই আলা, গোসাই নবিন বলে পড়ো নিলা ১৬ নাম ৩২ অক্ষরে ঃ।।

৪২/৪৩ নং

ভুলনা মন কারু ভোলে ঃ রছুলের দিন [দ্বিন] সর্ত্ত [সত্য] মানো ওরে ডাকো সদায় মওলা বলে ঃ।। খোদা প্রাপ্ত মল [মূল] সাধনা রছুল বিনে কেউ জানে না জাহের বাতুন উপসোনা রছুল দ্বারে [দ্বারায়] প্রকাশীলে ঃ।। দেখাদেখি সাধিলে জোগ বিপদ ঘটপে বাড়িবে রোগ জে জোনা হয় শুদ্দু [শুদ্ধ] সাধক নবির কর মেনে (ফর্মানে) সে চলে ঃ।। অপারকে বুজাতে [বুঝাতে] তামাম করেন রছুল জাহেরা কাম, বাত্তুনে মশগুল সুদায় [সর্বদা] কারু, জানাইলে ঃ। জে রূপ মরশীদ সেই রূপ রছুল জে ভজে শে হবে মকবুল ছেরাজ সাই কয় নালন কি কুল পাবি মরশীদ না ভজীলে ঃ।।

৪৩/(৪৪) নং

এ বড় আজব কুদরতি ঃ। ১৮ মোকামের মাজে জলছে একটা রূপের বাতি ঃ।। কি বারে রে কুদরতি খেলা জলের মাঝে অগ্নী জলা খবর জেন্তে [জানতে] হয় নিরালা নিরে খিরে আছে জুতি ঃ।। ছনি মনি নাল [লাল] জহরে শে বাতি রেকেচে ঘিরে, তিন সমায় তিন জোগ শেই ঘরে, জে জানে শে মহারতি ঃ।। থেকতে বাতি উর্জ্জলাময় দেখতে জার বাশনা রিদয় নালন কয় কখোন কোন সমায় অন্দকার [অন্ধকার] হবে বশতি ঃ।।

৪৪/(৪৫) নং

সদায় সে নিরাঞ্জন নিরে ভাশে ঃ। জে জানে শেই নিরের খবর নিরঘাটায় তায় খুজলে পায় অনাশে [অনায়াসে] ঃ।। বিনা মেঘে নির বরিসোন করিতে হয় তার অন্যসোন [অন্বেষণ] জাতে হলো ডিম্বর গঠন থাকিয়া আব্‌মস্তম্ম বাশে [আব্রহ্মস্তম্ভবাস] ঃ।। জথা নিরের হয় উৎপত্তি সেই আবেম্বে [আবিম্ব] জলবে সক্তী, মিলন হলো উভয় রতি, ভেষলে জখন নৈরেকারে এশে ঃ।। নিরে নিরাঞ্জন অবতার নিরেতে সব কোরবে সংহার, ছিরাই সাই তাই কয় বারেবার দেখরে নালন আপ্ততত্তে [তত্ত্বে] বশে ঃ।।

৪৫/(৪৬) নং

নাম সাধন বিফল বয়জোগ বিনে ঃ। এখানে সেখানে বরজোক ঃ। মুল ঠেকেনা তাই দেখো মনে ঃ। বরজোকের ঠিক না হয় জদি ভুলাইবে সএতান গীধি, ধরিয়ে রূপ নানান বিধি চিনবো তখোন কিরূপো প্রমানে ঃ। ৪ ভেঙ্গে দুই হলো পাকা সেই দুই বরজোক লেখাজোকা, তাতে পলো আরাক [আর এক] ধোকা দুই দিগে ঠিক কবে হয় ধ্যায়ানে ঃ।।

৪৬/(৪৭) নং

মন তোরে আইজ ধোরতে পার্তাম হাতে ঃ। তোরে দেখতাম মোর মনকী মনাই কেমন করে সদায় আইন ডেমাতে [ডিঙ্গাতে] ঃ।। কি কবো জে বেহাত আমার নৈলে কী মন এ তাল তোমার পাই নে গুনে তালের সুমার কোন তালে আমায় নাচাও কোন পথে ঃ।। ও মন সদায় বল আর ভুলবো না তিলকেতে [তিলেকে] ঠিক থাকে না দুষ্ট লালষ দোশে মনা মজালি আমারে নানান মতে ঃ।। ক্রমে তনু পলো ভাটী আর কবে মন হবা খাটি নালন বলে নারদকাটী বেজলে ওন্নী নেচে ওটো [উঠ] তাতে ঃ।।

৪৭/(৪৮) নং

কি বলিষ গো তোরা আইজ আমারে ঃ। চাঁদ গৌরাঙ্গ ভুজাঙ্গ ফনি ডংশীল জার রিদয় মাজারে ঃ।। ওগো রূপের কালে জারে ডংসায়, সে ধাউৎ [ধাত] কী বোজে ওজায় [ওঝায়], বিষ খেনেক জলে খেনেক পাজায় ধর্নন্তরির [ধন্বন্তরির] ঔশধ জায় গো ফিরে ঃ।। আমী ভুলবো না বলি কটাক্ষেতে অগ্নী ভুলী জ্ঞায়ান [জ্ঞান] পবন জায় সকলী ব্রর্ম [ব্রহ্ম] মন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে ঃ।। জদি মেলে রসিক শুজোন, রোসীক জোনার জুড়ায় জিবন, বিনয় কোরে বলে নালন অরসিকের কথায় দুঃখো ধরে ঃ।।

৪৮/(৪৯) নং

কে বোজে সেই কৃষ্ণের অপর নিলে ঃ। সনি [শুনি] তিলর্দ্ধ [তিলার্ধ] নাই ব্রজো ছাড়া কে তবে মথুরায় রাজা হলে ঃ।। সনি রাধা ছাড়া তিলর্দ্ধ নয়, ভারতে পুরানে তাই কয়, তবে ধনি কেনে দুর্জ্জয়, বিচ্ছাদে [বিচ্ছেদে] জগতে জানাইলে সবে বলে অটাল হরি, সে কেনে হয় ডণ্ডধারি, কিশেরো অভাবে তারি, ওই ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে ঃ।। নিগুড় খবর জানা গেলো পুরূষ হৈতে নারি হলো, তবে কেনে এমন হলো, আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলো ঃ।। কৃষ্ণ নিলের নিলে অথাই, থাই দিবে কেউ সে সাদ্দ [সাধ্য] নাই, জানি কি ভাবিয়ে কি কোরে জাই, নালন বলে পলেম বিসম ভোলে ঃ।।

৪৯/৫০ নং

জে জাবি আইজ গৌর প্রেমের হাটে ঃ। তোরা আএনা [আয়না] মনে হোয়ে খাটী ধাক্কায় জেনো জাইষ্‌নে চোটে ফেটে ঃ।। ও শে প্রমসাগরের তুফান ভারি ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরি, কর্ম্ম জোগে ধর্ম্মতরি, কারূ তাতে বেচে ওঠে ঃ।। ও চাতুরালি থেকলে বল, প্রম জাজনে বেন্দবে কলো, হারিএ শেশে দুটী কুলো, কান্দাকাটী লেগবে পথে ঘাটে ঃ।। আগে দুঃখো পাছে সুক [সুখ] হয়, শোএ [সহ্য করে] বোএ [বসে] কেউ জদি রয়, নালন বলে প্রম পরষ পায় সামান্য মনে কী মন তাই ঘটে ঃ।।

৫০/৫১ নং

এ জনম গেলোরে অসার ভেবে ঃ। পেয়েছো মানব জনম হেন দুল্লভ জনম আর কি হবে ঃ।। জননির জঠরে জখন অধমুণ্ডে ছিলে রে মন, বোলেছিলে কোরবো সাধন, এখন কী তা মনে হয় না ভবে ঃ।। ও মন কারে বল আমার ও তুমি কার আইজ কেবা তোমার, জাইবে সকল গুমার, জেদিন সমনো রায় আশীবে ঃ।। ও মন এদিনে শে দিন ভেবলে না, কি ভেবে কি করো মনা, নালন বলে জাবে জানা, হেরলে বাজি কেন্দলে [কাঁদলে] কি য়ার [আর] সারে ঃ।।

৫১/৫২ নং

কোরেছে কি শোভা সাই রঙ্গমহলে ঃ।। অজান রূপে দির্ছে [দিচ্ছে] ঝলক দেখলে নওন জায় গো ভুলে ঃ।। জলের মধ্যে ফলের (কলের) কোটা [কৌটা] সপ্ততালা আয়েনা আটা, তার ভিতরে রূপের ছাটা, মেঘে জমন বিজলী খেলে ঃ। লাল জরদা ছনি মনি, বেড়ে শে রূপেরো ফনি, দেখ্‌তে শোভা জন অম্নী তারার মালা চাঁদের গলে ঃ।। অনুরাগ জার বান্দা [বান্ধা] রিদয় তাই রি শে রূপ চক্ষে উদাই [উদয়] এড়াইবে সমনো দায় নালন মলো অপহেলে [অবহেলে] ঃ।।

৫২ নং

আজব আএনা মহল মনি গোভিরে ঃ। সেতা সদতো [সতত] বিরাজে সাইজি মেরে ঃ। পূর্ব্ব দিগে রত্ন বেদী, তাহারো উপরে খেলচে জোতি, তারে জে দেখেছে ভার্গগতি [ভাগ্যগতিকে], এবার সে জোনো সচেতন সব খবরে ঃ। জলেরো ভিতরে শুক্রো জমী ১৮ মোকামো তায় কাইমী, নিসন্দে সন্দের উদগামী সে মোকামের খবর জেন গে জারে ঃ। মনিপুরের ঘাটে মনোহরি কল তেহাটা ত্রীবিনি তায় বাঁকা নল, মাকড়ার আশে [মাকড়সার সুতোয়] বন্দি সে জন ফকির নালন বলে সন্দি বুজবে কেরে ঃ।।

৫৫/৫৬ নং

আপন আপন খবর নাই ঃ। গগনের চাঁদ ধরবো বলে মনে করি তাই ঃ।। জে গোটেছে এ প্রমতোরি, সেই হইএছে চড়ন্দারি, কোলের ঘোরে চিন্তে নারি, মিছে গোল বাদাই ঃ।। ১৮ মোকামে জানা মহারশের বারামখানা সেই রশের ভিতরে শে না আলো করে সাই ঃ।। না জেনে চাঁদ ধরার বিধি, কথারি কৈট [কুট] সাধন সাধি, নালন বলে বাদি ভেদী বিবাদী সদাই ঃ।।

৫৬ নং

সুদ্দ প্রেম সেধলো [সাধিল] জারা ঃ কামরতি রাখিল কোতা ঃ।। বল গো রসিক রশের মাফিক ঘুচাও আমার মনের বেথা ঃ।। আগে উদয় কামের রতি রশ আগোমন তাইরি গতি, সেই রশে হইয়ে স্থিতি, খেলছে মানুষ প্রেমদাতা ঃ।। মন জানিতো রশের করন নয় রে শে প্রেমীরি ধারন [ধরন], জল ছেচে [সেচে] হয় রে মরন কথায় কি বল বাজি জেতা ঃ।। মনেরো অবাদ্দ্য [অবাধ্য] জে জোন আপ্নার আপ্নী ভোলে সে জন, ভেবে কয় ফকির নালন ডেকলে শে তো কয় না কথা ঃ।।

৫৭/৫৮ নং

কাজ কি আমার এ ছার কুলে ঃ। আমার গৌরচাঁদকে জদি মেলে ঃ।। মনচোরা পাসে গৌররায়, অকুলের কুল জগতোময়, রে নবকুল আশায় সে কুল দোশায়, বিপদো ঘোটীবে তার কপালে ঃ। কুলে কালি দিয়ে ভোজিব সই, অন্ত্রি [অন্তিম] কালে বন্দবো [বান্ধব] জেই, ভব বন্দুজোন, কি কোরবে তখন, দিনবন্দুর দয়া না হইলে ঃ।। কুল গৈরাবি লোক জারা গুরু (গৌর) গৌরব কি জানে তারা জে ভাবের জে লাভ জানা জাবে সব নালন বলে আখের হিসাব কালে ঃ।।

৫৮/৫৯ নং

কার ভাবে সাম [শ্যাম] নদেয় এলো ঃ। ও তার ব্রজের ভাবের কি আশুসার ছিল ঃ। গোলেকেরি ভাব, তেজিএ শে ভাব, প্রভু ব্রজোপুরে লয়ে ছিল জেহি ভাব, এবে নাহিত শে ভাব, দেখি নতুন ভাব এভাব বুজিতে কোটীন হলো ঃ। সর্ত্ত [সত্য] যুগে সঙ্গি কৌশখি ছিল, ত্রেতায় সঙ্গি সিতে লক্ষী হলো, এবে দাপারে [দ্বাপরে] সঙ্গীনি রাধা রঙ্গীনি কোলির ভাবে তারা কোথায় রলো ঃ।। কোলি জুগের ভাব, এ কি অসম্ভাব, নাহি ব্রতোপূজা নাহি অন্য লাভ, ছিল ডণ্ডী [দণ্ডী] বেষ কিবল, ডণ্ড কৌমণ্ডল, নিতাই আবার তাহা ভেঙ্গে দিলো ঃ।। উহার ভাব জেনে ভাব নেয়া হলো দায়, না জানি কখোনে কি ভাব উদয়, কল্লে তিনোটি [তিনটি] নিলে একা নদিয়ায় নালন ভেবে দিশে নাহি পেলে ঃ।।

৬০/৬১ নং

ও হোরি কান্দে হোরি বলে কেনে ঃ।। ধারা বহে দুনওনে ঃ। হোরি বোলে হোরি ভোরা, নওনে বয় জলোধারা, কি ছলে এশেছে গোরা, জানি কি ছলে এশেছে গোরা, এই নদিয়া ভুবনে ঃ।। মোরা জতো পুরুষ নারি, দেখিতে আইলাম হোরি, হোরিকে হোরিলো হোরি ও শে হোরিকে হোরিলো হোরি জানি সেই হোরি কোনখানে ঃ।। গৌউর হোরি দেখে এবার কত পুরুষ নারি ছেড়ে যায় ঘর সেই হোরি কী করে এবার জানি সেই হোরি কি করে আবার তাই নালন ভাবে মনে ঃ।।

৬১/৬২ নং

নিগুড় প্রেম কথাটী তাই আজ আমী সুদাই [শুধাই] কারূ কাছে ঃ।[২] কোন প্রেমেতে আল্লা নবি মিসলো মেএ্রারাজে [মেয়ারাজ] ঃ।। মেএ্রারাজ ভাবের ভুবন, গোপ্ত বেক্ত আলাফ হয় দুজোন রে, কে পুরূ [পুরুষ] আকার কে প্রকীতি তার প্রমান কি লেখেছে ঃ।। কোন প্রেমের প্রমী ফাতেমা, করেন সাইকে পতি ভজনা, কোন প্রেমেরি দায় ফাতেমারে সাই মা বলো বলেছে ঃ।। কোন প্রেমে গুরূ ভবোতোরি,[২] কোন প্রেমে সিস্য [শিষ্য] কাণ্ডারি না জেনে নালন প্রমের উদ্দীপোন পীরিৎ করে মেছে [মিছে] ঃ।।

(৬২) ৬১/৬৩ নং

দেল দোরিয়ায় ডুবে দেখ না ঃ। অতি অজান খবর জাবে জানা ঃ। আলখানার সহরো সহর ভারি, তাহে আজব কারিগীরি [কারিগরি], রে ঃ। বোবা কথা কয় কালায় সন্তে [শুনতে] পায় আন্দোলাতে [অন্ধে] পরক কোরচে শে না ত্রীপিনির পীছল ঘাটে বিনে হাওয়ায় মৌজা ছোটো, ডওরায় [ডহরায়] পানি নাই ভিটে ডোবে তাই সনলে কী পেত্যাবি এ কারখানা ঃ । কহিবারে জজ্ঞ [যোগ্য] নয় শে কথা, সাগোরে ভাশে জগোত মাতা ঃ। নালন বলে মার উদরে পীতে জনমে পত্নীর দুগদু [দুগ্ধ] খেলে সে না ঃ।।

৬২/৬৪ নং

লন্ঠনে রূপের বাতি জলছেরে সদায় ঃ।। দেখ্না রে দেখতে জারো বাশোনা রিদয় ঃ।। রোতির গীরে ফকশ্বা মারা শুদই [শুধুই] কথার বেবসা [ব্যবসা] করা ঃ, তার কি হয় শে রূপ নেহারা মিছে গোল বাদায় ঃ।। জে দিন বাতি নিবে [নিভে] জাবে, ভাবের শহর আন্দার হবে, শুক পাখি শে পালাইবে ছেড়ে শুখোময় ঃ।। সিরাজ সাই বলে রে নালন স্বরূপ রূপে দিলে নওন হবে রূপের রূপ দরোশোন পড়িয্নে ধাদায় [ধাঁধায়] ঃ।।

৬৩/৬৫ নং

খাকি আদমের ভেদ শে ভেদ পোশু কী বোজে ঃ।। আদমো কালেবে খোদা খোদে বিরাজে ঃ।। আদম শরিরো আমায় ভাশায় [ভাষায়] বোলেছে অধার সাই নিজে, নৈলে কী আদমকে সেজদা ফেরেস্তার সাজে ঃ।। সনি [শুনি] আজাজীল খাস্তন আদাম তোন [তনু] গটেছে, সেই আজাজিল খোবিষ হলো আদম না ভজে ঃ। আব খাক আতোষ বাদে ঘর গটলে জান মালেক মুক্তার কোন চিজে সাই নালন বলে জেনলে এ ভেদ সব জানে শেজে ঃ।।

৬৪/৬৬ নং

তোরিকতে দাখিল হৈলে সব জানা জায় ঃ।। কেনেরে মন কোলের ঘোরে ঘোরো ডানি [ডান] বায় ঃ।। আউলে বিচমেল্লা বর্ত্ত, মূল বটে তার তিনটী অর্থ, আগোমে বৈলেচে সর্ত্ত [সত্য], ডুবে জেন্তে হয় ঃ। নবি আদম খোদবুদ খোদা, এ তিন কভু নহে যুদা, আদমকে করিলে সেজদা, আলেক জানে পায় ঃ। জথা আলেক মোকাম বাড়ি, ছপীউল্লা তারো সিড়ি, নালন বলে মনের বেড়ি লাগাও তারো পায় ঃ।।

৬৫/৬৭ নং

আপন ছরাতে আদম গটলে দয়াময় ঃ। নেইলে কী ফেরেস্তারে সেজদা দিতে কয় ঃ।। আল্লা আদম না হইলে, পাপ হতো সেজদা দিলে, সেরেকে পাপ জারে বলে এ দিন দুনিয়ায় ঃ। দুশে [দুয়ে] শে আদম ছপী, আজাজিল হলো পাপী মন তোমার নাপানাপী [লাফালাফি] তন্নী দেখা জায় ঃ।। আদমী শে চেনে আদম পোশু কি তার পায় মরম নালন কয় আদ্য ধরন [ধরম!] আদম চিনলে হয় ঃ।।

৬৬/৬৮ নং

তোরিকতে দাখিল না হলে, সরিয়তে হবে না সিদ্দী পোড়বি গোলমালে ঃ।। সরারো নামাজের বিজ, আরকাম আহাকাম ১৩ চিজ, তোরিকোতের আরকাম, আহাকাম কয় চিজ বলে ঃ।। ছালেক কী মর্জ্জোবি হয়, হোকিকতে পরিচায়, মারূফত সিদ্দীরো মোকাম দেখনারে খুলে ঃ।। আপ্তুতত্ত জানে জে, সব খবরের জবোর শে, নালন বলে ভেদ না জেনে পোড়বি রে গোলে ঃ।।

আমার এ ঘরখানায় কেবিরাজকরে:। তারে জনম ভোরে একবার—
দেখনা যনারে:। নড়ে চড়ে ইশান কোনে, দেখ্তে পাইনে এনওনে—
হাতের কাছে তার, ভাবের হাট বাজার, ধরতে গেনে হাতে পাইনে তারে:।।
সবে কয় শে প্রান পাখি, সনে চুপে চাপে থাকী, জলকী হুতাশন,
মাটিকী পবন, কেউ বলেনা একটা নিন্নয় কোরে:।। আপন ঘরের খবর
হয়না বাঞ্ছা করি পরকে চেনা, লালন বলে পর, বল্তে পরমেশ্বর—
শে কেমন রূপ আমি কিরূপ ওরে:।। —

৬৭/৬৯ নং

খাকে গোটীলো পীঞ্জীরে [পিঞ্জর] ঃ। এ শুক পাখি আমার কিশে গোটেচেরে ঃ। এ শুক পাখি আমার কিশে গোটেচে [গঠেছে] রে ঃ।। পাখি পুসলেম চিরোকাল, নিলে কিবা নাল [লাল], একদিন দেখতে নারি সেইরূপ ছামনে [সামনে] ধরে আবেখাকে পীজরা বর্ত্ত, আতশে হৈল পোক্ত পবনআড়া সেই ঘরে, আছে শুক পাখি সেথা প্রেমের ছিকল [শিকল] পায় আজব খেল খেলিছে গুরূ গোসাই মেরে ঃ।। কিবা রে পীঞ্জীরের ধজা নিচে উপার [উপর] ৯ দরোজা কুটরি কোটা থরে, মন রে পঞ্চ কুটরি তার আছে মলাধর [মূলাধর], মুলাধারের মুল শেই সর্ন [শূন্য] ভরে ঃ। কোরে আজব কারিগীরি বশে আছে ভাণ্ড মিস্তারি সেই পীঞ্জারার বাহিরে, পাখির আশা যাওা [যাওয়া] দার আছে সন্দির [সন্ধির] পর ফকির নালন বলে কেউ[২] দেখতে পারে ঃ।।

৬৮/৭০ নং

আমার এ ঘরখানা কে বিরাজ করে ঃ। তারে জনম ভোরে একবার দেখলাম না রে ঃ। নড়ে চড়ে ইশান কোনে, দেখ্‌তে পাইনে এ নওনে, হাতের কাছে তার ভবের হাটবাজার, ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে, সবে কয় শে প্রানোপাখি, সনে চুপে চাপে থাকী, জল কী হুতাশোন, মাটী কী পবন, কেউ বলে না একটা নিন্নয় কোরে ঃ।। আপন ঘরের খবর হয় না বাঞ্ছা করি পরকে চেনা, নালন বলে পর, বল্‌তে, [বলতে] পরমেশ্বর শে কেমন রূপ আমি কি রূপ ওরে ঃ।।

৬৯/৭১ নং

আপন ঘরের খবর নে না ঃ। অনাশে [অনায়াসে] দেখতে পাবি কোন খানে কার বারামখানা কোমল কোঠা কারে বলি কোন মোকাম তার কোথায় গলি, কোন সমায় পোড়ে ফুলি [পড়ে ফুলে] মধু খায় শে অলিজোনা ঃ। অর্স্ব গেন্দা সক্য মক্য সাধকেরো উপলক্য [উপলক্ষ্য] অপুরূব [অপরূপ] তারো ব্রন্ম্য দেখলে চক্ষ্যের পাপ থাকে না ঃ।। শুষ্কু নদির শুক সরোবর তিলে[২] হয় সাতার নালন কয় ক্রীতিকরমার [কৃতিকর্মার] কি কারখানা ঃ।।

৭০/৭২ নং

নিচে এ পর্দ্দ [পদ্ম] উদয় জগোতময় ঃ। আছমানেতে [আশমানেতে] চাঁদ চকরা [চকোর] কেমন কোরে জুগোল হয় ঃ। নিচের পর্দ্দ দিবোশে মুদীৎ আহা মরি আছমানে চাঁদের উদয় তখোন বিকশীৎ তারা দোহে এক জুগোল আত্তা রে সে চাঁদ লক্ষ জোজোন [যোজন] ছাড়া রয় ঃ।। চন্দ্র পর্দ্দ কান্ত শান্ত জে এ এ এ আহা মরি মালির সঙ্গে রশো অঙ্গে জোগ কে কারেচে [করেছে] শে, এবার মালি জমন সাজিএ ডালি রে এ এ এ সে মালি বশে আছে দরোজায় ঃ।। গুরূপদে শীর্শ [শিষ্য] চন্দ্র হয় আহা মরি সির্শ [শিষ্য] পর্দ্দে গুরু বর্দ্দ [বদ্ধ] রয় ক্ষেপা মদন বলে এহাই হৈলে রে তবে জুগোল আর্ত্তা [আত্মা] জানা জাএ ঃ।।

৭১/৭৩ নং

নিচে পদ্দে চরকবানে জুগোল মিলন চাঁদ চক্করা ঃ। শুর্জ্জেরো [সুর্যের] শুসঙ্গে কমল কি রূপে হয় প্রমোজুগোল, জানো না হোলি কেবল কামাবেশে মাতোয়ারা ঃ।। স্ত্রি লেঙ্গ [লিঙ্গ] পুলেঙ্গ [পুংলিঙ্গ] নাহি নাহি নপংশোকো [নপুংসক] সেহি, জে লেঙ্গব্রহ্মাণ্ডের উপার, কি দিবো তুলনা তাহার, রসীক জোনা জেনচে এবার অরসিকের চমতকারা ঃ। সামর্থারে পূর্ণ জেনে, বশে আছে সেই গুমানে জে রতিতে জনমে মতি সে রতির কেমন অক্রীতি [আকৃতি] জারে বলে সুধার পতি ত্রীলোকেরো সেই নেহারা ঃ।। সনি শুক্কুল চমপক কলি কোন সরূপ কাহারে বলি ভ্রঙ্গ [ভৃঙ্গ/ভঙ্গ] রতির কর নিরাপন চম্পক কলির অলি জে জোন ভাবানুসার কহে নালন কিশে যাবে তারে ধরা ঃ।।

৭২/৭৪ নং

জেন গে পর্দ্দ নিরাপন [নিরূপণ] ঃ। কোন পর্দ্দে জিবেরো স্থিতি কোন পর্দ্দে গুরুর আশন ঃ।। অধঃপর্দ্দ উর্দ্দ [উর্ধ্ব] পর্দ্দ নিলে নির্ত্তর [নিত্যের] এই সরার্দ্দ (সরাঙ্গ) [ষড়াঙ্গ] জে পর্দ্দে সাদোকের বর্ত্ত সে পর্দ্দ কেমন বরন ঃ।। আড়া পদ্দের কোড়া ধরে, ভ্রঙ্গ রতি চলে ফেরে, সে পর্দ্দ কোন দলের পরে বিবশিত হয় কখন ঃ।। গুরুমুখো পর্দ্দ বাক্য রিদয় জার হোএচে অক্য [ঐক্য] জানে সে সকলো পক্ষ্য কহে দিনহিন লালনঃ।।

৭৩/৭৫ নং

কোন রাগে শে মানুষ আছে মহারশের ধনি ঃ। পর্দ্দে মধু চন্দ্রে সুধা জোগাএ রাত্রদিনি [দিন] ঃ। সাধক সিদ্দী প্রবর্ত্ত গুন তিন রাগ ধরে আছে তিন জোন, এ তিনছাড়া রাগ নিরাপন [নিরূপণ] জেনলে হয় ভাবিনি ঃ।। স্রেনাল [মৃণাল] গতি রশের খেলা, নবঘাট নব ঘেটেলা দসমে জোগ বারির গোলা, জোগেশ্বর অজানি ঃ।। ছিরাজ সাঁইর আদেশে নালন বলচে বানি সোন [শোন] রে মলং ঘুরতে হবে নাগোর দলং [নাগরদোল] না জেনে মুল বানি ঃ।।

৭৪/৭৬ নং

আমি কি তাই জেনলে সাধন সিদ্দী হয় ঃ। আমি সব্দের অর্থ ভারি আমি তো সে আমি নয় ঃ।। অনাস্ত সহর বাজারে আমি২ সব্দ করে আমার খবর নাই আমারে বেদ পড়ে পাগোলের প্রায় ঃ।। মুনছুর হাল্লাজ ফকির শে তো বলেছিল আমি সর্ত্ত সই পলো সার [শাহের] আএন মোতো সরায় [শরীয়তে] কি তার মরমো পায় ঃ। কোম বিজনি কোম বাএজ নেল্লা সাইর হুকুম দুই আমি হেল্বা [হিল্লা] নালন বলে এ ভেদ খোল্লা আছে

—কাসিকি মাকেকায় জাবি মনা-চনরে কাইঃ। দোস্নাতে ঘরনে—
পথে সাদে বেনাউ পাই নাইঃ।। মাক্কোতে বাকেফো মে নৈ জেতে—
চাস্ত.কেস্তী স্থনে এম্নী হ্রানে কণ কনারনে চিঁচ নারুনে কেতা জাইঃ।
নৈ বিন্দু পাখনা-কনো) দেখে তো তো মন ভোনা, সিঙ্গী বিনায়—

চরী—
দিবগ। তনায় তাস্ত দেখে মন মন বনায়ঃ। চুন গোফে হুনো—
নুতা না পেনেম পথের গোড়া নানিন বলে মনের গোনে—
নাঙ্গোনেম কুন নাদির মাইঃ।।

৭৫/৭৭ নং

সামান্যে কি শে ধন ঃ পাবে ঃ। দিনের অধীন হৈয়ে সাধিতে হবে ঃ। কতো[২] মনি রিশী, জুগজুগোন্তর বোনোবাশী, পাবো বইলে কালো সশী, বসিয়ে তপে ঃ।। সাধন পথে কিনা হলো, বাদসারো বাদসাই [বাদশাহী] ছাড়িল, কুলোবতির কুলো গেলে [গেল] কালারে ভেবে ঃ।। গুরুপদে কত জোনা, বিনা মুলে হোএ কেনা, তারা করেন গুরুর দাস্যপানা শে ধোনের লোভে ঃ।। চরন ধোনে জারো আশা অন্য ধোনের নাই পেবশা [পিপাসা] নালন ভেড়োর বুদ্দীনাশা দোভাশা ভাবে ঃ।।

৭৬/৭৮ নং

দেখিলাম কি কুদরতিময় ঃ। বিনে বিছে আজবগোবি গাছ চাঁদ ধরেছে তায় ঃ। নাই শে গাছের আগাগোড়া সর্ন [শূন্য] ভরে আছে খাড়া ফুল ধরে তার ফলটী ছাড়া দেখে ধান্দা হয় ঃ। বলব কি শেই গাছের কথা, ফুলে মধু ফলে শুধা, শেই রবেতে [সৌরভেতে] হরে খুদা [ক্ষুদা] দরিদ্রতা জায় ঃ।। জেনলে গাছের অর্থবানি, চেতন বটে শেই ধনি গুরু বলে তারে মানি নালন ফোকির কয় ঃ।।

৭৭ নং

কারে আইজ সুধাই শে কথা ঃ। কি সাধনে পাবো তারে জে আমার জিবোনদাতাঃ।। সন্তে [শুনতে] পাই পাপ [পাপী] ধার্মিক সবে ইল্বিনে সিজ্জিনে জাবে উভয় কএদী রবে অটাল প্রাপ্ত কৈ ক্ষেমতা ঃ। ইল্বীন সিজ্জিন দুঃখ সুখের ঠাই কনখানে রেকেচে সাই এ হেতায় কেনে দুঃখশুক পাই, কোতাকার ভোগ ভুগী কোতা ঃ।। জখন কার ভোগ তখন ভুগী শীশু তবে হয় কেন রূগী নালন বলে বোজো দেখি শীশুর গোনাখাতা ঃ।।

৭৮ নং

কাসি [কাশী] কি মাক্কায় জাবি মনা চল রে জাই ঃ। দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্দে [সন্ধ্যে] বেলা উপাই নাই ঃ।। মাক্কাতে ধাক্কা খেলে জেতে চাও কাশীস্থলে এম্নী হালে কাল কাটালে ঠিক নাবালে কোতা ভাই ঃ। নৈবিদ্দ্য পাকা কলা, দেখে ভোলো মন ভোলা, সিন্বী [সিন্নী] বিলায় দরগা তলায় তাও দেখে মন খল্‌বলায় ঃ। চুল পেকে হলো হুড়া না পেলেম পথের গোড়া নালন বলে মনের গোলে না পেলেম কুল নদির থাই ঃ।।

৭৯ নং

জদি গৌরচাঁদকে পাই ঃ। গেলো[২] এ ছার কুল তাতে ক্ষেতি নাই ঃ। জন্নীলে মরিতে হবে, কুলকী কারূ সঙ্গে জাবে মিছে কিবল [কেবল] দুদিন ভবে কুলেরো বড়াই ঃ। কি ছার কুলের গৌরব করি, অকুলের কুল গৌর হোরি, ভবো তরঙ্গেরো তোরি গোউরো গোশাই ঃ। ছিলাম কুলের কুলোবালা কন্দে [কাঁধে] নেলেম আচলা ঝোলা, নালন বলে গোউর বালা আর কারে ডরাই ঃ।।

৮০/৮২ নং

দাড়া কানাই একবার দেখি ঃ।। কে তরে কোরিলো বেহাল হোলিরে কোন দুখের দুখি ঃ।। পরন ছিল পীতো ধড়া, মাথে ছিল মহন [মোহন] চুড়া, শে বেশো হৈলে ছাড়া বেহাল বেষ নিলে কোন শুখি [সুখে] ঃ।। ধেনু রেকতে মদের [মোদের] সাতে আবা২ ধনি [ধ্বনি] দিতে, এখোন এশে নদিয়াতে হোরি ধ্বনি দেও এ ভাব কী ঃ।। ভুল বুজি পোড়েচে ভাই তোর, আমি সেই ছিদাম নফর, নালন কয় ভাব সনে বিভোর, দেখিলে সাফল [সফল] হতো আখি ঃ।।

৮১/৮৩ নং

মনের কথা বোলবো কারে ঃ। মন জানে আর জানে মরমো মজিছি মন দিয়ে জারে ঃ। মনেরো তিনটী বাশোনা নদিয়ায় কোরবো সাধোনা, নৈলে মনের বিওগ জায়না তাইতে ছিদাম এ হাল মরে [মোরে] ঃ।। কোটীতে কোপীন পোরিবো, করেতে করঙ্গ নিবো, মনের মানুষ মনে রেকবো কর জোগাবো মনের সিরে ঃ।। জে দায়ের দাইক [দায়িক] আমার মন, রোশিক বিনে বুজবে কোন জোন, গৌর হোএ নন্দের নন্দন নালন কয় শেই বিনয় করে।।

৮২/৮৪ নং

কানাই কার ভাবে তোর এ ভাব দেখিরে ঃ। ব্রজের শে ভাবতো দেখি না রে ঃ। পরন ছিল পীতোধড়া, মাথে ছিল মহোন চুড়া করে বাশী রে ঃ।। আইজ দেখি তোমার করওয়া [করোয়া] কোপীন সার ব্রেজের শে ভাব কোথা রাখলিরে ঃ।। দাশ দাশী তেজিয়া কানাই একা২ ফিরচো রে ভাই, কাঙ্গাল বেষ ধোরে, ভিকারি হোলি কেন্তা [কন্থা] সার করিলী কিসারো অভাবেরে ঃ।। ব্রজোবাশীর হোয়ে নিদয়, আশীয়া ভাই এই নদিয়ায় কি শুখ পালি রে, নালন বলে আর কার বা রাজ্য কার আমি সব দেখি আইজ মিছেরে ঃ।।

৮৩/৮৫ নং

কারে বলবো আমার মনের বেদোনা ঃ। এমন বেতার [ব্যথার] বেতিৎ [ব্যথিত] মেলে না ঃ। জে দুখে আমারো মনো ঃ আছে সদায় উচাটোনো বল্লে সারে না, গুরু বিনে আর না দেখি কেনার তারে আমি ভজলেম না ঃ।। অনাথের নাথ জে জোন আমার, শে আছে কোন অচিন সহর তারে চিনলাম না, কি করি কি হয় দিনের দিনো জায়, কবে পুরবে মনের বাশোনা ঃ।। অন্য ধোনের নয় রে দুখি, মন বলে আইজ রিদয় রাখি শ্রীচরনখানা, নালন বলে মোর পাপের নাহি ওর, আশা তাইতে পূর্ণ হলো না ঃ।।

৮৪/৮৬ নং

আএ দেখে জা নতুন ভাব এনেছে গোরা ঃ। মড়িএ [মুড়িয়ে] মাতা [মাথা] গলে কেতা [কাঁথা] কোটীতে কোপীন ধরা ঃ।। গোরা হাশে কান্দে ভাবের অন্ত নাই সদায় দিন দোরদী বলিয়া ছাড়ে হাই জিজ্ঞাশীলে কএনা খুলে হোএচে কি ধোন হারা ঃ।। গোরা সাল [শাল] ছেড়ে কোপনী পোরেচে আপ্নী মেতে জগত মেতিএচে মরি হাএ কি নিলে কোলি কালে বেদবিধি চমতকারা ঃ।। সর্ত্ত তৃেতা [ত্রেতা] দাপার [দ্বাপর] কলি হয় গোরা তার মাজে এক দির্ব্বু জুগ দেখায়, অধিন নালন বলে ভাবিক হলে শে ভাবো জানে তারা ঃ।।

৮৫/৮৭ নং

কে আইজ কোপীন পরালো তোরে ঃ। তার কী দয়া মাওা [মায়া] কিছু নাই অন্তরে ঃ। একা পুত্র তুই রে নিমাই অভাগীনি্র আর কেও নাই কি দোশে আমায় ছেড়ে রে নিমাই ফকির হোলী এমন ব্এশে রে ঃ। মনে এহাই ছিল তোরি হবি রে নাচের ভিকারি তবে কেন বিএ কল্লী পরের মেএ, কেমনে আইজ আমি রেকবো তারে ঃ। তেয্য কোরে পীতে মাতা কি ধরমো আইজ জানবি কোতা, মাএর কথায় চল কোপীন খুলে ফেল নালন কয় জেরূপ তার মায়ে কয় রে ঃ।।

৮৬/৮৮ নং

মন আমার আইজ পোলি [পড়লি] ফেরে ঃ। দিনে দীন পৈত্রীকী ধন গেলো চোরে ঃ।। মায়া মদ খেএ ঃ মনা ঃ দিবোনিশী [দিবানিশি] ঝোক ছোটে না, পাচবাড়ির উল হলো না কে কি করে ঃ।। ঘরের চোরে ঘর মারে মন ঃ জায়না ঘোম [ঘুম] জানবি কখন একবার দিলে না নওন আপন ঘরে ঃ। বেপার করতে এশেছিলি আশোলে বিনাষ হোলি নালন হুজুরে গেলে বলবি কি রে ঃ।।

৮৭ নং

এলাহি আলামীন আল্লা বাদশা আলম পানা তুমী ঃ ভাশাএ [ভাসায়ে] ডুবাতেপারো ঃ ডুবাএ কেনার দেও কারো ঃ জা করো শেই হাত তোমারো তাইতে তোমায় ডাকি আমি ঃ।। নুহ নামে এক নবিরে ঃ ভাসালে বেশম [বিসম] পাথারে ঃ আর তারে মেহের কৈরে ঃ আপ্নী নাগালেন কেনারে ঃ জাহের আছে ত্রীসংসারে আমায় দয়া করো স্সামী [স্বামী] ঃ।। নেজাম নামে বাটপার শেতো পাপেতে ডুবিএ রৈতো ঃ তার মনে সুমতি দিলে, কুমতি তার গেলো টেলে [টলে] ঃ আউলে নাম খাতায় লিখিলে জানা গেল এ রহমী ঃ।। নবি না মানিল জারা ময়াহেদ কাফেরো তারা, শেই মওয়াহেদ দায়মাল হবে বেহেশোব দোজোখে জাবে আবার তারে খালাষ দিবে নালয় (নালন) কয় মোর কি হয় জানি ঃ।।

৮৮/৯০ নং

পোড়গে নামাজ জেনে শুনে ঃ। নিয়াৎ বেন্দে গে মানুষ মাক্কা [মক্কা] পানে মানুশে মানুষ কামোনা সিদ্দি [সিদ্ধি] করো বর্ত্তমানে, দেখ২ খেলচে খেলা বিনদ কালা এই মানুশের তোন ভুবনে ঃ।। সতোদল [শতদল] কমলে কালার আশন সর্ন্ন [স্বর্ণ] সিঙ্গাশোনে, ও শে চোদ্দভুবন ফিরাএ নিসান ঝলক দিচ্ছে নওন [নয়ন] কোনে ঃ।। মরশীদের মেহেরে মহর জার খুলেচে শেই তা জানে এবার বোলচে নালন ঘর ছেড়ে ধোন খুজিষ কেনে বোনে২ [বনে] ঃ।।

৮৯/৯১ নং

আছে আদ মাক্কা এই মানুষ দেহে ঃ। দেখনা রে মন ভেয়ে ঃ।। দেস দেসান্তার দৌড়ে এবার মরিশ্ কেন হাপীএ ঃ।। তিল প্রমান এক জায়গার ভিতর বানিএচে শাই উদ্দ্য [উর্ধ্ব] শহর এই মানুষ মক্কাতে কতো লাক২ হাজি করচে রে হজ শেই জাগাএ জোমিয়ে ঃ।। প্রথম খাদ ঃ।। কোরে অতি আজব ভাক্কা গোটেছে সাই মানুষ মাক্কা কুদরতি নুর দিয়ে, ও তার ৪ দ্বারে ৪ নুরি এমাম মর্দ্দে [মধ্যে] সাই বসিয়ে ঃ।। ১০ দুয়ারি মানুষ মাক্কা, গুরু পদে ডুবে দেক্ষা [দেখ্‌গা] ধার্ক্কা সামালিয়ে, নালন বলে গোপ্ত আছে আছে আদু এমাম শে মেয়ে ঃ।।

৯০/৯২ নং

একি আছমানি চোর ভাবের সহর নুট্‌ছে সঁদায় ঃ।। ও তার আশাজায়া কেমন রাহা কে দেখেছে বল আমায় ঃ।। সহর বেড়া অঘাৎ [অগাধ] দোরে ঃ তার মাজখানে ভাবের মন্দীরে শেই নিগুম জাগায় [জায়গায়], ও তার পবনদ্বারে চৌকি ফেরে রে এমন ঘরে চোর আশে জায় ঃ।। এক সহরে ২৪ জেলা, দাগেচে রে কামান দুবেলা শে বলিয়ে জয়২ ঃ। ওরে ধর্ন [ধন্য] চোরে এ ঘাটমারে রাখে না সে কাহারো ভয় ঃ।। মনোবুদ্দের [মনবুদ্ধির] অগোরচোরা বোল্যে কি পেতেবি [প্রত্যয় করিবি] তোরা আইজ আমার কথায় সাই নালন বলে ভাবক হৈলে ধাক্কা নাগে [লাগে] তাহারি গায় ঃ।।

৯১/৯৩ নং

আপ্নারে আপনি রে মন না জানো ঠেকেনা ঃ।। পরের অন্তরে কৈট শুমদ্র [সমুদ্র] কি শে জাবে জানা ঃ। পরর্থে পরম ঈশ্বর আর্ত্তা [আত্মা] রূপে করে বেহার দিদল বারামখানা ঃ।। সতদল সহস্র দলে আন্দ করূনা জেনো না ঃ।। কেশোরো [কেশের] আড়েতে যৈছে পর্ব্বতো লুকাইএ আছে দরশোন হলো না, এবার হেট নওন জার নিকটে তার সিদ্দি হয় ভাবনা ঃ। ছিরাজ শাই বলে রে নালন গুরু পদে ডুবে আপন আর্ত্তা ভেদ জেনলে না ঃ আর্ত্তা আর পরম আর্ত্তা ভিন্য ভেদ জেনো না ঃ।।

৯২/৯৪ নং

মন আমার কি ছার গৌরব কোরছো ভবে ঃ। দেখনা রে সব হাওয়ার খেলা বন্দ [বন্ধ] হৈতে দের [দেরি] কী হবে ঃ।। থেকতে হাওা [হাওআ (য়া)] হাওয়াখানা, মওলা বলে ডাক রশোনা মহাকাল বশেছে রানায়, কখন জানি কুঘাবে [কু গাবে, কু ঘটাবে] ঃ। বন্দ হলে এই হাওাটী, মাটির দেহো হবে মাটী, দেখে শুনে হও না খাটী কে তোরে কতই বুজাবে ঃ।। ভবে আশার অগ্রে (রে মন) তখন বলেছিলে কোরবো ভজন নালন বলে শে কথা মন ভুলেছ এই ভবার্নবে (ভবের লোভে ভবার্ণবে) ঃ।।

৯৩/৯৫ নং

পীরিতি অমুল্ল নিধি ঃ। বিসয় বিসাষ [বিশ্বাস] মতো কারূ হয় জদি এক পীরিতি সক্তী [শক্তি] পদে, মজেছিল চণ্ডীচাঁদে, জেনলে শে ভাব মনকে বেন্দে ঘুচে জেতো পথের বিবাদী ঃ। এক পীরিত ভবানির সনে কোরেছিল পঞ্চননে [পঞ্চাননে] নাম রহিল ত্রীভুবনে কিঞ্চীৎ ধ্যানে মহাদেব সিদ্দী ঃ। এক পীরিতে রাধার অঙ্গ পরসিয়ে সাম [শ্যাম] গৌরাঙ্গ করো নালন এন্নী সঙ্গ কহে ছিরাজ সাই নিরোবধি ঃ।।

৯৪/৯৬ নং

কে গো জেনবে তারে সামার্নে [সামান্যে] ঃ। আজব মিন রূপে সাই আমার খেলছে নিরে ঃ। জগোত জোড়া মিন অবোতার, কারূন্য বারিরো মাঝার মনে বুজে [বুঝে] কালাকাল বান্দিলে বান্দাল মন রে অনাআশে সে মিন ধরতে পারে ঃ। আজব নিলে মানুষ গঙ্গায় আলেরো ওপার জলোময়, জে দিন সুখাবে শে জল, হবে সব বিফল ও শে মিন পলাবে অন্নী অন্য [শূন্য] ভরে ঃ।। মানুষগঙ্গায় গোভির অথাই থাই দিলে তায় প্রম রসিক ভাই ভেবে ছিরাজ শাইর চরন কইচে নালন আমি চুবনি খেলাম নেবে শেই কেনারে।।

৯৫ নং

মরো জেন্দেগীর আগে দেখে সমন জাউক ফিরে ঃ। আই [আয়ু] থাকিতে আগে মরা সাধক জে তার এন্নী ধারা, প্রমমদে [প্রেমামোদে] মাতোয়ারা শে কি বিধির ভয় রাখে ঃ।। মরে জদি ভেশে ওটে, শে তো বেড়ায় ঘাটে[২] মরে অন্নী ডোফ [ডুব] শ্রীপাটে বিধির অধিকার ত্যাগে ঃ।। হাওাতের [হায়াতের] আগে জে মরে বাচে শে মওতের জেরে [জোরে] দেখরে মন হিসাব কৈরে ফকির নালন (নালন) কয় ডাকে ঃ।২।

৯৬/৯৮ নং

কোন পথে জাবি মন ঠিক হলো না ঃ। করো নাপানাপী [লাফালাফি] সার কাজে সর্নকার [শূণ্যকার] টাকসালে পড়িলে জাবে জানা ঃ।। জেতে চাও মার্ক্কা, জদি পায়ও ধাক্কা ফিরে দাড়াও তৎখোনা, বলো এতে কায্য নাই কাশীধামে জাই করে সহজ বিবেচনা ঃ।। ক্ষেনেক উদাসী ক্ষেনেক গ্রহবাসী [গৃহবাসী], ক্ষেনেক মন হতোভাগা, বাজায় তিলকে [তিলেকে] তিন তাল বাজায় হামে হাল মানের ঘরে বাদায় [বাঁধায়] তানা না না ঃ। একে নিরিক জার জেতে ভবেপার সে তোরি টার খাবে না হারে পাচপিরে চলন, চলিএ নালন ৮৪ করে আনাগোনা ঃ।।

৯৭/৯৯ নং

কে বোজে মন মওলার আলেক বাজি ঃ। কোরছে রে কোরানের মানি [মানে] জা আসে জার মনের বুজি ঃ।। সবে একোই কোরান পড়াসোনা কেওও মৌলাবি কেউ মওলানা, দাহিরে হয় কত জোনা সে মানে না সরার কাজি ঃ।। রোজ ক্যামত বলে সবায় কেউ বলে না তারিখ নিন্যয় [নির্ণয়] হিসাব হবে কি হচ্চে রে সদায়, কোন কথায় মন রাখি রাজি ঃ।। মলে [মরলে] জান ইল্লিন সিজ্জীন রয় জতো দিন রোজ হিসাব না হয় কেউ বলে জান ফিরে জর্মায় [জন্মায়] তবে ইল্লিন সিজ্জীন কোথা আজি ঃ।। আরাব বিধান সনিতে পাই এক গোরো মানসের [মানুষের] মৌওৎ নাই সে অমরি কোন ভজন রে ভাই বলচে নালন কারে পুছি ঃ।।

৯৮ নং

মানুষ ঝলক দিবে নেহারে রে ও মন কপাট মারো কামের ঘরে ঃ। হাওয়া ধরো অগ্নী স্থির করো জাতে মরিয়ে বাচিতে পারো মন রে মরনের আগে মরো, সমন যাউক ফিরে জাকরে ও মন দেখে সমন যাউক ফিরে ঃ।। বারে বারে করি রে মানা ও মন নিলে রাশে [লীলারস/রাস] রাশ কোর না, রেকো তেজের ঘর তেজিআনা উর্দ্দু [ঊর্ধ্ব] চাঁদ ধরে সাধরে মন সাধ উর্দ্দুচাঁদ ধরে ঃ।। জান না রে পারাহিন দর্পন তাতে কেমনে হয় রূপ দরোশোন অতি বিনয় করে কয় নালন থেকো হুসারে [হুসিয়ারে] ॥

৯৯ নং

সাধুর চরণ ধুলি লেগবে গায় ঃ। হ্যয় আছি আশাসিন্দু [আশাসিন্ধু] কুলে সদায় ঃ। চাতক জমন মেঘের জল বিনে, আছে অহনিশী মেঘ ধ্যায়ানে তেষ্টায় ম্রতাগতি [মৃতগতি] জিবনে সেই দশা আমায় ঃ। ভজোন সাধন আমার নাই কিবল মহত নামের দেই গো দোহাই, নামের মহিমা জানাও গো সাই পাপীর হও সদয় ঃ। সনেছি সাধুরো কোরূনা সাধু পরশীলে হয় গো শোনা বুজি আমার ভার্গে [ভাগ্যে] হলো না নালন কেন্দে কয় ঃ।।

১০০ নং

আছে কোন মানশের বাষ কোন দলে ঃ।। রে ও মন মানুষ সভয় [সবাই] বলে ঃ।। অজুনি সহজ সমস্কার, কারে কি সন্দে [সম্বন্ধে ?] সেদবো [সাধিব] এবার, বড় অগম্ভ মানুষ নিলে শে মানুষ নিলে ঃ।। শোমষকার সাধন ঃ না জানি কোথা পাই সহজ কোথাই অজুনি, বেড়াই গোলে হরিবোল বলে ঃ। তিন মানুশের করন বিচকক্ষন [বিচক্ষণ] ও তাই জেনলে, হবে এক নিরাপন অধিন নালন পলো গোলমালে, বিসম গোলমালে ঃ।।

১০১ নং

খেএচি বেজেতে কুচু [কচু] না বুজে ঃ। এখন তোতোল [তেঁতুল] পাই (কোথা) খুজে ঃ।। কচু এমন মান গোশাই তারে চিন্তে নারি ভাই আমি খেএ হলাম পাগলপারা তবুড়িঘরা চুমকেচে [চুলকেছে/চমকেছে] ঃ। ভবে নিম্ব ভিক্ষ [বৃক্ষ], তাতে দিলে চিনির সার, আবার কখন তো হএ না মিটে তম্নী কচুর বংশো জে ঃ।। জতো ভড়ুয়া বাঙ্গালে কচু (কে) মান গোশাই বলে, আবার নালন ভেড়ে দেখলে পড়ে ঐ কথায় কি মন মজে ঃ।।

১০২ নং

জাল ঘরে চোটীলে সে হয় জাইত নাশা ঃ। ও তার কিশেরো আশা ঃ। ও শে পোড়াচাড়াকে চাইর জুগ মিসায় না খাকে, চাইর জুগ মিসায় না খাকে ঃ গুরু ত্যাগী মন বিবাগী তারতো ঘটে শেই দশা ঃ।। হাড়ি কেউ চটে কেউ রয়, মনে দেখে ধোকায়ে মনে দেখে ধোকা হয় ঃ বুজি [বুঝি] পুর্ব্বে ফেরো ফেরে গড় শেয়ে তলা ফাশা ঃ।। কেউ কুমারকে দোশায় রে কেউ মাটী খারাফ কয় রে কেউ মাটী খারাফ কয় অধিন নালন বলে পাগ্লা ছলে বোজা কটীন সাদভাশা [সাধুভাষা] ঃ।।

১০৩ নং

আই [আয়ু] হারালি আমাবতি না মেনে ঃ। ও তোর হয় না সবুর একদিনে ঃ। হোলে আমাবতির বার মাটী রশে সরোবর মাটী রশে সরোবর সাধ গুরু বষ্ট [বৈষ্ণব] তিনে উদয় শে রশের সনে ঃ।। ও তুই খোত্না চাশা ভাই ও তোর জ্ঞান কিছু নাই রে তোর জ্ঞান কিছু নাই, এবার আমাবশ্যে প্রতিবাদে [প্রতিপদে] হাল বোয়ে কাল হও কেনে ঃ।। জে জোন রসিক চাশা হয় ওশে জোগ বুজে হাল বয় রে শে জোগ বুজে হাল বয় এবার নালন ফকির পায় না ফিকির হাপুর হুপুর ভুই বোনে ঃ।।

১০৪ নং

রসিক নাম ধরিএ মনা বেড়াও জগত মেতিয়ে [মাতিয়ে] ঃ। তুমি ভাব জান না ভাবক রোঙ্গা ভাঙ্গলী রে মাটি গুতিয়ে ঃ।। রসিকপাড়ায় গেলে তোমায় ঘুকশী বলে দেয় না থিয়ে ঃ। পেএছো জল ছেচো এক চাকরি, পরিএ ধড়ি গেড়ে-গুড়ি ছেচলে শুরু আখিরি, রসিক জারা চত্তুর তারা আছে হাওয়ার ফান্দ পেতিয়ে ঃ।। নাদাএ গুড় নাই রে মনা খাবরি, কেনে ভুভু কোরে বেড়াও উড়ে হলো না তোর সাবরি, ওরে গেড়ে পলি চুবনি খালি তবু উট্‌সি কুতকুতিয়ে ঃ। পিচুশে সবার রে তোর জায় না ওরে কথায় কিবল প্রেমের পাগল মদনবশে মগ্না সদা নালন বলে সভাব গুনে হলিরে তুই বেজেতিএ ঃ।।

১০৫ নং

সোনার মান গেলোরে ভাই বেঙ্গা এক পীতলের কাছে ঃ। সাল পটুকের কপালে ফের কোষ্টার বানাত দেষ জুড়েছে ঃ। বাজিল কোলির আরতি, পেচ [প্যাচ] পলো ভাই মানির প্রতি, মওরের [ময়ুরের] নিত্য [নৃত্য] দেখি পেচায় ফেকোম [পেখম] ধরতে বশে ঃ। সাল গ্রামকে কোরিএ নড়া ভুতের ঘরে ঘণ্টা নাড়া কোলির তো এন্নী দাড়া স্থুল কাজে সব ভুল পড়েছে সবায় কেনে পীতল দানা, জহরির তো মুল হলো না, নালন কয় গেলো জানা চটকে জগোৎ মেতেছে ঃ।

১০৬ নং

আমার ঘরের চাবি পরেরি হাতে ঃ। কেমনে খুলিএ শে ধোন দেখবো চক্ষেতে ঃ আপন ঘরে বোজাই শোনা, পরে করে লেনা দেনা, আমি হলেম জর্ম [জন্ম] কানা না পাই দেখিতে ঃ। রাজি হলে দরোয়ানি, দার ছাড়িএ দিবেন তিনি, তারে বা কৈ চিনি শুনি বেড়াই কুপথে ঃ। এই মানুশে আছে রে মন জারে বলে মানুষ রতন নালন বলে পেএ শে ধোন পেল্লেম [পারলাম] না চিস্তে ঃ।।

১০৭ নং

ওশে প্রেম করা কি কথারি কথা ঃ। প্রেমে হরির হলো গলাএ কেঁতা ঃ। একদিন রাধে মান করিএ ছিলেন ধনি স্যাম তেজিএ ঃ। মানের দায় সাম জোগী হোএ মড়ালে [মুড়ালে] মাতা ঃ।। আরাক প্রেমে মজে সশানে মশানে খেলা, গলে সক্তি হাড়ের মালা পাগোল অবস্থা ঃ রূপ শোনাতোন [সনাতন] ওজির [উজীর] ছিল, প্রেমে মজে ফকির হলো, নালন বলে এম্‌নি জেনো প্রেমের ক্ষেমতা ঃ।।

১০৮ নং

আগে কে জানে গো এমন ঃ হবে ঃ।। গৌর প্রেম কোরে আমার কুল মান জাবেঃ।। ছিলাম কুলের কুলোবালা, প্রেম ফান্দে বেদলো গলা, টেনলে তো আর না জায় খোলা বল্যে [বল্লে] কে বোজে ঃ।। জা হবার তাই হলো আমার এখন আমি এই বরো চাই, জাতে মজলেম তাই জনো [যেন] পাই, নালন বলে কুলো [কুল] বালাই গেলো জাউক ভবে ঃ।।

১০৯ নং

মুরশীদ রঙ্গমহলে সদায় ঝলক দেয় ঃ।। জার খুলেছে মনের আন্দার [আঁধার] শেই দেখিতে পায় ঃ।। সতোদল অন্তষ পুরি, আলিপুরে তার কাছারি দেখিলে শে কারিগীরি, হবে মহাশয় ঃ।। সজল উদয় সেই দেশেতে অনান্ত ফল ফলে তাতে, প্রম পাতিজাল পেতলে [পাতিলে] তাতে অধরা ধরা জায় ঃ।। রত্ন জে পায় আপন ঘরে, সে কি খোজে বাহিরে না বুজিএ নালন ভেড়ে দেষ্ [দেশ] বিদেশে ধায় ঃ।।

১১০ নং

অমরতো বারি শে বারি, অনুরাগ নলে [নৈলে] কী জাবে ধরা ঃ।। জে বারি পরশো হলে মন রে হবে ভবের করন সারা ঃ।। বারি নামে বার এলাহি, নাই রে তার তুলনা নাহি, সহস্রদল পদ্দে, সেহি অন্নী মৃেনাল গতি বহে ধারা ঃ।। ছায়াহিন এক মহামনি, বোলবো কি রে তার কোরোনি, প্রিকিতি হইএ তিনি হোলেন বারি শেধে অমর গোরা ঃ।। আছমানে বোরিসোন [বর্ষণ] হৈলে দাড়ায় জল মৃিতিকা [মৃত্তিকা] স্থলে নালন ফকির ভেবে বলে ওশে মাটী চিনবে ভাবক জারা ঃ।।

১১১ নং

কি সোবা [শোভা] দিদলের পরে ঃ।। রোশোমনি মানিকে রূপ ঝলক মারে ঃ।। আবিম্বুস্তমেতে সেনিত্য গোলক বিরাজ করে তাহে পূর্ন বের্ম্মো [ব্রহ্ম] লোক হোলে দিদল নিন্যয় [নির্ণয়], সব জানা জায় প্রসন্ধি থাকে না সাধন দারে [দ্বারে] ঃ।। সতোদল কিবা সহস্রদল, রশোরতি রূপে করে চলাচল, ওগো দিদলে স্থিতি বির্দ্দুৎ আক্রী [আকৃতি] ১৬ দলে বারাম জোগান্তরে ঃ।। সড়োদলে [ষড়দলে] সে তো সড়োতত্ত হয় দশোম দলে ম্রেনাল [মৃণাল] গতি গঙ্গা বয়, ওগো তিরোধারা তার ত্রীগুন বিচার নালন বলে গুরু অনুসারে ঃ।।

১১২ নং

কি শোভা দিদলোময় ঃ।। মন মহিনি রূপ ঝলক দেয় ঃ।। কিবারে রূপের বাখানি, লক্য [লক্ষ]২ চন্দ্র জিনি, ফনি মনি সওদামিনি শে রূপের তুলুনা নয় ঃ।। সহজো শুরশের গোরা, রশোকুপে আছে ঘেরা কিরনে চমকে পারা দিদলে ব্যাপীত হয় ঃ। সেরূপ জাগে জার নওনে, কি কাজো তার বেদ সাধনে, দিনের অধিন নালন ভনে, রসিক হলে জানা জায় ঃ।।

১১৩ নং

জদি ফানার ফিকির জানা যায় ঃ।। খোদ রূপ ফানা কৈরে খোদে খোদা হয় ঃ।। খোদা রূপ খোদ করে ধারন, অকৈতপ [অকৈতব] শে করন কারন, আই থাকিতে হৈলে মরন, ফানার জোজ্ঞ [যোগ্য] করন তাই রি কয় ঃ।। একে২ জেনে বেনা কোরতে হয় চাইর রূপো ফানা, একরূপ কোরে ভাবনা এড়াইবে শেহি সমন দায় ঃ।। না জানিলে ফানার কোরোনি করন তার ঐ মির্থা [মিথ্যা] জানি, ছিরাজ সাই কয় অর্থবানি, দেখ নালন মজে মরশীদের [মুর্শিদের] পায় ঃ।।

১১৪ নং

১৮ মোকামে একটী রূপের বাতি জলচে সদায় ঃ।। নাহি তেল তার নাহি তুলা আজগোবি হোএচে উদয় ঃ।। মোকামেরো মধ্যে মোকাম সর্নসিখর [স্বর্ণশিখর] বলি জার নাম, বাতির লন্ঠন সেথায় সদায় ত্রিভুবনে কিরোন ধায় ঃ।। দিবনিশী (৮) আটপহরে একরূপে ৪ রূপো ধরে, বর্ত্ত থেকতে দেখলি নারে ঘুরে মুলি [মরলি] বেদের বিদয় [বিধানে] ঃ।। জে জানে শে বাতির খবর, ছুটেছে তার নওনের ঘোর ছিরাজ সাই কয় নালন রে তোর, দিষ্ট হয় না মনের দিধায় [দ্বিধায়] ঃ।।

১১৫ নং

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা ঃ।। আইজ কেমন কৈরে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা ঃ।। লক্য্ [লক্ষ] চাঁদে কোরেচে শোবা ঃ তার মাজে অধার চাঁদেরো আভা ও শে চাঁদের বাজার দেখে, চাঁদ ঘুরানি লেগে, দেকিষ্ পাছে হোবি জ্ঞানহারা ঃ।। চাঁদের গাছে চাঁদের ফল ধরেছে তায়, থেকে্ ঝলক দেখা যায় একবার দৃষ্ট কৈরে দেখি ঠিক থাকে না আখি, রূপেরো কিরনে চমকে পারা ঃ।।

১১৬ নং

আএ গো জাই্ নবির দিনে ঃ।। দিনের ডাঙ্কা বাজে নগর বাশী গো দিনের ডাঙ্কা বাজে সদায় মাককা মদিনে ঃ।। তরিক দিচ্ছে নবি জাহের বাতুনে, জথাজজ্ঞ [যথাযোগ্য] নাএকো [নায়ক] জেনে ওশে বিনা কোড়ির ধোনো, সেদে দেয় এখন না লইলে আখের পচ্তাবি [পস্তাবি] মনে ঃ।। অমুল্য দোকান খুলেছে নবি তোরা জে ধোন চাবি সে ধনো পাবি, আছে রোজা আর নামাজ বেক্ত [ব্যক্ত] এহি কাজ গোপ্ত পথ মেনে ভক্তী সোনধানে [সন্ধানে] ঃ।। নবির সঙ্গে এয়ার [ইয়ার] ছিল ৪ জোন, নুর নবি ৪ কে দিলে ৪ জাজোন, ওশে নবি বিনে পথে গোল হলো ৪ মতে নালন বলে জেনো গোলে পড়িষ্নে ঃ।।

১১৭ নং

কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই ঃ।। রাজ রাজ্য ছেড়ে কেন বেহাল দেখতে পাই ঃ।। ভেবে তোরো এ ভাব বুজিতে নারি আইজ কিশের কাঙ্গাল আমার অটল বেহারি, ছিল অগর চর্ন্নন [অগুরু চন্দন] ঃ, জে অঙ্গে ভুসানো [ভুষণ], শে অঙ্গ আইজ কেনে লঞ্চাৎ [লোটায়] ধুলায় ঃ।। ব্রর্ম্মাণ্ড ভাবক জারে ভাবিএ, আইজ শে ভাবোকো [ভাবুক] কাহার ভাব লয়ে, এ এ একি অশম্ভাব ভাবনা শোম্ভাবে কোন জোনা মরি মরি ভাবের বলিহারি জাই ঃ।। অনুভাবে ভেবে কতই্ করি সার, সামচাঁদের উত্তম কি চাঁদ আছে আর করে চাঁদে হরন শেহি বা কেমন ভক্তী বিহিন নালন বশে ভাবে তাই ঃ।।

১১৮ নং

কএ দোমেতে বাজে ঘোড়ি করো রে ঠেকেনা ঃ।। কএ দোমে আইজ দিনরোজোনি, ফিরানা ঘুরানা ঃ।। দেহের খবর, জে জোন করে, আলেক বাজি দেখতে পারে, আলেক দোম হাওয়ায় চলে রে, কি আজব কারখানা ঃ।। ছেমওলাতে ঘড়ি ঘোরে, সব্দ হয় নিসব্দের ঘরে কলকাটী দুকন্দ দারে দোমে আশন বেনা ঃ।। দেহের সঙ্গে কর সংমিলন, অজান খবর জানবি রে মন ঃ।। বিনয় কৈরে বলছে নালন জনো [যেন] ঠিকের ঘর ভুলো না ঃ।।

১১৯/১২০ নং

অজান খবর না জানিলে কিশেরো ফোকিরি ঃ।। কিশেরো ফোকিরি ঃ। জে নুরে নুর নবি আমার তাহে আরোষ [আরস] বারি ঃ।। বোলবো কি শেই নুরের ধারা নুরেতে নুর আছে ঘেরা, ধরতে গেলে না জায় ধরা, জৈছেরে বিজরি ঃ।। মুলধারের মুল শেহি নুর, নুরের ভেদ অকুল শুমুদ্র [সমুদ্র] ঃ জার হোএছে প্রেমের অঙ্কুর ঐ নুর ঝলক দিচ্ছে তারি ঃ।। ছিরাজ শাই বলে রে নালন কোরগে আপন দেহের বলন নুরে নরে কোরে মিলন ঐ রূপ থেকো রে নেহারি ঃ।।

১২০/১২১ নং

মিনরূপে সাই খেলে ঃ।। ডুবে দেখ না রে প্রমনদির জলে ঃ।। প্রম ডুবারু না হইলে মোন, শে মিন বেদ না [বাধে না] রে জালে ঃ।। জেলে জেতেল ঃ বোরশেল [ন] আদি ভ্রিমিয়ে [ভ্রমিয়ে] ৪ যুগ অবধি কেউ তারে না পেলে, এবার খাড় কৈরে মিন রয় চিরোদিন প্রম সন্দীস্থলে ঃ।। প্রমনদির তিরো সন্দি, খুলতে পারে সেহি বন্দি প্রম ডুবারু হইলে, ভবে শে মিন এস্পে [আসবে] হাতে আপনার আপ্নী চলে ঃ।। স্বরূপ সক্তী প্রম সিন্দু দিন. অবতার দিনবন্ধু ছিরাজ সাই জায় বলে ওই শোন রে নালন মলি এখন গুরুতত্ত ভুলে ঃ।।

১২১ নং

মানুস লুকাইল কোন সহরে ঃ।। এবার খুজে মানুষ পাইনে তারে ঃ।। ব্রজো ছেড়ে নদেয় এলো তার পূর্ব্বে ওরে খবর ছিল, এবে নদে ছেড়ে কোতায় গেলো, জে জানো শে বল মোরে ঃ।। সরূপে শেই রূপো দেখা জমন চাঁদের আভা এমনি মতো থেকে কোতা প্রভু ক্ষেনেক্২ বারাম দেয় রে ঃ।। কেউ বলে তার নিজো ভজন লয়ে নিজো দেশে গমন মনে ভাবে নালন এবার শে নিজো দেষ বলি কারে ঃ।।

১২২ নং

কেনে খুজিস মনের মানুষ বোনে সদায় ঃ। এবার নিজো আর্ত্তা [আত্মা] জে রূপ আছে ঃ দেখো সেই রূপেতে দিন দয়াময় ঃ।। কারে বলি জিবের আর্ত্তা কারে বলি সয়ং কর্ত্তা আচ্চা [আচ্ছা] দেখি যুবোহাট্টা চক্ষে ভিলকী লেগে মামলা হারায় ঃ।। বোলবো কি তার আজব খেলা আপ্নী গুরু আপ্নী চেলা, পড়ে ভুৎ [ভূত] এ ভুবনের পণ্ডীৎ জে জোান আপ্তুতত্তের প্রবর্ত্ত নয় ঃ।। পরম আর্ত্তা রূপ ধরে জিবার্ত্তেকে [জীবাত্মাকে] হরন করে লোকে বলে জায়রে নিদ্রে সে না অভেদ ব্রর্ম্ম ভেবে নালন কয় ঃ।।

১২৩ নং

আমাবস্যে দিনে চন্দ্র থাকেন জেএ কোন সহরে ঃ।। প্রতিবতে [প্রতিপদে] হএ শে উদায় দিষ্ট হয় না কেনে তারে ঃ।। মাশে২ চাঁদের উদয়, আমাবশ্যে মাশন্তে হয় শুর্জ্জের [সূর্যের] আমাবস্যে নিন্নয় জেন্তে হবে নেহাজ কোরে ঃ।। শোলকলা হইলে সশী তবে তো পুন্যমাসী [পৌর্ণমাসী],১৫ রোয় [পনেরোয়] পন্নীমা কিশী পণ্ডীতেরা কয় সংসারে ঃ।। যে জেন্তে পারে দেহচন্দ্র সজ্ঞ [স্বর্গ] চন্দ্রের পায় গো খবর ছিরাজ সাই কয় নালন রে তোর মুল হারালী কোলের ঘরে ঃ।।

১২৪ নং

কি কোটীন শে ভারতি না জানি ঃ।। পরাইলে কোন প্রাণে কোপীনি ঃ।। হেনো ছেলে ফকির হয় জার সত্ ধর্ন [ধন্য] শে মার কেমনে রএছে ঘর ছেড়ে হেন শোনার গৌরমনি ঃ।। পরের ছেলে দেখে এ হাল, শোগানলে [শোকানলে] আমরা বেহাল না জানি এ শোগের কি হাল জোলচে গো আইজ উহার মা জোননি ঃ।। তারে জে দিএছে এ কোপীন ডোর তারে বিধি দেখাইতো মর [মোরে] ঘুচাইত মনের ফাফোর নালন বলে বলি কিছু বানি ঃ।।

১২৫ নং

জেন গে মানুশের করন কি শে হয় ঃ।। ভুলো না মন বৈদিক ভোলে জেএ [যেয়ে] রাগের ঘরে রয় ঃ। ভাটীর শোত [স্রোত] জার ফেরে ওজোন [উজান] তাইতে কি হয় মানশের করন ঃ পরশোন [স্পর্শন] না হইলে মন দর্শনে কি হয় ঃ। টলাটল করন জাহার, পরশো গুন কৈ মেলে তাহার গুরু সিস্য জুগ জুগন্তর ফাকে্ রয় ঃ।। লোহা সর্ন পরষ পরশে মানশের করন তমীনি [তেন্নি] শে নালন বলে হলে দিশে জটর [জঠর] জালা জায় ঃ।।

১২৬ নং

সুমজে করো ফোকিরি মন রে ঃ।। এবার গেলে আর হবে না পোড়বি ঘোরতরে ঃ। অগ্নী জৈছে ভস্মে ঢাকা শুধা [সুধা] তন্নী গরল মাখা মৈথন ডণ্ডে [মৈথুনদণ্ডে] জাবে দেখা বিভিন্য [বিভিন্ন] কোরে ঃ। বিসামৃতো [বিসামৃতে] আছে মিলন জেন্তে হয় তার কিরূপ সাধন, দেখো জনো গরল ভক্ষণ কোর না হারে ঃ। কবার কল্যে [কল্লে] আশা জায়া [যাওয়া] নিরাপন কী রেকলে [রাখলে] তাহা নালন বলে কে দেয় ক্ষ্যায়া ভবো মাঝারে ঃ।।

১২৭ নং

মলে গুরু প্রাপ্ত হবে শে তো কথার কথা ঃ।। জিবন থাকিতে জারে না দেখিলাম হেতা ঃ।। সেবা মুল করন তারি, না পাইএ কার শেবা করি, আন্দাজী হাতড়াইএ ফিরি, কতায় [কথায়] নাতাপাতা ঃ।। সাধন জোরে এ ভবে জার, শে রূপ চক্ষে হবে নেহার, তাইরি বটে শেরূপ আকার মেলে জথাতথা ঃ।। ভজে পাই কি পেএ ভজী, কি ভজোনে হএ শে রাজি ছিরাজ সাই কয় কি আন্দাজী নালন মড়ায় [মুড়ায়] মাতা [মাথা] ঃ।।

১২৮ নং

আর কি হবে এমন জনম বোষবো সাধুর মেলে ঃ।। হেলায় হেলায় দিন বোয়ে জায় ঘিরে এলো কালে ঃ। কত্ লক্ষ যুনি [যোনি] ভ্রেমন [ভ্রম] কোরেছো তুমি মানব কুলে মন রে তুমি এশে কি করিলে ঃ।। মানব কুলে মন রে তুমি এশে কি করিলে ঃ। মানব কুলেতে আশায় কত দেব দেবতা বাঞ্চীত [বাঞ্ছিত] হয়, দিএছো কোন ফলে ঃ।। ভুলোনা রে মন রশোনা শুমজে করো বেচাকেনা নালন কয় কুল পাবা না এবার ঠকে গেলে ঃ।।

১২৯ নং

হুজুরে কার হবে নিকাষ দেনা, পঞ্চাজনা [পঞ্চাজন] আছে ধোরে বেরাদর তার ১৬ জোনা॥ খিতি [ক্ষিতি] জল বাই [বায়ু] হুতাশোন, জে বোস্তু জার শেই খানে মেসাইবে [মিশ্‌বে] তা ঃ আকাশে মিস্পে আকাশ জানা জায়ে এই পঞ্চবেনা ঃ।। মনসি মৌসি [মুন্সী] মৌলবির কাছে, জনম ভৌর [ভোর] শুদাই [শুধাই] এশে ঘোর গেল না, পরে ল্যয় [নেয়] পরের খবোর নিজের খবর নিজে হয়ে না ঃ।। আত্তা কত্তা [আত্মকর্তা] কারে বলি কোন মোকামে তার কমনে গলি আনা জাওনা শেই মহলে নালন কোনজন তাও নালনের ঠিক হল না।।

১৩০ নং

জে জোন পদ্দহিনো [পদ্মহেম] সরোবরে জায় ঃ। অটালো [অটল] অমর্ল [অমূল্য] নিধি শেই অনাশে পায় ঃ।। অপোরূপ শেই নদির পানি জনমে জাতে মকত্তৌ [মুক্তো] মোনি বোলবো কি তাহার গুন বাখানি পরশে পরোস হয়ে ঃ।। বিনে হাওয়ায় মোজা খেলে ত্রিখণ্ড হয়ে ত্রিনো পলে তাহে ডুবি রত্ন তোলে রসিক মহাশয় ঃ।। পলক ভরে পড়ে চরা, পলকে তরফা (তরকা) ধারা সে ঘাট বেন্দে [বেন্ধো] মতস্য [মৎস্য] ধরা সামান্য কাজ নয়ে [নহে] ঃ।। গুরূজি কাণ্ডারি জারে অথাই থাই দিতে পারে নালন বলে সাদন জোরে সমন এরাএ [এড়ায়] ঃ।।

১৩১ নং

দোখো রে দিন রজোনি কোথা হৈতে হয়ে ঃ। কোন পাকে দিন আশে ঘুরে কোন পাকে রজোনি জায় ঃ।। রাত্র দিনের খবর নারে [নাইরে] জার, কিশের একটা উপোসোনা তার, নাম গোওালা [গোয়ালা] কাজি ভক্ষোন ফকিরি তার তমনি প্রায় [প্রায়] ঃ।। কয়ে দোমে দিন চালাচ্চে রাবি কয়ে দোমে রোজনি আখির আপন ঘরের নিকাষ করে জে জানে শে মহাশয় ঃ।। বাইরে খুজে কি জাবে জানা কারিকরের কিবা গুনপানা অধিন নালন বলে তিনটী তারে অনান্ত রূপ কল খাটায় ঃ।।

১৩২ নং

মানুস ভজোনে শোনার [সোনার] মানুষ হোবি ঃ।। মানুস ছেড়ে ক্ষেপা রে তুই মুল হারাবি ঃ।। দিদলের মৃনালে সোনার মানুষ উজ্জলে, মানুসগুরুর কৃপা হোলে জেন্তে [জানতে] পাবি ঃ।। এই মানুশে মানুস গাতা [গাঁথা] দেখ্‌না [দেখ্‌না] জমন আলেক লতা, জেনে শুনে মুড়াও মাতা [মাথা] জাতে তোরবি ঃ॥ মানুস ছাড়া মন আমার পোড়বি রে ওই সর্নকার [শূন্যকার] নালন বলে মানুষ আকার ভজনে তোরবি ঃ।।

১৩৩ নং

বলি রে মানুস, এই জগোতে ঃ।। কি বস্তু কেমন আকার পাই নে দেখতে ঃ। জে চারে হয় ধর [ধড়] গটন, আগোমে আছে রচন ঘরের মাঝে কোন জোন হয় চিন্তে ঃ।। এই মানুষ না জায় চেনা কি বস্তু কেমন জোনা নৈরেকার [নৈরাকার] নিরঞ্জনা জাইরে চিন্তে ঃ।। মন মানুষ এই মানুশে ছাড়াছাড়ি কত শে ছিরাজ সাই কয় নালন রে তাই বোজ সতন্তে [সততে] ঃ।।

১৩৪ নং

পারে কে জাবি তোরা আএনা [আয় না] জুটে ঃ। নিতাই চাঁদ হোএছে নেএ [নেয়ে] ঃ। ভবের ঘাটে ঃ। হোরিনামে তোরি তার, রাধা নামে বাদাম সার তুফান বলে ভয় কি রে তার ঃ।। শেই নায় উটে ঃ।। আমার নিতাই বড় দয়াময় পারের কোড়ি নাই শে লয়, এমন দয়াল মিলবে কোতায় এই নলাটে [ললাটে] ঃ।। ভার্জ্জবানো [ভাগ্যবান] জে দিন সেই তোরিতে পার হলো নালন ঘোর তুফানে পলো ভক্তী চোটে ঃ।।

১৩৫ নং

এমন শৌভাজ্ঞ [সৌভাগ্য] আমার কবে হবে ঃ। দয়াল চাঁদ আশীয়া আমায় পার কোরিবে ঃ।। আমার সাধনের বল কিছুই নাই কেমনে শে পারে জাই, কুলে বশে দিচ্ছি, দোহাই অপর ভেবে ঃ।। পতিত পাবন নামটি তার, তাই সনে [শুনে] বল হয় আমার, আবার ভাবি এ পাপী আর শে কি নিবে ঃ।। গুরুপদে ভক্তীহিন হৈএ রৈলাম চিরোদিন, নালন বলে কি করিতে এলাম ভবে ঃ।।

১৩৬ নং

আজব এক রোশীক নাগোর ভেশচে [ভাসছে] রশে ঃ।। হস্তোপদ নাইরে তার বেগে ধায় শে ঃ।। সেই রশেরো সরোবর, তিলে তিলে হয় সাতার উজোন ভেটেল কল কেবা তার ঘুরায় বশে ঃ।। ডুবলে রে দেল দোরিয়ায় সে রষ নিলে জানা জায়, মানব জনম সাপোল [সফল] হয় তার পরোশে [স্পর্শে] ঃ।। তার বামে কুলোকোণ্ডলীনি, জোগমাও৷ [যোগামায়া] জারে বলি, নালন বলে তার সরণ [শরণ] নিলি জায় সদেশে ঃ।।

১৩৭ নং

সে নিলে [লীলা] বুজবি ক্ষেপা কেমন কৈরে ঃ। নিলার জার নাই রে সিমা কোনখানে কোন রূপে ধরে ঃ।। আপ্নী [আপনি] ঘর শে আপ্নী, ঘোরি, আপ্নী করে রশের চুরি ঘরে ঘরে, ও শে আপ্নী করে মাজিষ্টেরি [ম্যাজিস্ট্রেটগিরি], আবার আপ্নী বেড়ায় বেড়ি পোরে ঃ।। গঙ্গায় রৈলে গঙ্গা জল হয় গর্থে [গর্তে] গেলে কুবজলো কয় বেদ বিচারে, তন্নী সাইর বিভিন্ন আকার জানায় পাত্র অনুসারে ঃ।। একে রয় অনান্ত ধারা, তুমি আমী নাম বেওরা ভবের পরে, অধিন নালন বলে কেবা আমি জেনলে ধান্দা জেতো দুরে ঃ।।

১৩৮ নং

গোপাল কে আইজ মাল্লি গো কেমন পরানে ঃ।। শে কি সামন্য [সামান্য] ছেলে তাই ভাবলি মনে ঃ। দেবেরো দুল্লভ গোপাল, শে চেনে না জার ফেরের গোল জে চরন আশায় সশান বাশী হয় দেবোর দেবো শীবো পঞ্চাননে ঃ।। একদিন জার গোধেনু হরে নিলেন ব্রম্মা পাতাল পুরে তাইতে ব্রম্মা দুসি [দোষী] হয় সভায় [সবায়] জেন্তে পায় তুমি জান না এই বৃন্দাবনে ঃ।। জোগীন্দ্র মনিন্দ্র আদি জোগ শেধে [সাধিয়া] না পায় জে নিধি সে হি কৃষ্ণধোন তোমারি নালন নালন বলে একি ঘোর এখানে ঃ।।

১৩৯ নং

এ কি নিলে মানুষ নিলে দেখি গোকুলেঃ। হরি নন্দো ঘোশের বাদা মাতায় [মাথায়] নিলে [নিল] ঃ।। রাখালেরো উচ্ছিষ্ট খায়, একদিন ব্রহ্মা দেখিতে পায়, তাইতে রূষ্ট হোএ [হয়ে] ভারি ঃ না চিনিএ হোরি, ধেনু বশ্র [বৎস] হরে লয় পাতালে ঃ।। কোন প্রেমে শে দিন দয়াময় নারির চরন নিলে মাথায়, এ কি নিলে চমতকার বোজা [বোঝা] হোলো ভার অপার [অপারগ] হোএ অধিন নালন বলে ঃ।।

১৪০ নং

তারে কি য়ার [আর] ভুলতে পারি আমার এই মনে ঃ। দিএছি মনো জে চরনে ঃ।। আমি জে দেখি ফিরি সে দিগে হেরি ঐ রূপের মাধুরি দুওনে [দুনয়নে] ঃ।। তোরা বলিষ কালো, কালো নয় শে চাঁদের আলো, শেই জে কালাচাঁদ নাই আর এমন চাঁদ শে চাঁদেরো তুল্ল তাইরি সনে ঃ।। দেবের দেবো শিবো ভোলা তার গুরু ঐ চিকোন কালা, তোরা বলিষ চিরোকাল তাইরি গো রাখাল কেমন রাখাল জেন গে [জান গে] বেদ পুরানে ঃ।। সাধেকী মজেচে রাধে, সে কালারো প্রমো [প্রেম] ফান্দে, শে ভাব তোরা কি জানবি বল্যে কি মানবি নালন বলে সামের [শ্যামের] গুন রাই জানে ঃ।।

১৪১ নং

দেখ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি ঃ। পরিএ কোপ্নী [কৌপীন] ধড়া কি মজা উড়ালে ফোকিরি ঃ।। বড় দরোদের ভাই বন্ধুজোনা, সাতের সাতি [সাথের সাথী] কেউ হবে না মন তোমারি ওরে একা পতে [পথে] খালি হাতে বিদায় কোরে দিবে তোরি ঃ।। জা করো জা করো রে মন, শেশের কথা রেখো সরন বরাবরি, ও তোর পীছে ফিরছে সমন কোন দিন হাতে দিবে ডুরি ঃ।। বড় আশার ঃ বাসা এ ঘর ঃ কে তা পোড়াবেরে কার ঠিক নাই তারি, দরবেষ ছিরাজ সাই কয় নালন ভেড়ো তুই করিষ রে কার এস্তেজারি ঃ।।

১৪২ নং

ধর্ন [ধন্য] ভাব গোপীর ভাব আ মরি ঃ।। জাতে বান্দা ব্রজের শ্রীহরি ঃ।। ছিল কৃশ্টেরো প্রতিজ্ঞা এমন ঃ জে ভাবে জে করে ভজোন ঃ তাইতে হয় তারি, শে প্রতিজ্ঞা তার না রহিল আর কল্লে গোপীর ভাবে মনঃচুরি ঃ।। ধর্মাধর্ম নাই শে বিচার ঃ কৃষ্ণ সুখের সুক [সুখ] গোপীকার হএ নিরান্তরি ঃ তাইতে দয়াময় গোপীরো সদয় মনের ভ্রেমে [ভ্রমে] তা জেন্তে নারি ঃ।। গোপীভাব সামান্যে বুজে [বুঝে] ঃ হোরি কে না পেলো ভজে শ্রীনারায়নি নালন কয় এমন আছে কত জোন বলতে হয় দিন আখিরি ঃ।।

১৪৩ নং

আছেরে ভাবের গোলা আসমানে তার মহাজোন কোথা ঃ।। কে জানে কারে সুধাই শেই কথা ঃ।। জমিনেতে মেওা [মেওয়া] ফলে, আছমানে বরিসোন [বর্ষণ] হোলে, কোমে [কমে] না কোনকালে তার নেতা ঃ।। রোবি শশী ছিশ্টীর [সৃষ্টির] কারন সেই গোলার নেঘাবান দুজোন জে জথা ঃ।। ধর্ন [ধন্য] ধনি ধর্ন কারবার আমি দেখলাম না তার বাড়িঘর নালন কয় জর্ম [জন্ম] আমার জায় ব্রথা ঃ।।

১৪৪ নং

খুজে ধোন পাই কি মতে পরের হাতে কলকাটী ঃ।। সতেকো তালা মালকুটী ঃ।। সবদের ঘর নিসব্দের কুড়ে সদাই তারা আছে যুড়ে দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাটী ঃ।। আপন ঘরে পরের কারবার আমি দেখলাম না রে তার বাড়িঘর, আমি বেহুষ মুটে কার মট [মোট] খাটী ঃ।। থেকতে রতন ঘরে, এ কি বেহাত আইজ আমারে নালন বলে রে মিছে ঘরবাটী ঃ।।

১৪৫ নং

দেখ না রে ভাবনগরে ভাবের ঘরে ভাবেরো কিত্তী [কীর্তি] ঃ।। জলের ভিতরে রে জলছে বাত্তি ঃ।। ভাবের মানুষ ভাবের খেলা, ভাবে বশে দেখ নিরালা, নিরেখিরেতে ভেলা বায় যুতি ঃ।। জোতিতে রতির উদয় সামান্যে কি তাই জানা জায় তাতে কতো রূপ দেখা জায় লাল মতি ঃ।। জখন নিসব্দে সব্দেরে খাবে, তখন ভাবের খেলা ভেঙ্গে জাবে, নালন কয় দেখপী [দেখবি] কি রে কি গতি ঃ।।

১৪৬ নং

বলি সব আমার, কে আমি তাই চিনিলাম না ঃ। কারে শুধাই কার কাছে পাই উপোশোনা [উপাসনা] ঃ।। আমায় আমি চিনি নে, কি রূপ আছি কোনখানে, পরেরে আইজ কি প্রকারে জাবে চেনা ঃ।। ধলা কি কালা বরন, আমি আছি এই ভুবন ঃ কোন দিনে এ নওনে [নয়নে] দেখিলাম না ঃ।। বারোভাটী বাঙ্গেলায় আমি, রব সদায়, নালন বলে কে জানিলে আমির বেনা ঃ।।

১৪৭ নং

খেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর জাবি কোথায় ঃ।। আপন ঘর না বুজে [বুঝে] বাইরি খুজে পোড়বি ধান্দায় ঃ।। আমি সর্ত্ত [সত্য] না হোলে হয় গুরু সর্ত্ত [সত্য] কোন কালে, আমি জেরূপ দেখনা সেরূপ দিন দয়াময় ঃ।। আর্ত্তা [আত্মা] রূপে শেই অধার সঙ্গি অংশো কলা তার ভেদ না জেনে বোনে, ফিরলে কি হয় আপ্নার আপ্নী না চিনলে, ঘুরবি কত ভুবনে, নালন বলে অন্তিমকালে নাইরে উপায় ঃ।।

১৪৮ নং

সুদ্দু [শুদ্ধ] প্রম না দিলে ভজে কে তারে পায় ঃ। ও শে না মানে আচার না মানে বিচার, প্রেম রশেরো রসিক শে দয়াময় ঃ।। জানো না মন সুখনো [শুকনো] কাষ্টে, কবে তার মালঞ্চ ফোটে, প্রম নাই জার চিতে তন্নী কাষ্ঠ শে নিজ সুক [সুখ] জোর্নে [জন্যে] পরপুত বলিদান দেয় ঃ।। সে প্রেমেরো প্রেমী জারা ফনি জমন মনি হারা, দেখ্‌লে তারো মখ [মুখ] রিদয় [হৃদয়] বাড়ে সুখ ঃ আমার দয়াল চাঁদ তাহারে থাকে সদায় ঃ।। জোগীন্দ্র মনিন্দ্র আদি জোগ সেধে না পায় জে নিধি, প্রেম দিয়ে তারে বেন্দলে [বাঁধল] গোপী রে অধিন নালন বলে সে প্রেম কী ঘটবে আমায় ঃ।।

১৪৯ নং

জে আমায় পাটালে [পাঠালে] এহি ভবনগরে ঃ। মনের আন্দার হরা চাঁদ সেই জে দয়াল চাঁদ আর কতো দিনে দেখপো [দেখবো] তারে ঃ।। কে দিবে রে উপশোনা [উপাসনা] করি রে আইজ কি সাধনা, কাশীতে জাই কি কাননে থাকি আমি কোথা গেলে পাবো শে চাঁদেরে ঃ।। মনো ফুলে পুজিবো কী নাম ব্রহ্ম রশোনায় জোপী, কিশে দয়া তার হবে পাপীর পর অধিন নালন বলে তাইতে পলেম ফেরে ঃ।।

১৫০ নং

পারো নিরহেতু সাধনা কোরিতে ঃ।। জাও রে ছেড়ে জরামৃতো নাই জে দেশেতে ঃ।। নিরহেতু সাধক জারা তাদের সাধন খাটী জোবান খারা, উপোসাখা [উপশাখা] কেটীয়া তারা চলেছে পথে ঃ।। মক্তীপদো [মুক্তিপদ] তেজিএ সদায় ভক্তীপদো রেখো রিদয় সুর্দ্দু [শুদ্ধ] প্রেমের হবে উপায় সাই রাজি জাতে ঃ।। শুমজে [সমঝে] সাধন করো ভবে এবার গেলে আর কী হবে নালন বলে পোড়বি তবে লক্ষ জুনিতে [যোনিতে] ঃ।।

১৫১ নং

কি করি কোন পথে জাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না ঃ।। দোটানাতে পড়ে ভাবি ঐ ভাবনাঃ।। কেউ বলে মাক্কা [মক্কা] জাইএ হজ কোরিলে জাবে গোনা, কেউ বলিছে মানুয ভোজে মানুষ হ না ঃ।। কেউ বলে পোড়লে কালাম পাএ শে আরাম বেহেস্তে খানা [খাবার] ঃ কেউ বলে ভাই ও সুখের ঠাই কাএম রয়না ঃ।। কেউ বলে মুরশীদের ঠাই খুঁজিলে পাই আদ [আধ/আদি] ঠেকেনা [ঠিকানা] নালন ভেড়ে না বুজিএ হয় দোটানা ঃ।।

১৫২ নং

না হৈলে মন সরোলা কি ফল মেলে কোথা ধুড়ে ঃ।। হাতে হাতে বেড়াই মিছে তোবা পড়ে ঃ।। মাক্কা মদিনায় জাবি ধাক্কা খাবি মর্না [মন না] মুড়ে, হাজি নামপাড়ান নর্খ [লক্ষ] তাই দেখি রে ঃ। মনে জে পড়ে কালাম তাইরি শুনাম হুজুর বাড়ে মন খাটী নয়, বেন্দেলে [বাধলে] কি হয় বোনে কুড়ে ঃ।। মন জার হোএচে খাটী, মুখে জদি গলদ পড়ে খোদা তারে নারাজ নয় রে নালন ভেড়ে ঃ।।

১৫৩ নং

জেতে সাদ [সাধ] হয় রে কাশী কর্ম্ম ফাশী বেদলো গলায় ঃ।। আমি আর কত দিন ঘুরবো এমন নাগোর দোলায় ঃ।। হোলো রে একি দশা সর্বনাশা মনের ভোলায় ডুবলো ডিঙ্গা নিশ্চায় বুজি জন্মনালায় ঃ।। বিধাতা দেয় বাজি ঃ কিবা মন পাজি হোএ ফেরে ফেলায়, বাও না বুজে [বুঝে] বাই তোরোনি ক্রমে তলায় ঃ।। কলুর বলদো জমন ঢাকে নওন [নয়ন] পাকে চলায় অধিন নালন পলো তন্নী পাকে হেলায় হেলায় ঃ।।

১৫৪ নং

কুলের বোউ হয়ে মনার [মন আর] কতো দিনে থাকবি ঘরে ঃ।। ঘোমটা ফেলে চল না জাই সাইর বাজারে ঃ।। কুলের ভয় কাজ হারাবি, কুল কি নিবি সঙ্গে কৈরে, ওরে পস্তাবি সসানে জে দিন ফেলবে তোরে ঃ।। দিষ্‌নে আর আচাই কোড়ি নাড়ার নাড়ি হও জেএ রে, থাকবি ভাল সর্বকালো জাবে দূরে ঃ। কুলের গৌরব জার হয় গুরু সদায় [সদয়] হয় না তারে নালন বেড়ায় ফাতরার [ফাতরায়] বেড়ায় কুলচী ফেরে ঃ।।

১৫৫ নং

ওগো জেন্তে মরা সে প্রম সাধনে ঃ তাকি পারবি তোরা ঃ। জে প্রেমে কিশোরা কিশোর মজেছে দুইজোনে ঃ।। কামের কামি নিসকামিনি হয়, কামরূপে কামসক্তীরো আশ্রায় [আশ্রয়] তার সন্দি [সন্ধি] জানা বড়ই শে না কোটীন [কঠিন] জিবের মনে ঃ। পাইলে রে অরুন কিরন কমলিনি প্রফুল্ল জমন, তন্নী গতি সেধলে রতি আকোরসনে [আকর্ষণে] টেনে ঃ।। সামর্থ আর সাম্বু [শম্ভু?] রশের মান উভয় জানে সুমানে শুমান নালন ফকির ফাকে ফেরে কটীন দেখে শুনে ঃ।।

১৫৬ নং

আমার আপন খবর আপনার হয় না ঃ।। এবার আপনারে চিন্তে [চিন্‌লে] পরে জায় অচিনারে চেনা ঃ।। সাই নিকট থেকে দুরে দেখায় জমন কেশের আড়ে পাহাড় নুকায় দেখ না আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি আমার কোলের ঘোর তো জায় না ঃ।। আর্ত্তা [আত্মা] রূপে কর্ত্তা হরি মনে নিষ্ঠা হইলে মিলবে তারি ঠেকনা বেদবিদান্ত পোরবে জত বেড়বে কত লকনা [লক্ষণা] ঃ।। আমি কে বলে মন জে জানে তার চরণ স্মরন লেনা সাই নালন বলে মনের ঘোরে হলেম চোক [চোখ] থেকীতে কানা ঃ।।

১৫৭ নং

তোরা দেখনা রে মন দিব্বু [দিব্য] নজরে ঃ।। ৪ চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মনি কোটার ঘরে ঃ।। হলে শে চাঁদের সাধন ঃ অধার চাঁদ হয় দরসন হয় রে ঃ ও শে চাঁদেতে চাদেরো আশন রেখেচে কি ঘিরে [কি করে] ঃ।। চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া চাঁদে দেএ চাঁদের খেওয়া দেয় রে, জমিনেতে ফোলচে মেওয়া ঐ চাঁদের শুধা ঝোরে ঃ।। নওন চাঁদ প্রসন্য [প্রসন্ন] জার সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার হয় রে অধিন নালন বলে বিপদ আমার গুরুচাঁদ ভুলে রে ঃ।।

১৫৮ নং

জে পরশে পরশে পরস সে পরশো চিনে লে না ঃ।। সামান্য পরোশেরো গুন লোহার কাছে গেলো জানা ঃ।। পরসমনি শোরূপগোশাই [স্বরূপ গোসাই] জে পরশের তুলোনাই [তুলনা নাই] পরসিবে জে জোন ঃ তার ঘুচিবে জঠর যন্ত্রণা ঃ।। কুমরিতে পরকে জমন, ধরায় শে আপন বরন সে পরশের জানিবে মন তন্নী মতোন পরশোনা ঃ।। ব্রেজেরো ঐ জলদ কালো জে পরোশে গৌর হলো নালন বলে মন রে চলো জানিতে শে উপাশোনা ঃ।।

১৫৪ শুটিনী

কুলের বোউ হয়ে মন্নার কলো। দিনে আকার ঘিরে:।। ঘোমটা ফেলে চলনা;
তাই সাইব বাজারে:। কুলের ভয় কাজ হারাবি কুলকি। রবি সঙ্গে —
কৈরে, ওরে পঞ্চারি সমানে জেদিন ফেলবে তোরে:। দিপ্রে আর —
আচাই কোড়ি নাড়ুর নাড়ি হুত কেবরে, আকরিজোল সর্বকুলো —
জাবে দূরে:। কুলের গৌরব জোর হয় তুরা সদায় হুবনা তারে নানন —
নেরোয় ফাতরায় বেড়ায় ফুল-টা ফেরে:।। —

১৫৯ নং

খাকি আদমের ভেদ শে ভেদ পোসু [পশু] কি বোজে ঃ।। আদম সরিরো আমার ভাশায় [ভাষায়] বলেছে অধার সাই নিজে, নৈলে কি আদমকে সেজদা ফেরেস্তার সাজে ঃ।। সনি [শুনি] আজাজীল খাশতোন খাকে আদম তোন [তন] গটেছে আবার সেই আজাজীল সয়তান হলো আদম না ভজে ঃ।। আব খাক আতোষ বাদে ঘর গোটলে জান মালেক মক্তার কোন চিজে সাই নালন বলে জেনলে এই ভেদ সব জানে শে জেঃ।।

১৬০ নং

মনে না দেখলে নেহাজ কৈরে ঃ মুখে পড়লে কি হয় ঃ।। মনের ঘোরে কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় ঃ।। আহামদ নাম দেখি মিম হরোফটী নফি দেখায়, ওরে মিম গেলে শে কি হয় দেখো পড়ুয়া সবায় ঃ।। আহাদ আহামদে এক লাএক [লায়েক] শে মরমো [মর্ম] কে পায় আকার ছেড়ে নিরাকারে শেজদা কি দেয় ঃ।। জানাতে ভজোন কথা তাইতে খোদা অলিরূপ [অলি রূপ] হয়,ওরে নালন গেলো ঘোলায় পোড়ে দাহারি আর ন্যায়ঃ।।

১৬১ নং

মেরে সাইর আজোবো কুদরতি তা কে বুজতে পারে ঃ।। আপ্নী রাজা, আপ্নী প্রজা ভবের পরে ঃ।। আহাদ রূপ নুকায় হাদি আহামদী রূপো ধরে, এ মরমো [মর্ম] না জেনে বান্দা পোড়বি ফেরে ঃ।। বাজিকর পুথলো [পুতল] নাচায়, কথা কহায়, আপ্নী তারে, জিব দেহে সাই চালায় ফেরায় সেই প্রকারে ঃ।। আপ্নারে চিনবে জে জোন, পোশবে [পশিবে] শে জন ভেদের ঘরে, ছিরাজ সাই কয় লালন কি আর বেড়াও ধুড়ে ঃ।।

১৬২ নং

আছে জার মনের মানুষ মনে শে কি জপে মালা ঃ। অতি নির্জ্জোনে শে বশে দেকচে খেলা ঃ।। কাছে রএ ডাকে তারে উচ্চুশ্বরে [উচ্চস্বরে] কোন পাগেলা, ওরে জে জা বোজে [বোঝে] তাই শে বুজে থাক রে ভোলা ঃ।। জথা জার বেতা [ব্যথা] নেহাত শেইখানে হাত ডলামলা ওরে তোম্নী জেনো মনের মানুষ মনে তোলা ঃ।। জে জোনা [জন] দেখে সে রূপ করিএ চুব [চুপ] রয় নিরালা ও শে নালন ভেড়ের লোক জানানো হোরী বলা, মুখে হোরি হোরি বোলা ঃ।।

১৬৩ নং

ঘরে বাশ কোরি শে ঘরের খবর নাই ঃ।। চেতন গুরুর সঙ্গ লএ খবর করো ভাই ঃ।। চারি জুগে ঘর চাবি আটা ছোড়ান পরের ঠাই ঃ।। কলকাটী জার পরের হাতে তার ক্ষেমতা [ক্ষমতা] কি জগোতে, লেনা দেনা দিবোরেতে পরে ভাই ঃ।। এমনি বেহাত আপন ঘরে, থেকতে রতন হৈ দারিদ্রে, দেয় শে রতন হাতে ধরে তারে কোথা পাই ঃ।। ঘর ছেড়ে ধন বাইরি [বাহিরে] খোজা, বয় শে জমন চিনির বোজা [বোঝা], পাএনা [পায়না] রে শে চিনির মজা বলদো জে ভাই ঃ।।

১৬৪ নং

আইজ ব্রজোপুরে কোন পথে জাই ঃ ওরে বল রে তাই ঃ। আমার সাতের সাতি [সাথের সাথী] আর কেহুই নাই ওরে কেহুই নাই ঃ।। কোথা রাধে কোথা কৃষ্ণধন ঃ কোথা রে তার সব সখিগন আর কতদিনে চলিলে শে চরন পাই ঃ জার নেগে [লেগে] মুড়ি [মুড়াই] এহি মাথা ঃ তারো পেলে জায় মনের বেথা [ব্যথা] ঃ কি সাধনে শে চরনে পাইব ঠাই ঃ।। তোরা জতো স্বরূপ গোনেতে ঃ বর দেগো কৃষ্ণ চরন পাই জাতে ঃ অধিন নালন বলে কৃষ্ণ নিলের অন্ত নাই ঃ।।

১৬৫ নং

কেনে চাদের জন্যে চাদ কাদে রে ঃ।। এই নিলের অন্ত পাইনে রে ঃ। দেখে শুনে ভাবচি মনে কৈ কারে ঃ আমরা দেখে এই গৌরোচাদ ধরবো বলে পেতে আছি ফান্দ আবার কোন চাদেতে এ চাদেরো শ্রী মনহরে জিবেরে কি ভুল দিতে সবায় গৌরচাদ আর চাদের কথা কয় ঃ পাই নে এবার কি ভাব ওহার অন্তরে। এ চাদ শে চাদ কোরে ভাবনা ঃ মোন আমার আইজ হলো দোটানা ঃ বলচে নালন পলেম এখন কি ঘোরে ঃ।।

১৬৬ নং

সে অটল রূপের উপসোনা ঃ। ভাব কেও [কেউ] জানে কেও জানে না ঃ বৈকণ্ট গোলোকের উপার ঃ আছে রে শে রূপের বেহার কেষ্টে সেউ নব রাধের পতি শে জোনা ঃ সরূপ রূপের এই জেনো ধরন দোহার [দোহে] ভাবে টলে দোহার মন ঃ অটল কে টলিতে পারে কোন জোনা ঃ নরেকারো জা হইতে জানে সে ঃ শক্তীধারা শেই আবেম্বে [আবিম্বে] অধিন নালন বলে দিন থাকিতে জেনলে না ঃ

১৬৭ নং

কি সাধনায় পাই গো তারে ঃ জার নাম অধার চাদ এই সংসারে ঃ। কত মনিরিশী [মুনি ঋষি] হদ্দ হলে ধ্যান করে ঃ কেউ ফকীর কেউ হচ্চে বৈরাগী কেউ মহন্ত কেউ সাজে জোগী কার বাক সাব [সাফ] মন শুতায় দেই গীরে [গিঠ] ঃ।। (কার বা ক...ব মন শুতোয় দেই গীরে) ঃ। ব্রহ্ম খিরিষ্টানিরা ঃ নাম ব্রর্মা [ব্রহ্মা] সার বলেন তার ঃ আমার দরবেশ কয় বস্তু কোথায় দেখ্না রে ঃ।। গুরু তত্তে [তত্ত্বে] বিধি শোনা জায় তাই তো দেখি এক রূপো সে নয়, নালন বলে জে জা বজে [বুঝে] তাই করে ঃ।।

১৬৮ নং

আমায় চরন ছাড়া করো না হে দওাল [দয়াল] হরি আমি অধম পামর বটে দোহাই দেই তোমারি ঃ।। চরনেরো জজ্ঞ [যোগ্য] মন নয় ঃ তবু মন ওই রাঙ্গা চরন চায় দওাল চাঁদের দও৷ [দয়া] হইলে পারে জায় অপারি ঃ।। অনিথ্য [অনিত্য] সুখেরো সব ঠাই তাই দিয়ে জিও [জীব] ভুলাও হে গোসাই চরন দিতে কেনে তাতে কর হে চাতুরি ঃ। ক্ষেমো অধিন দাশের অপরাধ শীতল চরণ দেও হে দিননাথ নালন বলে ঘুরিও না হে করে ময়াকারি [মায়াকারী] ঃ।

১৬৮ (খ)

আমায় চরন ছাড়া কোরো না হে দয়াল হোরি ঃ।। অধমো পামোরো বটে দোহাই দেই তোমারি ঃ।। ওগো সামার্ন [সামান্য] কি শে অধার চাঁদকে পাবে ঃ জার লেগে হইল জোগী দেবের দেব মহাদেব ঃ ভাব জেনে ভাব না দিলে তমন ব্রথা [বৃথা] জাবে সে ভক্তী দর্শন বাঞ্চা [বাঞ্ছা] জদি হয় সে চরন ভাব দে না শে ভাবে ঃ যে ভাবে সব গোপীনি তারা হোএ ছিল পাগল পারা চরন চেলে [চাইলে] তন্নী ধারা ভাব দিতে তায় হবে ঃ।।

১৬৯ নং

গুরূ রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে জার অন্তরে ঃ তার কিসের এঁকটা ভজন সাধন লোক জানীত করে ঃ বকের ধরন করন তারো নয় দিগ ছাড়া রূপ নিরিকো ঃ সদায় পুলক ভরে ভব পারে জায় সে নিরিখ ধায় জেন্তে [জ্যান্তে] গুরু না পেলে হেথা মলে পায় শে কথারি কথা সাধক জোনে বর্ত্তমানে সবায় ভজে তারে।। গুরুভক্তের তুলনা' দিব কি যে ভক্তীতে সাই থাকে রাজি নালন বলে গুরু রূপে নিরূপ মানষ [মানুষ] ফেরে ঃ।।

১৭০ নং

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি।। দেখত্তে [দেখতে] গুরু হারাই কোন রূপে দেই আখি ঃ।। গুরূগৌর রহিল দুই ঠাই কি রূপে একরূপ করি তাই ঃ।। এক নিরাপন না হলে মন সকল হবে ফাকি।। প্রবর্ত্তর নাই কোন ঠেকানা সীদ্দী [সিদ্ধি] কিসে হবে সাধনা মিছে সদায় সাধু হাটায় নাম পাড়ায় সাধকি।। এক রাজ্যে হলে দুজোন রাজা কার হুকুমের গতো হয় প্রজা নালন বলে তন্নী গোনে [গোলে] খাতায় পোলো বাকি।।

১৭১ নং

এই গোরাকি সুদই [শুধুই] গোরা ওগো নাগরি দেখ্ চেএ [চেয়ে] দেখো কেমন শ্রী ঃ।। সমাঙ্গে [শ্যামাঙ্গে] গৌরঙ্গ মাখা নয়ন দুটি বাঁকা মনে জেন দিচ্ছে দেখা ব্রজেরো হরি। না জানি কোন ভাব লয়ে এসেছে শ্যাম গৌর হয়ে কদিন বা রেক্‌বে ঢাকিয়ে, নিজো মাধুরি।। জে হউক শে হউক ও না গোরাঃ করবে কুলের কুলো সারা।। নালন বলে দেখবে জারা সভার্গ [সৌভাগ্য] তারি ঃ।।

১৭২ নং

গোল কোরো না ও নাগরি ঃ কেউ গোল কর না দেখি ঠাওরে দেখি কেমন গৌরাঙ্গ সাধু কি ও (চিত্ত) জাদুকারি, এশেছে এই নদে পুরি খেটবে [খাটিবে] হেতা ভারিভুরি তাই কি ভেবেছে বেদ পুরানে কয় সমাচার, কলিতে আর নাই অবতার তবে জে কয় শেই গীরিধর এসেছে দেখ ঃ।। বেদে জা নাই তাই যদি হয় পুথি পড়ে কে মরিতে জায় নালন বলে ভজিবো সবাই তবে ঐ গৌউর পদ ঃ।।

১৭৩ নং

সামান্য জ্ঞানে কি তার মর্ম জানা জায় জে ভাবে আইলো হরি এই নদীয়া (য়,) জিব তরে না অংশ হইতে বাঞ্চ [বাঞ্ছা] তার নিজে আশীতে [আসিতে] আর বাঞ্চা হইলো তাথে অদৌইতের [অদ্বৈতের] বাঞ্চাই [বাঞ্ছায়] ঃ।। শুনে অদৌইতের হুহঙ্গাকারি এনে কৃষ্ণ নদে পুরি বেদেরও অগচর [অগোচর] তারি সেই নিলে হয় ধন্যরে গৌউর অবতার কলিকালে হলো প্রচার কলির জিব পাইলো নিস্তার নালন গোল বাদাই [বাধায়] ঃ।।

১৭৪ নং

নবি না চিনলে কি শে খোদার ভেদ পায় ঃ।। চিনিতে বলেছে তারে সেই দয়াময় ঃ।। জে নবি পারেরো কাণ্ডার, জেন্দা শে ৪ জুগেরো পর হায়াতোলমরছলিন নাম তার সেই জন্যে কয় ঃ।। কোন নবি হোঁইল ওফাৎ কোন নবি বান্দারো হয়াৎ নেহাজ কোরে জেনলে নেহাৎ জাবে সংশায় [সংশয়] ঃ।। জে নবি আইজ সঙ্গে তোরো চিনে মন তার দাওইন ধরো; নালন বলে পারের কারো সাদ জদি হয় ঃ।।

১৭৫ নং

আকার কি নিরাকারা সেই রর্বানা [রব্বানা] ঃ। আহার্মদ [আহাম্মদ] আর আহাদ নামের বিচার হৈলে জাএ জানা ঃ। খুদিতে বান্দার দেহে খোদা শে নুকাইএ আহাদ মিম হরীএ [হরিয়া] আহাম্মদ হইল সে না ঃ। আহামদ নামে দেখি মিম হরফ লেখেন নফি মিম গেলে আহাদ বা কি আহামদ নাম থাকে না ঃ। এই পদের অর্থ ধুড়ে কারূ জ্ঞান বষেব [বসবে] ধড়ে কেউ কবে নালন ভেড়ে ফাক তামোশেই [ফাকি তামাশা] বোজে [বোঝে] না ঃ।

১৭৬ নং

ও দুইটি নুরের ভেদ বিচার জানা উচিত বটে ঃ। নবিজি আর নিরূপ খোদার নুর সে কি প্রকার ঃ। নবি জোন [জন] আকার ছিল তাহাতে নুর চোওায় [চোয়ায়] বল নিরাকারে কি প্রকারে নুর চোওায় খোদায় ঃ। আকারো বলিতে খোদা সরাতে নিসাধ [নিষেধ] সদা আকার বিনে নুর চোওায় প্রমান কি গো তার ঃ জাত এলাহি ছিল জাতে ঃ কি রূপ সে এলো ছেফাতে নালন নুর চিনিলে ঘোচে ঘোর আন্ধার ঃ।

১৭৭ নং

মরসীদ [মুর্শিদ] জানাএ জারে, মর্ম সেই জানিতে পারে ঃ। জেনে শুনে রাখে মনে সে কি কারূ কয় ঃ।। নিরাকার রয় অচিন দেশে আকার ছাড়া চলে না সে নিরান্ত সাই অন্ত জার নাই জা ভাবে তাই হয় ঃ।। মুনসী লোকের মুনসীগীরি আমি কি তাই জানিতে পারি, আকার নাই জার বরজোক কার বলে সর্বদাই ঃ।। নুরেতে কুলআলম পয়দা আবার কয় পানির কথা, নুর কি পানি বস্তু জানি নালন ভাবেতাই ঃ।।

(১৭৭ নং খ)

কৃতি করমারো খেল কে বুজেতে [বুঝিতে] পারে ঃ।। জে নিরাঞ্জন সেই নুরুনবী নামটী ধরে ঃ।। গোটীতে সয়াল [সকাল] সংসার ঃ এক দেহ দুই দেহ হএ তার ঃ আহাদ আহামদর বিচার দেখ বিচারে ঃ।। চারেতে নাম আহামদ হয়, এক হরফ তার নফি কেন কয় ঃ সে কথাটী জেনবো [জানিব] কোথায়, নিশ্চয় কোরে ঃ।। এ মরমো জাহারে শুদাই কাজিল বাগড়া বাদায় সে ভাই নালন বলে স্থুল ভুলে জাই তার তোড়ে রে ঃ।।

১৭৯ নং

মনের ভাব বুজে নবি মরমো খুলেছে ঃ। ও কেউ ঢাকা দিল্লী হেতড়ে ফিরি কেউ দেখে কাছে ঃ।। ছফিনায় সরারো কথা, জানাইলে জথা তথা, কারু ছিনায় ভেদ পুশীদা বলিয়া গীয়াছে ছিনা আর ছফিনার মানি, ফাকা ফাকি দিন রোজোনি, কেউ দেখে মত্ত্য কেন্থ সুনে আকাষ ধেইএছে [ধেয়েছে] ঃ।। নবুয়াতে নিরাকার কয় বেলাএতে বরজোক দেখায় অধিন নালন পলো পূর্ন ধোকায় এ ভবো মাজে ঃ।।

১৮১ নং

সোমাই [সময়] গেলে রে ও মন সাধন হবে না ঃ। দিন ধরিএ তিনের সাধন কেনে জেনলে না ঃ। জান না মন খালে বিলে মিন থাকে না জল শুখালে কি হএ তারো বান্দাল দিলে ঃ। শুখ্‌নো [শুক্‌নো] মহানা [মোহনা] ঃ। অসময়ে কৃশী কবে মিছেমিছি খাট মরি গাছ জদি হয় বিছের [বীজের] জোরে ফল ধরে না ঃ আমাবশ্যায় পূর্নিমা হয় মহাজোন সে দিনে উদায় [উদয়] নালন বলে তার সন্নায় ডণ্ডেক রয় না ঃ।।

১৮২ নং

ব্রেজের সে প্রেমের মহাজন সবায় কি জানে স্যামঙ্গ [শ্যামঙ্গ] গৌরাঙ্গ হইল সে প্রেম সাধনে ঃ। সামন্য বিশেষ রতি জোগল [যুগল] চলে ম্রনাল [মৃণাল] গতি বিশেষ সাধিতে বাদি হয় গো সামান্যে। ঃ প্রেমমাই কোমলি রায় [প্রেমময়ী কমলী রাই] কোমলাকান্তর কামরূপ সদাই কামি প্রেমি সে দুজন হয় প্রমায় কেমনে সহজে দেয় রায় [রাই] রতিদান স্যামরতি [শ্যামরতি] কই হয় শে প্রমান নালন বলে তার কি সন্ধান পায় গুরু বিনে ঃ।।

১৮৩ নং

সে কালার প্রমো করা কথার কথা নয় ঃ।। ভালো হলে ভালই ভালো নৈলে নেটা [ল্যাঠা] হয় ঃ।। সামান্যে কি এই জগোতে পারে গো শেই প্রম জজীতে প্রমী নাম পাড়াইএ মিছে দুকুল হারায় ঃ।। এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার প্রাপ্তী হএ শে ভাবানুশার, ভাব জেনে ভাব না দিলে তার প্রমে কী ফল পায় ঃ।। গোপী জমন প্রম আচারি, জাতে বান্দা বংশীধারি, নালন বলে সে প্রেমেরি ধন্য জগোৎময় ঃ।।

১৮৪ নং

জে সাধন জোরে কেটে জায় কর্মফাশী ঃ।। জদি জানবি সে সাধনার কথা ঃ।। হও গুরুর দাশী ঃ।। স্ত্রীলেঙ্গ পুলেঙ্গটী আর নপংশকে [নপুংসক] সাশীতো কর আছে জে লেঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপার [উপর/ওপার] করো প্রকাশী ঃ।। মারে মতচ্য [মৎস্য] না ছোএ পানি রোশীকের তন্নী কোরনী, ও শে আকোরশোনে আনে টানি খিরোদোশশী ঃ।। কারন্য শুমুদ্র [সমুদ্র] পারে গেলে পায় অধার চাঁদেরে অধিন নালন বলে নৈলে ঘুরে মোরবি চৌরাশী ঃ।।

১৮৬ নং

এই সুখে কি দিনো জাবে ঃ।। একদিন হুজুরে হিসাব দিতে জে হবে ঃ।। হুজুরে মন তোর আছে কবুতি, তাকি মনে পড়ে না শীতি, বাকির দায় কখন আশীএ সমন তিলকে [তিলেকে] তরঙ্গ তুফান ঘটাবে ঃ।। আইন মাফিক নিরিক দিতে ওরে মন, কে ন এতো আড়িগুড়ি তোর এখন, পর্তন [পত্তন] জে শোমায় হইলে জমায় নিরিক ভারি, পাতল [পাত্‌লা] তাকি দেখ নাই ভেবে ঃ।। ছাড়ো২ ওমন ছাড়ো রে বিকার, সরল হোএ জোগাও রাজোকর, এবার পলে বাকি উপায় কৈয়ার [আর] দেখি, নালন বলে দাএমাল হোবি মন তবে ঃ।।

১৮৭ নং

মন বিবাগী বাগ মানে না রে॥ জাতে অপমের্ত্ত [অপমৃত্যু] হবে সদায় তাই করে ঃ।। কিশে হবে আমার ভজোন সাধন মন হলো না রে মনের মতোন ওমন দেখে। শিমেল ফুল সদায় হয় বেকুল [ব্যাকুল], মন কে বুজাইতে নারি জনমো ভোরে ঃ।। মনের গুনে কেহু মাহাজোন হয়, কেহু ঠাকুর হৈয়া পূজা খায়, আমার এই মনে তো, আমায় কল্লে হতো [হত] আমি দুকুলো হারালাম মনেরো ফেরে ঃ।। মন কী মনাই হারে হাতে পেলেম না, কিরূপে তার করি সাধনা, নালন বলে আমি হলেম পাতালগামী কি করিতে এশে গেলাম কি কোরে ঃ।।

১৮৮ নং

মদিনায় রছুল নামে কে এলো ভাই কায়াধারি হোয়ে কেনে তার ছায়া নাই ঃ।। কি দিবো তুলুনা [তুলনা] তারে খুঁজে পাই নে এ সংসারে মেঘে রোইত [রহিত] ছায়া ধরে, ধুপেরো সোমায় ঃ।। ছায়াহিন জাহারো কায়া ত্রীভুবনে তারো ছায়া, এ কথারো মরমো লয়া অবস্য চাই ঃ।। কায়ার সরিক ছায়া দেখি, জারো নাই সে লা সরিকী নালন বলে তাও উঘারি বলতে ডরাই ঃ।।

১৮৯ নং

ও মন কে তোমার জাবে শাতে ঃ।। কোতা রবে ভাই বন্ধু সব পড়বি জে দিন কালের হাতে ঃ।। জে আশার আশাএ আশা, হলো না তার রতিমাশা ঘোটীল রে কি দুদশা কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ঃ।। নিকাশের দায় কোরে খাড়া মারিবে আত্ত্যসের [আতসের] কোড়া, শোজা কোরবে বেকা তেড়া জোরজুলম কিছুই খেটবে না ঃ।। জারে ধরে পাবি নিস্তার, তারে সদায় ভাবলি পর, ছিরাজ সাই কয় নালন তোমার সায় [সার] এই ভবের কুটুম্বীতে ঃ।।

১৯০ নং

মন তোর আপন বলতে কে আছে ঃ।। কার কান্দায় কান্দো মিছে ঃ।। থাক শে ভবের ভাই বেরাদর প্রাণ পাখি শে নয় আপনার পরের ময়ায় মজিএ পর, প্রাপ্তধোন হারায় শেশে ঃ।। সারানিশী দেখ মনুরায়, নানা পক্ষ এক ব্রক্ষে রয়, জাবার বেলায় কে কারে কয় দেহ্ প্রাণ তন্নী শেজে ঃ।। মিছে মায়ার মদ খেএও না, প্রাপ্ত পত ভুলে জেও না এবার গেলে আর হবে না পোড়বি কয় জুগের পেছে ঃ।। এস্তে একা আলি রে মন, জেতে একা জাবি তো মন, ছিরাজ সাই বলে রে নালন কার মায়ায় বেড়াও নেছে [নেচে] ঃ।।

১৯১ নং

ও মন দেখে শুনে ঘোর গেলো না ঃ।। কি করিতে কি করিলাম দুগ্দেতে মিশীলো চোনা ঃ।। মদন রাজার ডাঙ্কা ভারি হলেম তারো আজ্ঞাকারি জার মাটীতে বসোত কোরি চিরোদিন তারে চিনিলাম না ঃ।। রাগের আশ্রায় [আশ্রয়] নিলে তো মন, কি করিতে পারে ত মন [শমন] আমার হল কামলুভি মন মদন রাজার গাটরি টানা ঃ।। উপর হাকিম একে দিনে, কৃপা কোরতো নিজ গুনে, দিনে [দ্বিনের] অধিন নালন ভনে জেতো রে মনের দোটানা ঃ।।

১৯২ নং

কে পারে মকর উল্লার মকর বুজিতে ঃ।। আহাদে শে আহামদ নাম হয় জগোতে ঃ।। আহাম্মদ নামে খোদায়, মিম হরোফটী নফি কয়, মিম ওটাইএ [উঠিয়ে] দেখো সবায় কি হয় তাতে ঃ।। আকারে হোএ জুদা, খোদা শে বলে খোদা দিব্বু জ্ঞ্যায়ান [জ্ঞান] নৈলে কে তা পাএ জানিতে ঃ।। কুলহো আল্লা ছুরায় [সুরায়] তার, এশারা আছে নাচার নালন বলে দেখ না এবার দিন থাকিতে ঃ।।

১৯৩ নং

গোউর আমার কোলির আচার বিচার কি আইন আনিলে ঃ।। কি ভাবে বিওগী হইয়া বৈরাগী গৌর কুলের আচার বিচার পর তোজিলে ঃ।। হোরি বলে গোউর রায়, প্রেমে আকুল হয়, নওনেরো জলে বদন ভেশে জায়, দেখে উহার দশা সবায় জ্ঞান পায় আপ্নী কেন্দে এ জগত কান্দালে ঃ।। এ ভাব জিবের সম্ভাব নয়, দেখে লাগে ভয়, চণ্ডালেরে প্রভু আলিঙ্গন দেয়; নাই তার জেতের বোল, বলে হরিবোল, বেদপুরান আদি সব ছাড়িলে ঃ।। গোউর সিংহের হংকার [হুংকার], ছাড়েন বারে বার, নদিয়া বাশী সব কাপে থরোথর, প্রমতর্ত্ত [প্রেমতত্ত্ব] রাগতর্ত্ত জানালে সব অর্থ নালন কয় ঘটলো না মোর কপালে ঃ।।

১৯৬ নং

কোথা আছেরে সেই দিন দরোদী সাই ঃ চেতন গুরুর সঙ্গ লইএ খবর কোরো তাই।। চক্ষুর আন্দার দেলের ধোকায় কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় কি রঙ্গ দেখছে সদায় বসে নিগুম ঠাই।। জেন্তে জদি না দেখিবে আর কোতা [কোথা] কি রূপে পাবে মলে গুরু প্রাপ্ত হবে কী সে বুজি তাই।। এখোননা [এখানে] না দেখিলাম জারে চিনিব তারে কেমন কোরে ভার্গগতি [ভাগ্যগতিকে] আখের তারে দেখিতে জদি পাই।। ঠাওরে ভজন সাদন করো নিকটে ধন পেতে পারো নালন কয় নিজ মোকাম ধোড়ো বহুদুরে নাই ঃ।

১৯৭ নং

সামান্নে কে সে ধোন পাবে ঃ। দিনের অধিন হোএ খুজিতে হবে ঃ। সাধন পথে কিনা হলো বাদসারো বাদসাই ছাড়ীলো কুলোবতীর কুলো গেলো কালারে ভেবে ঃ। কতো মনি [মুনি] রিসী [ঋষি] জুগজুগান্তর বনবাসী পাবো বলে কালোশশী চারিজুগ বসিএ তপে ঃ। গুরূপদে কতোজনা বিনে মুলে [মূল্যে] হোএ কিনা [কেনা] তারা কল্লেন গুরুর দাস্যপানা সে ধোনে লোভ হএ ঃ।। চরন ধোনে জার আসা [আশা] অন্যধোনে নাই প্রবশা নালন ভেড়োর বুদ্দিনাশা দোভাসা ভাবে ঃ।।

১৯৭ (খ) নং

মেরে [আমার] সাইর ভর (ভব) জারা। তাদের ভাবের ভুসন জায় ধরা।। সাদা ভাব তার সাদা করণ নাইরে কালামালা ধারণ ও সে পঞ্চ ক্রিয়ে [ক্রিয়া] সাঙ্গএ কর [সাঙ্গ করে] ঘরে রাত্রদীন নেহারা।। পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ সরষ তার উপর একের কালষ [কলস?] তাহে জলীচে বাতি দীবরাতি [দিবারাতি] তাহে দৃষ্ট রয় বেভবরা।। আলেক রূপ জে হেরেছে সে কী দেবাদেবী পুজে এবার আউল চলন চলীএ নালন পাএ রত্ন হইলো হারা।।

১৯৮ নং

অটলো রূপের সরবর শ্রীরূপ সে ঘাটের ঘেটেলা [ঘাটোয়াল]।। জাও জদি মন সে সহরে মাএর চরন ধর এই বেলা।। শ্রীরূপ মুঞ্জুরি গুরু সে ধামের অধিকারি অনুগতো হইলে তারি খুলে দীবে রাগের তারা (তালা)।। রূপ দেখতে চাএ শ্রীরূপ ছেড়ে সে ত মিচে [মিছে] ধান্ধায় পড়ে বোজ রসীক তন্ত্র ধুড়ে ঘুচে জাবে মোনের ঘোলা।। সক্তিহরা ভাবক জিনী [যিনি] কপটভাবে উদাসীনী হিসাব নাই মুল তত্যবানী [তত্ত্ববাণী] নালন তম্নী আলাভুলা।।

২০১ নং

ক্ষেম২ অপরাধ ওহে দীননাথ কেসে [কেশে] ধরে আমার লাগাও কেনারে।। তুমী হেলই জা কর তাই করিতে পার তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে।। না বুজে [বুঝে] পাপ সাগর ডুবে খাবি খাই সেষ কালে তোর দেলাম গো দোহায় আমায় জদী না তার গো সাই তোমার দয়াল নামে দোষ রবে সংসারে।। সুনতে পাই পরম পীতে গো তুমী অতি অবধ বালক আমী জদী ভোজন [ভজন] ভুলে কুপথে ভ্রিমী কেনে দেও না সুপথ সরন [স্মরণ] করি।। পতিতকে তারিতে পতিত পাবন নাম তাইতে তোমায় ডাকি গুণধাম তুমী আমার বেলায় কেন হইলে বাম আমী আর কতো ভাষবো দুখের পাথরে [পাথারে] ।। অথায় [অথৈ] তরঙ্গ আতযে মরি কোথায় হে অপারের কাণ্ডারি অধিন নালন বলে তরায় [তরাও] হে তরি নামের মহিমা জানুক ভব সংসারে।।

২০২ নং

আবহয়তের নদী কোনখানে।। আগে জেন্দা পীরের খান্দানে জাও দেখীয়া [দেখিয়ে] দীবে সন্ধানে সেই জে নদীর পীচলো [পিছল] ঘাটা চাঁদ কোটাল খেলছে রে ভাটা দীন দুনিয়া জোড়া একটী মিন আছে তার মাঝখানে ঃ।। মওলার মহিমা রে এমনী সে নদীতে বয় অমত্য [অমৃত] পানী তার এক রতির পরসে পানী অমর হবে সেইজনে আবহএতের নদী কোনখানে ঃ।। আবহএতের মর্ম জে জান পাই [পায়] উপসোনা [উপাসনা] সেষ তার রি [তাহারি] হয় সেরাজ সাইর আদেসে অধিন নালন ফকির তাই ভনে ঃ।।

২০৩ নং

রসের রসীক না হলে কে গো জানতে পাই কোথা সে অটল রূপ বারাম দায় [দেয়]।। সর্ন [শূন্য] ভরে সোজ্য করে [শয্যা করে] পাতাল পুরে সওন [শয়ন] দেয় অরসীক বেড়ায় ঘুরে ঘোর ধান্দায় ঃ।। মনচোরা চৌর সেই জে নাগর তলে আসে তলে জায় উপর২ খুঁজে জিব সবায় ঃ।। মাটী ছাড়ে নাফ [লাফ] দিএ উটে আসমানে গীএ হাত বাড়ই [হাত বাড়াইএ] পড়ে সে ফাকের ঘরে সেসখানায় তলো পড়ে তলে ধোড়ে তবে সে ফলপ্রাপ্ত হয় নালন কএ উচমনের কায্য নয় ঃ।।

২০৪ নং

জেন গে (তে) বজ্র ভেদ পরে বেলাএত অচিন কে চিনবো জে বজ্র [বর্জক] ধরে ঃ।। নবুয়তের সব অদেখা তপ জপ, বেলাএত দীপ্তকার দেখ নজরে ঃ।। বজ্রখে জার নাই নেহারা আখেরে সাইর রূপ চীনবে না তারা নবি ছরআর বলেছে বার২ জানা গেল তায় হাদীছ মাঝারে ঃ।। সেই জে প্রমান এখানে জানা অদেখারে দেখে কেমনে চীনা জদী চেনা জায় তার বিদী [বিধি] হয় আরাক [আরেক] জোনকে সত্য বিশ্বষ করে ঃ।। বেলাএত নবুঅত কারে বলা জায় জে ভোজে [ভজে] মুরসীদ সেই হি জানাতে (পায়) নালন ফকির কয় আরাক ধান্ধা হয় বস্তু বিনে নামে পেট কৌ [কই] ভরে ঃ।।

২০৫ নং

চাঁদে চকরে রঙ্গ মহল ঘরে থেকে, ঝলক দিচ্ছে সদায় ঃ।। দেখলে সেহি চাঁদ, সাফল [সফল] হয় নয়ান আপ্ততর্ত্ত ধুড়ে দেখ না রিদয় ঃ।। তিতি[তিথি] জোগ ধরে, প্রিতি [প্রতি] মাশন্তে, যুগল মিলন হয় চাঁদে[২] তাহে অভরন, সুধার বরিসোন, খুদা নিবারন হয় জে সুধায় ঃ।। মনিপুর মহলে জে নিলে খেলা, বোলতে আকুল হই না জাএ বলা, অরসিক জোনে বল্লে কি জানে, মনিচন্দ্রে শর্গ চন্দ্র [স্বর্গচন্দ্র] উদয় ঃ।। আপ্ততর্ত্তে পড়েছে নজর, পাতালে শে পায় আছমানি খবর, ছিরাজ সাঁই বলে আপন ঘর ভুলে, নালন বেড়ো [ভেড়ো] কেন দুরূ [দূর] দেশে ধায় ঃ।।

২০৬ নং

জদি সরায় কায্য [কার্য] সিদ্দী হয় ঃ।। তবে মারূফতে কেনে মরতে জায়।। মারূফত মুল বস্তু জানি, সরিয়াৎ তাব সরপোষ জানি, ঘুচাইএ সরপোষ খানি. বস্তু লয় কি সরপোষ ধরে রয় ঃ।। সরিয়াৎ আর মারূফত জমন, দুগ্‌দেতে [দুগ্ধেতে] মিশালো মখন, [মাখন] মাখন তুল্লে দুগ্ধ তখোন ঘোল বলে তাতো জানে সবায় ঃ।। আক্কেল আউল দোরিএ [দরিয়া] দেখ না তাতে ডুবিএ মরশীদ ভজোন জে নাগীএ [লাগিয়া] নালন বলে তাতে ভুল সবায় ঃ।।

২০৭ নং

মরার আগে মলে সমন জালা ঘুচে যায়।। জেন গে কেমন মরা কিরূপ জানাজা তার দেয়।। জেন্‌তে [জ্যান্তে] মরিয়ে শুজোন লয়ে খেলকা তাজ তবন [তহবন] ভেক সাজায়, রূ [রুহু] ছাগাই হএ কিশে তাহার কব্বোরো কোথায় ঃ। মরার সেঙ্গারো [শৃঙ্গার] ধরে উচিত জানাজা করে জে জথায়, শেই মরা আবার মরিলে জানাজার কি হয়।। কথায় হএ না শে মরা তাদের করন বেদ ছাড়া সর্বদয় [সর্বদায়], সাই নালন বলে সমজে করো মরার হাল গলায়।।

২০৮ নং

· মন আইন মাফিক নিরিক দিতে ভাব কী ঃ।। কাল সমন এলে হবে কী ঃ।। ভাবিতে দিন আখির হলো সোলআনা বাকি পলো, কি আলিস্য ঘিরে এলো, দিখলি নে খুলে আখি ঃ।। নিষ্কামী নিস্বীগার [নির্বিকার?] হলে, জেন্তে মরে জোগ সাধিলে, তবে খাতায় উসুল পাবে নেইলে উপায় কৈ দেখি ঃ।। শুদ্দ মনে সকলি হয়, তাও তো এবার জোটে না তোমায় নালন বলে কোরবি হায় হায় ছেড়ে গেলে প্রাণপাখি ঃ।।

২০৯ নং

আছে ভাবের তালা শেই ঘরে ঃ।। জে ঘরে সাই বাষ [বাস] করে ঃ।। ভাব দিয়া খোল ভাবের তালা দেখবি শে মানুষের খেলা, ঘুচে জাবে সমন জালা থেকলে শে রূপ নেহারে ঃ।। ভাবের ঘরে কি কুদরতি ভাবের নলঠন ভাবের বাত্তি ভাবের বিভাব হয় একরতি অন্নী সে রূপ জায় শরে ঃ।। ভাব নৈলে ভক্তীতে কি হয় হয় ভেবে বুজে দেখ মনুরায় জার জে ভাব শে দেখিতে পায় নালন কয় বিনয় কোরে ঃ।।

২১০ নং

আছে আছে আদ [আদি/আধ] মার্কা [মক্কা] এই মানুষ দেহে দেখ না রে মন ভেয়ে [ভায়া] ঃ।। দেষ দেসান্তার দৌড়ে এবার মরিস কেন হাপীএ ঃ।। কোরে অতি আজব ভাক্কা গোটেছেন সাই মানুস মাক্কা কুদরতি নুর দিয়ে ও তার চার দারে [দ্বারে] ৪ নুরি এমাম মধ্যে সাই বসিএ ঃ।। তিল প্রমান এক জাগার [জায়গার] ভিতর বানিএছে সাই উদ্দু সহর এই মানুষ মাক্কাতে, কতো লাক[২] [লাখ] হাজি কোরচে রে হজ সেই জাগায় জোমিএ ঃ।। দশ দুওারি [দুয়ারি] মানুষ মাক্কা গুরুপদে ডুবে দেক্কা [দেখ গা] ধাক্কা সামলিএ সাই নালন বলে গোপ্ত মাক্কায় আছে আদ এমাম সে মেএ [মেয়ে] ঃ।।

২১১ নং

মায়েরে ভজিলে হয় শে বাপের ঠেকেনা ঃ।। নিগুমো বিচারে সর্ত্ত [সত্য] গেলো তাই জানা ঃ।। পুরুসো পরাওয়াদেগার, অঙ্গে ছিল প্রকিতি তার প্রিকিতির প্রিকিতি [প্রকৃতি] সংসার ছিশ্‌টী [সৃষ্টি] সব জোনা ঃ।। নিগুম খবর নাহি জেনে, কে বা শে মায়েরে চেনে, জাহারো ভার দিন দোনিএ দিলেন রব্বানা ঃ।। বিম্বু মধ্যে কেবা ছিল বের হৈএ কারে দিখিল [দেখিলে] নালন কয় সেই ভেদ জে পেলো ঘুচলো দিন কানা ঃ।।

২১২ নং

আজু *[আজও] কোরছে সাই ব্রম্মাণ্ডের [ব্রহ্মাণ্ডের] উপর সে রূপো নিলে [লীলা] ঃ।। নৈরেকারে ভেশেছিল জে রূপ হালে ঃ।। নৈরেকারের গম্ব ভারি, আমি কি তাই বুজতে পারি, কিঞ্চীতো প্রমানো তারি সনি সুক্কোলে [শোণিত শুক্রে] ঃ।। আবিম্বু উৎলিএ [উথলিয়ে] নিরো [নীর] পোড়িছে শে নুরেকারো ঃ ডিম্বুরূপো [ডিম্বরূপ] হয় গো তারো ছিশ্‌টীরো ছলে ঃ।। আপন তত্ত্বে আপ্নী কানা, মিছে কোরি পড়াশোনা, নালন বলে জাবে জানা আপ্নারে চিনলে ঃ।।

২১৩ নং

রঙ্গমহলে সিন্দ [সিঁধ] কাটে সদায় ঃ কোথা শে চোরের বাড়ি ঃ।। পেলে তারে কয়েদ কোরে পায়ে দিতাম মনবেড়ি ঃ।। সিঙ্গ [সিংহ] দরোজায় চৌকীদার একজোন, অহরনিশী আছে শে চেতন, কিরূপ তারে ভিল্‌কি মেরে চুরি করে কোন ঘোড়ি ঃ।। ঘর বেড়িয়ে ১৬ জন ছেপাই তার এক[২] জোনার বলের সিমা নাই ঃ তারাও চোরের না পেলো টের কার হাতে দিবে দড়ি ঃ।। পীতৃধোন আইজ সব নিলো মেরে ওগো নেংটী ঝাড়া কল্লে আমারে সাই নালন বলে এককালে চোরের হোলো কি আড়ি ঃ।।

* পড়াগোনা—

২১৪ নং

মন চোরারে ধরবি জদি মন ঃ তবে ফাঁদ পাতো আইজ ত্রীবিনে ঃ।। আমাবস্যে পুন্নিমাতে বারামখানা সেইখানে ঃ।। ত্রীপীনেরো তিরোধারা বয় তারো ধারা চিনে ধরতে পাল্লে হয়, কোন ধারায় তার সদায় বেহার [বিহার] হচ্ছে ভাবের ভুবনে ঃ।। সামান্যে কি জায় তারে ধরা, ৮ পহরি [প্রহর] দিতে হয় পারা [পাহারা], কখনো শে ধারায় মেশে, কখনো রয় নিজ্জোনে ঃ।। শুক্কুল পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডে গমন, কৃষ্ণপক্ষে জায় নিজো ভুবন, নালন বলে শেরূপ নিলে দিব্বুজ্ঞানী সেই জানে ঃ।।

২১৫ নং

হাতের কাছে সামলা থুয়ে আইজ কেনে ঘুরে বেড়াও মন ভেয়ে ঃ। কতো ঢাকার সহর দিল্লি লহর [লাহোর] খুজলে মেলে এই ঠাইয়ে, ঃ। মনে ধোকা হয়ে মাক্কায় জাবি, আবার ধাক্কা পেএ শেখান্তে [সেখানে থেকে] ফিরবি, এমনি ভাবে ঘুরতে হবে, দেহের খবর না পেয়ে ঃ।। গয়াকাশী মাক্কা মদিনা জেনো বাইরি খুজে ফাক্কায় পড়ো না, দেহোরতি খুজলে পাবি সকল তের্থের [তীর্থের] ফল তাহে ঃ।। দেখ দেখিরে অবোদ মন আমার অবিশ্বাসী কোথা প্রাপ্তী কার, বিশ্বাশে মন, নিকট পায় ধোন, নালন ফকির জায় কোয়েঃ।।

২১৬ নং

হায় কি কলের ঘরখানি বেন্দে [বেঁধে] তাতে বিরাজ করেন সাঁই আমার ঃ। তোরা দেখ্‌পি জদি সে কুদরতি দেল দোরিয়ার খবর কর ঃ। জলের জোড়া সকল শে ঘরে, ওগো খুঁটির গোড়া সর্ন্যের [শূন্যের] উপর, কি সন্দি কৈরে সন্নভরে ৪ চারি জুগে আছে অধর ঃ।। তিল পরিমান জায়গা বলা জায়, ওগো সত সত কুটরি কোটা তায়, তার নিচে উপার ৯টী দুয়ার ৯ ভাবে শে দিচ্ছে বার ঃ।। ঘরের মালেক আছে বর্ত্তমান একেজোন ঃ তারে দেখলি (না) রে দেখপী আর কখোন, ছিরাজ সাই কয় নালন তোমায় বোলবো কি সাইর কৃতি [কীর্তি] আর ঃ।।

২১৭ নং

আমারে কি রেকবেন গুরু চরনদাশী ঃ। ইতরপানা কায্য আমার অহোরনিশী ঃ।। জটোরো জন্ত্রনা পেএ এলেম জে করারো দিএ রৈলাম তা সবো ভুলিয়ে ভবে আশী ঃ। চিনলাম না শে গুরু কি ধন জেনলাম না তার শেবা সাধন, ঘুরতে বুজি হলো ও মোন ঃ ৮৪ আশী ঃ।। গুরু থাকেন সদয় সমন বলে তার কিশের ভয়, নালন বলে মন তুই আমায় কোল্লী দুশী [দোষী] ঃ।

২১৮ নং

মন আমার তুই কল্লি একি ইতোরপানা ঃ।। দুগ্‌দেতে জমনো [যেমন] রে তোর মিশলো চোনা ঃ।। শুদ্দরাগে থেকতে জদি হাতে পেতে অটল নিধি, বলি মন তাই নিরোবধি বাগ মানে না ঃ।। কি বৈদ্গিী [বৈদিকে] ঘিরলো রিদয়, হলো না শুরাগের উদয়, নওন থাকিতে সদায় হোলি কানা ঃ।। বাপের ধন তোর খেলো সর্প্পে, রাগ চক্ষু নাই দেখপী কবে নালন বলে হিসাব কালে জাবে জানা ঃ।

২১৯ নং

এনে মহাজোনের ধোন [মহাজনের ধন] বিনাষ কল্লি ক্ষেপা ঃ।। সর্দ্দ বাকির দায় জাবি জমলায় [যমালয়], হবে রে কপালে দায়মাল ছাপা ঃ।। কৃতি কর্ম্মা [কীর্ত্তিকর্ম্মা] শেহি ধনি, অমুল্য মানিকো মনি, করিল কৃপা, তোরে করিলো কৃপা, শে ধোনো এখন, হারালি রে মন, এমন তোর কপাল বদওফা ঃ।। আনন্দ বাজারে এলে, বেপারের [ব্যাপার] কোরবো বোলে, এখন সর্ন [সারল/শূন্য] শে দফা, কুসঙ্গেরি সঙ্গে মজে কুরঙ্গে হাতের তির হারিএ, হলি ক্ষেপা ঃ।। দেখলি নে মুল বস্তু ধুড়ে ঃ কাটের মালা নেড়ে চেড়ে, মিছে নাম জপা, নালন ফকির কয় কি হবে উপাই [উপায়] বৈদিগে রইলো জ্ঞানচক্ষু ঝাপা ঃ।।

২২০ নং

ডাকরে মন আমার হক নাম আল্লা বলে ঃ।। ভেবে বুজে দেখ [দেখ] সকলি না হব হক মোর আল্লার নামটী তাও ভুলিলে ঃ।। ভরোসা নাই এ জেনদাগী, জমন পদ্দ পাতার পানি, পড়বে টলে ঃ।। ভবেরো ভাই বন্ধু জারা, বিপদো দেখিলে তারা পালাবে ফেলে, কায় প্রাণেতে ভাই, আখের শুপদ নাই, ক্ষেনেক পক্ষ জমন থাকে ব্রক্ষ [বৃক্ষ] ডালে ঃ।। অকাজে দিন হলো রে সাম, কখোন নেবা সেই মধুর নাম, বাজার ভাঙ্গীলে ও প্রম বাজার ভাঙ্গীলে, পেএছিলে মন দুল্লভ জনম নালন কয় এ জনম জায় বিফলে ঃ।।

২২১ নং

একবার চাঁদ বদোনে বলো রে সাই।। বান্দার এক দোমের ভরোশা নাই ঃ।। কি হিন্দু কি জোবানের বালা ঃ পথের পথিক চিনে ধরো এই বেলা, পীছে কাল সমন, আছে সদক্ষন ঃ কোন দিন বিপথ্য ঘটাবে ভাই ঃ।। আমার বিষয় আমার বাড়িঘর, সদায় এই রবে দিন গেলো রে আমার, বিষয় বিষ খাবা, শে ধন হারাবা, শেশে কেন্দেলে [কাঁদলে] কিয়ার সনবে [শুনবে] তাই ঃ।। নিকটে থাকিতে রে সে ধন, বিশয় চঞ্চলাতে খুঁজলে না এখন, অধিন নালন কয় এধন কোথা রয় আখের খালি হাতে সবাই জাই ঃ।।

২২২ নং

চাঁদ ধরা ফাঁদ জানো না মন ঃ। নেহাজ নাই তোমার, নাচানাচি সার এবার নাব [লাফ] দিয়ে চাও ধরতে গগন ঃ।। সামান্যে রশে তার গন্ত পাবে কে কিবল প্রমো রশের রসিক শে, ওশে প্রম কেমন, করো নিরাপন, প্রমের সন্দি জেনে থাকো চেতন ঃ।। ভক্তী পাত্র আগে করো রে নিন্নয় মুকতি দাতা এশে জথা বারাম দেয়, নৈলে হবে না প্রম উপাসোনা মিছে জল বেড়িএ হবে মরন ঃ।। মুকতি দাতা আছে নওনের অজান, ভক্তীপাত্র সিড়ি দেখো বর্ত্তমান, মুখে দিন২ [দ্বিন] বল সিড়ি ধরে চল সিড়ি ছেড়লে ফাকে পোড়বি নালন ঃ।।

২২৩ নং

কাল কাটালাম কালের বশে ঃ। এবার জৈবন কাল কামে চিত্র [চিত্ত?] কাল মন রে (কোন) কালে আর হোবি দিশে ঃ।। জৈবন কালের কালে রঙ্গে দিলি মন দিনে দিন হারালি পীতৃধোন, গেলো রোবির জোর আখি হলো ঘোর কোনদিন ঘিরবে মহাকাল এশে ঃ।। জাদের সঙ্গে সঙ্গে রলি চিরোকাল, কালাকালে তারাই হবে কাল, মন রে জান না কার কি গুনপানা ধনির ধোন গেলো সব ইন্দ্রবশে [ইন্দ্রিয় বাসনাতে] ঃ।। বাদি ভেদী বিবাদী সবায়, সাধন সিদ্দী করিতে না দেয়, নাটের গুরু হয় নালষ মহাশয়, ডুরি দেওরে নালন লোবলালোশে [লোভ লালসায়] ঃ।।

২২৪ নং

চাঁদ বলে চাঁদ কান্দে কেনে ঃ।। আমার গৌরচাঁদ ত্রী জগোতের চাঁদ চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ অভরনে ঃ।। গৌরচাঁদে সামচাঁদেরো আভা কোটীচন্দ্র জিনিএ শোভা ঃ রূপে মনরি [মুনির] মনঃ করে আকারসোন, খুদা সান্তো সুধা বোরিশোনে ঃ।। গোলোকিরি চাঁদ গোকুলেরি চাঁদ নদিযায় গৌরাঙ্গ সেহি পূর্ণচাঁদ ঃ আর কি আছে চাঁদ শেয়ার কেমন চাঁদ আমার ঐ ভাবনা মনে ঃ।। লোয়েছি গলে এই গৌরচাঁদের ফান্দ, আবার সুনি আছে পরমচাঁদ থাক শে চাঁদের গুন কেন্দে কয় নালন আমার নাই উপায় চাঁদ গৌর বিনে ঃ।।

২২৭ নং

আমার মন চোরারে কোতা পাই।। কোতা জাই মন আজ কিসে বুজাই।। নিষ্কল ছিলাম ঘরে কি বা রূপ নয়নে মন তোমার ধোজ্য নাই ও প্রন (তোমার) ধজ্য [ধৈর্য] নাই, ওশে চাঁদ বটে কি মনুস [মানুষ] আমি দেখে হোইলাম বেহুস আর থেকে থেকে মনে পড়ে তাই।। বেসম রাগে আমাএ খেলে বিস উটীল ব্রহ্মমুলে কি মন্ত্রে এই বিস নাবাই সে বিস গটরি করা না জাএ হরা এশে, কি করিবে কবিরাজ জোই [যোগী]।। মন বুজে ধোন দিতে পারে কে আছে ভব নগরে আমি কার কাছে গে [গিয়া] প্রন জুড়াই জদি গুরু দওামএ [দয়াময়] ও আন [আনল] নিবাই অধিন নালন বলে শেই বল উপাই।।

২২৮ নং

কৃষ্ণ পদ্দের কতা [কথা] কর রে দিশে।। রাধাকান্তি পদ্দের উদাই হএ মাশে।। না জেনে শেই জোগ নিরাপন রসীক নাম ধরে শে কেমন অসমাএ [অসময়ে] চাস কোরিলে তখন কৃসী হএ কিশে।। সামান্য বিচার কর বিসাশে লোইএ ধর অমুল ফুল পেতে পার তাহে অনাশে [অনায়াসে]।। শেন্তে [শুনতে] নাই আন্দাজি কতা বর্ত্তমানে জান হেতা নালন কএ শে জর্ম [জন্ম] লতা দেখ বেহিশে [বে-হিসাবী] ঃ।।

২২৮ নং (খ)

জেনি গে জা গুরুর দারে জ্ঞেন উপাসোনা।। কোন মানুশের কেমন কৃতি জাবেরে জানা।। জার আশাএ জগত বিহাল [বেহাল] তার কি আছে সকাল বৈকাল তিলক মন্ত্র না দিলে জল ব্রহ্মাণ্ড (ব্রেমাণ্ড) রএ না।। পুরূস পরস মনি কালাকাল তার কিশে জানি জল দিএ সব চাতকিনি করে শান্তানা [সান্ত্বনা]।। বেদ বিদর [বিধির] অগোচর সদাএ কৃষ্ণপদ্দ নিত্তে [নিত্য] উদাএ [উদয়] নালন বলে মনের দিদাএ [দ্বিধায়] কেউ দেখেও দেখে না।।

২২৯ নং

সে করন সিদ্দি করা সামান্যে কি হএ॥ গরল হৌতে শুদা [সুধা] নিতে আর্তোশে [আতসে] প্রন জাএ॥ সাপার কাছে নাচাএ বেঙ্গা সে বড় আজব রোঙ্গা রোসীক জদি হএ শে খোঙ্গা ওমিনি ধোরে খাএ॥ ধোর্নতরির [ধন্বন্তরির] গুন সিখিলে তাকী মানে রূপের কালে শে গুন তার উলটীএ ফেলে মস্তকে ডংসাএ [দংশায়]॥ একাতো [একান্ত] জে ওনুরাগী জেন্তে মরা ভও [ভয়/ভক্ত] তেগী নালন কএ রসীক জোগী আমার কাজ্য নএ [নয়]॥

২৩০ নং

না জেনে করন কারন কতাএ কি হবে [হয় রে]॥ কতাএ জদি ফলে কৃসী [কৃষি] তবে বিচ কেনে রপেঃ গুড় বর্লে কি মুক মিট [মিষ্ট] হএ [হয়] দিব না জের্লে [জ্বালিলে] আদার [আধার] কি জাএ তমনি জান হোরি বলাএ হোরি কি পাবে॥ রাজায় পউরাস করে জমির কর বাচে না শে রে সেই কি তোর একরারি কাজ্যরে [কার্যরে] পউরাশে [পৌরুষ] ছাড়িবে॥ গুরু ধর খোদ কে চেন সাই আএন আমলে আন নালন বলে তবে মন সাই তোরে লিবে॥

২৩১ নং

জান রে মন শেই রাগের করন॥ জাতে কৃষ্ণবর্ণ হোল গোউর বরন॥ সত কটী গপীর সঙ্গে কৃঙ্গ প্রম রসরঙ্গে ওশে টলের কাজ্য নাএ অটল বলাএ শেই বা কেমন॥ রাধাতে কি ভাব কৃষ্ণ সে কিভাবে বস [বশ] গপীকারো এবার শেব [সেবা] না জেনে শেঙ্গ [সঙ্গ] কেমনে কোরিবে কোন জোন স্যাম [শ্যাম] রশের উপাশোনা না জানিলে রশীক হএ না নালন বলে সে জে নিগুড় করন ব্রজের অকৈতব ধোন॥

২৩২ নং

তিনদিনের তিন মরম জেনে॥ রসীক সাদনে ধরে তা একদিনে॥ অকৌতব শে ভেদের কতা কোইতে মরমের লাগে বেতা [ব্যথা] না কৌলে [কহিলে] জিবেরো নাহিক নিস্তার কএ [কই] শেই জোর্নে [জন্যে]॥ তিন শো সাট রসের মাজার [মাঝার] তিন রস গন্য হএ রশীকার সাদীলে শে করন এড়াইবে সমন এ ভুবানে॥ আমাবস্যা প্রিতিবত [প্রতিপদ] দুতিয়ার প্রতম [দ্বিতীয়ার প্রথম] শেতো অধিন নালন বলে তাই কার আগমন শেহি জোগের সোনে [সনে]॥

২৩৩ নং

গৌর প্রম অথাই [অথৈ] আমি ঝাপ দিএছি তাই॥ এখন আমার প্রন বাচা করি কি উপাই॥ ইন্দ্রোবারি সাশিত কোরে উজন ভাটা বইতে পারে সে ভাব আমার নাই অন্ত্রে [অন্তরে] কোট সাদী [সাধি] কতাই [কথাই]॥ একে শে প্রমনদীর জলে মেলে না নঙ্গড় ফেলে বেহুসারি নাইতে গেলে কাম কুভিরে [কুমীরে] খাএ॥ গোউর প্রেমের এমনি নেটা [ল্যাঠা] এতে বাটা জেতে বাটা না বুজিএ মুড়াএ মতা [মাথা] অধিন নালন ভাবে তাই॥

২৩৪ নং

শুৰ্দ্দ [শুদ্ধ] প্রমে রাগে সদাএ থাক রে আমার মন।। শোতে [স্রোতে] গাও ডালান দিও না রাগে বেএ জা ওজন [উজান]।। নিবারিএ মদন জালা [জ্বালা] ওহিমুণ্ডে কোরি গে খেলা উভাই নিহার উর্দ্দু [উর্ধ্ব] তালা প্রমের এই লোখন।। একটী সপের [সর্পের] দুটী ফোনি দোমুখে কামড়ান তিনি প্রমবানে বিকরমে তার সোনে দেও রোনা।। মহারস মুদিত কোমলে প্রম ছিঙ্গারে [শৃঙ্গারে] ন্যেও রে খুলে আপ্ত সামলে সেই রোনকালে কএ ফকির নালন।।

২৩৫ নং

ভজো মরশীদের কদম এই বেলা ঃ। ওগো চার পেয়ালায় রিদ [হৃদ] কমলায় ক্রমে হবে উৰ্জ্জালা ঃ।। নবিজির খান্দানেতে পেয়ালা চারিমতে জেনে নেও দিন থাকিতে ওরে আমার মন ভোলা ঃ।। কোতা আবহায়াত নদি, ধারা বয় নিরোবধি, ধর সেই ধারা জদি দেখবি অটালের খেলা ঃ।। এ পারে কে আনিল ওপার কে নেবে বলো, নালন কয় তারে ভোলো, কেনে রে কৈরে হেলা ঃ।।

২৩৬ নং

সহরে ১৬ জোনা বোমবেটে ঃ।। করিএ পাগোলপারা নিলে তারা নিলে তারা সব লুটে ঃ।। পাঁচজোনা ধনি ছিল তারা সব ফোতুর হলো কারবারে ভঙ্গ দিলো, কখোন জেনি জায় উটে ঃ।। রায্যস্বর [রাজস্বর/রাজ্যেশ্বর] রাজা জিনি চোরেরো সিরোমনি নালিষ কোরিবো আমি কোনখানে কার নিকটে ঃ।। গেলো ধোন মালো নামায় খালি ঘর দেখি জমায় নালন কয় খাজনারি দায় তাও কবে জাবে লাটে ঃ।।

২৩৮ নং

নজোর একদিগ গেলে আর দিগে অন্দকার হয় ঃ।। নুরে নরে দুটী নেহার কেমনে ঠিক রাখা জায় ঃ।। আইন জারি জগোত জোড়া শেজদা হারাম খোদা ছাড়া, মরশীদ বরজোগ ছামনে বেড়া কোথা থুই সেজদার সমায় ঃ। সোগোল রাবেতা বলে বরজোখ লেখে দলিলে কারে রাখি কারে ফেলে একে মনে দুই কৈ দাড়ায় ঃ।। বেলাএতের হলে বিচার ঘুচে জেতো ঘোর অন্দকার নালন ভেড়ো এধার ওধার দোধারাতে খাবি খায় ঃ।।

২৩৯ নং

আমার চরকা ভাঙ্গা টেকো আড়া নে ঃ। আমি টিপে শোজা কোরবো কতো আর তো বাচিনে ঃ।। একটা আটী আরাকটা খশে, বেতো চরকা লয়ে জাবো কোন দেশে, আর কতোকাল জলবো [জ্বলবো] এ হাল, এ বাতো চরকার গুনে ঃ।। কিবা ছতার [ছুতার] বেটার গুন পরিপাটী, ওগো ষোলকলে ঘুরায় টেকোটী তার একটি কলে বিকল হলে, শেরতে [সারিতে] পারে কোন জনে ঃ। সামান্য কাট পাটের চরকা নয়, জে খযলে খুটেখেটে আটা জায় মানব দেহো চরকা শেহো নালন কি তার ভেদ জানে ঃ।।

২৪০ নং

মন এখন মিছে ভেবলে [ভাবলে] কি ফল হয় ঃ। জা লেখেছে ক্রীতিকর্মা সে কলম আর কে ফিরায় ঃ।। কেউ বজরা সুলুক চালায় সর্বদা কেউ চালাচ্যে গুজা বাট্টী লা [নাও], পূর্বকালে জে জা পেলে, তাই পেএছো সে শোমায় ঃ।। কোট্না গাড়ি যুড়ে গোরুর হাল ঠেলতে কারু গেলো জন্মকাল, সকলীতো পূর্ব্বের খোচা ভেবে দেখো এবের নয় ঃ।।

২৪১ নং

চাড্ডি চন্দ্র ভাবের ভুবনে ঃ। ও তার দুটী চন্দ্র প্রকাশ্য হয় তাই জানে অনেব জোনে ঃ।। জে জানে শে চন্দ্র ভেদ কথা, বলবো কি তার ভক্তীর ক্ষেমতা শে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্যসোন [অন্বেষণ] জে চাদ না কেউ পায় গুনে ঃ।। একচন্দ্রে ৪ চন্দ্র মিশে রয়, ক্ষেনেকে২ বিভিন্ন রূপ হয়, ওশে মনিকোটার খবর জেনলে সকল খবর সেই জানে ঃ।। ধরতেমুল চন্দ্র কোন জোন গরল চন্দ্রের করো অন্যশোন, দরবেশ সাই কয় দেখ রে নালন বিস্মৃত [বিষামৃতে] মিলনে ঃ।।

২৪২ নং

সদয় মনের মানুষ খেলচে দিদলে ঃ।। জমন সওদা-মীনি মেঘের কোলে ঃ। ওশে রূপ নিরাপন হবে জখোন, মানুষ ধরা জাবে তখন সাপল [সফল] হবে রূপ দেখিলে ঃ।। আগে না জেনে সে দল উপাসোনা আন্দাজী কি হয় সাধনা, মিছে ঘুরে মরা গোলেমালে ঃ।। ও শে মানুষ চিনলো জারা পরম মহাত্ত্য তারা, অধিন (নালন) কয় দেখ নওন খুলে ঃ।

২৪৩ নং

জে জোন দেখেছে অটল রূপেরো বেহার ঃ। মুখে বলুক কিবা না বলুক সে থেকলে ঐ নেহার ঃ। নওনে রূপ না দেখতে পায় নামমন্ত্র জপীলে কি হয় নামের তুল্লা [তুল্য] নাম পাওয়া যায় রূপের তুল্লা কার ঃ নেহারায় গোলমালো হলে, পড়বি মন কুজনের ভোলে, আখের গুরু বলে ধরবি কারে; তরঙ্গ মাজার ঃ। স্বরূপ রূপে রূপের ভেলা, ত্রীজগতে করচে খেলা, অধিন নালন বলে মন রে ভোলা, কোলে ঘোর তোমায় ঃ।

২৪৪ নং

মন রে দিনের ভাব জেই ধারা, সনলে [শুনলে] রে জিবন ওমনি হয় সারা ঃ।। ওশে মরার সঙ্গে মরে, ভাবেরো স্বাগোরে [সাগরে] ডুবতে জদি পারে সাভাবিক তারা ঃ।। অগ্নী ঢাকা জৈছে ভস্মেরো ভিতোরে শুধা তন্নী আছে গরলে হল করা ও কেউ শুধার লোভে জেএ মরে গরল খেয়ে মনথোনে [মন্থনে] সুতারো [সুতাক] না জানে জারা ঃ। দুগ্ধে লনিতে মিলন সর্বদা মনথোন ডণ্ডে [দণ্ডে] করে আলাদা২ মন রে তন্নী ভাবের ভাবে সুধা নিধি পাবে মখের [মুখের] কথা নয় রে সে ভাবো করা ঃ। জে স্তনেতে দুগদু খাএ রে সিসু ছেলে, জোখের মখে শেথা রকতো এশে মেলে অধিন নালন ভেবে বলে বিচারো করিলে কুরশে শুরশো মেলে সেই ধারা ঃ।।

চান্দ্র চন্দ্র ভাবের ভুবনে:। ও তার দুটী চন্দ্র প্রকাশ্য হয়—
তাই জানে অনেক লোনে:। জেজানে শে—চন্দ্র ভেদ কথা
বনবো কিভার ভক্তীর ক্ষেমতা শোপাদ করে পায় চাঁদ
অন্য শোন জে চাঁদ নাকেও পায় শুনে:।। এক চন্দ্রে ৪ চন্দ্রা মিশে
রয় ক্রমেক২ বিভিন্য রূপ হয় ওশে মানি লো তার খবর—
জেনে নে সকল খবর সই জানে:।। ঐ বকে মুল চন্দ্র কোন লে
গরল চন্দ্রের বরো অন্য শোন নেবেশ সাইকয় দেখরে নান:
বিসিন্ধু তে মিলনে:।।

২৪৫ নং

দিনের ভাব জে দিন উদয় হবেঃ সেই দিন তোর ঘোর অন্দকার ঘুচে জাবে এএএ ঃ।। মনিহারা ফনির মতোন ঃ তেমতি ভাব রাগের করন ঃ অরুন বশোন ধারন বিভুতি ভুশান লবে ঃ।।

ভাব সর্ন্ন [শূন্য] রিদয় মাজার মুখে পড়ো কালাম আল্লার তাই তে কি মন হোবি তারন ভেবেছো এবার, অঙ্গে ধারন কর বেহাল রিদয় জালো প্রেমের মশাল দুনওন হোইবে উজ্জল মরশীদ বস্তু দেখতে পাবে ঃ।। হাদিচি লেখেছে প্রমান আপনার আপনি গে জান কিরূপে সে কোথায় থেকে কহিছে জোবান, নাকল্যে [কর্লে] মন সে শব দিশে তোরিকের মুঞ্জীলে বশে তিনে তিন আছে মিশে ভাবক হলে জেন্তে পাবে ঃ।।

একের জুতে তিনটি লক্ষণ, তিনের ঘরে আছে রে ধোন ঃ তিনের মরমো সাধিলে হয় রূপ দরোশোন শাই ছেরাজের হকের চরন ভেবে কহে ফকির নালন কথায় কি তার হয় আচরন খাটী হও মন দিনের ভেবে ঃ।।

২৪৬ নং

সরূপ [স্বরূপ] রূপে নওন দেরে ঃ। দেখপী রূপেরো রূপ কেমন শে রূপ ঝলক মারে ঃ।। সরূপ বিনে রূপকে দেখা, সেত কিবল মির্থে [মিথ্যে] ধোকা সাদোকেরো লেখাজোখা সরূপ সর্ত্ত [সত্য] সাধন দারে ঃ। অবতার অবতারি, দুইরূপে জুগোল তারি, তাহে রূপ চড়ন্দারি রূপেরো রূপ বলি জারে ঃ।। সন্ন [স্বর্ণ] ধামের ধজা সরূপ তারে আইজ ভাবিএ কুরূপ ছেরাজ সাই বলে রে রূপ সাধবি নালন কেমন কৈরে ঃ।।

২৪৭ নং

আমি জে অপরাধি ঃ আমার অপরাদ হয় না ক্ষমা হে দিনদয়াময় দয়ার নিধি ঃ জারো আছে মন পারেরো কড়ি পারে জেতে ক্ষনেক তার নাহি দেরি, ভক্তিবিহিন করি স্তুতি মিনতি করি কোন গুনে পার করবে অধিপতি ঃ নাম সনেছি তোমার পতিত পাবন ঃ পতিত জোনার জীবনের জীবন ঃ নামের জানাও মহিমা পাপির করো পাপ ক্ষেমা অগতিরো ঘুচাও দুর্গতি ঃ নিরপক্ষ নহে আছে পক্ষ বাদ বাদি প্রিতিবাদি [প্রতিবাদী] আছে একসাত আমি জাব বলে ডানি হাতে দেয় সে হানি সিতু বলে নালন সাই জদি দেয় উপাধি ঃ।।

২৪৮ নং

ও সে রূপে দারে অটল রূপ বেহারে চেএ দেখ না তোরা ঃ।। ফনি মনি জিনি রূপেরো বাখানি, দুইরূপে আছে সেই রূপ হল করা ঃ।। জে জোন অনুরাগী হয় রাগের দেশে জায় রাগের তালা খুলে শে রূপ দেখতে পায়, সুদ্দ [শুদ্ধ] রাগেরি করন বিধি বিস্মরন নিথ্য [নিত্য] নিলের উপর রাগ নেহারা ঃ।। ওশে অটল রূপ সাই ভেবে দেখো তাই সে রূপের কভু নিলে নিত্য নাই, জে জোন পঞ্চতর্ত্ত [তত্ত্ব] জজে নিলে রূপে মজে, শে কি জানে অটল রূপ কি ধারা ঃ।। আছে রূপের দরোজার ছিরূপ [শ্রীরূপ] মহাশয় রূপের তালা ছোড়ান তার হাতে সদায় আগে ছিরূপ গতো হবে তালার ছোড়ান পাবে নালন বলে অধার ধরবে তারা ঃ।।

২৪৯ নং গোষ্ঠ

বনে এসে হারালাম কানাই ঃ।। জেএ কি বোল বোলবো জশোদারে ঃ ভেবে উপাই নাই ঃ।। খেললেম সবে নুকানুকি আবার হলো দেখাদেখি ঃ মোদের কানাই গেল কোন মুল্লুকী খুজে নাহি পাই ঃ।। ছিদাম বলে নিবো খুজে, পলাবে কোন বোন মাজে [মাঝে], দাদা বলাই বলে আর বুজি শে দেখা দেয় না ভাই ঃ।। সুবল বলে পলো [পড়িল] মনে, বলেছিল একোদিনে, কানাই জাবে গোপ্ত বৃন্দাবোনে, গেলেন বুজি তাই ঃ।।

২৫০ নং গোষ্ঠ

সকালে জাই ধেনু লএ ঃ।। এ বোনেতে ভয় আছে ভাই মা আমাএ দিয়েছে কোয়ে [কহে] ঃ।। আজকোর খেলা এই অবধি গোচারে ভাই ধেনু আদি, প্রানে বেচে থাকো জদি কাল আবার খেলো আশীয়ে ঃ। নিত্য২ বোন ছাড়ি, সকালে জাইতাম বাড়ি, আইজ আমাদের দেখে দেরি মা আছে পত [পথ] পানে চেয়ে ঃ।। বলেছিল মা জশোদে কাঁনাই দিলাম বলাইর হাতে, ভালোমন্দ হলে তাতে কি বলিবো তারে জেয়ে ঃ।।

২৫১ নং ভেকের গাহান

কে তোমায় এ বেস ভুসোন [বেশভূষণ] সাজাইলে বল সনি [শুনি] ঃ।। জেন্দা দেহে মোরদার বেষ খেলকা তাজা ডোর কোপীনি [কৌপীন] ঃ।। জেন্তে মরার পোশাক করা আপন ছরাদ [শ্রাদ্ধ] আপ্নী সারা, ভবোলোক ভয়ংকারা দেখে অসমভাব কোরনি ঃ।। মরনেরো আগে মরে শোমনে [সমনে] ছোবে না তারে, সনেচি সাধুর দারে তাই বুজি কোরেছো ধনি ঃ।। সেজেছে সাজ ভালই তোরে, মোরে [মরে] জদি ডুবতে পারো নালন কয় জদি ফেরো দুকুল হবে অপমানি ঃ।।

২৫২ (খ)

আমি একদিনো [দিন] না দেখিলাম তারে ঃ। আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর এক পরশী বসত করে ঃ।। সেই গ্রাম বেড়ে অঘাত [অগাধ] পানি নাই কেন্নারা নাই তোরোনি পারে, মনে বাঞ্ছা করি দেখপো তারি কমনে সে গায় [গাঁয়ে] জাই রে ঃ।। বলবো কি পরসীর কথা তার হস্তপদো কন্দ [স্কন্ধ] মাতা [মাথা] নাইরে ও সে ক্ষেনেক থাকে সর্নর [শূন্যের] উপার, আবার ক্ষেনেক ভাশে নিরে ঃ।। পরশী জদি আমায় ছুতো জোম [জম] জাতানা সকল জেতো দুরে সেয়ার [আর] নালন এক্ষানে [একখানে] রয় থাকে লক্ষ জোজোন [যোজন] ফাক রে ঃ।।

২৫৩ নং

দেখপী জদি সোনার মানুষ দেখে জারে মন পাগেলা ঃ।। অষ্টঙ্গ গোলাপী বর্ন্ন [বর্ণ] পুর্ন্ন [পূর্ণ/পুণ্য] কায়া সোলোকলা ঃ।। মওরির [ময়ূরীর] কেষ ফিঙ্গেরি নাক, দেখপী জদি তাকিএ দেখ ঐ রূপ দেখে চুব মেরে থাক বংশোহিন তার হংশো গলা ঃ।। দুটী উরোত [উরূ তো] কলারি বোগ, সিঙ্গ মাজা দেখি কিবল, তাহাতে রএছে জুগোল অনাদী কালা, বুক্কো স্থলে চাঁদের ছাটা নাভি মুলে ঘোরে লেটা দুটী বাহু বেলন কাটা দুটী হস্ত জবাফুলা ঃ। জে দেখে শে মহাজোগী সেইতি...।

২৫৪ নং ১৩০৩, ২৯ শ্রাবণ

পড় পড়ো রে নামাজ ভেদ বুজে শুজে।
বরজগ ঠিক না হইলে মন নামাজ হয় মিছে॥
ছুন্নত ফরজ আর রেয়াকত গোনা॥
ওক্তের নাম তার সাতে আনা। এ সব সোনা পড়ায়
বরজগ ঠিক দাড়ায় কি শে

২৫৪ (খ)

ভজনের নিগুঢ় কথা জাতে আছে ঃ।। ব্রেহ্মার [ব্রহ্মার] বেদ ছাড়া ভেদ বিধান শে জে ঃ।। চার বেদে দেখ নিরাপন অষ্টবেদ বস্তুর কারন, জেনতে পারে রসিক শুজন, আর ঠাই মিশে॥ নিরে নিরাঞ্জন আমার আদ নিলে করে প্রচার, হলে আপন জন্মের বিচার সব জানে শে ঃ॥ সাই ভজন হেতু শুর্ন [শূন্য] ঐ পদে করি গন্য নালন কয় ধন্য২ জে তাই খোজে ঃ।।

২৫৬ নং

কি কারখানা দেখে আলাম দোম ঘরে ঃ। একজন বসে কল টানে তার আরাক জোন গটন করে ঃ। সনি শুতাল ভুতাল লমপটে লাভি কন্টা নলাটে ৬ রিপু আছে ঘটে জে জখোন ওশাষ [হুসহাস] করে, সাধুর বচনে শুনি অগ্নীর ভিতোরে পানি হায়া বয় দিন রজোনি ছিস্টী [সৃস্টি] হয় আত্যশের জোরে ঃ॥ ও শে দুনাল মিরনাল করনালে, শুকনালে হাওা [হাওয়া] চলে পশুর মতোর তাদের গটন ৪ চারিতে এক রংধায় ৪ নালে ৪ ধারা বয় সাধক তাই খুজে লয় কশীতে ভাব জানা জায় জে জতো উড়িতে পারে ঃ। জেখানে হাওার গোড়া ত্রীভুবনের মল [মূল] গোড়া পংকো জলে আছে খাড়া খুজে দেখ অন্তষপুরে, জেখানে হচ্চে রে ঝড় উড়িছে মটখারো খড় পাতালে রয়েছে জড় সহজ মানুষ চলে ফেরে ঃ। শুনি হাওায় [হাওয়ায়] জুতি তিন তার বয় তিন তারে বেগ ওজোন [উজান] ধায় গুনারি সব সারি গায় তার উপরে স্বরূপ বাজায় [বাজার] জেখানে হাওারি ঘর সেইখানে মন মনুহর [মনোহর] তার ওপার রূপ সবোবর গোপাল চাদের মনহরে ঃ।

২৫৭ নং

অজুদে ছিনা কতো কৈরে কালমা ছাবেদ কৈ গে জারে ঃ। কালমা ছাবেদ না হৈইলে রাছুল ছাবেদ তবে হবে না রে ঃ; এএএ ঃ। চেয়ে দেখোরে মন এই অযুদে আলেফ হে আর মিম দালেতে, আহামদ নাম লেখা তাতে ও তাই জেন্তে হবে মুরশীদ ধরে ঃ। আগে ২৪ হরফ করো সন্দি তবে দেখতে পাবে লকসাবন্দি [নক্সাবন্দী], তাই দেখিলে হয় বন্দিগী, ও সেই আলেক ফন্দি বুজতে পারে ঃ। কোরানেতে আছে প্রমান, আলাছুয়া তেহি কালাম তাই দেখে ফেরেস্তা তামাম ওরে আদমকে ছালাম করে ঃ এএএ ঃ। কালমা মুনছুর হাল্লাজ দেখেছিল দেখে এস্কেতে মশগুল হলো, তাইতে আনল হুকো [আইনাল হক] ফুকারিলো দরবেষ নালন সাই কয় বলাই কৈ তোরে ॥

২৫৯ নং

মনো রে অধর চাদেরে অধরে অধার দিএ ঃ। খিরদ [ক্ষীরোদ] মৈথনের ধারা রসিক নাগরা, জে রূপেতে অধর ধরা দেখ রে সচেন [সচেতন] হএ ঃ।। কারন বারির মদ্দে সেই ফুটে যে ফুল অচিন দলে চাদ চকরা [চকোর] তাহে খেলে প্রেমোবান প্রকাশিএ ঃ।। নিত্ত [নিত্য] ভেবে নিত্ত থেঁকো নিলে বাশে জেইয়ো নাকো, শে দেশেতে মহাপ্রলয় মাএতে পুত্র ধরি খায়, ভেবে বুজে দেক মনুরায় সে দেশে তোর কাজ কি জেএ ঃ।। ঐ পঞ্চবানের ছিলে কেটে প্রেমে সাদ [সাধ] সরূপের হাটে, ছেরাজ সাই বলে রে নালন বোইদিক বানে কোরিয নে রোন বান হারিএ পড়বি তখন রোন খোলাতে হুবড়ি খেএ ঃ।।

২৫৯ (খ)

যদি উজান বাঁকে তুলোশী ধায় ঃ।। খাঁটি তার পূজা বটে চরণ চাঁদ পায় ঃ।। তুলসী দেয় যত, ভাটিএ জাএ ততো, কোথায় শে অটল পদো, তুলসী কোথায় ঃ।। তুলসী এই জলে, উজাবে কোন কালে, মন তুলোসী হইলে, অবস্য হয় ঃ।। প্রেমের ঘাটে বশী [বসি], ভাশায় মন তুলোশী, নালন কয় তার দাশী লেখে খাতায় ঃ।।

২৬০ নং

আমার হাল বোয়ে কাল গেলো ঃ।। চিরোদিন দিইনে কামাই সার ভাবি তাই আবাদ কোরতে দিন ফুরাইল ঃ।। সর্বদায় ঐ ভাবনা নিসিতে নিদ্রা হয় না আজ দেখি বাদলা জায় না আবাদ হয় না ওরে নাবলা পড়ে গেলো ঃ জেদিন মঙ্গলবারে আমাবস্বে, আমার সে ও দিনে থাকে না দিশে, একদিনেও থাকি নে বশে, জোয়ালের ঘাট কান্দে পলো ঃ।। শ্রেবনা জর্মদিনে সেও দিন আমি মানি নে কারূ কথা শুনিনে মনে মনে ঃ ওরে ভাই বেড়াই বেছন [বিছন] বুনে ঃ আমাবতি [অম্বুবাচী] ঃ নাঙ্গল বহি জায়না কোনো জোনে ঃ আমি সেই দিন করি আবাদ ভারি ঃ কুকরো বালি কাকড়ি হলো ঃ।। ছিল মোর দুটী এড়ে একটী তার জর্ম [জন্ম] কুড়ে শেএড়ে আসন গোড়ে [আসন গেড়ে] নেজডি [লেজটি] বেড়ে গোহাইল [গোহাল] জুড়ে হুক্কা মেরে ওরে ভাই থাকে কোনায় পড়ে, নারান বলে ভাব না জেনে মিছে শ্রম হলো, শে এড়ে জমন কল্লা তন্নী হেল্লা অটল পাল্লায় বেন্তে [বান্ধিতে] হলো ঃ।।

২৬১ নং

ওরে মন চলো২ অন্তপুরে ঃ। অন্তরের অন্তরা চিন্‌লী নে মন তোর বাহিরে কেনে ফিরে২ ঃ।। নবদার পুরি অতি চমতকার, দেখিবি কতো তাহে অদভুতি বেপার, পুরন্দর নামে রাজা আছে তার শুখেতে রাজ্য করে ঃ। মুলোধার পদ্দ অতি চমতকার, ত্রেকোনা কন্নিকা মদ্দী [ত্রিকোণা কর্ণিকা মধ্যে] আছে তার তথায় ত্রীরো [ত্রি] ধারা, ইংঙ্গেলা, পীংঙ্গোলা, শুশমনা [সুষুম্না] নাম ধরে ঃ। মদ্দে অম্বনিম্বু সয়ংভু বিষ্টানি [স্বয়ম্ভু বৈষ্ণবী?], চৈতন্য রূপীনি, মন তার সাতে২ শুসম্মনা পথে জেতে হবে ধিরে২ ঃ।। লিঙ্গমুলেচক্র নাম সাদিষ্টান রিতু পত্র তাহে অদভুতো নির্মন সে চক্র ভেদ করি হোএ সাবধান ওটো গীয়ে মনিপুরে ঃ।। তথায় নিলদপল [নীলোৎপল] শোবে দশম দল, দক্ষীনে বামে নদি করে কলকল তার মদ্দে পত দিয়ে চল২ নিলদপল ভেদ কৈরে ঃ।। কন্দে ধুমাবর্ন বিশীদ্দ অক্ষ্যান [বিশুদ্ধ আখ্যান], সে চক্রভেদ করি করো রে বিশ্রাম লালাটো ভুদ্ধ জুগোল পরে ঃ।। তৎ উর্দ্দেতে [উর্ধ্বেতে] দেখো রিদয় পংক্ষোজ [পঙ্কজ] প্নীতবর্ন বারো দল শে সরত সট [ষট] কোন পরে বাউবিজ [বায়ুবীজ] কল্পতরু নাম ধরে ঃ।। মুলে মনিপীট দেবাদী শুভিত বিচিত্র চণ্ডী মা চামরা [চামর] বিষ্টীৎ [বেষ্টিত] সিব রূপ গুরু তথা দেখ রে নওন ভোরে ঃ।। সটচক্র বলি সবে বলি জাই, বিচিত্র চণ্ডী মা দেখিবি রে তথায়, মনের অন্দকার ঘুচিবে, তোমার জ্যোতির্ময় রূপ হেরে ঃ।।

২৬২ নং

অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার ভজোন সাধন ব্রথা [বৃথা] নবি না চিনে ঃ। ও শে আওল আখের ঃ বাতুন জাহের নবি কখোন কী রূপ ধারন করে কোনখানে ঃ। আছমা (ন) জমী জল আধি [জলাদি] পবন, জে নবিরো নুরে হয় শ্রেজোন ঃ বল কিশে ছিলো শে নবির আশন ঃ নবি পুরুষ কি প্রিকিতি আকার তখোনে ঃ। আল্লা নবি দুটি অবতার গাচ বিচ [গাছ বীজ] রূপে দেখি জে প্রকার ওশে গাছ বড় কি ফলটি বড় লেও জেনে ঃ।। আপ্তুতত্তে ফাজিল জে জোনা জেন্তে পারে নিগুড় কারখানা ঃ ও শে রছুল রূপে প্রকার [প্রকাশ] রব্বানা অধিন নালন বলে ছেরাজ সাঁইক গুনে ঃ।।

২৬৩ নং

পাখি কখোন জানি উড়ে জায় ঃ। বদ হাওা [হাওয়া] লেগে খাচায় ঃ।। খাচার আড়া পলো খোশে, পাখি আর দাড়াবে কিশে, ঐ ভাববনা [ভাবনা] ভাবিচি বশে, চোমক জরা বইচে গায় ঃ।। ভেবে অন্ত নাহি দেখি, কার বা খাচা কেবা পাখি, আমার এই পীঞ্জীরায় থাকি আমারে মজাতে চায় ঃ।। আগে জদি জেতো জানা, জোংলা [জংলা] কভু পোষ মানে না, তবে উহার প্রম করতাম না নালন ফকির কেন্দে কয় ঃ।।

২৬৪ নং

সদা মন থাকোবা হুষ ধ'রো মানুষ জোত নেহারে ঃ।। আএনা আটা রূপের ছাটা চিলে কোটায় ঝলক মারে ঃ।। স্বরূপ রূপে রূপকে জানা ঃ শেই বটে উপাসোনা গাজায় দোম চোড়িয়ে মনা বোমকালি আর বলিও নারে ঃ। বর্ত্তমানে দেখো ধরি, নর দেহে অটল বেহারি, মর কেন হড়িবাঁড় কাটের মালা টিপীয়ে হারে ঃ। দেল ঢুঢ়ে দরবেশ জারা, জোত নেহারে সিদ্দী তারা, নালন কয় আমার খেলা ডাণ্ডাগুলি সার হলো রে ঃ।

২৬৫ নং

একদিনো পারের ভাবনা ভাবলী নারে ঃ। পার হবো হিরের সাকো কেমন কৈরে ঃ। একদোমের ভরোশা নাই কখোন কি করবে রে সাই তখন কার দিবি দোহাই কারাকারে [কারাগারে] ঃ।। বিনে কড়ির সদাই করা, মনে সাইর নাম জপোনা, তাইতে কি অলষ পানা দেখি তোরে ঃ।। ভাসাও ওনুরাগ তোরি মরশীদ বসাও কাণ্ডারি নালন কয় শেই শে পাড়ি জাবে শেরে [সেরে/সে রে] ঃ।।

২৬৭ নং

বল সরূপ কোথায় আমার সাদের [সাধের] প্যারি ঃ।। জার ভাবে হোয়েছি রে ডণ্ডধারী ঃ। কোথা শে নিকুঞ্জ বোন, কোথা জমনা [যমুনা] এখন, কোথা সে গোপীনি গোন আহা মরি ঃ।। রামানন্দের দরোশোনে পুর্ব ভাব উদায় মনে জাই আমি কাহার সোনে সেহি পুরি ঃ।। আর কি সে সঙ্গি পাবো, মনেরো সাদ পুরাবো. পরম আনন্দে রবো ঐ রূপ হেরি ঃ। গৌরচাদ ঐ দিন বলে আকুল হয় তিলে তিলে নালন কয় শেহি নিলে শুমাধরি [সু-মাধুরী] ঃ।

২৬৯ নং

জেন্তে হয় আদম ছফির আর্দ্দ [আদ্য] কথা ঃ। না দেখে আজাজীল শে রূপ গোটলে আদম কি রূপ হেতো ঃ।। আদম শরীরো আমার ভাশাএ বলেছে অধার সাই নিজে, নৈলে কি আদমকে সেজদা ফেরেস্তার (সাজে) ঃ। আনিয়ে জেদ্দার মাটী, গোটলে বোরখা পরিপাটি, মিথ্যা নয় শে কথা খাটী কোন চিজে তার গটলে আর্ত্তা [আত্মা] ঃ।। সে হি জে আদমের ধড়ে অনান্ত কুটরি গোড়ে [গড়ে] মাজখানে হেতনা কল জুড়ে কুঠি করমা বষলে কোথা ঃ। আদমী হলে আদম চেনে ঠিক নাবায় [নামায়/না পায়] শে দেল কোরানে নালন কয় ছেরাজ সাইর গুনে আদম অধার ধরার শুতা [সুতা] ঃ।

২৭০ নং

জেন গে নুরের খবর জাতে নিরঞ্জন ঘেরা ঃ। নুর সেদলে [সাধিলে] সেই নিরাঞ্জনকে জাবে রে ধরা। নুরে নবির জর্ম [জন্ম] হয় নুরে গটলে অটলময় কাঙ্গুরা নুরেতে মোকাম মঞ্জীল উর্জ্জালো করা ঃ। আছে নুরের ছিস্ট [শ্রেষ্ঠ] নুর জানে সদায় সচতুর জিব জারা, জে নুয়ের হেল্লালে [হিল্লোলে] বর্ত্ত হয় নুর জহুরা ঃ নিবলে নুরেরো বাতি এশে ঘিববে কাল দুতি [দূতী/দ্যুতি] মান খানা, নালন বলে থেকবে পড়ে খাকের পীঞ্জীরা ঃ।।

২৭২ নং

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা ঃ আইজ কেমন কৈনে শে চাঁদ ধরবি তোরা ঃ।। লক্ষ লক্ষ চাঁদ কোরেছে শোভা, তার অধার চাঁদেরো আভা, একবার দিষ্ট কৈরে দেখি, ঠিক থাকে না আখি, রূপের কিরনে চমকে পারা ঃ। রূপের গাছে চাঁদের ফল ধরেছে তায়, থেকে থেকে ঝলক দেখা জায় ও শে চাঁদের বাজার দেখে চাঁদ ঘুরানি লেগে দেখিশ্ পাছে হবি জ্ঞানহারাঃ।। আলেফ লামে নামে শহর আজব কুদরতি রেতে উদয় ভানু দিবসে বাতি, জে জোন আলের খবর জানে দিপ্ত হয় নওনে নালন বলে শে চাঁদ দেখেচে তারা ঃ।।

২৭৩ নং

মন কি এহাই ভাবো আল্লা পাবো নবী না চিনেঃ। কারে বলিশ নবি দিশে পালিনেঃ।। জার নুরে হয় আদম পএদা শে নবির তোরিকো জুদা নুরেরো পেয়ালা খোদা দিলেন তারে খোদ অঙ্গ জেনে ঃ।। বিছ [বীজ] মালিক সাই ব্রক্ষ [বৃক্ষ] নবি, দেল ঢুড়িলে জেন্তে পাবি, বলবো কি সেই ব্রক্ষের খুবি তার এক ডালে দিন আর ডালে দোনে ঃ।। চাইর কারের উপরে দেখো রাগ পত্রে শে ছিলো কে গো, জদি পুর্বেপর [পুর্বাপর] তার খবর রাখো তবে জানবি নালন নবির ভেদ মনে ঃ।।

২৭৪ নং

ওগো নবির অঙ্গে জগোত পয়দা হয় ঃ। শেই আকার কি হলো তার কে করে নির্নয় ঃ। আবদুল্লার ঘরে বলো শেই নবির জনমো হলো মল [মূল] দেহে তার কোথা রইলো শুধাবো কোথায় ঃ। কি রূপে নবির জান শে জুক্ত হয় বাপের বিছে আবহাওাত জার নাম লেখেছে হাওা [হাওয়া] নাই শেতায় ঃ।। জদি একজানে দুই ফল ধরে কেউ পুন্য কেউ পাপ করে কি হবে তার রোজ হাসরে হিসাবের সমায় ঃ নবির ভেদ পায় একান্তী ঘুচে জায় তার সব সন্দী দিষ্ট হয় তার আলেক পান্তী [পন্থ/পংক্তি] নালন ফকির কয় ঃ।।

২৭৫ নং

মন রে আপ্ত তর্ত্ত না জানিলে সাধন হবে না পড়বি রে গোলে ঃ। জেন গে কালুল্লা আনল হক আল্লা জারে মানুষ বলে ঃ।। পড়ে ভুত আর হোষনে বারামবার একবার দেখ না প্রেম নওন খুলে ঃ। আপ্নী সাই ফকির, আপ্নী হয় ফিকির ও শে নিলে ছলে, আপনারে আপনি ভুলে রব্বানি আপ্নী ভাশে আপন প্রেমজলে ঃ। লায় লাহা তোন এলনেল্লা জিবন আছে প্রেম জুগোলে ঃ।। নালন ফকির কয় জাবি মন কোথায় আপ্নারে আজ আপনি ভুলে ঃ।।

২৭৬ নং

সাই আমার কখোন খেলে কোন খেলা ঃ। জিবের কি সাদ্দ [সাধ্য] আছে তাই বলা ঃ। কখোন ধরে আকার, কখোন হয় নিরাকার কেউ বলে সাকার অপার ভেবে হৈ ঘোলা ঃ। অবতার অবতরি সব শোমভাবো তারি একচাঁদে হয় উর্জ্জালা ঃ।। ভাণ্ড ব্রভাণ্ড [ব্রহ্মাণ্ড] মাজে সাই বিনে কি খেইল আছে নালন কয় নাম ধরে শে কৃষ [কৃষ্ণ] করিম কালা ঃ।

২৭৮ নং

ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে ঃ। শে কি সামান্যে চোরা ধরবি কোনা কাঞ্চীতে ঃ। পাতালে চোরের বহর দেখায় আছমানের উপর তিন তারে কোরছে খবর হাওা মুলধর তাতে ঃ।। কোথা ঘর কি বাশোনা, কে জানে ঠিক ঠেকেনা হাওায় [হাওয়ায়] তার বারামখানা শুভোশোভা জোগ মতে ঃ। চোর ধরে রাখবি জদি রিদ গারদ কৈর গে খাটী নালন কয় নাটীকুটী থেকতে কি শে দেয় শুতে ঃ ।।

২৮০ নং

মরশীদ বল মন রে পাখি ঃ ভবে কেউ কারূ নয় দুখের দুখি ঃ। ভুলোনারো ভবো ভ্রস্ত [ভ্রান্ত] কাজে, আখেরে এসব কাণ্ড মিছে ঃ মন রে এস্তে [এসতে] একা জেতে একা এ ভবো পীরিতের ফল আছে কী ঃ। হাওয়া বন্দ হলে শুপদ কিছুই নাই, বাড়িরো বাহির করেন সবাই, মন রে কেবা আপন পর তখন, দেখে শুনে কেন্দে ঝুরিবে আখি ঃ।। গোরেরো কেনারে জখন লএ জায়, কান্দীএ তখোন জিবন, ছেড়তে চায়, অধিন নালন (বলে) কারূ গোরে কেউ তো জায় না থেকতে হয় একাকী ঃ।

২৮১ নং

নরেকারে দুজন নুরি ভেশচে সদায় ঃ। ঝরার ঘাটে জোগান্তরে [যোগ অন্তরে] হচ্চে উদায়ঃ। একজোন পুরূশ একজন নারি, ভেশচে সদায় বরাবরী, ওপর আওলা [উপরঅলা] সদয় বারি জোগ তাথে দেয় ঃ। মাশান্তরে শে দুজোনা, আবেশে হয় দেখাশোনা, কেউ ভার্গদয় [ভাগ্যোদয়] ঃ। জে জানে শে দুই নুরিকে সিদ্দী হবে জোগে জেগে, নালন ভেড় পলো ফাকে মনের দিদায় [দ্বিধায়] ঃ।।

২৮৪ নং

আলেফ লাম মিমেতে ঃ কোরান তামাম শোদ লেখেছে ঃ। আলেফ আল্লাজি মিম মানে নবি, লামের হয় দুই মানি ও তার এক মানে সরায় প্রচার আর মানে মারূফতে ঃ। দরমিআনে লাম, আছে ডানি বাম, আলেফ মিম দুজোনে জমন [যেমন] গাছ বিচ অংকুর এই মত ঘুর না পারি বুঝিতে ঃ। এশারা [ইসারা] লিখন, কোরানে রে মন, হিসাব কর দেহেতে, তবে পাবি নালন সব অন্যশোন [অন্বেষণ] ঘুরিষ্নে [ঘুরিস নে] ঘোর পথে ঃ ।।

২৮৫ নং

নবির আইন বজা [বোঝা] সার্দ্দ নাই ঃ। জার জা মন বুদ্দীতে [বুদ্ধিতে] আশে বলে তাই, বেস্তের [বেহেস্তের] লাএক আহাম্মক সবে, সনি তাই হাদিচ কেতাবে, এ সসে কথার হিসাবে বেহেস্তের গৌরব কিশে থাকে ভাই ঃ। ঠকলে বলে আম্মক [আহম্মক] বোকা, সেই আম্মক পায় বেস্তে জাগা [জায়গা] এতো বড় ধোকা কে ঘুচাবে ধোকা কোতা [কোথা] জাই ঃ। নামাজ রোজা বেস্তের ভজোন তাই করিএ আম্মক সে জোন বিনয় কোরে বলচে নালন থেকতে পারে ভেদ মরসীদের ঠাই ঃ।।

২৮৫ নং (খ)

মেএ্রারাজের কথা শুধাবো কারে ঃ।। আদম তোন আর নিরাকারে মিল্লে কি করে ঃ। নবি কি ছাড়িলো আদমতোন, কিবা আদম রূপ হৈল্লে নিরঞ্জন, কে বলিবে সে অন্যশোন [অন্বেষণ] এ অধিনে রে ঃ।। নওনে নওনো বুকে বুক উভয় মেলে হইএ কৌতুক তবে জে দেখলো না শে রূপ নবির নজোরে ঃ। তুণ্ডে তুণ্ডু করলো কাহার শেই কথাডি [কথাটি] সন্তে চমৎকার, ছিরাজ সাই কয় নালন তোমার বোজো জ্ঞান দ্বারে ঃ।।

২৮৮ নং

ফেরেব ছেড়ে করো ফোকিরি ঃ। দিন তোর হেলায় হলো আখিরি ফেরেবি ফকিরি দাড়া, দরগা নিশান ঝাণ্টা গাড়া, গলে বেন্দে [বেধে] হড়া মড়া, সিন্নি খাওার [খাওয়ার] ফিকিরি ঃ। আশোলো [আসল] ফকিরি মতে বাজ্য [বাহ্য] আলাফ নাইকো তাতে, চলে সুদ্দ সহজ পথে, অবদ [অবোধ] গোবোদের [গোবধের] চটক ভারি ঃ।। নাম গোওালা [গোয়ালা] কাজি ভক্ষন, তোমার দেখি তন্নী লক্ষন, ছিরাজ সাই কয় অবোদ নালন সাধুর হাটে কর জুওচুরি [জুয়াচুরি] ঃ

২৯৪ নং

আমি কি দোশ দিবো কারে বে ঃ। আপন মনের দোশে পলেম শুবুদ্দী [সুবুদ্ধি] শুভাব গেলো ঃ কাগের শবাব [স্বভাব] মনের হলো ঃ তেজিয়ে অম্রেতো [অমৃত] ফল মাখাল [মাকাল] ফলে মন মজিলো রে ঃ। জে আশায় ভবে আশা ভাঙ্গীলো শে আশার বাশা ঘটীলো একি দুদশ্যা [দুর্দশা] ঠাকুর গড়তে বান্দর হলো রে ঃ। গুরুবস্তু চিনলি নে মন অশোময় কি করিবি তখন বিনয় কোরে বলছে নালন যজ্ঞের ঘ্রেতো [ঘৃত] কুত্তায় খেলো রে ঃ।

২৯৫ নং

প্রেম কি সামান্নেতে রাখা জায় ঃ।। প্রেমে মজলে ধর্মাধর্ম ছেড়তে হয় ঃ।। দেখো রে শে প্রেমের লেগে, হরি দিলেন দাশখত লেখে, শড়োইসয্য [ষড়ৈশ্বর্য] তেজ্য কইরে, কাঙ্গাল বেশে ফেরে নদীয়ায় ঃ।। ব্রজে ছিল জলদ কালো, প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হলো, সে প্রেম কী সামান্য বলো জে প্রেমেরো রশীক দয়াময় ঃ।। প্রেম প্রীরিতের এমনি ধারা, এক মরনে দুইজোন মরা ধর্মাধর্ম চায় না তারা নালন বলে সে প্রেমের রিতি তাই ঃ।।

২৯৬ নং

হক নাম বলো রশোনা ঃ জে নাম সরনে জাবে জটর যন্ত্রনা ঃ।। সিওরে শমন বশে, কোন সমায় বান্দিরে কোশে[কষে], ভুলে রলি বিসয় বিশে দিশে হলো না ঃ।। ফবার জানি ঘুরে ফিবে মানব জনম পেএছো রে এবার জেনো অলষ করে সে নাম ভুলো না ঃ।। ভবেরো ভাই বন্দু [বন্ধু] আদি কেউ কারূ নয় শাতের সাতি [সাথী], নালন বলে মরশীদ রতি করো সাধনা ঃ।।

২৯৭ নং

চাতক সবাব [স্বভাব] না হলে ঃ।। অমৃতো মেঘের বারি কথায় কি মেলে ঃ।। মেঘে কতো করে ফাকি তভু [তবু] চাতক মেঘের ভুকি।। তন্নী নিরিক রেকলে আখি শাদোকো বলে ঃ।। চাতকিরি এন্নী ধারা তেষ্টায় জিবন জায় গো মারা অন্য জলো খায়না তারা মেঘের জল ভুলে ঃ।। মন হোয়েছে পবনগতি উড়ে বেড়ায় দিবো রাতি নালন বলে গুরূ প্রতি রয়না শুহালে ঃ।

২৯৮ নং

নিলে দেখে লাগে ভয় ঃ। নৌকার পরে গঙ্গা বোজাই ডেঙ্গায় বোএ জায় আবহায়াত নাম গঙ্গা শে জে সংক্ষেপে কেউ দেখো বুজে পলকে পাহাড়ো ভাশে পলকে শুখায় ঃ।। ফুল ফোটে তার গঙ্গা জলে ফল ধরে তার অচিন দলে, জুক্ত [যুক্ত] হোয়ে জলে [ফুলে] ফলে তাতে কথা কয় গাঙ্ জোড়া এক মিন ঐ গাঙ্গে খেলচে খেলা পরম রং নালন বলে জল শুখালে মিন জাবে হাওায় ঃ।। [হাওয়ায়]

৩০০ নং

জেভাব গোপীর ভাবনা ঃ।। সামান্য মনেরো কাজ নয় শেভাব জানা ঃ।। বৈরার্গ [বৈরাগ্য] ভাব বেদের বিধি গোপীর ভাব অকৈতপ নিধি ডুবলে তাহে নিরোবধি রসিকো জোনা ঃ।। জোগীন্দ্র মনিদ্র [মুনীন্দ্র] জারে পায়না জোগ ধ্যানো কোরে শেই কৃষ্ট গোপীর দায়ে হোএচে কেনা ঃ।। জে জোন গোপী অনুগতো জেনেছো নিগুড় তত্ত নালন বলে জাথে কৃষ্ট [কৃষ্ণ] সদায় মগনা ঃ।।

৩০১ নং

শে ভাব সবায় কি জানে ঃ। জেভাবে সাম [শ্যাম] আছে বান্দা গোপীরো সনে ঃ। গোপী বিনে জানে কেবা শুদ্ধ রশাস্ত্রেতো শেবা গোপীর পাপোপুন্যের জ্ঞান থাকেনা কৃষ্ণ দর্শনে ঃ।। গোপী অনুগতো জারা ব্রজের শে ভাব জানে তারা নিরহেতু ভাব অধার ধরা গোপীরো সনে ঃ।। জে জোন গোপী অনুগত জানে শে ন্নিগুর তত্ত নালন বলে জাতে কৃষ্ণ সদায় মগনা ঃ।।

৩০২ নং

বেদে কি তার মরমো জানে ঃ। জে রূপে শাইর নিলে খেলা আছে এই দেহো ভুবনে ঃ। পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার পণ্ডীতেরা করেন প্রচার নিগুড় তত্ত মানুষ আকার বেদ ছাড়া বৈরার্গর মনে ঃ।। গোলে হরি বল্লে কি হয় নিগুড় তত্ত নিরালা পায় নিরে খিরে জুগোলে রয় সাইর বারামখানা সেইখানে ঃ।। পড়িলে কি পায় পদাত্ত [পদার্থ] আপ্ত তত্তে জারো ভ্রান্ত নালন কয় সাদ মহান্ত সিদ্দী হয় আপ্নাকে চিনে ঃ।

৩০২ (খ) নং

সংশার ব্রক্ষ্যাত পত্রং পতোতি কতো শতো পতোন্তী। কৃষ্ণনা ভজিয়ে কিবল আশা জায়া হলো সাতি ঃ। আদিব্রর্ম ব্রক্ষ্যারি মূল ঃ উদু [উর্ধ্ব] সাখা ব্রহ্মারি স্থুল অধো সাখা কনেষ্ট [কনিষ্ঠ] জিব অগোনন অতোল সেথা সব্দ আদি পুশপ গন্দ পাতা পাপপূর্ণ ফল ধরে তথা, জিব আদি সেই ফলেরতা খেয়ে হলো অধোগতি ঃ।। অজ্ঞানো নিবিড় বনাত কামরূপ ব্রখো থাকে তার সাত হিংশা নিন্দা শ্রেকাল [শৃগাল] আদি থাকে তার পষচাদ শেথা ধর্ম রূপো গাভি থাকে, শেগাভি পলো বিপাকে দধি দুগদু বিনাশ্বতি ঃ। বৈরাজ্ঞ চক্রেরী দারে শে ব্রহ্ম না ছেদন করে কৃষ্ণ ভুলে অন্দকারে বেড়াচ্চো ঘুরে গোশাই রামলাল কয় পাপ অন্দ কুপতে শেজন গ্রহন গতি জগত রামচন্দ্র সেই কুপে প্রপাত কৃষ্ণ রূপে নপর সতি ঃ। [ন স্পর্শতি]

৩০৫ নং

ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে ঃ। এমনো তরূন বএশে ঘর ছেড়ে ফকিরি নিলে ঃ।। ধন্যরে ভারতি জিনি শোনার অঙ্গে দেয় কোপীনি শিকাইলে হরিধনি করেতে করঙ্গ নিলে ঃ।। ধন্য পিতা বলি তারি ঠাকুর জগোন্নাৎ মিছরি [মিশ্র] জার ঘরে গৌরঙ্গ হরি মানুষ রূপে জর্ম্মাইলে ঃ।। ধন্যরে নদিয়া বাশী হেরিলো গৌরাঙ্গ শশী জে বলে শে জিব সর্নাশী নালন কয় শে ফেরে পলে ঃ।।

৩০৭ নং

বলরে নিমাই বল আমারে ঃ। রাধা বইলে আজগোবি আইজ শান্দীলি কেনে ঘোমের ঘোরে ঃ।। সেই জে রাধার কি মহিমা কেউ দিতে না পারে সিমা, ধেনে [ধ্যানে] জারে না পায় ব্রহ্মা, কিরূপ জানিলি শে রাধারে ঃ। রাঁধে তোমার কি হয় নিমাই সত্ত [সত্য] করে বল আমাএ এমনো বালোক সোমায় এবোল কে শীকালো তোরে ঃ।। তুমী শীশু ছেলে আমার মা হৈএ ভেদ পাইনে তোমার নালন কয় সচির কুমার জগত কল্লে চমতকারেঃ।।

৩০৮ নং

চেনেনা জসদা রানি গোপাল কি শামান্য ছেলে ধ্যেনে জারে পায় না মনি ঃ।। একদিন চরণ ঘেমে ছিলো তাইতে মন্দাকিনি হলো ঃ পাপোহরা শুশিতোলা শে মধুর চরণ দুখানি ঃ।। বিরিঞ্চী বাঞ্চীতো সে ধন মানুষ রূপে এই বিন্দাবন জানে জতো রশীক শুজন শে কালোরে গুন বাখানি ঃ।। দেবেরো দুর্লভো গোপাল ব্রহ্মা জার হরিল গোপাল নালন বলে আবার গোপাল কৃত্তি [কীর্ত্তি] গোপাল কল্লে সুনি ঃ।

৩০৯ নং

কি ছারো রাজস্য কোরি ঃ। গোপাল হেনো পুত্র আমার অক্রুর এশে কল্লে চুরি ঃ।। [সর্বত্র দীর্ঘ দাড়িটি হ্রস্ব করতে হবে] মিছে রাজার নামটি আছে লক্ষী শে তো গা তুলেছে, জে হতে গোপাল গীয়াছে, শে হতে অন্দকার পুরি ঃ। শোকানলে চিত্র [চিত্ত] মাজ্জার কার বাড়ি কার বা এ ঘর একা পুত্র গোপাল আমার কোরে গেলো সন্যকারি ঃ।। নন্দ জশোদারো ছেলে অক্রুর এশে হোরে নিলে, প্রাপ্ত কৃষের [কৃষ্ণের] এহি নিলে নালন কয় বিনয় করি ঃ।।

৩১০ নং

শকলি কপালে করেঃ।। কপালের নাম গোপাল চন্দ্র কপালের নাম গুয়ে গোবরেঃ।। জদি থাকে এই কপালে রত্ন এনে দেয় গোপালে কপালো বেমতি হলে দুর্ব্ব [দুর্বা] বনে বাগে [বাঘে] মারেঃ।। কেউ রাজা কেউ হয় ভিকারি কপালেরো ফল সবারি মনের ফেরে বুজতে নারি খেটে মরি এ শংশারেঃ।। জার জমন মনের করূনা [করণ/কল্পনা] তন্নী ফল পেয়েছে শে না নালন কয় আর ভেবলে হয় না বিধির কলম আর কি সারেঃ [সংশোধিত]।।

৩১১ নং

আর কি গৌর এশবে ফেরেঃ। মানুশ ভজে জে জা করো গৌরচাদ গীএছে শেরেঃ।। একবার এশে এই নদিয়ায় মানুষ রূপে হোয়ে উদয় প্রেম বিলালে জথা তথায় গেলেন প্রভু নিজো পূরেঃ।। চারজুগের ভজোন আদি বেদেতে রাখিয়া বিধি ব্রজের নিগুড় রশোপাস্তী শুপে [সপে] গেলেন শ্রীরূপেরেঃ।। আর কি শে অদ্যইত গোশাই এনবে গৌর এই নদিয়ায় নালন বলে শে দয়াময় কে জানিবে এ সংসারেঃ।।

৩১২ নং

আর আমারে মারিষ্ নে মাঃ।। বলি তোমায় চরণ ভরে [ধরে] লনিচুরি আর কোরব না ননির জন্যে আইজ আমারেঃ মারিশ গো মা বেন্দে ধরে দয়া নাই মা তোর অন্তরে সলপেতে [স্বপ্নেতে] মন গেলো জানাঃ। পরে মারে পরের ছেলে, কেন্দে জেএ মাকে বলে মা জননী নিদয়া হলে, কে বোজে শিশুর বেদনাঃ।। ছেড়ে দে মা হাতের বন্দন [বন্ধন] জাই আমার জেদিগে জায় মন পরের মাকে ডেকবো এখন তোমার গ্রেহে [গৃহে] আর রব নাঃ।।

৩১৩ নং

রাধার গুন কত নন্দলাল তা জানে নাঃ।। কিঞ্চীৎ জেনলে তো লমপট ভাব থেকতো নাঃ।। কোরেছে পীরিত, নাই তারো শুরিতি কুরিত ছলোনা, বলে রাই সত্ত দেখি অন্য ভাবনাঃ।। জদি মন দিতো রাধারে তবে (তবে) শাম কুব্জারে পরশো করতো না, এমন [একমন] কয় জাগায় বেচে তাও তো জেনলাম নাঃ।। চন্দ্রাবলির সঙ্গে মত্ত কোন রশরঙ্গে ভেবে দেখোনা, তন্নী অনাস্ত ভ্রান্ত সামের [শ্যামের] জায় জানাঃ জেনলে প্রম গোকুলে লোইতে কেন্তা [কন্থা] গলে নদেয় এস্তোনা [আসতো না] অধিনালন [অধিন নালন] কয় করো বিবাচোনাঃ।।

৩১৪ নং

তোমরা আর আমায় কালার কথা বলোনাঃ। ঠেকে শেখলাম গো কালো রূপ আর হেরবোনাঃ।। পোরলাম কলঙ্গের [কলঙ্কের] হারঃ। তবুতো ও কালার মন পেলেম না. জমন রূপ কালা তন্নী উহার মন কালাঃ।। প্রেমের কী এই সিক্ষে বেড়ায় বেন্নন [ব্যঞ্জন] চেকে লজ্জা গোনে না ঘেন্নায় মরে জাই এমন প্রম করবো নাঃ।। জমন চন্দ্রাবলী তন্নীশে রাখাল অলি থাক দুজোনা সনে [শুনে] রাধার বোল লালন কয় বোল সরে নাঃ।।

৩১৫ নং

ওগো ব্রজো নিলে একি নিলে ঃ। কৃস্টো গোপিকারে জানালে ঃ জারে নিজো শক্তি গোটলে নারায়ন, আবার গুরু বলে ভজলে তার চরন এ কি বেবহার সনে চমতকার, জিবের বোজা ভার ভুমগুলে ঃ।। নিলে দেখিয়ে কম্পীত ব্রজোধাম নারির মান ঘুচাতে জোগী হলেন শাম দুজজয় মানের ঘায় বাকা শাম রয় নারির পাদ-পদ্দ মাথায় নিলে ঃ।। ত্রিজগতের চিন্তে শ্রীহরি আইজ কি হোরির চিন্তে হলেন গো নারি, অশোম্ভাব বচন ভেবে কয় নালন রাধার দাশখতে সাম [শ্যাম] বিকালে ঃ।।

৩১৬ নং

ওগো রাই সাগোরে নেবলে [নাবলে] সামো রায় ঃ। তোরা ধর গো পাছে ভেশে জায় ঃ। রাই প্রেম শেই তরঙ্গ ভারি তাতে থাই দিতে কি পেরবে গো হোরি, ছেড়ে রাজত্ব প্রমে উদাশো প্রভুর চিন্তে খেন্তা [কন্থা] ওড়ে গায় ঃ।। চারজুগেতো ঐ কেলে শোনা ওগো ছিরাধার দাশ হতে পাল্লেনা, জদি হোতো দাশ জেতো অভিলাষ তবে এশবে [আসবে] কেনে নদিয়ায় ঃ।। তিনটী বাঞ্চা [বাঞ্ছা] অভিলাষ কোরে হোরি জনমো নিলেন সচিরো ঘরে ছিরাজ সাইর বচন ভেবে কয় নালন শেতাব জেন্তে পাল্লে রশীক হয় ঃ।

৩১৭ নং

কারে কার ভাবে এভাব হারে জিবন কানাই করে বাশী নাই মাথে চূড়া নাই ঃ।। খিরো সর ননি খেতে, বাশীটি সদায় বাজাতে, কি অসুক [অসুখ] পেয়ে তাতে ফোকির হলি ভাই ঃ।। অগোর চন্দন আদি মাখিতেন নিরোবধি শেই অঙ্গ ধুলায় অদভূতি এখোন দেখতে পাই ঃ।। বিন্দাবন জথার্থ বোন তো বিনে হলোরে এখন মানুষ নিলে কোরবে কোন জোন নালন বলে তাই ঃ।।

৩১৮ নং

নারির এতো মান ভালো নয় গো কিশোরি ঃ।। জতো সাদে সামার [শ্যাম আর] মান বাড়ায়ো ভারি ধর্ন্ন তোর বুকের জোর কান্দাও জগোত ঈশ্বর করে মান জারি, ইহার প্রতিশোদ না নেবে কি শে হরি ঃ।। ভাবে বুজলাম দড়ো সাম হৈতে মান বড় হলো তোমারি থাকো রাই দেখপো তোমার ভারি ভূরি ঃ।। দেখেচো কে কোথায় পূরূযকে নারির পায় ধরায় কোন নারি রাগে কয় বিন্দে নালন কি জানে তারি ঃ।

৩১৯ নং

ও কালার কথা কেনে বল আইজ আমায় ঃ।। জা সনলে আগুন লাগে গায় ঃ।। তুমী বিন্দে নামটি ধরো জলে অলন [অনল] দিতে পারো রাধারে ভুলাতে তোরো এবার বুজি কোটীন হয় ঃ।। জে কৃষ্ণ রাধারো অলি তারে ভুলায় চন্দ্রাবলী, শেকথা আর কারে বলি ঘেন্নায় জিবন জায় ঃ।। সতেক হাড়ির বের্ন্নন চাকা [চাখা] রাই বলে ধিক তারে দেখা, নালন বলে এবার বাকা শোজা হবে মানের ঘাএ ঃ।।

৩২০ নং

জাও হে রাই কুঞ্জে আর এশোনা ঃ।। এলে ভালো হবে না ঃ।। গাছ কেটে জল ঢালো পাতায় এ চাতরি শীখলে কোথায় উচিৎ ফল পাইবে হেতায় তা নৈলে টের পাবানা ঃ।। করতে চাও সাম নাগোরআলি জাওহে জথা চন্দ্রাবলি এপথে পড়েছে কালি একালি আর জাবেনা কেলে বন্দু [বন্ধু] জানা গেলো ঔপর কালো ভিতোর কালো নালন বলে উভয় ভালো করি উভয় বন্দনা ঃ।।

৩২১ নং

প্রিরী [প্যারী] ক্ষম অপরাধ আমার মান তরঙ্গে কর পার, তুমি রাধে কল্পতরু ভাব প্রেমে রসের গু:রু তোমা সমান অন্য কারু না জানী জগতে আর পূর্বে রাগ অবধী জারে আশ্রয় দীনে নিরাকারে সল্প দোষে সেই দাসেরে তেগীলে কি পৌরস তোমার? ভাল মন্দ যতই করি তথাই প্রেম দাশ তোমারী নালন বলে মরি মরি হরির এ কি ঋন সিকার।।

৩২২ নং

দিনে দিনে হলো আমার দিন আখিরি ঃ। আমি ছিলাম কোথায় এলেম কোথায় জাবো কোথায় সদায় ভেবে মরি ঃ। বশত করি দিবো রেতে ১৬ জন বমবেটের সাতে, আমায় জেতে দেয়না শরল পথে, আমায় কাজে২ করে দাগাদারি ঃ।। বাল্যকাল খেলায় গেলো যুবাকাল কলঙ্ক হলো ব্রর্দ্দ [বৃদ্ধ] কাল ছামনে এলো, এখন মহাকালে কল্লে অধিকারি ঃ।। জে আশায় ভবে আশা তাতে হলো ভগ্ন দশা নালন বলে হায় কি দশা আমার উজোইতে ভেটেল পলো তোরি ঃ।।

৩২২ (খ) নং

এমন মানব জনম আর কি হবে মন জা করো তরায় করোরে ঃ।। এই ভবে ঃ।। অনেকো ভাগ্যেরো ফলে মানব জনম পেএছোরে এজনম তোর জায় বিফলে বুজালে বোজোনা [বোঝেনা] ভবের লোবে ঃ।। দেবের উত্তম মহাদেবো জিবের উত্তম এই মানব দেবা দেবি অশেষ রূপো জর্ম ধারন কল্লে এই মানবে ঃ।। ভ্রমী আশী লক্ষ জুনি, [যোনি] মানবদেহে মুক্তী মানি জদি এবার হও গুরু ত্যাগী অধিন [নালন] বলে ফেরে পড়বি তবে ঃ।

৩২৩ নং

ছারমানে মজে কৃষ্ণ ধোনকে চেনোনা ঃ। থাকো২ ওগো প্যারি দুদিন বোই জাবে জানা ঃ।। কৃশেটরে [কৃষ্টেরে] কান্দালে তুমী জতো শে তোমায় কান্দাবে ততো চিরো দিনতো প্রচলিত আছে কিনা ঃ।। জখন বলেবে কোথা হরি এনে দেগো সহচরি এখন জে সাধিলাম হরি তা কি মনে জাননা ঃ। বাড়াবাড়ি হলে ক্রমে কুঘোটীতে আটক নাই কর্মে নালন কয় পাশান ঘামে সনে বিন্দার বন্দনা ঃ।।

৩২৪ নং

বিশয় বিশে চঞ্চলা মন ঃ দিবো রোজোনি ঃ। মত্ত [মন্ত] বজালে বোজেনা কর্ম কাহিনি ঃ।। বিশয় ছাড়িয়ে কবে মন আমার সান্তো হবেহে ঃ আমি কবে শে চরন করিব শ্বরন জাতে শীতোল হবে তাপীতো প্রানি ঃ।। কোনদিন সশান বাশী হবো, কিধোন সঙ্গে লয়ে জাবো হে আমি কি করি বই ভুতের বোজা একদিনে ভেবলেম না গুরূর বানি ঃ।। অনিত্য দেহেতে বাশা তাইতে এতো আশার আশা হে ঃ অধিন নালন তাই বলে নিত্য হইলে আর কতই মনে কোরতাম না জানি ঃ।।

৩২৫ নং

দেল দরিয়ায় ডুবিলে শে দরের খবর পায় ঃ।। নৈলে পথি [পুঁথি] পোড়ে পণ্ডীৎ [পণ্ডিত] হহলে কি হয় ঃ।। সয়াং-রূপ দর্পনে ধোরে মানব রূপো ছিষ্টি করেহে দিব্ব জ্ঞানি জারা ভাবে বজে [বুঝে] তারা মানুষ ভজে কায্য সিদ্ধী করে জায় ঃ।। একেতে হয় তিনটী আকার অজুনি [অযোনি] সহজো শোমস্কার জদি ভাব তরঙ্গে তরো মানুষ চিনে ধরো দিনোমনি গেলে কিহবে উপাএ ঃ। মূল হইতে হয় ডালের শেজেজান, [সৃজন] ডাল ধল্লে পায় মূল অন্যশোন, [অন্বেষণ] তন্নী রূপ হইতে সরূপ তারে ভেবে বেরূপ অধিন নালন সদায় নিরূপ ধরতে চায় ঃ।।

৩২৭ নং

মনরতি শে রিপুর বশে রাত্রদিনে ঃ।। মনের গেলো না সবাব কিশে মেলে ভাব সাধুর সনে ঃ।। নিজো গুনে জা করে সাই তা বিনে আর ভরোসা নাই জানা মোর মনের ভক্তী জোর জে রূপ মনে ঃ। বলি শে ছিচরন জদী মনে হয় কখোন তন্নী উটে হায় দুষ্ট শেসমায় দুদিক টানে ঃ।। দিনেদিন ফুরাইএ গেলো, রং মহল অন্দকার হলো নালন বলে হায় কি করি ওপায় পত দেখিনে ঃ।।

৩২৮ নং

ওন্তিমকালের কালে ওকি হয়না জানি ঃ।। কিবা ঘোরে কাটেলাম হারে দিনমনি ঃ এনেছিলাম বশে খাইলাম ঃ ওপাজ্জোন কই কি করিলাম নিকাশের বেলায় ঘটপেনো আওলা [এলোমেলো] বানি ঃ।। জেনে শুনে, শোনা ফেলে মন মজালেম রাংপীতলে, এ লাজের কথা বলীবো কোথা আর এখনি ঃ।। ঠকে গেলেম কাজে ২ ঘিরীলো অনুপোঞ্চাশে [উনপঞ্চাশে] নালন বলে মন কি হবে এখন-বলরে সুনি [শুনি] ঃ।।

৩২৯ নং

কারে দিবো দোশ নাহি পরের দোশ মনের দোশে আমি পলেম রে ফেরে আমার মন জদি বুজিতো লোবের দেশ ছাড়িতো লয়ে জেতো আমায় বিরজা পারে ঃ মনের গুনে কেহু হলো মাহাজোন বেপার কৈরে গেলো অমুল্ল রতন আমারে মজালি অবোদ মন পারের কিছুই না গেলাম করে।। অন্তীম কালের কালে কি না জানি হয়, একদিনে ভেবলে না অবোদ মনুরায় ভেবেচো দিন এমনি বুজি জায়, সকল জানা জাবে জেদিন সমনে ধরে ঃ কামে চিত্র হতো [চিত্ত হত] মনরে আমার শুধা তেজে গরল খাই শে বেশুমার ছিরাজ সাই কয় নালন রে তোমার ভগ্নদশা ভাবি দেখি আখেরে ঃ।।

৩৩০ নং

দেখলাম এ শংসার ভোজ বাজি প্রকার দেখতে ২ অমনি কেবা কোথা জায় ঃ।। মিছে এঘর বাড়ি মিছে ধোনো কোড়ি মিছে দোড়ো দোড়ি করি কার মাওায় [মায়ায়]।। কৃতিকর্মার [কীর্ত্তিকর্মার] কৃতি কে বুজতে পারে শে বা কোথা জিবকে লয় কোথা ধরে শে কথা আর শুধাবো কারে ওতার নিগুড় তত্ত অর্থ কে বলবে আমায়।। জে করে এ নিলে তারে দেখলাম না আমি ২ বলি আমি কোন জোনা মরিরে কি আজব কারখানা এবার শুনে কিছুই ঠাহর নাহি হয়।। ভয় ঘোচেনা আমায় দিবো রোজনি, কার সাতে কোন দেশে জাবো না জানি ছিরাজ সাই কয় বেস কারগোনি পাগোল হয়রে নালন জে তাই জেন্তে চায়।।

৩৩১ নং

অশার ভেবে সার দিন গেলো। আমার সার বস্তু ধোন এবার হলেম রে হারা ঃ। হাওয়া বন্দ হলে শব জাবে বিফলে ঃ দেখে শুনে লালোশ গেল না মারা গুরূ জারে সদায় হয় এই শংশারে, লোবে সাঙ্গ দিয়ে শেই জাবে শেরে অঘায় [অঘাটায়] আইজ মরন আমারে ঃ আমী জেনলেম নারে গুরূর চরন কি ধারা ঃ।। মহতে কয় পূর্বে থেকলে শুক্রীতি [সুকৃতি] দেখতে সন্তে গুরূ পদে হয় রতি শেও পূন্য মোর থাকিতো জদি, তবে কি হইতাম এমন পামোরা ঃ।। শোমাএ ছাড়িয়ে জানিলাম এখন গুরূক্রেপা [কৃপা] নৈলে ব্রথাই জিবন বিনয় কৈরে কয় অধিন নালন মনরে আর কী আশী এবার পাব কেনারা ঃ।।

৩৩২ নং

তুমী কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে ঃ।। মিছে মায়ায় মজিয়ে মন কি করোরে ঃ।। এতো পীরিৎ দন্ত জির্বায় [জিহ্বায়] কএদ [কয়েদ/কায়দা] পেলে শেও সাজা দেয় সল্পেতে সব জানিতে হয় ভাব লাবোরে [নগরে] ঃ।। সময়ে সকলী শখা অসময়ে কেও না দেয় দেখা জার পাপে শে ভোগে একা চাইর জুগেরে ঃ। আপ্নী জখোন নয় আমার কারে বল আমার২ ছেরাজ সাই কয় নালন তোমার জ্ঞান নাইরে ।।

৩৩৬ নং

চিরদিন দুখের আনলে প্রান জলছে আমার।। আমি আর কতদিন জানি অবলারও প্রানী এ জলনে, জলবে ওহে দয়াশ্বর।। দাশী মলে ক্ষতি নাই জাইহে মরে জাই, দয়াল নামের দস্য [দোষ] রবেহে গোঁসাই আমায় দেওহে দুখ যদি তবু তোমায় সাদী [সাধি] তোমা বিনে দোহাই আর দিব কার ঃ।। ও মেঘ হইয়ে উদয় নুকালে কোথায় প্রেবোসীর [প্রবাসীর/পিপাসীর] প্রান গেল প্রেবেসোয় আমার কি দোশের ফলে এদশা ঘটালে তুমি চাও হে না জে ফিরে চাও হে এগবার ঃ।। আমী উড়ি হাওয়ার সাত [সাথ] ডুরি তোমার হাত তুমি না তরালে কে তরায় [কে ত্বরায়] হে নাথ, আমায় ক্ষমা [ক্ষম] অপরাদ দেওহে শীতল পদ নালন বলে প্রানে বাচে নারে আর।।

৩৩৯ নং

জারে ধ্যেনে পায়না মনি ঃ।। আছে সেই অচিন মানুষ মিন রূপে ধরিএ ফনি ঃ।। আজব রংঙ্গের মিনতো [মীনতো] যে সাত সুমুদ্র জুড়ে আছে সবার হাতের কাছে চিনতে পারে কোন ধনি ঃ।। কররে সুমুদ্র নির্নয়, কোন যোগে তার কোন ধারা বয়, যোগ চিনে ডুবে তাহায় মিনকে ধরা জায় আপনী ঃ।। যোগ বুজে মিন পড়ে ধরা জেস্তে জায় সে যোগি জারা, সেরাজ সাই বলিছে খারা নালন সে ঘাটে খায় চুব্‌নি।।

৩৪০

আমার মনের মানুশের সনে ঃ।। মিলন হবে কত দিনে ঃ।। চাতক প্রায় অহনিসি চেএ আছি কালশশি, হব বলে চরন দাসি তা হয়না কপাল গুনে ঃ।। মেঘের বিদ্যুত মেঘে যমন, নুকালে না পাই অন্যেসন, কালারে হারিলাম [হারাইলাম] তখন রূপ হেরিএ সপনে ঃ।। যখন রূপ স্বরন হএ থাকে না লোক লজ্জা ভয়ে, অধিন নালন বলে সদাএ প্রেম জে করে সেই জানে ঃ।।

৩৪১ নং

কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে ঃ।। মা বলিএ চক্ষের দেখা তাইতে কি তোর ধর্ম জাএরে ঃ। কল্পতরূ হওরে যদি তভু মা বাপ গুরূ নিধি এগুরূ ছাড়িতে বিধি, কে তোরে দিএছে হারে ঃ।। আগে যদি জেনিলে ইহা তবে কেনে করিলে বিহা এখন শে বেশটপিএ [বিষ্ণুপ্রিয়া] কেমনে রাখিব ঘরে ঃ।। নদিএ ভাবের কথা, ওধিন নালন কি জানে তা হায় হতাশে সচি মাতা, বলে নিমাই দেখা দেরে ঃ।।

৩৫২ নং

মিছে ভবে খেলতে আলি তাস।। ও তোর মুন্ত্রী [মন্ত্রী] করলো সর্বনাশ ঃ।। রং থাকিতে খেল্লী কিবা রূপ তুমি মিছে ভবে পড়ে খালি করিতেছো তুরূক; রে ক্ষেপা পাসায় ছেড়ে আলি ফিরে ও লোভি মন সময়ে হাতের পাচের কিবা আস ঃ।। টিক্কাতে রং তুরুক করে মন তুই এমন বেকুব দশখান টিককা না মেরে খেপা খেলছো খেলা ও মন ভোলা কাবার দেও ইস্তক পঞ্চাশ ঃ।। জে দিন দিনকারি সাত দেখতে হবে মন তুমি হায় ডুব ডুব খাবি ভস্যেরি ঘাটেরে ক্ষেপা ডুবিবি ঘাটে—

৩৫৩ নং

ও দেল মমিনা চল জাই হায়াত নদীর পার ঃ।। শ্রীগুরু কাণ্ডারি জার রয়েছে হাল ধরে ঃ।। সে ঘাটে জন্মে সোনা লোভীকামী জেতে মানা সে ঘাটে জোর খাটেনা চল ধীরে২ জার ছেলে কুমিরে খায়, তার দেলে লেগেছে ভয় ঢেকী দেখিয়ে পালায় আবার বুজি ধরে ঃ।। শঞ্চাখেলন জানে জারা তাদের করন খারা তাদের কুমীরে না ধরে না আটে ঘাটের চাবি কত জন খাচ্ছে খাবি দিয়ে পাও ওমনি গোর [গড়াগড়ি] চুবিনি খেয়ে মরে ঃ।। রূপোই বলে গিয়ে ছিলাম কত রং দেখে আলাম কুমির রয়েছে গভীর ধারে গুরূর চরন হৃদয় রেখে ঝাপ দিলাম দরিয়াতে কত মুক্ত [মুক্তা] হলো তাতে গুরূর চরন ধরে ঃ।।

৩৫৫ নং

নবিজি মুরিদ কোন ঘরে ঃ।। কোন ২ চার ইয়ার এসে চাঁদয়া ধরে ঃ।। জাহার কালেমা দিন দুনিয়াএ, সেই মরিদ হলো কোন কালেমায়, নেহাজ করে দেখ মনুরায়, মুরসিদ তত্ত [তত্ত্ব] অথাই গভিরে ঃ।। উতারিলে তারে কোন পিয়ালা, জানিতে উচিত হয় নেরালা ওরূন বরূন জে ত্রিশ পারা কোন জোগে কোন আশ্রয় সাঙ্গ করে ঃ।। মউরা মৈরি [ময়ূর ময়ূরী] নিলে, কোন জোগে প্রকাশ করিলে শেরাজ সাই এসারায় বলে, নালন ঘুরে মলি বুদ্দির ফেরে ঃ।।

৩৫৭ নং

সাই দরবেশ জারা ঃ।। আপনারে ফানা করে অধরে মিশায়এ তারা।। মন জদি আজ হওরে ফকির লেও জেনে সে ফানায় ফিকির ধর অধরা ফানার ফিকির না জানিলে ভস [ভস্ম] মাখা হয় মসকারা।। কুপ জলেতে গোঙ্গার জল পরিলে সে হএরে মিশাল, উভায় একধারা এমনি জান ফানার ফিকির রূপের রূপ মিলন করা ঃ মুরশিদ রূপ আর আলেক নুরি এক মনে কেমন করি দুরূপ নিঁহারা নালন বলে রূপ সাদনে [সাধনে] হলেরে মত্তিক হারা।।

৩৫৮ নং

আপন খবর না জদি হয়।। জার অন্ত নাই মন তার খবর কে-পায় ঃ।। আত্তারূপে কেবা ভাণ্ডে করে সেবা, দেখ ২ জেবা হও মহাশয় ঃ।। কেবা চালায় হারে, কেঁবা চলে ফেরে, কেবা জাগে ধড়ে কেবা ঘুমাএ ঃ।। মনরে অন্য গোল মাল ছাড়, আপ্তুতত্ত খোড়ো [খুঁজ] নালন বলে তত্ত ব্রেদের [বিদেয়] কাজ নয়।।

৩৬০ নং

অনেক ভাগ্যের ফলে শেচাঁদ কেউ দেখিতে পায় ঃ।। আমাবশ্যে নাই শে চাঁদের দিদলে তার কিরন উদয় ঃ।। বিন্দু মাজে সিন্দু [সিন্ধু] ভারি মাজখানে তার সরনগিরি অধার চাদের স্বর্ন পুরি সেহিতো তিল প্রমান জায়গায় ঃ।। যথায়ে সেই চন্দ্রাভুবান দিবা রেতে নাই আলাপন কটি [কোটি] চন্দ্র জিনি কিরন বিজলী সঞ্চারে সদায় ঃ।। দরশনে দুখ হরে পরশনে পরশ করে এমনি শে চাদের মহিমা ফকির নালন ডুবে ও ডোবে না তায় ঃ।।

৩৬৩ নং

করি কেমনে শুদ্দু সহজ প্রেম সাদন ঃ।। প্রেম সাদিতে ফাপরি ওটে কাম নদির তুপান [তুফান] ঃ।। প্রেম রতন ধন, পাবার আশে, ত্রিপিনির ঘাট বেদলাম কশে কাম নদির এক ধাক্কা এসে জায় বাঁদন ছাঁদন ঃ।। বলবো কিশে প্রেমের কথা কাম হৈল প্রেমের লতা কামছাড়া প্রেম জথা তথা নাইরে আগমন ঃ।। পরম পতি প্রেম পিরিতি কাম গুরু হয় নিজ-পতি কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি তাই ভাবে নালন ঃ।।

৩৬৪ নং

জানি সম প্রেমের প্রেমী কাছে পেলে ঃ।। পুরুষ প্রকৃতি স্বভাব থেকতে কি প্রেম রসিক বলে ঃ।। মদন জ্বালায় ছিন্ন ভিন্য প্রেম ২ বলে জোরে জানান ওহিকদারে [ঐহিকদ্বারে] রসিক মান্য খুক্সি জারি প্রেম টাকশালে ঃ।। সহজ প্রেম রসিক জোনা শোশাপ্র শোসে বান ছাড়ে না, শে প্রেমের সন্দি জানা জায়না ডুবে না মরিলে ঃ।। তিন রশে প্রেম সাদিল হরি শেম [শ্যাম] অঙ্গে গৌরাঙ্গ তারি নালন বলে বিনয় করি, শেই রশে প্রেম রসিক বলে ঃ।।

৩৬৫ নং

কিরূপ সাদনের বলে অধর ধরা জায়।। নিগুড় সন্দানে জেনে শুনে সাধন করিতে [হয়] ঃ।। পঞ্চতত্ত সাদন করে পেত জদি সে চাঁদেরে হে তবে বৈরাগ্যরা কেনে আচলা গুদড়ি [গুধড়ি] টানে, কুলের বাহির হয় শে চরন বাঞ্চায় [বাঞ্ছায়] ঃ।। বৈষ্টবের ভজন ভাল, তাই বলিএ ভক্তি ছিল হে তাইতে ব্রেম্মাজ্ঞানী জারা সদায় বলে তারা শাক্ত বৈষ্টবের নাই সঙ্গানয়ং (স্বয়ং) পরিচাএ ঃ।। সনে বের্ম জ্ঞানির বক্য [বাক্য] দরবেশ করে তর্ক্যহে বস্তু জ্ঞান জার নাই নামবেম্য [নামব্রহ্ম] কি পাই, নালন দরবেশে একি কথা কয় ঃ।।

৩৬৬ নং

হরদম পড়ো এলেল্লা ঃ।। আরোফ [আরোপ] রাখিএ বরজোক মনরে ভোলা মোরাকিবা মোসাহেদা হইলে দেলের কেটবে [কাটবে] পরদা রউসনি দেল হবে সর্বদা ওসে মোরাকিবা কয় তরিকে জেনলে খোলে রাগের তালা ঃ।। তরিকের মঞ্জিলে বসে আরকাম আহাকাম কর দিসে ফকিরী কায়মী হয় কয় চিজে, ওসে তরিকের কয় মঞ্জিল বলে, জেনগে হকিকতে আছে জানা ঃ।। খোলা ঃ।। ছিরাজ সাই দরবেশের চরন ভেবে কহে ফকির নালন ডুবলে পাবি এসব অন্যেসন, এবার মুরসিদ জারে দয়া করে, ও তার তরিকের পথ হয়

৩৬৭ নং

মনরে কবে ভবে শুজ্জের [সূর্যের] জোগ হয় কর বিবেচনা ঃ।। চন্দ্র কান্তির জোগ মাসান্তরে ভবে আছে জানা ঃ।। জে জাগে সেই জোগের সাতে অমুল্য ধোন পাবে হাতে খুধা তেষ্টা জাবে তাতে, এমন ধোন খুজিলে না ঃ।। চন্দ্রকান্তি শুজ্জকান্তি তারে ধরে আছে অনেক পান্তি জুগল গত হও একান্তি পাবি উপাসনা ঃ।। অখণ্ড উদভাব রতি রসিকের প্রান রসের পতি নালন ভেবে কয় সম্প্রতি দেহো খুজে দেখ্ না ঃ।।

৩৬৮ নং

একি অনান্তভাব হায় গো ধনি দেখালে এবার ঃ।। ক্ষেনেক পুরুষ ক্ষেনেক নারী ক্ষেনেক (২) হও নিআকার ঃ।। আছিলো সাই নরেকারে, ছিল কুদরতির জোরে, সংসার স্রীজনের [সৃজনের] কালে, ধরিল প্রিকিতির আকার ঃ।। তুমি সাই করিম করতার, যার অংশে তিন (চিন!।।) করে আকার, কারে ভজে কারে পাব ভেবে দিশে পাই নে তার ঃ।। ভেবে পাই নে ভাব অন্যশন [অন্বেষণ] কিবা মনে ভাবি তখন, বিনয় করে বলচে নালন, ঘোচায় [ঘোচাও] আমার মনের ঘোর অন্দকার ঃ।।

৩৬৯ নং

কর রে পিয়ালা শুদ্দ [শুদ্ধ] এমানে ঃ।। মিশবী জদি জাত ছেপাতে এ তুনু [তনু] আখিরীর দিনে ঃ।। সাধরে নুরের পিয়ালা, খুলে জাবে রাগের তালা, অচিন মানুশের খেলা, দেখবী ওরে দু নয়নে ঃ।। জব্বুরী ছত্তুরী ধরী সাধ রে সার নুর জহরী, এ চার করন ভারী, আছেরে অতি গোপনে ঃ।। ফানা ফে পশে, বাকা ফানা স্থল, ফানা ফেল্লা ফানাফের রছুল, এ চার ঘরেতে নালন মুরশীদ ভজ রে অতি নীর্জ্জনে ঃ।। [পদটি সংখ্যাহীন]

৩৭১ নং (সংখ্যাহীন পদ)

অবোধ মন রে তোমার হলো না দিশে ঃ।। এবার মানসের করন হবে কিসে ঃ।। কোনদিন এশবে জোমের [যমের] চেলা, ভেঙ্গে জাবে ভবের খেলা, সেদিন হিসাব দিতে বেশম জালা ঘটবে শেশে ঃ।। উজান ভেটেল দুটী পথো, ভুক্তিমুক্তির করন সে তো, এবার তাতে জায় না জরাম্রেতো [জরা মৃত্যু], জোমের ঘর শে ঃ।। জে পরশে পরশ হবি, সে করন আর কবে করবি, দরবেশ ছিরাজ সাই কয় নালন রলি ফাকে বশে ঃ।।

৩৭২ নং (সংখ্যাহীন পদ)

এবার কে তোর মালেক চিনলে না তারে ঃ।। মন কি এমন জনম হবে রে ঃ।। দেবের দুল্লভ এবার, মানস জনম তোমার, এমনো জনমের আচার কল্লি কিরে ঃ।। নিশ্বাসের নাইরে বিশ্বাস, পলকে সব করবে নৈরাশ, তখন মনে রবে মনের আশ, বলবি কারে ঃ।। এখন শ্বাস আছে বজায়, জা কর তাই সিদ্দি হয়, দরবেশ ছিরাজ সাই কয় তাই বার (২) নালনেরে ঃ।।

৩৭৩ নং (সংখ্যাহীন পদ)

মুরশিদ ধনি গুনমনি গোপনে রলে ঃ।। তারে চেনা না গেলো ঃ।। চারযুগ সে রয় গোপনে, দেখা নাই কারো সনে, ব্রম্মা বিষ্ণু না পায় ধ্যানে, মনিগনে [মুনিগণে] পথ হারিয়ে চেয়ে রলো, নুর নবিকে মোহর করে আপনি দিদার হলো ঃ।। ইঞ্জিল, তৌরিদ, জোব্বার, ফুরকান কেতাব করলেন ছোব্বহান, কেবা তার কল্লে নিশান, তাহার প্রমান জগতে আর কে রহিল ঃ।। সে কখন কোন খিয়ালে থাকে কিছুই না জানা গেল ঃ।। সাধুরো জবানে সনি ধারাতে আছেন ধনি, কথা কয় না গুনমনি, আওয়াজ সনি, চেনা বেশম দায় হলো, ভেবে নালন বলে, মলাম ঘুরে, মানুষ সত্য জার [সার] হলো ঃ।।

৩৭৪ নং (সংখ্যাহীন পদ)

মানুশে আছে সেই মানুশ মিশে ঃ।। কত মনিরিশী জোগ [যোগী] তপস্বী তারে খুজে বেড়াচ্ছে ঃ।। পানীর মধ্যে চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে হাতে কে পায়, তমনী আলেক মানুষ আলেকে রয়, থাকে আলেকে মিশে ঃ।। অচিনফুলে বসতি হয়, দিদল পদ্দে বরাম [বারাম] তার দল নিরূপন হইছে জার মানুশ দেখে অনাশে ঃ।। আমার কি হলো ভ্রান্ত মন, বাইরে খুজি ঘরেরি ধন, ছেরাজ সাই কয় ঘুরবি নালন আপ্তুতত্ত না বুজে ঃ।।

৩৭৫ নং (সংখ্যাহীন পদ)

সুক [সুখ] শাগোরের ঘাটে জেএ মতস্য ধরো হুশীয়ারে ঃ।। ওরে জল ছুও না মন রশোনা বলী তোমায় বারে (২)।। সুকসাগোরের তুফান ভারি, তাহে বজারা শুলুক ধরতে নারি, বিনা হাওয়ায় মৌজা তারি ধাক্কা লাগে কেনারে ঃ।। ও সে ঘাটে আছে পঞ্চনারি, বসে আছে খড়া ধারি, তাতে হটাৎ করে নাইতে গেলী এককোপে ছিদন [ছেদন] করে ঃ। প্রম ডুবারু হৈলে পরে জেতে পারে সরবরে, দরবেষ নালন সাই বলে হারে ধর গে মিন হাওা ধরে।।

পরিশিষ্ট।। প্রথম অধ্যায়।।
গানের পর্যায় এবং অর্থসংকেত।

গানের স্তর-নির্ণয়ে এবং অর্থ-নির্ণয়ে বহু সাধক-গায়ক সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আজাহার খাঁ (গোরভাঙা, নদীয়া), ইউসুফ সেখ (লালনগর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ), বসিরুদ্দীন শা (স্বরূপপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ), লোকমান ফকির (পাড় দিয়াড়, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ) , আমীরুদ্দীন বাউল (পূর্বোক্ত), বীরেন দাস বাউল (পূর্বোক্ত) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এদের মতভেদ বা মত-পার্থক্যও যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে—একাধিক অর্থ বা গানের স্তরের একাধিক স্তর নির্দেশে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আভিপ্রায়িক অর্থের দায় বহন করেছেন আজাহার আলী খাঁ এবং ইউসুফ সেখ। আমার প্রতি এঁদের স্নেহের ও সহায়তার ঋণ অপরিশোধ্য। গ্রন্থটির প্রকাশিত রূপ দেখার আগেই ইউসুফ মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রাগুক্ত সাধকবর্গ সকলেই নিজেদের লালনপন্থী বলে মনে করেন। লালনের গানের চর্চায় এঁরা সবাই রত। সৈয়দ শা মৈনুল হক (বাড়া, নলহাটী, বীরভূম, প-বঙ্গ) আরবী ফারসী শব্দগুলির এবং মারফতী সুফী সাধনা-সম্মত অর্থ-নির্ণয়ে সহায়তা করেছেন। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে আরবী ফারসীতে যথার্থ শিক্ষা হয়েছিল তাঁর। এক প্রখ্যাত পীর-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তিনি। চিস্তিয়া ঘরে দীক্ষা তাঁর, শিক্ষা কাদেরিয়া ঘরে। তাঁর ব্যাখ্যাগুলি ঈষৎ ভিন্ন এবং লালনপন্থীদের ব্যাখ্যার সমান্তরালে ব্যবহৃত হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ শরীরে তিনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্থল বিশেষে আ. ফা. সঙ্কেতার্থ আরবী ফারসী শব্দ।

(১) পর্যায়—স্থূলের দৈন্য / রাগ দৈন্য।

বাউল গান সাধুসভায় গুরু, নবী, চৈতন্য, মাতৃবন্দনা দিয়ে শুরু হয়। এটি গুরুবন্দনা। বিভিন্ন তন্ত্র-গ্রন্থে গুরুবন্দনায় বলা হয় যে তিনি জ্ঞান-অঞ্জন শলাকা দিয়ে শিষ্যকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। (অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন ইত্যাদি)। তন্ত্রসার গ্রন্থাদি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'ভারতীয় সাধনায় গুরুবাদ' নিবন্ধে প্রণবেশ্বরর ভট্টাচার্য বিষয়টিকে বিস্তৃত করেছিলেন (মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৬৩)। গুরুকে লালন মনরথের সারথি, মন্ত্রে মন্ত্রী, যন্ত্রের যন্ত্রী বলে নিজেকে যন্ত্রের মতো নির্জীব কল্পনা করেছেন।

তন্ত্রের তনপরি—তন্ত্রের তন্ত্রী বা তন্ত্রধারক শব্দটির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। বোর্দ্দ—বোদ্ধ, বোধ আছে যার বা যিনি বোধিলাভ করেছেন। শব্দটি বৌদ্ধ অনুষঙ্গের বাহক। গোপীনাথ কবিরাজ, রচনা সঙ্কলন গ্রন্থের একাধিক নিবন্ধে সাধনায় গুরুবাদের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন।

(২) প্রবর্ত্তের শিক্ষা; গুরুর মহিমা গান।

অশুসার—অসুবিধা, আগম—পার্বতীর প্রশ্নে শিবের উত্তর, নিগম—শিবের জিজ্ঞাসায় পার্বতীর উত্তরমূলক তন্ত্র-গ্রন্থাদি। অশোমার—অসময়ের, অধপতে—অধঃপথে, কুসাভাবে—কুস্বভাবে। তন্ত্রে গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করা নিষিদ্ধ; বৈষ্ণবরাও গুরুকে কৃষ্ণ বা রাধা-স্বরূপ মনে করেন। কিন্তু লালনের ইষ্ট সর্বদা জীবন্ত মানুষ।

(৩) স্থূলের দৈন্য, গুরুবন্দনা।

শেদি—সাধি, শেরএ—(দফা) সারা হয় অর্থাৎ ধ্বংস হয়, ক্রেতে—কৃপাতে, জগাই-মাধাই— চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে বর্ণিত নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বংশজাত দুই দুর্বৃত্ত। তাঁরা নিত্যানন্দকে আহত করে; অবশেষে চৈতন্য-নিত্যান্যন্দের কৃপা লাভ করে বৈষ্ণব হয়।

(৪) স্থূলের সাধক; মনঃশিক্ষা ও মানবজীবনের মহিমা-বর্ণনা।

শুধারায়ে—সুপথে, ভারা—মহাজনী নৌকার মালপত্র, দেহতত্ত্বে শুক্র। মাধোজ্য ভজন—মাধুর্য ভজন; মধুর রসকে সর্বোচ্চ সাধন-সামগ্রী হিসাবে চৈ. চরিতামৃতে ঘোষণা করা হয়েছে। এ রস আস্বাদনের লোভেই কৃষ্ণ নরদেহ ধারণ করেছেন [চৈ. চ. মধ্য, ৮ম]।

নিরাঞ্জন—নাথ সাহিত্যে, ধর্মমঙ্গলে, নানকপন্থা, কবীরপন্থায় শব্দটি আদি স্রষ্টা হিসাবে গৃহীত। সত্যার্থ প্রকাশে, দয়ানন্দ সরস্বতী, শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। নির + অঞ্জন (অঞ্জনং ব্যক্তিম্লক্ষণ ইত্যাদি)—যিনি আকৃতি, কুকাম, দুষ্ট কামনা এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়পথ থেকে পৃথক, সেই ঈশ্বরের নাম নিরঞ্জন। সাধকেরা নির্মল সত্তা অর্থে শব্দটি গ্রহণ করে। নিরাকার শব্দটি নিরঞ্জনের বিশেষণ। ডু কৃঞ্ করণে, নির ও আঙ্ পূর্বক হয় নিরাকার 'নির্গত আকারাৎ স নিরাকার'। [ঐ, ১ম সমুল্লাস, পৃ. ২৩]

'রন্‌জ' আরবী শব্দ—শোকতাপাদি

নিঃ (নাই) রন্‌জ—শোকতাপাদির অতীত যিনি, এ অর্থে সঙ্কর শব্দটির ব্যবহার।

সাঁই শব্দের প্রচলিত উৎস স্বামী। এ নিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরের মন্তব্য পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী চারজন সাঁই-এর উল্লেখ করেছেন (আদি, ১ম পরিচ্ছেদ)। শব্দটির উৎস—শায়ী (কারণতোয়শায়ী ইত্যাদি)<শায়িত। মৈনুল হকের মতে সা' শেয়েখ এই আরবী শব্দের (অর্থ ধর্মগুরু) বিকৃত রূপ সাঁই (সাইখ) হতে পারে। সাই নিরঞ্জন শব্দ ভক্তি-আন্দোলন ও লোক-ঐতিহ্য থেকে আগত।

(৫) প্রবর্তের (তরিকের) স্থূল; নবীতত্ত্ব। গাছ, ফল, বীজের প্রতীকে দেহতত্ত্ব আলোচিত এখানে।

নুর—আলো, বীজ; নবী—আল্লার খোদ অঙ্গ, যিনি নবুয়ত-প্রাপ্ত হয়ে, দেহে সে চিহ্ন বহন করেন; পয়গম্বর—যার কাছে আল্লার বার্তা আসে; কুদরতি খিয়াল—অলৌকিক চিন্তা; বাতুন/বাতেন/বাতন—গোপন, মারফত। দেল কোরাণ—গুরু-কৃপায় চিত্তে জাগে জ্ঞানসমূহ, এটিই মূল কোরাণ।

(৬) প্রবর্তের প্রবর্ত; তরিক বিষয়ক পদ।

আএন—আইন; নবুয়ত—আনুমানিক, পরের কথা (পরচর্চা); মারফত—গুপ্ত সাধনা, আত্মচর্চা; বেলায়ত—প্রকাশ্য, বর্তমান; সরপোষ—খাবারের ঢাকনি।

(৭) সিদ্ধের স্থূল; ফাণা বা সমাধি-তত্ত্ব।

ফাণা—চার ধরনের ফাণা বা আত্ম-লীন হবার পদ্ধতি সুফী সাহিত্যে পাওয়া যায়। ফাণা ফিশেখ, ফাণা ফিল রসুল, ফাণা ফিল্লা, বকা বিল্লা।

ফাণার ফিকির—গুরুর কছে আত্ম-সমর্পণান্তে আসবে ফেকের; ক্রমশ মনের চিন্তার সূক্ষ্মতা সাধিত হবে।

রব্বানা—আল্লাব বিভিন্ন গুণপ্রকাশক নামের একটি।

মুরশীদ—গুরু/পথ-নির্দেশক; জাজন—সাধনা; স্বরূপ—নিজের রূপ, আত্মার যথার্থ বিশেষত্ব; অটল নুর—বস্তু-রক্ষাকারীর জ্যোতি।

(৮) প্রবর্ত্তকের প্রবর্ত্ত; নামাজতত্ত্ব।

দাএমি—দায়ে বদ্ধ নমাজ, মানবিক কর্তব্য; আখিরি—শেষ; মাশুক— প্রেম নির্ভর করে যার উপর, যে আমার জন্য ব্যস্ত নয়; আশুক—প্রেমকারী, যে প্রেমে আর্ত; অবধারি—অবধারিত সময়; ছালেক—সালিক প্রেমপন্থের সাধক সুফী সাধনায়, আদেশ-পালনকারী; দেওনা—দেওয়ানা—প্রেমে উন্মত্ত; দেল—হৃদপিণ্ড; বাজ্য পানা—বাহ্যিক প্রকাশ; মজ্যুবি—যিনি গোপনে কাজ করেন; ফরজ—পালনীয় কর্তব্য।

আশা ঝুলি—ফারসী 'আশা' শব্দার্থ লাঠি; ঝুলি ও লাঠি খেলাফতী ফকিরের প্রতীক/লিঙ্গ -অঙ্গ।

কেফায়া......দামী ফরজ— এক ফারসী গজলের ছত্রবিশেষ। এর অর্থ—অবশ্যপালনীয় বিষয়াদির সঙ্গে তোমাকে জানাতে হবে যে এটাই শেষ নয়, এ ছাড়াও ফরজ তোমার আছে তা হলো মানবপ্রেম। এটি দায়েমী ফরজ বা পালনীয় কর্তব্য।

তরিক—পন্থা, জাত এলাহী—অশেষ গুণান্বিত প্রভুর গুণ বর্ণনাতীত। আএনি—কোরাণ-নির্দেশিত; বরজক—গুরুমূর্তিকে বর্ত্ত করে ধ্যান, পীরের প্রতিমূর্তি স্মরণে আনা। আত্মা শেষ বিচারের জন্য এখানে অপেক্ষা করে। প্রাচীরের মত গুরু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝখানে থাকেন। আর্গেকারী—আজ্ঞাকারী।

(৯) প্রবর্ত্তকের প্রবর্ত্ত, দৈন্য।

বেলি<বলি; আপাএ—ক্ষুদ্র জলাশয়; অন্তসপুরী—অন্তঃপুরে; গুণাবি—মন্ত্রবিদ্; ডাঙ্কাভারী—প্রবল ঘোষণা; ছেঁছোড়—ছ্যাঁচড়া চোর; মালখানা—মালগুদাম।

(১০) স্থূলের প্রবর্ত্ত; মুরশীদ রূপে আল্লা; গুরু কৃষ্ণ অভেদ। পদে দুটি সংশোধন আছে। বো এ 'জে' বসানো এবং পতে কেটে পথে করা হয়েছে।

অলি এল মুরশিদা; যেহি মুরশিদ সেহি খোদা—মুর্শিদই খোদা; মুরিদ হচ্ছে অনুগত দাস বা মৃত, পরিচালিত; আর যিনি পথ জানেন ও অন্যকে পথে পরিচালিত করতে সমর্থ তিনিই মুর্শিদ।

আয়েত লিখা কোরাণেতে—সুরা তৌবার শেষাংশে পাই যে 'গুরুহীন ব্যক্তি'কে অধিকার করবে শয়তান—পরোক্ষে মুর্শিদের গুরুত্ব এতে উল্লিখিত হয়েছে।

কুল্লে সাই......। কাদির—সৃষ্টিকে বন্ধনে রেখে তিনি সর্বত্র প্রভাবশীল/সর্বত্র আল্লা, ৫ জাত (লতিফা) এবং চক্ষু (২) কর্ণ (২), নাক (২), মুখ এই ৭ সেফাত—সর্বমোট ১২ দিয়ে আল্লা ঘেরা।

কালাম—(কলমা থেকে অপভ্রংশ) ভাল কথা; নিহাজ—নিষ্ঠা, সত্যকে জানা; আদম ছপী—আদি মানুষ; অনুগ্রহভাজন আদমকে আল্লা নবী করেছিলেন; এ অর্থে সফিউল্লা/ছপী।

(১১) স্থূলের দৈন্য।

আদেলা পুকুর—বদ্ধ জলাশয়, পুরুষ দেহ; বাঙ্গর—বৃহৎ জলাশয়; শুবল—সুবোল।

(১২) প্রবর্ত্তকের প্রবর্ত্ত।

কালরাগিণী—মৃত্যুরূপা ক্রোধপরায়ণা সর্পী। আজগবি—আজগুবি; বিষধরে ভোজন করে—

অনেকে সাপের বিষ খায়, নেশা করার জন্য। (করিমপুর, হোগেল বেড়িয়ার, বাদল ফকির)। বিষের সঙ্গে শুক্রের রং ও প্রকৃতির সাদৃশ্য আছে। অধর/অধার—নিচের ঠোঁট, যাকে ধরা যায় না; আধার—দেহ, নারী-জন্মস্থান; চৈতন্য-গুনিন—সচেতন সাধক; চৈতন্য-অনুসারী বৈষ্ণব সাধক। কু-কাপের (ফা-কোর কোপ)—অন্ধকার, বদ রঙ্গতামশসা, দেহমিলনে কাপট্য।
(১৩) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত (প্রবর্ত্তক/প্রবর্ত্ত দুটি শব্দই সাধকেরা ব্যবহার করেন)।

বাগ্ লোয়ে—উপদেশ নিয়ে; গুজ্যগত—সূর্য-অস্তপ্রাণ; বিবাসিত—বিকাশিত; সোন্নিতে পাএরে—শুনিতে পায়/শনিতে পায়; গুরু ছেড়ে গৌর ভজি—লালনের বাসস্থানে গৌর-পারম্যবাদীদের আন্দোলন চলছিল। তাঁরা গৌরভজনার তত্ত্ব প্রচার করতেন। এক মনে দু'জনকে ধ্যান করা সম্ভব নয়—এ সমস্যা লালনের বহু গানে শোনা যায়। পুঁথি—হস্তলিখিত সাধন-বিষয়ক গুপ্ত গ্রন্থাদি।
(১৪) সাধকের স্থূল।

চৈ. চ. মধ্য/২৩ এ পাই অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥ যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার। শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি অধর।

রস—দেহের তরল পদার্থ; রতি—পিতৃবস্তু/নারীর শুক্র/দেহমিলনে উত্থিত রস; ৩৬০ রস—রজঃ/মূত্র (রা—হ্লাদিনী—রজঃ; ধা—ধাতু—বীজ); সাড়ে তিন রতি—কাম, প্রেম ও নিষ্ঠারতি। দেহমিলনে ৩$\frac{১}{২}$ ফোঁটা শুক্র স্খলিত হয়। মতান্তরে দ্বিতীয়ার রজঃসাধনায় বীজাদি মিশ্রিত রসায়ন (তিনদিনের) আধাআধি ভাগ করে গ্রহণ করে সাধক-সাধিকা। উজান/ভেটেল—শুক্রের/রসাদির উর্ধ্বগতি/ নিম্নগতি; ত্রিপীনির—তিন রকম পানির (রজঃ, প্রস্রাব, শুক্র) স্থান; যোনি। তির নালা—যোনির তিন দ্বার/মুখ, স্তন, যোনি-র তিনটি নির্গমনপথ। ভিয়ান—দেহমিলনে রসাদি জ্বাল দেয়া; মিছরিওলা—জ্বালে ইক্ষুরসের ক্রমিক সর্বোচ্চ দুটি স্তর। জল তোলা ফেলা—রসাদি গ্রহণ কিন্তু বস্তুক্ষয়/নিম্নগামী বস্তুকে বারবার উর্ধ্বে টেনে তোলা—কামনার অস্তিত্ব।
(১৫) পার—নাভির ছ'আঙুল স্থানের নিম্নে মূল বস্তু গেলে স্খলন; উর্ধ্বে থাকলে দেহ-নৌকা নারীদেহের নদীতে কাম তৃপ্ত করে নিরাপদ থাকে। স্খলনহীন দেহমিলনের সমাপ্তিই পার। মিলনে শ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে নামজপ করা হয়।

হীরের সাকো—ক্ষুরধার সেতু; নারীর যোনিতে এর অবস্থান—পুং-শুক্রকে খণ্ড করে ফেলে।

সেই......কোরে—পূর্ববঙ্গীয় বাক্‌ভঙ্গি; সেই পার হবে সুচারুভাবে।
(১৬) স্থূলের দৈন্য।

মনত্রোনি ছএ জোন—মন্ত্রী ছ'জন/ষড় রিপু।

ফেরে—বিপদে। কবীরের ৫, ৩, ৭, ১০ শাখীতে কেশে ধরে উদ্ধারের প্রার্থনা আছে। The sants, (p.281-303) কবীরের গানের সূত্রগুলি এ গ্রন্থ থেকে দেয়া হয়েছে।
(১৭) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ।

বেনা/বিনা (আ. ফা)—আদেশ ও নিষেধ/নিগূঢ়তত্ত্ব; লহর—লাহোর; আলেক—অলক্ষ্য/(আ. ফা) শুক্র; কোলের ঘোর—নিকটবর্তী/নিজস্ব আচ্ছন্নতা।

(১৮) সাধকের স্থূল।

রস অনুসারে—রজঃ ও দেহরসের রং ও স্বাদ-অনুযায়ী সাধকেরা বহু কিছু নির্ণয় করে। আধলীলা—তিনদিনের রজঃ তিন রতি; এর সঙ্গে আধরতি শুক্র মিলিত হয়। জন্মলতা—মস্তিষ্কের মেরুদণ্ডের নাল দিয়ে লিঙ্গ বা যোনি পর্যন্ত প্রসারিত নাড়ি; যোনি। রতি—বীর্য; মতি—রজঃ (শ্রী-মতি=রাধা)।

(১৯) সাধকের স্থূল ঃ ফুলের গান; দেহতত্ত্বে রজঃফুলে হয়, গুরুপূজা।

অটাল বেহার—অটল বিহারের ক্ষমতা জন্মে রজঃসাধনায়। জন্ম পথে......ধ্বজা—পুষ্পবিকাশের পর সৃষ্টি সূচিত হয়। মগবুল (আ. ফা.) গৃহীত। ভেড়ো—ভেড়ার মত বোকা/স্ত্রৈণ।

(২০) সাধকের প্রবর্ত্ত ঃ ফুলের গান।

মূলাধার—ষট্‌চক্র পরিকল্পনায় এ নাম পাওয়া যায় না। লিঙ্গের নিম্নে, গুহ্যের ঊর্ধ্বে বা নাভিমণ্ডলে মূলাধার/আধার পদ্মের অবস্থান। এখানেই যোনি-মণ্ডল। উল (আ. ফা)—খোঁজ, সন্ধান; অলি—ভ্রমর/লিঙ্গ/অমরোলী, বজ্রোলী এবং সহজোলী মুদ্রায় সিদ্ধ সাধক। লিঙ্গনাল দিয়ে যারা অনায়াসে তরল পদার্থ টেনে নিতে পারেন। নারী দেহরস-গ্রহণে সিদ্ধ সাধকেরাই অলি। হুল—কামের দংশন। বেদমান্যকারী/শাস্ত্রানুসারী সাধারণ মানুষ রজঃসাধনার তত্ত্ব জানে না, এজন্য এটি 'বেদের আগোচর'।

(২১) সাধকের প্রবর্ত্ত : ফুলের গান।

সাম্যরস/শ্যামরস/সমরস—বৈষ্ণব কড়চায় এ শব্দগুলি দেহরসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। বিশেষ দিনের সাধনায় নরনারী একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ বা শুক্রপাত ঘটিয়ে, নায়ক যোনি থেকে মুখ দিয়ে এই মিশ্রিত রস নিয়ে নায়িকা-মুখে দিয়ে সমভোগ করে। মতান্তরে বীর্যরক্ষাকরী সাধকের দেহে নারীদেহের অনুরূপ তরল একপ্রকার রস জন্মে। বাতাস তা মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। এটিই কামরস/শ্যামরস বা মাতৃরস।

সুম্ব বিম্ব—শম্ভুরস বা গরল রস। তিক্ত স্বাদের রসাদি বিষাক্ত বলে গণ্য করে পরিত্যাগ করা হয়। টক-জাতীয় রসও পরিত্যাগ করা হয়।

শনি সুক্কুল—শোণিত ও শুক্র; রজঃ শ্বেত। সহজ প্রেম ইস্‌কুলে—সহজ প্রেমের বিদ্যালয় হচ্ছে গুরুর শিক্ষা। স্থূল থেকে সিদ্ধের শিক্ষা তিনি দেন। সহজ দেশ/সহজপুর নামে কড়চায় দেহের স্থানবিশেষকে বোঝোনো হয়। সহজ সাধনায় দেহে চারটি সরোবর পরিকল্পিত হয়েছে। দেহের বামাঙ্গে কাম ও মান সরোবর। এ দুটি প্রকৃতি। ডান অঙ্গে প্রেম ও অক্ষয় সবোবব—এ দুটি পুরুষ। মান সরোবর উদরে। অক্ষয় সরোবর সহস্রদল কমলে। সেখানে কাল বা জরা-মৃত্যুর প্রভাব নেই; এটি ১৪ ভুবনের পারে এবং পরামাত্মার বাসস্থান। (নিত্যের বাস) এখান থেকে বান এসে বিরজা নদীতে পড়ে এবং সে তরঙ্গ রেবা নদীতে পতিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পৃ. ২৮৩-৮৪।

(২২) সিদ্ধের স্থূল : ফুলের গান।

এক ফুলে চার রং—তিন দিনের রজেঃ ডালিম, জবা, পলাশ ফুলের রং এবং তিনদিনের পরে রজঃধারার শেষে অতসী ফুলের মতো রং দেখা যায় রসের। দরিয়া—সাগর।

(২৩) সাধকের প্রবর্ত্ত : ফুলের গান।

মাসান্তে—এক রজঃবিকাশ থেকে অন্য রজঃবিকাশ দেহতত্ত্বের এক মাস। মাস-অন্তে রজঃ

বিকশিত হয়। জগতের গঠন—রজঃ-বিকাশ হন্ধ হয়ে গঠিত হয় ভ্রূণদেহ ; এই দেহই ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ।

(২৪) সাধকের প্রবর্ত্ত ; ফুলের গান।

সন্দী—সন্ধান ; তিন—তিন দিনের রজঃ ; তিন প্রকার দেহরস ; সড়োরসিক—কটুতিক্তাদি ছ' প্রকার রসাস্বাদনকারী সাধক ; সন্দীস্থলে—মিলনস্থলে/যোনি ; চাঁদ—রাধাবিন্দু ও কৃষ্ণবিন্দু।

(২৫) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : গৌরনাগরী ভাবের পদ।

নামের বই—নামের ছাপ ; রসরাজ চৈতন্য—চরিতামৃত এবং বংশীলীলায় রসরাজ চৈতন্যের প্রসঙ্গ আছে। জাহ্নবা দেবীর দত্তক-পুত্র বাঘনাপাড়া কেন্দ্রে এই রসরাজ উপাসনা চালু করেছিলেন।

*(২৬) প্রবর্ত্তের সাধক : মুখের বাক্য দিয়ে শিষ্য গুরুকে নিজের সম্পদ ও পরিবার দান করে। গুরু তাকে পুনরায় এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন মাত্র ; মালিকানা নয়। রামপ্রসাদ এক গানে 'নিজেকে সরকারী মুটে' বলেছেন।

খিজি—খেয়াল। প্রেমপাগল—পরের জন্য উন্মত্ত এবং আত্মজ্ঞান-লুপ্ত প্রেমসাধক। অসুস্থ পাগল বা ভণ্ড সাধকের সঙ্গে এখানে প্রেমিকের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।

(২৭) সাধকের স্থূল : গৌরনাগরী ভাবের পদ।

পোসে—প্রবেশ করে। ধৈর্য ডুরি—ডোর কৌপীন ব্যবহার করে ভেকধারীরা। তাদের পক্ষে নিম্নাঙ্গে দেহমিলন নিষিদ্ধ। গ্রাম্য নারীরা কোমরে ডুরি পরে তাতে কাপড় আটকে রাখে।

(২৮) সিদ্ধের সাধক। রজঃবিকাশ হেতুহীন 'সহজ' ধারা।

নীরক্ষীর—রজঃ বীজ ; সর্নদেশ—শূন্যদেশ ; ইন্দ্রডাঙ্কা—ইন্দ্রিয়-নিনাদ ; মদনকে দেবরাজ ইন্দ্র আদেশ দেন সাধকের (শিব) কাম সৃষ্টির জন্য।

(২৯) সিদ্ধের সাধক। এখানে রজ সাধনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।

(৩০) সিদ্ধের স্থূল : এখানে অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে লালন নিজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

অধারা/অধার—তিনদিন রজঃকালে রজঃ নয় এমন এক ধারায় আসে রাধাবিন্দু ; দেহের মূল সত্তা সাঁই, যাকে ধরা কঠিন।

নেহারা<নিহার—মনঃসংযোগ করে দেখা/আরবী নাহার (রাত্রি) শব্দের অনুষঙ্গ এতে থাকতে পারে। এ সাধনা রাতের।

সপ্তপন্থী—জৈনরা সপ্তপ্রকার আপত্তি তুলতেন যে কোন প্রমাণ সম্পর্কে/ সাতপর্দা দেহ, লিঙ্গ সাড়ে সাত আঙুল।

(৩১) সিদ্ধের প্রবর্ত্তক।

হল—গিলটি করা/যুগল ; রাগের দেশ—রাগসাধনার স্তর ; দশম দল—মণিপুর নাভি পদ্ম/দশ দশা ; শ্রীরূপগত—শ্রীরূপের অনুসারী/নারী রজেঃর সাধক ; বিধি বিস্মরণ—শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ।

ছোড়ান—চাবি

(৩২) স্থূলের সিদ্ধ।

ডিম্ব অবোতোরি—ডিম্ব অবতারী ; নিগোমের ফুল—পার্বতীর কাছ থেকে আগত রজঃ ; আগমে......হৈলে—মানবাত্মাকে বারবার ধুয়ে পরিষ্কৃত করা হয়েছে (ময়লা থেকে বৃক্ষ জীবাদি

তৈরি)। অমল আত্মা [বস্তুই আত্মা] গলিত হয়ে [ডিম্ব ভেঙে] সৃষ্টির আগে ছিল বিসমিল্লা [ইলাল্লা বীজ, নুক্তা আল্লা] ; সৃষ্টির সূচনার নিরাকার [নির্গত আকারাৎ/জলীয় পদার্থরূপে] আহাদ এবং সৃষ্টিতে আহাম্মদ, যিনি চারভূতে গঠিত দেহধারী। 'নরবপু কৃষ্ণে'র স্বরূপ। আলেপে আল্লা, মহাম্মদে মিম, আদমে দম—এ তিন সত্তা মানুষে মিশে দম সুমারে খেলছে।

ফাজিল—কোরাণের অর্থ জ্ঞাত যার/তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু প্রকাশ করতে অক্ষম।

রছুল—প্রেরিত পুরুষ হিসাবে যিনি দাবি করেন।

*(৩৩) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : সৃষ্টির সমস্ত কিছুতে স্রষ্টা বহুধা হয়ে নিজেকে নিজে আস্বাদন করছেন। সর্বত্র রজঃবীজের খেলা।

লা-সরিকালা—যার কোন অংশী বা শরিক নেই, এক ও অদ্বিতীয় ; তরং—তরঙ্গ ; রোঙ্গ—রঙ্গ, নাচাড়ি—বিস্তারিত বর্ণনার ছড়াগান ; গোর্খ বিজয়ে নাচাড়ি দীর্ঘছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃ ১৪)

(৩৪) স্থূলের সিদ্ধ।

আরাজ্ঞ—আরোগ্য।

(৩৫) সাধকের স্থূল।

ভোড়ুয়া বাঙ্গাল—বোকা/স্ত্রৈণ, পূর্ববঙ্গবাসী ; পাচবাড়ি—বাড়ির পিছনের দিক—নিম্নাঙ্গ /পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশ করো ; কাটফাড়া—কথা বলে কিন্তু কাজে অক্ষম ; পৈত্রিকী ধন—পিতার মূলবস্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে সন্তানদেহ পায় ; ফোকতাড়া/কোকতাড়া—আ. শওক<ফোক, (বোধ বা খেয়াল) তাড়া—প্রবৃত্তিতাড়িত ; কাকতাড়ুয়ার মতো হতকুচ্ছিৎ লাবণ্যহীন দেহ ; বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, পৃ. ২৪৩-২৪৪ ; ঘরচোরা—কাম ও কামিনী-গৃহিণী।

(৩৬) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

ভূত ভেবিষ—ভূত ও ভবিষ্যতের ভাগ্য গণনা ; জোরই শোরই—চিৎকাব করে মন্ত্র পড়ে ; পেচো পাচী—শিশুরোগের অপদেবতা ও অপদেবী ; এল ভোলা—পথে, মাঠে, বিলে অপদেবতাবিশেষ পথ ভুলিয়ে মানুষকে হয়রান করে মারে। 'ভুলা' 'ভোলা' লাগা বলা হয় একে ; ফেউ—বাঘের আগমন ঘোষণা করে ফেউ, শাস্ত্রের বা অন্যের অর্থহীন, বিবেকহীন অন্ধ অনুসরণকারী ; ফেপী-ফেকসা—ফাঁপা ও ফ্যাকাসে (গর্ভবতী, বস্তুক্ষয়ে রক্তহীন) ; (ভাকা) ভুকোয়—চিৎকারে ও ছলনায় ; চটামরা—অস্থির, ছিটকে বেড়ায়।

*(৩৭) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত।

গীল্লাত<গলদ—পরনিন্দা; গিল্লাগিবত করার মাফ আল্লা করেন না বলে অনেকের বিশ্বাস। সেবা-সাধনা—গুরু বা সাধুকে সেবা দেয়াই একরকম সাধনা। কেউ কেউ একে ভজনা বলে। বৈষ্ণবদের সেবাবিধান ও সেবাপরাধ নিয়ে বহু আলোচনা আছে। গুপ্ত পুঁথিতে বাহ্য, অর্ধবাহ্য, অন্তরঙ্গ বা নিজমত, গুরুমনোমত, রাগমত প্রভৃতি নানাধরনের সেবাপদ্ধতি আছে। অন্ন, তৈল, তাম্বুল, তামাক সেবা-পদ্ধতিগুলি শিক্ষণীয়। সেবাকমলিনী বলে একধরনের সাধিকা নিজ দেহ দিয়ে সাধুগুরুর সেবা করেন।

বিষে বেষ—বেশভূষণ ; কাষ্ঠ হাশী—কৃত্রিম হাসি ; গোপী—নিজদেহ দিয়ে যারা কৃষ্ণভজন করেছিলেন, কৃষ্ণসুখে সুখ তাদের।

(৩৮) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

কুপেচে কুপাকে—নদীর স্থান বিশেষে ঘূর্ণিপাক থাকে ; বুজিরো দারে—বোধের দ্বারা ; ধার...ধরো উজান স্রোতকে অবলম্বন করে প্রতিলোমে মূল স্থানের পরিচয় জানা যাবে।

(৩৯) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

অঘাতো—অগাধ ; আনল/অনোল—অনল ; কুদরত—অসীম ক্ষমতা।

(৩৯ খ) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

বারামখানা—বিশ্রামস্থান ; সনিলে—শুনিলে; জে ধোনের উৎপত্তি প্রাণধোন—মূলবস্তু শুক্র।

*(৪০) প্রবর্ত্তের সাধক।

বেদ ছাড়া বৈরার্গ মনে—শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ও লা. গী. সংশোধন করে 'বৈরাগী' করেছেন। শূদ্রের সন্ন্যাস নেবার বিধি বেদ-সমর্থিত নয়। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ বেদবিধি অগ্রাহ্য করেন। ভেক শূদ্রও নেয়। প্রবাদে পাই, "যদি হবি বেদছাড়া, যা বৈরাগীপাড়া"। ভেকধারী বৈষ্ণবদের উপাধি বৈরাগ্য/দাস বৈরাগ্য—সুতরাং লালনের শব্দপ্রয়োগ সঠিক। আপ্তুতত্ত্ব—সিদ্ধ হবার তত্ত্বজ্ঞান [রবীন্দ্রনাথ আত্মতত্ত্ব করেছেন] ।

(৪২/৪৩) প্রবর্ত্তের সাধক।

মওলা—আল্লার ৯৯টি গুণবাচক নামের একটি, প্রভু ; জাহের—প্রকাশ্য ; বাতুন—গোপন ; নবীর কর—নবীর নির্দেশ বা কোরাণ ; অপারকে—অক্ষমকে।

জেরূপ...রছুল—মুর্শিদ ও রসুল একই। প্রকাশ্য সাধনা সাধারণ 'অপারগদের' জন্য ; বাতনের সাধনাযোগ স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্য।

(৪৩/৪৪) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

জুতি—যুক্ত ; মোকাম—গৃহ, স্থান ; তিনসমায়...জোগ—রজঃ-প্রকাশের তিনদিন ; ছনি, মনি, লাল, জহর—শ্বেত, লোহিত, পীত, নীল।

(৪৪/৪৫) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত।

নীরঘাটায়—জলাশয়ের ঘাটে/ জন্মস্থানে ; আব্‌মস্তম্ম বাশে—আব্রহ্মাস্তম্ভ বাসে ; নীর—জলীয় রসাকারে নিরঞ্জন অবতারের বর্ণনা।

(৪৫/৪৬) প্রবর্ত্তের সাধক (সাধকের প্রবর্ত্ত)

ভক্তি-আন্দোলনের ভাববাদী ধারায় নাম ও নামী অভেদ এবং নাম গুরুত্বপূর্ণ। লালন নামকে অগ্রাহ্য না করেও বস্তু বা ব্যক্তিকে গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন। কাদেরিয়াগণ নাভিতে নফসের স্থান নির্ণয় করে জেকেরে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। চিস্তিয়াদের অনেকে আজ্ঞাচক্রে (কপালে) নফসের স্থান নির্ণয় করে, সেখানে গুরুমূর্তিকে স্থাপন করে সাধনা করেন। সএতান গীধি—শয়তান গৃধিণী ; ৪—আব, আতস, খাক, বাদ এ চার ভূত ; ২—চার ভূতে গঠিত হলো রজঃ বীজ এ দুটি। দুই দিগ—একসঙ্গে দু'দিকে দেখা যায় না বা দুটি মূর্তিরূপকে স্মরণে আনা যায় না। যুগল মূর্তি দর্শনে সমস্যাটি সমাধিত হয়।

(৪৬/৪৭) সাধকের স্থূল।

ডেমাতে—লঙ্ঘন করতে, ডিঙিয়ে যেতে ; তালের শুমার—নাম-গণনা ; পলো ভাটি—বার্ধক্য ; নারদ কাটী—ঢোল ইত্যাদি দুই কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। নারদ ঝগড়ার দেবতা।

বিবাদের সূচনা/ দেহে উত্তেজনার আগমন এর অর্থ। দুটি কাঠির ঘর্ষণে আগুন জ্বলে—দেহমিলনের ঘর্ষণে কামোন্মাদনা আসে।

(৪৭/৪৮) সাধকের সাধক ; গৌরনাগরী ভাবের পদ।

ডংশীল, ডংশায়—দংশিল, দংশায় ; ধাওৎ—ধাত ; ওজা—ওঝা ; পাজায়—পাঁজরে/হৃদয়ে।

(৪৮/৪৯) সাধকের সিদ্ধ (কৃষ্ণ/গৌরাঙ্গ-তত্ত্বের গান, সাধকের দেশের গান) ;

ভারতে—মহাভারতে ; ডণ্ডধারি—দণ্ডধারী ; চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণের তিনবাঞ্ছা ছিল অপূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মেরও অভাব ছিল। ভোলে—ভ্রান্তিতে।

(৪৯/৫০) সাধকের প্রবর্ত্ত।

প্রেমের হাট : নরোত্তম বৈষ্ণব গুরুবর্গের প্রচারকে 'হাটপত্তনে'-র রূপকে বিবৃত করেছেন।

ব্রহ্মপুরী—মাথার সহস্রদল ; কল—কলঙ্ক/ কলে ইঁদুরের মতো আটকে যাবে ; শোএ—সহ্য করে।

(৫০/৫১) সাধকের প্রবর্ত্ত।

গুমার—গর্ব ; সমনোরায়—শমন (রায় সম্ভ্রান্তদের উপাধি) ; জননির...সাধন—মাতৃগর্ভে হেটমুণ্ডে ঊর্ধ্বপদে ভ্রূণ থাকে ; বাজি—সে কালে বাজি পোড়ানো জনপ্রিয় ছিল।

(৫১/৫২) সিদ্ধের স্থূল।

রঙ্গমহলে—রূপ বা রজঃ প্রকাশিত হয় যে-স্থানে ; কলের কোটা—কলের কৌটা/ কোঠাবাড়ি ভিতরে যন্ত্র বসানো ; সপ্ততালা—দেহের ৭ স্তর।

(৫২) সিদ্ধের সাধক।

পূর্ব্ব দিক—দেহের দিক-নির্ণয়ে নানা মতভেদ আছে। এখানে সূর্য/চন্দ্র উদয়ের স্থান (যোনি) পূর্বদিক। ভার্গগতি—ভাগ্য-গতিকে; মণিপুর—নাভিমণ্ডলীতে বা যোনিমণ্ডলে—এখানের ঘাটে যোনিযন্ত্র (কল) ; ত্রীবিনি—তিনটি নাড়ি (এক) বেণী বদ্ধ হয়ে এখানে থাকে। এ ত্রিবেণী মুক্ত; ভ্রূর মাঝখানে আজ্ঞাচক্রের ত্রিবেণীটি যুক্ত। বাঁকানল—যোনিরন্ধ্র ; মাকড়ার আশ—মাকড়সার সুতো; সন্দি—গূঢ় বিষয়।

(৫৫/৫৬) সাধকের প্রবর্ত্ত।

চড়ন্দারি—আরোহী ; সেই রসের...সাঁই—'ব্রহ্মরসে থাকেন' মতবাদটি লালনেরও।

কথারি কৈট—চালাকি করে বেশি কথা বলা ; বাদি ভেদী বিবাদী—বিরুদ্ধ, ঘরভেদী, সতত বিবাদ করে।

(৫৬/৫৭) সিদ্ধের স্থূল।

রশ আগোমন...গতি—দেহমিলনের সূচনায় কামরস আসে, এ রস না এলে দেহমিলন সহজ হয় না। কথায় কি বল বাজি জেতা—সেকাল বা একালের বাউলদের বড় অংশটিই ধূর্ত, অসাধক, বাক্যবাগীশ। সাধক বেশধারীরা চারুবাক বলে, সাধনা জানে না বা করে না। জল ছেচে—নৌকায় ছিদ্র থাকলে নৌকা সতত জলে ভরে যায়, জল ছেচে ফেলতে হয়। কামের উত্তেজনা থাকলে দেহের মূলবস্তু নিম্নগামী হয়, তাকে বারবার টেনে নিতে হয়।

(৫৭/৫৮) সাধকের প্রবর্ত্ত। গৌরনাগরী/নদীয়া নাগরী, ভাবের পদ।

গৌরো রায়—মৃত্যু বা বহু শক্তিশালী চরিত্রের উপাধি 'রায়'। লালনের সমাজে প্রতাপশালী জনগণ 'রায়' উপাধি ব্যবহার করতেন। এটি উচ্চবর্গের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি।

কুল—শব্দটিকে শ্লেষে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৫৮/৫৯) সিদ্ধের স্থূল/প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত। গৌরতত্ত্ব।

এ সাধনায় ব্রতপূজা নেই, লালন নন ব্রাত্য। চার যুগে কৃষ্ণের চার অবতার, চার প্রকার নামমন্ত্র, চার সঙ্গিনী। চৈতন্য চার যুগের বাইরে : সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি (আদি, ৩য় চৈ. চ.) কিন্তু তিন যুগের সমস্ত লীলাই তিনি নদীয়ায় করেছেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে দেন। এর নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। 'কপট সন্ন্যাসী' মহাপ্রভু অন্তরঙ্গে করেন রসসাধনা ; তিনি শুষ্ক বৈরাগী নন। গোবিন্দদাসের হোরির এক পদে পাই 'রাধা রঙ্গিনী সঙ্গিনী বাম', বৈষ্ণব পদাবলী। আওসার/আসুসার—অস্বস্তি।

(৬০/৬১) সিদ্ধের স্থূল।

হরি শব্দের যমক ও শ্লেষ-ব্যবহার কবিগানকে স্মরণে আনে।

(৬২) সাধকের প্রবর্ত্ত।

মেএ্যারাজ—জিব্রাইলের সঙ্গে নবী হজরত মহাম্মদ সাত-তবক আসমান পার হয়ে বেহেস্তে গিয়ে আল্লার সঙ্গে মিলিত হন। সেই অভিজ্ঞতার একাংশ কোরাণে প্রকাশিত ; একাংশ চার ইয়ারকে কথিত ; আর একাংশ তার সিনায় গোপনে ছিল। ফকিরগণ এ মিলনের গুপ্ত ব্যাখ্যা দেন। লালন-উত্তর পদকর্তাগণ 'মেয়েরাজ'কে এক স্বতন্ত্র পর্যায় হিসাবে রচনা করেছেন।

আল্লা ও নবী, এর মধ্যে 'নবী' শব্দটি নারীবাচক। দেহে কাম/কৃষ্ণ/আল্লা অনঙ্গ পুরুষশক্তি। দু'অঙ্গে অনঙ্গ কাম এসে তাদের মিলিত করে এবং রসাস্বাদ করে। দেহে প্রকৃতির সৃষ্টি—দেহে কাম এলে পুরুষ প্রকৃতি হয় ; প্রকৃতি পুরুষ।

ফাতেমা—আলীর স্ত্রী, হজরত মহাম্মদের কন্যা, সাধিকা নারী। সাইকে পতি ভজনা...'ফাতেমা সাধনা' নামে এক গুপ্ত সাধনা ফকিরদের মধ্যে প্রচলিত আছে। মহাম্মদ অর্থ দেহধারী। আর দেহে পুরুষ হচ্ছে কাম। ফতেমা দেহধারীকে পতি হিসাবে ভজনা করেছে। (কামগুরু হয় নিজপতি—চৈ. চ.)

ফতেমারে...বলেছে—মহাম্মদ বা দেহীর রজেঃ বীজে মাতৃজঠর থেকে জন্ম হয় এবং নারীকে মা বলে সৃষ্ট দেহধারী।

গুরু ভব...শিষ্য কাণ্ডারী—এখানে প্রচলিত ধারণাটি উল্টে গেছে। সাধনার স্তরে প্রেমিকা নারীর সহায়তায় পুরুষ-সাধক সিদ্ধ হয়। এ পর্যায়ে প্রেমের গুরু নারী। তিনি দেহরসাদি দিয়ে, যোগ-নির্ণয়ে সাধু, গুরুদের উদ্ধার করেন। সাধন পর্যায়ে কাণ্ডারী নারী।

(৬২/৬৩) সিদ্ধের স্থূল/সাধকের সিদ্ধ : উল্টাকথার পদ।

দোরিয়া—সমুদ্র ; কারিগীরি—কারিগরি ; বোবা—লিঙ্গ (মুখ আছে কথা নেই) ; কালা—পুংলিঙ্গ (কৃষ্ণবর্ণরা কালো) ; আন্দেলাতে—অন্ধ/ মন—চক্ষুহীন কিন্তু অনুভব করে। ত্রীপিনির পিছল ঘাট—যোনি ; ডওরায়—নৌকার তলার মধ্যবর্তী স্থান/শুষ্ক যোনি দেহমিলনে রসে পূর্ণ হয়ে যায়।

সাগোরে ভাসে জগৎমাতা—ধর্ম ও অন্য মঙ্গলকাব্যে পাই যে আদি দেবী শবরূপে জলে ভেসে তপস্যারত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে এলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুর্গন্ধে ও ঘৃণায় তাকে

সরিয়ে দেয়। কিন্তু শিব শবে বসেই সাধনা শুরু করেন। ফলত আদ্যা তার পত্নীত্ব স্বীকার করেন। এখনো রজঃস্রোতে ভেসে আসেন রাধাবিন্দু, একটি মাত্র পুংকীট তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ; নারীগর্ভে লালিত হয়ে সে, তার স্তনদুগ্ধে বর্ধিত হয়। পিতৃবস্তু বা পিতারূপী শুক্র, মাতা নারীর গর্ভে যায় এবং স্ত্রী-সম্বন্ধীয়া নারীর স্তন পান করে। একই নারী কন্যা, জায়া, জননী। গোর্খ বিজয়ে (পৃ. ২২) গোর্খনাথ ছ'মাসের শিশু হয়ে স্ত্রী-র স্তন পান করেছে।

(৬২/৬৪) স্থূলের সিদ্ধ।

গীরে—গিঠ, শুক্রকে গিঠ (বাঁধ) দিয়ে বেঁধে রাখা হয়; ফকশ্বা—ফস্‌কে (বর্ণবিপর্যয়) যায় অর্থাৎ গিঠটি খুলে যায় ; শুকপাখী—বৈষ্ণবপদে ও লোক-সংস্কারে শুক-সারী পাখির কথা আছে। এখানে শ্লেষে 'সুখপাখী' ; রূপের রূপ—রূপের অন্তর্নিহিত স্বরূপ।

(৬৩/৬৫) সাধকের সিদ্ধ।

খাক/ খাকি (আ. ফা)—সব কিছু মাটি দিয়ে গঠিত, আদম দেহ মাটি দিয়ে গঠন করে, আল্লা বীর্য মিশ্রিত করে দিলেন আদম দেহে। খাকি—দেহ ; আদম—দম সুমার ; কালেব—(আ. ফা) কল্‌ব, বাঁদিকের হৃদপিণ্ড ; ফেরেস্তা (আ. ফা)—দেবদূত ; আজাজিল—ফেরেস্তাদের প্রধান ও শিক্ষক ছিলেন। সৃষ্টির পর সৃষ্ট আদমকে সেজদা না করায় শয়তানে পরিণত হন।

খাস্তন (আ. ফা)—আদি শরীর (পরে মাটির দেহ—খাকতন)/বিশেষ সম্মানীয়/কাল্‌ব ; খোবিষ—নোংরা লোক (ক্রোধ) ; আব...ঘর—চাবভূতে গঠিত দেহ ; জান (আ. ফা)—(শব্দটির বহু অর্থ) প্রাণ/হৃদপিণ্ড ও তার সহায়ক প্রত্যঙ্গসমূহ ; কোন চিজে—কোন্ উপাদানে।

(৬৪/৬৬) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : তরিকার গান।

তোরিকত—ইসলামের সাধনার চারটি স্তর। শরীয়ত, তরিকত (শাস্ত্রবিধান মেনে সাধনা) হকিকত (সরল, সত্যবাদী হওয়া), মারফত। আউল—আদিতে ; বিছমিল্লা—প্রভুর নাম স্মরণের পর, ইসমে আল্লা/বীন্দ মে আল্লা। তিনটি অর্থ—আল্লার ৯৯টি নামের ১৯টি অর্থ প্রধান। তার মধ্যে আলেপ, লাম, মিম (লিঙ্গ, দেহ, যোনি) প্রধান। নবী...জুদা—এ তিনজন একত্রে মিলিত আছে ; সেজদা—আভূমি প্রণাম।

(৬৫/৬৭) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : আদম তত্ত্ব।

আদমে আল্লা আছে এ জন্য ফেরেস্তাদের আদমকে সেজদা দিতে বলা হয়েছিল ; কেননা "আল্লা ছাড়া সেজদা হারাম"। মানুষকে যারা অবজ্ঞা করে তারা আজাজিলের মতো শয়তান হবে—এই যুক্তি লালনের।

ছুরাত—বাহ্যিক দৈহিক রূপ ; নাপানাপী—লাফালাফি ; আদ্যধরণ—আদি ধর্ম/আদ্যকে ধরা।

(৬৬) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ : তারিকের গান।

সরার নামাজের বীজ : শরীয়তের নামাজের বীজমন্ত্র হচ্ছে 'হু'। তান্ত্রিক বৌদ্ধ বা হিন্দু বীজমন্ত্রের প্রভাবে সৃষ্ট এটি।

আরকাম...১৩ চিজ—নিয়ম-কানুন ; এবাদতের জায়নামাজে নানা ভিন্নতা আছে। এর ১০ চিজ প্রকাশ্য ; তিনটি গুপ্ত। ছালেকী—নবদ্বার বন্ধ করে জেকের করে রূপদর্শনের সাধনা কাদেরিয়া ঐতিহ্যে অতি-প্রচলিত/ সাধক বিশেষ।

মজ্জোবে—মহজাব—বাহ্যজ্ঞানহারা সমাধিমগ্ন সাধক ; ভেদ—যথার্থতত্ত্ব, গুপ্তজ্ঞান, অভিপ্রায়িক অর্থ।

(৬৭/৬৯) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ : দেহতত্ত্ব।

ছামনে-সামনে ; নিলে—নীল ; পীজরের বর্ত্ত—পিঞ্জর বা দেহ বর্তমানে চারভূতে গঠিত। ৯ দরজা—নবদ্বার ;

সর্নভরে—শূন্য ভরে ; ভাগুমিস্তারী—দেহের স্রষ্টা ; সন্দির পর—সন্ধান করে/পাও দেহের সন্ধিস্থলে।

(৬৮/৭০) প্রবর্ত্তের সাধক। ঈশান কোন কৈলাস নয়, কামরূপ।

ঈশান কোণ—বাঁদিকের তলপেটের স্থানবিশেষ ; সনে—শুনে ; পর/পরমেশ্বর—আমি ছাড়া সব কিছু পর ; নারী ; স্রষ্টা রজঃবীজ। সাধকের সাধনার সময়/পরে ঈশান কোণে পটোলের আকৃতিবিশিষ্ট এক পিণ্ডের চলাফেরা টের পায়। এটি রুদ্ধকাম বা বস্তু।

(৬৯/৭১) স্থূলের সিদ্ধ।

অনাশে—অনায়াসে ; গোলি—সঙ্কীর্ণ পথ ; পোড়ে ফুলি—ফুলে পড়ে।

অর্স্ব...মক্য—শব্দগুলি স্পষ্ট নয়। লা. গী. (পৃ. ৩২)-তে পাই 'অন্য জ্ঞান যার সখ্য মোক্ষ' (!)

ব্রক্ষ—বৃক্ষ (লা.গী.ব্রহ্ম)। নদীটি চার সরোবরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। শুক সরোবর—সুখের/শুষ্ক সরোবর।

(৭১/৭৩) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ।

চক্করা—চকোর ; লোকবিশ্বাসে চন্দ্রসুধা বা জ্যোৎস্না-পানকারী পক্ষীবিশেষ। দিনে এরা একত্রে থাকে ; রাতে পৃথক হয়ে যায়। প্রবর্ত্ত স্তরে চকোর সাধনা অনেকে করেন।

লেঙ্গ—লিঙ্গ ; লপংশোকো—নপুংসক ; চম্পক কলি—রাধাবিন্দু বা Ovam-এর রং ডিমের কুসুমের মতো ; এজন্যই চম্পক (বা হলুদ চাঁপার মতো)-বরণী রাধা বলা হয়।

ভৃঙ্গ রতি—ভ্রমের মতো মধুপানে সদা-তৎপর অটল সাধকের রতি/ভেঙে যাওয়া শুক্র বা ভগ্নরতি।

সামর্থা—কামসূত্রে দৈহিক গঠন ও যোনির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিত্রাণী, সঙ্খিনী, হস্তিনী এবং পদ্মিনী—এ চতুর্বিধ শ্রেণীর নারী পরিকল্পিত হয়েছে। এই দৈহিক বিভাগ অগ্রাহ্য করে বৈষ্ণবগণ কাম-বৈশিষ্ট্য ও মানসিক ভাবানুযায়ী তিন শ্রেণীর নারীর (সাধারণী, সামঞ্জস্যা, সামর্থা) পরিকল্পনা করেছেন। সামর্থা নারী আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে দয়িতকে সুখ দেয় এবং রক্ষা করে। রাধা এবং গোপবধূদের একাংশ সামর্থা নারী। কামনার প্রাবল্য এদের নেই। পুরুষ-সাধকদের ভীতি কামনাময়ী নারীর প্রতি।

(৭২/৭৪) সাধকের সিদ্ধ : পদ্মের গান।

তান্ত্রিক ষট্চক্র বা সুফী ছ'লতিফার পরিবর্তে বাউল গানে এবং বৈষ্ণব সহজ-সাধনায় অষ্টপদ্মের উল্লেখ পাই। অবশ্য তান্ত্রিক 'যন্ত্র' নির্মাণে এ পদ্মকে দেখা যায়। দেহে পদ্মের এ পরিকল্পনা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবজাত হতে পারে। দেহসাধনায় দ্বিদল ও অষ্টদল পদ্মের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

নিলে নির্ত্তর—নিত্যলীলার ; আড়াপদ্মের কোড়া—স্তন, স্তনবৃন্ত/পদ্মকলির মতো পুংলিঙ্গ; ভৃঙ্গ রতি—রজঃধারার সঙ্গে মিলনেচ্ছু শুক্র ; অক্য—ঐক্য।

(৭৩/৭৫) সাধকের সিদ্ধ।

মলমকে শিক্ষা দানের সূত্রে পদটি রচিত। অনুমিত হয় যে এটি লালনের প্রথম জীবনের রচনা। মলম তাঁর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই।

সাধক সিদ্দি প্রবর্ত্ত—প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ এ তিন স্তর। মানুষ...ধনি—মানুষ বা মানবিক গুণাবলী নারীত্বের স্বভাবসঙ্গত ঐশ্বর্য ; তাই মানুষ অনেক সময় নারীত্বের সমার্থক শব্দ।

(৭৪/৭৬) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

মনসুর হাল্লাজ—কবি, ভ্রমণকারী, তাত্ত্বিক সাধক হাল্লাক সুফী গুরুর অধীনে সাধনা শুরু করেন। শেষপর্যন্ত তিনি প্রচলিত সুফী পদ্ধতি ও সাজপোষাক পরিত্যাগ করেন। বহু দেশ ভ্রমণের সূত্রে ভারতবর্ষে এসেছিলেন হাল্লাজ। তিনি "আমিই হক বা আল্লা" ঘোষণা করলে ধর্মান্ধগণ তাকে কারারুদ্ধ করে, অবশেষে ৯২২ খৃ. অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে। আল আরাবীর দর্শনে, আবদুল করীম জিলির গ্রন্থে এবং আবুল খয়েরের কবিতায় হাল্লাজের মতবাদ রূপ পেয়েছে।

পৃথিবীর সকলে আত্মপরিচয়ে 'আমি' বলে ; যাকে আমরা তুমি/আপনি/তুই বলি, সে-ও জিজ্ঞাসিত হলে 'আমি' বলে পরিচয় দেয়। গীতায় কৃষ্ণ 'অহং' রূপে সর্বভূতের মূলে তার পরিচয় জানিয়েছেন। তাই 'আমি' বা আত্মা সমার্থক। জীবই শিব। আত্মতত্ত্ব জানেনা লিখিত শাস্ত্রানুসারীগণ ; এটি গুরুর কাছে অলিখিত ঐতিহ্যে পাওয়া যায়।

(৭৫/৭৭) সিদ্ধের স্থূল : প্রেম বা রসতত্ত্ব সিদ্ধ পর্যায়ের গান।

মনিরিশী—মুনিঋষি ; জুগোন্তর—যুগান্তর ; পেবশা—পিপাসা ; দোভাসা—দ্বিধাগ্রস্ত ; ভেড়ো (>ভট্টারক!)—ভাঁড়, ভণ্ড, স্ত্রৈণ, বোকা।

(৭৬/৭৮) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : উল্টা ভাষাভঙ্গির পদ।

বিছে—বীজে (রজঃ বীজহীন বৃক্ষ/লতা) ; ফুল—রজঃ ; ফল—স্তন ; গুরু...মানি—সাধিকানারী 'চেতনগুরু'।

(৭৭) স্থূলের সিদ্ধ।

সন্তে—শুনতে ; গোনাখাতা (ফা.) জ্ঞানপাপী/পাপের হিসাবের খাতা ; ইল্লিন—শেষবিচারের আগে পুণ্যাত্মাদের অবস্থান-স্থল ; সিজ্জিন—ঐ, পাপীদের অবস্থান-স্থল।

(৭৮) সাধকের প্রবর্ত্ত।

হুড়া—শুষ্ক, শীর্ণ ; কুল নদীর থাই—গুরুকুলের সাধনার অন্ত।

(৭৯) সাধকের সিদ্ধ।

আচলা ঝোলা—বহির্বাস ও ভিক্ষার ঝুলি ; ভেক ও খিলাফৎ গ্রহণকারীদের বাহ্যবেশ। ভিতরে তারা ডোর কৌপীন পরিধান করেন।

গৌরবালা—নিজেকে নারী কল্পনা করা হয়েছে।

(৮০/৮২) সাধকের সিদ্ধ ; গোষ্ঠের পদ, রাখালশিশুর বাক্‌ভঙ্গি।

বেহাল—বস্ত্রাদি অবিন্যস্ত/বৈষ্ণব-ফকিরদের সেমিজের মতো আগুলফ-লম্বিত জামা। মদের সাতে—মোদের সাথে ; সনে—শুনে ; সাফল—সফল।

(৮১/৮৩) সাধকের স্থূল : পূর্ব-পদটির উত্তর পাই এখানে।

বিওগ—বিয়োগ ; মরে—মোর; কোটীতে—কটিতে ; কৌপীন—ভেকধারীদের ব্যবহৃত

সাজ; করঙ্গ—নারকেলাদি ফলের খোসা দিয়ে নির্মিত পানপাত্র। রসসাধকের ব্যবহার্য এবং রসসাধনার প্রতীক এ করোয়া বা মালাই। রস-আস্বাদনের জন্যই কৃষ্ণ চৈতন্য হয়েছেন। এই চৈত্যন্যের অন্তরঙ্গ ধর্মের কথা চৈ. চ.-এ বিস্তৃতভাবে পাই। কৌপীন, করঙ্গ এবং মনের মানুষকে অন্তরে রাখা তিনবাঞ্ছা একান্তই লালনের/লৌকিকও বটে।

(৮২) সাধকের প্রবর্ত্ত। আবার প্রশ্ন করা হয়েছে।

করোয়া, কৌপীন, কেন্তা—চরিতামৃতে চৈতন্যদেব করোয়া কৌপীন, কন্থা ব্যবহারকারী গৌড়ীয়া ভক্তগণের কথা বলেছেন। রূপ সনাতনের বর্ণনা ঃ করোয়ামাত্র হাতে কাঁথা ছিড়া বহির্বাস (মধ্য, ১৯ পরিচ্ছেদ, চৈ. চ.)।

(৮৩/৮৫) সিদ্ধের স্থূল : পূর্বপদটির উত্তরের আভাস আছে এখানে।

বেতার—ব্যথার ; বেতিৎ—ব্যথিত ; ওর—শেষ (ব্রজবুলি শব্দ) ; শ্রীচরণ—নারী বা মনের মানুষের চরণ থেকেই কামবীজের সাধনা শুরু হয়।

*(৮৪/৮৬) সিদ্ধের স্থূল। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ।

মড়িএ—মুড়িয়ে ; দিন দোরদী—দীন দরদী (এক ধরনের ফকিরদের সর্বদা ব্যবহৃত শব্দ) ; সাল—শাল (বড়লোকদের ব্যবহৃত কাপড়)।

সত্য...দির্ব্বুজুগ দেখায়—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি॥ (চৈ.চ.আদি/৩য়)

হাএ কি—হায় একি ; ভাবিক—সমভাবাপন্ন।

(৮৫/৮৭) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : গৌরাঙ্গ বিষয়ক।

মাওা—মায়া ; বএশে—বয়সে ; ফকির হলি—লালনের দৃষ্টিতে ফকিরি এবং সন্ন্যাস সমার্থক ; বিএ—বিয়ে ; মেএ—মেযে ; নাচের ভিকারি—নাচ ও গানে চৈতন্যবর্গ সময়াতিপাত করতেন ; ভিক্ষাজীবী ছিলেন তাঁরা। সেকালের সমাজে এ ধরনের ভিক্ষাজীবী ছিল। বাউল বা লালন নিজেও এই দলেরই একজন।

কৌপীন খুলে ফেল—নিত্যানন্দ সন্ন্যাস পরিত্যাগ করে সংসার করেছিলেন। ব্যাপারটিতে লালনের সমর্থন আছে।

মায়ে কএ রে—মা বলে, পূবর্ববঙ্গীয় ভাষা-রীতি এটি।

*(৮৬/৮৮) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত।

উল—সন্ধান ; বেপার—ব্যবসা ; আস্লেলে বিনাস—মূলধন নষ্ট হওয়া। পাচবাড়ির—নিম্নাঙ্গের নির্গমন-দ্বারগুলির।

(৮৭) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত।

এলাহী...আল্লা—(ফা) হে আমার প্রভু, প্রতিপালক/এ—আল্লা, লা—দেহ, হি—নবী ; আলামীন—ধৈর্যশীল ; নুহু—বাইবেল-কথিত নোয়া/ক্রন্দনকারী ; মেহের—দয়া ; নেজাম—চিস্তিয়া শাখার প্রখ্যাত গুরু, আজমীর শরীফে সমাধি; আউলে—আউলিয়া মতবাদে ; রহমী—দয়া ; কাফের—নবীবিরোধী কুফার জনগণ ; ইসলাম বিরোধী ; মওয়াহেদ—একেশ্বরবাদী ; দোজখ—নরক/ শাস্তিস্থল ; খালাষ—মুক্তি ; টেলে—টলে ; দায়মাল (আ. দামেয়+উল+হংস) —চোরাই মাল ধরা পড়ায় আজীবন কারাবাস।

(৮৮/৮৯) (প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত) সিদ্ধের স্থূল।

নিয়াৎ বেন্দে—একাগ্র মননে ; তোন—তনু ; মানুষ কামনা—প্রায় সর্বত্র শব্দটি 'মনস্কামনা' হিসাবে সম্পাদিত। মানুষ মানুষকে চায় ; কল্পিত কাউকে নয়। মহর—মুদ্রাঙ্কিত/কুলকুণ্ডলিনী ; ঘর—দেহ।

(৮৯/৯১) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত (স্থূলের প্রবর্ত্ত)।

আদ মাক্কা—আদিমক্কা/অর্ধেক মক্কা ; মরিশ্‌কেন—মরিস কেন ; ৪ দ্বার ৪ নুরি এমাম : চোখে থাকেন মেকাইল, কানে থাকেন আজরাইল, নাকে ইস্রাফিল, মুখে জিব্রাইল ; ১০ দুয়ারী—দশটি দুয়ার হচ্ছে নবদ্বার এবং রজঃবীজ নির্গমনের পথ। শেষোক্ত পথটি সাধুদের ধ্যানের স্থান। গোর্খ-বিজয়ে এ-দ্বারের উল্লেখ আছে। [পৃ. ১৯, ৮৮, ৯১] ।

আদু...মেয়ে—চৈতন্যলীলায় মাধবীদেবীকে 'আধ' হিসাবে গণনা করা হতো ; রাধাও 'আধা'/আদ্যা প্রকৃতিই মূল। স্মৃতিতে যে সমস্ত দেহ-রূপ আসে, আদি প্রকৃতি দেখায় সব। নারীর, রজঃ আদি বা আধা।

(৯০/৯২) সিদ্ধের স্থূল (প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত)।

আছমানী—কামক্রোধাদি আকাশ থেকে জাত, এজন্য এ বৃত্তিগুলি আসমানী ; বাহা—রাস্তা ; অগোরচোরা—অগোচরচোরা/অগোচরা ; মন বুদ্দের—মন বুদ্ধির।

(৯১/৯৩) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

কৈট—কূট/ কুটিল, কোটি ; শুমদ্র—সমুদ্র ; পরর্থে—পর অর্থে ; আন্দ করূণা—অর্থ স্পষ্ট নয় (!)

(৯২/৯৪) স্থূলের সিদ্ধ।

দেরকী—দেরি কি; কুঘাবে—কু ঘটাবে/কু গাবে।

(৯৩/৯৫) সাধকের সিদ্ধ।

সাম—শ্যাম ; পঞ্চননে—পঞ্চাননে।

(৯৪/৯৬) স্থূলের সিদ্ধ।

বান্দাল—বাঁধ, শর্ণভরে—শূন্যে ; প্রম—প্রেম।

জল সুখালে মীন... —রজঃস্রোতে ভেসে আসে রাধাবিন্দু ;/এ সময় আলজিহ্বায় মিলনে সুখের স্বাদ অনুভব করছে যে, রস শুকালে সে আনন্দ থাকে না।

(৯৫) সাধকের সিদ্ধ।

আই—আয়ু ; জেন্দেগী—জীবন ; হায়াত—আয়ু ; মওত—মৃত্যু ; ডোফ—ডুব দাও।

শ্রীপাট—বৈষ্ণব সাধকদের জন্ম/সাধনস্থান/শ্রী-পট্ট=যোনি।

মরে— জদি...মৃতদেহ জলে ডুবে আবার ভেসে ওঠে ; গুপ্ত সাধনায় শুক্র স্খলিত হয়ে আবার ফিরে আসে।

(৯৬/৯৮) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত [যে সব গানে পরিবর্তনের/সংশোধনের প্রচেষ্টা থাকে, সে গান প্রবর্ত্ত দেশের]।

নাপানাপী—লাফালাফি ; সর্নকার—স্বর্ণকার/শূন্যকার; গ্রহ—গৃহ; নিরিক—দৃষ্টি; টার—ধাক্কা; পাচপিরে চলন—এ দেশে ইসলামের পঞ্চপীর বিখ্যাত। চট্টগ্রামে এবং নাবিকদের মধ্যে

এদের স্মরণ করা হয়।/পঞ্চভূতই পাঁচপীর। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলিই পীর। ৮৪—জন্ম-মৃত্যু রোধ না করে দেহগ্রহণ।

(৯৭) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

মুন্সী—লেখাপড়া জানেন; মৌলবী—বিদ্বান; মওলানা—বিদ্বান ও ধর্মযাজক; রোজ কেয়ামত—শেষ বিচারে পুরস্কার ও তিরস্কারের দিন। সরার কাজী—সরিয়তের তত্ত্বজ্ঞ।

এক গো রো...নাই—ইসলামে আল্লার পথে মরে যাওয়া ব্যক্তিদের মৃত বলা নিষিদ্ধ।

পরলোক এবং পুনর্জন্ম নিয়ে সামাজিক বিতর্ক নচিকেতার যুগ থেকে শুরু হয়েছিল।

দাহির—নাস্তিক, বস্তুবাদী, বীজেশ্বরবাদী।

(৯৮) সিদ্ধের স্থূল।

কপাট মারো—বন্ধ করে দাও; নিলে বাশে—লীলার বাসনায় বা বাসায়/অতিরিক্ত দেহমিলনে মৃত্যু অনিবার্য; কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদির সন্তানের জন্ম হয়েছিল। ডোর কৌপীন পরিধান হচ্ছে কামের ঘরে কপাট মারা।

হুসারে—হুসিয়ারে; পারদ—যা পার করে, পারদের মতো ভারি, চঞ্চল, নীলাভ শুক্র।

(৯৯) স্থূলের প্রবর্ত্ত : সাধুসঙ্গের মহিমা।

মহৎ নামের—মহাজন গুরুর; নামের মহিমা—নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ এক (চৈ.চ. মধ্য,১৭) , নামের মাহাত্ম্য ও নাম-জপে চৈতন্যের উন্মত্ত দশা পাই। চৈ.চ. (আদি, ৭ম)। বৃন্দাবন দাস নাম-প্রচারকেই চৈতন্যলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য বলেছেন। নাম শ্লেষার্থে বস্তুবাচক বা বস্তু।

সাধু পরশীলে—স্পর্শে জীব সাধু হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়নির্ভর সাধনা এটি। From a touch the world was born (Kabir, sabda 41) চাতক প্রতীকের ব্যবহার কবীরের ৫, ৭১ শব্দে আছে।

(১০০) সিদ্ধের সাধক।

অযোনি, সহজ, সমস্কারা—তিন মানুষের নাম অযোনি, সহজ, সংস্কারা।

(১০১) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

বেজেতে—বুনো, জাতহীন (নদীয়ায় 'বুনো' জনগোষ্ঠী জাতি-শৃঙ্খলের বাইরে); নিম্বভিক্ষ—নিম্ববৃক্ষ: কুচু—কচু; তেতোল—তেতুল। চুবরী ঘরা—চর্বির ঘর/ঢোক গিলে যে স্থানে চাপ পড়ে গলার; মান গোঁ-সাই—পূর্ববঙ্গের লোকবিশ্বাস/মা গোঁসাইরা উগ্রা।

(১০২) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

তুলনায় অপরিণত এ রচনাটি। ভাষা নিয়ে মূল্যবান মন্তব্য আছে। আছে আত্মজৈবনিক তথ্য।

পোড়া...থাকে—পোড়া মাটি চার যুগ পরে মাটিতে মেশে; সিদ্ধ দেহের ভূতগুলি তদ্রূপ পৃথক থাকে। পূর্বে ফেরো—পূর্বের কর্মফলে; খারাফ—খরাপ; পাগ্লা...ভাশা—পাগলামির ছলে বলা সাধুদের ভাষা বোঝা কঠিন। চৈতন্যদেব ও তাঁর ভাষাকে বাতুলের প্রলাপ/প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন (চৈ.চ. মধ্য/২৪; মধ্য/৮;)।

(১০৩) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

আই—আয়ু; প্রতিবাদে—প্রতিপদে; খোত্না—খৎনা, লিঙ্গত্বকচ্ছেদ কৃত্যবিশেষ; সাধু গুরু বষ্ট—সাধু (ফকির মতে আল্লা, রং লাল), গুরু (নবী, রং কালচে); বৈষ্ণব (আদম, রং শ্বেতভাব)—রজঃকালীন ত্রিধারা।

(১০৪) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

পদটি লালন-শিষ্য মদনের। ঘুকশী—গুপ্ত ব্যভিচারী।

(১০৫) প্রবর্ত্তের ঠেশ : দৃষ্টান্ত প্রমাণে ভক্তকে বলছে।

বেঙ্গা—মুরারী শীল কালকেতুর সোনার আংটি নিয়ে ঠকানোর জন্য বলেছে : 'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল'। সাল পটুক—শালকর; কোষ্টার—দেশী পাট/ শন; পেচ পলো—গলা কাটা হলো; জহরি—মূল্যবান মণিমুক্ত-জহরতের ব্যবসায়ী; ফেকোম—পেখম; মওরের নিত্য—ময়ূরের নৃত্য। তুলসীদাসের দোহায় পাই—'সাচ বোল তো মারে লাঠ্ঠা ঝুঠা, জগৎ ভুলায়।

*(১০৬) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

জর্ম—জন্ম;

(১০৭) সাধকের/সিদ্ধের স্থূল।

গলায় কেঁতা—চৈতন্যের ছিন্ন কন্থা বাস, সন্ন্যাসগ্রহণ; হাড়মাল—১০৮ বার পার্বতীর মৃত্যুর পর তার দেহাস্থি দিয়ে তৈরি শিবের মালা; রূপ শোনাতোন ওজীর—রূপ সনাতন মন্ত্রী ছিলেন।

(১০৮) সিদ্ধের স্থূল।

বেদলো—বিঁধল; টেনলে—টানিলে; নালন বলে...ভবে—বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণে প্রচলিত কুলাচার নষ্ট হয়।

(১০৯) সাধকের সিদ্ধ।

সজল ঔদয়—মেঘোদয়/রজঃবিকাশ; প্রম পাতিজাল—প্রেমের জাল দিয়ে অধরকে ধরতে হয়।

এ জলে ফসল ফলে/ দেহ পুষ্ট হয়। মীন বা মাছের প্রতি দুর্বলতা আছে বৈষ্ণব ও ফকিরদের। 'গঙ্গা ফল' সঙ্কেত-শব্দে ম.ছ বোঝায়। মাছ খাওয়ার পেছনে এদের যুক্তি যে পূর্বপুরুষগণ মাছ খেতেন তাই মৎস্য-সত্তায় আমাদের জন্ম। তাছাড়া ১. শীতল জলের মাছ দেহকে ঠাণ্ডা রাখে; এটি গরম খাদ্য নয়। ২. মাছের চোখের পলক পড়ে না। বস্তুরক্ষার সাধনায় নায়িকার চোখে অপলক তাকিয়ে থাকতে হয়—পলকে প্রলয় ঘটে। এ গুণ মাছের সূত্রে লভ্য। ৩. উজান স্রোতে চলতে পারে মাছ; তাই উজান সাধনায় মৎস্য সহায়ক ৪. 'মাছের নেই মাছা' (কথাটি সত্য নয়) অর্থাৎ দেহসঙ্গম হয় না মাছের। সুতরাং কামহীনতা মাছ খাবার সূত্রে দেহে সংক্রামিত হতে পারে।

বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে মৎস্যাবতার অন্যতম। লালনের 'মীন' প্রতীকে তার ছায়া আছে। সুফী সাহিত্যের নয় এ প্রতীক।

ভেড়ো—ভাড়রা গ্রামবাসী বলে ভেড়ো বিশেষণটি অনেকে গ্রহণ করেছেন। অন্য অর্থ পূর্বে আলোচিত।

(১১০) সাধকের সিদ্ধ/ সাধকের স্থূল : গুরুপদ; রজঃসাধনার ইঙ্গিতবহ পদ।

অমরতো বারি—যে রস খেলে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়; বারি, বার এলাহী—আল্লার নাম/রসযুক্ত আল্লা; অনুরাগ নলে কী... —কুমারীর প্রথম রজঃ ব্যবহারে সাধক বস্তু-রক্ষায় সিদ্ধ হয়; এ রস অনুরাগ না হলে ধরা যায় না। ছায়াহিন এক মহামনি—নবীর ছায়া নেই/ভগলিঙ্গ , মন, কাম এদেরও ছায়া নেই।

মাটী—শ্লেষে (ক) ক্ষেত্র (খ) মা।

(১১১) সিদ্ধের স্থূল/প্রবর্ত্ত : গুরুপদ, রজঃসাধনা বিষয়কপদ।

বের্ম্মোলোক—ব্রহ্মালোক; দ্বিদল—যোনি; ১৬ দল—বক্ষ; দশমদল নাভি, শতদল—কণ্ঠ; সহস্রদল—মাথা; ৬ দল—নাভির নিম্নে যোনিমণ্ডলে; তিরো—তীব্র/তিন দিনের ধারা।

এ রূপ দর্শন করতে পারে বস্তুরক্ষাকারী সাধক। রূপের সঙ্গে রতির মিলন হয় শূন্যে (মুখে)।

(১১২) সাধকের সিদ্ধ/সিদ্ধের স্থূল : গুরুপদ—রজঃসাধনা বিষয়ক পদ।

চাঁদ-যোনি; বেদসাধনে—এ সাধনা বেদবিরোধী, দিনের অধীন—দ্বীন (ধর্ম)-এর অনুগামী।

(১১৩) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ/ সাধকের প্রবর্ত্ত : গুরুপদ।

করণ, করণী—সাধনা করা; খোদে খোদা—স্বয়ং খোদা/জন্ম দেন স্বয়ং খোদা বা নারী; বিণা—সন্ধান; ফাণা—পূর্বোক্ত/রূপদর্শন, দ্বিদল দর্শন, গুরুদর্শন, নামে মগ্ন—এ চার ধরনের ফাণা; আর মনের শূন্য অবস্থা পঞ্চম প্রকার ফাণা।

(১১৪) সাধকের সাধক : গুরুপদ।

তেল...তুলা—তেল ও তুলা দিয়ে বাতি জ্বালানো প্রাচীন গ্রাম্য পদ্ধতি। সাধকেরা আলোয় সাধনা করতে ভালবাসেন। বেদের বিদয়—বেদের বিধানে; ঘোর—আচ্ছন্নতা; বর্ত্ত থাকতে—বর্তমান থাকতে।

*(১১৫) সিদ্ধের স্থূল/সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : গুরুপদ। (পদটি অপূর্ণ; পূর্ণাঙ্গ পদটি ২২৭ নং)।

লক্য—লক্ষ্য কামগায়ত্রীতে দেহে ২৪ চন্দ্র পরিকল্পিত। (২০ নখে+নাভি, স্তন, ঠোঁট, কপাল) এছাড়া আদি দ্বিচন্দ্র—ভগ, লিঙ্গ। রজঃবিকাশ চন্দ্রোদয়। দেহের চারভূতের পরিণামগুলি চারচন্দ্র।

(১১৬) প্রবর্ত্তের স্থূল : গুরুপদ। পদটিতে ইসলামী উপসম্প্রদায়গুলি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

(১) ৪ জন ইয়ার (২) চার যাজন/৪ তরিক (৩) ৪ কোরাণ।

জাহেরাতে—প্রকাশ্যে ১. আবুবক্কর, ওমর, ওসমান, আলী।
২. শরীয়ত, তরীকত, হকিকত, মারফত।
৩. ফুরকান, ইঞ্জিল, তৌরাদ, জব্বুর।

বাতন বা গুপ্ত সাধনায় : ১. চোখ, নাক, মুখ, কান।
২. প্রাগুক্ত চার ইন্দ্রিয় চার ইন্দ্রিয় চার ধরনের অনুভব করে স্রষ্টাকে—এ চার পন্থায় সাধনা বিভক্ত।
৩. মুখ, কান, চক্ষু, নাক।
তরিক—পথ/সাধনা পদ্ধতি; দিনের ডঙ্কা—দ্বীনের ডঙ্কা।

(১১৭) সিদ্ধের স্থূল : ঈশ্বরভাব থেকে মানবভাবে নবদ্বীপে এলেন চৈতন্য। সাম—শ্যাম; অগর—অগুরু; চর্ন্নন—চন্দন; লঞ্চাৎ—লুটায়। ভাবক (ও ভাবিনী)-শব্দ চট্টগ্রামের দৌলত কাজী, আলাওলের রচনায় পাই। আকর্যক ও আকর্ষিত অর্থে; অনুভাবে—অনুসরণে; চাঁদকে হরণ—মনের অধিষ্ঠাতা দেবতা চাঁদ, তাই শব্দটির অর্থ মনোহরণ। শ্যামচাঁদের উত্তম—চৈ.চ. বর্ণিত সর্বপ্রাণী-আকর্যক কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে নাচায় রাধা (আদি; ৪র্থ : জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী)।

(১১৮) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : ঘড়ির রূপকে দেহতত্ত্ব বর্ণিত। হঠযোগ প্রদীপিকা, স্বরোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বৈশিষ্ট্য দ্বারা পঞ্চতত্ত্বের উদয়; কু-সু নির্ণয়, কর্মসূচনার যোগ নির্ণয় করা হয়। রেচক, কুম্ভক, পূরক দ্বারা স্বাস্থ্য ও বস্তুরক্ষা করা হয়। বৌদ্ধ গুপ্ত সাধনার 'অনাপানা সতী'তে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে অনুসরণ করে দেহাভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ এবং দৈহিক কু-গুলিকে মুছে ফেলা হয়। বামাক্ষ্যাপা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং লৌকিক গুপ্তসাধক গোষ্ঠীতে নিঃশ্বাস 'দেখার' এ সাধনা প্রচলিত আছে। এ পদে লালন কেবলমাত্র বায়ু সাধনার কথা বলেননি।

ছে-মণ্ডলা—ষড়রিপু/শির প্রধান; শব্দ—হৃদপিণ্ডে এবং অন্যত্র সাধনায় নানা শব্দঘাতের প্রতিক্রিয়া শোনা যায়। ঠিকের ঘর—প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সচেতন হয়ে অনুসরণ করলে মনে কোন কুচিন্তা আসে না।/দেহমিলনে বস্তু ঠিক রাখা।

(১১৯/১২০) সাধকের সিদ্ধ : সাধনার শেষে জানা যায়।

নুর—নুর বা শুক্র রক্ষা করলে আলা হয়, আলা থেকে হয় আল্লা। সত্তা গলিত হয়ে যা আসে (শুক্র) তা ইলাল্লা।

আরসবারি—প্রভুর বসার স্থান, ভক্তের হৃদয়; বলন—পুষ্টি, বর্ধন, যৈছে—যেমন (ব্রজবুলি শব্দ)। (১২০/১২১) সাধকের প্রবর্ত্ত ঃ গুরুপদ।

ডুবারু—ডুবরী; বেদনারে—বেঁধেনারে; খাড়—নরম মাটিতে গর্ত; তিরোসন্দি—ত্রিসন্ধান; বন্দি—বন্দনা করে; এস্পে—এসবে; দিন অবতার—দ্বীন (ধর্ম) অবতার (এবং দীনবন্ধু সিরাজকে বলা হয়েছে)।

(১২১) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত :

ব্রজো........ছিল—চৈতন্য অবতার হবার নানা শাস্ত্রীয় উল্লেখ তাত্ত্বিকেরা করেছেন (চৈ. চ. আদি / ৩য় পরিচ্ছেদ)। কিন্তু চৈতন্যের তো মৃত্যু হয় না। তাহলে এখন তিনি কোথায়? স্বরূপে সেই চৈতন্যশক্তিকে জানাই লালনের অগ্রজ হাল্লাজের সাধনা। নিজ......কারে—চমৎকার সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে।

(১২২) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : পূর্ব-পদটির ব্যাখ্যা এ পদটি। পড়ে....পণ্ডীৎ—বাস্তব বুদ্ধি-বিবর্জিত পণ্ডিতবর্গ; প্রবর্ত্ত নয়—সাধনায় প্রবৃত্ত হয়নি; নিদ্রে—মৃত্যু ও একধরনের ঘুম।

(১২৩) সাধকের সিদ্ধ :

পুণ্যমাশী—পৌর্ণমাসী / মাসপূর্ণ ; মাসান্তে—মাসের শেষে; সজ্ঞ—সর্গ; লালন এখানে দেহের রজঃবিকাশের মাসের অমাবস্যা-পূর্ণিমার কথা বলছেন। প্রচলিত মতে ৩০ দিনে মাস; ১৫ দিন কৃষ্ণ ও ১৫ দিন শুক্লপক্ষ। চাঁদের ষোলকলা পূর্ণ বা ক্ষয়িত হতে লাগে ১৬ দিন। তাই পূর্ণিমা হয় তথাকথিত কৃষ্ণপক্ষে এবং অমাবস্যা ঘটে ঘটে শুক্লপক্ষে।

(১২৪) সিদ্ধের স্থূল : নিমাই সন্ন্যাস।

ভারতী—চৈতন্যের সন্ন্যাসের গুরু কেশবভারতী উত্তরকালে বৈষ্ণবদের ভেকের গুরু। শোগানলে—শোকানলে; দিএছে কোপীন ডোর—চৈতন্যও ভেক নিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে; ফাফোর—ফাপর।

(১২৫) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : নিম্নগামী বস্তুকে ঊর্ধ্বগামী করাই নয়, 'মানুষের' সাধনা। মানুষের কারণ—মানুষের সাধনা টল বা অটল নয়; বৈদিক ভোল—বেদবিহিত প্রাগুক্ত সাধনা-দ্বয় রাগসাধক নেয় না। দর্শনে......রয়—দর্শনে নয়, পরশনে এ সাধনা। জটর জ্বালা—কাম বা পুনর্জন্ম।

(১২৬) সাধকের সিদ্ধ।

মৈথন দণ্ডে—মৈথুন দণ্ডে/পুরুষের লিঙ্গ; আসা জায়া—জন্মমৃত্যু; ক্ষ্যায়া—কে পার করে জন্ম থেকে মৃত্যুতে বা তদ্‌বিপরীতে? চর্যাপদে এক বৃদ্ধা ভবনদী পার করে, ঐ আদ্যাদেহ সৃষ্টি ও ধ্বংস করে।

(১২৭) প্রবর্ত্তের স্থূল।

মলে.....হেতা—বর্তমানে ইহজীবনের সেবামূলক এ সাধনায়, সেবার পাত্র প্রয়োজন; শেরূপ আকার—আকারে স্রষ্টাকে দেখা; ভজন—অন্যকে সেবায় তুষ্ট করা; মড়ায়—মুড়ায়।

(১২৮) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

সাধুর মেল—সাধুদের মিলন-সভায় / মেলায়; লক্ষ যুনি—লক্ষ যোনি; দেব.....বাঞ্ছিত হয়—স্বয়ং কৃষ্ণ নররূপে আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেছেন; এ লীলা কৃষ্ণের সর্বোত্তম। বেচাকেনা—ব্যবসার অনুষঙ্গ; সাধনার অচ্ছেদ অঙ্গ; বিক্রয় করা ও কেনা অবশ্য বস্তু-বিনিময় প্রথায় (বার্টার) পরিচালিত হয়। লাভ করায় যে অন্যকে ঠকানো বা বঞ্চিত করা হয় এ বোধ লালনের নেই। মূলধন বাড়াতে তিনি উৎসাহ দেন। কুল—ভিত্তি / আশ্রয়।

(১২৯) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

পঞ্চজনা—চারভূত ও রজঃবীজ; ১৬ জনা—১০ ইন্দ্রিয় ষড়রিপু; খিতি....বেনা—দেহের উপাদানগুলি দেহান্তে ভূতগুলিতে ফিরে যায়; ভৌর—ভর; আত্তাকত্তা—আত্মাকর্তা; নালন....ঠিক হলো না—নালনের সঠিক পরিচয় কী, তিনি জানতে চান।

(১৩০) সাধকের সিদ্ধ; রজঃসাধনা-সম্পৃক্ত পদ।

অমল্ল—অমূল্য; মকত্তৌ—মুক্তো, রত্ত—রত্ন; তরফা—হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। পদ্মহীন সরোবর—বিগত যৌবনা / কিশোরী।

(১৩১) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত :

নারে—নাইরে; নাম......প্রায়—গোয়ালা হয়ে দুগ্ধজাত দ্রব্য না খেয়ে বাসিভাত খায়, তদ্রূপ অসাধক ফকির আছে। যথার্থ সাধক চিরকাল, 'কোটিকে গোটিক'। তিনটি তারে—তিন নাড়ি; ত্রিগুণ।

(১৩২) সিদ্ধের সাধক।

জেন্তে—জানিতে; গাতা—গাঁথা; আলেক লতা—আলোকলতা—অনেকের ধারণা বিনা বীজে এর জন্ম হয়। তোরবি—উদ্ধার পাবি; সর্নকার—শূন্যকার; মানুষ আকার—লালন নিরাকারের উপাসক নন; মনুষ্যমূর্তি এবং মানুষ-ভজনের তিনি প্রবক্তা। পরের পদটি এ পদের উত্তর।

(১৩৩) সিদ্ধের সাধক।

যে চারে হয় ধর গটন—যে চার ভূতে হয় দেহগঠন, আগোম—আগম / গুরুমুখ নিঃসৃত আগত বাক্যে; সতন্তে—সৎ হয়ে সর্বদা; মন মানুষ....ছাড়াছাড়ি—সাধারণ মানুষ, মনের মানুষের সঙ্গে সাধকের অনুসন্ধেয় মানুষের সম্পর্কসূত্র-নির্ণয়ের সূত্র আছে এ পদে।

(১৩৪) স্থূলের প্রবর্ত্ত : পারের গান।

নিতাই চাঁদ—নিত্যানন্দ / নিত্যা; নেএ—নেয়ে; হোরি....রাধা নামে বাদাম—নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ নাম ও উপাসনা প্রবর্তন করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। নিত্যানন্দ জাতিভেদ অগ্রাহ্য

করে, প্রথাদি অস্বীকার করে জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। ভক্তী চোটে—ভক্তি নষ্ট হয়ে।

*(১৩৫) স্থূলের স্থূল/প্রবর্ত্ত : পারের গান।

শৌভাজ্ঞ—সৌভাগ্য।

(১৩৬) সাধকের সিদ্ধ : রজঃ ও রসসাধনা-সম্পৃক্ত পদ।

ভেসচে—ভাসছে; সাতার—বহু জল; রষ নিলে—দেহে রসের লীলা, সাপোল—সফল; জোগমাওা—যোগমায়া / যোগমাতা; কৌশলে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটান যোগমায়া, বিলাস দর্শনে তার আনন্দ। সরণ—স্মরণ।

*(১৩৭) সাধকের প্রবর্ত্ত।

নিলে—লীলা; ক্ষেপা—অন্যত্র দেখি বস্তু হারিয়ে সাধকেরা ক্ষেপা হয়, এখানে দেখি তত্ত্ব বুঝতে অক্ষমজনকে ক্ষেপা সম্বোধন করা হয়েছে। আপ্নী....পোরে—ভাল এবং মন্দের মধ্যে একই সত্তা ক্রিয়াশীল; মাজিষ্টেরি—বিচারক; গর্থে—গর্তে; জেনলে—জ্বালে; ধান্দা—ধাঁধা।

(১৩৮) সাধকের প্রবর্ত্ত।

মাল্লিগো—মারিলি গো; শীবো—শিব; দুসি—দোষী; মনিন্দ্র—মুণিগণ / মুনিশ্রেষ্ঠ।

'লালন সেই কৃষ্ণ' নিদয়া জননীকে এ তথ্যটি জানানো হয়েছে। ঘোর—আচ্ছন্নতা।

(১৩৯) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : কৃষ্ণের নরলীলা।

ওছিষ্ট—উচ্ছিষ্ট; বশ্র—বৎস; নারির চরণ—জয়দেবের দেহি পদপল্লবমুদারম শ্লোকের প্রসঙ্গ স্মরণ করা হয়েছে। নারীকে এই মর্যাদা দান লালনের সাধনার বৈশিষ্ট্য।

(১৪০) সাধকের সিদ্ধ : পদটিতে পাই মহাভাব-স্বরূপিনী রাধার প্রেমার্তি এবং লালনের আত্মস্মৃতি। জেদেখি—যেদিকে / সর্বত্র কৃষ্ণস্ফুরে; সিবোভোলা—শিব ভোলা / একাধিক কলমী পুঁথিতে শিবপার্বতীকে কৃষ্ণ-রাধার অনুসারী করে বর্ণনা করা হয়েছে। শৈব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষ্ণমহিমা।

(১৪১) স্থূলের সিদ্ধ।

নিঃসঙ্গ লালনকে ফকিরি নেবার সময় সিরাজ প্রবোধ দেন। ঝাকমারি—ঝকমারি; কোপ্নী—কৌপীন; ডুরি—ডোর/দড়ি—মৃত্যুর পর যমদূত বেঁধে নিয়ে যায় মানুষকে এটি লোক-বিশ্বাস। ঘর পোড়াবে—দেহভস্ম হবে [হিন্দু সংস্কার!]

এন্তেজারি—(আ. ফা.) নিরলসভাবে অনুসরণ।

(১৪২) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত ; গোপীপ্রেমের মহিমা। তাইতে হয় তারি—সেভাবেই তিনিও ভজনা করবেন; শ্রীনারায়ণী—লক্ষ্মী, এ প্রসঙ্গটি চৈ. চ. (মধ্য/৮) বিস্তৃত করেছেন রায় রামানন্দ।

(১৪৩) সাধকের সিদ্ধ।

মেওা—মেওয়া; মেতা—মিষ্টত্ব / স্বাদ; নেঘাবান—বানের প্রতি একনিষ্ঠ / নরনারী। জর্মা—জন্ম; ব্রথা—বৃথা। বৃষ্টি ও বৃক্ষ-জন্মের বৈদিক প্রতীকটি লালনও ব্যবহার করলেন।

*(১৪৪) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

জিবের....টাটী—জীবের নজর আড়াল করে (টাটী— বেড়া); পরের—দেহের পরিচালক মূলবস্তু; মুটে—অন্যের / ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা; বেহাত—হ

*(১৪৫) সাধকের সিদ্ধ।

লা. গী. ও অন্যত্র পদটি বিকৃত।

যুতি—যুক্ত করে; নালমতি—লালমোতি (রজঃ); দেখপী—দেখবি।

(১৪৬) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

উপোশোনা—উপাসনা / সাধনা; আমির বেনা—আমির তত্ত্ব। বারভাটি—দেহের বারোটি স্থান; বারো বুরুজ।

*(১৪৭) সাধকের সিদ্ধ; পূর্বপদটির উত্তর।

আমি সত্য.....কোনরূপ—আমার অস্তিত্ব থাকলে গুরুর অস্তিত্ব থাকে; আমি....দিনদয়াময়—প্রত্যেকে নিজের আদলে স্রষ্টাকে ধারণা করে; আত্মা—দুদ্দুর গানে আছে "বস্তুকেই আত্মা বলা যায়"।

(১৪৮) সাধকের সিদ্ধ।

কবে তার মালঞ্চ ফোটে—ফুল ফোটে; নিজ....পরপুত্র বলিদান দেয়—জীবহত্যা করে / বস্তুস্খলনে আনন্দ, মখ—মুখ।

(১৪৯) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

আন্দার—আন্ধার, ফেরে—বিপদে।

(১৫০) সাধকের সিদ্ধ।

জরা মৃতো—জরা এবং মৃত্যু; জোবান খাড়া—সত্যনিষ্ঠ, হকদার; উপোসাখা—চৈ. চ. ভক্তিবৃক্ষের উপশাখা ছেদন করতে বলা হয়েছে। কুটিনাটি, হিংসা, লোভ, প্রতিষ্ঠা, মুক্তি, ভুক্তি জলসেচনে বর্ধিত হয়ে মূল শাখাকে বাড়তে দেয় না : প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন। তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥

(মধ্য / ১৯)

শক্তী পদো...সুর্দ্দু প্রেমের হবে উদয়—'শাক্ত শক্তি' অর্জন করতে চায়; অনেকে শক্তিদেবীর কাছে ভুক্তি (ভোগ) ও মুক্তি চান। এগুলি হেতুভক্তি। সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চ বিধাকার।।

এই যাহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী। (চৈ. চ. মধ্য / ২৪ পরিচ্ছেদ)

(১৫১) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

ভেহেস্ত—বেহেস্ত, স্বর্গ; আদ—আদি; দোটানা—দ্বিধাগ্রস্ত।

(১৫২) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত। পূর্বপদের উত্তর।

ধুড়ে—খুঁজে; তোবা পোড়ে—ভুল স্বীকার করে, ভুল না করার প্রতিজ্ঞা; পাড়ান নর্খ—নামে খ্যাত হওয়া লক্ষ্য; কালাম—কোরাণের বাণী।

(১৫৩) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

বাও—বাতাস।

(১৫৪) স্থূলের প্রবর্ত্ত (প্রবর্ত্তের পদে পরিবর্তন করার চেষ্টা থাকে)।

সাইর বাজারে—গুরুকুলে; পস্তাবি—অনুশোচনা করবি; আচাই—সন্তানের জন্মাদি; নাড়ানাড়ি—অনেক মতে নাড়-পাদের শিষ্য; বা কড়ি, নারকেল, মালাধারণে যোগী হওয়া। মতান্তরে মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী / সর্বকেশ-বিবর্জিত কলন্দর ফকিরগোষ্ঠী / ভেকধারী ভিক্ষুক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী (এভাবেও পড়া যায়)। বেড়ায়, ফাতরায়, বেড়ায় কুলচী ফেরে—নানা

কুখাদ্য খেয়ে মুখ ধোয় বারবার। ইসলামে শুক্রস্খলনে স্নান করার বিধান আছে। ফাতরা—দরিদ্র ইসলামি জনতা কলাপাতার বেড়া / পর্দা দিয়ে কুল রক্ষা করতে চায়।

(১৫৫) সিদ্ধের স্থূল।

সন্দি—সন্ধান; গূঢ়তত্ত্ব; অরুণকিরণ—সূর্যালোক; সাম্বু—শম্ভু / সোম, সম, শ্যামরস্। এর অধিকারিণী সামর্থা নায়িকা রাধা; কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম।

(চৈ. চ. মধ্য, ৮ম)

*(১৫৬) স্থূলের সিদ্ধ।

জমন—যেমন; ঠেকনা—ঠিকানা; বেড়বে—ঘিরে আচ্ছন্ন করবে; তার....সরণ—গুরু-আশ্রয়।

(১৫৭) সিদ্ধের সাধক; চারচন্দ্র ভেদের পদ।

গোর্খবিজয়ে, গুরু মীননাথকে চারচন্দ্র সাধনায় জরাবিজয়ের উপদেশ দিয়ে গোর্খ সাধনাটিকে বিস্তৃত করেছে। সেখানে চারচন্দ্র হচ্ছে আদি, নিজ, উন্মত্ত, গরল [পৃ. ৭০-৭৩]। দিব্বু—দিব্য; চাঁদের....ফিকিরে—সদাচঞ্চল মূল বস্তুকে চারচন্দ্রের আবরণে ঘিরে স্থির করে রাখা যায়। জমিনেতে....ঝোরে—চাঁদের প্রভাবে শষ্যাদি জন্মায়। নয়নচাঁদ, সকলচাঁদ, গুরুচাঁদ, অধীরচাঁদ যা কিছু মূল্যবান, উজ্জ্বল তাই চন্দ্রের মতো।

(১৫৮) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ।

কুমরী...বরণ—কুমরীপোকা ঝিঁঝি পোকাকে ধরে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তাকে অর্ধমৃত করে দেহে ডিম পাড়ে, সে ডিম কুমরীপোকা হয়ে নির্গত হয়। লোকবিশ্বাস যে ঝিঁঝিই কুমরীতে রূপান্তরিত হয়।

ব্রজের....গৌর হলো—রাধার স্পর্শে কৃষ্ণ গৌর হয়েছে—এ এক গুপ্ত সাধনা পদ্ধতি [মূলত রজঃবীজ রসের সাধনা]

*(১৫৮ খ/১৫৯) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

আরশী—আয়না (অন্যত্র আর্শীমহল); পড়শী—প্রতিবেশী [চর্যায় 'প্রতিবেশী'হীন বসতি, চর্যা ৩০], কন্দ মাতা—স্কন্ধ মাথা; সন্যার—শূন্যের; নিরে—রসে রজেঃ বীজে গঠিত লালনের দেহ; কিন্তু নিজের মধ্যে সৃষ্টির মূল বজঃকে চিহ্নিত করা যায় না। নিজেকে দেখার দর্পণ লাগে, সাধনায় প্রকৃতিদেহে 'অপরা / পরম'সত্তাকে জানা ও দেখা যায়। উন্নত স্তরে সাধক নিজ দেহে রজঃবীজকে অনুভব করতে পারেন।

(১৬০) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : নবীনতত্ত্ব।

মনে....লুকায়—মনের নিষ্ঠাহীনতায় বিশাল পর্বতও কেশের আড়ালে আচ্ছন্ন হয়, অর্থাৎ প্রকট সত্য ধরা পড়ে না।

আহাম্মদ নাম লিখতে লাগে চারটি আরবী অক্ষর, আর আহাদ লিখতে লাগে প্রাগ্ব্যবহৃত তিনটি অক্ষর। আহাম্মদে বেশি একটি অক্ষর, সেটি, মিম। অর্থাৎ আহাদে মিম বসালে আহাম্মদ হয়। (আহাম্মদকেই আল্লা ধরে নাও)। আহাদ—এক, আকারহীন (অনিরূপ—মূলবস্তু); মহাম্মদ—দেহ, বহুরূপ তার (সৃষ্ট জীব-সকল, দেহী মানুষ), আলেপ—আল্লা; মিম্-নবী; লামের দ্বিঅর্থ—প্রকাশ্যে আল্লা; মারফতে দেহধারী আদম। চৈ. চ. চৈতন্যদেব বিজলী খানের পীরকে

লায়লাহা ইল্লাহা শ্লোকটির এ ধরনের আভিপ্রায়িক অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যে মহাম্মদকেই আল্লা বলে মেনে নাও [নির্বিশেষ গোঁসাই লএগ্রা করেন ব্যাখ্যান। সাকার গোসাই সেব্য নাহি কার জ্ঞান।।] (মধ্য, ১৮)। মিম-এর-দ্বি-অর্থ—অদেখা ধ্যান/মিলন ; দাহারি—দাখিল বা রুজ হওয়া, পথভ্রষ্ট, বস্তুবাদী।

(১৬১) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ।

বুজতে—বুঝিতে ; হাদি (আ.) ধর্মপ্রচারক আবদুল্লার পুত্র হজরত মহাম্মদ ; পুথলো—পুতুল ; পোশবে—পসিবে ; ভেদের ঘরে—গুপ্তজ্ঞান মারফতের স্তরে।

*(১৬২) প্রবর্ত্তের সিদ্ধ। (মূলবস্তুকে এখনো জানেনি)।

মনের মানুষ মনে—যাকে ভাল লাগে মনে তার মূর্তি বা নক্সা তুলে রেখে স্মরণ, খেলা, এটিই বর্জোক ; উচ্চুশ্বরে—উচ্চস্বরে ; বেতা—ব্যথা ; চুব—চুপ ; হোরী বলা—উচ্চস্বরে নামজপ লোক-দেখেনো প্রথা।

(১৬৩) স্থূলের সিদ্ধ : দেহ-ঘরের তত্ত্ব।

চেতনগুরু—সদ্‌গুরু/নারী ; চারিযুগ—বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ ; পর—নারী ; ছোড়ান—চাবি ; পুরুষদেহ নারী দ্বারা জাত, বর্ধিত, কামনার্ত, তারই জন্য জন্মায় শুক্র ; চিনিবহা বলদের মতো নিজের দেহস্থিত ধনকে জীব খুঁজে পায় না।

(১৬৪) সিদ্ধের স্থূল : রাধার ভাবে চৈতন্যের বিলাপ—কাঁহা গেলে তোমা পাই (চৈ. চ./অন্ত/১৭)।

নেগে—লেগে ; মুড়িএছি মাথা—সন্ন্যাস নিয়েছি/মস্তক বিক্রয় করেছি। স্বরূপ গোনেতে—স্বরূপ দামোদর/রাধার সখী, সামর্থার গণ রাধার স্বরূপ।

(১৬৫) সিদ্ধের স্থূল।

চাঁদের—কৃষ্ণ/রাধার জন্য ; চাঁদ—চৈতন্য ; এই...শ্রীমনহার—বঙ্গে গৌর উপাসনার ধারাটি প্রবল। গৌরকে পাবার জন্য ভক্ত ব্যাকুল ; সেই গৌর আবার কাকে পেতে চায়? ভক্তও সেই চাঁদের কথা ভেবে আকর্ষিত হচ্ছে—তাই দোটানা।

(১৬৬) সিদ্ধের সাধক : পূর্বোক্ত দুটি পদের উত্তর আছে এখানে।

ওপসোনা—উপাসোনা ; বৈকণ্ট—বৈকুণ্ঠ ; উপার—উপর/ওপার ; দোহায়...মন—পরস্পরকে আকর্ষণ করে ; দিন থাকিতে—জীবিত অবস্থায়।

(১৬৭) প্রবর্ত্তের প্রবত্ত।

মনি রিশী—মুনি (একক সংসারত্যাগী তপস্বী), ঋষি (তপোবনে সংসার নিয়ে সাধকবর্গ); ফকীর—ফকরা (তুর্কী) শব্দজাত ভিক্ষুক ও সাধকবিশেষকে বোঝায় ; বৈরাগী—একটি প্রাচীন ধর্ম-গোষ্ঠী কিন্তু অধুনা ভেকধারী বৈষ্ণবদের বোঝায় ; মহন্ত—বৈষ্ণব গুরুদের উপাধি ; মহাপ্রভু এবং অন্য দুই প্রভুর বংশধর ও গোপালগণ ব্যাতীত অন্য শাখাভুক্ত বৈষ্ণবগণকে মহান্ত বলা হয় [কানুতত্ত্ব নির্ণয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩] ; যোগী—যম নিয়ম আসনাদির সাধনা করেন এমন নানা সম্প্রদায়ের যোগী আছেন। জুগী বা নাথযোগীদের উত্তরপুরুষেরা বঙ্গে যোগী/হঠযোগী নামে খ্যাত। চৈ. চ. অন্ত্যলীলায় এই বাউল-যোগীর বর্ণনা আছে (১৪ শ পরিচ্ছেদ) ; ব্রহ্ম-খিরিষ্টানী—বিদেশী ভাবাপন্ন ব্রাহ্মরা/সাহেবী ব্রাহ্মরা ; বস্তু কোথায়......নয়—ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় নয়, তার বিচিত্র রূপগুলি সত্য, আর লালন বস্তুবাদী। ব্রহ্ম বলতে তিনি

ব্রহ্মবস্তু বোঝেন। নাম বা বিশেষ্যও বস্তুবাচক বর্তমান পন্থায়। 'এ নাম নয়রে ভাই আরেক নাম আছে। এই নাম নিয়ে যায় সেই নামের কাছে।'—এ নাম দেহরস-বিশেষ। কবীর বলেছেন যে রামনামে একেক জন একেক ভিন্ন বস্তু বোঝে। Kabir. 1974. C. Vaudevelle. Oxford. P. 288

(১৬৮) স্থূলের স্থূল।

সামার্ন—সাধারণ (বিশেষের বিপরীত শব্দটি দক্ষভাবে ব্যবহৃত) ; ব্রথা—বৃথা ; গোপীনি...... পাগলপারা—প্রেমোন্মত্ত হয়ে গোপীরা কুলধনমান সব বিসর্জন দিয়েছিল। চৈ.চ.-এ নানাধরনের পাগলের/বাউলের বর্ণনা আছে ; তার মধ্যে জাতিকুল-বিসর্জনকারী সাধকদেরও পাগল বলা হয়েছে ; যেমন অবধূত নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে, অদ্বৈতের উক্তি : 'তোর জাতিকুল নাহি সহজে পাগল' [মধ্য, ৩য়] 'আমার যে সব দিতে হবে' রবীন্দ্রসঙ্গীতে উক্তিটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

(১৬৯) সাধকের স্থূল।

নিরিক—একনিষ্ঠ স্মরণ ; না...পেলে কথা—সাধনে ঈশ্বরকে পেতে চান এ জন্মে, ইহলোকে ; গুরুরূপে নিরূপ—গুরুই নিরাকার ঈশ্বরের মূর্তি। "গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু...নরকং ব্রজেৎ" তন্ত্রসার : পৃ. ২ গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রামাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্ত গণে।। চৈ.চ. আদি, ১ম পরিচ্ছেদ। গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান নিষিদ্ধ ভাগবতেও।

(১৭০) সাধকের সিদ্ধ।

গুরু এবং গৌরের দ্বন্দ্ব—দুই, না এক? প্রবর্ত্তের নাই...সাধনা—প্রবর্ত্ত স্তরে সাধনাটি থাকে অজ্ঞাত ; সাধু হাটাই—সাধুর হাটে ; খাতায় পলো বাকি—খাজনাদি বাকি পড়লে সেরেস্তার খাতায় লিখিত হয়/সাধনায় ব্যর্থতা।

(১৭১) সিদ্ধের স্থূল। গৌরই কৃষ্ণ।

রায় রামানন্দ 'গৌরকান্তে সর্ব অঙ্গ ঢাকা' কৃষ্ণরূপে চৈতন্যকে দেখেছিলেন। চৈ. চ. মধ্য/৮ম)। চরিতামৃতের এ পরিচ্ছেদটির প্রভাব লালনে গুরুতর। সভার্গ—সৌভাগ্য।

(১৭২) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : লা. গী.-তে পদটির বক্র রম্যতা বিনষ্ট হয়েছে (৩১০ পদ) ;

নাগরি—নায়িকা ; ১ম চরণ লা.গী.তে গো দিয়ে সমাপ্তি ; এতে কোন মিত্রাক্ষর হয়নি (...কোরনা গো) ; দ্বিতীয় পংক্তি সমাপ্ত গৌরাঙ্গ দিয়ে ; এখানে নাগরী : যাদুকারী (যাদু করে যে) মিল। পরের লাইন গদ্য (কবিতা) হয়েছে লা.গী.-তে।

সাধুও কি যাদুকর। এসেছে এই নদী পুরী।—নদীপুরী কথাটির অর্থ হয় কি? 'নদে পুরী' নদীয়া > নদে—মূলে ছিল। এখানে পাই খেটবে হেতা...তাই কি ভেবেছে? লা.গী—খাটবে না হেথা জারিজুরি...তাই কি ভেবেছ।।—অর্থ বিপরীত হলো এতে। "বেদপুরাণে......অবতার" কথাটির চরিতামৃতে বাসুদেব সার্বভৌমের উক্তি (মধ্য/৬ পরিচ্ছেদ) যে কলিতে অবতার নেই। লা.গী. বিপরীত কথা লিখেছে যে বেদপুরাণ মতে কলিতে অবতার। এখানে আছে "তবে যে কয়......" অর্থাৎ সবাই বলে চৈতন্য কৃষ্ণ।

লালনগীতিকা : 'তবে সে কয়'—সে কে? এখানে 'বেদে যা নাই' (বেদে নেই) লা.গী. আছে 'বেদে জানাই' (জানায়) অর্থাৎ বেদ সমর্থিত।

(১৭৩) সিদ্ধের স্থূল।

অদৌইতের বাঞ্ছাই—যাহার তুলসীজলে যাহার হুঙ্কারে স্বগন সহিতে চৈতন্যেরে অবতারে।। চৈ. চ. আদি/৬

কলিকালে—এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥ (ঐ. আদি. ৩য়)

(১৭৪) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

৪ জুগোরো পর—চিরকাল ; হায়াতোল মরছলিন—নবীর উপাধি (সব সাধকের জীবনে যার উল্লেখ আছে) /চিরজীবী ; ওফাৎ—মৃত্যু ; হয়াৎ—আয়ু ; স্রষ্টা নবী অমর ; আবদুল্লার সন্তান হজরত মহাম্মদের, কৃষ্ণ, রামের জন্মমৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কোন্ নবী চিরজীবী? এটি নবীতত্ত্বের পালাগানের আলোচ্য বিষয়। পদটি বিলায়েত নবুয়তের শিক্ষার। দাওইন—সাধারণ সৃষ্টিতে দৃষ্ট/শিষ্য দ্রব্য স্পর্শ করে যে-শপথ করে।

(১৭৫) সাধকের স্থূল।

নফি—বাদ ; ফাক তামোশা—ফাঁকি ও তামাশার ভঙ্গিতে বলা কথা।

লা.গী.-তে শেষে আছে : ফাকড়া সই বোঝে না—এর অর্থ স্পষ্ট নয়।

(১৭৬) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : আকার-নিরাকারের সমস্যা।

নিরাকার খোদার জ্যোতি/বীজ কীভাবে সম্ভব? আকার......সদা—শরীয়তে আল্লার মূর্তিকল্পনা নিষিদ্ধ। জাত—এক ; সেফাত—বহু।

(১৭৭) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

পূর্বের দুটি পদের উত্তর যে সমস্যাটি গুরুগম্য। জা ভাবে তাই হয়...ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামাত্র নানারূপ হয় ; আকারহীন রূপের......বরজোখ কীভাবে সম্ভব? নুরেতে......বস্তুজানি—আল্লার নুরে নবীর জন্ম ; আবার জলে সৃষ্টি বলা হয়েছে কোরাণে ('প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি হতে সৃষ্টি করলাম' ; সুরা আম্বীয়া, ২১ সুরা, ১৭ পারা, রুকু ৩)। তাই লালনের প্রশ্ন : 'পানিই কি নুর' এটি জটিল কাকুবক্রোক্তি।

(১৭৭খ) সাধকের স্থূল।

কৃতিকরমা—কীর্তিকর্মা (বিশ্বকর্মার প্রতিসাম্যে তৈরি শব্দ) ; জে নিরাঞ্জন......ধরে—নিরাঞ্জনই নুরনবী ; কাজিল—বিবাদ।

(১৭৯) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : নবুয়াত ইত্যাদি তরিকার গান।

নবুয়াত—নবীদের প্রচারিত আনুমানিক মতবাদ।

বেলাওত—গুরু-প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ সাধনপন্থা।

ছপিনায় সরা—জ্ঞানে অন্তরে শরীয়ত/ গন্তব্যের বাহন। ছিনায়[২] ভেদপুসীদা—গভীর বিশ্বাসে গুপ্ত জ্ঞান মারফত লুক্কায়িত হৃদয়ে।

(১৮১) সিদ্ধের স্থূল।

বান্দাল—বাঁধ ; মহান—মোহনা ; মহাজোন—মহান জন ; উদায়—উদয় ; ডণ্ডেক—এক দণ্ড ; দ্বিতীয় দিনের রজঃসাধনার নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে রজঃবিকাশের ঠিক চার প্রহর/২৪ ঘণ্টা পর।

(১৮২) সিদ্ধের সাধক।

শ্যামঙ্গ গৌরাঙ্গ—রজঃসাধনায় এবং প্রলেপে শ্যামবর্ণ এদেশের মানুষ গৌরাঙ্গ হয়। সামান্ন বিশেষ—সামান্য রতি পুরুষের, রজঃসাধনার ২য় দিনে বিশেষ রতির উদ্ভব নারীদেহে। বিশাস......সামান্ন—কাম এ সাধনায় সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রেমমাই—প্রেমময়ী ;

কোমলাকান্তের......সদায়—কামকৃষ্ণ, প্রেমী রাধা। স্যামরতি—সমরতি। সামান্য-বিশেষ ন্যায়শাস্ত্রের শব্দ।

(১৮৩) সাধকের প্রবর্ত্ত।

প্রমো—প্রেম ; নেটা—ল্যাঠা ; জজীতে—সাধনা করিতে।

(১৮৪) সাধকের সিদ্ধ।

কর্মফাশী—কর্মবন্ধন ; শ্রীলেঙ্গ—স্ত্রীলিঙ্গ ; পুলেঙ্গটি—পুংলিঙ্গটি ; নপংশকে—নপুংসকে ; ব্রহ্মাণ্ডের উপর—দেহের ঊর্ধ্বে/জিহ্বা ; কারণ্য শুমুদ্রপারে—দ্বিতীয় দিনের রজঃধারায়।

(১৮৬) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

কবুতি—কবলুতি/ মুরিদ আত্মসমর্পণ করার পর মুর্শিদ তা গ্রহণ করেছেন ; আইনমাফিক নিরিক—গুরু-নির্দেশিত পন্থায় ; আড়িগুড়ি—ইতস্তত ; দায়মাল—উপাসনা বা প্রেমে একনিষ্ঠ হওয়া।

(১৮৭) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত। দৈন্য (মনঃশিক্ষা)।

অপমের্ত্ত—অপমৃত্যু ; মাহাজন—মহাজন ; কল্লে হতো—হত্যা করল।

(১৮৮) নবুয়াত, (প্রবর্ত্তের সাধক) দৈন্য।

কায়াধারী...নাই—আলোর ছায়া হয় না ; সুতরাং জ্যোতির্ময় নবীর ছায়া ছিল না, এটা ইসলামের বিশ্বাস। লা-শরিকী—যার শরিক বা অংশ নেই। দেহতত্ত্বে বর্ণিত হয় যে নারীর যোনির কোন ছায়া পড়ে না।

(১৮৯) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

শাতে—সাথে ; আত্তশের কোড়া—আগুনের চাবুক ; বেকাতেড়া—আকাবাঁকা ; খেটবে—খাটবে ; জারে ধরে...পর—নারী (বৈদিক ধারণায় কামিনী সাধনার বিঘ্ন)। কুসঙ্গ—সাধনায় সঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। পদে গুরু লালনকে প্রবোধ দিয়েছে।

(১৯০) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : গুরুপদ।

ময়ায়—মায়ায় ; পক্ষ—পক্ষী ; ব্রক্ষে—বৃক্ষে (দেহবৃক্ষ, প্রাণপাখী) ; পেছে—পেছনে/প্যাঁচে, এস্তে—এসতে ; নেছে—নেচে। মনুরা<আর্বি মনবরা ; মনুরায় সম্বোধনে শব্দেব রূপান্তর ঘটেছে।

(১৯১) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

ঘোর—আচ্ছন্নতা ; দুগদেতে—দুগ্ধেতে ; চোনা—গোমূত্র (ফলত দুধ নষ্ট হয়ে যায়) ; মদন.....কারি—কামাধীন ; রাগের আশ্রায়/জার মাটিতে বসত—মাটির দেহে প্রাণ বাস করে, এটির স্রষ্টা নারী, তার প্রতি প্রেমের দৃষ্টিতে রাগধর্ম পালন ; লুভি—লোভী ; উপর হাকিম—উপরওলা হাকিম যিনি নিম্নস্তরের হাকিমের বিচার/রায় পালটে দিতে পারেন। হাকিমদের এই স্তরবিন্যাসের ধারণাটি নতুন শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন।

এ পদগুলিতে নিজের দেহমনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু ভিন্নজনের সহায়তা প্রার্থিত এবং তার প্রতি আনুগত্যও ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়নি (Caste and subaltern consciousness, P. Chatterjee, সর্বকর্তৃত্ব অস্বীকার করার প্রয়াস চিহ্নিত করেছেন এ দেহসাধনায়)।

(১৯২) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : বিলায়েত।

মকরউল্লার মকর—(আ.ফা.) ষড়যন্ত্রকরীর চক্রান্ত/লীলাকারীর লীলা ; মিম—মিলন/ধ্যান ; জুদা—পৃথক ; দিব্বু জ্ঞায়ান—দিব্যজ্ঞান/গুপ্ত সাধনা জানেন যিনি।

(১৯৩) সিদ্ধের সিদ্ধ : গৌরলীলা।

বিওগী—বিয়োগী; সম্ভাব—সম্ভব; জেতের বোল—জাত-সচেতনতা ; গৌর......থরোথর : চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥ (চৈ. চ. আদি, ৩য়)।

প্রমতত্ত্বে—প্রেমতত্ত্ব। লালনের চৈতন্য ললিত লবঙ্গলতা নহেন।

*(১৯৬) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

দিনদরোদী—দীন দরদী ; চক্ষু আন্দার......ধোকায়—মনের ভ্রান্তিতে চোখ দেখতে পায় না ; নিগুম—গোপন ; মলে শুক পাই—মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ কল্পনামাত্র, লালন ইহজীবনবাদী। তাই ইহজীবনে স্রষ্টাকে না দেখলে পরকালে তাকে চিনবেন কী করে? সাদন—সাধন ; বহুদূরে নাই—সুফীরা বলতেন, 'সে তোমার গ্রীবাস্থিত ধমনীর কাছে আছে।'

(১৯৭) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

দিনের অধীন—ধর্ম ও গুরুর অধীন ; দাস্যপনা—দাস্য-সাধনা ; প্রবসা—পিপাসা।

(১৯৭খ) স্থূলের প্রবর্ত্ত : শিক্ষা।

ভর—নির্ভরযোগ্য, ভরসা ; কালামালা—তসবী, বালা, মালা ; নেহারা—দেখায় মগ্ন ; আলেক রূপ—অরূপের রূপ/মূলবস্তুর জ্যোতি ; আউল—এলোমেলোভাবে চলে।

(১৯৮) সাধকের প্রবর্ত্ত।

অটলা—অটল ; শ্রীরূপ—রূপগোস্বামী/নারীর রূপ ; ঘেটেলা—ঘাটোয়াল ; শ্রীরূপ......তালা (তারা)—মুঞ্জরীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণলীলায় প্রবেশাধিকার জন্মে ; শ্রীরূপ ছেড়ে—রূপ দেখা যায় না ; তন্ত্র ধুড়ে—রজঃসাধনাকে তন্ত্রসমর্থিত সাধনা বলে মনে করা হয়েছে। শক্তি হরা—নারীকে হত্যা করে তার মূলবস্তু দ্বারা শক্তিসংগ্রাহী সাধক ; আলাভুলা—আলেয়ার আলো দেখে ভোলে।

(২০১) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

অপরাদ—অপরাধ ; হেলই—হেলায় ; দোহায়—দোহাই ; অবধ—অবোধ ; ভ্রিমী—ভ্রমি ; অথায়—অথৈ ; আতষে—আগুনে ; তরায়—তরাও।

(২০২) সাধকের প্রবর্ত্ত—বিলাওত, দেখানো। রস ও রজঃসাধনা-সম্পৃক্ত পদ।

আবহায়াতের নদী—হাওজ কাওসার-নামক স্থানে রোজকেয়ামতের দিনে এ নদীটি তৈরি হবে (বৈতরণী নদীর মতো) ; মৃত্যুর পবে এ নদী পার হওয়া যায়। সাধকেরা জীবন্তে এ নদীতে পৌছেছেন ; তাই তারা জীবন্তে মরা।

অনেকের মতে এর (নারীদেহের) তিন ধরনের বা পঞ্চ রস দিয়ে নবীর হৃদপিণ্ড ধুয়ে কলুষমুক্ত করা হয়েছিল (সিনাচাক)। জেন্দাপীর—জীবিত সাধক।

(২০৩) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

পাই—পায় ; সওন—শয়ন ; তলে আসে তলে যায়—নিম্নাঙ্গে আসে ও যায় ; লাফ দীএ—লাফ দিয়ে ; উচমনের,—বোকার, যৌবনোন্মত্তের ।

(২০৪) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত/বেলায়েতের শিক্ষা।

বজ্র—বর্জখ ; নবুয়তে...নজরে—নবুয়তে অদেখা সত্তার জপতপ, বিলায়েতে প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধনা ; নেহারা—একনিষ্ঠ দৃষ্টি ; নবী ছরআর—নবী ; বিদী—বিধি ; বস্তু বিনে নামে কৌ পেট ভরে—বস্তু না খেয়ে তার নাম করলে পেট ভরে না ; সুতরাং নামের চাইতে বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল।

(২০৫) সাধকের প্রবর্ত্ত : রজঃসাধনা-সম্পৃক্ত পদ।

চকরে—চকোরে ; সাফল—সফল ; আপ্ততও ধুড়ে—সিদ্ধতত্ত্ব অনুসন্ধান করে ; রিদয়—হৃদয় ; তিতি জোগ—তিথিযোগ ; প্রিতি মাশন্তে—প্রতি মাস-অন্তে ; চাঁদে চাঁদে—দেহমিলন ; খুদা—ক্ষুধা ; শর্গ—স্বর্গ ; আছমানি—আসমানী ; বেড়ো—ভেড়ো ; দুরু—দূর।

(২০৬) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : শরীয়ত মারফত-বিষয়ক তরিকার পদ।

শরায়—শরীয়তে ; সিদ্দী—সিদ্ধি ; সরপোষ—আচ্ছাদন ; আক্কেল আউল দরিয়া—জ্ঞানের আদি সমুদ্র ; তাথে—তাতে ; ভুল সবায়—সকলে ভুলে যায়/ভুল করে।

(২০৭) সাধকের প্রবর্ত্ত : ভেকের/খেলকার গান।

জানাজা...দেয়—মৃতের জন্য নামাজ জানাজা ; খেলাকাধারীগণ সমবেত হয়ে খেলকা-গ্রহণকারীর জন্য জানাজা পড়ে। এর নেতৃত্ব দেন খেলকা-গ্রহণোদ্যত সাধক। অর্থাৎ নিজের জানাজা নিজে পড়ান। জেনতে—জ্যান্তে, জীয়ন্তে ; খেলকা...সাজায়—টুপি, তহবন, খেলকা বা বহির্বাস তাঁর হাতে তুলে দেন খেলকাধারী কেউ। ভেক ও খেলকা সমার্থক এখানে।

রূছাপাই—রুহু (হৃদপিণ্ডের ডানদিক) সাফাই ; কব্বোরো কোথায়—সবার সঙ্গে কবরস্থানে খেলকাধারী সমাহিত হয় না ; তাঁর একক কবর হবার রীতি আছে। আবার মরিলে...হয়—খেলকাধারীর মৃত্যু হলে জানাজা পড়া অর্থহীন, লোকচারে জানাজা হয় কিন্তু অলক্ষ্যে তিনি নিজে পরিচালনা করেন এটি। বেদ ছাড়া সর্বদয়—সর্বদা বেদ ছাড়া ; এখানে বেদ অর্থে শাস্ত্রীয় আচার। সমজে—সমঝে ; হাল—বিশিষ্ট বহির্বাস। 'বেশ'ধারণের সঙ্গে রুহু সাফাই করার গুপ্ত সাধনা লালন নির্দেশ করেছেন।

*(২০৮) প্রবর্ত্তের সাধক।

আখির—শেষ ; নিশকামী—নিষ্কামী, নিস্বীগার—নির্বিকার (?) ; উসুল—ওয়াসিল ; ধর্মীয় বিধান চার প্রকার : কোরাণ, হাদীস, উসুল, ফেকা। কোরাণ হাদীসে অবর্ণিত, এমন বিষয় বিচার করা হয় শাস্ত্র দিয়ে। এ পদ্ধতি উসুল। 'ফেকা' আলেমদের বাক্য। মারফতে উসুল হচ্ছে সাধননিষ্ঠার জন্য মুর্শিদের আশীর্বাদ। মানসিক শুদ্ধতা লালনের সাধনায় জরুরি।

(২০৯) সাধকের সিদ্ধ।

বাষ—বাস ; বিভাব—বিশেষ ভাব/বিনষ্ট ভাব। শরে—সরে ; ভাব নৈলে ভক্তিতে কি হয়— বৈষ্ণব তত্ত্বে জ্ঞান ; কর্মপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য। লালন অন্ধ ভক্তির সমর্থক নন। বস্তু থেকে ভাব জন্মায়। এই ভাব সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তি-আন্দোলনে লালন অন্যতম যুক্তিবাদী।

(২১০) সাধকের স্থূল।

দশ দুয়ারী—দশ দ্বারযুক্ত। রজঃ শুক্র-নির্গমন পথ।

(২১১) প্রবর্ত্তের সাধক।

ঠেকেনা—ঠিকানা ; সর্ত্ত—সত্য ; পুরূসো পরওয়াদেগার—(ফা.) আল্লার বিশেষ গুণপ্রকাশক

নাম ; অঙ্গে...তার—কোরাণের কাহিনীতে আদমের বাঁদিকের হাড় থেকে আদিনারী হওয়ার জন্মকথা বিবৃত হয়েছে ; প্রিকিত...জোনা—সংসারের সব কিছু প্রকৃতির সৃষ্টি ; জাহারো...দিলেন—যার উপর দ্বীন ও দুনিয়ার ভার দিলেন ; রব্বানা—আল্লা ; বিম্বু—বিম্ব/বিন্দু ; দিখিল—দেখিল ; ঘুচলো...কাণা—যথার্থ জ্ঞান পেল।

(২১২) প্রবর্ত্তের সাধক : কারের গান। আবিফার্সিতে গম্ম—শোক, বিষাদা, স্বাদ অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়।

আজু—আজও; সাই....নিলে—'অদ্যাপিও সেই লীলা করে শ্যামরায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'॥ নরেকার—নৈরাকার/নরাকার ; উৎলিএ—উথলিয়ে, দেহ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে রজঃ বা বীজ নির্গত হয় ; নুরে কারো—নৈরাকার প্রথম স্তর ; দ্বিতীয় স্তর নুর ; ডিম্বরূপে—সৃষ্টির জন্য এ ডিম্বু (Ovam)। আপ্পারে চিন্‌লে—নিজের খবর মানুষ নিজে জানে না; তা জানলে এ তত্ত্ব বোধব্য।

(২১৩) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

সিন্দ—সিঁধ ; সিঙ্গ—সিংহ ; ভিলকি—ভেলকি ; কোন ঘড়ি—কোন্ সময় ; বেড়িয়ে—ঘিরে ; নেহাজ<নিহাশ—হিসাব, নেংটী ঝাড়া—'নিনাংটিয়া' অর্থাৎ নেংটি পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে—কথাটি উত্তরবঙ্গে চলিত। নেংটি পড়তেন রাজবংশী ও অন্যান্য দরিদ্র মানুষ। আর ভেকধারীরা। সুতরাং নেংটি খুলেই পিতৃধন হরণ করেছে।

(২১৪) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্তঃ এ পদটি পূর্ব শিষ্যপদের উত্তরে গুরুর শিক্ষাপদ পদটি রজঃসাধনার ইঙ্গিতবহ।

ত্রীবিনে—ত্রিবেণী, জন্মস্থানে ; ৮ পহরি—৮ প্রহর, ১ দিন ১ রাত্রি ; পারা—পাহারা/মূলবস্তু ; শুক্ল...নিজো ভুবন—দেহের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে শুক্লপক্ষে ; কৃষ্ণপক্ষে অবশেষে সহস্রারে চলে যায়। এটি 'নিজ ভুবন'। তিরোধারা—রজঃবিকাশের তিনদিন তিন নাড়ির মধ্য দিয়ে আগত রসধারা। এতে নানা নামের নানা ঢেউ থাকে।

(২১৫) সাধকের প্রবর্ত্ত : মনঃশিক্ষা।

ভেয়ে—ভাই হে ; নহর—লাহোর ; শেখান্তে—সেখান থেকে ; জেনো—যেন ; তের্থের—তীর্থের। দেহের আছে মূল সত্য, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু।

(২১৬) সাধকের প্রবর্ত্ত।

দেখপি—দেখবি ; কৃতি—কীর্তি।

(২১৭) সাধকের স্থূল। মনঃশিক্ষার পদ। করার—প্রতিশ্রুতি।

রেকবেন—রাখবেন ; জটোরো—জঠর ; কোল্লী—করলি ; সেবাসাধনা—গুরুকে সেবা করে হয় সাধনা। এ সেবা বাহ্য, অর্ধবাহ্য, অন্তরঙ্গ. নিজ মনোমত, গুরু মনোমত প্রভৃতি নানারকম।

(২১৮) সাধকের প্রবর্ত্ত।

জমনো—যেমনে; চোনা—গোমূত্র ; বৈদিকী—বৈদিকে। শাস্ত্রীয় সংস্কৃতিকে এখানে সত্যের পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

(২১৯) সাধকের প্রবর্ত্ত।

মাহাজানের ধোন—মহাজনের ধন/শুক্র ; সর্দ্দ—সদ্য ; জমলায়—যমালয় ; ধনি—নারী ; সর্ন—শূন্য ; রতি হারিএ হলি ক্ষেপা—মূল সাধনায় ব্যর্থতায় ক্ষেপা ; কাটের—কাঠের, ঝাপা—

ঢাকা ; কৃপা—দয়া/করে পাওয়া। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পদ্ধতির মধ্যে কৃপা অন্যতম। বদওফা—মন্দ।

(২২০) সাধকের প্রবর্ত্ত।

নাহক—অসত্য ; জেন্‌গানি—জিন্দানী ; পর্দ্দ—পদ্ম ; পক্ষ— পক্ষী ; ব্রক্ষ—বৃক্ষ ; সাম—সন্ধ্যা/শেষ।

বদোনে—বদনে ; বান্দা—অধীন ব্যক্তি ; জোবানের বালা—যবনের বালা (লালনের দ্বিতীয়া স্ত্রী যবনকন্যা) ; সদক্ষণ—সর্বক্ষণ ; বিপথ্য—বিপদ ; বিসয় বিস—বিষয়বিষ ; আখেরে—অন্তিমে।

(২২২) সাধকের প্রবর্ত্ত।

নাব—লাফ ; গন্ত— গম/স্বাদ, মজা ; কিবল—কেবল ; প্রমো—প্রেম ; ভক্তিপাত্র... বর্ত্তবান—প্রেমসাধনায় সামর্থা নারী নির্বাচন করে, 'ধরণীর রসে নারী তারি উপাসনা' (মোহিতলাল, বিস্মরণী) করতে হয়। সেখানে স্তরে স্তরে সাধনা (সিঁড়ি ধরে)। বর্ত্তবান—বর্ত্ত (পথ, যোনি) আছে যার।

(২২৩) সাধকের প্রবর্ত্ত। কাল শব্দের শ্লেষ ও যমক আছে পদটিতে।

জৈবন—যৌবন ; চিত্র কাল—চিত্ত কালো ; রোবির—রবির ; কালাকালে—কালের অকালে ; পানা—পনা ; ইন্দ্রবশে—ইন্দ্রিয়দের বশে ; সিদ্দী—সিদ্ধি ; লাঠের—নাটের ; লালষ লালসা, সহস্র দিকে ধায় লোভ (কাম একমুখী) ; ডুরি দেওরে...লালোশে—বন্ধন কর লোভলালসাকে।

(২২৪) সিদ্ধের স্থূল : গৌরলীলা।

চাঁদ শব্দের যমক ও শ্লেষ। অভরণে—আভরণে ; সামচাঁদ—শ্যামচন্দ্র/কৃষ্ণ ; মনির—মুনির, সান্তো—শান্ত ; শেয়ার—সে আর, (গৌরচাঁদ ভাবে কৃষ্ণচাঁদের কথা, কৃষ্ণচন্দ্র ভাবে পূর্ণচন্দ্র রাধার কথা) ; গৌরচাঁদের ফান্দ—গলার চন্দ্রাকৃতি মালা/বৈষ্ণবের কণ্ঠি।

(২২৭) সিদ্ধের সাধক : গৌরলীলা, রাধাভাব।

কোতা—কোথা ; বুজাই—বুঝাই/ভরাট করি ; নিষ্কল—অখণ্ড, অবিভক্ত, কলঙ্কহীন ; ধ্যোজ্য—ধৈর্য ; বেসমরার্গে—কালসর্প (কৃষ্ণ) ; বিস উটীল...মূলে—বিষ উঠিল মস্তকে ; গটরি—গিঠ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ; জোই—যোগী ; বজে—বুঝে ; গে—গিয়ে ; দত্তাম—ধরতাম ; আন—আনল ; নিবাই—নিভাই ; উপাই—উপায়।

(২২৮) সাধকের প্রবর্ত্ত : পুরুষদেহের যোগ-নির্ণয় এবং নারীর দেহযোগের (রজঃবিকাশ) সঙ্গে তার সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা।।

কতা—কথা ; রাধ-কান্তি...মাসে—রজঃবিকাশ ; নিরাপন—নিরূপণ ; অসমাএ—অসময়ে ; কৃশী—কৃষি ; অমূল—অমূল্য, মূলহীন ; শেন্তে—শুনতে ; হেতা—হেথা ; জর্মলতা—যে-লতায় জন্ম হয়েছে রজঃ ও শুক্র ; বেহিশে—বেহিসাবী ; কারো মতে নারীসঙ্গিনীর রজঃবিকাশ পুরুষ সাধকেরও রজঃপ্রবৃত্তিকে জাগায়। কারো মতে বছরে ২ বার ছ'মাস পরে-পরে পুরুষের ঋতু হয়। লিঙ্গদ্বারে সামান্য রজঃরক্ত আসে ; তুলা দিয়ে রেখে একে চিহ্নিত করা যায়। এজন্যই পুরুষের কৌপীন ধারণ। সেখানেও এ দাগ লাগে। চৈত্রের চড়কপূজার একাদশী এবং ভাদ্রের প্রথম একাদশীর কাছাকাছি সময়ে পুরুষদেহের এই রজঃকাল উপস্থিত হয়। কোন কোন সাধক মনে করেন যে রক্ত নয়, এসময় প্রস্রাব হঠাৎ ঘোলা হয়।

(২২৮ খ) সাধকের প্রবর্ত্ত ; কৃষ্ণপদ্মের গান।

জেনি গে—জান গিয়ে ; দারে—দ্বারে/কুটীরের দ্বারে/(নব) দ্বারে ; জ্ঞেন—জ্ঞান, ভক্তিতে জ্ঞান-অর্জনকে লালন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের থেকে তিনি এক্ষেত্রে পৃথক। বিহাল—বে-হাল/উদাসী ; সকল—সকাল ; ব্রেমাণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড ; কালাকাল—সময়-অসময় ; শান্তানা—সান্ত্বনা ; বেদবিদর—বেদবিদের, বেদজ্ঞের ; দিদাএ—দ্বিধায়।

(২২৯) সাধকের প্রবর্ত্ত।

হৌতে—হৈতে ; শুদা—সুধা ; আর্ত্তোশে—আগুনে ; সাপার—সাপের, বেঙ্গা—ব্যাঙ ; রোঙ্গা—রঙ্গ ; ওমিনি—অমনি ; ধোর্ন্নতরির গুণ—ধন্বন্তরি বিদ্যা ; রূপের কাল—রূপসী সর্প (নারী/যোনি, ভেক পুংলিঙ্গ) ; ভক্ত—ভক্ত ; তেগী—ত্যাগী ; কাজ্য—কার্য ; নাএ—নয়।

(২৩০) সাধকের প্রবর্ত্ত : শুধু নামে, জপে, কথায় সাধনা হয় না। সাধনা কর্ম।

কতাএ—কথায় ; বিচ...রপে—বীজ কেন রোপণ করে ; মুকমিট হএ—মুখ মিঠা হয় ; দিব—দীপ ; জের্লে আদার—জ্বেলে আঁধার ; পউরাস করে—পৌরুষ করে ; একরারি—প্রতিশ্রুতি। জমিদারদের খাজনা দিতে নিষেধ করা হয়েছিল দুধুমিঞার কৃষক-আন্দোলনে। সিপাহী বিদ্রোহের সমকালে ব্রিটিশ কারাগারে তার মৃত্যু হয়। আন্দোলনটি স্তিমিত হয় লালনের অঞ্চলে। পুনর্বার জমিদারবর্গ খাজনা আদায় শুরু করেন। সেই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় বিদ্রোহে নিরুৎসুক লালন। আএন—সাধ্য বিষয়াদি।

(২৩১) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত।

সত কটী গপী—শত কোটি গোপী ; নাএ—না হয় ; গপী কারো—গোপী করে ; শেব—সেবা ; শেংগ—সঙ্গ ; স্যামরস—শ্যামরস (চৈ. চ.—পূর্বোক্ত) ; নিগূঢ় করণ—গুপ্ত সাধন-কর্ম।

(২৩২) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : রজঃসাধনা-সম্পৃক্ত পদ।

সাদনে—সাধনে; অকৌতব—অকৈতব ; ভেদের কতা—গুপ্তকথা ; বেতা—ব্যথা ; কৌলে—কহিলে ; জোর্নে—জন্য ; গর্ন—গণ্য ; সাদীলে—সাধিলে ; সমন—শমন/স্খলন ; আমাবস্যা...দুতিয়ার প্রথম—দ্বিতীয়ার প্রথমাংশে 'মানুষের' মানুষ ধরার সাধনা ; সোনে—সনে।

(২৩৩) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : গৌরলীলা—গৌর-নাগরীভাবের পদ।

অথাই—অথৈ ; প্রণ বাচা—প্রাণ বাঁচার ; ইন্দ্র-বারি—শুক্রাদি ; অন্ত্রে—অন্তরে ; কোট সাদী কতাই—কথায় কূট-কৌশল করি ; মোলা—মেলে না ; এতে বাটা জেতে বাটা—আসার সময় এবং যাবার সময়ে শুল্ক দিতে হয় ; মতা—মাথা।

(২৩৪) সাধকের সাধক।

শুর্দ্দ প্রমে রাগে—শুদ্ধপ্রেমের রাগ-সাধনায় ; গাও ডালান—গা ছেড়ে ; ওহি মুণ্ডে—অহিমুণ্ডে/যোনির বহির্ভাগে (যোনি-নাসায়) ; উভাই নেহার উর্দ্দুতালা—উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে ; লোখন—লক্ষণ ; রোনা—রন ; কোমলে—কমলে ; প্রমছিঙ্গারে—প্রেমশৃঙ্গারে (কামশৃঙ্গার আলাদা) ; আপ্ত—সিদ্ধ বস্তু।

(২৩৫) প্রবর্ত্তের সাধক : বিলায়েত।

কদম—পা ; নবিজির খান্দান—হজরত মহাম্মদের কন্যাজাত বংশধরগণ/কন্যা ;

চারপেয়ালা—আবুবক্কর, ওমর, ওসমান, আলী-এর তত্ত্ব নিয়ে চার পেয়ালা, এদের রূপে চার রং দেখা যায়।

কাদেরিয়া, চিস্তিয়া, নক্সাবন্দী ও মুজ্জাদ্দাদিয়ায় চার বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ সাধনা। যেমন কাদেরিয়ায় নাভিমণ্ডল ; চিস্তিয়ায় আজ্ঞাচক্র ইত্যাদি।

মারফতে চার পেয়ালা রজঃসাধনাও চন্দ্রভেদের ইঙ্গিতবহ।

(২৩৬) স্থূলের সাধক : দৈন্যপদ।

ইংরেজ আমলে শাসন-শোষণের কেন্দ্র শহর গ্রামীণ মানুষের কাছে সর্বদা ভয়ঙ্কর। সহর—দেহ ; নুটে—লুটে ; জায় উঠে—বন্ধ হওয়া ; মালো নামায়—মাল নামায় ; লাটে—নিলামে।

(২৩৮) স্থূলের দৈন্য : গৌর-গুরুর দ্বন্দ্বের মতো এখানে নবী-আল্লা দুয়ের দ্বন্দ্ব।

নুরে নরে—নিরাকার আল্লা, নরাকার নবী ; হারাম—নিষিদ্ধ ; সোগোল রাবেতা—মায়া (যাদু) ময় দ্রব্যাদি নিয়ে-যারা ব্যস্ত থাকে। কোরাণে যাদুকরদের নিন্দা আছে। বরজক-শাস্ত্রীয় অর্থে ব্যবহার।

(২৩৯) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

জোলাদের সংস্পর্শে ছিলেন লালন ; সেকালের দেশী চরকার নানা অংশ ও নাম পদটিতে পাই।

টেকো—টাকু, সুতা কাটে যা দিয়ে ; নে—নেই, এ হাল—এ মত ; ছতার—ছুতার ; ষোলকল—১০ ইন্দ্রিয়া + ৬ রিপু ; শেরতে—মেরামত ; খষলে—খসিলে।

(২৪০) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : মনঃশিক্ষা। কর্মফলের স্বীকৃতি আছে ও পদে।

সুলুক (ফা.)—ফুটো নৌকা ; গুজা (ফা.)—খেয়ানৌকা ; বাট্টী—বেঁটে, ক্ষুদ্র নৌকা ; খোচা—কলমের লেখা ; এবের—এ জন্মের।

(২৪১) সাধকের প্রবর্ত্ত : চারচন্দ্র বিষয়ক।

চাড্ডি চন্দ্র—চারিটি চন্দ্র ; ভাবের ভুবনে—সাধনার জগতে ; (আদি, নিজ, উন্মত্ত, গরল) দুটি...জনে—তন্ত্রাদিতে রজঃ ও শুক্রের সাধনা প্রকাশ্যে লিখিত আছে ; এ দুটির কথা সবাই জানে ; মূত্রও গুহ্য গুপ্তকথা। 'চারচন্দ্র আলেক সাই, তার উপার কর্ম নাই' ; 'চার চন্দ্র করে যে জগতের গুরু সে' প্রভৃতি প্রবচন বাউল-সমাজে প্রচলিত। শে...গুণে—চার চন্দ্রের সাধনায় শুক্র স্থির হয়, কাম দমিত হয় ; তখন নারীসত্তাকে ধরতে পারে পুরুষ বা বিপরীতে নারী। এক চন্দ্রে...জানে—সহস্রার থেকে আগত রজঃধারায় পাটুলির বৈষ্ণবগোষ্ঠী ও আরও অনেকে পূর্ণ, নষ্ট, গরল, সরল এই চার বৈশিষ্ট্যের চারচন্দ্র নির্ণয় করে। মূল চন্দ্র—শুক্র? রজঃ? বিস্মৃতে—বিষ ও অমৃত এ সমস্ত চন্দ্রে একত্রে থাকে ; তিক্ত বিষ সর্বদা পরিত্যাগ করতে হয়। সিদ্ধ সাধকের কাছে বিষামৃত সমান। কিন্তু সাধনায় রসাদির স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ দ্বারা বিষাক্ত বস্তু নির্ণয় করে সেগুলি পরিত্যাগ করা হয়। এ বিষ দেহকে অসুস্থ করে।

(২৪২) সাধকের প্রবর্ত্ত।

দিদলে-দ্বিদলে (মনের মানুষ কি জন্মস্থানে যিনি প্রকাশিত হন?) ; সওদামিনি—সৌদামিনী ; সাপল—সফল ; অধিন কয়—সঠিক পাঠ 'অধিন নালন কয়' ; নওন—নয়ন।

*(২৪৩) সাধকের প্রবর্ত্ত।

নামের চাইতে ব্যক্তি ও বস্তু লালনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। থেকলে—থাকলে ; নামের তুল্লা—

নামের তূল্য ; রূপের তুল্লা কার—পৃথিবীতে দুটি গাছের পাতাও একরূপ হয় না ; নেহারা—নিহারে ; আখেরগুরু—শেষগুরু (সাধনার শেষ স্তরে গুরু নারী)।
(২৪৪) সাধকের সাধক।

সাধক শিশু ; অসাধক—জোক। সনলে—শুনলে ; স্বাগোরে—সাগরে ; সাভাবিক—স্বাভাবিক ; হল করা—মিশ্রিত ; সুতারো—সুতাক ; লনতে—ননীতে ; মখের—মুখের।
(২৪৫) সাধকের প্রবর্ত্ত।

মন শুদ্ধ না করে বাহ্য বেশধারণে ফল নেই।

দিনের—দ্বীনের (ধর্মের) ; অরুণবসন ধারণ—রক্তবর্ণের বস্ত্র ও গায়ে ছাই শৈব-তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। সন্ন বিদর—ভাবশূন্য ; কালাম—লায়ালাহা ইত্যাদি ; তারণ উদ্ধার ; বেহাল—প্রথাগত সন্ন্যাসবেশের সমান্তরালে লৌকিক সন্ন্যাসবেশ। মরসীদ বস্তু—গুরুবস্তু/রজঃবীজ। হাদিচি...জান—নবীর মহাপ্রয়াণের পর ইসলামে রাজন্য প্রথা চালু হলে সাধকদের মধ্যে চলিত হয় একথা : মান আরফা নফসা হু ফাকাদ আরফা রব্বা হু।। জোবান (ফা.)—কথা ; মুঞ্জীল—বাসস্থান।
(২৪৬) সাধকের প্রবর্ত্ত। রূপ শব্দের পুনরাবৃত্তি।

দেখপী—দেখবি ; সরূপ—স্বরূপ ; মির্থে—মিথ্যে ; অবতারি—অবতরী ; স্বয়ং অবতীর্ণ (চৈ.চ. আদি। ২ পরিচ্ছেদ এ শব্দটির ব্যবহার আছে) ; সন্নধামের—স্বর্ণধাম।
(২৪৮) সাধকের প্রবর্ত্ত : রজঃসাধনার আভাসবহ পদ।

বেহারে—বিহার করে ; চেএ—চেয়ে ; বিস্যরণ—বিস্মরণ ; নিথ্যনি[illegible]র—নিত্যলীলার ; কি ধারা—কী ধরনের।
(২৪৯) সাধকের সাধক : গোষ্ঠ।

জেএ—গিয়ে ; বোল—কথা ; উপাই—উপায় ; নুকানুকি—লুকালুকি ; বুজিশে—বুঝি সে ; গোপ্তবিন্দাবনে—গুপ্ত-বৃন্দাবন ; ভৌগোলিক বৃন্দাবন প্রকাশ্য ; গুপ্ত-বৃন্দাবন আছে দেহে।
(২৫০) সাধকের সাধক : গোষ্ঠ।

আজকোর—আজকের ; গোচারে—গোচারণে ; জেয়ে—যেয়ে।
(২৫১) সাধকের প্রবর্ত্ত : ভেকের গাহান (গান)।

বেসভুসোন—বেশভূষণ ; সনি—শুনি ; জেন্দা দেহে মোরদার বেশ—জীবিতের দেহে মৃতের বেশ, ইসলামে মৃত দেহে ৫/৭ প্রস্থ পোষাকাদি দেয়া হয়। এখানেও বহির্বাস, টুপী, ডুরি, কৌপীন প্রভৃতি বেশ।

আপন ছরাদ—নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে সন্ন্যাস/ভেক নিতে হয়। অসমভাব কোরুনি—অসম্ভব কার্য ; সনেছি—শুনেছি ; মোরে—মরে ; জদি ফেরো—সন্ন্যাসজীবন থেকে আবার যদি গৃহে যাও কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, জন্ম দাও সন্তানাদির। ভেকধারী বৈষ্ণবদের এমন দুর্দশা ঘটে, তাদের সন্তানগণ পূর্বকুলে বা সাধুর কুলে আশ্রয় না পেয়ে হয় 'জাত বৈষ্ণব'।
(২৫২) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

আরশিনগর—আয়নায় প্রতিফলিত নগর ; বেড়ে—ব্যাপিয়া ; ছুতো—স্পর্শে দেহ হতো সোনার এবং মৃত্যুভয় থাকত না।

এক্ষানে—একখানে ; দেহ এবং চেতনা একত্র থাকে বটে কিন্তু সাধনায় দেহকে পৃথকভাবে দেখা যায়। এটিই স্বরূপদর্শন।

(২৫২) সাধকের প্রবর্ত্ত।

পদটি ভণিতাহীন। বন্নপূর্ন—বর্ণপূর্ণ ; চুব—চুপ।

(২৫৩) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

ছুন্নত ফরজ—(আ.) নবীর বাক্য ও কার্য/অবশ্য প্রতিপালনীয়। রেয়াকত (ফা. রেয়াজত) —ধ্যানভঙ্গ হলে আবার মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করা।

(২৫৪ খ) সাধকের প্রবর্ত্ত।

ব্রহ্মার বেদ ছাড়া ভেদ—বেদ-বহির্ভূত তত্ত্বাদি ; আদ নিলে—আদিলীলা/রজঃবীজে সৃষ্টি। হেতশুর্ন—হেতুহীন।

(২৫৭) প্রবর্ত্তের সাধক : মারুফত তত্ত্ব এখানে শিষ্য বলাইকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে।

অজুদে—(আ.) দেহ ; ছিনা—(আ.) বুক ; রাছুল ছাবেদ ও কালমা ছাবেদ—কালমার মধ্যেকার সদাসর্বদা জপনীয় অংশ (আল্লা হু এবং লাইলাহাইলিল্লা)/প্রমাণযোগ্য বাক্য।

২৪ হরফ—২৪ ঘণ্টার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস/আরবীতে আদি ব্যঞ্জন ২৪টি, এই ২৪ বর্ণ বা তত্ত্ব দিয়ে গঠিত মানবদেহ।

মওয়াহেদ—(আ.) একেশ্বরবাদী ; নকসাবন্দী—সুফী সম্প্রদায় বিশেষ/সর্বত্র আল্লার নিদর্শন দেখেন যারা/একটি নক্সা বা মানুষের মূর্তিকে মনে বন্দী করে যারা সাধনা করেন। কাদেরিয়াগণ জেকের দ্বারা নাভিতে স্থিত নফ্‌সকে শুদ্ধ করেন। চিস্তিয়ারা আজ্ঞাচক্রে পূর্বোক্ত গুরুর নক্সা স্থাপিত করে নফ্‌সকে শোধন করেন। নফ্‌স থাকে, ছ'লতিফা ও চার ভূত, এ ১০টি বস্তুতে। লালন 'নামসাধনের' সঙ্গে গুরু 'বর্জোক'কেও ব্যবহার করেন। চিস্তিয়া—কাদেরিয়া ঐতিহ্য এখানে মাখামাখি হয়ে গেছে।

বন্দেগী—বন্দনা/ধ্যানের পূর্বে অগ্রজ সাধকদের প্রতি সম্মান জানাতে হয়।

আলাছুরা তেহি কালাম—দাস হিসাবে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ; এস্কেতে মসগুল—প্রেমে মগ্ন ; দায়মাল—প্রেমে একনিষ্ঠ, ধ্যানে তন্ময় ; আনল হক—আমি সত্য।

(২৫৯) সিদ্ধের সাধক।

অধর ধরা।। হাতের লেখা ভিন্ন।

অধরে—আধারে, যেখানে চাঁদ আছে ; অধর—নিচের ঠোঁট ; লিঙ্গ ; সচেন—সচেতন ; কারণ বারির—রজেঃর ; নিলে বাসে জেইয়ো নাকো—লীলার বশীভূত হয়ো না ; লীলায় সৃষ্টি হয়ে যায় ; মায়েতে...খায়—পুরুষদেহের শুক্র, জননী নারী গ্রহণ করে ; স্বরূপের হাট জন্মস্থান ; বোইদিক বানে—বৈদিক বানে (বেদবিহিত দেহমিলনে স্খলন ও সন্তানের জন্ম) ; বান হারিএ—স্খলন ; রণ খোলাতে—রণক্ষেত্রে, হুবড়ি খেএ—উপুড় হয়ে/হুড়মুড় করে।

(২৫৯ খ/২৬৬) সাধকের স্থূল।

মন তুলো্শী—মন তুলসী, নারায়ণ বা কৃষ্ণপদে দেয়া হয়, এখানে প্রিয়কে তুলসী অর্পণ অর্থে দেহদান।

(২৬২) স্থূলের প্রবর্ত্ত দৈন্যপদ।

অপারের—অনন্তজলে, অপারগের, যা অসাধ্য ; কাণ্ডার—নৌকার হাল, আউল—আদি ;

নবি... —নানারূপ ধারণ করেন তিনি সৃষ্টিতে ; স্রষ্টা নবী কোথায় ছিলেন? তিনি পুরুষ না নারী?

আল্লা নবী...অবতার—আল্লা ও নুর, পরে আল্লা ও নবী এ দুইকে সুফী ও লালনপন্থী সাধক স্বীকার করেছেন।

আপ্তুতত্ত্বে ফাজিল—প্রকাশে অক্ষম সিদ্ধ সাধক ; রব্বানা—আমার প্রভু।

(২৬৩) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

হাওা—হাওয়া ; খোশে—খসে ; ভাব্বনা—ভাবনা ; চোমক জরা—চমকে যে জ্বর হয় ; জোংলা—জংলা ; প্রম--প্রেম।

(২৬৪) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : গাঁজাবিরোধী পদ, জোত নিহারের সাধনা।

জোত নেহার—বিশ্রাম/গভীর রাতে সমধর্মী সাধকদের তত্ত্বালোচনা ও সাধনার আসর/জ্যোতিদর্শন, রূপদর্শন। দেহ-মিলনকালে উভয়ের অপলক দৃষ্টি। দেহমিলনে ক্লান্ত হয়ে স্থির হয়ে উভয়ের রূপদর্শন এবং পুনর্বার কর্মে লিপ্ত হওয়া।

গাজা...অটল বেহারি—এই প্রত্যক্ষ দর্শন ও মননের সাধনায় গাঁজার নেশা সাহায্য করে না।

কাটের..টিপীয়ে—অনেকে থলিতে রেখে নানাপ্রকার কাঠ দিয়ে, রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি মালা জপে নাম করে।

*দরবেশ...—দরবেশগণ জোত নেহারে সিদ্ধ হন। কৃষিকর্মে ক্লান্ত হয়ে স্বল্পকালীন বিশ্রামবে 'জোত' বলা হয়। গাড়ি বা যোয়ালে লগ্ন অবস্থায় স্থির হয়ে থাকা।

(২৬৫) প্রবর্ত্তের সাধক : পারের গান।

হিরের সাকো—হীরার মতো ধারালো সেতু ; কারাকারে—কারাগার /গর্ভ ; সদাই করা—বাজার করা ; পাড়ি...শেরে—পাড়ি সমাপ্ত করবে।

(২৬৭) সিদ্ধের সাধক : গৌরলীলা। কৃষ্ণভাব। ওয়াকিল আহমেদ 'সারি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি প্যারী বা রাধা হবে।

জমনা—যমুনা; আন্দ—আনন্দে; শুমাধরি—সুমধুর।

[চৈ. চ. অন্তলীলা ১৮, ১৯, ২০ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

(২৬৯) প্রবর্ত্তের স্থূল, আদমতত্ত্ব, বিলায়েত।

আর্দ্দ—আদি ; না দেখে...হেতা—আজাজিল আল্লাকে দেখে তার প্রতিরূপে আদম গঠন করেছিলেন। আদম...সাজে—আল্লা নিজে আদম দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন ; তাই ফেরেস্তাদের আদমকে সেজদা দিতে নির্দেশ দেন। বোরখা—বহির্দেহ ; হেতনা কল—যে যন্ত্রের সাহায্যে জল তোলা, ফেলা যায় ; দেল কোরাণ—হৃদয়ের জ্ঞানভাণ্ডার ; গোপীনাথ কবিরাজ এ ধরনের জ্ঞানকে 'প্রাতিভ' জ্ঞান বা 'বিবেকজ প্রাতিভ জ্ঞান' বলেছেন। (তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩)। আদম...সুতো—মৎস্যরূপী অধরকে দেহরূপ সুতা দিয়ে ধরা যায়।

(২৭০) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত, বিলায়েত, নুরতত্ত্ব।

লালনের গানের নুর ইত্যাদি প্রতীক নিয়ে Carol Salomon আলোচনা করেছেন The Cosmological Riddles of Lalan fakir নিবন্ধে।

শেদলে—সাধিলে, সাধন করিলে ; নুরে নবী, নুরে অটলময়, কাঙ্গুরা নুরে উজ্জ্বল দেহ। ছিষ্ট—সৃষ্ট (নুর দ্বারা সৃষ্ট নুর) ; সচতুর—সুচতুর ; নুরের হিল্লোলে—নুরে চন্দ্রে ; নুর জহুরা—

নবী নন্দিনীর প্রতি অনুরাগ থেকে প্রাপ্ত দিব্যশক্তি ; নুরের বাতি—জীবন ; খাকের পিঞ্জিরা—মাটির দেহ।

(২৭২) সাধকের প্রবর্ত্ত : নানাধরনের চাঁদ বর্ণিত এখানে। উজ্জ্বল সুন্দর দেহাঙ্গে চাঁদ স্থাপিত হয়েছে।

জ্ঞানহারা—চাঁদ জলকে আকর্ষণ করে ; চন্দ্রাকৃতি যোনির আকর্ষণে পুরুষ হয় জ্ঞানহারা।

রেতে উদয়...বাতি—পদ্মলোচনের পদে পাই, 'দিন দুপুরে চাঁদের উদয়। এখানে লালন উল্টা ভাষা ব্যবহার করেছেন।

(২৭৩) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত। নবী ও আল্লার সম্পর্ক।

এহাই—এই ; জার...জেনে—আল্লার নুরে নবী, নবীর দেহে খোদা নিজ নুরের পেয়ালা রেখেছেন ; নবীর নুরে আদমের জন্ম। বিছ—বীজ (সাই) ; ব্রক্ষ নবি—বৃক্ষ হচ্ছে নবী ; জেন্তে—জানিতে, ব্রক্ষের খুবি—বৃক্ষের সৌন্দর্য (ফা. খুব+ই) ; তোরিক—পৃথক পথ/দিব্য জ্ঞানের পর জ্যান্তে মরা অবস্থা ; চাইর কার—সৃষ্টির চারটি পর্যায় ; রাগপত্রে—রাগের পাতায় (রজেঃ?) ; নবির ভেদ—নবির গুপ্ততত্ত্ব ; দিন দুনিয়া—ধর্ম ও সংসার (নর ও নারী এই দু' নিয়ে)।

(২৭৪) স্থূলের প্রবর্ত্ত : দৈন্য।

মল—মূল ; পুক্ত—পোক্ত ; বাপের বিছে—বাপের বীজে ;

রোজ হাশরে—রোজ কেয়ামতের দিন ; দিষ্ট—দৃষ্ট ; আলেক পান্তী—আলেক পন্থা (অলক্ষ্য / শুক্র)।

(২৭৫) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত : দেহ ও আত্মা অভিন্ন।

বারামবার—বারংবার ; প্রমনওন—প্রেমনয়ন ; লায় লাহান—(কলমার অংশ) দেহ ; এলেল্লা জিবন—প্রাণ ; জুগোলে—যুগলে।

(২৭৬) সাধকের প্রবর্ত্ত : এক বহুরূপে বিকশিত হয়।

সার্দ্দ—সাধ্য ; মাজে—মাঝে, খেইল—খেলা ; কৃষ—কৃষ্ণ।

(২৭৮) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

আছমানের—আকাশের ; তিন তার—তিন নাড়ি ; হাওা মুলাধর—হাওয়া মূলাধার ; ঠেকেনা—ঠিকানা ; শুভোশোভা জোগ—শুভাশুভ যোগ ; রিদ—হৃদ্ ; নাটীকুটী—জটিলতা-কুটিলতা।

(২৮০) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

ভ্রন্ত—ভ্রান্ত ; এস্তে—আসতে ; শুপদ—সুপথ ; ছেড়তে—ছাড়িতে ; থেকতে—থাকতে।

(২৮১) সাধকের প্রবর্ত্ত ; বিলায়েত।

নরেকারে—নর আকারে ; ঝরার ঘাট—জন্মস্থান ; জোগান্তরে—যোগের সময় ; উপরআওলা—উপরঅলা ; দিদায়—দ্বিধায়।

(২৮৪) সাধকের প্রবর্ত্ত।

আলেফ—আল্লা ; মিম—নবী ; লামের—প্রকাশ্য অর্থ আল্লা ; গুপ্ত অর্থ মহম্মদ ; এশারা লিখন—কোরাণের ভাষা ইঙ্গিতপূর্ণ ; অন্যশোন—অন্বেষণ ; ঘুরিষ্‌নে—ঘুরিস নে।

(২৮৫) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

বজা সাদ্দ—বোঝা সাধ্য ; বুদ্দীতে—বুদ্ধিতে ; বেস্তের লাএক...সবে—কী, কেন, কিন্তু প্রশ্ন যারা করে না, অর্থাৎ সব জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটেছে যাদের, লোকে তাদের আহাম্মক বলে। একমাত্র তারাই বেহেস্তে স্বর্গে যায়। ভেদ—গুপ্ত ব্যাখ্যা।

(২৮৫ খ) সাধকের সাধক ; যুগল মিলন। মেরাজনামা।

আদম...কি করে—নবীর নরদেহ ; আল্লা নিরাকার—এ দুজনের মিলন হলো কীভাবে। নবী দেহত্যাগ করলেন, না আল্লা দেহী হলেন? (পরের বর্ণনা দুটি দেহের মিলন—এ থেকে প্রশ্নেই উত্তরটি পাই)।

তুণ্ডে...কাহার—মুখে মুখে বিহার (কাহার) ; সন্তে—শুনতে।

তুণ্ডু< তুন্দি—নাভি, উদর।

(২৮৮) প্রবর্তের স্থূল।

ফকিরি দাড়া—ফকিরি দণ্ড, আশা ; দরগা—সাধকের সমাধিস্থান, নিশান ঝাণ্টা—নিশান ঝাণ্ডা ; বেন্দে হড়া মরা—মরার হাড় বেন্ধে ; বাজ্য আলাফ—বাহ্য আলাপ ; অবদ গোবোদের—অবোধ গোবোধের। কাজি—জল দেওয়া বাসি ভাত।

(২৯৪) প্রবর্তের প্রবর্ত্ত।

কাগের শবাব—কাকের স্বভাব ; অম্রেতো—অমৃত ; মাখাল—মহাকাল/মাকাল ; অশোমায়—অসময় ; জজ্ঞোর ঘ্রেতো—যজ্ঞের ঘৃত।

(২৯৫) সাধকের প্রবর্ত্ত।

দেলেন—দিলেন ; দাশখত—অন্যের দাসত্ব করার লিখিত দলিল। ভাগবতাদিতে গোপীদের প্রসঙ্গে কৃষ্ণের ঋণের প্রসঙ্গ পাই। জয়দেবের 'দেহি পদপল্লবমুদারম'' পংক্তি দাসখতের প্রমাণ। রিতি—রীতি।

(২৯৬) প্রবর্তের প্রবর্ত্ত।

হক—সত্য ; জঠরযন্ত্রণা—গর্ভবাসের কষ্ট ; কোশে—কষে ; অলষ—অলসতা ; বন্দু—বন্ধু ; শাতের শাতি—সাথের সাথী।

(২৯৭) সাধকের প্রবর্ত্ত।

চাতক সবাব (স্বভাব)—চাতকের স্বভাব হলো এই যে, সে মেঘের জল ছাড়া অন্য জল খায় না। সাধকও রজঃবিকাশের আস্বাদ গ্রহণ করে এবং কেবলমাত্র সে সময় দেহমিলনে প্রবৃত্ত হয়।

রেকলে—রাখলে ; শুহালে—ভাল অবস্থায়।

(২৯৮) সাধকের প্রবর্ত্ত : পারের গান। এখানে উল্টাবংশী ও আভিপ্রায়িক-পারিভাষিক শব্দ এবং ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

নৌকার পরে গঙ্গা বোঝাই—উল্টা কথাটির অর্থ নৌকাকৃতি যোনিদেশে গঙ্গারূপ পূর্ণ রজঃবিকাশ। অন্যত্র লালন একে আবহায়াত বলেছেন। ফুল...ফল—রজঃ আগমন এবং রাধাবিন্দু/স্তন প্রকাশ, রং—রঙে ; মিন—মাছ, রাধাবিন্দু বা পুরুষ শুক্রকীট ; হাওায়—হাওয়ায়।

(৩০০) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত।

বৈরাগ্য—সন্ন্যাস বা নিবৃত্তি মার্গ বেদবিহিত ; গোপীভাব—সমাজ-বিধান অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন বেদ-বিরোধী আচার—রসিকেরা গোপীদের অনুসারী। জোগীন্দ্র মনিন্দ্র—প্রধান প্রধান যোগী এবং মুনি ; যোগীরা দেহ-সাধনা করে ; মুনিরা মানসিক সাধনা ও জ্ঞানমার্গের

পথিক। গোপীর—কৃষ্ণ গোপীদের প্রতি সতত আসক্ত ; গোপীর কেনা...মগনা—গোপী-ভাবের সাধকের অনুগত হয়েই বৃন্দাবন লীলার সাধনরাজ্যে প্রবেশিত হওয়া যায়।

(৩০১) সাধকের সিদ্ধ। কৃষ্ণলীলার এ পদটি পূর্বপদের ব্যাখ্যা।

সাম—শ্যাম ; বান্দা—বান্দা ; শুর্দ্দ...শেবা—শুদ্ধ রসামৃত সেবা ; নিগুর তত্ত্ব—নিগূঢ় তত্ত্ব।

*(৩০২) সাধকের প্রবর্ত্ত।

বৌদ্ধদের পঞ্চস্কন্ধ, ভাববাদীদের পঞ্চভূত এবং বৈষ্ণবদেব পঞ্চতত্ত্বের ধারণাটিকে এখানে বৈদিক বলা হয়েছে। বিধি বা আচার নয়, নরপূজা এ মতবাদটির মূল কথা। হরিকে প্রত্যক্ষ না দেখে সশব্দে হরিনাম কীর্তনে হরি লভ্য নয় বলে লালন মনে করেন।

(৩০৫) সিদ্ধের স্থূল : গৌরলীলা।

ধর্ন—ধন্য ; বএশে—বয়সে ; ভারতি—কেশব ভারতী, ভেকের গুরুদের ভারতী বলেন বৈষ্ণবদের কেউ কেউ ; শিকাইলে—শিখাইলে ; জগোর্নাৎ মিছরি—জগন্নাথ মিশ্র ; জিব সর্নাশী—জীবন্ত সন্ন্যাসী।

(৩৪১) সিদ্ধের স্থূল : গৌরাঙ্গ বিষয়ক।

অন্তোরে—অন্তরে ; কপ্লতোরু—কল্পতরু (বিপর্যয) ; বিহা—বিবাহ ; বেষ্টপীয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া ; সচিমাথা—শচীমাতা।

(৩০৭) সিদ্ধের স্থূল : গৌরলীলা।

বইলে—বলে ; আজগোবি—আজগুবি ; ঘোমের ঘরে—ঘুমের ঘোরে ; সত্ত্য কৈরে—সত্য করে ; শোমায—সময় ; শীখালো—শিখাল ;

(৩০৮) সিদ্ধের স্থূল : কৃষ্ণলীলা।

জসদা—যশোদা; সামন্য—সামান্য ; মনি—মুনি ; শুসিতোলো—সুশীতল ; বাঞ্চীতো—বাঞ্ছিত ; বিন্দাবোন—বৃন্দাবন ; গোপাল, গোপাল—কৃষ্ণ, গোরুর পাল ; কৃতি—কীর্তি।

(৩০৯) সিদ্ধের স্থূল : ঐ।

কল্যে—করিল ; চিত্র মাজাব—চিত্ত মাঝার ; সন্যকারি—শূন্যকার ; হোরে—হরে।

(৩১০) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত। ভাবনার সঙ্গে কর্মসিদ্ধির সম্পর্ক আছে।

বেমতি—বিরূপ ; দুর্ব্ববনে বাগে—দূর্বা বনে বাঘে ; ভিকারি—ভিখারি ; ফেরে—দোষে ; জার...করূণা—যার যেমন মনেব করণ , ভেবলে—ভাবলে ; সারে—সংশোধন হয।

পদটি পড়ে মনে হতে পারে যে লালন পূর্বজন্মের কর্মফলে বিশ্বাসী, কিন্তু এটি শিষ্যপদ, বিতর্কের জন্য রচিত ; এর জবাবটি দুদ্দুর রচনায় পাই। (বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ ৩৯৮)। সেখানে মানুষ নিজ কর্মে ভাগ্য সৃষ্টি করে বলে উল্লিখিত হয়েছে।

(৩১১) সিদ্ধের সিদ্ধ : গৌরলীলা—মানুষ ভজনতত্ত্ব।

এশবে ফেরে—আসবে ফিরে ; গীএছে শেরে—গিয়াছে সমাপ্ত করে ; জথা তথায়—যেখানে সেখানে/যথা প্রয়োজন তথায় ; রশোপান্তী—রসপন্থী ; শুপে...শ্রীরূপেরে—সঁপে গেলেন শ্রীরূপকে ; অদ্যইত—অদ্বৈত।

(৩১২) সাধকের স্থূল : কৃষ্ণলীলা।

পদটিকে 'কৃষ্ণভাবে আত্মকথা' হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

লনি—ননী ; সলপেতে—স্বপ্নেতে ; জেএ—গিয়ে ; মাজোনি—মা জননী ; বন্দন—বন্ধন ; ডেকবো—ডাকবো ; গ্রেহে—গৃহে।

(৩১৩) সাধকের প্রবর্ত্ত/সিদ্ধের স্থূল : কৃষ্ণলীলা। বহুগামীতার প্রতি প্রবল নিন্দা।

জেনলে—জানলে ; শুরিতি কুরিত—সুরীতি কুরীতি ; সাম—শ্যাম ; এমন—একমন ; কয়...জেনলেম না—মন একটি, বহু সঙ্গ করার অর্থ একটি মন একাধিকবার বিক্রয় করা—যা সামাজিক নিয়মে অনৈতিক ; তন্নী...জানা শ্যামের আচরণ অন্তহীন ভুলে ভরা ; প্রম গোকুলে—প্রেম গোকুলে ; লোইতে...এস্তোনা—একনিষ্ঠার অভাবহেতু প্রেমাস্বাদের জন্য কন্থার জামা পরিধান করে নদীয়ায় এসেছেন ; বিবাচোনা—বিবেচনা।

(৩১৪) সিদ্ধের স্থূল : কৃষ্ণলীলা : মান।

পোরলাম—পরলাম ; সিক্ষে—শিক্ষে ; বের্ন্নন—ব্যঞ্জন, তরকারি ; চেকে—চেখে ; লর্জ্জা গোনেনা—লজ্জা (হিসাবে এটাকে) গণ্য করে না ; ঘেন্যায়—ঘৃণায় ; জমন—যেমন ; তন্নী—তেমনি ; রাখাল অলি—চন্দ্রাবলী সামঞ্জস্যা সুখপিপাসিনী নায়িকা, কৃষ্ণ তার ভ্রমর (ফুলে মধু খায়) ; বোল—কথা।

(৩১৫) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত : কৃষ্ণলীলা।

কৃস্টেন—কৃষ্ণ ; জারে...চরণ—নারায়ণের শক্তি (তান্ত্রিক শব্দ) গোপী, কিন্তু কৃষ্ণ গুরু বলে তাদের চরণবন্দনা করেছেন। জয়দেবের 'দেহি' পদ...' শ্লোকের এটি লালনের ব্যাখ্যা।

বেবহার—ব্যবহার ; পাদপর্দ্দ—পাদপদ্ম ; ত্রি...নারী—কৃষ্ণকে সবাই চায় ; কৃষ্ণ চায় নারী রাধাকে ; দাসখতে...বিকালে—প্রেমের ঋণে শ্যাম বিক্রীত হয়ে গেলেন।

(৩১৬) সিদ্ধের সাধক : কৃষ্ণলীলা ও গৌর অবতার।

নেবলে—নামিল ; সামোরায়—শ্যামরায় ; ভেশে—ভেসে ; পেববে—পারবে ; রাজশ্ব—রাজত্ব ; উর্দ্দাশো—উদ্দেশ্যে ; চিন্তে খেন্তা—চিন্তা কন্থা, ছেড়া কাঁথা ; কেলে শোনা—কেলে সোনা, কৃষ্ণ, ছিরাধার—শ্রীরাধার ; দাশ...অভিলাষ—অনুগত, একনিষ্ঠ ; এশবে—আসবে ; বাঞ্চা—বাঞ্ছা ; জেন্তে পাল্যে—জানতে পারলে।

(৩১৭) সিদ্ধের সাধক : কৃষ্ণ/গৌরলীলা।

মাথে—মাথায় ; খিরোসর ননি—ক্ষীরসর ননী ; অসুক—অসুখ ; অগোর—অগুরু ; বোন—বন।

(৩১৮) সিদ্ধের সাধক : মান।

কিশোরি—কিশোরী, রাধা ; জন্তো সাদে সামার—যত সাধে শ্যাম আর ; ধর্ন্ন—ধন্য ; প্রতিশোদ—প্রতিশোধ [কৃষ্ণকীর্তনে এধরনের কথা কৃষ্ণ রাধাকে বলেছে] ; বজলাম দড়ো—বুঝলাম দৃঢ় ; সমা—শ্যাম ; দেখপো—দেখবো ; বিন্দে—বৃন্দা, রাধার সখী/কৃষ্ণের দূতী।

(৩১৯) সিদ্ধের সাধক : মান।

জা সনলে—যা শুনলে ; বিন্দে—বৃন্দে ; তোরো—তোর ; বুজি কোটীন হএ—বুঝি কঠিন হয় ; সতেক—শতেক ; বাঁকা—কৃষ্ণ ; মানের ঘাএ—মানের প্রতিক্রিয়ায়।

(৩২০) সিদ্ধের সাধক : মান।

চাতরি—চাতুরী ; হেতায়—হেথায় ; নাগোর আলি—নাগরালি ; কালি—মুছে যাওয়া/বন্ধ হয়ে যাওয়া।

(৩২১) সিদ্ধের সিদ্ধ : মান পদগুচ্ছের সমাপ্তি এ পদটিতে। এখানে রাধার মহিমা গান।

প্রিরী—প্যারী, পিয়ারি ; ভাবপ্রেম রসের গুরু—সাধনায় এ তত্ত্ব রাধা জানাতে পারে ; আশ্রায়—আশ্রয় ; সপ্প—স্বপ্ন ; তেজীলে—ত্যজিলে ; পৌরস—পৌরুষ ; তথাই—তথাপি ; রিন সিকার—ঋণ স্বীকার।

(৩২২) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত/সাধক। এ পদে আত্মজৈবনিক তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা নেই।

বমবেটের—বোম্বেটের ; শরল—সরল ; যুবাকাল কলঙ্ক হলো—লালনের জীবনের দুর্ঘটনা এবং সংসারত্যাগের স্মৃতিচারণ এখানে ; ব্রর্দ্ধ—বৃদ্ধ ; উজইতে—উজাইতে ; তোরি—তরি। লালনের গানে পিতার পরিবর্তে গুরু এবং সাঁইকে পাওয়া যায়।

(৩২৩) সিদ্ধের সাধক : কৃষ্ণলীলা : মান।

কৃশ্‌টেরে—কৃষ্ণকে ; কুঘোটাতে—কু ঘটিতে ; পাশান—পাষাণ ; সনে—শুনে।

(৩২৪) প্রবর্ত্তের স্থূল (জীবদশা)।

বিশয়—বিষয় ; দিবোরোজোনি—দিবারজনী ; সান্তো—শান্ত ; শ্বরন—স্মরণ।

(৩২৫) সাধকের প্রবর্ত্ত।

দরের—সাগরের/ধড়ের ; পণ্ডীৎ—পুঁথিবিদ্যা সম্বল ; পথি—পুঁথি ; সয়াং—স্বয়াং ; বজে—বুঝে ; অজুনি—অযোনি, অকাম ; সহজো—সহজ ; শোমস্কার—সমস্কারা ; দিনোমনি গেলে—জীবনাবসান ; শেজ্জোন—সৃজন ; অন্যশোন—অন্বেষণ।

(৩২৬) সাধকের প্রবর্ত্ত।

অধার—অধর/যে ধারাকে ধরা কঠিন ; পঞ্চতত্ত্ব—বৈষ্ণবদের সাধনা ; জদী—যদি ; বৈরাগ্যরা—ভেকধারী বৈষ্ণব যাদের উপাধি হয় দাসবৈরাগ্য/বৈরাগ্য ; আচলা গুদড়ি—আঁচল বা বহির্বাস, গুধড়ি বা কাঁথা (ছিন্নকন্থার পোষাক) ; বোষ্টবেবো—বৈষ্টমের ; ব্রহ্মজ্ঞানী—ব্রাহ্ম ; শাক্ত বৈষ্টবেরো নয় শয়ং পরিচয়—শাক্ত বৈষ্ণবদের স্বয়ং এর সঙ্গে পরিচয় হয় না, তারা গুরুতেই আবদ্ধ থাকে ; অক্ষ্য—ঐক্য/তর্ক, কি পাই—কি পায়।

(৩২৭) সাধকের প্রবর্ত্ত।

সবাব—স্বভাব ; ভরোসা—ভরসা ; ছিচরণ—শ্রীচরণ ; বুদি কটানে—বুদ্ধি কাটানো ; পত—পথ।

(৩২৮) প্রবর্ত্তেব প্রবর্ত্ত।

বশে—বসে ; উপাজ্জোন—উপার্জন ; আওলা বানি—এলোমেলো কথা ; শোনা—সোনা ; অনুপোঞ্চাশে—ঊনপঞ্চাশটি পবনে।

(৩২৯) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

লোবের—লোভ, বিরাজা—বিরজা ; বেপার—ব্যবসা ; অক্রীম—অন্তিম ; চিত্র—চিত্ত ; বেশুমার—(সুমার—গণনা করা) বহুবার, গোনা যায় না।

(৩৩০) স্থূলের প্রবর্ত্ত।

শব জাবে—সব যাবে ; লালোশ—লালসা ; শংশার—সংসার ; শুক্রীতি—সুকৃতি ; পামোরা—পামর ; শোমাএ—সময় ; ক্রেপা—কৃপা ; কেনারা—কিনারা।

(৩৩২) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

পীরিৎ—পীরিত ; জিৰ্ব্বায়—জিহ্বায় ; কএদ—কায়দা ; লাবোরে—লাভে রে ; জখোন—যখন।

(৩৩৬) প্রবর্ত্তের স্থূল।

আনলে—অনলে ; প্রানী—প্রাণ ; জলনে—জ্বলনে ; দস—দোষ ; সাদী—সাধি, প্রেবোসির—প্রবাসীর ; সাত—সাথে ; ত্তরায়—ত্বরায়।

(৩৩৯) সাধকের প্রবর্ত্ত।

ধ্যেনে—ধ্যানে ; মনি—মুনি ; মিন—মীন ; ফনি—ফণা ; শুমুদ্র—সমুদ্র ; ডুব্লে—ডুবলে ; যোগি—যোগী, দেহমিলন সাধনাকারী ; খারা—খাড়া, স্পষ্ট ; চুব্‌নি—চুবনি।

(৩৪০) সিদ্ধের সাধক ; কৃষ্ণলীলা।

মনের মানুশের—প্রেমিক ; অহনিসি—অহর্নিশি ; শশি—শশী ; অন্যেসন—অন্বেষণ ; হারিলাম—হারালাম ; স্বরণ—স্মরণ।

(৩৫৩) সাধকের প্রবর্ত্ত : পারের গান। রূপাই-এর পদ।

মমিনা—বিশ্বাসী/জোলা ; জার...খায়—দেহমিলনে যার মৃত্যু হয়েছে ; ঢেঁকী—ঢেঁকি ; ঘাটার চাবি——ঘাটের চাবি, দেহ বন্ধ না করে।

(৩৫৫) প্রবর্ত্তের স্থূল : আসল শরীয়ত।

মুরিদ...ঘরে—হজরত মহাম্মদ কার শিষ্য? কোন কালেমায়—কোন কালেমা উচ্চারণ করেছিলেন ; অথাই গভিরে—অথৈ গভীরে ; নেরালা—নিরালা ; ময়ৌমৈরি নিলে—ময়ূর-ময়ূরীর অযোনি-সম্পর্ক ; এসারায়—ইশারায়, বুদ্দির—বুদ্ধির।

(৩৫৭) সাধকের প্রবর্ত্ত/প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

ফাণা—তন্ময় চিন্তায় মগ্ন ; ফকিব—সাধকগোষ্ঠী ; ভস—ভস্ম ; মসকরা—মস্করা, বৃথা ; উভায়—উভয় ; মুর্শিদ ও আলেকনুরি—(রজঃবীজ) ; মতিকহারা—মতিচ্ছন্ন।

(৩৫৮) প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত।

জার—যার ; আত্তা—আত্মা ; জেবা—যেবা ; তত্তব্রেদের—তত্ত্ববিদের।

(৩৬০) সাধকের প্রবর্ত্ত : রজঃসাধনা-সম্পৃক্ত পদ।

আমাবশ্যে—সে চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই ; সিন্দু-সিন্ধু ; সরনগিরি—স্বর্ণগিরি ; ভুবান—ভুবন।

(৩৬৩) সাধকের সাধক।

সাদন—সাধন ; সাদিতে—সাধিতে ; ফাপরি—ফেঁপে ; তুপান—তুফান ; বেঁদলাম কশে—কষে বাঁধলাম ; বস্তুরক্ষায় নাভি, বুক, গলায় তিন বাঁধ সৃষ্টি করা হয় ; বাঁদন—বাঁধন ; কাম...আগমন—কাম ছাড়া প্রেম হয় না ; কামগুরু—স্বামী গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়, প্রেমসুখার্থ দেহমিলন, (পরম বা সাধকের কর্ম এটি)।

(৩৬৪) সিদ্ধের প্রবর্ত্ত।

ছিন্য ভিন্য—ছিন্নভিন্ন ; ওহিক দারে—ঐহিক দ্বারে, যোনিতে পরীক্ষা হয় রসিকের ; খুকসি (< ফা. খসকী=বর্ণবিপর্যয়) বাড়ির পিছন-দ্বারে ভয়ে জড়সড় ; শোশাএ শোশে—শোষায় শোষে, মুখের সাধনা ; সন্দি—সন্ধান ; সাদিল—সাধিল ; শেম—শ্যাম।

(৩৬৬) প্রবর্তের প্রবর্ত।

আরোফ—আরোপ, দৃষ্ট ব্যক্তিকে স্মরণ ; রউসনি দেল—হৃদয় আলোকিত হবে ; জেললে—জান্‌লে ; মোরাকেবা—ধ্যান ; মোসাহেদ—ধ্যানে বিশেষ তত্ত্ব জানায় অনলস চেষ্টা ; তরিকের মঞ্জিল—সিদ্ধিলাভের পর আশ্রয়স্থান।

(৩৬৭) সাধকের প্রবর্ত।

শুক্কের জোগ—সূর্যের যোগ/পুরুষদেহের রজঃপ্রবৃত্তি ; খুধা—ক্ষুধা ; পান্তি—পঙ্খী, পংক্তি ; জুগলগত—যুগল সাধকের অনুগত ; উদ্‌ভাব—উদ্ভব।

(৩৬৮) সাধকের প্রবর্ত।

একই সত্তা নানা রূপ ধারণ করেন ; নারী বা পুরুষ হন। চৈ. চ. বর্ণিত হয়েছে পূর্বের কৃষ্ণলীলার সখীগণ, চৈতন্যলীলায় পুরুষ হয়েছেন। করিম—দয়ালু ; করতার—কর্তা (> করতা) ; ঘোচায়—ঘুচাও।

(৩৬৯) সাধকের প্রবর্ত। চার পেয়ালার তত্ত্ব : চারচন্দ্রভেদের ইঙ্গিত আছে।

জাত—এক ; ছেপাতে—সেফাতে ; ৪ পেয়ালা—জব্বুরী, ছত্তুরী, নুরী, জহুরী। এ চার...অতি গোপনে—চারচন্দ্রের সাধনা অতি গুপ্ত। চার ফাণা—ফাণা, বাকা, ফাণাফেল্লা, ফাণাফের রছুল।

(৩৭১) প্রবর্তের প্রবর্ত। গানটিতে পদসংখ্যা নেই।

মানসের—মানুষের ; জোমের চেলা—যমের চেলা ; বেশম জালা—বিষম জ্বালা ; শেশে—শেষে ; উজান ভেটেল—বস্তুরক্ষা বা বিসর্জন/প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মার্গ ; ভুক্তি ও মুক্তি—ভোগ ও মোক্ষ ; জরাম্রেতো—জরামৃত ; জোমের ঘর—যমের ঘর ; করণ—সাধনা ; রলি—রহিলি।

(৩৭২) প্রবর্তের প্রবর্ত। গানটিতে পদ সংখ্যা নেই।

দেবের দুল্লভ—দেবদুর্লভ ; আচার—আচরণীয় কর্ম ; সিদ্দি—সিদ্ধি।

(৩৭৩) প্রবর্তের স্থূল। পদসংখ্যাহীন ।

মনি—মুনি ; রলো—রহিল ; মেহের—দয়া ; দিদার—ব্যক্ত ; চারটি কোরান—ইঞ্জিল ; তৌরাদ, জোব্বার ; ফুরকান (হজরত মহাম্মদ আনীত) ; কল্বেন—করলেন ; ছোবহান—সুব্বাহান, আল্লা ; কেল্ল—কেল্লা ; খিয়ালে—খেয়ালে ; জবানে সনি—জবানে শুনি ; ধারাতে-ধনি—রসস্রোতে আছেন ধনি ; বেশম—বিসম ; সত্ত—সত্য।

(৩৭৪) সিদ্ধের স্থূল। সংখ্যাচিহ্নিত নয়।

মনি রিশী জোগ—মুনি ঋষি যোগী ; আলেক মানুষ আলেফে—শুক্র পুরুষদেহে ; অনাশে—অনায়াসে ; ঘরেরী—ঘরের ; বুজে—বুঝে।

শঙ্করাচার্য ঘটাকাশে প্রতি বিম্বিত তত্ত্বালোচনা করেছেন।

২৯ সংখ্যক চর্যাপদে লুই, চাঁদ এবং জলের প্রতিবিম্বিত চাঁদের কোনটিকেই মিথ্যে বলেন নি।

এই চাঁদ এবং জলে বা অন্যত্র প্রতিবিম্বিত চাঁদের প্রসঙ্গ লালনে বহু ৩৬০, ২৭২, ১১৫, ১৫৭, ২০৫ নং পদে এ চিত্রকল্প আছে। ২২৪নং পদে গৌরচাঁদে শ্যাম চাঁদের আভা বর্জিত হয়েছে। ২২২নং পদে লালন চাঁদধরা ফাঁদের পরিকল্পনা করেছেন। ২৫৯ নং পদে অধর চাঁদকে ধরার পসঙ্গ। লুই এর—চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন লালন ভিন্ন সিদ্ধান্তে, "পাণির চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে থাতে কে পায়?

(৩৭৫) **সাধকের প্রবর্ত**। সংখ্যা চিহ্নিত নয়।

সুক সাগোর—সুখসাগর ; জেএ—গিয়ে ; জল ছুওনা—প্রথাগত দেহমিলনে নিষেধ ;

পঞ্চনারী—পঞ্চভূতের পঞ্চশক্তি ; খড়গধারী—কালিকা, পশুভাবে মাতৃগমন করলে তিনি খড়গ দিয়ে তাকে হত্যা করেন ; সরবর—সরোবর ; মিন হাওা ধরে—মাছধর বাতাস নির্ণয় করে ; বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে ছিপে মাছ ধরার সম্পর্ক আছে/ দেহসাধনায় বায়ুর অবস্থান গুরুত্ব পূর্ণ।

*** তারকা চিহ্নিত ২০টি পদ প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত।**

পরিশিষ্ট।। পাঠান্তর সমস্যা

ক্ষিতিমোহন সেন এবং মনসুরউদ্দীন গায়কদের কাছ থেকে গান সংগ্রহ করে, সেগুলিকে সংস্কৃত করেছেন। লৌকিক ভাষারীতির চিহ্ন এ গানে কম। মনসুরউদ্দীনের গান গায়কদের কাছ থেকে গৃহীত। ভাষা, ছন্দ সংশোধিত। আবদুল হাই, দু'জন গায়কের দ্বারা এগুলি মার্জিত করে সম্পাদনা করেছেন। এ সংগ্রহগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয়নি।[১]

খোন্দকার রফিকউদ্দীন, পাঞ্জুর গানের লিখিত উৎসসূত্রের নির্দেশ করলেও, গানের কোন উৎসসূত্র উক্ত হয়নি। নানা বিকৃত আকারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লালনাদির গান প্রকাশিত হচ্ছিল। "তিন নকলে আসল খাস্তা হয়ে লোককবিদের ভাবপূর্ণ গীতির অর্থবোধ হয় না।" এ জন্য তিনি 'ভাবসঙ্গীত' প্রকাশ করেন (১৯৫৫)। "এগুলিতে ধর্মবিশ্বাসের গোড়ামি আরোপ করা হয়নি।" গানগুলি, "সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।" সংশোধনের প্রকৃতি আলোচিত হয়নি।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গান সংগ্রহ করেছেন :

১. গায়কদের খাতা।
২. লালনের আশ্রমে রক্ষিত খাতা (এর প্রতিলিপি রবীন্দ্র ভবনের খাতা)।
৩. গায়কদের মুখ থেকে।

কুষ্টিয়ার হীরুশাহ ও খোদাবক্স শাহের দ্বারা এগুলি সংশোধিত হয়েছিল। গায়কদের গান তিনি মনসুরউদ্দীনের মতো (যৎ শ্রুতং তৎ লিখিতং) নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। "অশিক্ষিত গায়ক না বুঝে সাধনা বা ভাব শব্দ বিশেষ পরিবর্ত্তন করার ফলে পদ অর্থহীন হয়ে গেছে। খাতা-লেখকদের অজ্ঞতার জন্য বানান ও শব্দ বিকৃত হয়েছে। খাতা থেকে গানের ভুল সংশোধন করে বিচার-বিবেচনার দ্বারা প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা হয়েছে। অর্থহীন শব্দ স্পষ্টতঃ নিতান্ত অশুদ্ধ ও বিকৃত ভাষা সংশোধন ছাড়া, ভাষা বা ছন্দে বিন্দুমাত্র হাত দেয়া হয় নাই।"[২]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'লালন গীতিকা'-র মূল সম্পাদক হিসাবে পীযূষকান্তি মহাপাত্রকে নির্দেশ করেছেন। মতিলাল দাশের সংগ্রহ, রবীন্দ্রভবনের খাতা থেকে গানগুলি গৃহীত হয়েছে (১টি পদ উপেন্দ্রনাথের)। আঞ্চলিক উচ্চারণে তৎসম শব্দের বিকৃতি, বর্ণাশুদ্ধি, অ-কারের ও-কার প্রবণতা, মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণতা প্রভৃতি বিকৃতি ও অশুদ্ধি সংশোধিত হয়েছে। পংক্তি ভেঙে গানগুলিকে কবিতার আকারে সাজানো হয়েছে—গানগুলিকে বোধগম্য করে তুলবার জন্য।[৩]

ঢাকা, বাংলা একাডেমী থেকে আবু তালিব সম্পাদিত দু'খণ্ড লালন গীতিকায় মোট ৬২৬ টি গান সংগৃহীত হয়েছে।[৪] এর মধ্যে কিছু পদ লালনের নয় বলে তালিবের ধারণা। গ্রন্থ-ভূমিকায় (১ম খণ্ড) কাজী দীন মহম্মদ দেশের উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণান্তে বিভিন্ন গায়কের কাছ থেকে এ গানগুলি সংগ্রহের কথা বিবৃত করেছেন। কিন্তু তারিখ, স্থান ও গায়কের নাম উল্লিখিত হয়নি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে।

কুষ্টিয়া নিবাসী জনৈক মুসলিমউদ্দীনের উল্লেখ পাই তালিবের লেখায়। তিনি একটি 'আদর্শ খাতার' উল্লেখ করেছেন বহুবার কিন্তু এটির তারিখ, মালিকের নাম নেই।[৫] গায়কদের মুখ এবং খাতা থেকে, লালন গীতিকা, ভাবসঙ্গীত ও উপেন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকেও তিনি পদ নিয়েছেন। পদ শুদ্ধ করেছেন :

(ক) গায়কদের কাছে শুনে।
(খ) ভাবসঙ্গীতের পদ ব্যবহার করে[৬]।
(গ) লালন গীতিকা ব্যবহার করে[৭]।

লালন গীতিকার পাঠ অপেক্ষা ভাবসঙ্গীতের পাঠগুলিকে তিনি শুদ্ধ মনে করে মন্তব্য করেছেন যে গীতিকার সম্পাদক "পুঁথির গলদ যাই থাকুক, শব্দগুলির উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে না পারায় এই বিপদ ঘটেছে, মনে হয়।"[৮] ভাবসঙ্গীতের ত্রুটি সম্পর্কে তিনি অবশ্য নীরব। পূর্ববঙ্গের কথ্য শব্দ এবং আরবী ফার্সী শব্দগুলি এ সংকলনে প্রায় যথাযথভাবে ব্যবহৃত এবং ব্যাখ্যাত। কিন্তু পংক্তি-সজ্জায়, স্তবক-গঠনে বা ভাষায় সম্প্রদায়ের বা আঞ্চলিকতার কোন চিহ্ন নেই। বাকরীতি মূলত ভদ্রজনোচিত। বহু স্থলে ইসলামী শব্দ আরোপিত হয়েছে গানে। গানের শব্দার্থ বোঝার অক্ষমতাজনিত সম্পাদনার ভ্রান্তি আবু তালিবের গ্রন্থে যথেষ্ট।[৯] এভাবেই শিক্ষিত সম্পাদকেরা গায়ক ও খাতার প্রতি অবজ্ঞা থেকে, নিজেদের বিজ্ঞতাকে লালনের গানকে সংস্কৃত করার দায়ে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লালনের জগতের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিতি না থাকার জন্য সংস্কৃত গানগুলি ক্ষেত্রবিশেষে অস্পষ্ট, অর্থহীন, এবং অর্থান্তরিত হয়ে গেছে। ভোলাই-এর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ভাবসঙ্গীত, উপেন্দ্রনাথের সংগ্রহ, লালন গীতিকা-র কয়েকটি গানের তুলনা করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বাঁদিকের সংখ্যা পৃষ্ঠার, ডানের সংখ্যাটি পদের ; সংক্ষেপে ভা. স. (ভাব সঙ্গীত), লা.গী. (লালন গীতিকা), উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (উ.ভ.) এবং ভো. (ভোলাই-এর পাণ্ডুলিপি) শব্দ ব্যবহৃত হলো।

অসাধারণ ছন্দোস্পন্দের গান 'যেতে সাধ হয়রে কাশী' গানটি চারটি সংকলনেই পাই।

ভা.স.	লা.গী.	উ.ভ.	ভো.
৭৩/২০৩	৯/১১	৫৬৭/৩৪	১৫৩
ভোলাই-এর অনুরূপ	৯ টি পংক্তি, ৪টি একদাঁড়ি, ৪টি দু'দাঁড়ি। ৮টি মিত্রাক্ষর, ১টি পংক্তি মুক্ত।	১৬টি পংক্তি, ৪টি এক ও ৪টি দু'দাঁড়ি। চরণগুলিকে একাধিক পংক্তিতে সাজানোয় অন্ত্যমিল ভিন্ন। প্রায় ১৬টি মিত্রাক্ষর ; পর্বান্তিক মিল দিয়ে পংক্তি রচিত। মিলের পুনরুক্তি আছে।	মুখপাত ও ৩ কলি, ৫টি চরণান্তিক মিল
বাধলো	বাধে	বাধে	১ম চরণে 'বেদলো'
বর্জিত	ঐ	ঐ	২য় চরণে 'আমি'
			৩য় চরণে মনের ভোলায়
	ঐ	দাঁড়ি ব্যবহৃত	পর্বচ্ছেদ
ডিঙ্গি	ঐ	ডিঙ্গে	৩য় চরণে ডিঙ্গা
লালয়	শালায় (পাঠান্তর নালায়)	ঐ	৩য় চরণে নালায়

হয় বিবাদী	ভো. অনুরূপ	সাজাএকী	৪র্থ চরণে দেয় বাজি
কি মন...	ভো. অনুরূপ	ফাঁকি দিয়ে	কিবা মন... পাজি হোএ
বায়	ঐ	ঐ	বাই
ঢেকে...চালায়	তাকে...চালায়	ঢেকে...চালায়	৫ম চরণে ঢাকে... চলায়
বর্জিত	ঐ	ঐ	অধীন

ভোলাই-এর খাতায় বেদলো, নাগোর, বুজি, হোএ, বলদো, জমন প্রভৃতি উচ্চারণভিত্তিক বানান ধ্বনির ঐকতান সৃষ্টি করেছে। অন্যত্র ছন্দোস্পন্দের হানি ঘটেছে। ডিঙ্গা বা নৌকা নালায় ডোবে; লা. গী...তে পরিবর্ত-শব্দ অর্থান্তর ঘটায়; ভা. স. লালয় শব্দটি অর্থহীন। অন্যান্য শব্দ পরিবর্তনে ক্রিয়া, কর্তারও পরিবর্তন ঘটেছে।

সাধন-সংক্রান্ত 'মানসের করণ সে কিরে সাধারণ' পদটি চারটি সঙ্কলনেই আছে। ভাবসঙ্গাতের সঙ্গে ভোলাই-এর খাতার কয়েকটি শব্দগত পার্থক্য আছে মাত্র; কিন্তু অন্য দুটি সঙ্কলনের সঙ্গে এ পদটির গুরুতর পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

ভা.স.	লা.গী.	উ.ভ.	ভো.
১২১—১২২/৩৩৭	৩১৪/৪৫৬ ১৬ পংক্তি, ১টি ১ দাঁড়ি ৪টি দু'দাঁড়ি	৫৯৯/৮৬ ১৭ পংক্তি!—১টি, ১ দাঁড়ি—৩টি; দু'দাঁড়ি—৩টি	২৯ নং পদ মুখপাত ও তিন কলি; ৫টি মিত্রাক্ষর
ভো. অনুরূপ	ভো. অনুরূপ	কেবল রসিক	মুখপাত 'রসিক'
. . .বেবাগই	ঐ	বিষয়ভোগী	।।. জীব বিবাগী
ভো. অনুরূপ	ভো. অনুরূপ	অটলে এ অংশ বর্জিত;	অটল
ভো. অনুরূপ	ভো. অনুরূপ	৫ম লাইনটি অন্য কোথাও নেই; সাধনপ্রসঙ্গে এর অর্থ নেই।	সেও রাগ..ধারা
ঐ 'ছন্দি'	ঐ 'সন্দি'	এটি সম্পূর্ণ আলাদা	১ম কলি 'সন্দী'
ঐ 'হেম অঙ্গ'	ভো. অনুরূপ	পড়ে না সে দুর্দশায়	'হীন অঙ্গ' 'সে পড়ে দুর্দশায়'
'হলে' শব্দ বর্জিত	ঐ	এটি নেই; অন্য স্তবক	২য় কলিটি গুরুত্বপূর্ণ
ভো. অনুরূপ 'অধীন' শব্দ বর্জিত	ভো. অনুরূপ 'কামহেতু'	২য় কলির দু'একটি শব্দযোগে অন্য স্তবক, পারিভাষিক শব্দ নেই।	৩য় কলিটি অসাধারণ 'হেতুকামে'

ভোলাই-এর বানানে মানুষো, বিশ্বাসো আছে; অন্যত্র এগুলি সংশোধিত। উ. ভ. গুরুত্বপূর্ণ পদটি খণ্ডিত, বিকৃত এবং অর্থহীন।

সুফী-ইসলামী এবং অন্য পারিভাষিক শব্দের কী বিপর্যয় ঘটেছে উ. ভ. এ এবং লা. গী-তে তার দু'চারটি উদাহারণ দেয়া যায় ঃ[১০]

ভো	উ. ভ.
২৩৮	৬৩৮/১৫৩
সোগোল রাবেতা বলে	সকলের আত্মা বলে
এক মনে দুই কৈ দাড়ায়	দুই দিকে মন কৈ দাড়ায়
দোধারাতে খাবি খায়	দুই ধারে মন খাবি খায়
২৪৫ নং পদ	৬৭০/২০৭
তোর	মনের
মতন	যেমন
(নেই)	অঙ্গে
ভূশান, দুনওন, তিনে তিন	বিভূষণ, চতুর্গুণ, তিনেতে তিন
হকের	হক্কের
দিনের ভেবে	দিনের ভাবে

ভো	উ. ভ.
১২৯	৬০৪/৯৬
পঞ্চজনা আছে ধরে	লক্ষ জনে আছে ঘিরে
কার হবে নিকাষ দেনা	হলে নিকাশ জানা যাবে পাওনাদেনা
তার ১৬ জনা	তোর ফি জনা
সুদাই এসে	বেড়ালাম খুঁজে
ঘোর গেল না	তবু মনের

পঞ্চভূত কীভাবে পঞ্চভূতে মিশে যায় লালনের এ বর্ণনা ভট্টাচার্যে দুর্বোধ্য আকার ধারণ করেছে। এসেছে 'স্তবক' দুদ্দুর গান থেকে।

ভো	উ. ভ.
১২৩	৬০৯/১০৫
এ অংশটি প্রশ্নবোধক	দ্বিতীয় পংক্তি অস্ত্যার্থক
সূজ্জের আমাবস্যে নিন্নয়...নেহাজ করে	অমাবস্যা পূর্ণিমার...নেহার করে।
১৫-য় পুন্নিমা কিসি	সেই পূর্ণিমা হয় কিসি
দেহচন্দ্র	দেহ চন্দর
তোর	তুই

লালন গীতিকায় ১৭৯/২৬৫ পদটি ভো. (৮) ও ভা.স. (১০/২৭) আছে।

লা.গী.	ভা.স.	ভো.
... পেয়ে সোনা	ঐ	আশা ঝুলি লয়ে সেনা (লাঠি)
কে কায়া আইল জিনি	জিন্নি	কে ফায়া আইনিজিনি
চার্জপানা (অর্থহীন শব্দ)	বাহ্যপনা	বাজ্যপনা

মূল আরবী শ্লোকটি অর্থবোধের অক্ষমতায় বিকৃত হয়েছে।

লালনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'আছে ২ আদ মক্কা এই মানব দেহে'। (লা. গী......২৯৫ নং পদ; ভা. স. ৪০ নং পদ; উ. ভ. ৪৩ (পৃ. ৫৭২) নং পদ; ভো....—পাঠান্তর ৯১, ২১০)। অন্যত্র পদটি বিকৃত, তরল; ভো. সঙ্গে তুলনায় কলিগুলি ভিন্ন; গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দগুলি বিকৃত। শেষ পংক্তিটি 'আদু ইমাম সে মেয়ে/আদ এমাম সে মেএ'—এ উক্তিতে 'প্রকৃতি মূল' নারী-প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। ভা. স...তে শব্দটি অবিকৃত। কিন্তু লা. গী. এবং উ. ভ. লিখেছেন—....আদি ইমাম সেই মিঞে;।। ভা. স. পদটিতে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়।

'একী আইন নবী কল্যে জারী' পদটির শব্দ ও পংক্তিগত পার্থক্য ছাড়াও, শেষ পংক্তিটিতে গুরুতর এক ভিন্নতা আছে। এ ভিন্নতার মূলে সম্পাদকদের ধর্মবিশ্বাস ছায়া ফেলেছে, বলে মনে হয়।"

পদটির উপসংহারে পাই (ভো.) :

'সরপোস থুই তুলে ওকি দেই ফেলে নালন বস্তু ভিকারি'—এ সিদ্ধান্ত ইতিবাচক; এখানে সংশয় বা দ্বিধা নেই। সরপোষ বা খাদ্য-ঢাকনি সরিয়ে খাদ্যবস্তু নেয় সকলে; কেউ সরপোষকে ফেলে দেয় না। রম্য বক্রোক্তিতে লালন নবীর চারটি পথের একটি, শরীয়তকে অগ্রাহ্য করতে বলেননি।

ভা. স. পাই : 'ছরপোষ থুই তুলে কি দেই ফেলে লালন ভাবে বস্তু ভিখারী'....এখানে ছন্দোপতন ঘটেছে। এ ভণিতায় শরীয়ত রূপ সরপোষকে নিয়ে কী করবেন, লালনের দ্বিধা প্রকাশিত হয়েছে। লা. গী. স্পষ্টত শরীয়ত-বিদ্বেষে, সরপোষকে ফেলে দিতে বলেছে : 'সরপোষ তুলে দিয়ে ফেলে বস্তু ভিখিরী।" বিভিন্ন লালন গীতির সঙ্কলনের সঙ্গে তুলনা করলে আলোচ্য গানগুলিকে শিল্পরূপ ও অর্থবোধের দিক থেকে অনেক বেশি সঙ্গত বলে মনে হয়। বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে লালনের মূল গানগুলি সম্পাদনার সূত্রে, এবং উৎসের ভিন্নতায় কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—এটি গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু সে অন্য এক প্রসঙ্গ।

তথ্যসূত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রবল জাতীয়তাবাদী আবেগে পৃথিবীর নানাস্থানে লোক সাহিত্য সংগ্রহ করে মুদ্রিত করা শুরু হয়। R. M. Dorson এর মতে এগুলির বড় অংশই সংস্কৃত, বিকৃত। (Folk lore and Fake lore, Harvard University Press, 1976, U. S. A., P. 5)

(১) মনসুরউদ্দীন লালনগীতির কোন অখণ্ড পাণ্ডুলিপি পাননি। লালনের আখড়ার খাতা সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। কালুশাহ, মঙ্গল প্রামাণিক, ফরিদপুরের পাংশা, পাটিকাবাড়ির হায়দার চৌধুরীদের

কাছ থেকে তিনি গান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সব সময় খাতা/মুখ এবং গায়কদের নাম তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে উপেন্দ্রনাথ-উত্থাপিত এবং আঁবদুল হাই-সমর্থিত অভিযোগ হচ্ছে যে "অশিক্ষিত গায়কদের মুখে যা শুনেছেন, হুবহু তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। হারামণির সংগ্রহে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা, বিকৃত উচ্চারণাদি প্রায় নেই; নেই গায়কদের কলিবিভাগ।

হারামণি (৭ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮ মনসুরউদ্দীন সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

ঐ (৫ম খণ্ড), ঐ; ১৯৮৪, আবদুল হাই সম্পাদিত। হাই-এর মতে, 'লালন গীতিকা' সর্বাপেক্ষা 'সুসম্পাদিত গ্রন্থ' (পৃঃ ২৪৪)।

(২) স্বরলিপিতে (১১৪৯ পৃষ্ঠা) কলি শব্দ ব্যবহার করলেও, উপেন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্রপন্থা অনুসরণে' কমা, সেমিকোলনের ব্যবহার, কবিতার পংক্তিসজ্জা ও স্তবক-বন্ধন এবং বিকৃত আঞ্চলিক উচ্চারণ ও বানানকে সংস্কৃত করেছেন গানের ক্ষেত্রে। ক্ষেত্রবিশেষে আঞ্চলিক বানান ও উচ্চারণ রক্ষিত হয়েছে তাঁর সংগৃহীত গানে। গানের মূল রূপটি বজায় রাখার চাইতেও গানগুলিকে সংস্কৃত করে বিদগ্ধজনের উপযোগী করে পরিবেশন করা উপেন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য। গায়ক এবং সম্প্রদায়ের খাতার অশুদ্ধির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা অপরিসীম। আর শুদ্ধ করতে গিয়ে বিপুল ভ্রান্তি ঘটেছে।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, ভূমিকা, ঝ

(৩) লালন গীতিকা, ভূমিকা 110-11

(৪) লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা (১ম খণ্ড)

(৫) ঐ, পৃ. ৯৬, ২২০, ২২৩

(৬) ঐ, পৃ. ৭-১২। পদ নং ৫, ১০, ২১, ২৩০-এ ভাবসঙ্গীতের পাঠকে শুদ্ধ বিবেচনা করা হয়েছে।

জসীমুদ্দীনের (বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩৩) পাঠও তিনি গ্রহণ করেছেন। পৃ. ১২

(৭) ঐ, পৃ. ২৭৬, পদ নং ৩০১

(৮) ঐ, পৃ. ১৩

(৯) ১২৭ নং পদে (৯ পংক্তি) আছে, "কুমীরেতে পরকে যেমন" ভোলাই-এর খাতায়, "কুমরিতে জমন" শব্দটি জলজন্তু 'কুমীর' নয়, 'কুমরি'পোকা।

১৩২ নং পদে (১৩ পংক্তিতে) পাই : শুভ্র রসের উপাসনা—এটি 'শান্তু রস' বা সাম্মু (সম) রস হওয়া উচিত।

১৩৯ নং পদে (৩য় পংক্তি) আছে : খেঁতা শব্দটির উৎস কন্থা>কাঁথা>কেতা

এ সংকলনে সম্পাদিত-ভ্রান্তি অনেক

(১০) বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদেও লালন গীতিকায় গুরুতর ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়।

৭৬ নং পদে (ভোলাই পদ নং ১৫৮) 'কুমরি'কে জলজন্তু 'কুমীর' করা হয়েছে।

পরশমণি রাধার স্পর্শে ব্রজের জলদ কালো কৃষ্ণ 'গৌর হল' (ভোলাই)। কিন্তু লা. গী-তে পাই "পরশ হলো"। অর্থাৎ কুমরি, গৌর>কুমীর, পরশ হবার ফলে পদটিতে গুরুতর অর্থান্তর ঘটে গেল। এরকম বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়।

(১১) লালন গীতিকা (১৪০/২০৮) ; ভাবসঙ্গীত (৭/২০) ; ভোলাই (৬ নং পদ) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পর্ব
বাউল বনাম লালন সাঁই

কথামুখ।।

ভারতবর্ষের বৈদিক ও লৌকিক সন্ন্যাসী-সাধকদের এবং ইসলামের পরিমণ্ডলভুক্ত পীর ফকিরদের বহু সম্প্রদায় ; বিচিত্র বেশ, খাদ্য, উপাসনা এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি। তন্ত্রসম্পৃক্ত এবং লৌকিক উপাসকদের সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলা এবং গুরু-পরম্পরা ভিন্ন ধরনের। অনেক সাধক দীক্ষা, সাধনা এবং ভেক বা খিলাফতের চারজন গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন। এদের মধ্যে কেউ দীক্ষা, কেউ শিক্ষা, কেউ ভেক বা সাধনসঙ্গিনী নারীকে চেতনগুরু হিসাবে উল্লেখ করেন।[১] একাধিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করার ফলে এ সমাজে গুরু-পরম্পরার সাম্প্রদায়িক কাঠামোটি দুর্বল। বহুজনের কাছে শিক্ষা পেয়ে যাকে মন চায়, তার নাম উল্লেখ করার নির্দেশ পাই বাউল জনগণের মধ্যে প্রচলিত এক ছড়ায়।[২] উপরন্তু কবীর, লালন, হাউড়ে, যাদুবিন্দু প্রভৃতি মহতের ঐতিহ্যে সাধুসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। 'সাধুসঙ্গ' গুরুর গুরুত্বকে অনেক খর্ব করে। নদীয়া মুর্শিদাবাদের মুসলমান বাউল জনতার মধ্যে কোরাণসম্পৃক্ত এক তথ্যে জানা যায় যে নবী হজরত মহাম্মদ আল্লার সঙ্গে মে'রাজ মিলনে নব্বুই হাজার জ্ঞানমূলক বাক্য পেয়েছিলেন। তার তিরিশ হাজার সর্বজনের জন্য কোরাণে লিপিবদ্ধ ; তিরিশ হাজার যোগ্য শিষ্যদের জানিয়েছিলেন ; বাকি তিরিশ হাজার তার 'সিনায়' (হৃদয়ে) ছিল। এগুলি নবীর নুরে জাত সাধু-ফকিরদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এ সমাজে গুরু শিষ্যের এক কানে মন্ত্র দেন অন্য কানটি ফাঁকা রাখেন ; মানুষের কাছ থেকে, সাধুসঙ্গ করে ছড়িয়ে থাকা গুপ্তজ্ঞান সংগ্রহ করে শিষ্যবর্গ।[৩] মৌলবাদী অন্ধতা ও অনড় সাম্প্রদায়িকতা এ কারণেই বাউল মতবাদে নেই। জ্ঞানরাজ্যে তাঁর সদা অপূর্ণতা, যে কোন মানুষের কাছ থেকে সে সংগ্রহে, গ্রহণে প্রস্তুত। এসমস্ত ঐতিহ্যের অনুসারীরা "It is less successfully institutionalised. It rests primarily on the oral tradition and , because it attends even more precisely than renunciation to the private whims of the practitioners ; it is the most individualistic.***

One is tempted to say that there are as many asceticisms as there are ascetics."[৪]

বাউল দেহ-সাধনার চারেচন্দ্র ভেদ এবং রস-রতির সাধনা সমাজ-নিন্দিত। বিপরীত রতি, নারীর শ্রেষ্ঠত্ব, পুরুষের নারী-ভাব, নারীভাবিত পুরুষ নারীদেহ থেকে রস গ্রহণ করে নিজ দেহে, প্রভৃতি উল্টা সাধনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত মূল্যবোধ শরীয়তী-বৈদিকদের অসি ও মসী দ্বারা আক্রান্ত হয়। লালনের পূর্বকাল থেকে মুসলমাল বাউলগণ অত্যাচারিত হয়ে আসছেন। আধুনিক কালের সূচনায় পূর্ব বঙ্গে রূপ-কবিরাজের ঐতিহ্যভুক্ত কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের অনুসারী কিশোরী-ভজনার বিপুল সংখ্যক সমর্থক অত্যাচারিত হয়েছেন। এদের 'অপসম্প্রদায়' হিসাবে চিহ্নিত করে নিশ্চিহ্ন করার আবেদন জানান রক্ষণশীল ধর্মনেতারা।[৫] এ সমস্ত সাধক আপন সাধনকথা যথা-তথা বলে না এবং ছদ্ম-পরিচয়ে আত্মগোপন করে থাকে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (ষোড়শ শতক) কুলসাধনা গোপন করার জন্য উচ্চৈস্বরে হরিনাম কীর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন।

কুলসাধকেরা রাজদ্বারে শৈব, জনসমাজে বৈষ্ণব পরিচয় দিতেন।[৬] চার্বাক লোকায়ত নামের মধ্যে নানা উপগোষ্ঠী আশ্রয় নিয়েছিল। সামাজিকদের আক্রমণ এড়ানোর জন্য এরা নানা বিচিত্র বেশ ও পরিচয় ধারণ করে দেশ-দেশান্তরে বিচরণ করত।[৭] তথাকথিত বাউল জনতার মধ্যে নানা বিচিত্র ব্যক্তি ও উপগোষ্ঠীর ভগ্নাংশগুলিকে আবিষ্কার করা যায়। বাউল ধ্বংসের ফৎওয়ায় রেয়াজুদ্দীন যে সমস্ত উপগোষ্ঠীকে বাউল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তাদের তালিকা দিয়েছেন। গৌর ভগবান গ্রন্থে অনুরাগী সাঁই সমধর্মী কিন্তু ঈষদ্ ভিন্ন গোষ্ঠীগুলির পরিচয় দিয়েছেন।[৮] সহজ সাধনাকে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের যে সমস্ত গোষ্ঠী গ্রহণ করেছেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাদের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৯] স্বরূপ দামোদরের কড়চায় কুল ও সহজ সাধনাকে সমার্থক বলা হয়েছে।[১০] লালন ও অন্যান্য পদকর্তাদের রচনায় ফকিরি, দরবেশী, বৈষ্ণব, রসিক শব্দগুলি সহজ সাধনার প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি প্রাচীন পদে নানা ভিন্ন গোষ্ঠীর সহজ সাধনার প্রসঙ্গ পাই :

> হতে নখ মাথে রাখয়ে চুলি। সহজধর্ম পাইব বলি॥
> কণ্ঠিহীন মুখে লম্বিত নুরে। দরবেশ বলিয়া ফুৎকার করে॥
> ভক্ষের নিয়ম নাহিক তার। অন্ন ব্রহ্ম বলি করয়ে আহার॥
> কেহ বা স্ত্রী পুত্র তেজিয়া হয়। চটক দেখিয়া ভুলিয়া রয়॥
> ভোজবাজী কেহ প্রকাশ করে। সহজ ধরম পাবার তরে॥
> ডোর কৌপীন কেহ মুণ্ডিত শিরে। উদাসীন কেহ হইয়া ফিরে॥
> কেহ মাধুকরী মাগিয়া খায় ** মৌলিক হইয়া ভ্রমণ করে।[১১]

সুতরাং নানা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠীর ভগ্নাংশকে লোকায়ত বাউল মতবাদের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। সর্ববঙ্গে বাউল নামে কোন একক সম্প্রদায়, কেন্দ্র বা প্রবর্ত্তক নেই ; অতীতেও ছিল না। বৈদিক-শরীয়তের আচার, শাস্ত্রবিধি; অনুমান-পন্থার বিরোধী হিসাবে এরা 'বর্তমানপন্থী/বস্তুবাদী' হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু বর্তমানপন্থাও বহু বিচিত্র এবং ভিন্নতাযুক্ত।

লালন বনাম বাউল

লালন ছিলেন সাধক, গায়ক, সুরকার, কবি এবং সামাজিক দায়ে বদ্ধ এক বিরল ব্যক্তিত্ব। শতবর্ষ পূর্বে (১৮৯০/অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মতে ১৮৯১) তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল। মহাকালের শিলালিপিতে স্থান পেয়েছে তাঁর রচনাবলী। এখনও জনসমাজে বিপুলভাবে তিনি আদৃত, আলোচিত, এবং জনপ্রিয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তীকালে, এক ছিন্নমস্তা রুধির-রঞ্জিত সময়ের গর্ভে তিনি জন্মেছিলেন। পাননি 'নিদয়া জননী'র স্নেহ। প্রিয়জনেরা তাঁকে ডাকত নালন নামে। নাল অর্থ উর্বরা কৃষিজমি। উর্বর মানবজমিনে সুচেতনার আবাদে ব্যস্ত ছিলেন তিনি শতাধিক বৎসরের আয়ুষ্কালে।

বৈদিক আচার এবং লৌকিক অনাচারের বিরুদ্ধে লালনের দ্বিমুখী সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়েছিল সেকালের বহু শিষ্ট ভূস্বামী, ঐতিহাসিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবী লেখক এবং গ্রাম্য জনতা। নানা

জাতপাতের রক্তসম্পর্কহীন মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল কয়েক সহস্র সদস্যের লালন পরিবার। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড লালনের নানা সামাজিক আন্দোলনের নীরব সাক্ষী। দেশের মৃত্তিকালগ্ন লৌকিক অসাম্প্রদায়িক যুক্তিঋদ্ধ ঐতিহ্যের পতাকা-বাহক লালন আর্থ-সামাজিক ভেদ মুছে ফেলে সর্বমানবের জন্য এক আসন রচনা করেছিলেন। ভেদবুদ্ধির এবং আচারের কণ্টকাকীর্ণ বেড়াগুলি ভেঙে তিনি নির্মাণ করেছিলেন এক বিশাল প্রান্তর। সিসেরো প্রমুখ গ্রীক মনীষীদের মতো লালনও সুসংস্কৃত নর-নারীকে মানুষ বলেছেন। প্রকৃতি, পরিবেশ অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে হবে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ অস্তিত্ব। ইহ, দেহ এবং আত্মচেতনাপূর্ণ মানুষ ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। অসাধারণ শিল্পী লালনের রচনায় বাংলায় চিরায়ত গণশিল্পরীতির নানা ছিন্ন খণ্ড সঙ্গত সুষমায় ধ্রুবনক্ষত্রের সমগ্রতা লাভ করেছে।

বাংলাদেশের বহু গবেষক লালনপন্থীদের থেকে লালনকে পৃথক করে, তাঁকে বাউল না বলে সুফী বলার পক্ষপাতী।[১২] কিন্তু বঙ্গের রক্ষণশীল সুফী-পীর-ঐতিহ্য লালনকে গ্রহণ করেনি। লালনপন্থীরা বা লালন নিজে সুফী হিসাবে আত্মপরিচয় দেননি। অজ্ঞাতকুলের সিরাজ তাঁর গুরু ; তিনি এক লৌকিক সাধক ছিলেন। এ সূত্রে লালনপন্থীরা লোক-বৃত্তের অন্তর্গত। শত্রু, মিত্রদের প্রদত্ত বিশেষণ এবং আত্মপরিচয়ের সূত্রে বরং বাউল শব্দের সঙ্গে এদের বিশেষ সম্পর্ক।

বাউল শব্দের অর্থ অনির্দিষ্ট এবং বহু। লোকসমাজ, উচ্চবর্গ, শিল্পী এবং গবেষকবৃন্দ বাউল শব্দের নানা তাৎপর্য গ্রহণ করে থাকেন। সাধকেরা একে নানা অর্থে গ্রহণ করেন।[১৩] চর্যাপদের সমকাল থেকে আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে বাউল বা তার সমার্থক শব্দ এবং সাধনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায়। বিশিষ্ট দেহসাধক হিসাবে চর্যাপদে এবং নাথ সাহিত্যে বাউল/বাউল শব্দের ব্যবহার আছে। বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে বাউল মতবাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-মতবাদের সমালোচক হিসাবে দেহবাদী আত্ম-সাধনপন্থীদের উল্লেখ করেছেন।[১৪] কামকলা-বিশেষজ্ঞ, কাপালিকের পরিবর্ত শব্দ, দশ ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকারী সাধক, প্রচলিত ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের প্রতিবাদী, কপট সাধক প্রভৃতি নানা অর্থে চৈতন্য চরিতামৃতে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ড. সুকুমার সেন যোগী ভিখারী বা বাউলের পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পেয়েছেন।[১৫] এ গ্রন্থে রক্ষণশীলগণ মর্কট সন্ন্যাসী, উন্মাদ, অবোধ, মূর্খ প্রভৃতি নিন্দাবাচক অর্থে বাউল শব্দ ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে দশ ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকারী ; নৃত্য-গীতরত সানুচর চৈতন্য ; অবধূত নিত্যানন্দ, যবন হরিদাসের পৃষ্ঠপোষক অদ্বৈত, চৈতন্যপন্থী বাসুদেব ও সনাতন—যাঁরা পণ্ডিতের অবোধ্য অর্থে শাস্ত্রব্যাখ্যা গ্রহণ করেন, আচার লঙ্ঘন করেন তাঁরা সবাই বাউল বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে রক্ষণশীলদের অবজ্ঞা এবং সাধকদের প্রথাবিরোধী আত্মপরিচয় যুগ্মভাবে বাউল শব্দে রক্ষিত হয়েছে। চর্যাপদ, নাথ সাহিত্যেও প্রতিবাদী প্রথাবিরোধী এক জীবনচর্যার সঙ্গে বাউল শব্দের যোগ। প্রথাবিরোধিতার নেতিবাচক দিকে আছে জাত, ধর্ম, পুরোহিত, শাস্ত্র, আচার, সমাজশৃঙ্খলের বন্ধন অগ্রাহ্য করা। আর ইতিবাচক দিকে লৌকিক রস-রতির নারীকেন্দ্রিক এক দেহ-সাধনার সঙ্গে বাউল শব্দের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। স্বাধীন ব্যক্তিদের এ সমবায়ে অজস্র বৈচিত্র্য মূল ভিত্তিকে অস্বীকার না করেও গড়ে উঠেছে। আচারের শৃঙ্খলে বৈচিত্র্য এখানে নিশ্চিহ্ন হয়নি ; সম্প্রদায় গড়ে উঠেনি।

অক্ষয়কুমার দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বাউলদের একটি সম্প্রদায়

হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক কালের সূচনায় হাণ্টার এবং রিজলে বৈষ্ণব উপসম্প্রদায় হিসাবে বাউলদের চিহ্নিত করেছেন।[১৬] উপেন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে 'বাউল' বলতে হিন্দু সমাজভুক্ত সাধক বা গায়কদের এবং 'ফকির' বলতে মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক-গায়কদের চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্র-উত্তরকালে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় এই 'হিন্দু বাউল' এবং 'মুসলমান ফকিরগণ' স্বতন্ত্র দুই তাঁবুতে স্থান পায়। লালন, হাউড়ে, কুবীর, শরতের গান করে মুসলমান সমাজভুক্ত গায়ক ফকিরী গানের জন্য অভিজ্ঞানপত্র পায় ; আর এ গানগুলি কোন হিন্দু সমাজভুক্ত গায়ক করলে হয়ে যায় 'বাউল' গান। স্বতন্ত্র তাদের অভিজ্ঞানপত্র। বাউল-বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত দধিয়া, অগ্রদ্বীপ, ঘোষপাড়া প্রভৃতি মেলায় এ ধরনের কোন বিভাগ গড়ে ওঠেনি। একথা সত্য যে পূর্ববঙ্গে মুর্শিদী বা মুর্শিদা গানের অংশবিশেষ ইসলামী তত্ত্বসম্মত পীর-মহিমা কীর্তন। অন্যত্র রক্ষণশীল পীরপন্থীদের মধ্যে ফকির এবং ফকিরী গান শব্দটি চলিত। চব্বিশ পরগণায় 'মুস্কিল আসান' প্রভৃতি গান ফকিরী গান নামে খ্যাত। বীরভূমের অংশবিশেষে অবাঙালী পীরপন্থী মুসলমান সমাজভুক্তে অনেকে ফকির বলে পরিচয় দেন। কিন্তু রামপ্রসাদ, লালন, নীলকণ্ঠ, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার প্রভৃতি বহু সাধক 'ফকির' হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। তুর্কী ভাষা থেকে আগত এ শব্দ নিঃস্ব মানুষ অর্থে হিন্দু সমাজেও গৃহীত হয়েছে। এটি কোন সম্প্রদায়বাচক শব্দ নয়। রূপরামের ধর্ম ফকির বেশী ; কবি নিজেকেও ফকির বলেছেন।[১৭]

অত্যন্ত সঠিকভাবেই ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল, গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক-গায়ক-পদকর্তাদের বাউল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্প্রদায়ের সীমানা অগ্রাহ্যকারী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করেছেন বাউলদের। লালন প্রমুখের গানকে তিনি বাউল গান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উইলসন, অক্ষয়কুমার, জে. এন. ভট্টাচার্য লৌকিক উপাসকগোষ্ঠী হিসাবে তুলে ধরেছেন বাউলদের। শশিভূষণ দাশগুপ্ত এক বিশিষ্ট সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন বাউলকে। রামকৃষ্ণ লোকায়ত সাধনার এক বিশিষ্ট স্তরকে বলেছেন বাউল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এদের যুক্ত করেছেন চারচন্দ্রভেদের সঙ্গে । চারণকবি মুকুন্দদাস গৃহস্থ নিষ্কাম কর্মযোগী, দেশপ্রাণ কর্মী হিসাবে আদর্শায়িত করেছেন বাউলকে। অনেকের কাছে বাউল এক সাঙ্গীতিক গোষ্ঠী মাত্র। ক্ষেত্র সমীক্ষায় হিন্দু এবং মুসলমান দু'সমাজেই বাউলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যে-গানগুলি বাউল গান হিসাবে গায়ক এবং শ্রোতাগণ সনাক্ত করে তার মধ্যে শৈব ফটিক গোঁসাই, সাহেবধনী কুবীর, যাদুবিন্দু ; সহজ বৈষ্ণবসাধক গোপাল, তন্ত্রানুসারী হরিনাথ, হাউড়ে ; বেশরা সুফী পাঞ্জু, বুদ্ধু শাহ ; লৌকিক সাধক লালন ও তার অনুসারীগণ রয়েছেন। হিন্দু বা মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক বা গায়কেরা এদের মহাজন হিসাবে মান্য করেন। এই মহাজনগণ হিন্দু বা ইসলামের সীমানা ডিঙিয়েছেন ; শাস্ত্রের বেড়া ভেঙেছেন ; উঁচু জাত বিসর্জন দিয়ে নিম্নবর্গের পাতা আসন গ্রহণ করেছেন। যাঁরা শাস্ত্র, আচার এবং সম্প্রদায়ের ও জাতিভেদের সীমানা রক্ষা করেন ; তাঁরা বাউল শব্দটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। যেমন পাটুলি স্রোতের সাধকেরা রস-রতির (একচন্দ্রের/রজেঃর) সাধনা করেও সমাজ ও জাতির বেড়া রক্ষা করেন এবং বাউলদের নিন্দা করেন। বাংলাদেশের মনসুর-রশিদের গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতার সমালোচক, আংশিক চন্দ্রসাধনা করেন কিন্তু তাদের গান ও আলোচনা ইসলামী বৃত্তেই আবর্তিত হয়। তারা গুরুবর্জোক দিয়ে ও জিকির করে বস্তুরক্ষা করতে চান। কিন্তু কোরাণাদিব

তত্ত্ব ব্যাখ্যা থেকে বহির্গত হন না। অন্যপক্ষে লালন, পাঞ্জু, দুদ্দু ইসলামী ও হিন্দু বৃত্ত থেকে যথেচ্ছ তত্ত্ব, রূপক, প্রতীক গ্রহণ করেছেন এবং গান ও সাধনাকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডিমুক্ত করেছেন। সুতরাং দু'বঙ্গে মনসুর-রশিদের সমর্থকগণ বাউল শব্দে আত্মপরিচয় দিতে প্রবল আপত্তি জানায়।[১৮] দুদ্দু, পাঞ্জু, বুদ্ধু, বেহাল জালাল প্রমুখ পদকর্তা হিন্দু সংস্কৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। অন্যপক্ষে গোঁসাই গোপাল, শবৎ, বিজয় সরকার কোরাণ ও সুফীতত্ত্বকে অনায়াস দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন পদে। হজরত মহাম্মদকে নিয়ে অতি সুন্দর এক পদের রচয়িতা প্রফুল্ল সরকার।[১৯] এ প্রতীকের গূঢ় অর্থে যে-সাধনা আভাসিত, তা কোরাণ, পুরাণ সমর্থিত নয় ; অশাস্ত্রীয়, লৌকিক। এই জনসমষ্টি, সাধনা, গান সাধারণ্যে বাউল বলে চিহ্নিত হয়। ফকির, বাউল, দরবেশ, সাঁই, আউল প্রভৃতি লৌকিক সম্প্রদায়গুলিতে হিন্দু এবং মুসলমান দুই সমাজভুক্ত লোকেদেরই খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য বা মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্যের বহু উদাহরণ আছে এই সমস্ত গোষ্ঠীতে। বাউল ধর্ম নয়, এক মতবাদ ও জীবনযাপন প্রণালী। জন্মসূত্রে কেউ বাউল হয় না। পিতার সূত্রে পুত্র, স্ত্রী স্বামীর সূত্রে বাউল মতবাদী হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন জাত/ ধর্মের নরনারী গুরুর কাছ থেকে এটি গ্রহণ করে। ধর্মীয়বৃত্ত লঙ্ঘন করেন গুরুবর্গ শিষ্য করার ক্ষেত্রে। সমাজের নানা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্তর থেকে আগত ব্যক্তিরা গুরুকে কেন্দ্র করে এক অসাম্প্রদায়িক অস্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলেন। শিষ্য ক্রমে গুরু হয়। পূর্বমতে যুক্ত হয় ব্যক্তির সংস্কার। এভাবে সঞ্চালিত হয় বাউল মতবাদ। যে কোন ধর্ম, জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষের বাউল মতবাদ গ্রহণের অধিকার আছে। নদীয়ায় বুনো (ওঁরাও)-দেব অনেকে এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। চাপড়ায় থাকেন এ গোষ্ঠীর বাউল-মতের গুরু গোপাল এবং গায়িকা সুমিত্রা দাস। উপেন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন এব' আরো অনেকে বঙ্গে একটি বাউল সম্প্রদায় কল্পনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবত বঙ্গে বাউল নামে এক ও অভিন্ন কোন কেন্দ্র, আচার, কর্তৃত্ব দ্বারা আবদ্ধ সম্প্রদায় নেই। ফকিরমাত্রেই নয় মুসলমান ; বাউল নয় হিন্দু। মুসলমান সমাজের লৌকিক সাধকদের বিরুদ্ধে বাউল ধ্বংসের ফতোয়া জারি হয়েছিল। সেখানে নানা বিভিন্ন নামে পরিচিত সাধকদের বাউল হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান-প্রধান বহু গ্রামে 'বাউল পাড়া' আছে।[২০] শাস্ত্রবিরোধী প্রতিবাদী নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কালক্রমে বাউল অভিধার অন্তর্গত হয়েছে। এরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজসংলগ্ন ; অথচ শাস্ত্রীয় আচার ও সাম্প্রদায়িক বৃত্তের বহির্মুখী প্রবণতায় প্রতিবাদী। লৌকিক জগতে সর্বদা এক মিলন মিশ্রণ ঘটে চলেছে। কুল বা গুরু-ঐতিহ্যের শুদ্ধতা রক্ষার দায় এরা বহন করেন না। লৌকিক সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাধুসঙ্গ করা। যার কাছে কিছু শেখা যায় তিনিই গুরু। গুরু পরিবর্তন বা গুরুর মৃত্যুতে নূতন গুরু গ্রহণ লৌকিক জগতে হামেশাই ঘটে। বহু গুরু বা মতবাদ গ্রহণ করেন অনেকে। শাস্ত্রীয় গুরু বা পীরবাদে এগুলি নিন্দার্হ। একে অগ্রাহ্য করে বাউল সমাজ এক ছড়া ব্যবহার করে :

গুরু কর শত শত মন্ত্র কর সার।
যে ঘোচাবে মনের কালি দোহাই দাও তাঁর॥

রামকৃষ্ণদেবের জীবনে এই বহুমতের সংশ্লেষ ঘটেছিল। বর্ধমান জেলার কল্যাণপুরে শতাব্দীর সমবয়সী অমৃতগিরি বরফানী নাগা বাবাজী থাকেন। চোখে কাজল, পায়ে আলতা, কপালে সিন্দুর ; কোমরে রজঃনিষিক্ত ন্যাকড়া, হস্তে নরাস্থির শাখা। উনি বৈষ্ণব, শাক্ত তান্ত্রিক, শৈবগিরি

এবং নাগা দীক্ষা নিয়ে তাদের সঙ্গ করেছেন কিন্তু মূলত তিনি রসধর্ম পালন করেন। এক সময় বাউল গানে তাঁর খ্যাতি ছিল। সম্প্রদায়ের বাইরে স্বাধীন জীবন তাঁর।

গবেষণার সূত্রে আমরা এধরনের স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সম্প্রদায়ভুক্ত করে সাধারণীকরণ করে তৃপ্তি পাই। সুধীর চক্রবর্তী সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। চরণপালের বংশকে গুরুকর্তৃত্ব, অগ্রদ্বীপকে কেন্দ্র এবং ঘোমটা প্রতীকের সূত্রে তিনি সাহেবধনীদের এক সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পালদের শিষ্যাদি মূলত হিন্দু সমাজে। কিন্তু এদের বৃত্তের বাইরে মুসলমান সমাজে বহু সাহেবধনী শিষ্য ও গুরুর অস্তিত্ব আছে। তারা ঘোমটা প্রতীক বা লাল কাপড়ে আচ্ছাদিত ভূমিতে ত্রিশূলাকৃতি লৌহদণ্ডের প্রতীক ব্যবহার করে না। অগ্রদ্বীপ চৈতন্য-অনুচর কীর্তনীয়া গোবিন্দ ঘোষের সমাধিস্থান। অপুত্রক গোবিন্দের শ্রাদ্ধ করেছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ।[২১] তারই অনুকরণ হয় প্রতি বছর। এ মেলায় বাউল গান ও কীর্তন হয়। কেবলমাত্র সাহেবধনীরা এখানে আসেন না। এটি নয় তাদের কেন্দ্র। পালদের অনেকে এখানে আসেন ; প্রাণামী পান। কিন্তু তারা মেলার নিয়ন্ত্রক নন। বহু সাহেবধনী ভক্ত, অন্য সমধর্মী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষকে অন্নভোগ দেন। ঘোমটা দেয়া পালেদের প্রতীক কেউ অনুসরণ করেন না। লাল কাপড়ে আচ্ছাদিত ভূমিতে লৌহদণ্ডের প্রোথিত প্রতীক অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র কুবীর, যাদুবিন্দুর গান করেন, এমন সাম্প্রদায়িক কোন গায়কের সন্ধান আমরা পাইনি। সাধারণ বাউলের গায়কেরা অন্য 'মহতের' পদের সঙ্গে কুবীর গোঁসাই, যাদুবিন্দুর পদ গান করেন ; এবং বাউল সমাজের এরাও মান্য মহাজন। বাউল সাধনপ্রসঙ্গের সুরে বাঁধা কুবীর, যাদুবিন্দুর গান। অনিবার্য কারণে সাহেবধনীদের একাংশ মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান বাউলদের সঙ্গে অভিন্ন। নদীয়ার বড় নলদহে থাকেন সাহেবধনী গুরুতালিকার এক মুসলমান গুরুবংশ। বর্তমান গুরু লালন শাহ। এদের শিষ্য আছে হরিহরপাড়া থানার চোয়ার পাঠান পাড়ায়। লালনের পিতা জানকী, মা এবং পিতামহ নবীন সাধক-গায়ক ছিলেন। পাঠানপাড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের মুসলমান বাউলদের সঙ্গে এরা অভিন্ন এবং গানের পাল্লাও করতেন একত্রে। বস্তুরক্ষা, চারচন্দ্রের ব্যবহার, নারীকেন্দ্রিকতা বিষয়ে লালনের সাধনার সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মুসলমান বাউলদের মূলগত কোন ভিন্নতা নেই।[২২] হিন্দু বা মুসলমান সমাজের নানা উপগোষ্ঠীকে বাউল অভিধার মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। শাস্ত্রবিরোধী সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ এই গোষ্ঠীগুলি। এদের মতবাদে শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিরোধের এক অনবদ্য দলিল পাওয়া যায়। বেদ, ঈশ্বর, ব্রাহ্মণকে অমান্যকারী বহু গোষ্ঠী হিন্দু সমাজে ছিল। নির্দিষ্ট গ্রন্থ, ব্যক্তি বা দেবতাকে মান্য না করেও হিন্দু থাকা যায়। হিন্দু সমাজভুক্ত বাউল নিজেকে সর্বদা বেদবিরোধী 'অবৈদিক' ঘোষণা করে। কিন্তু ইসলামে কোরাণ এবং নবী মহাম্মদকে না মানলে সে মুসলমান থাকে না। ইসলামের উপগোষ্ঠীগুলি নবীকে মেনে, কোরাণের ভিন্ন ব্যাখ্যায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। বৈদিক ঐতিহ্যে বহু শাস্ত্র, আচার, দেবতা, কর্তৃত্বের সমবায় ; ইসলামী ঐতিহ্যে এক ভেঙে বহু -সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মুসলমান বাউল বেদবিরোধী হয়েও নবী ও কোরাণকে অস্বীকার করেনি। মৌখিক এক অলিখিত ব্যাখ্যায় তারা কোরাণ ও নবীকে গ্রহণ করেছেন। এ সূত্রে সুফী ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। হিন্দু বা মুসলমান সমাজে নানা গোষ্ঠীর গায়ক, সাধক, বেশধারী ভিক্ষুক, নেশাখোর আউল, বাউল, ফকির হিসাবে চিহ্নিত হয়। বাউল শব্দের উৎসে আরবী, ফারসী, বৌদ্ধ, শৈব তান্ত্রিক এবং

লোকায়ত সাধনার অস্তিত্ব বর্তমান। গ্রন্থ, ব্যক্তি, সাধনপন্থা, বেশ প্রভৃতি নানা অর্থবাচক বাউল শব্দটি। বাউলবিরোধী প্রচারপুস্তিকাগুলিতে নানা উপগোষ্ঠীর ভগ্নাংশকে বাউল নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। লোকে শব্দগান, (কবীরের প্রভাব), ধুয়া (দোহা), ভাব, মারফতী, দেহতত্ত্ব, ফকিরী, বাউল প্রভৃতি নানা আঞ্চলিক নামে বাউল গান আস্বাদন করেন। দেহকেন্দ্রিক এক বিশিষ্ট তত্ত্ব এর বিষয়বস্তু। পদাবলী কীর্তন বা নবীনামায় দেবতা বা অবতারের গুণকীর্তন। রূপকে মোড়া কিঞ্চিৎ সাধন প্রসঙ্গ থাকে এখানে। বাউলগানে দেহকেন্দ্রিক এক সাধনা ও জীবনবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রচারিত হয়। ইহ এহং দেহ এর বিষয়বস্তু। প্রচলিত বাংলা গান থেকে এসমস্ত গানের রূপ ও রীতি অতিশয় স্বতন্ত্র। এদের গোপন সাধনা গানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এ গানে একতারা, খমক, প্রেমজুরী, খঞ্জনি, নূপুর, দোতারা, সারিন্দা, গুবা, বায়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। বায়া-এক তারা/গুবা বাউলদেরই বাদ্যযন্ত্র। এ গান নৃত্য, কথকতা সহযোগে পরিবেশিত হয়। গায়কদের সাজসজ্জা বিশিষ্ট, নৃত্যভঙ্গী বিশিষ্ট, স্বরক্ষেপণ ও গীতিরীতি বিশিষ্ট।

প্রসাদী, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, ঢপ কীর্তন, ভাসান প্রভৃতি লোকগীতির ঢং ব্যবহার করেন বাউল গায়ক। কিন্তু নৃত্যের তালে, আবেগের উৎসারণে, লয়-পরিবর্তনে বাউল গান স্বতন্ত্র শিল্প হয়ে ওঠে। বাউল মহাজনদের গৌর বা কৃষ্ণপদ কীর্তনের সুরে গীত হয় না ; নিজস্ব ঢঙে এ গান গীত হয়। মাইজ ভাণ্ডারী, লালনশাহী, এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়ার বাউলদের সাজসজ্জা, বাদ্য ব্যবহার এবং গীতরীতিতে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের উৎস কোন প্রাচীন আঞ্চলিক ঘরানা এবং প্রতিভাবান লোকসমাজের সুরকার। সাধকেরা মহাজনদের বাক্যকে সত্যের মর্যাদা দেন। তাই কীর্তন ও বাউল গানে মহাজনদের পদ পরিবর্তন করা বা ভুল গাওয়া দূষণীয়। সাধুসভায় এ জন্য গায়ক তিরস্কৃত হয়।

কিন্তু বাউল গায়কের সুরের স্বাধীনতা আছে। মূল ঠাটটি অবিকৃত রেখে যে কোন আঞ্চলিক, মার্গ বা সিনেমা সঙ্গীতের সুরের অংশবিশেষ তিনি গানে ঢুকিয়ে দেন। ভাটিয়ালি, প্রসাদী বা কীর্তন ও ঝুমুরের বিভিন্ন অঙ্গ বাউল গানে যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক গায়ক বা সুরকারের থাকে অনেক ক'টি ঢং। নতুন গান এই ছকগুলিতে ফেলে তোলা হয়। বাউল গানের নির্দিষ্ট কোন স্বরলিপি নেই। একই গান অঞ্চলভেদে সুরের ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। গানে প্রচলিত সুরের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাকে শ্রুতিসুখকর করা হলে সাধুসমাজ সাদরে তা গ্রহণ করেন। সুরের এ স্বাধীনতার জন্যই গায়ক নিজের অনুভব ও আবেগকে এ গানে উজাড় করে দিতে পারেন। সুরের ক্ষেত্রে বাউল গান বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীত। একদা বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনদের পদাবলী গায়ক যথাইচ্ছা গান করতে পারতেন। গানের সময় অঙ্গভঙ্গী, নাচে চোখ ও মুখের অভিব্যক্তির সমবায়ে গায়ক ভাবকে প্রকাশ করতে চান। কথার অতিরিক্ত এক নীরবতার ভাষা এতে অভিব্যক্ত হয়। সব মিলিয়ে বাউল গান শুধু শ্রাব্য নয়; দৃশ্যও বটে। বেড়ানৃত্য এবং অন্য কয়েকটি নাচের ঢং বাউল ব্যবহার করে। এ ঐতিহ্য সানুচর-চৈতন্যদেবের;তুর্কী নাচনদার দরবেশদের। সব মিলিয়ে বাউল গানকে অন্য গান থেকে পৃথকভাবে সনাক্ত করা যায়।

ক্ষিতিমোহন, উপেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ প্রমুখ এক বিশিষ্ট সাধনপন্থার সঙ্গে বাউলদের যুক্ত করেছেন। রস, সহজ বা চারচন্দ্রের সাধনার সঙ্গে যুক্ত সকলে বাউল বলে পরিচয় দেয় না।

হিন্দু সমাজভুক্ত এসমস্ত সাধকের বড় অংশটি কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব। বিশ্ববন্ধু, জগদ্‌বন্ধু, রাজক্ষ্যাপা প্রভৃতি কণ্ঠিহীন গুরুদের অনুসারীগণ কালক্রমে কণ্ঠি নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে মিশে গেছে।[২৩] সঙ্গত কারণেই বাউল সাধনা, গান বা সংস্কৃতির পৃথক অস্তিত্ব অনেকে খুঁজে পান না।[২৪] মুসলমান সমাজে বাউলকে সনাক্ত করা তুলনায় সহজ। বৈষ্ণবদের একাংশ বাউল; তান্ত্রিক জাত-বৈষ্ণবদের অনেকে বাউল বলে পরিচয় দেয়।[২৫]

সামাজিক গণের বাউল ধারণাটি বিচিত্র। একজন উচ্চপদস্থ আই.পি.এস অফিসার আমার পরিচিত একাধিক বাউলগুরুকে ৫০ টাকার নোট দিয়ে প্রণাম করে তাদের আর্শীবাদ প্রার্থনা করেন। এদের অলৌকিক ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাস করেন। আমার এক অধ্যাপক বন্ধু এদের যথার্থ সাধক এবং নির্বেদ স্তরের প্রতিনিধি মনে করেন। অন্য আর এক অধ্যাপক বন্ধু এদের গ্রাম্য দার্শনিক মনে করেন। অনেক বিদগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির মতে এরা শক্তিশালী এক সাঙ্গীতিক গোষ্ঠী। আমাদের এক তরুণ চিত্রকর গোষ্ঠীর মতে এরা প্রতিবাদী শিল্পী। প্রখ্যাত এক কবি মনে করেন যে, এরা অপূর্ব এক সংস্কৃতি অর্জন করে। তিনি এমন একজন বৈষ্ণবীর সঙ্গে আলাপ করতে চান। গ্রামীণ মুসলমান সমাজভুক্ত একজন শিক্ষকের মতে এরা গাঁজাখোর ও লম্পট। শিক্ষিত এক মৌলবী স্বীকার করেন যে এদের কেউ কেউ বস্তুরক্ষা করে; কিন্তু বহুগামী। একজন রক্ষণশীল গ্রাম্য কৃষকের মতে এরা হায়েজ, গু-মুত খেয়ে পশুর মতো আচার আচরণ করে। কলেজে পাঠরতা বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তা জনৈক ছাত্রীর দৃষ্টিতে এরা 'ভণ্ডা'। গ্রামের এক শিক্ষিতা মহিলা মনে করেন যে এরা দেহে যৌবন ধরে রাখার এবং সন্তান না হবার গুপ্তবিদ্যা জানে। এরা ভালো চিকিৎসকও বটে। বৈষ্ণব এক সাধকের মতে এরা কামকলা ও বস্তুরক্ষার দেহসাধক; কৃষ্ণভক্ত নয়। কর্তাভজা এক সাধক মনে করে যে এরা নিজেরা কৃষ্ণ সাজে। সমাজবিজ্ঞানের জনৈক গবেষক এদের সংহতি ও মিলনের চারণ মনে করেন। নৃতত্ত্বের জনৈক গবেষকের দৃষ্টিতে এদের মৌলিক চিন্তা, যুক্তি ও বাক্‌ভঙ্গী অসাধারণ।

বাংলার অঞ্চলভেদে বাউল শব্দের নানা তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য। শান্তিনিকেতন-কেন্দ্রিক বীরভূমে ভদ্রলোক এবং বিদেশীদের কাছে বাউল খুব আকর্ষণীয় ও সম্মানীয় বলে বিবেচিত হয়।[২৬] তাই এ অঞ্চলে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ, অধ্যাপক, শিক্ষক বহুব্যক্তি বাউল বলে পরিচয় দিয়ে বিদেশী এবং ভদ্রলোকদের চোখে পড়তে চায়। এখানে বাউল হিন্দু এবং বিশিষ্ট সাজে সজ্জিত। মুসলমান গায়কেরা এখানে ফকির। গোলাম শা ও সম্প্রদায় বা অন্য কোন মুসলমান গায়ক বিদেশী বা ভদ্রবাবুদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা বা বিদেশ যাবার সুযোগ পায় না। আর এ অঞ্চলের জাত-বৈষ্ণব গায়কদের ধারণা যে তারাই যথার্থ বাউল। অন্যেরা অন্যায়ভাবে বাউল সাজছে।[২৭] এ অঞ্চলে ফকির মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক, ভিক্ষুক, গায়ক। আর বাউল হচ্ছে হিন্দু বেশধারী গায়ক। অনেকের গুরু নেই [গানের গুরু আছে], অনেকে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ী নন। দরবেশ, সাঁই, বনচারী, কালাচাঁদী, নানা বৈষ্ণব ও শৈব উপ-সম্প্রদায়ের পরিচয়ে পরিচিত গায়কেরা এ অঞ্চলে বাউল বলে বিবেচিত হয়। গান করেন না, এমন কোন সাধক বাউল হিসাবে স্বীকৃত হয় না ভাগীরথী অজয়-অববাহিকায়। ভাগীরথী-পদ্মার মধ্যবর্তী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় হিন্দু শরীয়তী সাধারণ আচার যারা মানেননা— সেরেকী, বেদাতী,বেদীন, মুণাফেক, পাওরা (জারজ), হের্মে (হারামী), নাস্তিক প্রভৃতির সমার্থক

শব্দ হিসাবে তাদের অনেকে বাউল বলে চিহ্নিত করেন।[২৮] হিন্দু ও মুসলমান বাউলদের উপর ধর্মীয় আচার না-মানার জন্য এ অঞ্চলে প্রভূত সামাজিক অত্যাচার হয়। প্রকাশ্যে বাউল বলে পরিচয় দিতে অনেকে ভয় পায়। এখানে হিন্দুগুরুর মুসলমান শিষ্য, বা তদ্‌বিপরীত দৃষ্টান্ত বহু। রক্ষণশীলেরা বাউল শব্দে ঘৃণ্য মানুষ বোঝায়। সাধকেরা বাউল বলে কৃষ্ণ, শিব, চৈতন্য, নবী মহম্মদকে এবং নিজেরা, 'বাউল হতে পারিনি' বলে দীনতা প্রকাশ করে। এ অঞ্চলে বাউল এক মতবাদ—হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে তার অস্তিত্ব স্বীকৃত।

নদীয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাউলের অবস্থান মুসলমান সমাজে। সমধর্মী সহজ রসিক সাধকেরা কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব বলে হিন্দু সমাজে থাকে। বৈষ্ণব নয়, রক্তবস্ত্রের বা কণ্ঠিহীন সাধককে, গায়ককে অনেকে বাউল বলে। রুদ্রাক্ষ এবং তুলসীমূলের হীরা (সাঁইদের বৈশিষ্ট্য) ব্যবহারকারী রাজক্ষ্যাপার শিষ্যদের খাতায় নিজেদের 'গোস্বামী মত'-ভুক্ত না করে 'বাউল মত' ভুক্ত করা হয়েছে। বৈষ্ণব সাধকদের একাংশ নিজেদের 'বাতুল বৈষ্ণব' বলে চিহ্নিত করেন। রায় রামানন্দ, সিদ্ধ মুকুন্দদেব, নিত্যানন্দ থেকে এদের গুরু-তালিকার সূচনা। এ সমস্ত এলাকায় বাউল শব্দটি হীনার্থবাচক। পক্ষান্তরে নদীয়ার অনেক মুসলমান সাধক নিজেকে গর্বভরে বাউল হিসাবে উল্লেখ করেন।[২৯]

একদা আমরা, নদীয়া মুর্শিদাবাদে ধর্মাচার ও মালা-তিলক, মূর্তিপূজা-অগ্রাহ্যকারী সাধকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম। ডোমকল থানার (মুর্শিদাবাদ) ভাতশালা গ্রামের কতিপয় বৈষ্ণব এমন একজন সাধকের সন্ধান দেন চক ইসলামপুরে এবং তাকে তাঁরা বাউল বলে উল্লেখ করেন। আমরা তার কাছে যাই। সাধকের নাম ধনঞ্জয় সরকার। মুসলমান শিষ্য আছে তার। বৈষ্ণব, পীর, কর্তাভজা ধারায় শিক্ষাদীক্ষা আছে তার। শিষ্যদের হাতে নিরামিষ খান। অন্যদের হাতে খান না। কিন্তু তিনি নিজেকে বৈষ্ণব মনে করেন।

অধিকতর রক্ষণশীল সাধকেরা তুলনায় কম আচার মানেন, এমন সাধকদের বেশরা/অবৈদিক/ অনাচারী অথবা বাউল-ফকির বলে উল্লেখ করে থাকেন। যেমন শরীয়তের পীরপন্থী ফুরফুরা শরীফের বা অন্য গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে মনসুর-রশিদের বা বর্ধমানের খাঁ পুকুরের বুদ্ধু শা-এর অনুগামীরা বাউল। কিন্তু আলোচ্য গোষ্ঠীদ্বয়ের সাধারণ অনুগামীরা নিজেদের সুফী, আউলিয়া মনে করে এবং শরীয়তের সঙ্গে ছিন্নসূত্র সাধকদের বাউল বলে উল্লেখ করে। রক্ষণশীল বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে মৎস্যাহারী, গুরুপূজক পাটুলি স্রোত এবং অন্য বহু উপ-সম্প্রদায় বাউল বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু পাটুলি স্রোতের অনুগামীরা রূপ কবিরাজের অনুগামীদের বাউল মনে করে; নিজেদের গোস্বামী মতানুসারী বলে পরিচয় দেয়। সুতরাং ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলের প্রতিবাদী এবং আচার-বিরোধিতার সঙ্গে বাউল শব্দ-ব্যবহারের গভীর যোগ আছে রাঢ়ের জাত-বৈষ্ণবদের কেউ কেউ যখন নিজেদের খাঁটি বাউল বলেন বা জনগণ এদের বাউল হিসাবে চিহ্নিত করেন; তখন বেদ-ব্রাহ্মণ-শালগ্রাম-পুরোহিত এবং জাত-অগ্রাহ্যকারী গোষ্ঠীর এক প্রতিবাদী চরিত্র বাউল শব্দ-তাৎপর্যে ফুটে ওঠে।[৩০] বাউল হিসাবে পরিচিতদের খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের বহু সাধক পেঁয়াজ-রসুনহীন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন এবং নিজগোষ্ঠীর বাইরে অন্যের হাতে খান না। নিমতিতার (মুর্শিদাবাদ) সুফী আব্দুল গণি উপরন্তু পশুদেহজাত দুগ্ধাদিও গ্রহণ করেন না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষদের মধ্যে মাছ গুরুসেবায় আবশ্যিক। মাংস, ডিম এরা খায় না। সাঁই, রাঢ়ের জাত-বৈষ্ণব গায়কদের

অনেকে এবং মুসলমান সাধকের একাংশ গোপনে বা প্রকাশ্যে মাছ, মাংস, ডিম খায় কিন্তু নিজ হাতে পশুহত্যা করে না। গোমাংস খায় না মুসলমান সাধকেরা। গোমাংস-ভক্ষকদের হাঁড়িতেও না-খাবার প্রবণতা আছে। একই গুরুর শিষ্যদের খাদ্যবিচারে পার্থক্য দেখা যায়। চারচন্দ্রের সাধকেরা মাংস, ডিম, মাছ পরিহার করে। সমস্ত বাউল গাঁজা খায় না। বাউলদের একাংশ গাঁজার ভক্ত কিন্তু মদের বিরোধী। সাঁই এবং রাঢ়ের বহু গায়ক মদ্য-মাংসের একনিষ্ঠ সেবক। রাঢ়ের বহু মুসলমান বাউল-গুরুর শিষ্য গোমাংস খায়।

কার হাতে কে খাবে এ বিচারও অনেক সাধক করেন। বাউল সাধক ভক্তিপূর্ণভাবে প্রদত্ত যে কারো খাদ্যগ্রহণে রাজি থাকেন।

অঞ্চলভেদে বাউলের নানা বেশ। পত্রপুটের ১৫ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মালা, তিলক, বেশ দিয়ে সম্প্রদায় রচিত হতে দেখেছেন। বসনের রং, মালা এবং তিলক দিয়ে বঙ্গে নানা উপ-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থাদিতে মালা-তিলকতত্ত্বের বিপুল আলোচনা দৃষ্ট হয়। তুলসীকাঠ ও মূল, বেল, বাঁশ, নারকেলের খোলা, নানা ফলের বীজ, পাথর, ধাতু দিয়ে বহু ধরনের মালা তৈরি হয়। রুদ্রাক্ষ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। এক/দুই/তিন ফের মালা এবং খণ্ড-সংখ্যার তারতম্যের সঙ্গে দেখা যায় একাধিক মালার ব্যবহার। অনেকে আবার নর-অস্থি/দাঁত/ নখ প্রভৃতি ধারণ করেন; ধাতুবলয়, শাঁখা ইত্যাদি ব্যবহার করেন। কেউ রক্ষা করেন সর্বকেশ; কারো মুখ পরিষ্কার, দীর্ঘ কেশ; কারো খোপা, কারো চূড়াবাঁধা চুল।

হিন্দু বা মুসলমান বাউলদের অনেকে ভেকধারী; জাত-বৈষ্ণবদের ভেক আবশ্যিক প্রথা। তাদের বেশ ঈষৎ স্বতন্ত্র। সাধারণভাবে দুভাঁজ করা ধুতি নিম্নাঙ্গে থাকে; ভেকধারীদের এর ভেতরে থাকে ডোর কৌপীন। নিম্নাঙ্গের বসন লাল; শাদা, গেরুয়া, হলুদ (শাড়িও হয় ঐ রঙের)। ঊর্ধ্বাঙ্গের বেশে বিপুল বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। উপরিউক্ত চার রং ছাড়াও কেউ ব্যবহার করেন ঢোলা পাঞ্জাবি, কেউ হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত সেমিজের মতো হাল অথবা হাতাওয়ালা আলখেল্লা। নানা রং-এর কাপড়ের টুকরা দিয়ে তৈরি ওয়েস্টকোটের মতো জ্যাকেট বা দরবেশী আলখেল্লা অনেকে ব্যবহার করেন।[৩১]

সমস্যা এই যে গায়ক ও ভিক্ষুকরা এই মালা, তিলক, বেশবাস ধারণ করেন। মূল সাধনার প্রতীক রং হতে পারে, কিন্তু বর্হিবেশ নয়। রাঢ়ের বাউলদের গেরুয়াবেশের সঙ্গে কোমরবন্ধ ও মাথায় পাগড়ি বিবেকানন্দের অনুকরণে, ভারতীয় অধ্যাত্ম-প্রতিনিধির ভাবমূর্তি গঠনের অঙ্গ হিসাবেই পরিকল্পিত হয়েছিল।[৩২] এটি দ্রুত বাউল-গায়কদের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পূর্ণদাসের পিতা নবনীদাসের ফটোতে তালি-দেয়া আলখেল্লা, বায়া ও একতারা দেখা যায়। রামকিঙ্কর প্রমুখ শিল্পীর বাউলমূর্তির বেশ অনুরূপ। মুসলমান সমাজে পীরদের মধ্যে কৃষ্ণবস্ত্র, নানা রং-এর পাগড়ি, তসবী মালার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খাদ্য, বস্ত্র, বেশবিচারে বাউল সনাক্ত করা কঠিন। উপরন্তু লালনপন্থী এবং বহু সাধক এসব কালামালা ব্যবহার করেন না।

চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিতেও বাউল-ধারণার বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। ১৮৮৯-এর ৫ই মে শিলাইদহের বোটে লালনের স্কেচ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতে ধরা যায়নি লালনের ব্যক্তিত্ব। ছবিটিতে বাহ্যিক বিবরণে দেখা যায় যে লম্বা চুল, গোঁফ ছাঁটা, দাঁড়ি এবং হাল-পরিহিত এক বৃদ্ধ। সঙ্গে নেই কোন বাদ্যযন্ত্র। তারপর ১৩২২ সালের বৈশাখে প্রবাসীতে

গগনেন্দ্রনাথ আলখেল্লা পরা একতারা নিয়ে 'ডান্সিং দরবেশে'র ছবি আঁকলেন। নন্দলাল বসুর অতি-পরিচিত লালনের ছবিতে চূড়াবাঁধা চুলের এক প্রজ্ঞাবান ঋষির ভাব ও আদল ফুটে উঠেছে সেকালের খ্যাতিমান শিল্পী সুধীর খাস্তগীর একাধিক বাউলের ছবি এঁকেছেন। এখানে বাউলের বাঁয়ে বায়া, ডান হাতে একতারা। একটি উত্তরপ্রদেশ ললিতকলা একাডেমীর প্রকাশিত গ্রন্থে বলিষ্ঠ যুবক বাউল; অন্যটি শান্তিনিকেতনে বাসভবনে বৃদ্ধ বাউল। দু'টি ছবিতেই নৃত্য-ভঙ্গী।[৩৩] প্রথাবিরোধী শিল্পী কিরণচন্দ্র সিংহ একদা অনেক বাউলের ছবি ও স্কেচ করেছিলেন। তিনি এদের প্রথাবিরোধী শিল্পী মনে করতেন। শান্তিনিকেতনের বাসভবনে তাঁর আঁকা দুটি উল্লেখযোগ্য বাউলের ছবি আছে। একটি ছবিতে জয়দেবের মেলায় আগত এক বাউল-পরিবার চিত্রিত হয়েছে। অন্য ছবিটি, সূর্যাস্তের রঞ্জিত সময়ে মাথার কাছে বাদ্যযন্ত্র রেখে এক শায়িত বাউলের। আকাশ ও মাটির মধ্যস্থলে তিনি শায়িত। প্রজ্ঞা, আবেগ, সুদূর পিপাসা, লোকোত্তর ভাবনায় এ সমস্ত ছবি বিশিষ্ট। শিল্পীদের নানারকম বাউল-ভাবনা বিচিত্র মাথায় ছবিতে পাওয়া যায়। মহান লোকশিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ লালন তথা বাউলের এক মূর্তি নির্মাণ করেছেন। শান্তিনিকেতনে বিচিত্রার পাশে 'নাট্যঘর'-এ মঞ্চের ডানদিকের দেয়ালে এ মূর্তিটি আছে। বাঁদিকে যক্ষীর মূর্তি। ১৩৭২ সনে সহকর্মী অসিত-সহ তিনি মূর্তিটি নির্মাণ করেন। বাঁয়ে বায়া, ডান হাতে একতারা নিয়ে নৃত্যরত নট-গীতিকার পাষাণরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। মূর্তির ডানদিকে উৎকলিত লালনের অতিখ্যাত গান ঃ "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, লালন বলে জেতের ফাতা বিকিয়েছি সাত বাজারে।" জাতপাত-বিরোধী এক মহান লোকশিল্পীকে অশেষ গুরুত্বে ধরলেন নীচুজাতের আর এক মহান শিল্পী—এ তাৎপর্যে রামকিঙ্করের লালন-মূর্তি অনবদ্য।[৩৪] কৃষ্ণনগরের শিক্ষক স্বপন বিশ্বাস লালনের নানাধরনের কাষ্ঠ ও মর্মরমূর্তি নির্মাণ করেছেন; এগুলি মাজদিয়ার নিকটবর্তী (নদীয়া) কদমখালির লালন-আশ্রমে রক্ষিত আছে। এছাড়াও বহু চিত্রশিল্পী বাউলের ছবি এঁকেছেন।

খাদ্য, বেশ, আচারে বহু বৈচিত্র্য বাউলদের। এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। মাইজভাণ্ডারী, লালনশাহী, বীরভূম ঘরানার বাউলদের গীতরীতি ও বাদ্য-ব্যবহারেও পার্থক্য আছে। বাউল হিসাবে চিহ্নিত জনসমষ্টির মধ্যে অসাধক, গায়ক, ভিক্ষুক, সাজা, গাঁজাখোর, অনগ্রসর ও অগ্রসর সাধক প্রভৃতি নানা স্তরের মানুষ আছে। ব্রাহ্মদের একেশ্বরবাদকে খণ্ডন করে লালন ব্রহ্মের বহু রূপ রূপবৈচিত্র্যকে স্বীকার করেছেন। বাউল বলে, 'যত কাল্লা, তত আল্লা' অর্থাৎ প্রতি মানুষ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু সারা জগৎ ভ্রমণ করে সাধক নানাবর্ণের গাভীর এক বর্ণ দুধ দেখেছেন; মাতৃগর্ভজাত রজেঃ বীজে সবার জন্ম নির্ণয় করেছেন।[৩৫] নেতিবাচকভাবে শাস্ত্রাচার, মৌলবী, পুরোহিতের বিরোধিতায়; আর ইতিবাচকভাবে সুপ্রাচীন নারীকেন্দ্রিক রস-রসায়নের সাধনা দ্বারা দেহ-মনকে সংস্কৃত করা ও বস্তুরক্ষার সুটল পদ্ধতি অনুকরণ করা এবং চন্দ্রভেদ বিষয়ে সাধকেরা ঐক্যমত। প্রায় অসাধক দীক্ষিত ব্যক্তিও বস্তুরক্ষা, যুগলের আবশ্যকতা, চন্দ্রভেদকে করণীয় কর্তব্য বলে জানেন। এই মূল্যবোধ ও সাধনার সূত্রেই বৈচিত্র্যের অন্তরালে মূলগত ঐক্যের এক স্রোত বাউল জনসমষ্টির মধ্যে বহমান। ঐক্য এখানে স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করে সম্প্রদায় গঠন করেনি; তাই বাউল হিসাবে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শিথিল এক সমবায় পাওয়া যায়।

আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে বাউল　　　কিরণচন্দ্র সিনহা, শান্তিনিকেতন

বাউল শব্দের নানা উৎসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাতুল বা পাগল। এ যুগের দু'বঙ্গের প্রখ্যাত দুই পদকর্তা বিজয় সরকার ও ভবা পাগলা ভণিতায় নিজেদের পাগল বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ শব্দটি আমাদের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ কথামৃতে নানা ধরনের উন্মাদ সাধকের পরিচয় আছে। প্রচলিত সামাজিক বিচারবুদ্ধি অগ্রাহ্য করে রামপ্রসাদ পাগল হতে চেয়েছিলেন। লালন চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতকে পাগল হিসাবে দেখিয়ে, তাঁদের নাচ, গান, জাতিধর্ম-বেদাচার লঙ্ঘনকে পাগলামির অন্তর্গত বিবেচনা করেছেন। শিব তো বাউল, ক্ষেপা। লালন এক পাগল দেওয়ানার (প্রেম-পাগল) হৃদয়জয়ের ইচ্ছায় পাগল হতে চেয়েছেন। কিন্তু 'সরল' হয়ে 'আত্মপর' ভুলে যথার্থ পাগল না হয়ে বিলাপ করেছেন।

শরীয়তী/বৈদিক প্রচলিত মূল্যবোধ ও আচারধর্মের সীমানা লঙ্ঘনের সূত্রে লালন পাগল শব্দ ব্যবহার করেছেন। উনিশ শতকীয় বঙ্গসাহিত্যে ভ্রাম্যমান, ব্যর্থপ্রেমিক, জ্ঞানী, দেশভক্ত প্রভৃতি নানাধরনের পাগল দেখা যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা প্রচ্ছন্ন পাগল। উনিশ শতকের শেষার্ধে কলিযুগের সাহিত্যে কামিনী-কাঞ্চন চাকরির দৌড় থেকে মুক্ত মানুষেরা পাগল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।[৬৬]

বঙ্গসংস্কৃতিতে সাধকে-পাগলে ঐক্য আছে। উভয়ের নির্দিষ্ট খাদ্য বা বাসস্থান নেই। তাঁরা সমাজের বন্ধনমুক্ত; যা ইচ্ছা তাই করে সমাজ অগ্রাহ্য করেন। উভয়ে নিজের মনোজগতে মগ্ন থাকেন', মল-মূত্রাদি গায়ে মাখেন। তাঁদের ঘুম থাকে না, চোখে থাকে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি। পাগল মানসিকভাবে অসুস্থ, সাধক সব কিছু করে সজ্ঞানে। পাগল এবং সাধক প্রচলিত জীবনচর্যার পরিমণ্ডল বহির্ভূত : No fixed house, free wishes.....are an indication that he has no personal code of conduct, no Dharma and hence in a significant sense, no identity at all*** It breaks all boundaris. The very open nature of the individual implies paglami as a form of devience where the regulation of interchange has been inadeqate, implies paglami as a procees where intrusiveness from the outside erase the differentiation which gives the system its identity *** It has transuctional and transformational aspect of the destruction of the individual". [৬৭] এ আর্তিতে লালনও বাউল।

লালনের নামে প্রচলিত গানে কোথাও নিজেকে তিনি বাউল বলেননি। সাঁই, দরবেশ বলেছেন গুরুকে; নিজের পরিচয় ফকির; মত ও সাধনপন্থা ফকিরী, সহজ, রসসাধনা। লালনের শিষ্যেরা গুরুকে সাঁই দরবেশ বলেছেন। লালনের অন্যতম তাত্ত্বিক শিষ্য দুদ্দুশাহ নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন 'দরবেশী বাউল' বলে; লালনের কাছ থেকে তিনি বীরভদ্র শাখার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক জেনেছেন। দরবেশ ফারাসী শব্দজাত; তুর্কী এবং আরবী ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হিসাবে পাই ফকির, শেখ, সুফী, জাহিদ প্রভৃতি। সন্ন্যাস এবং ভিক্ষা ইসলামে সমর্থনীয় না হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম সুচনাপর্ব থেকে ত্যাগী ভিক্ষাজীবী সংঘ ও ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায়। সুফী নামের অন্তরালে ইসলামের প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলি সমবেত হয়েছিল। গবেষকদের মতে সুফীবাদ এক দার্শনিক বিশ্বাস; দরবেশপন্থা এক বিশিষ্ট জীবনযাপন পদ্ধতি।

দরবেশের বহু শাখা, বহু গোষ্ঠী। বিশ্বকোষে মন্তব্য করা হয়েছে, "ভারতে অনেক দরবেশই

নীচ বংশোদ্ভব ও অসৎ চরিত্র, ইহাদের অধিকাংশই বেশরা।”[৩৮] সুফী, দরবেশগোষ্ঠী কালক্রমে শরা এবং বেশরা অর্থাৎ ধর্মাচার-অগ্রাহ্যকারী ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের অবৈদিক অংশের সঙ্গে এই বেশরা ইসলামী ঐতিহ্য মিলিত ও মিশ্রিত হয়েছিল। ভারতের ভক্তি আন্দোলনে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভারতীয় প্রতিবাদী উপাসকগোষ্ঠী প্রাচীন এই সমস্ত ঐতিহ্যের সন্তান। লালন ও অন্যান্য বাউল-ফকিরদের রক্ষণশীলেরা বেশরা এবং অনাচারী মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল ওয়ালির প্রবন্ধ স্মরণীয়।[৩৯] লালনের গানে সাঁই, দরবেশ, ফকির, সাধু প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরা সহজ, রসসাধনার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ, জীবন-বিশ্বাসে ইহবাদী বর্তমানপন্থী; অলৌকিকে অবিশ্বাসী, দেহকে কষ্ট দেওয়ার বিরোধী এবং মানবতার চারণকবি। লিখিত শাস্ত্র নয়, মৌখিক এক ঐতিহ্য এবং নিজে করে দেখার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এরা মান্য করেন। দেহ এদের বেদ; দেল কোরাণ। ভারতের সাধুসন্তদের এবং পীরদের একাংশ প্রচলিত ধর্মসংস্কৃতি, আচার, জাতিভেদের ঘোরতর বিরোধী। বাউল-ফকিরগণ তাঁদেরই অন্তর্গত।

আচার-ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িক সীমানা লঙ্ঘনকারী ফকির-দরবেশগোষ্ঠীতে কালক্রমে শিষ্টদের অবজ্ঞাবাচক ও সাধকদের প্রতিবাদবাচক বাউল শব্দ গৃহীত হয়েছিল। লালনের জীবদ্দশায় সূচিত হয়েছিল বাউল, ন্যাড়ার ফকির-বিরোধী আন্দোলন। ফলত বাউল শব্দটি স্পষ্টতা লাভ করেছিল। লালনপন্থী তাত্ত্বিক দুদ্দুশাহ নিজেদের গোষ্ঠীগত পরিচয়ে, লালনের অনুমতিসাপেক্ষে, বাউল শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দুদ্দুর মতে, তারা দরবেশী বাউল/বাউল; আচারধর্ম মানেন না, মূর্তিপূজার বিরোধী, ভাগ্য, পরজন্মে, পূর্বজন্মে অবিশ্বাসী।

স্পষ্ট করে লালন বলেছেন যে, মানুষতত্ত্বেই তাদের বিশ্বাস, মানুষ সবার উপরে। দুদ্দুর গানে, ‘দরবেশী বাউল’ শব্দ এবং নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা আছে। বঙ্গে বিশুদ্ধ শরীয়তপন্থী দরবেশ আছে; সনাতন প্রতিষ্ঠিত দরবেশ শাখা আছে হিন্দু সমাজে। আবার চার স্তরের সাধনায় তৃতীয় সর্বোচ্চ স্তরটির নাম দরবেশ।[৪০] এদের থেকে পৃথক এক অস্তিত্ব বাউল শব্দে যুক্ত করে দুদ্দু তাকে চিহ্নিত করেছেন। তারা শাস্ত্রাচার এবং সাম্প্রদায়িক সীমানা-লঙ্ঘনকারী অতএব ‘দরবেশী বাউল’—অর্থাৎ দরবেশ ঐতিহ্য থেকে আগত বাউল। দুদ্দু বীরভদ্রকে স্মরণ করেছেন সমধর্মী হিসাবে। মাধব বিবির কড়চা ইত্যাদি হস্তলিখিত বৈষ্ণব কড়চায় ইসলামের মাধব বিবির কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন বীরভদ্র, বলে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ নেড়ানেড়িকে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সুতরাং অসাম্প্রদায়িকতা ও মিলনধর্মের সূত্রে দুদ্দুর সঙ্গে বীরভদ্রের ঐক্য ধরা পড়েছে। নদীয়ার একাধিক সাধকের খাতায় ‘বাউল মত’ এবং ‘বাতুল বৈষ্ণবের লক্ষণ’ লিখিত আছে। সর্বকেশী, নামরত, সহিষ্ণু বাতুল বৈষ্ণব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মুণ্ডিতকেশ। গোস্বামীমতে বিধি, আচার, পূজা, ব্রত, উপবাস মান্য করতে হয়; আমিষ নিষিদ্ধ। অন্যপক্ষে বৈষ্ণব ঐতিহ্য থেকে আগত বাউলদের গুরুসেবায় মাছ আবশ্যিক, রাধাকৃষ্ণ মূর্তিপূজা, উপবাস, জাতিভেদ, এক কথায় ধর্মীয় আচার অগ্রাহ্য করে এরা রসরসায়নের/বস্তুরক্ষার দেহ-সাধনা করেন। নানা ভিন্ন নামে এদের পরিচিতি। ফকির, দরবেশগণের একাংশ অবশ্যই বাউল অভিধার অন্তর্গত বলে বিবেচিত হতে পারে। দুদ্দুর বিচারে লালন বাউল ঐতিহ্যের মধ্যেই অবস্থিত। সমকালীন বিরোধীরা তাঁকে বাউল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বন্ধু কাঙ্গাল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্য অনুরাগী তাঁকে বাউল বলে

উল্লেখ করেছেন। এদেশের মৃত্তিকালগ্ন এক প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্য নাম—বাউল, এবং অবশ্যই লোকশিল্পী লালন এর উজ্জ্বল এক নায়ক।

ডিমক বাউলের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'A Baul essentially is One Who says he is a Baul and who has taken inititation from a guru, recognised by other Bauls'[৪১]।

সামাজিক অত্যাচার এবং কুৎসাহেতু অনেক ক্ষেত্রে অনেকে নিজেকে বাউল বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন না। কিন্তু গোপনে জিজ্ঞাসিত হলে পরম গর্বে বাউল পরিচয় জানান। প্রচলিত বিধিমার্গের প্রতিবাদী অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা বহুক্ষেত্রে জনগণ দ্বারা বাউল হিসাবে চিহ্নিত হন। দীক্ষার চাইতে শিক্ষার মূল্য বাউল ঐতিহ্যে গুরুত্বপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রে এরা শিক্ষাগুরুর তালিকা রক্ষা করেন। বিধিমার্গের দীক্ষাদি এখানে আবশ্যিক নয়। অনেকে গুরু হিসাবে কারো নাম করেন কিন্তু সাধুসঙ্গেই তার যথার্থ শিক্ষা। তাই যিনি দীক্ষা বা শিক্ষা নিয়েছেন বলে জানাবেন, তদন্তহীনভাবে তা গ্রহণ করতে হবে। বেশধারী, সাধক, গায়ক যে কেউ প্রকাশ্যে বা গোপনে বাউল পরিচয় স্বীকার করলে, অন্য বাউলদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে স্বীকৃত হলে, লোকসমাজ দ্বারা চিহ্নিত হলে এবং আংশিক বস্তুরক্ষা, রস-রতি-চন্দ্রভেদের সাধনার গুরুত্ব স্বীকার করে; শাস্ত্র, আচার, জাতিভেদের বিরুদ্ধে তত্ত্বগতভাবে অবস্থান নিলে তাকে বাউল অভিধার মধ্যে বিবেচনা করা উচিত। বাউল এক বিশিষ্ট জীবনচর্যা। বহিরঙ্গে তার প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক যুক্তি; অন্তরঙ্গে সুপ্রাচীন রসরতির সাধনা।

তথাপি 'বাহ্যিক কোন পরিচয়ে, দীক্ষাগুরু (তন্ত্র ও বৈষ্ণবতায়ও আছে) বা সাজপোষাক দিয়ে বাউল সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। লালনপন্থীরা তো "কালামালা" ব্যবহার করেন না। সহজ বা রসরতি ও চন্দ্রভেদের সাধনার সঙ্গে যুক্ত বঙ্গের সাধকদের অনেকে ফকির, সাঁই দরবেশ, কালাচাঁদী, বৈষ্ণব প্রভৃতি উপ-সাম্প্রদায়িক নাম ব্যবহার করে। বাউল শব্দটি প্রত্যাখ্যান না করলেও, বাউল হিসাবে এরা নিজের পরিচয় দেয় না। মূলত বাউল গায়কেরা নিজেদেব সর্বদা বাউল হিসাবে ঘোযণা করে। বঙ্গের এক শ্রেণীর লৌকিক উপাসকবর্গ শাস্ত্রীয় অনুমান-পন্থা ও আচারধর্ম থেকে নিজেদের পৃথক করে 'বর্তমানপন্থী' বা 'বস্তুবাদী' বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু বস্তুবাদী শব্দটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে; আর 'বর্তমান' শব্দের নানা অর্থ, নানা শাখা, নানান সাধনবৈচিত্র্য। তাই বাহ্যিক ভাবে বাউল সনাক্ত না করে; লালন ও দুদ্দু বৈষ্ণবাদি গোষ্ঠী থেকে এদের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন এভাবে ঃ

(১) বাউলদের কেউ কেউ বস্তুবাদী;— সর্ববিধ শাস্ত্রীয় অনুমানে, পূর্ব-পরজন্মে, জাতিভেদে অবিশ্বাসী এবং ইহবাদী।

(২) 'বস্তুকেই' তারা বলেন আত্মা, বস্তুতেই অমৃত খোঁজেন।

(৩) তাদের সাধনায় নারী অপরিহার্য এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন।

(৪) দেবতা, অপদেবতা, মূর্তি, কবরপূজা না করে তারা জীবন্ত মানুষকে খোদা হিসাবে সেবাপূজা করেন। তাদের দর্শনের নাম "মানুষতত্ত্ব"।

(৫) বাউল সাধনা কোন লিখিত শাস্ত্রে নেই; শাস্ত্রে এর ইঙ্গিত আছে মাত্র। গুরুমুখ থেকে

এ সাধনতত্ত্ব শুনে 'যুগলে' অভ্যাস করতে হয় এ পন্থা। প্রচলিত মূল্যবোধ, আচার-আচরণের বিরোধী বাউল মত সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে এক গুপ্ত সাধনা।[৪২]

এই গুপ্ত সাধনাকে বাহ্যিক ভাবে সনাক্ত না করে, লালন ও দুদ্দু অন্তরঙ্গ সাধনা ও জীবনাচরণের মানদণ্ডে বাউল সনাক্ত করেছেন। এ সনাক্তকরণই সঙ্গত এবং যথার্থ।

বঙ্গদেশের হিন্দু বা মুসলমান সমাজভুক্ত বাউল গায়ক বা সাধক লালনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাউল মহাজন মনে করেন। লালনের পদের নিষ্কাশিত তত্ত্ব তারা ব্যবহার করেন সাধনায় এবং আপ্ত বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় লালনের পদাংশ। বাউল-বিরোধীগণ লালনকে বাউল বিবেচনা করেছেন। বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সাহিত্যিক ইতিহাসকার সকলেই লালনকে বাউল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই বহুমুখী ব্যাপক অর্থ-তাৎপর্যের সূত্রে লালন প্রসঙ্গে বাউল শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

(১) বৈষ্ণব কড়চা, 'চারি জন্ম নিরূপন' (নিজস্ব সংগ্রহ)-এ চারস্তরের চারজন গুরুর আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে ''মুর্শিদাবাদ জেলার বস্তুবাদী মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ, দর্শন এবং সাহিত্য-বিষয়ক আমার অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে অনেক পদকর্তার পদ সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

চণ্ডীদাসের পদে সাধনসঙ্গিনী রামীকে ইষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নবরসিকদের ঐতিহ্যে প্রেমিকা নারী ইষ্টগুরু রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাধক রাজক্ষ্যাপার হস্তলিখিত রচনাসংগ্রহ সূচিত হয়েছে সাধনসঙ্গিনী রাজেশ্বরীর বন্দনা দিয়ে, ''বন্দেহং রাজেশ্বরম।'' (নিজস্ব সংগ্রহ)। কড়চা সাহিত্যে এ মতবাদের আদি সূত্র জয়দেব। তাঁর গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের রাধার পাদধারণের প্রসঙ্গটি সকলে স্মরণ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতে এর আভাস আছে ঃ

কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান।।
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত।।

রাধিকাসে প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।
(আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

(২) গুরু কর শত শত মন্ত্র কর সার
যে ঘুচাবে মনের কালি দোহাই দেও তার।।
কথক ঃ আমিরুদ্দীন বাউল, মামদালিপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

(৩) আমীরুদ্দীন বাউল এবং লোকমান ফকির (পাড়দেয়ার, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ)-এর নিকট থেকে সংগৃহীত।

(৪) Lynn Teskey Dentoe, 'varieties of Hindu femaleasceticism', Role and rituals for Hindu woman, edited by Julia Leslie. P.P. 218, 225 নদীয়ার (গোরভাঙা, করিমপুর) অন্যতম বাউল গুরু আজাহার আলী খাঁ-এর মতে এ পন্থায় প্রতি

মানুষের ইচ্ছা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়। সামাজিক বিধিবিধান থেকে মুক্ত হয়ে আসা মানুষ এ মতবাদে ইচ্ছা, খাদ্য, বেশবাসের যথেচ্ছ স্বাধীনতা ভোগ করে।

(৫) রেয়াজুদ্দীন আহাম্মদ, বাউল ধ্বংস ফৎওয়া। মুসলমান সমাজের বাউল-বিরোধী আন্দোলনের বিবরণ দিয়েছেন আব্দুল আহসান চৌধুরী তাঁর লালন শাহ গ্রন্থে (পৃঃ ১২২, ১৩০) কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের কিশোরী ভজনা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিবরণ পাই, মদনমোহন দাস ব্রহ্মচারীর সহজিয়াদলন (১ম খণ্ড) গ্রন্থে।

(৬) দর্শয়েদ্বৈষ্ণবীং মুদ্রাং বিষ্ণুন্যাসং তথা স্তবং।।৬৬।।

তন্ত্রসার, পৃ. ৪৯৮।

(৭) চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদুকা বহুশ্রুতাঃ। মহাভারত, ১৩, ৩৯, ৩-১৯।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, পৃ. ৫৬-৫৭ এবং লতিকা চট্টোপাধ্যায়ের চার্বাক দর্শন গ্রন্থে বস্তুবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় আছে। ভারতীয় বস্তুবাদের আদর্শায়িত উত্তরাধিকার বহন করে বাউল মতবাদ। এ সূত্রে এখানেও বহু মত, অনেক গোষ্ঠী।

(৮) গৌরভগবান, অনুরাগী দাস মোহান্ত, সর্বকেশী, কাঙ্গাল, গৌড়ীয়া, স্পষ্টদায়ক, বিরক্ত, সহজিক, সখীভাবক, গৌরবাদী, রাধাস্বামী, বৈরাগী, শম্ভুচাঁদী, চিন্তামণি, সুধারাণী, পাগল নাথী, নাড়া, বাউল, আউলিয়া, দরবেশ, সায়ী প্রভৃতি লৌকিক গোষ্ঠী ও মতবাদের আলোচনা করেছেন অনুরাগী।

(৯) S. B. Dasgupta : obscure religious cults. (১০) হারাধন দাস প্রকাশিত গ্রন্থটি ১৩৯১-তে মনীন্দ্রনাথ অধিকারী পুনঃমুদ্রিত করেছেন।

সহজ সাধন বলি রসিকে বলিল।

কুলাচার ধর্ম বলি তন্ত্রেতে লিখিল।। পৃ. ৩৬.

(১১) মনীন্দ্রমোহন বসু, সহজিয়া সাহিত্য, পদ নং ৮১, পৃ. ৪৬।

(১২) মোঃ গোলাম রসুল, দেওয়ান মোঃ আজরফ ঃ লালন সাহিত্য ও দর্শন ঃ রিয়াজুল হক সম্পাদিত, পৃ. ১০১, ১৫২-১৬৩।

(১৩) লেখকের অমুদ্রিত গবেষণা নিবন্ধ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বস্তুবাদী মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ের সমাজ, দর্শন ও সাহিত্যে বিস্তৃতভাবে সাধকদের ব্যাখ্যা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে বাক্য (গুরুর) বস্তু, বায়ু—এই তিন 'ব' এর সাধকেরা বাউল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(১৪) মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়

কেহ বলে আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।

ডাকিলে কি কার্য হয় না জানিল ইহা।।

আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।

ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন।।

নামে মুক্তি হয় না; নাম বা বস্তুসাধনায় মুক্তি। দেহে না খুঁজে বাইরে পরমকে খোঁজা বৃথা—এ যুক্তি বাউলগানে ও সমাজে অতিব্যবহৃত।

(১৫) শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, ভূমিকা (পৃ. ২-৩)।

(১৬) Tribes and castes of Bengal. Vol-1 (1st edi 1891) p-78. : 'A low class of mendicant vaishnabas.'

(১৭) 'আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে বসে আছ রাজকুমারী', রামপ্রসাদ, পদ নং-১৬৩, শাক্ত পদাবলী। ফক্‌রা তুর্কী শব্দ থেকে ফকির এসেছে। তুর্কীস্তানে বহু উপ-সম্প্রদায় ফকিরদের। ইসলামীয় সমাজে নিঃস্ব ভিক্ষুককেও ফকির বলা হয়। রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা সুকুমার সেন এবং পঞ্চানন মণ্ডল, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৫১।

(১৮) মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান বাউলদের ক্ষেত্র-সমীক্ষার সূত্রে রশিদগোষ্ঠীর দশজনের উপর সমীক্ষা চালিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণে এ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

(১৯) আলোচ্য পদটি প্রফুল্ল সরকারের। তিনি পূর্ববঙ্গের সাধক, গায়ক এবং পদকর্তা ছিলেন।

ফুটলরে ফুল আরবের গুলবাগিচায়।
রবিউল আওয়াল চাঁদে ১২ই সোমবার ভোরবেলায়।।

এ ধরনের আর এক পদকর্তা বিজয় সরকার বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবিয়াল ও বাউলগান-রচয়িতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমাদৃত হন। তার জন্ম ১৩০৯; মৃত্যু ১৩৯২। ১৩৯৩-তে তাঁর গ্রন্থ বিজয়গীতি প্রকাশিত হয়।

(২০) বহরমপুর থানার নূতন গ্রামে, হরিহরপাড়া থানার মালোপাড়ায়; ডোমকলের বাঘডাঙায় বাউল গায়ক-সাধক-প্রধান অঞ্চলগুলি বাউল পাড়া নামে পরিচিত।

(২১) উদ্ধারণপুরে উদ্ধারণ দত্তের শ্রাদ্ধ করেন বনোয়ারীবাদ থেকে আগত কৃষ্ণঠাকুর। এ রীতিটি বহুলপ্রসারিত। বৈষ্ণব সাধুর শ্রাদ্ধ না হবার কথা। বৈদিক সংস্কৃতির এক আলৌকিকের প্রতি পক্ষপাত ঘটেছে এখানে।

(২২) টেপ রেকর্ডারে গৃহীত বড়নলদহের গুরু লালন শাহের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা।

(২৩) বিশ্ববন্ধুর নাম ফটিক গোঁসাই; উত্তরপুরুষদের বাস নদীয়ার বেতাই। মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া ধামে জগদ্‌বন্ধু সুন্দরের অনুবাগীরা কেন্দ্র গড়েছেন। রাজকৃষ্ণ মিশ্রের বাড়ি ছিল শ্রীহট্টে। এদের ফটোতে কারো গলায় কণ্ঠি নেই।

(২৪) দেশ, ১৮/১/১৯৯২, সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার বাউল।

(২৫) পূর্বোক্ত আলোচনায় ডঃ চক্রবর্তী জাত-বৈষ্ণবদের বৈষ্ণব ধর্মানুসারী বলে উল্লেখ করেছেন। কানুতত্ত্ব নির্ণয়ে নির্ণয়ে এবং ক্ষেত্র-সমীক্ষায় জানা যায় যে এদের বহু পবিবার শাক্ত, তন্ত্রানুসারী; কোন মতেই বৈষ্ণব নয়।

(২৬) ওরিয়েন্টালিজমের সূত্রে এদের প্রতি বিদেশীদের আকর্ষণ। অনেকে বাউল বাদ্যযন্ত্র এবং গীতপদ্ধতি নিজেদের পদ্ধতিতে আত্তীকরণ করতে চান। অনেকে আবেগকে ভাষাহীন ভঙ্গীতে নিংড়ে দেবার মধ্যে এক নীরবতায় লোকনাট্য সন্ধান করেন। বিদেশী সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরা অ-সাধারণ; একারণে আকর্ষণীয়। নেশা এবং বিচিত্র যৌনতার সূত্রে একশ্রেণীর বিদেশী মহিলা তরুণ-বাউলদের ব্যবহার করেন। সমকামী ও বিকৃতকামী বাঙালী ভদ্রলোকদের অনেকে দরিদ্র বাউল কিশোরদের ব্যবহার করে।

(২৭) জনৈক ডোম-গায়ক বিদেশে গেলে, বোলপুর সুরিপাড়ায় আনন্দদাস মন্তব্য করেন, "ওরা সাজা বাউল; আমরা আসল "। তার পিতা বিশ্বনাথ দাস বিখ্যাত গায়ক।

(২৮) তথ্যসূত্র ঃ লাল মহম্মদ গায়ক, খোসালপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

বাউল ধ্বংসের ফৎওয়ায় ইসলামের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে বাউলগণ ইসলামকে বিপন্ন করছে এটি মূল অভিযোগ ছিল। জাতিভেদ, শাস্ত্রনির্দেশ, বেশ, খাদ্যাদির নিয়মলঙ্ঘনের সূত্রে এদের উপর সামাজিক অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে।

(২৯) আজাহার খাঁ, পদকর্তা, গায়ক, গুরু, বয়স ৭১, গোরভাঙা, করিমপুর, নদীয়া।

(৩০) জাত-বৈষ্ণবদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, পুরোহিত অপ্রয়োজনীয়। নিজেদের গুরুবর্গ এ সমস্ত অনুষ্ঠানে এবং মহাপ্রভু ও প্রভুদের ভোগরাগ পরিচালনা করেন। রক্ষণশীলেরা এ কারণে মালা-চন্দনের বিবাহকে মানেন না বৈধ বলে।

(৩১) গুরুর ব্যবহৃত একটি জামা প্রত্যহ পটি দিয়ে বারো বছর ব্যবহার করতে হয়; ঘুমের সময় ছাড়া এটি খোলা নিষিদ্ধ, স্নানও নিষিদ্ধ। অনেকে ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঝোলা ও বহির্বাস তৈরি করে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ আলখেল্লা দর্জিকে দিয়ে তৈরি করা এবং গানের সময় ব্যবহৃত হয় মাত্র। তথ্যসূত্র ঃ বলাই গোঁসাই, নাটনা, করিমপুর, নদীয়া। যমের রং লাল। মৃত্যু এবং প্রাণের রং লাল। মহাভারতে গণিকাদের বেশ রক্তবর্ণ বলে বর্ণিত হয়েছে (৮/৯৪/২৬)। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমলা দেবী সম্পাদিত, ভারতীয় সমাজে প্রান্তবাসিনী, পৃ. ৫৫-৫৬

প্রখ্যাত সুফি সাধক মিয়া মির আলখাল্লাদি বা ভিন্নরঙ, তসবী দিয়ে ভিন্নতা সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। Rizvi, A history of sufism in India, Vol.II, 1983, P. 107.

(৩২) আমেরিকায় প্রবাসী হিতব্রত রায় (3,050 West fall place, Falls Church, Virginia 22.040 U. S. A.) শান্তিনিকেতনেও থাকেন। তিনি বাচ্চু রায় নামে জনপ্রিয় এক মানুষ। রজনীকান্ত সেনের বংশধর হিতব্রত নিজেও সুগায়ক। পূর্ণদাস ইত্যাদিকে বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের সূত্রে তিনি আমেরিকায় নিয়ে যান। কিন্তু সেখানকার লোকশিল্পীরা বাউলগানে আশানুরূপ আকৃষ্ট হয় না। একশ্রেণীর বিদেশী বাউল-গায়কদের ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং গেরুয়া সন্ন্যাস বেশটি ব্যবহৃত হতে থাকে। (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সূত্রে লভ্য তথ্য)।

মুকুন্দদাসের অভিনেতার ফটোতে আলোচ্য বেশভূষা পাওয়া যায়। তার অনেক বাউলগানও আছে। সঙ্গীত চয়ন, সম্পাদনা দৌহিত্রী পুতুল দেবী।

ইতিপূর্বে বিবেকানন্দ যে-বেশ ধারণ করে বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছিলেন সে পোশাকে সজ্জিত করা হয় বিদেশে বাউল গায়ককে। ক্রমশ বৈদেশিক স্বীকৃতির গুরুত্বে এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতায় এ বেশটিই বাউল-পোশাক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেবেন ভট্টাচার্যের গ্রন্থে পূর্ণদাস বাউলের কিশোর বয়সের এক ফটোতে পাশ-কাটা লম্বা পাঞ্জাবি পরিধানে, মাথায় চূড়া বাঁধা চুল, দেখা যায়। বাঁকুড়ার সাঁই গোষ্ঠী এবং রাঢ়ের জাত-বৈষ্ণবেরা ভেক নেয় এবং গেরুয়া বস্ত্র ব্যবহার করে। এ 'বেশ'টি বিবেকানন্দের পোষাকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রাঢ়ের 'বাউল' বেশ পরিকল্পিত হয়েছে।

পূর্ণদাস বাউল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি একাধিকবার আন্তর্জাতিক যুব উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে এবং অন্যান্য বাউলদের পশ্চিমী দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার পেছনে কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে এদের মুক্ত করার এক প্রচেষ্টা

ছিল বলে অনেকে মনে করেন। একদা স্বদেশী আন্দোলনে বাউল গান উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ থেকে সূচিত বিপ্লবী আন্দোলন থেকে বাউলদের মুক্ত রাখাব উদ্দেশ্য এবং বৈদেশিকদের বাউল-সঙ্গের মধ্যে যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

(৩৩) ১৯৭৮-এ প্রকাশিত সুধীরঞ্জন খাস্তগীর-এর গ্রন্থে মুদ্রিত; অন্য ছবিগুলি শান্তিনিকেতনে শ্যামলী তান খাস্তগীরের সংগ্রহে আছে। কিরণচন্দ্র সিংহও শান্তিনিকেতনে থাকেন। তিনি বাউলের অনেক বস্তুনিষ্ঠ স্কেচ করেছেন। শান্তিনিকেতনের সোমনাথ হোর এবং আরো বহু শিল্পীর আঁকা বাউলের ছবি আছে। নন্দলাল বসুর অঙ্কিত একাধিক বাউলের মূর্তি আছে। এদের মধ্যে সাধক ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। খাস্তগীর, কিরণবাবুর ছবিতে শিল্পী ও দার্শনিকতার প্রাধান্য।

(৩৪) বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধান দেন রামকিঙ্করের মূর্তিটির।

(৩৫) ভণিতাহীন পদাংশ এই : নানাবরণ গাভীরে ভাই একুই বরণ দুধ /সারা জগৎ ভ্রমি দেখলাম সব একুই মায়ের পুত।

(৩৬) Renaissance Kaliyuga and Kalki construcation of times and history. Sumit Sarkar. A paper. 2.9.1989. P.59

(৩৭) Paglami : Ethnopsychiatric knowledge in Bengal, Deborah P. Bhattacharya. P. P. 152

(৩৮) ৮ম ভাগ. পৃ. ৩৫৯, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

(৩৯) On ourions tenets and parctices of a certain class of Faqirs in Bengal.

(৪০) পূর্ব উল্লিখিত গবেষণাগ্রন্থ বস্তুবাদী বাউলএ বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

রামকৃষ্ণ কথামৃতে এবং অনুরাগী সাঁই, গৌর ভগবান গ্রন্থে এ চার বিভাগকে (আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই) সাধনার চার স্তর বলে গণ্য করেছেন। বৈষ্ণব তান্ত্রিক হস্তলিখিত পুঁথিতে চার স্তরের সাধনা এবং মাতৃগর্ভে, অদীক্ষিত জীবনে, দীক্ষায়, এবং সিদ্ধিতে এ চার স্তর যুক্ত। বহরমপুর শহরের গোরাবাজার নিবাসী প্রয়াত মহিলা-গুরু পারুলবালা পালের মতে চারচন্দ্র সাধনার সঙ্গে জড়িত চারটি স্তর। সারগাছির সাধক রুহুল আমীনের মতে সাংসারিক, সাধক, সংসারত্যাগী এবং ভ্রাম্যমান এ চার ধরনের সাধক এ চার শব্দে আভাসিত (মুর্শিদাবাদজেলার)।

বৈষ্ণবান্দোলনের জাতিভেদ-বিরোধিতার তাত্ত্বিক ভাবনায় গড়ে ওঠে পাঁচ বৈষ্ণবগুরুর অনুসারী পঞ্চপরিবার বৈষ্ণব সমাজ। এরা বৈদিক আচারের বাইরে। পাঁচমিশালী জাত ও বর্ণ দিয়ে বৈষ্ণব সমাজ গঠিত হয়েছিল। আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই এদের চারটি বিভাগ খুট বা থাক। চতুর্বর্ণের প্রতিসাম্যে এরা নির্মিত। তথ্যসূত্র ঃ কালিপদ দাস বৈরাগ্য , ৫৯, আমাই-পাড়া, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

(৪১) The Bauls and the Islamic Traditions, the Sants. P.P.375

(৪২) বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদ সংখ্যা ৩৭৩, ৩৭৯, ৩৮৮, ৩৯৮, ৪১২ ঃ পৃ. ৮০৮-৮৩১।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ লালনের গানের খাতার সমস্যা ও পাঠান্তর।।

মুদ্রাযন্ত্র, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং মুদ্রা অর্থনীতির ব্যাপক প্রসারের ফলে ইংরেজ আমল থেকেই, আমাদের মৌখিক, মুখবাহিত এবং স্মৃতি রক্ষিত অনামা রচনাবলী লোকসাহিত্যের নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়। লালনের গানগুলি ইংরেজ আমলের রচনা। তখন মুদ্রাযন্ত্র এবং গ্রন্থস্বত্ব সমাজে সুপরিচিত। লালনের বন্ধু হরিনাথ মজুমদারের কুমারখালিতে ছাপাখানা ছিল। লালনের এবং অন্যান্য বাউল গান ব্যক্তিবিশেষের ভণিতাযুক্ত রচনা। বৈষ্ণব মহাজনবৃন্দ, শাক্ত পদকর্তা প্রমুখ রচনাকারগণের পদাঙ্ক অনুসরণে লালন ভণিতায় নিজ নামকে স্থাপন করেছেন। উপরন্তু লালনপন্থী সাধুসভায়, লালনের গানের কথাকে পরিবর্তন করা এক গর্হিত অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া মৌখিক রূপের সমান্তরালে হস্তলিখিত খাতায় লালনের গানের এক প্রামাণ্য রূপকে পাওয়া যায়। সুতরাং লালনের গানকে বা বাউল গানকে বিশুদ্ধ লোকসাহিত্য হিসাবে গণ্য করেননি আশুতোষ ভট্টাচার্য।[১]

কিন্তু লালনের রচনায় নানাবিধ লোকসাহিত্যের চরিত্রগুণ বর্তমান। প্রথমত এ গানের কোন গ্রন্থস্বত্ব নেই। দ্বিতীয়ত লালনপন্থী সাধুদের কোন কেন্দ্র বা কঠোর কর্তৃত্ব নেই। সাধকদের আপত্তি সত্ত্বেও গায়কেরা গানের শব্দ বা কলি পরিবর্তন করে অন্যের রচনা লালনের নামে চালায়, লালনের গানে অন্য ভণিতা দেখা দেয়। তৃতীয়ত লালনগীতির নেই কোন নির্দিষ্ট স্বরলিপি বা সুর। সুরের ক্ষেত্রে এক অনির্দিষ্টতা এগুলিকে লোকসঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছে। ব্যক্তি-নামাঙ্কিত রচনা ও হস্তলিখিত সঞ্চালন পদ্ধতির সমান্তরালে নমনীয় কর্তৃত্ব এবং সুরের স্বাধীনতার বিচারে লালনের রচনাবলীকে আমরা লিখিত শিষ্ট এবং লোকসাহিত্যের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে চাই।

মৌখিক ঐতিহ্যে, বাউল গানের আঞ্চলিক পাঠান্তরগুলিকে শুদ্ধাশুদ্ধ নির্বিচারে গ্রহণ করতে চেয়েছেন আবদুল হাই। কিন্তু লেখ্য রূপের অস্তিত্বহেতু, এ সমস্ত গানে পাঠ-বিকৃতির সমস্যা ও সম্পাদনার গুরুত্ব ব্যক্ত করেছেন তিনি।[২]

মধ্যযুগ থেকে মুসলমান সমাজে কোরাণের হস্তলিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগ থেকে বাউল-ফকির-বৈষ্ণবগণ গ্রন্থাদির নকল বা অনুলিখনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নানাধরনের পুঁথির লেখনীয়াদের সন্ধান পাই প্রাচীন যুগে। চৈতন্যদেব নিজস্ব লেখককে দিয়ে গ্রন্থাদির অনুলিপি করতেন।[৩] বহু সাধন-গ্রন্থ, বৈষ্ণব কড়চা, পদ-সংগ্রহাদি 'কলমী পুঁথি' নামে ব্যক্তিগত সংগ্রহে, আশ্রমে, আখড়ায়, গ্রন্থাগারে, সাহিত্য পরিষদে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। কীর্তনীয়াগণ হস্তলিখিত পদাবলী সংগ্রহ ব্যবহার করেন। বাউল গুরু, গায়ক পদকর্তাদের নিজস্ব হস্তলিখিত খাতা থাকে। অথবা শিক্ষিত কোন শিষ্য নিরক্ষর গুরু, পদকর্তার পদ লিখে রাখেন। অনেক গুরু প্রিয় শিষ্যদের স্বহস্ত-লিখিত গান ও তত্ত্বের খাতা উপহার দেন। বাঁকুড়ার নবাসন নিবাসী হরিপদ গোস্বামী বহুজনকে 'খাতা' উপহার দিয়েছেন।[৪] লালনের মতো গায়কেরা, যাঁরা গানের 'বাহাস' করেন, তাঁরা অবশ্যই হস্তলিখিত খাতা ব্যবহার করেন। সহযোগী কেউ খাতা থেকে গান বলে দেয় গায়ককে। গায়কদের গানের খাতারও 'পরম্পরা' থাকে এবং এ ধরনের খাতা মূল্যবান বলে চুরিও হয়। হারামণির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাউলগান শোনার সঙ্গে , 'তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি' বলে মন্তব্য করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ সমস্ত খাতা লালনের বা লালনপন্থীদের। রবীন্দ্রনাথের বাউলগান চর্চার উৎস এরকম হস্তলিখিত খাতা।

লালন নিজে লিখতে জানতেন কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তাঁর আখড়াবাসী শিষ্যদের অনেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা লিখে রাখতেন লালনের মুখরচিত পদাবলী। আমাদের আলোচ্য গানের খাতাটি লালনের দত্তকপুত্র ও জামাই ভোলাই সা ফকিরের। ভোলাই শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু পুঁথি লেখায় দক্ষ জনৈক জগৎ বিশ্বাসকে দিয়ে তিনি লালনের মূল খাতা থেকে ১২৯৯ সনে একটি নকল করান। অর্থাৎ লালনের নিজের একটি গানের খাতা ছিল। মৌখিক রূপের সমান্তরালে ছিল তাঁর গানের লেখ্য রূপ। বিভিন্ন গবেষক লালনের গানের খাতা নিয়ে লালনপন্থীদের বহু অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু লালনের মূল খাতা বা লালনগীতির 'প্রাচীন' কোন খাতা কেউ পাননি। হিতকারী পত্রিকার, লালন বিষয়ক নিবন্ধে, আখড়াবাসী পনের-ষোলজন লালনের শিষ্যের মধ্যে, "শীতল ও ভোলাই নামক দুই জনকে ইনি (লালন) ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন", বলা হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লালনের আখড়াবাসী শিষ্য 'শীতলের' উল্লেখ করেছেন।[৫] বসন্তকুমার পাল ছেউড়িয়ার আখড়ায় ভোলাই এবং পাঁচু সা-এর কাছ থেকে লালন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩২)। লালন গীতিকার অন্যতম সংগ্রাহক মতিলাল দাশ, ভোলাই-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছিলেন এইভাবে, "দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোন উত্তর পাই নাই।"[৬] অথচ ১৩১৬ সনের বঙ্গদর্শনে (৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) সুবোধচন্দ্র মজুমদার, 'গ্রাম্য সাহিত্য' নিবন্ধে ছেউড়িয়ার আশ্রমের খাতা থেকে পাঁচটি গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন।

লালনের ঘনিষ্ঠজনদের এবং লালনের আখড়ার 'কর্তৃপক্ষের'র দৃঢ় ধারণা ছিল যে রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের মূল খাতা নিয়ে চলে গেছেন। ১৯৩৬ সালে, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, লালনের আশ্রমে গান সংগ্রহের জন্য গিয়ে ভোলাই এবং অন্যদের সঙ্গে দেখা করলে, তাঁরা জানান যে "সাইজীর আসল খাতা শিলাইদহের রবিবাবু মশায় লইয়া গিয়াছেন।" ভোলাই, এতদঞ্চলের মুন্সেফ মতিলাল দাশের বিরুদ্ধে আশ্রমে রক্ষিত খাতা নিয়ে চলে যাওয়ার অভিযোগ জানান।[৭] জমিদার এবং মুন্সেফের বিরুদ্ধে নিঃস্ব আখড়াবাসী সাধকদের এ সমস্ত "অবিশ্বাস্য" অভিযোগে কৌতুক বোধ করেছেন উপেন্দ্রনাথ।[৮] কুষ্টিয়ার মহকুমা-শাসক এবং প্রখ্যাত লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে, হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানাথ মজুমদারের এবং লালনের শিষ্যবর্গ, লালন শাহের, "আসল পুঁথিখানি কবিগুরুর কাছ থেকে উদ্ধার করতে" আবেদন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।[৯] লালনের অনুগত শিষ্যদের অনেকের ধারণা ছিল যে কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি' রচনার মূলে, লালনের গানের খাতার সহায়তা ছিল। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন, "শিষ্যদের অনুযোগ তখনি আমার কানে এসেছিল যে, লালনের গানের খাতাখানি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গেছেন ও প্রার্থনা সত্ত্বেও ফেরৎ দিচ্ছেন না।"[১০] উপেন্দ্রনাথের মতো, অন্নদাশঙ্করও লালনপন্থীদের এ অভিযোগ প্রায় বাতিল করে দিয়েছেন। 'রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের গানের খাতা দু'টি, কোন কর্মচারীকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, লালনের আশ্রমের অশুদ্ধপাঠ খাতার নকল করে সংগ্রহ করেছেন,' উপেন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্তে অন্নদাশঙ্কর দ্বিমত করেননি।

একথা সর্বজনবিদিত যে ছেউড়িয়ার আশ্রমে লালন-পরিজনদের কারো কাছে, লালনগীতির কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নেই। ১৩১৬ সনে সুবোধ মজুমদার প্রাচীন খাতা থেকেই গান সংগ্রহ

করেছিলেন এবং লালনপন্থীদের কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেননি। আলোচ্য খাতাটি ১৩১৬ সন পর্যন্ত ছেউড়িয়ার ভোলাই-এর কাছে ছিল, তা প্রমাণিত হয় খাতার সর্বশেষ লিখিত তারিখ থেকে। এরপর থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভোলাই এবং অন্যদের অভিযোগ ধ্বনিত হতে থাকে। লালন-গীতির অর্বাচীন খাতা ছেউড়িয়ার মৌখিক সূত্র থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এ আশ্রমে, বা লালন-পরিজনদের কাছে লালনের কোন প্রামাণ্য পদ-সংগ্রহের পুঁথি ছিল না। ফলত লালন পদাবলী প্রকাশ করতে পারেননি লালনপন্থীরা। অথচ বাংলার দু'খণ্ডে অন্তত কুড়িটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করে ভদ্রলোকেরা কেউ বিত্ত, কেউ সম্মান লাভ করেছেন।[১১] লেখকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সঠিক পাঠের প্রামাণ্য উৎস। এ ধরনের পাণ্ডুলিপির অভাবে অন্য হস্তলিখিত এবং লেখক দ্বারা সংশোধিত বা অনুমোদিত পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা হয়। অন্যথায় লেখকের বাসস্থানের নিকটবর্তী অন্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণিকতার মর্যাদা দেয়া হয়।[১২]

লালনের গানের যে খাতাটি আমরা এখানে প্রাচীন লালনগীতির লেখ্য রূপের নিদর্শনরূপে তুলে ধরতে চাই সেটির মালিক ভোলাই সা। নাম, ঠিকানা, সন, তারিখ এবং শীতল সা, মানিক সা প্রভৃতি লালন-পরিজনদের নাম বা স্বাক্ষর এ খাতায় আছে। ভোলাই লালন সা দরবেশের তালেব হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি (১৮৪৫-১৯৪০) কুষ্টিয়ার উদিবাড়ি মজমপুর গ্রামের এক জোলা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফকিরি মতের মানুষ। ভোলাই দীক্ষা নিয়ে লালনের ছেউড়ে আখড়ায় স্থায়ীভাবে থেকে যান। শান্ত স্বভাব, গীতপ্রতিভা এবং সাধননিষ্ঠায় তিনি লালনের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। লালন তাঁকে পুত্রবৎ জ্ঞানে নিজ ধর্মকন্যা পিয়ারীর সঙ্গে বিবাহ দেন। লালনের মৃত্যুর পর 'ছোট ফকির' ভোলাই আখড়ার অন্যতম পরিচালক হন। তিনি পদকর্তা ও গুরু ছিলেন। কুষ্টিয়ার নানা অংশে তাঁর বহু শিষ্য ছিল। মৃত্যুর পর লালনের মাজারের বহির্দেশে তার সমাধি রচিত হয়। লালনের মূল খাতা থেকে ১২৯৯-তে শ্রী জগৎ বিশ্বাস এটি নকল করেন। সুতরাং (১) এ পাণ্ডুলিপিটি লালনের মূল খাতা থেকে লালন-পরিজনদের দ্বারা অনুলিখিত, (২) ভোলাই ও অন্যান্য লালন-পরিজন এ খাতা ব্যবহার করেছেন, (৩) মূল্যবান ও প্রামাণ্য বলেই শান্তিনিকেতনে এটি আনা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ এটি ব্যবহার করেন, (৪) সূচনা ও সমাপ্তিতে এবং অন্যত্র এতে সন-তারিখ আছে, (৫) খাতাটি ১২৯৯ থেকে ১৩১৬ পর্যন্ত লালনের আখড়ায় রক্ষিত ছিল ও ব্যবহৃত হয়েছিল, (৬) যাঁরা এটি নকল করিয়েছিলেন এবং করেছিলেন তাঁরা সবাই লালনপন্থী সাধক ও অভিজ্ঞ লেখনীয়া।

এ সমস্ত কারণে এ খাতা / পাণ্ডুলিপিকে লালনের লেখ্য গানের প্রামাণ্য নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা চলে।

পাণ্ডুলিপিটি ৯´´ ৫১/২´´ মাপের শক্ত পিচবোর্ড দিয়ে বাঁধানো; চার কোণা ও ধার চামড়া দিয়ে মোড়া। (মনে হয় এ বাঁধাই শান্তিনিকেতনের)। পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা সূচিত হয়েছে শ্রী[২] হক নাম দিয়ে; পাতার একাংশে ইংরাজিতে লিখিত :

Likhok Jogat Biswas, Kushtia; খাতার শেষাংশে এ নামটি দু'বার লেখা হয়েছে। বিভিন্ন হাতের লেখায় একাধিক বার কতগুলি নাম ও ঠিকানা ইংরাজিতে লিখিত হয়েছে : Valay Sha Darbesh, Bhalai Saha Fakir, Nalan Saha Fakir Taleb Voloy Sa

Fakir, Sital Saha Fakir, Darbesh Nalan Saha Fakir, Sauria, Khustia (Nadia) India, Johod box Biswas (Sauria, Kustia, India), Bilatali Biswas, P. O. Durgapur, Carbarir ghat Dt. Faridpur Via-Roybari. এছাড়া শেষদিকে লেখা God is good এবং The End (৩৬৯)। ১৩৪, ১৩৫ নং পদের শেষে ইংরাজিতে Bilatali-এর স্বাক্ষর আছে। ইংরাজিতে ভোলাই নামের একাধিক বানান লক্ষণীয়। আর বাংলায় এবং ইংরাজিতে পরিষ্কার লেখা হয়েছে নালন [Nalan]। মনে হয় লৌকিক উচ্চারণে নামটি নালনই ছিল; সংস্কৃতায়নে তা হয়েছে লালন। [অথবা ল<ন হবার ফলেও এটি ঘটতে পারে] পাণ্ডুলিপির শেষাংশ বাঁধানো নীলচে পাতায় পেন্সিলে লেখা M.S. of Baul Songs, rare (collected by Tagore?)

বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত ইংরাজি লেখা থেকে এর ভাষা ও ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। এ হাতের লেখা রবীন্দ্র-পরিবারভুক্ত কারো হতে পারে; যিনি এ পাণ্ডুলিপিকে মূল্যবান বলে সনাক্ত করেছেন; কিন্তু এটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত নন। রবীন্দ্রোত্তর কালে এ মন্তব্য সংযোজিত হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। এটি রবীন্দ্রপরিবারে কৃষ্ণ কৃপালনীর কাছে রক্ষিত ছিল এবং এ পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র ভবনে জমা দেয়া হয়নি / পড়েনি। বিনষ্টির হাত থেকে এটিকে রক্ষা করে শান্তিনিকেতনের এক শিল্পী এ পাণ্ডুলিপি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তিনি নামপ্রচারে অনিচ্ছুক; আত্মসর্বস্ব জগৎ থেকে দূরে, তাঁর অবস্থান। আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা তাঁকে জানাই। লেখক জগৎ বিশ্বাস হিন্দু না মুসলমান সমাজগত বলা কঠিন। আজমত শাহের মতে তিনি জগতাই কাপড়ের কলে কাজ করতেন এবং লালনের অনুগত।

পাণ্ডুলিপির সূচনায় ভোলাই-এর নাম, ঠিকানা এবং 'খাতার মালিক' হিসাবে পরিচয়ের পর ১২৯৯-এর ৯ই কার্ত্তিক তারিখ আছে। এবং এটি লালনের মূল খাতা থেকে অনুলিপি (নকল) করা এ ঘোষণার পর সমাপ্তির তারিখ ৭ই ফাল্গুন ১২৯৯ [প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য] । আমাদের মনে হয় যে মোরাকেবাটির পরে যে সমাপ্তি-তারিখ, তা আদিতে একই হস্তাক্ষর ৩৩৫ সংখ্যক গানের পর ছিল। তারপরে অন্য হাতের অন্য লেখা ও পরবর্তী তারিখগুলি ছিল। কিন্তু বাঁধানোর সময় পাণ্ডুলিপির রীতিতে গ্রন্থ-সূচনার তারিখ এবং গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এই কারণে পাণ্ডুলিপির মূল লেখক জগৎ বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি-তারিখের পরেও একাধিক হস্তাক্ষরে লালনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গান সংগৃহীত হয়েছে (১৩১৬ পর্যন্ত)। পাণ্ডুলিপির নানা স্থানে নাম, স্থান, মাস, সনের উল্লেখ পাওয়া যায় :

১৩০১, ছেউড়া (২৪৫ পৃঃ); ১৩০৩, ২৯শে শ্রাবণ (২৫৪ পৃ.) ; ১৩১০ ছেউড়া (২৬৬ পৃ.); ১৩১২ (শেষ পাতার পূর্বে) ; ১৩১৩; ১৩১৬, ১৯ শে পৌষ (৩৬৪ পৃ.); ১৩১৬, ২৮ শে পৌষ (৩৬৬, ৩৭০ পৃ.) অর্থাৎ ১৩১৬ সালের পৌষ মাস পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিটি ছেউড়িয়ার আখড়ায় ভোলাই-এর কাছে ছিল। এর পরে কোন এক সময় এটি রবীন্দ্রনাথের কাছে নীত হয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের বাউল গান সংগ্রহে অনেক গান নেই, যা প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু এ খাতাটিতে গানগুলি আছে এবং এখানকার পাঠ অনুসৃত হয়েছিল প্রবাসীর প্রকাশিত গানে। সুতরাং ১৩২২-এ প্রবাসীতে লালনগীতি প্রকাশের পূর্বে এ পাণ্ডুলিপি

রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হয়েছিল। এটি ছেঁউড়িয়াতে ফেরৎ যায়নি এবং আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল। পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনেও জমা ছিল। পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনেও জমা পড়েনি।

পাণ্ডুলিপির মালিক ভোলাই বাংলা ও ইংরাজি লিখতে জানতেন। এখানে তাঁর স্বাক্ষর এবং বিক্ষিপ্ত লেখা আছে। পাণ্ডুলিপির মূল লেখক জগৎ বিশ্বাস। এছাড়া আরো চার জনের চার ধরনের হস্তাক্ষর ভিন্ন কালিতে এখানে লেখা হয়েছে।

মূল লেখক জগৎ বিশ্বাস ১ থেকে ৩৩৫ পর্যন্ত গানগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে ১৭২, ১৭৩, ১৭৫-১৭৮, ১৮০-১৮২, ১৯৬-২০৪, ২৪৭, ২৫৪, ২৫৯, ২৫৯।।, ৩২১ পদে অন্য হস্তাক্ষর দেখা যায়। ২৬০ নং পদ এবং ২৮৫ পদের পরবর্তী সংখ্যাহীন মেহেরাজ বিষয়ক পদটি ভিন্ন জন ভিন্ন কালিতে লিখেছেন। ৩৩৫ নং পদের পর একটি শাদা পাতা, অতঃপর ৩৩৬ থেকে অন্য হাতের লেখা। ৩৩৭ থেকে ৩৭০ পর্যন্ত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন গানগুলি জগতের হস্তাক্ষর নয়। এর মধ্যে ৩৫২ ও ৩৫৩ পদে ভণিতা নেই এবং হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র। ৩৫৪-৩৬৭ মূলত একজনের লেখা। ৩৭০ নং পদের পর লেখা The end, তারপরে সংখ্যাহীন দুটি পদ; অতঃপর হাড় জোড়া লাগার একটি মন্ত্র এবং অন্য পাতায় কবিরাজী একটি ওষুধের তালিকা আছে। খাতা শেষ হয়েছে জগৎ বিশ্বাসের সর্বাপেক্ষা সুচারু হস্তাক্ষরে লিখিত 'মোরাকেবা' দিয়ে। এটি কোথা থেকে গৃহীত সে সূত্রও দেয়া আছে [অনুলিপি দ্রষ্টব্য]। মুরশীদের বাহ্যিক রূপ বা নক্সাকে যখন চোখ বন্ধ করে, শিষ্য দৃশ্যমান করে মনকে আবিষ্ট রাখে, সেই 'নেহারের' আনুসঙ্গিক প্রার্থনাগান এটি; লালনপন্থী সাধনার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিটি এই 'মোরাকেবায়' রয়েছে। মৌলানা আবদুর রহমানের 'গঞ্জরাজ' কেতাব থেকে এটি গৃহীত।[১৪]

এরপরে লালনের 'তালেব' ভোলাই শা ফকিরের স্বাক্ষর ও ইংরাজিতে ভোলাই, শীতল, মানিক, বিলাত আলী বিশ্বাসের নামোল্লেখ আছে।

জগৎ বিশ্বাসের মূল হস্তাক্ষরে পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্তির তারিখের (১২৯৯, ৭ই ফাল্গুন) পরেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লালনের গান সংগ্রহ করে (১৩১৬ পর্যন্ত) এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ লালনের সমস্ত গান এ খাতায় ছিল না এবং এর বাইরেও লালনের বহু গান আছে বা থাকতে পারে। লালন-শিষ্যগণ গান লিখতেন; তাদের গান রচনার চেষ্টার দু'একটি নিদর্শনও আছে পাণ্ডুলিপিতে। লালনের গান এ পাণ্ডুলিপির দ্বারা চূড়ান্ত সনাক্ত করা সমীচীন নয়। তাঁর দীর্ঘ জীবনে রচিত পদাবলী ৩৭০-এর অনেক বেশি ছিল। আর সেগুলি সনাক্ত করার মানদণ্ড আলাদা। পাণ্ডুলিপির শিরোনামে হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। রাম, কৃষ্ণ, হরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব 'নাম'জপ বা গানে স্মরিত হন; পাণ্ডুলিপিতে তাঁরা স্থান করে নিয়েছেন। [কিন্তু অ-বৈষ্ণব কোন নাম বা দেবতা এখানে স্থান পায়নি। বৈষ্ণবতার অতি ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ এগুলি]।

শ্রী$_২$ কৃষ্ণ, শ্রী$_২$ কৃষ্ণসার, শ্রী$_২$ রাম. শ্রী$_২$ বাম সার/সহায়, শ্রী$_২$ হরি; শ্রী$_২$ হরিসার/সহায় এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। খাতার শেষাংশে ভিন্ন হস্তাক্ষরে পাই শিরোদেশে ইসলামের শুভ সংখ্যা ৭৮৬ (৩৬৯-৩৭১ পদ /পৃষ্ঠা)। অন্যত্র পাওয়া যায় শ্রী$_২$ এলাহি সহায়/ভরসা, শ্রী$_২$ হবিব (সার), শ্রী$_২$ হক নাম (সার)।

লালন ছাড়াও অন্যান্য পদকর্তার কয়েকটি পদ এ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। যেমন :

(ক) নবীন গোঁসাই-এর পদ ১টি (৪২ নং, আমার মন পাখি আইজ);

(খ) নারাণ-এর পদ ১টি (২৬০, আমার হাল বোয়ে কাল গেল);

(গ) সিতু (লালনের শিষ্য) ১টি (২৪৭, আমি যে অপরাধী);

(ঘ) গোঁসাই গোপাল-এর পদ ১টি (২৫৬, কি কারখানা দেখে এলাম);

(ঙ) রামচন্দ্র (গুরু রামলাল)-এর পদ ১টি (২৫৮, সংসার বৃক্ষাৎ...);

(চ) মদন-এর পদ ১টি (৭২, নিচে পদ্দ উদয় জগোৎময়)।

এছাড়া ৩৫২, ২৬১, ২৫৪ প্রভৃতি কয়েকটি পদে ভণিতা নেই। আর কয়েকটি পদে ক্রম-সংখ্যা নেই। কিছু পদ দুবার; কোন পদ তিনবার খাতায় লেখা আছে। যেমন ১৮৫ (২৮৭, ২৯২), ৪০ (৩০২, ৩৩৭), ৬ (৫৪, ১৮০) প্রভৃতি। পরে দ্বিতীয়বার লিখিত পদের উপর/নীচে 'দোকায়' শব্দ দিয়ে পদগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কোন পদ প্রথমে অপূর্ণ; পরবর্তী পাঠে তার পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। যেমন ৪০ নং পদের পূর্ণ পাঠ পাই ৩০২ ও ৩০৭ নং পদে। একাধিকবার লিখিত পদে পাঠান্তর আছে; এজন্য দু/তিনটি পাঠই লিখে রাখা হয়েছে।

পদদ্বিত্ব এবং অন্যের রচিত ও ভণিতাহীন পদগুলি বাদ দিলে এ পাণ্ডুলিপিতে ৩১৭টি গান পাওয়া যায়। লালনের অজস্র গানের একটি প্রামাণ্য লেখ্য নমুনা হিসাবে এগুলি মূল্যবান।

গানের লিপি পুঁথির ঢঙে করা হয়েছে। ছেদ চিহ্ন হিসাবে ঃ; অর্ধকলির চিহ্ন (।) একদাড়ি; পূর্ণ কলি দুদাঁড়ি (।।) দিয়ে চিহ্নিত। আধুনিক ছেদ কমার ব্যবহার পাণ্ডুলিপিতে করা হয়েছে। নিজস্ব তৈবি কালিতে, সুন্দর হস্তাক্ষরে, গানগুলি আঞ্চলিক উচ্চারণভিত্তিক বানানে লেখা হয়েছে। মূল লিপিকার যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহারে তার ভ্রান্তি কম। ই কার, শ, স, ষ-এর ব্যবহার অত্যন্ত অস্থির। 'ণ' বা 'য'-এর ব্যবহার পুঁথিতে প্রায় নেই।

অনধিকারী বা অপহরণকারীর বিরুদ্ধে লেখক বিশেষ কতগুলি কৌশল ব্যবহার করেছেন পাণ্ডুলিপিতে।

১. শব্দান্তে ২ লিখে বাক্যের অংশবিশেষের দ্বিত্ব নির্দেশিত হয়েছে ভুলিব না৲ ভুলিব না, ভুলিব না।

২. রেফ কখনো রেফ; কখনো বর্ণদ্বিত্ব, কখনো-য-ফলা, য ফলা অর্ন (অন্য), আর্গেকারী (আজ্ঞে (গ্ন) কারী), পর্দ্দ (পদ্ম), মর্না, (মননা)।

৩. একটি ব্যঞ্জনে বা স্বরে একাধিক স্বর যোগ বা সমাক্ষর লোপ। দৌহাদি = দো হা ই দি (৩নং পদ); ওমী = ও তুমি (৩২ নং পদ); সবঙ্গে = সব অঙ্গে (২৫ নং পদ); হৈলে = হৈইলে; মেওা = মেওয়া। হাওাটি = হাওআটি, হাতে রতি = হাতের রতি (২১)।

৪. একটি স্বর/ব্যঞ্জনদ্বিত্ব করে পড়তে হবে

জাওজনা (২৩৪) = জাও ওজনা (যাও উজানে)

আক্রী (১১১) = আকৃতি (আক্রতী)

৫. উচ্চারণভিত্তিক যুক্ত-ব্যঞ্জন

দেখ্না = দেখ না (৬৪); করিষ্রে (১৪১) = করিস রে; পড়িষ্নে = পড়িস নে; মিষ্পে = মিশপে; মর্না = মন্না = মন না।

এ ধরনের কৌশল ব্যবহৃত হবার কারণে পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার আয়াসসাধ্য।

পাণ্ডুলিপির প্রথমার্ধে প্রতি পাতায় ১টি করে গান আছে; পরে একপাতায় একাধিক গান

পাই। কয়েকটি ক্ষেত্রে পদের পূর্বে বিষয়বস্তু নির্দেশিত হয়েছে; যেমন গোষ্ঠ (পদ, ২৪৯, ২৫০) ; ভেকের গাহান (২৫১)। একটি ক্ষেত্রে গীতপদ্ধতির নির্দেশ, 'প্রথম খাদ' পাই (১৮৩)। সংস্কৃত শ্লোক (৩০২), আরবী বয়েৎ বঙ্গাক্ষরে লেখা পাওয়া যায় (২৩৮)।

অনুলিপিতে মাঝে মাঝে শব্দ বাদ পড়ে গেছে; সেখানে '×' চিহ্ন দিয়ে শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। ভ্রান্ত শব্দ কেটে উপরে শুদ্ধ পাঠ লিখিত হয়েছে। [৫, ৭, ১০ (৭ম লাইনে, 'পতে' কেটে 'পথে' করা হয়েছে]। যেমন ১১ নং পদে 'ব্রথা', কেটে উপরে 'বৃথা'; ১২ নং পদে 'জম'-তে যুক্ত হয়েছে 'ন'। শেষ পংক্তিতে 'বেগ' সঙ্গে + দিয়ে 'রে' লেখা; ১৩ নং, পদ চিহ্ন দিয়ে, 'দেখনা মন পুঁথি পাঁজি সত্য কি মিথ্যা কহে'। ১৯ নং পদে × চিহ্ন দিয়ে 'ছিরাজ সাই......' ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে, এটি লেখকের হস্তাক্ষর। এই সংযোজন ও সংশোধনগুলি পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশে বেশি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এগুলি লেখকের; কিন্তু এতে আরও একাধিক হস্তাক্ষর থাকায় পাণ্ডুলিপিতে একাধিক পাঠকের হস্তক্ষেপ অনুমান করা যায়।

গানের ক্রমিক সংখ্যারও বিপর্যয় ঘটেছে; 'দোকায়' গানের ক্রমিক সংখ্যা কেটে দিয়ে পরবর্তী গানের ক্রমিক সংখ্যা সংশোধিত হয়েছে। (পদ ৩৩) এবং গানের ক্রমিক সংখ্যায় কাটাকুটি আছে। ক্রমিক সংখ্যা নেই, এমন পদ পূর্ব সংখ্যায় (খ) চিহ্নে আমি চিহ্নিত করেছি। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা ক্ষেত্রবিশেষে গানের ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ৪২ নং পদে একটি ছবি আঁকা এবং 'মহর' লেখা। অসম্পূর্ণ পদে চিহ্ন ×××× (৪০ নং)। সব দিক দিয়ে বিচার করলে পাণ্ডুলিপির প্রথম াংশে আধুনিক, সচেতন একাধিক হস্তক্ষেপ ঘটেছিল এতে সন্দেহ নেই। আব গোটা পাণ্ডুলিপিটির মূল অংশের পরে, একাধিকজন তাদের স্বাক্ষব, গান ইত্যাদি সংযোজিত করেছিলেন।

শব্দ বাদ পড়েছে ; কখনো দ্বিত্ব হয়েছে; কমার ব্যবহার মূল লেখকের কিনা তা সন্দেহযোগ্য; ছেদচিহ্নে কখনো কখনো বিপর্যয় ঘটেছে (ঃ।।>।।ঃ)। এতদ্‌সত্ত্বেও অনুলিপিটি অত্যন্ত সুলিখিত। শব্দ, অক্ষরের বাদ-পড়া বা চরণাংশের বিপর্যয় স্থানবিশেষে মূল লেখক সংশোধন করেছেন। একই গানের একাধিক পাঠান্তর সযত্নে এতে গৃহীত হয়েছে। অনুলিপিকার এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। লোপ বা বিপর্যয়ের ফলে এখানে গানের মূল কাঠামো বা অর্থের কোন গুরুতর পরিবর্তন ঘটেনি। বাদ চলে যাওয়া বর্ণ বা শব্দ অনায়াসে ধরা পড়ে। লালনপন্থী সাধক-গায়কেরা পদের শুদ্ধতা ও কলাবিভাগ রক্ষায় খুব সচেতন। সাধনার সঙ্গে অসম্পৃক্ত গায়কেরা অচলিত সাধন-সংক্রান্ত শব্দ অবোধ্য বিবেচনায় পালটে দেন। পণ্ডিতদের ভ্রান্তি আরও গুরুতর। যেমন লালনের 'আপ্তুতত্ত্ব' শব্দটিকে সমস্ত গবেষক, সংগ্রাহক 'আত্মতত্ত্ব'-এ সংশোধন করেছেন; যা অসঙ্গত। এ পাণ্ডুলিপির মালিক, লেখক, ব্যবহারকারীদের অনেকেই মূলত সাধনজগতের সঙ্গে যুক্ত লালনের আপনজন। এই কারণে এখানের পদগুলির প্রামাণিকতার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অনুলিপির সূচনায় আছে পর পর তিনটি গুরুবন্দনার পদ; সমাপ্তিতে পাই গুরু বর্জোক নেহারের 'মোরাকেবা'টি। অর্থাৎ এ পাণ্ডুলিপির সূচনা গুরুবন্দনায়; সমাপ্তি গুরু স্মরণে। এখানে বিষয়বস্তু বা পর্যায়বিভাগে বা প্রশ্নোত্তরী রীতিতে পদগুলি সজ্জিত হয়নি। রফিউদ্দীন ভাবসঙ্গীতে লালনের পদের পর্যায় ভাগ করেছেন যেমন, রাগ, দৈন্য, নবীপদ, প্রবর্ত্ত ইত্যাদি। জালাল গীতিকায় বিষয়বস্তু অনুযায়ী পদ-সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। সাধক-গায়কের খাতায়

পর্যায় এবং প্রশ্নোত্তরী রীতিতে (গুরুপদ/শিষ্যপদ বা উচ্চপদ/নীচপদ) পদসজ্জার রীতি থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত লালন গীতিকায় বিষয়ানুগ নামকরণ যেমন 'বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদ' পাই। হালে কেউ কেউ পদের শিরোনাম ব্যবহার করেন। পাণ্ডুলিপিতে এগুলি নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে বিশেষ পর্যায়ের একগুচ্ছ পদ প্রশ্নোত্তরী রীতিতে সাজানো দেখা যায়।

যেমন ফুলের পদ—১৯-২৪

মানুষতত্ত্ব—২৮-৪০, ৫৭-৬১

পদ্ম—৭০-৭৩

চোর—২১৩-২১৪

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ—৪৭-৪৯, ৮২-৮৫, ১৭০-১৭২, ৩০৪-৩২০

এগুলির মধ্যে ক্রম ও প্রশ্নোত্তরী রীতির অনুসরণ আছে। লালনের অধিকাংশ পদের মধ্যেই প্রশ্ন ও উত্তরের রীতি লুকিয়ে আছে।

লালনের গানে রাগ ও তালের নির্দেশ নেই (ফিকির চাঁদের গানে আছে)। রাগ, তাল ও গীতপদ্ধতি, এক্ষেত্রে, মৌখিক ঐতিহ্যের গুরুমুখী বিদ্যার অন্তর্গত। প্রাচীনপন্থীগণ মূলত একতারা ও প্রেমজুরী বাজিয়ে গান করতেন। লালন-উত্তরকালে অমূল্য সাহা নামে একজন আর্যাবর্ত থেকে মার্গসঙ্গীত ও ভক্তিসঙ্গীত শিখে আসেন। তিনিই গলায় ঝোলানো বাঁয়া, পায়ে নুপুর, ডানহাতে একতাবা নিয়ে গান করার আদি প্রবর্তক।[১৫]

এ অঞ্চলের কেউ কেউ দোতারা সহযোগে গান করেন। গুপীযন্ত্র, খঞ্জনী এবং বেহালা (শাঁসপুর, বীরভূমের গোলাম শা ও তাঁর সন্তান ও শিষ্যগণ) মূলত পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গের গায়কেরা ব্যবহার করেন। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত লালনের গানের লেখকের হস্তাক্ষর এবং আমাদের আলোচ্য পাণ্ডুলিপির মূল হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই সূত্র থেকে এ দুটি খাতা অনুলিখিত হয়নি—কারণ ক. সূচনার পদ সমাপ্তির পদ এবং মোট পদসংখ্যা দুটি ক্ষেত্রে দু'রকম; মোরাকেবা নেই রবীন্দ্র ভবনের খাতায়।

খ. একই পদের কলাবিভাগ, ভণিতা, শব্দের ক্রমেরও বহু পার্থক্য আছে।

তাই, খাতা দুটি দুই ভিন্ন সূত্র থেকে অনুলিখিত হয়েছে এমত সম্ভাবনাই যুক্তিপূর্ণ।

লালনের সুদীর্ঘ জীবনের নানা সময়কালে তাঁর গানগুলি রচিত। কিন্তু কালপর্বে গানগুলিকে বিন্যস্ত করার কোন সুযোগ নেই। ভাষাতাত্ত্বিক বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে পদবিশেষের রচনাকাল নির্ণয় করা যাবে না। তবে তাঁর কিছু কিছু পদে গুরু সিরাজ সাঁই-এর নাম নেই। মনে হয় দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে বা গুরুর প্রভাব তার জীবনে দৃঢ় হবার আগে এ পদগুলি রচিত হয়েছে। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে এ ধরনের পদ তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশে গুরুস্মরণহীন লালনের পদ পাই।

লালন গীতিকাগুলি, নিজে গান করার সূত্রে এবং বলাই-এর মতো সুকণ্ঠ গায়কদের জন্য রচিত হয়েছিল। ইসলামী ধর্মীয় বিতর্ক এবং বৈষ্ণব তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিচার—এ দুটি প্রধান সুরতরঙ্গ এ গানে পাই। এ থেকে বলা যেতে পারে যে হিন্দু ও মুসলমান এ দুই সমাজের শ্রোতার প্রতি গীতিকারের মনোযোগ ছিল। হিন্দুরা ছিলেন মূলত বৈষ্ণবভাবাপন্ন। বৈষ্ণব সমাজের ভেক এবং ফকিরী নেবার অনুষ্ঠানসঙ্গীত "ভেকের গাহান"। বৈষ্ণবদের প্রভাতী সঙ্গীত "গোষ্ঠ"—লালন গীতিকায় আছে।

লালনের গানগুলি সংক্ষিপ্ত। সাড়ে তিন; সাড়ে চার কলিতে তার অধিকাংশ পদ রচিত। প্রথম কলি, দু'টি ছোট চরণের সমাহার। ফলে ৫টি ছেদ তাঁর গানের কাঠামোয় পাওয়া যায়। এদিক থেকে এগুলি চর্যাপদের উত্তরাধিকার বহন করে। লালনের গানে সব কলিই গায়ক ধ্রুবপদ হিসাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে, নির্দিষ্ট কোন ধ্রুবপদ নেই। চর্যাপদ একই ধরনের সমধ্রুবা পদ্ধতিতে রচিত। চর্যার পরবর্তী যুগে বাউলগানেই এ ঐতিহ্য রক্ষিত আছে। চর্যার মতো পদান্তের ভণিতায় লালন আত্মপরিচয় দেন। চর্যার মতো লালনের গানও 'পঞ্চপদী'।[১৬] তবে এর চাইতে বড় বা ছোট অবয়বের গান চর্যাতে পাওয়া যায়; লালনেও আছে।

বানানের ক্ষেত্রে স্থির কোন নিয়ম পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না। একাধিক হস্তাক্ষরে বানানের রীতি ভিন্ন। যেমন কৈ/কহি কিন্তু ভিন্ন হস্তাক্ষরে (২০৪ পদ) কৌ। তাছাড়া একই হস্তাক্ষর ও পদে উচ্চারণভিত্তিক ভিন্ন বানান দেখা যায় :

ভেড়ো, বেড়ো (২০৫); ত্রীবিনে, ত্রীপীনে (২১৪), চাঁদ, চাদ, চান্দ (১৫৭, ১৬৫); শুক, শুখ (১৪২); কথা, কতা (১২৭); প্রম, প্রেম, প্রমী, প্রেমী, প্রিমী (১৮৩); বৈদিক, বৈদিগ; পত, পথ; মৎস্য, মতস্য, মতচ্য; রং, রঙ্গ; গোরাং, গৌরাঙ্গ (১৭০ নং পদ) প্রভৃতি। হৌ, কি, ক্রী, অক্ষরগুলি; খে্ত, ষে্ন প্রভৃতির ব্যবহারও দেখা যায়।

পরিবর্তনের অস্থিরতা, নব্য ভাষাদর্শের প্রভাব ও পাণ্ডুলিপির নেপথ্য ভূমিকা রচনা করেছে।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ লালনচর্চার ইতিহাস।।

হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় [১০ম ভাগ, ১৭দশ সংখ্যা, ভাদ্র ১ম সপ্তাহ, ১২৭৯, (১৮৭২ আগষ্ট পৃ. ৩] লালনের সর্বপ্রাচীন-উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময় লালন-সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হয়েছিল। লালনকে হরিনাথ কায়স্থ বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করে তিনি এক উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সূচিত করেছিলেন। পত্রিকার 'জাতি'বিষয়ক আলোচনায় লালন প্রসঙ্গটিকে আহসান চৌধুরী লালনের প্রতিকূল সমালোচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আমাদের এ আলোচনাটিকে লালনের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন বলে মনে হয় [লালন শাহ, পৃ. ৯৩]।

তাঁর ব্রহ্মাণ্ড বেদের (১ম ভাগ ১ম সংখ্যা; ৩য় ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) লালনের গানের প্রসঙ্গ আছে; ২য় ভাগ ১ম সংখ্যায় লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। হরিনাথের অপ্রকাশিত দিনলিপিতে বিপন্ন সময়ের বন্ধু লালনের উল্লেখ আছে। লালনচর্চার পথিকৃৎ কাঙাল হরিনাথ।

লালনের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় মৃত্যুর ১৪ দিন পরে হিতকরী পত্রিকার (১৫ কার্তিক, ১২৯৭, ১ম ভাগ, ১৩দশ সংখ্যা, পৃ. ১০০-০০১) সম্পাদকীয় 'মহাত্মা লালন ফকির'। কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী রাইচরণ দাস (১৮৫৯-১৯৩২) সম্ভবত এর রচয়িতা। উত্তরকালেও লালন-শিষ্যগণ এ জীবনীকে প্রামাণ্য মনে করতেন। রাইচরণ, মনের কথা অনেক কথা গ্রন্থেও লালনের আলোচনা করেছেন।[১৭]

১৩০২-এর ভাদ্র সংখ্যায় সরলাদেবী সম্পাদিত ভারতীতে তাঁর মন্তব্য, গীতসংগ্রহ এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র রচিত লালন জীবনী প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের তথ্যসূত্র কাঙাল ও তদীয় অনুসারীগণ। তিনি লালনকে হিন্দু-কুলজাত এবং অসুস্থ অবস্থায় পিতামাতা কর্তৃক

পরিত্যাগের তথ্য জানিয়েছেন। লালনের সঙ্গে তিনি .পরিচিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ছবি লালনকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন ইঙ্গিত এ রচনায় আছে। হিন্দু বা মুসলমানকে এবং নরনারীকে তিনি সমানাধিকার দিয়েছিলেন। সরলাদেবীর গান সংগ্রহের রীতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যশোহর জেলার শৈলকূপার সাব-রেজিস্ট্রার মৌলভী আবদুল ওয়ালী ১৮৯৮, ৩০শে নভেম্বর বোম্বাই-এর এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভায় এক নিবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনার অংশবিশেষ অশ্লীল বিবেচনায় বর্জিত হয়ে, ১৯০০ সালের পত্রিকায় 'On curious tenets and practices of a certain class of faqirs in Bengal নামে মুদ্রিত হয়। তিনিও লালনকে 'কায়স্থ' বলে চিহ্নিত করেন। লালন ও সিরাজের বাস, এ প্রবন্ধে, ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর বলে উল্লিখিত হয়েছে।

এছাড়া লালনের গান ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় দুর্গাদাস লাহিড়ির (১৮৫৮-১৯৩২) বাঙ্গালীর গান (১৩১২), অনাথকৃষ্ণ দেবের (—১৯১৯) বঙ্গের কবিতা (১৩১৮); কুমুদনাথ মল্লিকের (১৮৮০-১৯৩৮) নদীয়া কাহিনী (প্র. স. ১৩১৭) এবং শরৎকুমার লাহিড়ি ও বঙ্গের বর্তমান যুগ গ্রন্থে।

লালনচর্চায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসীর হারামণি বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ও আরো অনেকে অংশ নিয়েছিলেন (১৩২২)। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাউল নিবন্ধ' প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় (১৩৩৯ মাঘ, ফাল্গুন)।

কাঙালের ছাত্র জলধর সেন 'কাঙাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড, ১৩২০) গ্রন্থে লালনের গান ও প্রত্যক্ষ পরিচয়ের স্মৃতি বিবৃত করেছেন। হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানাথ মজুমদার লালনের গান সংগ্রহ করেন, নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। সবগুলি অমুদ্রিত। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ গবেষক তাঁর সংগৃহীত উপাদান ব্যবহার করেছেন। ভোলানাথের পুত্র নীলরতন মজুমদার পিতার সংগ্রহের সাহায্যে দীপিকা পত্রিকায় (৪, ১৫ ও ৩২ আষাঢ়, ১৩৩৯) 'ফকির লালন সাঁই' প্রবন্ধ লেখেন। একই সূত্র ব্যবহার করে বিশ্বনাথ মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৯/৪/১৯৪১) 'লালন ফকিব' নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

বসন্তকুমার পাল লালনের জন্মস্থানেরই বাসিন্দা এবং বাউল-ফকির পরিমণ্ডলের অন্তরঙ্গ মানুষ। ক্ষেত্র-সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রবাসীতে লালনকে নিয়ে তিনি দুটি প্রবন্ধ লেখেন (শ্রাবণ ১৩৩২ ও বৈশাখ ১৩৩৫)। পরবর্তীকালে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ, 'মহাত্মা লালন ফকির' প্রকাশিত হয় ১৩৬২-তে। এই গ্রন্থে লালনের পদের ব্যাখ্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। লালনের গান ও জীবন নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন মহম্মদ মনসুরউদ্দীন। তাঁর সংগৃহীত লালন গীতিই সর্বাধিক। হারামণি গ্রন্থ ছাড়াও লালন ফকিরের গান নামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর সংগৃহীত বেশ কিছু লালনগীতি মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে হারামণি (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে স্থান পায়।

মনসুরউদ্দীনের সংগ্রহ বিজ্ঞানসম্মত নয়। তদুপরি উত্তর-পাকিস্তান পর্বের সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রভাব থেকেও তিনি মুক্ত নন। কবি জসীমুদ্দীন একদা বাউলগান সংগ্রহ করেছিলেন এবং বঙ্গবাণীতে 'লালন ফকির' (১৩৩৩, শ্রাবণ সংখ্যা) নামে এক নিবন্ধ লেখেন।

সাধক পাঞ্জু শাহের পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দীন 'ভাবসঙ্গীত' (২য় সং, ৭ই আষাঢ়, ১৩৭৪,

হরিশপুর, সাধুগঞ্জ, যশোহর, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৫) গ্রন্থে লালনের ৫৩৪টি গান আছে। গ্রন্থে তিনি লালনকে মুসলিম বংশজাত এবং হরিশপুরের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাঁর লেখা একাধিক নিবন্ধ আছে। বহু গবেষক রফিউদ্দীনের তথ্য ব্যবহার করেছেন। সাধক ও বাউল-গায়কদের মধ্যে প্রায় সকলে ভাবসঙ্গীত গ্রন্থটি ব্যবহার করেন।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খোন্দকার রিয়াজুল হক লালনের জীবনী নিয়ে পাক সমাচার (১৯৫৭, ৫ই এপ্রিল) ও দৈনিক ইত্তেফাকে (১৩৬৬, ১৩ই ভাদ্র) নিবন্ধ লেখেন। [ভাবসঙ্গীত, ফকির লালন শাহ্, পৃ. ৩]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'লালন সাহিত্য ও দর্শন' (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬)। এখানে 'বাংলা সাহিত্যে লালন শাহের উত্তরাধিকার' নামে তাঁর একটি সুলিখিত রচনা আছে। লালনগীতির গ্রন্থ 'লালন সংগীত চয়ন' (১৯৮৯, ঢাকা) তিনি প্রকাশ করেছেন।

লালনের গান সংগ্রহে ও লালনচর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ড. মতিলাল দাসের। কুষ্টিয়ায় মুন্সেফ থাকাকালীন লালনের আখড়া ও ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের কাছ থেকে তিনি প্রায় ছয় শত লালন গীতি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৩৫১-এর বসুমতী, শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধের নাম ছিল 'লালন ফকিরের গান'। উত্তরকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত লালন গীতিকায় তাঁর সংগ্রহ গৃহীত হয়। কিন্তু তাঁর সংগৃহীত সমস্ত লালনগীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগেও পাওয়া যায় না।

বাউল ও লালনচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থের ১ম সংস্করণ ১৫০টি, ২য় সংস্করণে মোট ২১০টি লালন গীত সংগ্রহ করেন। (১ম সং, ১৩৬৪)। তথ্যসূত্রে নিপুণ ও রীতিসচেতন গবেষক উপেন্দ্রনাথ কিন্তু লালন-জীবনের কোন নতুন তথ্য দিতে পারেননি! তাঁর গানের সম্পাদনায় নিরক্ষর গায়ক/গীতিকারদের প্রতি এক অবজ্ঞাসূচক মনোভাব কাজ করেছে।

উমেশচন্দ্র বটব্যালের 'বাউল পদ্ধতি' নামে এক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন মনসুরউদ্দীন হারামণি (৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩)। বাউল নিয়ে ঐতিহাসিক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত মূল্যবান এক নিবন্ধ রচনা করেছেন, ('The Bauls and the Pasupatas J. N. Banerjee volume, the Alumni association, Dept, of Ancient Indian History and Culture. C. U..1960)। এখানে অনেক নূতন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে।

প্রখ্যাত লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় জেলাশাসক হিসাবে কুষ্টিয়ার লালনপন্থীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বহু লালনপন্থী সাধক এবং গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগের ফসল তাঁর 'লালন ও তাঁর গান' গ্রন্থটি। নির্বাচিত লালন গীতির অবশ্য তথ্যসূত্র ও সম্পাদনার রীতি বিবৃত হয়নি। বাউলদের নানা আর্থ-সাংস্কৃতির তথ্য এ গ্রন্থে আছে। ঐতিহ্যবাহিত মানবতার আলোকে তিনি লালনের গুরুত্ব নির্ণয় করেছেন। সাহিত্য-সেবক জসীমুদ্দীন ছাড়াও নদীয়া-নাগরিক কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লালন বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করেছেন (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩১)।

লালনচর্চার বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ছিলেন উপেন্দ্রনাথের গবেষণার অন্যতম সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জীবন নিয়ে, লালন, গগন, সর্বক্ষেপী বৈষ্ণবী, গোঁসাই গোপালকে নিয়ে তাঁর নিবন্ধ আছে। লালনের জীবন অবলম্বনে নাটক রচনার ও চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। প্রামাণিক তথ্য লেখায় তিনি কম ব্যবহার করেন, কিংবদন্তীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত।

লালন গীতিকার ভূমিকায় এবং Obscure Religious cult গ্রন্থে বাউল এবং লালন নিয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ড. সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র গুপ্ত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লালন প্রসঙ্গে নানা মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। উত্তরা পত্রিকায় প্রবোধচন্দ্র বাগচী বাউল বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। লালনের তত্ত্বদর্শনের উপর ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা করেচেন ড. পলাশ মিত্র। তাঁর গবেষণা নিবন্ধটি অপ্রকাশিত। বাউল বিষয়ক নানা মূল্যবান মন্তব্য আছে ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থে। বর্তমান লেখকের, মুর্শিদাবাদ জেলার বস্তুবাদী মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ের সমাজ, দর্শন ও সাহিত্য, গবেষণাগ্রন্থটিও 'বস্তুবাদী বাউল' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থাবলীতে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং নানা সময়ের লেখায় বিনয় ঘোষ লালন সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এছাড়া ড. অরুণ বসু, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদক, লালন স্মরণিক, ১৯৭৬), রণজিৎ কুমার সেন, চিত্তরঞ্জন দেব, মোহিত রায়, ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী, ড. দুলাল চৌধুরী, সুনীতিকুমার পাঠক, ড. পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখ লালন বিষয়ক নানা নিবন্ধ রচনা করেছেন। সুশান্ত হালদার (কদমখালি, ভীমপুর, নদীয়া) সম্পাদনা করেছেন এক স্মারকগ্রন্থ (১৯৯০)। প্রতি বছর এখানে লালন মেলা হয় এবং সে উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থগুলি বিশিষ্ট।[১৮]

ড. সনৎকুমার মিত্র, লালন ফকির : কবি ও কাব্য, গ্রন্থে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত গানগুলি মুদ্রিত করে ভূমিকায় লালনের ছবির উপর তিনি কিছু আলোকপাত করেছেন। ড. তৃপ্তি ব্রহ্মের লালন পরিক্রমা (১৩৯৩, কলকাতা), বিভিন্ন গবেষকের রচনার সার-সংক্ষেপ। সুবোধ চক্রবর্তীর, বাংলার বাউল ও লালন ফকির (কলকাতা, ১৩৯১) এবং ড. শান্তিময় ঘোষালের লালন ফকির (১৩৯৩) গ্রন্থে নেই কোন মৌলিক তথ্য বা গভীর বিশ্লেষণ। ভীমপুরের লালন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী স্বপন বিশ্বাস রচনা করেছেন লালনের সাঁইজী (অনুদাস ছদ্মনাম; নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯২)। বৈষ্ণব তত্ত্বের আলোকে এখানে লালনপন্থা চিত্রিত। গ্রন্থটির দেহতাত্ত্বিক চিত্রগুলি বিশিষ্ট। ড. সুধীর চক্রবর্তীর 'ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির' (চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯৯১-৯২) গ্রন্থটি প্রচলিত মত ও তথ্যের উপর লেখকের টীকাভাষ্য।

লালনের ঘটনাবহুল জীবন আকর্ষণ করেছে ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের। রণজিৎ কুমার সেনের বাউলরাজা (কলকাতা, ১৩৭৩) লালন-জীবনভিত্তিক উপন্যাস। তিনি এটিকে নাট্যকার রূপও দিয়েছিলেন। সমকালীন দেশ ও কালের জটিল কোন আবর্তে এ রচনা অনন্য হয়নি। পরেশ ভট্টাচার্যের বাউল রাজার প্রেম (কলকাতা, ১৯৮৬) গতানুগতিক গল্পপ্রধান গ্রন্থ।

লালন-জীবনকে নাট্যরূপ দিয়েছেন আসকার ইবনে শাইখ, ঢাকা থেকে ১৯৬৯-এ লালন ফকীর নাটকে। ঢাকা থেকে ১৯৭৭-এ কল্যাণ মিত্র লালন ফকির নামে এক নাটক প্রকাশ করেন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় গুরুত্বপূর্ণ নাটক লিখেছেন, লালন ফকির (১৩৭৮, কলকাতা) নামে। এটি জনসাধারণ্যে অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছে। কলকাতা থেকে লালনকে নিয়ে আর এক নাট্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ নাথ : সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির (১৩৭৯, ডায়মণ্ড লাইব্রেরি)।

লালনের গান ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন Religion of man -এ রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলার বাউল গ্রন্থানুবাদ সূত্রে এবং অন্যত্র লালনের গানের ইংরাজি অনুবাদ করেছেন লীলা রায়। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি থেকে আবু রুশদের লালন গীতির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-তে Songs of Lalan Shah. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের লালনের ইংরাজি অনুবাদ-গ্রন্থ Folk song of Lalan Shah ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। M. Mizanur Rahaman -এর অনুবাদ গ্রন্থ Myriad–Lalon's song (Dhaka, 1987) লালনেব ইংরাজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশ করেছেন Brother James : Songs of Lalan (Dhaka, 1987)। এর মধ্যে আবু রুশদের অনুবাদগুলি তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের। সাম্প্রতিক কালে আমেরিকান গবেষক ক্যারল সলোমন লালনের গানের ইংরাজি অনুবাদকর্মে মনোযোগ দিয়েছেন। লালনের কিছু গানকে গবেষণার সূত্রে অনুবাদ করেছেন S.O.A.S. -এর গবেষক জান ওপেন শ'। ডিমক বেশ কিছু বাউল গানের অনুবাদ করেছেন তাঁর গবেষণাগ্রন্থ The Place of the hidden moon (U. S. A. 1966, PP 249)এ।

UNESCO-এর ভারতীয় গ্রন্থমালা সিরিজে লালন প্রমুখ বাউলগানের ইংরাজি অনুবাদ করেছেন দেবেন ভট্টাচার্য The mirror in the sky (London, 1969) গ্রন্থে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং মেরি অ্যান দাশগুপ্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ অনুবাদগ্রন্থ হলো The roots in void, Bauls of Bengal (K. P. Bagchi, Càlcutta, 1977) এ গ্রন্থে লালনসহ অন্যান্য বাউলগান অনূদিত হয়েছে। লালন ও অন্যান্য বাউলগানের ইংরাজি অনুবাদ করেছেন সুরথচন্দ্র চক্রবর্তী (Baul : The spiritual vikings); শ্রী অনির্বাণ (letters from a Baul : Life within life, Calcutta, 1983), প্রণব ব্যানার্জি (Bauls of Bengal, Firrma KLM Pvt Ltd, Calcutta, 1987/89), পৃথ্বীন্দ্র মুখার্জি লালন এবং অন্যান্য বাউলগানের যুগপৎ ইংরাজি ও ফরাসি অনুবাদ করেছেন, Chant Baul (editions Findakly, Paris, 1985) গ্রন্থে। নানা সূত্রে লালনসহ অন্যান্য বাউলগানের ইংরাজি অনুবাদ করেছেন রাজেশ্বরী দত্ত (পরে নিবন্ধটির উল্লেখ আছে), সনৎ কুমার বসু (Baul songs of Bengal, Folk Music and folklore, An anthology, Calcutta, 1967), পীযুষকান্তি মহাপাত্র (Folklore, April to September, 1971, edited by S. Sengupta Calcutta), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Baul songs of Bengal, Calcutta, 1976), Charles H. Capwell (The esoteric belife of the Bauls of Bengal, JAS, Feb. 1974, NO LXXXIII, No. 2), দীপক মজুমদার এবং Gaston Roberge (The Bauls : Communicators and Artists, National journal of Performing Arts of Bombay, 1979) [১৯] লালনের গানের এসমস্ত অনুবাদে নানা সমস্যা আছে ভাষান্তরের। কিন্তু এর মাধ্যমে লালন বিষয়ে বহির্বঙ্গের প্রবল এক আগ্রহকে চিহ্নিত করা যায়। এই মহান লোকশিল্পী সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। লালন বিষয়ক গ্রন্থ ও গবেষণাগুলি এর অন্যতর প্রমাণ।

লালন তথা বাউল-গবেষণায় তিনজন বিদেশী গবেষক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ক্যারল সলোমন, (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা) দীর্ঘদিন থেকে লালনের গান ও সাধকদের কাছে গানের ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে সেগুলি অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। ইতিমধ্যে

তাঁর গবেষণা নিবন্ধ Cosmogonic Riddles of Lalan Fakir (Gender, genre and power in south Asian expressive Tradition, edited by Arjun Appadurai, et al, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, U.S.A. 1991, pp 267-304) প্রকাশিত হয়েছে। এ নিবন্ধে গভীর কোন বিশ্লেষণ নেই। জার্মানির হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রাহুল পিটার দাস (Rahul Peter Das) অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা নিবন্ধ, Problematic aspects of the sexual rituals of the Bauls of Bengal (journal of the American Oriental Society 112.3 (1992), pp 388-432) প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের লালনপন্থীদের মধ্য থেকেও তিনি তথ্য নিয়েছেন। সাধনরাজ্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন দাস। এ ধরনের বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ অতি অল্পই রচিত হয়েছে। কিন্তু সাধনদেশে যে অনেক বৈচিত্র্য ও মতভেদ, আছে তার কোন বিবরণ রাহুল দেননি। নিবন্ধটির শেষে প্রদত্ত গ্রন্থতালিকাটি খুবই আকর্ষণীয়। এছাড়া 'লালন ফকিরের জন্ম কোন্ ধর্মসম্প্রদায়ে' (১৯৮২, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৮৮, পৃ. ১৮২-১৮৪) রাহুল পিটার দাসের অন্যতম নিবন্ধ।

Charles Capwell ক্ষেত্র-গবেষণার ভিত্তিতে রচনা করেছেন The esoteric Belief of the Bauls (JAS, Vol.33, No. 2, 1974) এবং The Music of the Bauls of Bengal (Kent, ohio the kent state university press, 1986)। এখানে গ্রন্থকার মূলত বাউলসাধনা এবং গানের সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণ করেছেন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, লালনাদির গানের ইংরাজী অনুবাদ A Book of Bengali verse (India publication, Calcutta, 1969) প্রকাশ করেছিলেন।

সাম্প্রতিক কালে দীর্ঘ ক্ষেত্র-গবেষণার পর জান ওপেন শ' [Jeanne Open shaw] তার পি. এইচ. ডি.-এর জন্য মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ, Bauls of West Bengal : with special .eferrence to RajKhyapa and his followers 1993), রচনা করেছেন। বিদেশীদের বাউল-চর্চায় জানের গবেষণা নূতন মাত্রা যুক্ত করবে। তার গ্রন্থটি Seeking Bauls of Bengal নামে প্রকাশিত হয়েছে।

লালনের আখড়া, জন্মভূমি ও অনুগামীদের বড় অংশটি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৩ সালে ছোউড়িয়ায় স্থাপিত হয় লালন একাডেমি নামে এক গবেষণাকেন্দ্র। কিন্তু সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণায় এ কেন্দ্র কোন অবদান রাখেনি। পাকিস্তান আমলে লালনকে 'ইসলামীকরণের' এক প্রচেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। নিজামুদ্দীন চিস্তির সমাধির অনুকরণে নির্মিত হয় লালনের মাজারগৃহ। ভাষা-আন্দোলন এবং নতুন বাংলাদেশের জন্মের আন্দোলনে লালনগোষ্ঠী বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দেশবিভাগের কালে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে লালনচর্চার ত্রিধারা। প্রথম ধারাটি হলো মুক্তবুদ্ধির মননশীল গবেষণা। দ্বিতীয় ধারাটি সচেতনভাবে লালনকে ইসলামী ও সুফী পরিমণ্ডলভুক্ত করে, তার জীবনকথার পুনর্বিন্যাস করেছে। তৃতীয় ধারাটি লালনের জনপ্রিয়তার কারণে গান, জীবনী প্রভৃতির জাল রচনা সৃষ্টি করেছে। গবেষকগণ অসত্য তথ্য প্রমাণের জন্য অনেক জাল 'লালনপন্থী'কর্তৃত্ব তৈরি করেছেন।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ ছাড়াও ড. আনোয়ারুল লালন বিষয়ক একাধিক

গ্রন্থকর্তা। বাউলকবি লালন শাহ (১৯৬৩, ঢাকা) ফকির লালন শাহ (ঢাকা, ১৩৮২), The Bauls of Bangladesh (1980), রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ (১৯৭৭), লালনের গান (১৯৮৪) প্রভৃতি গ্রন্থ সর্বজন পরিচিত। ১৯৬৬-তে তিনি সম্পাদনা করেছিলেন লালনগীতি। মৌলিক তথ্য, গভীর বিশ্লেষণ নেই করীমের রচনায়; উপরন্তু লালনকে সুফী ও মুসলমান প্রতিপন্ন করতে গিয়ে করীমের স্ববিরোধিতা প্রকট হয়েছে।

মহম্মদ আবু তালিব লালনের প্রবীণ গবেষক ও নানা নিবন্ধ রচয়িতা। লালন পরিচিতি (১৯৬৮) ও লালনগীতিকা (২ খণ্ড, ১৯৬৮) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। গানের সম্পাদনা তাঁর সুচারু, কিন্তু দুদ্দুর নামের জাল লালনজীবনী এবং জাল এক জমির দলিল দিয়ে লালন-জীবনের পুনর্বিন্যাস স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত। নদীয়া জেলার চর ব্রহ্মপুরে প্রাপ্ত দুদ্দুরচিতলালন-জীবনীটির সরবরাহক ঢাকার বাংলা একাডেমির সংগ্রাহক লতিফ আফী আনহু। ইনি স্বঘোষিত, বাংলাদেশের বাউলদের সেক্রেটারি বটে!

এস. এম. লুৎফর রহমান রচনা করেছেন, লালন শাহ : জীবন ও গান (১৯৮৩), লালন জিজ্ঞাসা (১৯৮৪), সম্পাদনা করেছেন—লালন গীতিচয়ন (১৯৮৫)। পূর্বোক্ত লতিফ সাহেবের জাল তথ্যগুলিকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন লুৎফর রহমান।

এ.এইচ.এম. ইমামউদ্দীনের বাউল মতবাদ ও ইসলাম (১৯৬৯) গুরুত্বপূর্ণ রচনা। উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে ম. মনিরুজ্জামানের লালন জীবনী ও সমস্যা (১৯৭৮) এবং সম্পাদিত লালন ফকিরের গান (১৯৯৩)-এর নাম করা যায়।

প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক আবদুল হাই হারামণির ৫ম খণ্ডটি সম্পাদনা করে এক মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন (১৩৬৮)। মনসুরউদ্দীন লালনগীতি সংগ্রহ (২৯০টি) প্রকাশ করেছেন সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় (বর্ষা, ১৩৬৫)। এছাড়া তাঁর মূল্যবান এক নিবন্ধ লালন শাহ ফকীর (সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৬৫)।

আহামদ শরীফের লালন শাহ (বিচিত্র চিন্তা, ১৯৬৮) এবং বাউলতত্ত্ব (১৯৭৩) গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদনা করেছেন লালন স্মারক-গ্রন্থ (১৯৭৪); তাঁর রচিত কুষ্টিয়ার বাউল সাধক (১৯৭৪), বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত লালন শাহ্ (১৯৯০) তথ্যপূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ রচনা। এছাড়া মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আশারফ সিদ্দিকী, ওয়াকিল আহাম্মদ, রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী, মোমেন চৌধুরী, আবু জাফর, মো. সোলায়মান আলী সরকার, মযহারুল ইসলাম, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল লালন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য নিবন্ধাদি রচনা করেছেন। বাংলাদেশের জন্মের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের আলোকে লালন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছেন। তাই বাংলাদেশের লালনচর্চার মননশীলতা ও গভীরতা অধিকতর।

আবুল আহসান চৌধুরী এবং অন্য গবেষকরা লালনকে নিয়ে মৌলিক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, যাত্রা, পুতুলনাচ, সিনেমা, গীতসংগ্রহ, গানের ক্যাসেট ও রেকর্ডাদির যে তালিকা দিয়েছেন[২০] তা থেকে মৃত্যুর শতবর্ষ পরেও জনচিত্তে লালনের প্রভাবের শ্রীবৃদ্ধি চিহ্নিত করা যায়। দু'বঙ্গে লালনকে নিয়ে একাধিক সিনেমা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের হাসান ইমামের তথ্যচিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ভদ্রলোক, ঠাকুরবাড়ি, রবীন্দ্রনাথ এবং লালন।।

উনিশ শতকের শেষার্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতীয় জনজীবনের উপর তার শোষণ-জালকে প্রসারিত করেছিল। এবং সহযোগী সামন্ত ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। মধ্যবিত্তের মনে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধছিল; পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে মনে হচ্ছিল না 'জ্ঞানের মশাল'; বরং রবীন্দ্রনাথের মতো তরুণেরাও এ অগ্নিতে নিজেদের গৃহদাহ চিহ্নিত করেছিলেন।[২১] সেকালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা কংগ্রেস, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের পথ দেখাতে পারছিল না। ইংরেজি উদারনৈতিক সংস্কৃতির অভিঘাতে সৃষ্ট বঙ্গের সংস্কার-আন্দোলন এবং সামাজিক প্রগতির ধারা রুদ্ধ ও শুষ্ক হয়ে যায়। ব্রাহ্মধর্মে দেখা দেয় উপদলীয় কলহ; সাময়িক ব্যর্থতার বোঝা বহন করতে করতে বিদ্যাসাগর হয়ে যান নিঃসঙ্গ। গ্রাম ও গ্রামীণ সংস্কৃতি উপেক্ষিত হয়েছিল হুতুম পেঁচার নক্সায়, ব্রাহ্ম-সংস্কৃত রুচিতে। ইংরাজি শিক্ষা মধ্যশ্রেণীকে ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। হতাশার আলোহীন এ সময়ে, "During hiatus between two dominant myths, there could be among some a turning away from social activism toward moods of introspection, passivity, nostalgia for the countryside, almost a child or womb-reversion."[২২] এ প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্তের বঙ্গভাষার প্রতি সনেটটি স্মরণীয়। মহাকাব্যিক আদর্শের অমর মহাকাব্য রচনা মধুসূদন করতে পারেননি। তাঁর কবিতায় দেখা দিয়েছিল বিষাদ ও অতীতস্মৃতির গীতিপ্রবণতা। এপিক রীতি পরিত্যাগ করে বিহারীলাল জটিল আত্মকথনের আবেগকে বাংলা কবিতায় রূপ দিলেন। অন্তর্নিবিষ্ট আবেগবাহুল্যে তিনি বাউল হিসাবে নিজেকে কল্পনা করে লিখলেন বাউল বিংশতি। কিশোর রবীন্দ্রনাথ কাব্যগুরু বিহারীলালের (১৮৩৫-১৮৯৪) সূত্রেই বাউল ভাবনার উত্তরাধিকার লাভ করেন।

এদেশের গ্রামাঞ্চলে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ঘটার ফলে ১৮৮০ থেকে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত (১৯০৫) কলকাতা এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান থেকে বাউল গীতিসংকলন প্রকাশিত হয়। শতকের আটের দশকে পাই ৩১টি বাউল গানের সংকলন। অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকৃতি, ১০/১২টি গান ছাপিয়ে নিজেদের নামকে মুদ্রিত দেখার বাসনায় এগুলি রচিত হয়। এর মধ্যে সর্বাধিক মুদ্রিতপদ ফিকিরচাঁদের (১০টিখণ্ড,১৮৮৫)। গীতিকারদের মধ্যে মুসলমান, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈরাগী সকলেই আছেন। চর্যাপদের সমকাল থেকে বাউলপন্থা ও গান নিম্নবর্গের সমাজে প্রচলিত থাকলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে উচ্চবর্গের শিক্ষিত মানুষদের বাউল বিষয়টি ক্রমশ মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকে।[২৩] অনেকে আলোচ্য বাউল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের 'সখের বাউল'[২৪] অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষমাত্রকেই 'সখের বাউল' বলা চলে না। গোঁসাই গোপাল, লালন, হাউড়ে (মতিলাল সান্যাল), দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মানুষরাই বাউল পদাবলীর স্বীকৃত মহাজন। অবশ্য এরা সবাই উচ্চবর্ণের শ্রেণী ও সাংস্কৃতিক অবস্থান পরিত্যাগ করেছিলেন। বাউল অভিধার অন্তরালে বহু উচ্চবর্ণের নিম্নবর্গীয় মানুষকে আবিষ্কার করা যায়। একান্ত ব্যক্তিগত গোপন এ সাধনা যে কোন ধর্ম বা বর্ণের মানুষের কাছে অবারিত দ্বার। সুতরাং যথেষ্ট ব্যক্তিগত তথ্য ও প্রমাণ ব্যতীত কাউকে সখের বাউল বলা সঙ্গত নয়। বরং গানগুলি বিচার করে সহজে সনাক্ত করা যায় যে গীতিকার বাউল-সাধনার ভিতরের না বাইরের লোক। হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদকে

(১৮৩৩-১৮৯৬) গানের সাক্ষ্যে সখের বাউল বলা চলে না। আধুনিক কালে আদর্শবাদী শিক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে তিনি বাউল সাধনা ও গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চরিত্রাদর্শে মুগ্ধ হয়ে বহু শিক্ষিত তরুণ বাউলদলে গোগ দিয়েছিল।[২৫] জলধর সেনের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিরা ছিল তাঁর শিষ্যস্থানীয়।

শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্রসাধনপীঠ বরিশালে জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। ১৮৮৪ সাল নাগাদ সেখানে ভারতগীতি নামে এক গীত সংকলন প্রকাশিত হয়। অশ্বিনীকুমার লোকগীতিকারদের সাহায্যে জনবহুল স্থানে দেশের আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি গানের মধ্য দিয়ে প্রচার করতেন।[২৬] স্বদেশী মতবাদ প্রচারের জন্য বাউলাঙ্গে সুরের এই ব্যবহার পরবর্তীকালে সমগ্র বঙ্গদেশে অতীব জনপ্রিয় হয়। অতীতে ইংরেজ-বিরোধী সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ এবং 'পাগলা' পন্থী গুরুদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা এর পটভূমিকা রচনা করেছে। কাঙাল, দুদ্দু, পাঞ্জু শাহের অনেক ইংরেজ-বিরোধী গান আছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে অজ্ঞাতনামা রচয়িতা অসাধারণ এক গান এ সূত্রেই রচনা করেছিলেন। অশ্বিনীকুমার স্নেহধন্য এবং সহজ বৈষ্ণব ভগবানদাস ও কালীসাধিকা সরোজিনী দেবীর শিষ্য মুকুন্দদাস বঙ্গ ভঙ্গের পূর্বেই লোকসঙ্গীতে স্বদেশী ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করেন। এর আগে দেশপ্রেম ও দৈনন্দিন জীবন-সমস্যার সঙ্গে বাউল গানকে যুক্ত করেছিলেন হরিনাথ মজুমদার; মুকুন্দদাস বাউলাঙ্গের গানে যুক্ত করলেন তীব্র স্বদেশীয়ানা। তাঁর রচিত সাধন সঙ্গীত ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হয়। মুকুন্দদাসের বাউল সিদ্ধ, আত্মমগ্ন সাধক নয়, জীবনের পরম অনুরাগী, সমাজ-সংস্কারক দেশপ্রেমিকরূপে তিনি বাউলের ছবি আঁকলেন গানে, নাটকে।[২৭] সুতরাং বাউল গানের সঙ্গে দেশাত্মবোধের যোগ এবং স্বদেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসাবে বাউল গানকে বিবেচনা করার ঝোঁক বুদ্ধিজীবী ও দেশনেতাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

বাউল বিষয়টি ভদ্রজনের কাছে গুরুত্ব পাবার পেছনে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংলণ্ডে লোকসংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়; ১৮৭৮-এ স্থাপিত হয় ফোক্‌লোর সোসাইটি। ভারতবর্ষে বিদেশী রাজকর্মচারী ও ধর্মপ্রচারকগণ লোকসংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে সংগ্রহ ও চর্চা শুরু করেছিলেন। বঙ্গে অচিরকাল-মধ্যে স্থাপিত হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ লোকধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হলেন। সহযোগী গবেষকবৃন্দ লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ শুরু করলেন, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতি লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের আহ্বান জানালেন বিদগ্ধ মানুষেরা। বাউল গানের সংগ্রহ ও প্রকাশ এ চেতনায় মূল্যবান বলে বিবেচিত হলো।

দ্বিতীয়ত লৌকিক সাধক রামকৃষ্ণ পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ স্বীকৃতি পাবার ফলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বঙ্গের লৌকিক উপাসক সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। লোকায়ত সাধকদের জীবনী রচনা করলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (লালন জীবনী ১৩০২)। সরলাদেবী গগন হরকরার জীবনী সংগ্রহের জন্য আহ্বান জানালেন। (ভারতী, ভাদ্র ১৩০২)। ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং জে. এন. ভট্টাচার্য, দয়ানন্দ সরস্বতী লোকায়ত সাধকদের একান্ত সাধনার নেতিবাচক দিকগুলি চিহ্নিত করে ঘৃণামিশ্রিত উষ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। রক্ষণশীল ইসলামী মৌলবাদীরা বাউলদের ধর্মবিদ্রোহ সহ্য করেনি। কিন্তু পরিবর্তিত চেতনায় বাউলসমাজের আচার-বিরোধিতা, যুক্তিবাদ, ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সোৎসাহ সমর্থন পেতে

থাকে। ১৮৫৯-এ 'কল্কি অবতার' নাটকে নারায়ণ চট্টরাজ প্রচলিত ধর্ম অমান্যকারী পাপী হিসাবে বাউলদের চিহ্নিত করেছিলেন। আর বিশেষ ধর্মের সীমানা লঙ্ঘন করেই রামকৃষ্ণ মৌলিক এক মতবাদকে জনসমক্ষে স্থাপন করে মর্যাদা পেলেন। এই যুগপ্রবৃত্তির আলোকেই বাউল মতবাদ রঞ্জিত হয়ে প্রচারিত হলো হরিনাথ, লালনের গানে। ভিক্টোরীয় অতিনৈতিকতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিল হলে, বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা লোকসংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে এক জীবন্ত সংস্কৃতি খুঁজে পেলেন। বাংলার নিজস্ব মাটির সৃষ্টি ও ঐতিহ্য আস্বাদিত হতে থাকল।

তৃতীয়ত পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান যাজকদের দ্বারা এবং যুক্তিবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হিন্দুধর্ম কুসংস্কারে পরিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। বাউলপন্থার যুক্তিবাদ, অসাম্প্রদায়িক মানবতা, ইহবাদ, জাতিভেদ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ বিরোধিতা, বিধবা বিবাহ ও নারীশিক্ষার সমর্থনে উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট আলোচনাগুলি ভিত্তিভূমি খুঁজে পেল। দেশীয় ঐতিহ্যের যুক্তিবাদী এ ধারাটি হীনমন্যতার প্রতিষেধক হিসাবে মূল্য পেল।

চতুর্থত ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর অস্তিত্বে বঙ্গে এক ধর্মকলহ সৃষ্টি হলো। খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, হিন্দু রক্ষণশীলদের বাদ-প্রতিবাদ এবং সংস্কার-আন্দোলনগুলি জনজীবনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। প্রতিবাদী ব্রাহ্ম ধর্মগোষ্ঠী ভারতবর্ষে সমধর্মী দল বা গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মিলিত হতে চেষ্টা করেছিল। শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসবে দেবেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় নিরাকার উপাসকদের আহ্বান করতেন। রক্ষণশীল ধর্মের সমালোচক ভক্তিবাদী গোষ্ঠীর সমালোচনামূলক গানকে মাদ্রাজের ব্রাহ্ম নাটকে ব্যবহার করা হলো। বঙ্গে সাকার-নিরাকারের মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে সরলা দেবী ভারতীয় নিবন্ধে (১৩০২, ভাদ্র) লালনের মতাদর্শে নিরাকার উপাসনার সমধর্ম আবিষ্কার করলেন। রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত ব্রাহ্ম ও বাউলপন্থীরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য অনুভব করলেন। শান্তিনিকেতনের উৎসবে বাউলরা যোগ দিত। ১৯২৪-এ শান্তিনিকেতনের গানের দল যোগ দিল জয়দেবের বাউল উৎসবে। ব্রাহ্ম-প্রচারক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকে বাউলদের তুলে ধরলেন জনসমক্ষে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাঙাল হরিনাথের দলকে ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজে নিয়ে যান। বিজয়কৃষ্ণ কাঙালের অনুরক্ত ছিলেন।[২৮] নিজেদের সমধর্মী গোষ্ঠী হিসাবে বাউলদের চিহ্নিত করে, প্রতিবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলনের লৌকিক গণ-সমর্থন খোঁজার সূত্রে ব্রাহ্মদের একাংশ বাউলদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলেন। ব্রাহ্মদের কীর্তন ও প্রার্থনাগানে ব্যবহৃত হতো বাউল সুর ও কথা।

পঞ্চমত ভারত সংস্কৃতির ভাববাদী ঐতিহ্যের সমান্তরালে ইহবাদী সংস্কৃতি সম্বন্ধে রামমোহন সচেতন ছিলেন। দেহকেন্দ্রিক তান্ত্রিকতার সঙ্গে, সুফী ভাবনার সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক ছিল। নাগরিক এবং বৈষ্ণবতার মধ্যেও দেহসাধনার এক স্রোত প্রবাহিত হতো সেকালে। এই ইহবাদী-দেহবাদী ঐতিহ্য এবং দর্শন অতিনিন্দিত অনাচার হিসাবে বর্ণিত হতো উচ্চবর্গের লেখায়। বঙ্গের উচ্চবর্গ নিজেদের আর্য এবং বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী মনে করতেন। মহেনজোদরো-হরপ্পার আবিষ্কার, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম চর্চা, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চর্যাপদের আবিষ্কার বঙ্গসংস্কৃতির চর্চায় গুরুতর পরিবর্তন নিয়ে এল। বাঙালি পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গসংস্কৃতির বৌদ্ধ, লোকায়ত এবং অনার্য উপাদানগুলি বিশ্লেষণে মনোযোগী হলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরচ্চন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব বড়ুয়া, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের গবেষণায় মানবতাবাদী, যুক্তিঋদ্ধ বৌদ্ধ-ঐতিহ্য বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসে বঙ্গের প্রাক্তন বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের এক মনোরম ছবি পাই। বৌদ্ধ এবং অনার্য

সংস্কৃতিগুলি নানাভাবে নিম্নবর্গের লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল। এর মধ্যে ছিল বৈদিক সংস্কৃতির সমালোচনা, জাতিভেদাদির প্রতিবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের ও ভাববাদী পরকাল-চিন্তার বিরোধিতা। সুতরাং নিম্নবর্গের ধর্ম ও সংস্কৃতি নতুন এক দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয়ে অতীব গুরুত্ব অর্জন করল। বৈদেশিক রীতির মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ এবং সংস্কার বিরোধিতার বহু পূর্বের এসমস্ত দেশজ প্রতিবাদ, আমাদের লোকায়ত ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যমুখী পণ্ডিতদের কাছে আদরণীয় করে তুলল।

"They find that it is Buuddhism that has deflected the human rational and proto-scientific culture of Bengal from an orderly course of development which will have made the culture of Bengal fully the equal of other parts of India in the modern age."[২২]

য়ুরোপীয়দের বৌদ্ধধর্মচর্চায় দার্শনিকতা এবং হীনযান মত প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু মহাযান মতবাদ এবং তার শাখাপ্রশাখাগুলির সমধিক প্রভাব বঙ্গ-সংস্কৃতিতে চিহ্নিত হতে থাকল। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য; "মহাযান সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। **যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।" মহাযান শাস্ত্রে বৌদ্ধতত্ত্বের সঙ্গে অবৈদিক অনার্য সংস্কৃতি মিশে গেছে। "এই মিশ্রনের উপাদানগুলি নূতন নহে, ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না, তেমনি বৈদিককালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানাজাতির সংমিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ইহারাই আর সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ পরাইবার প্রয়াস; ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা। অতএব ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাহারা অনুসরণ করিতে চান, তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া এই মহাযান বৌদ্ধ পুরাণসকলের অনুসরণ করিতে হইবে।"[২৩] হারামণির ভূমিকায় এবং অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বাউলপন্থার মধ্যে ভারতের মিলনমূলক সভ্যতার ঐতিহ্য চিহ্নিত করেছেন। ভারতীয় উপাসকদের নরপূজার বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সহজ বৈষ্ণব এবং বাউলেরা বহন করে চলেছেন। এই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের লোকায়ত রূপ চিহ্নিত হলো বাঙালির এক সাংস্কৃতিক সঙ্কটকালে।

'That in those years as the pace of social and political discontent increases, the Bengalee intellectuals are driven to a cultural defensiveness which sets them ransacking their own history for analogues or prefigurings of the western idias, whose truth seems unanswerable in the light of their worldwide success in action. Such a cultural defensiveness spread over in other parts of India and over most of Asia, but in Bengal and elsewhere it often centres some of its defences in the Budhist tradition. The people of Bengal have tied first of all to prove that the Western countries have invented nothing and that Buddhism as for example, is democratic, ** egalitarian, ** humanistic, ** it is communistic, rationalistic, since emancipation is a matter of reason divorced from transcendence, in its doctrine of the void and its dialectic it is Kantian and Hegelian, it is existentialist in its denial of

essence. Thus the writings of Rabindranath Tagore express such cultural defensiveness and when he speaks of Budhism, it is to claim the superiority of the doctrine of love and compassion over the theories of military power and brutal force, to point to the more advanced from of Western libertarianism to be found in Buddhism and the like. Moreover, Tagore claims for Bengal the key-role in the formation of the later phase of Buddhism and thus adds to the list of Bengali priorities and superiorities with which he seeks to revive his own and his countrymen's waning confidence in the creativity of their culture."[২২]

শুধু বৌদ্ধ মূল্যবোধ নয়, বৈদিক, বৈষ্ণব এবং লোকধর্মের মধ্য থেকে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সমান্তরাল গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা উনিশ শতকের শেষার্ধে চিহ্নিত করা যায়। বৈদেশিক যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে অস্বীকার না করেও মুকুন্দদাসের নাটকে বাউল, পাশ্চাত্য নগরসভ্যতা, মূল্যবোধ এবং চিকিৎসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজের মূল্যবোধের প্রতি প্রবল এক আস্থা এবং যে কোন জ্ঞানকে স্বীকার করে নেয়ার মুক্ত মন যুগপৎ বাউলপন্থার বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের মতো বহু জনের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। মৌলবাদী না হয়েও, পাশ্চাত্য সভ্যতার নব যৌবন-জলতরঙ্গে ভেসে না গিয়ে স্বদেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করার বাউল-আদর্শ সংস্কৃতির এক সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রেরণাদাত্রী ছিল।

লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর ঘৃণামিশ্রিত উষ্মার পরিবর্তন দেখা যায় উনিশ শতকের শেষার্ধে। লৌকিক বাংলার ঐতিহ্যে, বৌদ্ধ-লোকায়ত দেশজ ঐতিহ্যে নিরালম্ব মধ্যশ্রেণী তাদের অতীত এবং শিকড় খুঁজেছিলেন। আর প্রতিবাদী বাউল মতবাদ ও গান এ সূত্রে অতীব গুরুত্ব পেয়েছিল স্বদেশমুখী শিক্ষিতজনের ভাবনায়। রাজনারায়ণ বসুর উৎসাহে বাউলগানের সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ভুবন মোহন ঘোষ। ব্রাহ্মরা নানা সূত্রে বাউলদের ব্যবহার করতেন।

ঠাকুর পরিবার এবং লালন

ঠাকুরবাড়ির অনেকের সঙ্গে লালনের পরিচয় ছিল। ঠাকুরদের জমিদারিতে ছিল তাঁর বাস এবং ঠাকুর-জমিদারের প্রজা ছিলেন তিনি। একদা ঠাকুরদের সঙ্গে লালনের সংঘর্ষ ঘটেছিল। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদারের অত্যাচারী ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের তথ্যাদি গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় প্রকাশ করার সূত্র ধরে উচ্চ পদস্থ ইংরেজ আমলাগণ এ বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত-করেন। আর, এতে ক্রুদ্ধ ঠাকুর-জমিদারগণ লাঠিয়াল দিয়ে কাঙালকে আক্রমণ ও শায়েস্তা করতে উদ্যত হলে; সশিষ্য লালন সশস্ত্রভাবে জমিদারদের লাঠিয়ালদের মোকাবিলা করেন। ভাড়াটে জমিদারদের বাহিনী পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে কৃষকবন্ধু কাঙালকে লালনপন্থীরা চোখের মণির মতো রক্ষা করতেন। সম্ভবত এ সূত্রেই সাধক-গায়ক লালন জমিদারদের কাছে গুরুত্ব পায়।[২৩]

বসন্তকুমার পাল, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের পরিচয়ের তথ্য উদ্ধার করেছেন।[২৪] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের পরিচয় ছিল। ১৮৮৯, ৫ই শিলাইদহের বোটে তিনি লালনের একটি স্কেচ করেছিলেন। এ ছবিটির আলোচনা করে, ১৩০২ সালের ভারতীর নিবন্ধে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, এতে লালনের চেহারা বা চরিত্র ধরা পড়েনি, মন্তব্য করেছেন। আবুল আহসান

চৌধুরীর গ্রন্থ-উদ্ধৃত লালনশিষ্য মনিরুদ্দীনের আবেদনপত্রটি থেকে জানা যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের আখড়াকে নিষ্কর করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৫৫] জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে লালনের পরিচয়ের তথ্য জানিয়েছেন মনসুরউদ্দীন।[৫৬] ইন্দিরা দেবী লালনের গানের স্বরলিপি করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ঠাকুরবাড়ির মহিলারা শিলাইদহ গিয়ে নানাপ্রকার লোকসঙ্গীত ও বাউলগান শুনতেন; পুরস্কৃত করতেন গায়কদের।[৫৭] লালনচর্চার ক্ষেত্রে সরলাদেবীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। লালনকে তিনি দেখেননি; শিলাইদহের জনৈক বৈরাগীর কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন লালন ও গগনের গান। এই উপাদান দিয়ে ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতীতে তিনি প্রকাশ করেন 'লালন ফকির ও গগন' নিবন্ধটি। সে সময় সাকার-নিরাকার উপাসনা নিয়ে এক প্রবল সামাজিক বিতর্ক দেখা দেয়। মূর্তিপূজার বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে বাউলগণ শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে আমন্ত্রিত হয়। সরলাদেবী লৌকিক জীবন ও সাধনা থেকে নিরাকার উপাসনার সমর্থন খুঁজেছেন, "এই এদেশের নিম্নস্তরের সমাজেই এই নিরাকার উপাসনার অধিক প্রসার। বাউলের গান তাহার প্রমাণ। *** এইরূপ একটি ভগবদ্‌প্রণয়ী চার বৎসর পূর্বে কুষ্টিয়া অঞ্চলে জীবিত ছিলেন।" (পৃ ২৭৫) পারিবারিক ধর্মের সমর্থনে লৌকিক ঐতিহ্যের ব্যবহারটি অভিনব।

লালনের গানে ঠাকুর পরিবারের কারো নামোল্লেখ নেই। কিন্তু অনেক ক'টি গানে ব্রাহ্মদের এবং ব্রাহ্ম মতবাদের আলোচনা আছে। ব্রাহ্মদের মতো তিনি "অদেখা ভাবুক" নন; রূপ না দেখে ব্রহ্মনাম করেন না। তিনি রূপের পূজারী, বহু রূপবৈচিত্র্যকে তিনি মান্য করেন, তিনি ইহবাদী, বস্তুভিখারী, মানুষমূর্তি তাঁর ইষ্ট; গুরু-বর্জক ছাড়া হয় না তাঁর সাধনা। লালন তাঁর ধর্মতত্ত্বকে সর্বদা জমিদারের ধর্মতত্ত্ব থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং লালন

শান্তিনিকেতন-বাসের পূর্বে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ অঞ্চলে বাস করেছেন। তারও পূর্বে পিতা ও দাদাদের সঙ্গে এসেছেন এ অঞ্চলে। তাঁর জীবন ও শিল্পের যৌবনকালে (১৮৯০, ১৭ই অক্টোবর) লালনের মহাপ্রয়ান ঘটে। রবীন্দ্রসাহিত্য বা সঙ্গ তাঁর জীবন শিল্পে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়নি। সর্বগ্রাসী রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন এক যুগ লালনে সমাহিত হয়ে আছে। লালনের জীবন, সাধনা, কথা ও সুর নানাভাবে রবীন্দ্র চিন্তায় অনুরণিত হয়েছে। এই পূর্বসুরীর ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ আত্মীকরণ করেছেন অশেষে বিশেষে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের নাম জড়িয়ে নানা ধরনের কল্প-কাহিনী রচনা করেছেন বিভিন্ন গবেষক, গ্রন্থকার এবং উচ্চবর্গের ভদ্রলোকেরা। সর্বত্র 'দাতা' রবীন্দ্রনাথ, গ্রহীতা লালন। এরকম একটি গপ্পো হলো যে লালনের সমাধিটি পাকা করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ তথ্যের প্রস্তাবক ঠাকুরদের কর্মচারী এবং লেখক শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, সমর্থক মনসুরউদ্দীন।[৫৮] একথা সত্য যে জমিদারদের কাছে সমাধিটি বাঁধানোর এবং আখড়া নিষ্কর করার আবেদন হয়েছিল। জমিদারদের পক্ষ থেকে এজন্য প্রাথমিক পরিদর্শনাদির কাজ হয়। লালনের মৃত্যুর পর আখড়াবাসী শিষ্য ভোলাই মানিক, শীতলের সঙ্গে বাইরেকার মনিরুদ্দীন প্রমুখের নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। জমিদারদের দিয়ে সমাধি বাঁধানোর চেষ্টা করেছিলেন মনিরুদ্দীন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে জমিদাররা এতে কোন সাহায্য করেননি। অনুরাগী শিষ্যদের সাহায্যে ভোলাই প্রমুখ এ সমাধিটি পাকা করেন। আর ভোলাই, মানিক শীতলের মৃত্যুর পর আখড়ার অনেক

খাজনা বাকি পড়ে এবং জমিদারগণ ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর খাজনার জন্য আখড়াটি নিলামে তোলেন। লালনের শিষ্যরা ১শত ৭টাকা ৪ আনা দিয়ে নিলামে সম্পত্তি খরিদ করে আখড়ার অস্তিত্ব রক্ষা করেন। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।[৩৯]

মনসুরউদ্দীনের আরেক গল্পে শোনা যায় যে লালনের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধশান্তি সাহায্যের জন্য তাঁর শিষ্যরা আসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং কবি তাদের দুই শত টাকা দেন।[৪০] এসময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদারিতে বাস করছিলেন। আর হিতকরীর সংবাদে জানা যায় যে শ্রাদ্ধশান্তির কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান লালনের মৃত্যুর পর হয়নি।

একটি মাত্র গবেষণামূলক উপকথা পরিবেশন করেছেন আনোয়ারুল করীম; যেখানে দাতা লালন, গ্রহীতা রবীন্দ্রনাথ। লালনের একটি গান আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ করে করীম প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[৪১] মনসুরউদ্দীন ছেউড়িয়ার জনৈক লালনশিষ্যের দোহাই দিয়ে বিষয়টি সমর্থন করেছেন।[৪২]

মনসুরউদ্দীনের মতে, প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ লালনের গান জনসমক্ষে প্রকাশ করলে, অজ্ঞাত বেসরা ফকির লালন সাধারণ্যে গুরুত্ব পায়।[৪৩] লালন গীতিকার ভূমিকায় শশিভূষণ দাশগুপ্ত (পৃ.১) এবং ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আর তালিবের লালন শাহ ও লালন গীতিকায় (২ খণ্ড, ভূমিকা ঙ) এই উক্তির প্রবল সমর্থন পাই। এ সমর্থন অধিকাংশ গবেষণায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে প্রবাসী পত্রিকায় গ্রামীণ কবিতা-সংগ্রহ বিভাগ, 'হারামণি' চালু হয়। প্রথম সংখ্যায় ছিল রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত 'কোথায় পাবো তারে' গান; দীনেন্দ্রনাথের এ গানটির স্বরলিপি এবং গীত-অবলম্বনে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বাউলের ছবি। কুড়ি বছর আগে ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতীতে এ গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। সরলা দেবী সেখানে গগন হরকরার জীবনী সংগ্রহের জন্য আবেদন রেখেছিলেন। কুড়ি বছরের মধ্যে কেউ সংগ্রহ করলেন না তাঁর জীবনকথা। বৈশাখের প্রকাশিত গানে গগনের ভণিতা নেই। গগনকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব শিলাইদহ জমিদারীর ডাক-হরকরা বলে পরিচয় করানো হয়েছে। এতে, পরোক্ষভাবে, গানটি গগনের কাছ থেকে সরাসরি গৃহীত বলে মনে হবে। সরলা দেবী গগনকে দেখেননি; তাঁর পরিচয়-এর আবেদন জানিয়েছিলেন। মনের মানুষের গীত-রচয়িতা গগনের প্রতি ইতিপূর্বে কোন আগ্রহ দেখাননি রবীন্দ্রনাথ। ১২৯৬-তে রবীন্দ্র-পরিবারসহ বলেন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে গগনের কাছ থেকে গান শুনে লিখে নিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছেন, "বষ্ণব, ডাক-হরকরা কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গান গাইত।"[৪৪] এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুপস্থিত। কিন্তু গগনের কাঙালের শিষ্য হিসাবে পরিচয় দেয়া হলো না। আর গানটি সরাসরি গগনের কাছ থেকে গৃহীত নয়। ভারতীর সঙ্গে প্রবাসীর বৈশাখ সংখ্যার গানটি তুলনা করলে দেখা যাবে যে ভারতীতে কলিবিভাগ, আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি এবং ভণিতায় পদকর্তার নাম আছে। প্রবাসীতে নেই এসব, উপরন্তু গানের স্তবক উলটে-পালটে গেছে; অংশবিশেষ বর্জিত। আধুনিক পংক্তি ও স্তবকবিন্যাসে গানটি প্রবাসীতে পাই। ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবাসীতে হারামণির শেষে (পৃ. ৩২৪) এ গানটি পুর্নমুদ্রিত হয়েছে। ভ্রান্তিস্বীকারের পরিবর্তে বলা হলো যে, গতবারের পাঠ অসম্পূর্ণ থাকার জন্য, "সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হল।" স্বরলিপির পরিবর্তনের নির্দেশ এইরকম, "মিশ্র একতালায়, ২ কলিব সুরে ৪, ৬ কলি এবং ৩য় কলির সুরে ৫ ও ৭ম কলি" গাইতে হবে। এ পাঠ কুড়ি বছর আগেকার ভারতী থেকে কলিবিভাগ, ভণিতাসহ গৃহীত

হয়েছে। এতে পংক্তিসজ্জা সামান্য ভিন্ন, 'বলে দেরে ও মরি হায় রে' ধুয়া ব্যবহারের পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। অথচ গানটির পূর্বপ্রকাশের কথা বা ভারতীর কাছে ঋণস্বীকার নেই; গানের সংগ্রহসূত্রের উল্লেখ নেই; নেই কোনরূপ ভ্রান্তিস্বীকার। প্রবাসীর হারামণি বিভাগে গানের পাঠান্তর, ভ্রান্তি নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। এখানে তার কোন চিহ্ন নেই। 'মনের মানুষ', গানটির প্রবাসীতে প্রকাশ এক ভ্রান্তিবিলাসের নিঃশব্দ নিদর্শন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের আগে, প্রবাসীর হারামণি বিভাগে ১৩২২-এর শ্রাবণ সংখ্যায় সতীশচন্দ্র দাস সংগ্রহ করে লালনের (ক) কথা কয়রে এবং (খ) পাখী কখন যেন উড়ে যায়—এ দুটি গান প্রকাশ করেন। তিনি নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুরে লালন ও সিরাজের গানের বহুল ব্যাপ্তি বর্ণনা করেছেন (পৃ. ৫৪২)। ঐ বছর ভাদ্র সংখ্যায় ৭টি গান প্রকাশ করেন করুণাময় গোস্বামী; তাঁর মধ্যে দুটি পদ লালনের (একটিকে ভুল করে সিরাজ রচিত বলা হয়েছে; কিন্তু ভণিতা লালনের)। পদকর্তা সম্পর্কে সংগ্রাহকের মন্তব্য, "প্রসিদ্ধ লালন শা ফকিরের রচনা বোধহয় সহস্র গান আছে।" (পৃ. ৬৪০-৪১)।

আবুল আহসান চৌধুরী লালনচর্চার বিস্তৃত তথ্য সংকলন করেছেন তাঁর গ্রন্থে।[৪৫] প্রাক্-রবীন্দ্র লালনচর্চার সূত্রপাত কাঙালের পত্রিকায়, ব্রহ্মাণ্ড বেদ (৩ খণ্ড) ও দিনলিপিতে। মীর মসারফ হোসেন, দুর্গাদাস লাহিড়ি, অনাথকৃষ্ণ দেব, কুমুদনাথ মল্লিক লালনের পরিচয় ও গান মুদ্রিত করেছিলেন। শরৎকুমার লাহিড়িও বঙ্গের বর্তমান যুগ গ্রন্থে "প্রতিভাশালী ও উচ্চশ্রেণীর সাধক" লালনের পরিচয় আছে। ভারতীতে সরলা দেবী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। মৌলবী আবদুল ওয়ালীর নিবন্ধে লালনের উল্লেখ আছে। কাঙাল হরিনাথের বাউলগানের রচনা ও প্লাবনসৃষ্টিতে জলধর সেন, লালনের কার্যকরী প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন।

জীবিতকালেই সহস্র সহস্র গ্রামীণ মানুষ কর্তৃক তিনি সমাদৃত এবং শ্রুত হতেন। বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজ গায়ক, সাধক এবং কবি হিসাবে তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য সংখ্যা সেকালের ব্রাহ্ম সমাজ বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অপেক্ষা অধিক ছিল। ১৩২২-এর প্রবাসীতে নোবেল পুরস্কারজয়ী রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান প্রকাশ করে তাঁকে অশেষ গুরুত্ব দিলেন সত্য; কিন্তু ইতিপূর্বে লালন জনসমাজে খুব অপরিচিত ছিলেন না। এ প্রতিষ্ঠা আপন প্রতিভায়; রবিরশ্মির বিচ্ছুরণে নয়। লালন-সম্পর্কিত ১৩২২ সালের পূর্ববর্তী আলোচনার দ্বিধারা : (১) সাধক, প্রতিভাবান লোকশিল্পী হিসাবে অক্ষয়কুমার, সরলা দেবী, জলধর সেন প্রমুখ উজ্জ্বল বর্ণে লালনকে চিত্রিত করেছেন; (২) অন্যপক্ষে বিকৃত দেহসাধনা ও অনাচারের প্রসঙ্গ লালন-বিরোধী রচনাবলীতে, হিতকারীর নিবন্ধে এবং আবদুল ওয়ালির গবেষণাপত্রে উচ্চারিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক এ সমস্ত অনাচার, ব্যভিচার থেকে অবশ্য হিতকরী, লালনের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছে।

ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১ম খণ্ড, ১৮৭০) বীভৎস প্রথা, উচ্ছৃঙ্খল যৌন অনাচারের সঙ্গে বাউলদের যুক্ত করেছেন। ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠ আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী লোকায়ত সাধকদের অনাচারের কাহিনী ১৮৮২ থেকে সত্যার্থ প্রকাশে লিখতে শুরু করেন। J. N. Bhattacharya-এর Hindu castes and sects (1886) গ্রন্থে নিরীশ্বরবাদী যুক্তিবাদী বাউলদের মহৎ দোষ যৌন অনাচারকে সর্বগুণনাশী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণদেব নারীসঙ্গী বাউলদের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন ছিলেন

না। ব্রাহ্ম প্রচারক ও গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাউলদের চারচন্দ্রভেদ ইত্যাদিকে আক্রমণ করেছিলেন।[৪৬]

কবীরের গানে নানা সাধকগোষ্ঠীর অনাচারের সমালোচনা আছে। লালনের গানেও কামী, লোভী, অনাচারীদের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত সংগ্রাম চিহ্নিত করা যায়। লৌকিক নারীকেন্দ্রিক দেহসাধনার মানবিক সম্পর্কগুলি 'ন্যাড়ানেড়ি' কাণ্ড বলে উচ্চবর্গ বিবেচনা করতেন। এর সমান্তরালে ছিল শুদ্ধ সাধনার ধারা। এই সাধকেরা সংখ্যায় চিরকালই স্বল্প। লালন সেই মুষ্টিমেয় শুদ্ধ সাধকের একজন আর উনিশ শতকের এক সার্বিক সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ সমাজে আছড়ে পড়ছিল তখন। নতুন পরিবেশে মতবাদের সংস্কৃত এক শুদ্ধ রূপকে তুলে ধরলেন লালন এবং কাঙাল। নারীকেন্দ্রিক সাধনার অনাচারাদি দূর করার আহ্বান ধ্বনিত হলো তাদের গানে। কাঙাল হরিনাথ তেজস্বী সমাজসেবী, গীতিকার, সংগঠক, জীবনাচরনে ত্যাগী সন্ন্যাসী। লালন সিদ্ধ শুদ্ধ সাধক 'সাঁই'। দুজনের ব্যক্তিগত জীবনের নির্মলতা সর্বজনস্বীকৃত ছিল। অমলিন এ প্রদীপ থেকে জ্বলে উঠছিল অনেক দেউটি : শীতল ভোলাই, দুদ্দু প্রভৃতি (হিতকরীর মতে এরাও সৎ)।

বাউলগানকে জনপ্রিয় ও লোকমান্য করার পেছনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার পূর্বে কাঙাল ফিকিরচাঁদ এবং মুকুন্দদাসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। ফিকিরচাঁদের জীবনীগ্রন্থে জলধর সেন কাঙালের বাউলদল গঠন এবং অতি দ্রুত সারা বঙ্গে 'বাউলগানের প্লাবনসৃষ্টির আলোচনা করেছেন। জে. এন. ভট্টাচার্যের গ্রন্থে বঙ্গের প্রধান শহরে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবগুলিতে বাউলদলের উপস্থিতি ও জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ পাই। প্রবাসীর হারামণি বিভাগের আলোচনায় (চৈত্র, ১৩২২) ধরণীধর ঘোষাল বর্ধমান জেলায় বাউলের দল ও তাদের প্রধান গায়কের উল্লেখ করেছেন। ঐ বিভাগে (ভাদ্র, ১৩২২) সরসকুসুম সেন নরসিংদির দেশবিখ্যাত বাউলদল ও জনগণের জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা তাদের গানের অতুল জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন। পাটের মন্দা নিয়ে রচিত একটি গানের (সম্ভবত ফিকিরচাঁদের রচনা) উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। গোরা উপন্যাসে বিনয় শিলাইদহ থেকে আগত গায়কের মুখে গান শুনেছিল। বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথ সেকালে বাউল গানের সামাজিক জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন ''বাউল ও কীর্তন গান এদেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল।''[৪৭]

সেকালের যাত্রায়, নাটকে, দোল-দুর্গোৎসবে বাউলগান হতো। রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সবাই আস্বাদ করতেন বাউলগান। অধ্যাপক অরুণ বসু রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গানে শহরে প্রচলিত ফিকিরচাঁদী ঢঙের প্রভাব নির্ণয় করেছেন।[৪৮] লালনপন্থীদের গানের ঢং ঈষৎ ভিন্ন; সে সুর রবীন্দ্রনাথ কতটা গ্রহণ করেছেন তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তবে লালনগীতিকার সুর রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছিল; এ বিষয়ে কবির স্বীকৃতি আছে। নীহাররঞ্জন রায় এবং সুকুমার সেন চর্যাপদের যুগ থেকেই বাউলাঙ্গের গানের ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করেছেন। গুপ্ত সাধকগোষ্ঠীর এ গান ভিক্ষা পাবার আকাঙ্ক্ষায় সামাজিকদের উদ্দেশ্যেও লেখা হতো।[৪৯] গ্রাম্য জনতার আস্বাদ্য এ সামগ্রীকে নগরে এনে যুগোচিত মার্জনা দ্বারা শিক্ষিতজনের উপযোগী করে পরিবেশন করলেন হরিনাথ। নানা কারণে এ গান ও সুর নাগরিকদের মনোরঞ্জন করল। বিহারীলাল চক্রবর্তী বাউল গান লিখেছিলেন। তাছাড়া বৈষ্ণবপদ সংগ্রহের রীতি অনুসরণে এসময় বাউল-জাতীয় গানের কতকগুলি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। লালশশী সংকলিত কর্তাভজার গীতাবলী

(১২৭৭), দয়ালচাঁদ ঘোষের বাউল সঙ্গীত (১২৮৯), হৃদয়লাল দত্তের বাউল সঙ্গীত (১৮৮২) প্রভৃতি বাউলগান সংকলনের মুদ্রণ বাউলগানের নাগরিক ঔৎসুক্যকে প্রকাশ করে। মীর মশারফ হোসেন সঙ্গত কারণেই "বাউলগানে দেশ মেতেছে" মন্তব্য করেছিলেন। বিশিষ্ট সাধনা থেকে জীবনের যে কোন সমস্যা আধুনিক বাউলগানে বিষয় হয়ে উঠেছিল, এটি তাৎপর্যপূর্ণ।

চারণকবি মুকুন্দদাস (১২৮৫-১৩৪১) বিভিন্ন লোকনাট্যে লোকনায়ক ও জাতীয় বিবেকের মর্যাদায় বাউল চরিত্র সৃষ্টি করলেন। বঙ্গসমাজে আদর্শায়িত বাউল চরিত্রের প্রতিষ্ঠাতা মুকুন্দদাস। আদর্শবাদী হরিনাথের ছায়ায় নির্মিত তার বাউল চরিত্র। তার সমাজ-নাটকের নায়ক সত্য— 'পাগল'। সে জাতিভেদ, পণপ্রথার বিরোধী; স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার ও জনসেবায় তৎপর সে। এ নাটকে নারীসঙ্গী বৈষ্ণব তিরস্কৃত; কিন্তু দেহতত্ত্বের গায়ক হরিচরণ প্রশংসিত।

কর্মক্ষেত্র নাটকের নায়ক বাউল ঠাকুর শহুরে সভ্যতা, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের প্রবল বিরোধী; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে গ্রামীণ জীবনে নিয়ে আসবার প্রবক্তা তিনি। সন্ন্যাস বা ভিক্ষাবৃত্তিতে সমর্থন নেই তার; কর্মক্ষেত্র তার সংসার ও মানুষ। অন্ধ গুরুবাদের তিনি বিরোধী; ধর্মীয় চিহ্ন বা শুষ্ক আচারে তার সমর্থন নেই। অরাজনৈতিক বিপ্লবের প্রবক্তা বাউল ঠাকুর জমিদার ও আমলার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষে। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার করেন তিনি, দেন শূদ্রদের পূজাধিকার। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রবক্তা তিনি। সমবায় ব্যাঙ্ক, গণবিচারালয়, সমবায় প্রথায় চাষ, স্কুল স্থাপন, বিদেশী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রভৃতি কর্মযজ্ঞের তিনি নায়ক। জাতীয় ঐতিহ্যের, দেশ-আত্মার এক মানবমূর্তি মুকুন্দদাসের বাউল ঠাকুর।[৫০]

মুকুন্দদাস জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অশ্বিনীকুমার ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। গোস্বামী চারচন্দ্রভেদী অশাস্ত্রীয়, বীভৎস বাউলদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান শিষ্য কিরণচাঁদ দরবেশ গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও বাউলসঙ্গ করতেন এবং বাউলসঙ্গ ছিল তার সাধনার প্রেরণা। কিরণচাঁদ দরবেশ ১৩২২-এর প্রবাসীতে একটি বাউলগান সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। কিরণচাঁদকে দাদা বলে মুকুন্দ ডাকতেন এবং মুকুন্দদাসের স্বদেশী গানে কিরণচাঁদের হাত ছিল।[৫১] মুকুন্দদাসের প্রচারে বাউল আদর্শায়িত হয়ে শিক্ষিত সমাজে স্থাপিত হয়েছিল।

আধুনিক বাউলগানের উন্মেষপর্বে আছে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে হিন্দু বা ইসলামের দূরে চলে যাওয়া; খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এবং বিদেশী যুক্তিবাদের আলোকে এদেশীয় মানুষেরা শুরু করলেন সনাতন ধর্ম ও মূল্যবোধের সমালোচনা। পাশ্চাত্য শাসনের বিরোধিতার সূত্রে ক্রমশ বিরাগ দেখা দিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি এবং বুদ্ধিজীবীগণ "স্বদেশের কুকুরকেও" বিদেশী ঠাকুর অপেক্ষা শ্রেয় মনে করতে লাগলেন। বস্তুবাদী বিজ্ঞানচেতনার প্রসার এ সময়কার এক উল্লেখযোগ্য প্রবণতা। জাত-পাত-ধর্ম দ্বারা খণ্ডিত জনগণকে মিলিত করার চিন্তা-ভাবনা এ সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী বাউল মতাদর্শে প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ, ধর্মের ও জাতিভেদের শাস্ত্রের সমালোচনা, ইহবাদ, সমাজচেতনা, মানবতাবোধ, অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীতে সর্বধর্মের মিলন প্রভৃতি মূল্যবান দেশীয় মূল্যবোধ বিদগ্ধ জনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। দেহসাধনার এই বিশিষ্ট অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যটি দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের প্রতিবাদী মানুষের মিলনস্থল ছিল। বিশেষত নিম্নবর্গের মধ্যে এ মতবাদের

প্রাবল্য ছিল। সন্ন্যাসী-ফকিরগণ ইংরেজবিরোধী কৃষক-সংগ্রামের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। গ্রামীণ জনতার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর নাগরিকদের সংগ্রামের মেলবন্ধনের সূত্রেই প্রতিবাদী বাউল মতবাদ নাগরিকদের আকৃষ্ট করে। বাউলতত্ত্বের প্রগতিশীল চরিত্রকে জে. এন. ভট্টাচার্যও স্বীকার করেছেন। বাউলগান বঙ্গের নিজস্ব ধর্ম-বিবর্তনের পরিচয়বাহী বাউলের সাজ-পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, নাচ, সুর—শুধু শ্রাব্য নয়, দৃশ্যও বটে। এত আকর্ষণীয় লোকসঙ্গীত বঙ্গের অন্যত্র নেই।

লালনের প্রায় দশহাজার শিষ্য ছিল। শাস্ত্রবিরোধী অসাম্প্রদায়িক এত বড় সংগঠন তখন বঙ্গে ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজ বা জাতীয় কংগ্রেসেরও সংগঠন এত বড় ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশনেরও নয়। সুতরাং নানা কারণে এবং নিজের উজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রতিভা দ্বারাই লালন সমকালে গুরুত্ব পেয়েছিলেন। কেবলমাত্র মহাকবির স্বীকৃতিতেই নয় তাঁর প্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার নিয়ে আধুনিককালে তুমুল বিতর্ক ও গবেষণা হয়েছে। এ সাক্ষাৎকারের নানাবিধ বর্ণনা মনসুরউদ্দীনের হারামণিতে এবং শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা, ১৩৫২) গ্রন্থে পাওয়া যায়। শচীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এ তথ্য প্রত্যাহার করে নেন। এই সাক্ষাৎকার ঘটেনি বলে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন। তথ্যভাবে অন্নদাশঙ্কর একে বলেছেন অসিদ্ধ। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘটনাকে 'কিংবদন্তী' হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৫২] শচীন্দ্রনাথ-মনসুরউদ্দীনের বহু পূর্বে জলধর সেন, বসন্তকুমার পাল এবং গোঁসাই গোপালের পুত্র রাসবিহারী জোয়ারদার রবীন্দ্র-লালন মিলনের ব্যাপক জনশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশান্তকুমার পাল রবি-জীবনীতে এর সপক্ষে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। বিনয় ঘোষ এ মিলনকে সত্য বলেছেন। আর সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথ লালনের "সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন" মন্তব্য করেছেন। তথ্যসূত্র উল্লেখ না করলেও, এ মত তিনি প্রত্যাহার করেননি।[৫৪]

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র বা অন্য কোথাও লালনের সঙ্গের তথ্য প্রশান্তকুমার পাননি। জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে আসেন, তার সামান্য পরে লালন প্রয়াত। তবে ইতিপূর্বে বহুবার এ অঞ্চলে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন এ মিলন ঘটা সম্ভব ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তথ্যহীনতার উল্লেখ করেছেন রবি-জীবনীকার। সেগুলির পুনরুক্তি অপ্রয়োজনীয়। কবির জীবদ্দশায় জলধর সেনের গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকারের উল্লেখ হয়েছিল এবং এ গ্রন্থ কবির না দেখার কারণ ছিল না। বসন্তকুমার পাল লালন-জীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হলে, কবির সচিব সুধীর কর ১৩৩৯-এর ২০শে জুলাই এক পত্রে তাকে সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন এবং লিখিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ, "ফকির সাহেবকে জানতেন বটে, কিন্তু সে তো বহুদিন আগে"।[৫৫] মনসুরউদ্দীনের হারামণির আশীর্বাণীতে কবি লিখেছেন যে "শিলাইদহে থাকাকালীন বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো" (১৩৩৭, কলকাতা)। কালীমোহন ঘোষকে লিখিত পত্র থেকে জানা যায় যে, "এই বাউলদল মূলত লালন ফকিরের শিষ্য"।[৫৬] পূর্বালোচিত মনিরুদ্দীনের আবেদন থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরিচিতি জানা যায়। ১৯০৯ সালে (২১ আগস্ট) সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত ছাত্রদের প্রতি অভিভাষণে গ্রামীণ লোকধর্মের আলোচনাসূত্রে তিনি বলেছেন, "আমি এইরূপ একজন ধর্ম-প্রচারকের বিষয় কিছু জানি—তাহার নাম লালন ফকির। লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—এরূপ শোনা যায় যে তাহার বাপ-মা তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাহার বসন্ত রোগ হওয়াতে তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই সময় একজন মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান হিন্দু জৈন মতসকল একত্র করিয়া এমন একটা জিনিস তৈয়ার হইয়াছে, যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে"। এ লেখায় জৈন মতবাদ এবং পিতামাতা কর্তৃক বর্জিত হবার তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় তথ্যটি অবশ্য ভারতীর অক্ষয়কুমারের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। লালন-প্রসঙ্গটি পরবর্তীকালে এ রচনা থেকে বর্জিত হয়েছিল। এর কোন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়নি।[৫৭]

১৩২২-এ প্রবাসীতে হারামণির বিভিন্ন সংগ্রহকর্তা, ক্ষিতিমোহন সেন পর্যন্ত, গান-সংগ্রহের সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিন সংখ্যায় প্রকাশিত লালনের গানের সংগ্রহকর্তাহিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম থাকায়, এগুলি সরাসরি লালনের নিকট থেকেই সংগৃহীত এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বৈশাখে গগনের ও তার গুরুর ছবি অঙ্কিত হওয়ায়—এরাও ঠাকুরদের প্রত্যক্ষ পরিচিত এমন মনে হয়েছিল। পরিশেষে স্মরণ করি পত্রপুটদের সেই বিখ্যাত কবিতা :

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে

দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে। [পত্রপুট, ১৫]

আনোয়ারুল করীমের মতো অনেকে, এ বাউলকে লালন বলে মনে করতে পারেন।[৫৮] শিলাইদহে লালনের বাস ছিল না, এখানে থাকতেন রামলাল, গোঁসাই গোপাল প্রমুখ। কবিতায় বর্ণিত ব্যক্তিটিকেই কি গগনেন্দ্রনাথ ছবিতে এঁকেছিলেন গগনের সঙ্গে। গগন হরকরার গুরু কে ছিলেন? বলেন্দ্রনাথের লেখায় দেখি 'তিনি কাঙালের দলভুক্ত'। ঠাকুরদের লেখায়, প্রচলিত গবেষণাগ্রন্থ এগুলির কোন সমাধান আমরা পাই না। ভবিষ্যৎ গবেষণায় যথার্থ তথ্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে, বা লালন ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার কোন সুযোগ নেই।

সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি লোকধর্ম এবং গ্রামীণ ধর্মগুরুদের জীবনী সংগ্রহের আহ্বান জানালেন। অথচ ব্যক্তিগতভাবে শিবচন্দ্র, লালন, কাঙাল সম্পর্কে, এমনকি মনের মানুষের রচয়িতা গগন মণ্ডলের সম্পর্কে কোন তথ্য কবি নিজে সংগ্রহ করলেন না কেন? লালনের গান তো তাঁর সংগ্রহে ছিল—সেগুলি প্রকাশ্যে মনসুরউদ্দীনের মতো সংগ্রাহককে দিলেন না কেন? এ এক অনুদ্ঘাটিত রহস্য। ক্ষিতিমোহন বহু বাউলগানকে সাধনসামগ্রী মনে করে তার প্রকাশে কুণ্ঠিত ছিলেন। এ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়তে পারে। আর যথার্থ শিল্পী বা সাধককে তাদের স্থূল জীবনচরিতে পাওয়া যায় না—এমত বিশ্বাস তো রবীন্দ্রনাথের ছিল। মেঘও রৌদ্র গল্পে বাউল প্রসঙ্গ আছে।

বাউল তথা লালন-কাঙালের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে, ঠাকুর-পরিবারের সংঘর্ষ ঘটেছিল। এরা, বা এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত গগনের জীবনী-সংগ্রহে সে তথ্য

প্রচারিত বা পল্লবিত হবার সম্ভাবনা ছিল। মুকুন্দদাসের বাউল বা রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। সামন্ত পরিবারের জনৈক যুবক প্রজাদের প্রিয়; মহিলারা বাউলের গান শোনে। বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসে বা নাটকে এ ছকটি ঘুরেফিরে এসেছে। বাস্তব ঘটনাভিত্তিক এ ছকটি। লালনের স্ত্রী; উত্তরপুরুষ ভোলাই, শীতল; শিষ্য দুদ্দু, পাঞ্জু; শিলাইদহের গোপাল বা কাঙালের উত্তরপুরুষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা, সম্পর্কেব কোন তথ্য নেই। এক মানসিক অস্বস্তি শিলাইদহ অঞ্চলের বাউল-বিষয়ক তথ্যের অন্যতম নেপথ্য পটভূমিকা।

রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ধর্মনেতা; দয়ানন্দ প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ও অন্যান্য বাউলবিরোধী লেখক নানা বীভৎস প্রথা, শিথিল যৌনসম্পর্ক এবং নেশার জন্য বাউলদের অভিযুক্ত করেছিলেন। বাউল-সাধনায় এবম্বিধ সমস্যা রবীন্দ্র-মানসিকতায় বাউলদের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টি করেছিল। তিনি কি এগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে শিলাইদহ-বাসের অনতিবিলম্বে রচিত হয়েছিল পোষ্টমাস্টার গল্প (১৮৯৮?) স্থানীয় পটভূমিকায়। গল্পের প্রথমাংশেই পাই, "সন্ধ্যার সময়....দূরে নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈস্বরে গান জুড়িয়া দিত।" শিলাইদহের বাউলদের অনেকে কিশোরী ভজনা গোষ্ঠীর ছিলেন। সেই পটভূমিকায় এক বিপরীত মূল্যবোধ পোস্টমাষ্টার গল্পে অভিব্যক্ত।[৫৯] শিলাইদহ-বাসের স্মৃতিচারণায় ১৩৩৩ সালে শিক্ষার বিকীরণ প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, "একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদের কাছে শুনেছি এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যেপ্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্ম নামধারী লালসার লোলুপতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড় বড় চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে"।[৬০] বাউল গানের গোষ্ঠীগত ব্যাখ্যা যে কবির নিজস্ব ব্যাখ্যা থেকে পৃথক সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মনের মানুষের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা যে তার ব্যাখ্যার অনুরূপ নয় সে আলোচনায় তিনি স্মরণ করেছেন ইহুদী পুরাণের স্রষ্টার নিজের প্রতিরূপে মানুষ সৃষ্টির কথা। বাউল ভাবপ্রতিমা গড়ে না; রামকৃষ্ণের ভাষায়, 'ওরা মূর্তিপূজা লাইক্ করে না, জীবন্ত প্রতিমা চায়'। তাই বাউলদের ব্যাখ্যায় মনের মানুষ, 'একথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয়নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িকভাবে এর ঠিক কি অর্থ বোঝে....।[৬১]

সুতরাং দেহসাধনা এবং ইহবাদী ইন্দ্রিয়প্রধান সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে দ্বিধা বোধ করেছেন। বাউলগানকে নিজ চিন্তায় রূপায়িত করেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্টমী গল্প ১৩২১-এ লিখিত; বৈষ্ণবীর অন্তিম পরিণতি রোমান্টিক, সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। কবি নিজেই এ গল্পের যে নেপথ্য কাহিনী পরিবেশন করেছেন, তাতে জানা যায় যে, এই বৈষ্ণবী, গুরুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। অর্থাৎ পোস্টমাষ্টার গল্পের পরবর্তী যুগে সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ বাউল-তথ্যাদি আদর্শায়িত করেছেন। ব্যক্তিগত বাউলসঙ্গের চাইতে লিখিত ও শ্রুত গানের মধ্য দিয়েই বাউলভুবনকে তিনি দেখেছেন। লালনের গান অভিনিবেশসহকারে তিনি দেখেছিলেন। ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণকারী নিঃসন্তান সাধক লালন প্রমুখ, 'মর্কট বৈবাগী'দের পাশাপাশি উজ্জ্বল হয়ে

ওঠেন। কামসাধনার পাশাপাশি একনিষ্ঠ প্রেমসাধনার ঐতিহ্য এবং লালনের জীবন-দৃষ্টান্ত তাঁকে আকৃষ্ট করে। এ প্রেম নর-নারীযুগলের। কেবল আবেগে নয়, বহু সাধনার স্তর-পরম্পরায় এ প্রেম লভ্য। জীবসত্তাকে হত্যা করলে, মরার পর একে পাওয়া যায়। অতিপরিচয়ে (চিত্রাঙ্গদা, রাজারাণী) এ প্রেম মলিন হয় না। 'বেশধারী' বাউলদের থেকে পৃথক সাধকদের তিনি বর্গীকরণ করলেন 'খাঁটি বাউল' হিসাবে। ক্রমশ বাউলদের নেতিবাচক দিক অপেক্ষা ইতিবাচক অসাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার-বিরোধিতা, অহিংসা প্রভৃতি দিক রবীন্দ্রমানসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এদের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন (ক) উপনিষদের 'আত্মসাধনার ঐতিহ্য (খ) মিলনমূলক ভারতীয় ঐতিহ্য (গ) যুগ-পরিবর্তনে পরিবর্তিত লোক-ধর্মচেতনা (ঘ) প্রাচীন ভারতীয় অনন্য মানবতাবোধ। এগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। লালনের গান তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। রবীন্দ্রভবনে রাখা দু'টি গানের খাতা ছাড়াও আর একটি রবীন্দ্র-ব্যবহৃত লালনের গানের খাতা আমরা পেয়েছি। ১২৯৯-তে শ্রীজগৎ বিশ্বাস লালনের মূল খাতা থেকে গানগুলি লিখেছিলেন। খাতাটি লালনের 'দত্তকপুত্র' ভোলাই শা-এর।[৬২] এছাড়া লালনের মূল খাতা শান্তিনিকেতনের কোথাও থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বাউলসঙ্গ ব্যক্তি অপেক্ষা, এই গানের ভিতর দিয়ে ঘটেছিল। বাউল এবং লালন অনেক সময় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল কবির কাছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি গগন ও সর্বক্ষেপী বৈষ্ণবীর সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলেছেন। মনিরুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু 'সাধুবেশধারী'-দের নামোল্লেখ নেই। ১৩২২ সালের আগে একবার মাত্র লালনের নাম করেই তা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। প্রবাসীর দীর্ঘদিন পর ছন্দের আলোচনায় নামসহ লালনের পদ উল্লিখিত হলো। অথচ কবির রচনায় বাউলদের প্রসঙ্গ নিরন্তর আলোচিত হচ্ছে। সুর ও বাণীর ঋণ গ্রহণ করছেন; বাউলবেশে অভিনয় করছেন; নিজেকে বাউল বলে পরিচয় দিচ্ছেন। শান্তিনিকেতন-বাস পর্বে কোন বাউলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কোন তথ্য আমরা পাই না। অবশ্য বীরভূমে গায়ক-বাউলদের প্রাধান্য, সাধক-বাউল তুলনায় কম। বিশেষত জীবণাচরণে এদের সাধকচরিত্র স্পষ্ট নয়। বাউলের প্রতি সামাজিক দ্বিধা ভিন্নরূপে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বাউলদের দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন (ক) খাঁটি (খ) সখের (বেশধারী)। ফলত বাউল গানও দু'ধরনের (ক) অমূল্য (খ) সস্তা (মৃত্যুভয় দেখিয়ে বৈরাগীদলে টানার প্রচার)। এ তথ্যগুলি রবীন্দ্রনাথের লালন তথা বাউলচর্চায় অতি প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাবনার দ্বিধারা। একটি ধারায় ব্রাত্য, সাধক, শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও একাত্মতা। অন্য ধারাটি বিকর্ষণের। তবে আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে আকর্ষণেরই জয় হয়েছে। এ আকর্ষণ আদর্শায়িত বাউলের প্রতি।

লালনপন্থী এবং রসিক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে প্রাক্‌যৌবনে বাউল গান রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ কবত। কাঙালেব দল কলকাতায় গানের ঢেউ পৌঁছে দিয়েছিল। কল্পনা পত্রিকায় ১২৯৪-তে কাব্যগুরু বিহারীলাল কয়েকটি বাউল গান প্রকাশ করেন। পরে ১৩০৭-এ বাউল বিংশতি গ্রন্থে এগুলি স্থান পায়। প্রচলিত মূল্যবোধ-বিরোধী এক প্রতিবাদী মানসিকতা ছিল রবীন্দ্রনাথের; আর ছিল জীবনমুখী অধ্যাত্ম-এষণা। এগুলির মধ্যেই শশিভূষণ দাশগুপ্ত চিহ্নিত করেছেন, 'এক নবীন বাউলের বসতি।'[৬৩] বিনয় ঘোষ, ১৯২০-এ ভারতীর বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্র-সমালোচিত সঙ্গীত সংগ্রহ/বাউলের গাথাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন।[৬৪] এ সমালোচনায় পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত মৃত্তিকালগ্ন জাতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ হিসাবে গানগুলিকে

স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ১. বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বাঙালির মর্মের ভাষা, ২। গুরুত্বপূর্ণ প্রেমতত্ত্ব-আত্মোৎসর্গ এবং বিশ্বজয়, ৩. সর্বজনীনতা—আধুনিক মানুষের সঙ্গে ঐক্য—এ তিনটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হলো বাউল গানের।[৬৫] তখন স্বাদেশিকতার এক প্রবল বন্যা সমাজে এবং ঠাকুরবাড়িতে দেখা দিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইংরেজ কোম্পানীর কাছে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় এগুলি ঘটেছিল। ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের ইংরেজ ও জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে গণঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাউল-ফকির নেতৃত্বে। দুধুমিঞা, পাগলপন্থী গুরুরা, কাঙাল-লালন গণকণ্ঠে ভাষা দিয়েছিলেন। সর্ববর্ণের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার উপাদান বাউলতত্ত্বে ছিল।

মুকুন্দদাস এবং কাঙাল স্বদেশ-ভাবনা দিয়ে বাউল মূর্তি গড়েছিলেন। মুকুন্দের নাট্যাভিনয়ে জাতীয় বিবেকের অন্য নাম বাউল। রবীন্দ্রনাথও যুগপ্রবৃত্তির আনুগত্যে ১৯০৫-এর স্বদেশী গানের সংকলনটির নাম দিলেন 'বাউল'; তাঁর বাউল স্বদেশ ও আত্মচিন্তার বাণীমূর্তি। এসমস্ত গান পরে গীতবিতানে স্থান পায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বাউল-ভাবনার ক্রমবিকাশ আলোচনার পূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বাউল গান সংগ্রহ এবং প্রবাসীতে ২০টি লালনগীতি প্রকাশের বিষয়টি আলোচনা করে নিতে চাই। নানা সময়ে ব্যবহৃত বাউলগানের মধ্যে কেবল লালনের গানই ছিল তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ। অন্য গান তিনি ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ থেকে নিয়েছেন। হারামণির ভূমিকায় শিলাইদহ অঞ্চলে খাঁটি বাউলের মুখ থেকে (ক) গান শোনা এবং (খ) তাদের পুরাতন হস্তলিখিত খাতা দেখবার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মুখ থেকে শোনা বাউল গান সংগ্রহের কোন তথ্য তিনি দেননি। সেকালের বাউলগান সংগ্রহকর্তাদের মধ্যে তিনিই কেবল হস্তলিখিত পুরনো খাতার উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত দুটি খাতা এবং আমাদের আলোচ্য ভোলাই-এর খাতা রবীন্দ্রনাথের কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। লেখ্য এ লালনগীতি থেকেই বাউলগান, তত্ত্ব এবং লালন সম্পর্কে এক ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত গানগুলি এবং পরবর্তীকালে 'ছন্দে' ব্যবহৃত পাঠান্তর এই খাতা থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে ভোলাই-এব খাতা মূল এক খাতার অনুলিপি মাত্র। লালনের মূল খাতা কি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খাতাদুটি? না তা অন্যত্র কোথাও আছে অথবা লুপ্ত?

১৯৪৭ সালে রবীন্দ্র-পরিবারের পক্ষ থেকে লালনের গানের দুটি খাতা রবীন্দ্রভবনে জমা দেয়া হয়। খাতার পাতাগুলি লাইনটানা কাগজ ; এতে লালনের ২৯৮টি গান পাওয়া যায়। প্রথমটির নম্বর ১৩৮ (এ) ১ ; পৃষ্ঠা ৬৮ ; দ্বিতীয়টির নম্বব ১৩৮ (এ) ২, পৃষ্ঠা ৯৫। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে এগুলি জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যের অনুলিখিত সংগ্রহ। ড. সনৎ মিত্রের মতে এগুলিই লালনের মূল গানের খাতা। খাতার হস্তলিপিতে জমিদারী সেরেস্তার 'টান' নেই ; এখানে লেখকেরও নাম নেই। রবীন্দ্রভবনের জমিদারী সেরেস্তায় রক্ষিত বামাচরণের হস্তলিপির সঙ্গে মিলিয়ে না দেখেই শচীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রনাথ এগুলিকে বামাচরণের হস্তলিপি ঘোষণা করেছেন। তারিখ, মালিকহীন এ খাতার হস্তলিপি বামাচরণের নয়, এ প্রমাণ না করেই ড. মিত্র, 'মনে হয়', 'আমার প্রত্যয়' প্রভৃতি যুক্তিতে এ খাতাকেই লালনের মূল পাণ্ডুলিপি ঘোষণা করেছেন।[illegible] [illegible]ের মতে, এটি রবীন্দ্রব্যবহৃত লালনের একমাত্র

প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি, এর বাইরে যে-সমস্ত লালনের গান রয়েছে তিনি সেগুলিকে আসল মনে করেননি। এমন কি হিতকরীর লালন বিষয়ক নিবন্ধে উদ্ধৃত সব লোকে কয়, গানটিও এ সূত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। প্রবাসীতে রবীন্দ্র-প্রকাশিত ২০টি লালনগীতির মধ্যে মাত্র ৯টি এ খাতাগুলিতে পাওয়া যায়। আর ৯টির মধ্যে তিন-চারটি গানের ক্রম ও পাঠ এ খাতার সঙ্গে মেলে। অর্থাৎ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে লালনের জাল গান প্রকাশ করেছেন ; অথবা এ খাতা নয় প্রবাসীর গানের উৎস ; অথবা এ খাতার সঙ্গে অন্য খাতা তিনি ব্যবহার করেছিলেন লালনের গানের আলোচনায়। এই তৃতীয় সম্ভাবনাটি যুক্তিপূর্ণ এবং বাস্তবে প্রমাণিত হতে পারে। প্রবাসীতে প্রকাশিত লালনের গানের ২০টিই ভোলাই-এর খাতায় আছে ; প্রবাসীর একটি অপূর্ণ পদের উৎস ভোলাই-এর খাতা। আবার তিন-চারটি পদের ক্রম রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খাতার সঙ্গে মেলে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে (১) প্রবাসীর লালনগীতি পুরনো খাতা থেকে সংগৃহীত, (২) খাতাগুলি পৃথক উৎস থেকে সংগৃহীত, (৩) আলোচ্য খাতাগুলি থেকে সতর্কভাবে গানগুলি সংকলিত ও সম্পাদিত, (৪) লালনের মূল পাণ্ডুলিপির অভাবে, রবীন্দ্রভবনের খাতার পাঠে তুষ্ট না হয়ে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর প্রামাণিক ভোলাই-এর খাতা সংগ্রহ করেছিলেন এবং এর উপর নির্ভর করেছিলেন। মনের মানুষ গানটি নিয়ে দুর্ঘটনার স্মৃতিতেই এই সতর্ক সচেতনতার জন্ম।

প্রবাসীর হারামণি বিভাগে বাউলগানের প্রকাশ ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে ভদ্রসমাজে বাউলগানের একটি সর্বজনস্বীকৃত রূপ ও রীতি গড়ে ওঠে। ইতিপূর্বে ভারতী পত্রিকায় সরলা দেবী বাউল গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহিত লেখ্য রূপের চরণবিন্যাস, কথ্য শব্দ, উচ্চারণে লৌকিক বানানরীতি যথাসম্ভব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু প্রবাসীর বিদগ্ধ সংগ্রাহকেরা এগুলিকে সাধু বা চলিত শিষ্ট ভাষাদর্শে সংস্কৃতায়িত করলেন। এক্ষেত্রে মূল লেখকের রচনাস্বত্বের দাবি অগ্রাহ্য করা হলো। ১৩২২ সালের কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ১০২) বাউলগানের আঞ্চলিক পাঠান্তরের আলোচনায় অবিনাশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "এইসব গ্রাম্যগান একরকম বেওয়ারিশী মাল। যে যেভাবে ইচ্ছা ইহাদের উপর নিজ নিজ কেরদানী জাহির করে। গানের পদ তো পরিবর্তন করেই, এমনকি রচয়িতার নামেরও গোলমাল করিয়া বসে এবং এক গানের পদ আনিয়া অন্য গানের সহিত যোগ করিয়া দেয়।"

লোকশিল্পীরা এই গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। গ্রাম্য সমাজে শিল্প বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। উচ্চবর্গের সমাজে গ্রন্থস্বত্ব সর্বজন-মান্য বিষয় ; কিন্তু শিক্ষিত জনেরা দুর্বল নিম্নবর্গের গ্রন্থস্বত্বকে মর্যাদা দেয় না। আমাদের সমাজে এ এক অলিখিত নিয়ম। সমস্যাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন, "প্রচলিত লোকসাহিত্যে গ্রন্থস্বত্ব থাকে না, মুখে-মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না।"[৬৭] বাউল গানগুলি বিভিন্ন মহতের নাম-চিহ্নিত রচনা। সাধক-গায়কেরা মহতের কথাকে বিকৃত করার বিরুদ্ধে সদা-সচেতন। লালনপন্থী সাধুসভায় যারা গান শুনেছেন, তারা জানেন যে সমবেত সাধুবা পরিবেশিত গানের কথার পরিবর্তনের কতটা বিরোধী।[৬৮] মূলত শিক্ষিত সম্পাদক ও সংগ্রাহকেরা লালনের গানগুলিকে সংস্কৃত করে ছন্দ-ধ্বনি নষ্ট করেছেন ; পংক্তি-বিভাজনে বাধিত হয়েছে অর্থবোধ ; লৌকিক শব্দের পরিবর্তনে ঘটে গেছে অর্থান্তর। সর্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত লালন গীতিকা এ পদ্ধতির আদর্শ নির্দশন।

গগনের গানটিকে প্রবাসীতে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মার্জিত করা হয়েছিল। লোকসাহিত্য সংগ্রহে পাঠান্তর, বানানরীতি ইত্যাদি নিয়ে সেকালের পক্ষে বিস্ময়করভাবে সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩০১ সালে ছড়াসংগ্রহে এ চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।[৬৯] এর কিছু পরে (১৩০৫-১২) চণ্ডীদাস পদাবলীর সংগ্রহের সমালোচনায় তিনি লিখেছিলেন, ''সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। * * * প্রাচীন গ্রন্থাদির আধুনিক সংস্করণে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। * * * আধুনিক বাংলার আদর্শে যাহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাহারা পরম অনিষ্ট করেন।''[৭০] 'পদাবলীর মাত্রাত্মক শব্দের বানান বদলালে মাত্রা রক্ষা হবে না', নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকায় এ মন্তব্য করেছেন।

জগৎবিখ্যাত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এ চেতনা বর্জন করে, প্রবাসীর ভদ্রলোকদের গ্রাম্য গান সংগ্রহের সংস্কৃতায়িত রীতিকে গ্রহণ করলেন। ১৩২২-এর প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় ৬টি, অগ্রহায়ণে ৩টি পৌষে ৫টি ও মাঘ সংখ্যায় ৬টি, এই সর্বমোট ২০ টি লালনের গান প্রকাশিত' হলো। এ গুলির সংগ্রহকর্তা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সংগ্রহ সূত্র অনুল্লিখিত। এর মধ্যে অগ্রহায়ণে প্রকাশিত ১নং পদ (চাঁদে আছে চাঁদে ঘেরা) অপূর্ণ এবং ভণিতাহীন। ভোলাই-এব খাতার এটি ১১৫ নং পদ। এখানে ২৭২ নং পদে এটির পূর্ণ পাঠ পাই। রবীন্দ্রভবনের ১ নং খাতার ১৬ পাতায় ২৮ নং পদটি ঈষৎ পাঠান্তরে রক্ষিত। এই অপূর্ণ পদটি হুবহু ভোলাই-এর খাতা থেকে গৃহীত।

প্রবাসীর ২০টি পদের মধ্যে ৯টি আছে রবীন্দ্রভবনের খাতায়। এর মধ্যে ২/১৭/১০, ১/৩৩/১৮, ১/৬৯/৩৭, ১/৭৮/৪৩, ১/২৮/১৬ এ পাঁচটি পদের পাঠ প্রবাসীর গান অনুসরণ করেনি। বাকি ৪টি গানে এ খাতার পাঠ আংশিক গৃহীত হয়েছে।[৭১]

পাঠান্তরগুলি সতর্কভাবে পরীক্ষা করে, তবেই কবি মূল পাঠ নির্ণয় করেছেন। যেমন, 'বেদে কি তাব মর্ম জানে, (মাঘ, ১নং গান) গানটি তিনবার দু'ধরনের হস্তলিপিতে ভোলাই-এর খাতায় পাওয়া যায় (পদ ৩০২, ৩৩৭, ৪০ নং পদে এটি অপূর্ণ)। পূর্ণ পদ দুটিতে একটি শব্দ 'সাপ্ততত্ত্ব', এটি সম্পাদিত হয়েছে, 'আত্মতত্ত্ব'রূপে। গানগুলিকে নাগরিকদের বোধগম্য করার সূত্রে মার্জনা ও সংস্কৃতায়িত করা হয়েছে। আর যেহেতু খাতাগুলি মূলের অনুলিখন ; ক্ষেত্রবিশেষে শব্দ লুপ্ত, দ্বিত্ব, বিকৃত ও বর্জিত ;—তাই এগুলি সম্পাদনার অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-রীতির বৈশিষ্ট্য হলো :

(১) একদাঁড়ি, দু'দাঁড়ি বা সংখ্যা দ্বারা কলিবিভাগ পরিত্যক্ত হয়েছে। এক-একটি কলি অন্ত্যমিলযুক্ত পংক্তিতে বিন্যস্ত করে এক-একটি স্তবক নির্মিত হয়েছে। কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলি পর্বের গানের রূপ ও রীতির আদল অনুসৃত হয়েছে এখানে।

(২) আবদুল হাই প্রমুখ কুষ্টিয়ার কথ্যভাষায় লালনের গান রচনার কথা বলেছেন। ভোলাই-এর খাতা এই আঞ্চলিক ভাষারীতির অন্যতম প্রমাণ। বানানে ; বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়ায় ; বহু শব্দে কথ্য আঞ্চলিক যে-রূপ ছিল, প্রায় সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ শিষ্ট চলিত ভাষাদর্শে মার্জিত করেছেন। যেমন কৈরে>করে, লেগে> লাগে, জায়> যায়, বুজে> বুঝে, চিন্‌লে> চিনলে,

লেনা> লওনা, দেখপো> দেখবো, কোলেন> করলেন, হৈলাম> হোলাম। লৌকিক উচ্চারণ সংস্কৃত হলো শিষ্ট আদর্শে—ওসুল> ওয়াসিল, চুবচাবে> চুপেচাপে, ভেড়ের> ভেড়োর ; দীর্ঘস্বরগুলিকে হ্রস্ব করা হলো—অনান্ত> অনন্ত, অধার> অধর, হোলে> হলে।

(৩) পদের কোন স্থলে শব্দ পরিত্যক্ত হলো, স্থানবিশেষে নতুন শব্দ যুক্ত হলো। যেমন ১১৫ নং ভোলাই-এর পদ-পাঠের পরিবর্তন—চাঁদ ঘুরানি লেগে> ঘূর্ণী লাগে ; বায়> বয় ; সুমজে ভবে> ঠাওরে ভজন (১৯৬ পদ)। ভোলাই-এর ১৫৬ নং পদটিতে পরিবর্তন বহু। বেদাদি শাস্ত্রপাঠে গৌণ লক্ষণার্থ পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ঘিরে ফেলে আচ্ছন্ন করে। লালন ব্যবহার করেছেন 'বেড়বে' শব্দ ; রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধি পাওয়া অর্থে 'বাড়বে' ব্যবহার করলেন।

'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে' [ভো. ৬৮] এই অতিখ্যাত গানের পদটি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভবনের খাতায় একই রকম। মূল পাঠে পাই : 'আমার এ ঘরখানা কে বিরাজ করে'। এখানে 'ঘরখানা'-র পর বিরতিটি তাৎপর্যপূর্ণ। কথ্য বাংলায় বিভক্তি, সংযোজক অব্যয় লুপ্ত থাকে ; হঠাৎ বাক্য ছেড়ে দেয়া হয়। এ ভাষার স্বভাবকে ব্যবহার করে জীবনানন্দ এক ধ্বনির যাদু সৃষ্টি করেছেন। এ রীতির পূর্বসূরী লালন। হলন্ত প্রাধান্য ছাড়াও দীর্ঘস্বরান্তে ধ্বনির অনুরণন ঘটে ; জন্ম নেয় নানা আর্তি—কথ্য ভাষার এ সমস্ত ভঙ্গী পালটে দিলে কবিতা আহত হয়। রবীন্দ্রনাথের সংস্কার কবিতার ধ্বনি ও সুরকে পালটে দিয়েছে কোথাও কোথাও। বেজেতে > বেজাত, পৈত্রীকী ধন> পৈতৃক ধন রূপান্তরে ধ্বনি-সংহতি বদলে গেছে।

(৪) দু'একটি ক্ষেত্রে গ্রাম্যশব্দের পাঠ সঠিকভাবে উদ্ধার করা যায়নি ; যেমন রায় রাঙ্গা > রায় রায়ান/রাই রাঙ্গা [মাঘ, ৩নং পদ ; ভোলাই ৩৩নং পদ] হওয়া উচিত ছিল। জীবনানন্দ দক্ষতার সঙ্গে রায় রায়ান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(৫) রবীন্দ্রনাথের জীবনবিশ্বাস এবং মূল্যবোধ লালনের থেকে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র ছিল। এই স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পদগুলির পরিবর্তনে ও পরিবর্জনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। মাঘ সংখ্যার ২নং পদে ব্যাটা শব্দ বর্জিত হয়েছে (পাগলা বেটার> পাগলাটার)। আশ্বিনের ৩নং পদটিতে এই ধরনের পরিবর্জন ও সংশোধন বহু (১৯৬ নং পদ)। ১ম পংক্তিতে 'সেই' বর্জিত ; ২য় পংক্তিতে ভাই> তাই ; ৫ম পংক্তিতে, 'সাঁই' অতিরিক্ত যোজনা। ভোলাই-এর খাতায় ৩য় কলিটি × চিহ্নিত। 'জেন্তে জদি না দেখিবে' ইত্যাদি অংশে এ জন্মে, এ ভবে, প্রত্যক্ষভাবে ইষ্টকে পেতে চান লালন ; পরকাল, পরলোকে তিনি অনাগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ পরজন্ম, পরলোকের অস্বীকৃতিটুকু সম্পূর্ণত বর্জন করেছেন প্রকাশিত কবিতায়। পৌষ সংখ্যার ১নং (ভো. ৩৩) পদ 'এমন মানব জনম আর কি হবে'—। ভণিতায় ছিল, 'অধীন' লালন তাই ভাবে' গুরুর এই অধীনতা অস্বীকার করে রবীন্দ্র পদটি বদলে লিখলেন, 'লালন কয় কাতরভাবে'। পদে, কত ভাগ্যের ফলে' অংশে প্রবল ইহবাদ এবং মানবজন্মের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। লালনের মতে, সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ ; স্রষ্টার লীলারস আস্বাদনের জন্য জাত। দেহী মানুষের এ মহিমাকে, 'ইচ্ছা' থেকে সৃষ্টির ভাববাদী সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। 'মানুষ' বদলে লিখলেন 'মানস'। বহু পরে ছন্দের আলোচনায় লালনের এই কবিতাংশ ব্যবহার করতে গিয়ে প্রবাসীর প্রকাশিত পাঠ সংশোধন করে রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপির 'মানুষ রূপ' ব্যবহার করলেন। পরিণত এই প্রজ্ঞায় মানুষ মহামহিম মর্যাদাপ্রাপ্ত। 'মানস' থেকে এই 'মানুষে' ফেরায় লালনের

বিশেষ এক প্রভাব কার্যকর ছিল। এই পাঠান্তর লালনকে নিয়ে কবির গুরুতর এক চিন্তাভাবনার ফসল। সরলা দেবীর প্রকাশিত লালনগীতির মাত্র তিনটি রবীন্দ্র-প্রকাশিত গানে পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-সম্পাদিত লালনগীতির সঙ্গে সরলা দেবীর সম্পাদনার চরণ, শব্দ, অঙ্গসজ্জা ও ভাষাগত পার্থক্য আছে।[৭২] সরলা দেবী সম্প্রদায়ের কলিবিন্যাস অনুসরণ করেছেন এবং গ্রাম্য বাক্‌রীতিকে মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি পর্যায়ের কবিতা/গানের আদলে ৪ বা ৫টি স্তবকে লালনের গান সাজিয়েছেন, বহুসময় পর্বান্তিক মিত্রাক্ষর চরণান্তিক মিত্রাক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিবর্তন, সংশোধন, মার্জনার মধ্য দিয়ে লালনের পদকে উজ্জ্বলভাবে আধুনিক পাঠকের সামনে তুলে ধরার সৎ অভিপ্রায় ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু পরবর্তীকালে বহু অক্ষম সম্পাদক, মহাকবির দৃষ্টান্ত অনুসরণে লালনের পদ-সংস্কারে, অবাধ হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করেছেন। তৃপ্তি ব্রহ্ম এবং আরো অনেকে 'অশিক্ষিত' লালনের গানগুলির যথার্থ নামকরণ করেছেন। [লালন পরিক্রমা] সূত্র বা সম্পাদনার রীতি বিবৃত না করেই, পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সুধীর চক্রবর্তী [বাংলা দেহতত্ত্বের গান]। কুড়িটির অধিক লালনগীতি সংগ্রহে কেউ সম্পাদনার বিজ্ঞানসম্মত রীতি অনুসরণ করেননি ; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে, সম্পাদনার সূত্রে লালনের গান সবচেয়ে বেশি বিকৃত হয়েছে। ড. সনৎ মিত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের গানগুলি, 'হুবহু' মুদ্রিত করতে গিয়েও পংক্তি, পর্যায় ও নামকরণের ভিন্নতা আরোপ করেছেন এখানে। লালনের গানের গ্রন্থস্বত্ব নেই। নেই লালনপন্থী সাধকদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা। তাঁরা সংঘবদ্ধ নন। তাঁদের হাতে প্রামাণ্য কোন লালনগীতির লেখ্য পাণ্ডুলিপিও অবশিষ্ট নেই। রাঢ়ের বহু গায়ক লালনের ভূমিকা বর্জন করে, সামান্য পালটে লালনের পদকে অন্য নামে চালান। ভদ্রলোকের মুদ্রিত গ্রন্থকে ব্যবহার করতে হয় গায়কদের। তথাপি গুরু-মুখে বাহিত সাধক-গায়কদের মধ্যে লালনের পদের শুদ্ধ কাঠামোটি পাওয়া যায়। শিক্ষিত সম্পাদকেরা লালনের গান থেকে অর্থ বা সম্মান ও উপাধি লাভ করেছেন। তাঁদের প্রতিটি গ্রন্থের ব্যক্তিগত স্বত্ব আছে। শুধু নিম্নবর্গের মহান শিল্পী লালনের গানের কোন মর্যাদাময় স্বত্ব নেই ; উচ্চবর্গের গানগুলিকে বিকৃত করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আইন নেই। সরলাদেবীর সম্পাদনার রীতি অনুসৃত হলে লালনের গানের প্রকাশনাগুলি হতো অনেক সত্যনিষ্ঠ।[৭৩]

পরবর্তী আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে বাউল এবং লালনের প্রভাবের ক্রমবিকাশ দেখাতে চাই। বাউল এবং লালন একাকার হয়েছিল রবীন্দ্রচিন্তায়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বাউলের উল্লেখ খুব কম। ইতিপূর্বে পোষ্টমাষ্টার এবং বৈষ্টমী গল্পের কথা আমরা বলেছি। মেঘ ও রৌদ্র গল্পের, ১০ম পরিচ্ছেদে একদল বৈষ্ণব গায়ক-ভিক্ষুকের উল্লেখ পাই। ইতিপূর্বে বাউল গানের শ্রুত চরণাংশ কবির সৃষ্ট চরিত্রের মনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৩২১-এ লিখিত শেষের রাত্রি গল্পে, "হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটি বাউল গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল :

ওরে মন যখন জাগলি নারে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙ্গলরে ঘুম
ও তোর ভাঙ্গল রে ঘুম অন্ধকারে।

এ গানটি কিন্তু রবীন্দ্র-বাউলের রচিত। গীতাঞ্জলি-উত্তর যুগে কবি নিজেই বাউল গান লিখছেন, এটি তাৎপর্যপূর্ণ।

বাউলের উল্লেখ ও বাউল-বিষয়ক নানা চিন্তাভাবনা রবীন্দ্র-নিবন্ধে পাওয়া যায়। পূর্বে উল্লিখিত বাউলগানের সমালোচনার পর সমাজে, অযোগ্য ভক্তি প্রবন্ধে মনুষ্যপূজার প্রসঙ্গ এসেছে। কর্তাভজা ও অন্ধ ভক্তিবাদের সমালোচনা, সংস্কারমূলক অন্ধ দেবদ্বিজে ভক্তিকে তিনি ধিক্কার দিলেন। কিন্তু যুক্তি-প্রমাণঋদ্ধ ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা, বাউলদের মতো, তিনি স্বীকার করলেন। সাধুশূদ্রকেও ভক্তি, ভক্তের মহিমা, মানবমিলনে ভক্তির রাসায়নিক শক্তির কথা বলে, কবির মন্তব্য, 'স্বাধীন বোধশক্তিযোগে যে ভক্তিবলে মহত্ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করি তাহাই সার্থক ভক্তি।' ১৯০৯-এ সাহিত্য পরিষদে ভাষণটি থেকে লালন-প্রসঙ্গ বর্জিত হলেও[৭৪] এখানে অধুনা গ্রামের বাউল-ধর্মান্দোলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ আছে। পরিবর্তনের অনিবার্য প্রবাহে নিম্নবর্গের জীবনে নানা ধর্মান্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার ফসল এগুলি। জনজীবনের গতিবিধি বোঝার পক্ষে এগুলি অত্যাবশ্যক।[৭৫]

১২৯৯-তে বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির স্বভাবের সম্পর্কের সূত্রে কীর্তন, প্রসাদী গানের সঙ্গে বাউল গানেরও আলোচনা করলেন। সুরের সাহায্য নিয়ে কথার ভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করা প্রাচীন বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য। কাব্যরচনা তার মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ।[৭৬] রবীন্দ্রসঙ্গীত তো এই ঐতিহ্যের ফসল। বিষয়টি পুনর্বার আলোচিত হয়েছে, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে, বন্ধনের বিরুদ্ধে হৃদয়াবেগের বঙ্গীয় ধর্ম বাউল ও কীর্তনে আছে জন্যই তা এদেশকে প্লাবিত করেছিল।[৭৭]

বিচিত্র প্রবন্ধের পাগল প্রবন্ধে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমী শক্তি হিসাবে, সমাজের বহির্ভূত প্রতিবাদী শক্তি হিসাবে পাগল ও ক্ষেপাকে গণ্য করা হয়েছে। চৈতন্য, শিব সবাই ক্ষেপা। পরকে আপন করার তত্ত্বও এখানে আলোচিত হয়েছে। লালনের একটি বিখ্যাত পদ স্মরণে আসে। গায়ে ছাই মাখলে, শ্মশানে থাকলে পাগল হয় না, পাগলের আত্মপর ভেদ থাকে না।[৭৮]

বিবিধ প্রসঙ্গে কবি যত লোক তত জগৎ এ মত ব্যক্ত করেছেন। যত কাল্লা (কলেবর) তত আল্লা এবং 'দেহই ভুবন' এ বাউল মতাদর্শ এখানে স্মরণ করা যায়।[৭৯]

মনসুরউদ্দীনের হারামণির শুভেচ্ছালিপিটিতে পাই নানা তথ্য :

১. শিলাইদহে বাউলদলের সঙ্গে আলাপ, গান শোনা, পুরনো খাতা দেখার প্রসঙ্গ।

২. নিজের বহু গানে জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে বাউলের সুর গ্রহণের স্বীকৃতি।

৩. বাউলের বাণী কোন একসময় সহজ হয়ে মিশে গেছে রবীন্দ্রচিন্তায়।

৪. উপনিষদের মনের মানুষের সন্ধান বাউল করে।

৫. সখের বাউল ও সস্তা, বিকৃত বাউলগান।

৬. স্বদেশের উপেক্ষিত জনগণের মূল্যবান মনন ও চিন্তা আছে এতে।

৭. ঐক্যমূলক ভারত-সংস্কৃতি, কোরাণে-পুরানে দ্বন্দ্ব নেই, সব ধর্মের মানুষের জন্য এক আসন রচনা করেছে বাউল মতবাদ।

৮. বাউল গানের ভাষার সারল্য, ভাবের গভীরতা, সুরের দরদ অতুলনীয়। জ্ঞানের তত্ত্ব, কাব্যগুণ ও ভক্তিরসের অপূর্ব এ মিশ্রণ লোকসাহিত্যে দুর্লভ।[৮০]

বাউল গানের মনের মানুষ বীজমন্ত্রের মতো পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্র-মননে।

শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর ছোট ও বড় প্রবন্ধে মনের মানুষ ও অচিন পাখীর প্রসঙ্গ আছে। বৈদিক 'পিতা নোহসি' কে স্মরণ করা হয়েছে।[৮১] মানবসত্য ও জীবনদেবতা তত্ত্ব বাউলের মনের মানুষ থেকে অভিন্ন বলে তাঁর মন্তব্য, "এই মনের মানুষের এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে।"[৮২] আর মানুষের ধর্মে বাউল মতবাদের ঋণ তো সর্বজনজ্ঞাত।

মানুষের ধর্মে, 'কোথায় পাবো তারে' গানের পরে পাই, "সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম, তোর ভিতর অতল সাগর। সেই পাগলই গেয়েছিল, "মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।"[৮৩] অন্যত্র "আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলেছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যে, তাকে বলে মনের মানুষ।"[৮৪] মানুষই ঈশ্বরের অবতার, ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানটি আলোচনা করে এ মতবাদ তুলে ধরেছেন কবি।[৮৫]

উপনিষদের দুই পাখীতত্ত্ব এবং রবীন্দ্র-বিশ্বাসের একটি চিন্তার অহং ও আত্মার দ্বন্দ্বে অহং জীবসত্তা হিসাবে নিন্দিত। লালনপন্থী গানের বাহাসে 'তুমি এবং আমি', প্রসঙ্গটি অতিপরিচিত। তাদের মতে সর্বভূতে 'আমি' থাকে, এই আমি বা আত্মতত্ত্বই একমাত্র জানার। গীতা, উপনিষদ সকলেই এই 'আমি' কে জানতে বলেছে। রবীন্দ্র-কবিতার অন্তিম পর্যায়ে এই 'আমি' এবং 'আমার' শব্দ ও তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কবি এই সোহং তত্ত্ব ও মনের মানুষ-তত্ত্বকে অভিন্ন মনে করে রামানন্দ, যীশুকে এ তত্ত্বের প্রবক্তা মনে করেছেন। 'মানবমহিমার তত্ত্বই সোহমবাদ—এতে সকলের অধিকার।'[৮৬] সহজ বৈষ্ণব সাধনায় এবং বাউল সাধনায় ত্রিবিধ চেতনসত্তার কথা বলা হয়েছে : জীব, ঈশ্বর, মানুষ বা যোনিজ, অযোনিজ, সংস্কারা। এই জীবসত্তাকে সাধনায় পরাজিত করতে হয়—জীবকে মানুষ (Nature-Culture) করতে হয়। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব মানুষের ধর্মের বহুস্থলে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৮৭]

তিনি ভারতীয় দর্শনশাখার অভিভাষণে (১৯২৫) লালনের খাঁচার ভিতর অচিন পাখী গানটিকে উপনিষদ ও শেলীর কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই গানের সমধর্ম উৎসারিত হয়েছে তাঁর বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর মধ্যে।[৮৮]

ব্রাহ্মধর্ম মূর্তি বা রূপে আসক্ত নয়। উপরন্তু কবি সুরদাসের প্রার্থনায়, রাজা নাটকে, মেঘদূতের আলোচনার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সত্য বা সুন্দরকে না-পাবার তত্ত্ব এবং খণ্ড-পৃথিবীতে অপূর্ণতার কথা বলেছেন। কিন্তু এরই সমান্তরালে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না করে সত্যের সন্ধানও চলেছে। আত্মপরিচয়ে নিজ ধর্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ফাল্গুনীর বাউলকে উদ্ধৃত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, "রূপের মধ্যেই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।"[৮৯] এই প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয়টি বাউলতত্ত্ব।

বাউল প্রসঙ্গে বারবার রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ স্মরণ করেছেন। শিলাইদহের গোঁসাই গোপালের পরম্পরায় কথিত হয় যে প্রাচীন ধর্মে দুটি স্রোত—(ক) বৈদিক : শাস্ত্র ও গ্রন্থনির্ভরতা, গুরু বা পুরোহিত ধর্মাচরণ করে, অন্যেরা দ্রষ্টা ; (২) আর একটি ধারা উপনিষদের—গুরুর কাছে শিখে নিজেকে জানার সাধনা নিজে করতে হয়।[৯০]

ছন্দের আলোচনায় কবি নিজের রচনায় গীতাঞ্জলি পর্ব থেকে চলতি ভাষার কলধ্বনি ও সুরকে ব্যবহার করবার জন্য অগ্রজের ঋণ হিসাবে লালনকে স্মরণ করেছেন।[৯১] ছন্দ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় লালনের ভণিতাযুক্ত ২টি এবং ভণিতাহীন একটি পদ [প্রবাসী

থেকে পৃথক, পাঠান্তর] আলোচনা করে বাংলাভাষার নিজস্ব সম্পদ, সহজ সারল্য, বিচিত্র ছন্দভঙ্গী, ছোট-বড় নানা বক্রগতি কীভাবে এর রূপ নির্মাণ করেছে, তা তুলে ধরে লালনকে যথার্থ শিল্পী ও রূপরসিক আখ্যা দিলেন। কবির মতে লালনের পদের মূলধন "ধ্বনি"।[১২]

লালনের ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো তৎসম-প্রাকৃত শব্দের অনায়াস-মিশ্রণ।[১৩] (গুরুচণ্ডালী দোষ)। বাংলাভাষা পরিচয়ে শব্দ-নির্বাচন ও সহজ উপমার নিদর্শন হিসাবে ক্ষিতিমোহন-সংগৃহীত বাউলগানের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৪]

নিবন্ধে বাউলের প্রসঙ্গ বহু ; কিন্তু মাত্র দু'ক্ষেত্রে লালন ব্যক্তি-নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

বাউল-নৃত্যে, অঙ্গভঙ্গীতে এর নীরব নাট্যভাষা আছে। বাউলগানে শ্রাব্যরীতির সঙ্গে দৃশ্যরীতির মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাটকে বাউলের আবির্ভাব এবং প্রভাব অধিকতর। একতারা হাতে নৃত্যপর বাউলের ভূমিকায় অভিনয় ছিল তাঁর প্রিয়। নাটকে আচারধর্মের সঙ্গে কল্যাণধর্মের যে-সংঘাতের কথা কবি বলেছেন ; বাউল তো সমস্ত জীবনে এই আচার এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ আত্মিক ও অরাজনৈতিক। এ সূত্রে রবীন্দ্রনাট্যচিন্তায় বাউলের অনুপ্রবেশ।

১৮৯৮-এ শিলাইদহ বাসকালে রচিত হয় বিসর্জন। রবীন্দ্রনাথ লালন প্রসঙ্গে জৈন ধর্মের কথা বলেছিলেন। বৈষ্ণব বাউলদের জীবহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জৈন অহিংসার অতিরেকের সঙ্গে অভিন্ন। মুসলমান বাউল কোরবাণী দেয় না ; হত্যা করে নফসকে। জীবহত্যার বিরুদ্ধে এদের অতিরঞ্জিত প্রচার এবং সর্বপ্রাণবাদের সূত্রে জীবের সঙ্গে মানবসম্বন্ধ স্থাপনের সঙ্গে বিসর্জন নাটকের সম্পর্ক আছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে জয়সিংহ মানবী অপর্ণাকে দেবীরূপে পূজা করেছে। ৩য় দৃশ্যে বলা হয়েছে :

'দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া যারে ভালবাসি তার মুখে'।

৪র্থ দৃশ্যে দেবীপ্রতিমা অপেক্ষা মানবী অপর্ণার সত্যতা ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। নাটকের উপসংহারে মানুষকে দেবতা হিসাবে বরণ করা হয়েছে। লালনশিষ্য দুদ্দুর একটি পদে পাই—

'জ্যান্ত কালী ঘরের মধ্যে দেখলি না
পুতুল পূজে মলি হারে দিন কানা'।[১৫]

বিসর্জনে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা অপেক্ষা মানবিকতা ও মানুষকে দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাউল-ভাবনার ছায়া আছে। এ নাটকের ২ অঙ্কের ২ দৃশ্যের গানটি বাউলাঙ্গের।

শেষ রক্ষা ও গোড়ায় গলদ নাটকের সমাপ্তি-সঙ্গীত দুটি বাউল গান। ব্যঙ্গকৌতুকে বশীকরণ নাটকে নিরূপমার গানে আছে, 'তব স্পর্শে পরশ রতন'। মানুষের স্পর্শেই মানুষ সোনা হয় এ বিশ্বাস বাউলের।

শারদোৎসব নাটকের ২ দৃশ্যে 'আজ ধানের ক্ষেতে' গানটি বাউল সুরের। নাটকের বিশ্ব-আনন্দপ্রবাহে যোগ দিয়ে সহজ হবার যে তত্ত্বটি, তা সহজ সাধনা-সম্পৃক্ত। আর বাউলপন্থাও তো আনন্দমার্গ। সবার মধ্যে আত্মকে প্রসারিত করে যে দেখে, সেই বাউল। নাটকের ঋণশোধের ধারণাটি রাধাঋণ ও মাতৃঋণ শোধের বাউলতত্ত্বের অনুরূপ। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী কাঙাল-লালনের আদলে নির্মিত। তার চরিত্রে হরির প্রতি আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা তাকে বীর্যবান করেছে। গানে সেও খোঁজে মনের মানুষ। অক্ষয় মৈত্রেয় এর লালনের বর্ণনায় দেখা

যায় যে যুক্তিতর্কের বদলে সে গান গায়। এ বৈশিষ্ট্য ধনঞ্জয়েরও। রাজবাড়ির মহিলারা তার গান শুনতে উৎসুক। ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের লোকশিল্পীদের প্রতি আগ্রহকে স্মরণ করায়। নররূপী ভগবানকে উপবাসী রেখে সে জমিদারকে খাজনা দেবার বিরোধিতা করেছে। দুধুমিঞার আন্দোলনে বা পাবনার কৃষক বিদ্রোহে এই খাজনা না-দেবার সমস্যাটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। পরিত্রাণ নাটকের ২ দৃশ্যে মন্ত্রী যথার্থই বলেছে যে ধনঞ্জয় ধর্মের ভেক ধরে প্রজা-বিদ্রোহের সাহস দিয়েছে। বলা বাহুল্য, ধনঞ্জয়ের গানগুলি বাউল গান।

প্রায়শ্চিত্তের ১৫ বছর পর মুক্তধারায় আবার ধনঞ্জয়কে দেখা যায়। অপ্রাণ, জাতিদম্ভ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সে নেতা। বটু প্রায় বাউল ; তাছাড়া এ নাটকে বাউল দলের গান আছে। লক্ষ করার বিষয় যে সামন্তশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে বাউল আছে। কিন্তু নাগরিক শ্রমিক ও যন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে, রক্তকরবী নাটকে বাউল নেই। বিশু পাগল বাউলের লক্ষণাক্রান্ত।

গৃহপ্রবেশ নাটকে হিমির গানটি (রসের সরোবরে মূলহারা ফুল) লালনের ফুলের গানকে স্মরণ করায়। মুক্তির উপায় নাটকে মর্কট সন্ন্যাসের প্রতি, অ-গুরু জঙ্গলের প্রতি, ভাববাদী গুরুভক্তি ও অলৌকিক বিশ্বাসের প্রতি সমালোচনাগুলি বাউলভাবাপন্ন।

রাজা নাটকে ২য় ও ৫ম দৃশ্যে বাউলদলের গান আছে। ৫ম দৃশ্যের গানটির সঙ্গে (যা ছিল কালো ধলো, তোমার রং-এ রাঙা হল) লালনের, 'শ্যামাঙ্গ-গৌরাঙ্গ হবার', সাদৃশ্য আছে। ১০ম দৃশ্যে সুরঙ্গমার 'আমি কেবল তোমার দাসী'র সঙ্গে লালনের 'হতে চাও হুজুরের দাসী'-এর মিল আছে।

অচলায়তন নাটকের শাস্ত্র-আচারবিরোধী গানে এবং অস্পৃশ্য নিম্নবর্গের গুরু ঠাকুরদাদার মধ্যে বাউলের ছায়া দেখা যায়। ডাকঘর নাটকে ফকিরবেশে ঠাকুরদাদার আবির্ভাব। লালন নিজেকে সর্বত্র ফকির বলেছেন ; হরিনাথের ভণিতায়ও পাই 'ফকির।' ফাল্গুনী নাটক 'কবিবাউলের একতারা'। কোটাল যাদের পাগল বলে চিহ্নিত করেছে (২য় দৃশ্যে) তারা ভ্রাম্যমান, কর্মের বন্ধনমুক্ত গায়কদল "সহজ মানুষ"। নাটকের তিনটি গান, ১. ভালো মানুষ নইরে মোরা ২. যে পথ দিয়ে চলে এলি ৩. আপনাকে ফুরিয়ে দেয়া—উল্টোকথা, সামাজিক নিন্দা অগ্রাহ্য করা, মাতৃজঠরে প্রতিজ্ঞা, জ্যান্তে মরা প্রভৃতি বাউল অনুষঙ্গে এগুলি পূর্ণ।

এ নাটকের বাউল মহত্তম মর্যাদা পেয়েছে। চন্দ্রহাস যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে চায়, সে পথের সন্ধান জানে একমাত্র অন্ধ বাউল। তার পথ নিজের ভেতরে ; গানে তার চলা এবং সাধনা।

বৌঠাকুরাণীর হাটে ধনঞ্জয় নেই ; গানও বৈঠকী সঙ্গীত। বাউল চরিত্র এবং গান পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে রবীন্দ্র-নাটকে। যাত্রাপালায় বিবেকের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাট্যে বাউল পালন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাউল-ফকির অনুষঙ্গ প্রাচীনতর। ১৮৮৬-তে রচিত রাজর্ষিতে বাউল, ফকির এবং সন্ন্যাসীদের দেখা যায়। ৪৪ পরিচ্ছেদে অতৃপ্ত বাসনার অভিমানে পূর্ণ ফকিরের বিশ্লেষণ, যেন সাধারণ অসাধক বাউলের বিবরণ। এ নাটকের বিল্বন যন্ত্রসহযোগে গান করে ক্লান্তি দূর করতেন। নিজের সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে তিনি জনসেবায় রত। কাঙালের রচনায় এবং লালন-দুদ্দুর ঘোষণায় জাতি-পরিচয় অগ্রাহ্য করে মানুষের পরিচয়দানের পদ্ধতি বিল্বনেরও, "আমার কোন জাত নেই, আমার জাত মানুষ।"

গোরা উপন্যাসের সূচনায় ব্যবহৃত বাউলগানের চরণাংশে গোরার আত্ম-অনুসন্ধানের সূত্রে বাউল অনুষঙ্গ হিসাবে জাতপাত-আচারের বিরুদ্ধে সার্বজনীন মানবতার কথা জড়িত ছিল। উপন্যাসের মূল বীজটি এতে সুপ্ত ছিল ; ঘটনাক্রমে তারই বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে

গোরা উপন্যাসে। নায়ক আত্ম ও দেশ-আত্মার সন্ধানে মধ্যপর্বে গ্রাম-পরিক্রমায় দেখেছে নীলকর-বিরোধী গণসংগ্রামী ঐক্য ধর্মের সীমানা ভেঙে নতুন মানব-সম্পর্ক স্থাপন করেছে। হিন্দু নাপিতের গৃহে পালিত হচ্ছে পুত্রস্নেহে এক মুসলমান শিশু। বিশ্বনও মুসলমান অনাথ শিশুদের পালন করত। লালন পালিত হয়েছিলেন এক ফকিরের বাড়িতে। গোরা চরিত্রের বিবর্তনে গণসংস্কৃতির এ ঘটনাটি বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। হিন্দু-মুসলমান ভেদ অগ্রাহ্য করে লালন প্রচার করেছিলেন ঐক্যের। বিপন্ন উপনিবেশের নাগরিক মধ্যবিত্ত রক্তসম্পর্কের অতীত নতুন মানব সম্বন্ধের, আমাদের মৃত্তিকালগ্ন এ রসকে শোষণ করে নিতে চেয়েছে। ১৮৯১-তেও রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হিসাবে জনগণনায় নিজেদের theistic Hindu হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়েছেন। ইতিপূর্বে লালন-দুদ্দুর আন্দোলন এবং নিজেদের মানুষ হিসাবে ঘোষণাটি কবিকে অশেষ-বিশেষে ভাবিত করেছিল। পারিবারিক ধর্মের গণ্ডি থেকে কবির নিষ্ক্রমণ, গোরার হিন্দু বৃত্ত থেকে বহির্গমন একসূত্রে গাঁথা। আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বাউল-সাধক ভাবে প্রকৃতি হতে চায়। বাউল-ভাবনায় নারীত্বে মানবিক স্নেহ প্রেম দয়া প্রভৃতি গুণ আছে। সে প্রাকৃতিক 'মানুষ'। নারী ও মনুষ্যত্ব তাদের কাছে সমার্থক। ভারতে শূদ্র ও নারী বরাবর ধর্ম ও বেদে অধিকারহীন। কথিত হয় তাদের জাত নেই। লালনের জাতিবিরোধী গানেও ব্রাহ্মণী বা মুসলমানীর জাতিচিহ্ন নেই বলা হয়েছে। এই জাতিসংস্কারমুক্ত মানবী আনন্দময়ীই ভারত-আত্মার দ্বিতীয় উপমারূপে গোরার কাছে গৃহীত হয়েছেন। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে বাউল নাস্তিক। কিন্তু সে মানুষকে বসায় ঈশ্বরের আসনে। চতুরঙ্গের জ্যাঠামশায় এ আদলে গঠিত।

ঘরে বাইরে উপন্যাসে বাউল-বৈষ্ণব পরকীয়া রসসাধনার, দেহকামনার নানা ইঙ্গিত সন্দীপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষরূপেই দেখা দেন।' 'হ্লাদিনী নারীকে পুরুষরূপী কৃষ্ণ সন্ধান করছে।' সন্দীপের গানগুলিও বাউলের এবং পরকীয়া সম্পর্কের গুণগানে মুখরিত। এখানে বাউল অনুষঙ্গ হীন বর্ণে চিত্রিত হয়েছে।

বাউল, বাউলতত্ত্ব, বাউল গান তথা লালনের শিল্পরীতি রবীন্দ্র-চিন্তার পর্বে পর্বে প্রতিফলিত হয়ে বিশেষ রূপ ও রসের মূর্তি গ্রহণ করেছিল। গানে বাউল সুর গ্রহণ ও মিশ্রণের কথা তিনি বলেছেন। গানে কথা-প্রাধান্যের প্রাক্তন ঐতিহ্য তার মধ্যে ফলবতী হবার কথাও বলেছেন। ছন্দের আলোচনায় বাউল গানে শিল্পরূপের প্রভাব নির্ণয় করেছেন গীতাঞ্জলি পর্বে। হারামণির ভূমিকায় বাউলের 'বাণী' সহজ হয়ে তার শিল্পে মিশ্রিত হবার প্রসঙ্গ আছে। লালনের কাবিতার শব্দ, চরণ, চিত্রকল্পগুলি নানাভাবে গানের খাতার মাধ্যমে রবীন্দ্রশিল্পে সঞ্চারিত হয়ে অর্থান্তরের মাধ্যমে নবজীবন লাভ করেছিল। লালনের গান পাঠকসমাজে তুলনায় কম পরিচিত বলে এবং স্থানাভাবহেতু তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করে অল্প কয়েকটি উদাহরণে আমরা সীমাবদ্ধ থাকব। বলা বাহুল্য এ প্রভাব সোনার তরীর কাল থেকে প্রবল হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সহজ সাধনার স্মৃতিবহ সহজ শব্দের এবং মতবাদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজ হওয়াকে তিনি সাধনার সিদ্ধি, মনুষ্যত্বের চরম হিসাবে গ্রহণ করতেন। এ সহজ আবার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়াও বটে। লালনের সাধনা মূলত সহজ সাধনা।

বাউল সাধনা এবং লালনের গানে আত্মাকে সব কিছুর মধ্যে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধেও এ চেতনা আছে। যখন সাধক বিশ্বের মানুষের সঙ্গে নিজেদের একসূত্রের জৈবিক বন্ধন বুঝতে পারে, তখন সে বোঝে যে একের কর্ম, দুঃখ-সুখ অন্যেরও বটে। 'এ পাপ তোমার আমার' ঝড়ের খেয়া কবিতা-ব্যাখ্যায় আইয়ুব একের পাপে অন্যের শাস্তির অসঙ্গতির প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বিশ্বাসে মানুষ অবিভাজ্য বলে একের পাপ অন্যকে স্পর্শ করে। এ বিশ্বাসেই তিনি মনে করেছেন যে যতদিন মানুষ আছে, ততদিন তিনিও আছেন ;— 'সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি'। এই আমি তত্ত্ব রবীন্দ্রকবিতায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৬]

সোনার তরীর সমসময় থেকে কয়েকটি জটিল চিত্রকল্প কবিতায় নানা নতুন অলঙ্করণে সজ্জিত হয়ে বারে বারে দেখা দিয়েছে। এর 'আর্কিটাইপ' কাঠামোর উৎস পাই লালনের গানে।

(১) ফাঁদ : গ্রামীণ জীবনের ব্যবহৃত এ উপাদানকে প্রতীক হিসাবে লালন ব্যবহার করেছেন। মানুষ ধরার ফাঁদ, ত্রিবেণীতে ফাঁদ পেতে মানুষ ধরা, হাওয়ায় ফাঁদ—নানারকম ফাঁদ আছে তার গানে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের ফাঁদ, রূপের ফাঁদ, আরো নানা ফাঁদের প্রতীক তিনি রচনা করেছেন।

(২) বাউলগানের একটি বিশেষ পর্যায় হলো 'পারের গান।' এখানে নদী, তরী, কাণ্ডারী এবং পারগামী ব্যক্তি নিয়ে একটি চতুর্ভুজ রচিত হয়েছে।

প্রচলিত রূপকে নদী সময়ের প্রবাহ। কিন্তু ধর্ম ও পুরাণ-কথায় পিতৃলোক-ইহলোকের মাঝে দুস্তর বৈতরণী। লৌকিক কৃষ্ণকথার দানখণ্ডে নদীপারের প্রসঙ্গ, চর্যায় দুরন্ত নদীতে বৃদ্ধা কাণ্ডারী পার করে। বাউলগানে জীবনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়া এবং গুরু কাণ্ডারীর পরিচালনায় অন্যপারে উপনীত হওয়া জটিল এই চিত্রকল্পের পটভূমিকা। এ নদী বিঘ্ন, বিপদ, ঝড়তুফানে ভরা—তা থেকে গুরু রক্ষা করেন।

রবীন্দ্রকবিতায় বারংবার এই নদী, নৌকা, কাণ্ডারী, ঝড়তুফানের মিশ্রিত চিত্রকল্প এসেছে।[১৭]

জীবন্তে মরে নদীর ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ানোর প্রতীক পাই লালনের গানে। জীবননদীর ঘাটে ঘাটে অনাসক্তভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কবিতাও ভ্রাম্যমান।[১৮]

আর একটি বিরোধাভাসপূর্ণ লালনের চিত্রকল্প 'নদীতে ফুল ফোটা, যে ফুলের মূল নেই'। ফুলের গানের এ চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন।

(৩) লালনের গানে নিজেকে যন্ত্র এবং গুরু বা অন্তঃস্থিত পরিচালককে যন্ত্রী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এটি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় চিত্রকল্প এবং নানারূপে এটি রূপান্তরিত হয়েছে।

(৪) লালনের অন্যতম আর একটি চিত্রকল্প হলো 'পরশমণি।' এই স্পর্শমণি সিদ্ধ সাধক বা প্রেম, যার স্পর্শে মানুষ খাঁটি সোনা হয়। এই স্পর্শমণি রবীন্দ্র-কবিতায় বহুব্যবহৃত।[১৯]

সোনার তরী থেকে নানা নতুন শব্দ, বাক্‌ভঙ্গি, চিন্তা ও চিত্রকল্প রবীন্দ্রকাব্যে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সোনার তরীর সর্বত্র সোনা। ধান, রোদ, প্রান্তর, জীবন, তরণী সর্বত্র সোনার স্পর্শ। প্রাচীন রাসায়নিক গোষ্ঠী মূল্যবান এ ধাতু তৈরি করতে চেয়েছিলেন, রাসায়নিক পদ্ধতিতে। লোকবিশ্বাসে সোনা ক্ষয়হীন ধাতু। বৈদিক যুগ থেকে সোমযাগে, পরে ভক্তিতে (হনুমান), ইষ্টের আশীর্বাদে, কায়াসাধনায় সোনার দেহ বা অমর দেহলাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। রস-রসায়নে রসিক লালনও দেহকে স্বর্ণে পরিণত করার সাধনা করেছিলেন। ইহজীবনের সব কিছু মূল্যবান বলেই সোনার প্রতিচ্ছবি এ কাব্যে। স্বর্ণতরীকে এবং তাতে রক্ষিত সামগ্রীকে 'কাল ধ্বংস করে না। কিন্তু দেহী মানুষের অমরত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সোনার তরীতে। শেষ কবিতায় মরণের বিপরীতে, নিত্য মৃত্যুহীন জীবন—তার পরিচালক সুন্দর।

বাউল বৈষ্ণব রসসাধনায়, যারা ভাবযোগ্য মঞ্জরীর সিদ্ধ দেহ লাভ করেন, তারা মরণকে এড়িয়ে নিত্য বৃন্দাবনলীলায় অনুপ্রবিষ্ট হন। জীয়ন্তে যে মরে তার হয় না প্রাকৃতিক মৃত্যু। সুতরাং অপরিবর্তনীয় নিত্যলীলায় দেহীর স্থান আছে। তাই নিরুদ্দেশ যাত্রার স্বর্ণতরীতে কবি স্থানলাভ করেন। জটিল এক সাধনার তত্ত্ব এবং ঐতিহ্য নিরুদ্দেশ যাত্রার স্বর্ণতরীর প্রতীকের পশ্চাদ্‌পট রচনা করেছে।

লালনের সাঁই বিচিত্র রূপে নারী-পুরুষ, চোর-সাধু-বিচারক, সাপ-ওঝা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হন। আর ইষ্টকে প্রেমিক বা সাধনসঙ্গিনী রূপে কল্পনা করা হয় বাউল-সাধনায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা পুরুষ, নারী, প্রেমিক, সখা, প্রভুরূপে আসেন ; আবার অন্তরে তিনি প্রেমিকার এক দিব্যমূর্তি। একই সত্তার বিচিত্ররূপের বন্দনা আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। সোনার তরীতে এ সত্তার প্রথম আবির্ভাবে, বাউলসাধনার 'মনের মানুষের' স্পষ্ট প্রভাব চিহ্নিত করা যায়।

প্রবল ইহবাদ এবং মানবজন্মের মহিমা প্রচারিত হয়েছে, প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ-প্রকাশিত লালনের একাধিক গানে। দেবতারা এখানে প্রার্থনা করে মানবজন্ম। সোনার তরী পর্বের প্রবল মর্ত্যপ্রীতি, মানবীয় সম্বন্ধের প্রেমে অমৃতরসের স্বাদ পেয়ে, কবি, মোক্ষ মুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে বারংবার এ ভুবনে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এই ইহবাদ, মর্ত্যপ্রীতি এবং মানুষের প্রতি মুখ ফেরানোয় লালনের প্রভাব ছিল অনিবার্য।[১০০]

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়দমন-রূপ শুষ্ক সন্ন্যাসকে সমালোচনা করেছেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত করে রূপ-রস আস্বাদনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন তিনি। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আত্মনিগ্রহকে ; নারীকে নরকের দ্বার হিসাবে গণ্য করার তিনি বিরোধিতা করেছেন। তখন জীবনে এবং সাধনায় নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি রবীন্দ্র-মতাদর্শে। এ সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের নারী-সম্পর্কিত ভাবনায় এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দেয়। বাউল মতাদর্শ নারীর সন্তান-জন্মদান বা প্রেমিকা রূপকে খুব গুরুত্ব দেয় না। 'চেতনগুরু' নারীব্যক্তিত্ব, বাউল সাধনায়, উপাসনাযোগ্য পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের কাছে একদা জায়া ও জননীরূপে নারীর চরম পরিণতি চিহ্নিত হয়েছিল। উত্তরকালে নারীর প্রেমিকারূপ আচ্ছন্ন করেছে মাতৃরূপকে। তারপর নারীব্যক্তিত্ব আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্র হয়েছে। নারীবিষয়ক চেতনার এ ক্রমবিবর্তন ঘটেছে প্রেমতত্ত্বেও। সাধিকা 'সামর্থা' নারী আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে প্রেমিকের সুখের কারণ ঘটায় সাধনরাজ্যে। রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বও আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে অন্যকে সুখী করার তত্ত্ব।

বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনার দ্বিধারা বিষয়ে কবি সচেতন হয়েছেন এই 'বর্তমানপন্থী' সাধকের সংস্পর্শে এসে। দেবতার পূজার সমান্তরালে মানবসেবা-সাধনার মধ্যে মর্ত্য ও বাস্তবের ভূমিকা আবিষ্কার করেছেন তিনি বৈষ্ণব কবিতা (সোনার তরী) কবিতায়। প্রিয় মানুষকে উপাসনার এই স্রোতটিই বাউল সাধনার মর্মকথা। এটি রবীন্দ্রগোচরীভূত হয়ে একাধিক কবিতার জন্ম দিয়েছে।

মানুষের সঙ্গে মিলনের আগ্রহ থেকে প্রেমের জন্ম এবং এ প্রেম জগতের সর্বব্যাপ্ত বিশ্ববিধান। আলাওলের সময় থেকেই বাউল ভাবনায় এ যুগলতত্ত্ব বর্তমান। সামাজিক স্বীকৃত স্বামী-স্ত্রীর চাইতে প্রকৃতি-নির্ধারিত এই যুগলতত্ত্ব রবীন্দ্রভাবনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। গভীর এ আত্মিক সম্পর্ক মৃত্যু-উত্তীর্ণ হয়ে বয়ে চলেছে। এ বিশ্বাসগুলি সোনার তরী পর্বে দেখা দিয়েছে।

দেহের মধ্যে মনের মানুষ বাস করে। 'সে আর লালন' একত্রে থাকে। তাকে ধরাই, জানাই

বাউল-সাধনা। চিত্রার ভূমিকায় কবি নিজের মধ্যে এই যুগ্মসত্তাকে অনুভব করেছেন। আবার কখনো তাকে বাইরে এনে দেখেছেন প্রকৃতি, মানুষ বা কল্পনায়। একই সত্তার বিচিত্র রূপধারণ তত্ত্ব মিশেছে এর সঙ্গে। আর এ তত্ত্বের জটিল, কুটিল আস্বাদনে মুখর চিত্রা এবং পরবর্তী বহু কবিতা।

লালনের পদে শুনি কুল এবং সর্বস্ব ত্যাগ না করলে পরমকে পাওয়া যায় না। উজীর রূপ-সনাতন ঐশ্বর্য ত্যাগ করে 'ছেঁড়া কাঁথা' নিয়েছিলেন। এই 'ছেঁড়া কাঁথা' গৌরাঙ্গেরও ভূষণ। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় পাই 'শুনিয়াছি তারি লাগি রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা'। অনুমান বা কাল্পনিকতার বিরুদ্ধে বাউল মতের প্রবল প্রতিবাদের প্রক্রিয়া কি এ কবিতায় কার্যকরী?

লালনের নবী, চৈতন্য শব্দ স্থানবিশেষে নারীবাচক শব্দ। নারী সাধকের চেতনগুরু, প্রেমের গুরু ; এমনকি পুরুষ-সাধকের মনের মানুষও নারীমূর্তি হতে পারে। 'সিন্ধুপারে'র লীলাসঙ্গিনী কবিতায় নারীমূর্তিতে ইষ্টের আবির্ভাব।

বাউলের প্রেমসাধনাই নমাজ বা পূজা। চৈতালির, পুণ্যের হিসাব কবিতায় ভালোবাসাকেই পূজা বলা হয়েছে। দেবতার বিদায়ে মানুষে আবিষ্কৃত হয়েছে দেবতা। দুই উপমা কবিতায় মন্ত্র তন্ত্র ও লোকাচারের সমালোচনা। অভয় কবিতায় আনন্দে আনন্দময়ের উপাসনার কথা বলা হয়েছে।

নৈবেদ্যের ৩০ নং কবিতায় বৈরাগ্য সাধনায় মোহকে মুক্তিতে এবং প্রেমকে ভক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রসঙ্গ পাই। ৩৪ নং কবিতায় জগৎকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। বাউল তো জগৎ-বহির্ভূত ব্রহ্ম মানে না। ভক্তিবাদ সম্পর্কে বাউলের যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। নাচ, গান শাস্ত্রপাঠে ; আবেগে বা মত্ততায় অধর ধরা যায় না , যুক্তিসিদ্ধ সাধনায় তিনি লভ্য, এ মতবাদ ৪৫ নং কবিতার বিষয়বস্তু।

উৎসর্গের ১০ নং কবিতায় নিত্যযুগলের বাউল-ধারণার রূপান্তর পাই। প্রাক্-গীতাঞ্জলি পর্বে বক্তব্যে, শব্দ ও চিত্রকল্পে নানা বাউল অনুষঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়। এর আগে যে সহজ সাধনার কথা বলা হয়েছিল তা শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্র-কাব্যে পূর্ণ প্রার্থনারূপে উচ্চারিত হয়েছে :

> মুক্তি এই সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে
> নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
> আত্ম অস্বীকারে। [প্রান্তিক, ৬]

চারভূত এবং রজেঃবীজে সমস্ত বস্তুজগৎ সৃজিত বলে তাদের মধ্যে মূলগত এক ঐক্যে অথচ বাহ্যিক বৈচিত্র্য স্বীকার করে অনন্ত বৈচিত্র্যে বাউল বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উৎস থেকে এবং বহু বিচিত্র কারণের সমবায়ে গড়ে উঠেছে বাউলদের বিরোধাভাসপূর্ণ উল্টাভাষা। এ ভাষায় তারা উল্টে দেয় প্রচলিত সমাজ, সত্য, মুল্যবোধকে। এ ভাষায় তারা আত্মরক্ষা করে। অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতীকধর্মী এ ভাষার সুচারু রূপ লালনের কবিতায় পাওয়া যায়। বিরুদ্ধ বিপরীত রূপের বাহ্যিক সহাবস্থানের অন্তরালে আছে বিরোধের অবসান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিরোধ অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যায় অবসিত হয়। গীতাঞ্জলি পর্ব থেকে এই বিরোধী যুগ্ম-প্রতীকগুলি দিয়ে 'উল্টা' এক কাব্যভাষা রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন। সীমা-অসীম, রূপ-অরূপ, জীবন-মরণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে এক বিশেষ কাব্যভাষা লোকায়ত বাউল-উৎস থেকে প্রাণরস আহরণ করে পুষ্ট হয়েছে এতে সন্দেহ নাই।

লালন অসাধাণ বাক্‌শিল্পী। তাঁর ভাষায় সংহতি ও সংযম অনন্য। কৃষ্ণবিষয়ক একটি পদে তিনি লিখেছেন, "রাই সায়রে ডুবলো শ্যাম রায়"—এর ভাষান্তর পাই রবীন্দ্রনাথের 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি...' অন্যত্র লালন লিখেছেন 'এ লজ্জা ধুলেও তো যায় না।' রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তর : দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে [গীতাঞ্জলি, ৭৫]। বাউলের কথাপ্রাধান্য, লৌকিক ছন্দ দিয়ে গুরুভার বহন, তৎসম ও গ্রাম্য শব্দের অবাধ মিলনে কবিতার সাম্রাজ্যবিস্তার, হসন্ত শব্দের ব্যবহার, একান্ত বঙ্গের ভাষাভঙ্গী প্রভৃতির ঋণ রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন। ছন্দের আলোচনায় লালনের কৃতিত্ব তিনি নিরূপণ করেছেন ধ্বনিসৃষ্টিতে এবং নানা ঢং-এর সৃষ্টিতে। কিন্তু আলোচনাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। লালনের ছন্দের কতগুলি বৈশিষ্ট্য গীতাঞ্জলির পূর্বযুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল। একটি হচ্ছে মরি, হায়, হায় হায় রে, বলি শুন প্রভৃতি অতিপর্বের ব্যবহার। প্রচলিত ছন্দে চরণের সূচনায় অতিপর্ব ব্যবহৃত হয়ে ছন্দে দোলা দিয়ে দেয়। লালনের গানে চরণের (কলি) মধ্যে অতিপর্ব ব্যবহৃত হয়ে ছন্দকে তরঙ্গিত করেছে। গীতাঞ্জলি এবং তৎপরবর্তী রচনায় এটি অনুসৃত। দ্বিতীয়ত কবিতার চরণে নানা মাপের পর্ব এবং পর্বান্তিক অন্ত্যমিলগুলি লালনের কবিতার ছন্দে বিচিত্র বক্র কুটিলতা সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত চরণান্তিক মিল ও আন্তঃপর্বিক মিল এবং অমিল ব্যবহার করে লালন কানকে মাঝে মাঝে চমকে দেন। মিলের প্রত্যাশায় মিল দেন না ; অমিল দিয়ে অন্ত্যানুপ্রাসের একঘেয়েমিকে ভাঙতে তিনি জানেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :—

কিবা গৌর রূপ লমপোটে ধর্য্যডুবি দেয় গো কেটে লজ্জাভয় সব পলায় ছুটে যখন ঐ রূপ মনে করি॥ গৌর দেখা দিল ঘোমের ঘোরে চেতন হোয়ে পাইনে তারে, পালাইলে কোন সহরে নব দলের রশ বেহারি॥ (পদ নং ২৭—ভোলাই-এর খাতা)। অথবা :

নেজাম নামে বাটপার শে তো পাপেতে ডুবিএ রৈতো ঃ

তার মনে সুমতি দিলে কুমতি তার গেলো টেলে আউলে খাতার নাম লিখিলে জানা গেলো এ রহমী॥ [পদ নং ৮৭, ঐ, দুদাঁড়ি কলিবিভাগের]।

চতুর্থত হসন্ত শব্দ ব্যবহার করে যেমন ছন্দকে লালন বিলম্বিত করেছেন, তেমনি হ্রস্ব স্বরান্ত বা হলন্তকে দীর্ঘ স্বরান্ত করে ছন্দের গতিতে দ্রুতি এনেছেন। লালন লিখেছেন, 'একদিন না দেখিলাম তারে॥ এখানে দীর্ঘস্বরে এক আর্তি জন্ম নিয়েছে।

ছন্দ এবং ধ্বনির এই দৃষ্টান্তগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বীকরণ করেছেন। লালনে বিচিত্র সাহসিক অন্ত্যমিল আছে। যেমন : চুমকেচে—বংশো জে (১০৩ নং পদ)। সোনার তরী কবিতায় লালনের অন্ত্যমিল গৃহীত হয়েছে 'বরষা, ভরষা'॥

গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতায় অতি-সহজ রূপ ও রীতির উপর লালন তথা বাউলগানের প্রভাব আছে। সাধনার চার স্তরকে বাউলেরা তিন করে নিয়েছে : প্রবর্ত্ত (অনুসন্ধান), সাধক (উদ্দিষ্ট, মাঝে মাঝে পাওয়া) সিদ্ধ (ইষ্টলাভ)। গীতাঞ্জলিতে ইষ্টকে পাবার আর্তি ; গীতালিতে প্রাপ্তি ও পেয়ে হারানোর বিলাপ ; গীতিমাল্য ও অন্যত্র সুন্দরের সঙ্গলাভ। আবেগের এই ত্রিধারা মিশ্রিতভাবে রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু লালনের ইষ্ট থেকে রবীন্দ্রনাথের ইষ্ট ভিন্ন ; আর কবিদেরও বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্য আছে। লালন ও কবীরের পদ মূলত সংলাপচারিতার রীতিতে লেখা ; ভণিতায় তাঁরা সম্বোধন করেছেন শ্রোতা বা সমধর্মী সাধুকে। তাঁরা বহির্মুখ ভণিতায়। তাঁদেরর পদে ঈশ্বর বা দেবতাকে সম্বোধন কমই। অন্যপক্ষে সুরদাস বা মীরার পদে

ইষ্টের সঙ্গে নিভৃত সংলাপ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মীরা/সুরদাসের ঘনিষ্ঠ—তার কবিতার মুখ ঈশ্বরের দিকে ফেরানো।[১০১] আর একটি কথা—সখা, বন্ধু, বিদেশিনী, সুন্দরী সম্বোধন সত্ত্বেও ঈশ্বরের সঙ্গে কবির যথোচিত দূরত্ব কখনও কমেনি। গীতাঞ্জলি পর্বে বাউল কবিতার রূপক ও চিত্রকল্পের বহুব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন রূপের সাগরে অমরত্ব বা মরে বাঁচা (গীতাঞ্জলি, ৪৭, ১৩০), দেহযন্ত্র (ঐ, ৬৪), দেহঘরে প্রাণদেবতা (ঐ, ৪৯), মন্দিরে নেই দেবতা, তিনি মানুষে (ঐ, ১১৯)। ১৪২ নং পদের বিরোধাভাসটি গুরুত্বপূর্ণ :

অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে
* *
পরশ যারে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা॥

অরূপকে প্রত্যক্ষ দর্শন এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে অনুভব দেহবাদী বাউলতত্ত্ব।

গীতিমাল্যে নিজেকে কেনাবেচা (৮৪), দেহে না খুঁজে বাইরে খোঁজা (৯২) প্রভৃতি বাউল-অনুষঙ্গ পাই। আর পাই বিষ দিয়ে বিষ জারণ, কুল অগ্রাহ্য করে ভবসাগরে ঝাঁপ, সহজ হবার গান। বাউলদের পারিভাষিক 'অলখ' শব্দটিও রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। বাউলেরা 'সর্বচরণে প্রণাম' জানায়। গীতালির শেষ পদে কবি জানিয়েছেন 'সবারে প্রণাম।'

বীথিকায় অচিন মানুষ কবিতায় মনের মানুষের ছায়া। শেষ সপ্তকের ১৩ নং কবিতাটির বিষয়বস্তু বাউল। খাঁচার পাখী ও অধরের সম্পর্ক নারীর সঙ্গে ; তার প্রদত্ত ভিক্ষায় এগুলি পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্যায়ে বাউল-ভাবনার আধিক্য চোখে পড়ে। মৃত্যুর প্রসারিত হাতের দিকে তাকিয়ে তাঁর এ পৃথিবীর ধুলি মধুময় মনে হয়েছিল। আর ক্রমশ মানুষের প্রতি বিশ্বাস বেড়ে চলেছিল। লালনের গানে ছিল ঐতিহ্যবাহিত ইহবাদ ও মানবতা। দেবতা বা ঊর্ধ্বলোক থেকে মানুষ এবং ইহজগতে কবির প্রত্যাবর্তনে লালনের ভূমিকা ছিল। একদা 'মানুষকে' তিনি 'মানস' করেছিলেন ; কিন্তু পরিণামে ফিরে এলেন মানুষে। ধর্মব্যাখ্যা না করে তিনি লিখলেন মানুষের ধর্ম। নাটকে এবং অন্যত্র অবিরলভাবে জীবন-বিযুক্ত তত্ত্ব ও আচার মানুষকে কীভাবে পিষ্ট করে, রবীন্দ্রনাথ তো দেখিয়েছেন। এসময়কার ঈশ্বর মানবপুত্র, 'মানুষের ঈশ্বর'। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ঝড়ের খেয়া কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্কট-মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। পরবর্তীকালে মহামানবের প্রত্যাশায় তিনি অপেক্ষামান। জীবনের উপান্তে সভ্যতার সঙ্কটে তাঁর বিশ্বাস ন্যস্ত মানুষের উপর। সমাজের রথ মহামানবেরা চালায় না আর ; এখন রথের রশি ধরেছে অবজ্ঞাত জনগণ। ওরা কাজ করে কবিতায় সভ্যতার পরিচালক-শক্তি শ্রমজীবী-জনগণের মহিমাগান করা হয়েছে। আর অপূর্ব এক মর্ত্যমমতা রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়ে ফুটে উঠেছে। পত্রপুটে তালি দেওয়া আলখাল্লাপরা বাউল হাটে গান করছে। (৫ নং কবিতা)। জাতের বাইরে এদের অবস্থান চিহ্নিত হয় ৮ নং কবিতায়।

রবীন্দ্রমানসের এই বিবর্তন ও ক্রমবিকাশে লালন তথা বাউল-চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ছন্দের আলোচনায় কবি নিজেকে বাউল বলেছেন। ইতিপূর্বে বাউল সেজে অভিনয় করেছেন তিনি। জীবনপ্রবাহ, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক অবস্থান থেকে তাঁকে ক্রমশ সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল লৌকিক সাধকগোষ্ঠীর অতি সন্নিকটে। পত্রপুটের পনের

সংখ্যক কবিতায় কবি নিজের অজ্ঞাত মানসলোকের ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রদায়িক অনুমানপন্থায় বিশ্বাসী কবি ছিলেন মন্দিরবাসী এক কাল্পনিক দেবতার উপাসক। গন্তব্য পথ ছিল অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট। ছিল মানুষে মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর। এই সাম্প্রদায়িক অনুমানপন্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি মানবে মহান পুরুষকে, ইহলোকে দিব্য সৌন্দর্যকে, রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করলেন। ইন্দ্রিয়নিরোধ, নারীবিদ্বেষ, মানুষকে বিভক্ত করার ধর্ম ও সংস্কৃতিগুলিকে অগ্রাহ্য করলেন। কল্পিত কোন দেবতা নয়, ভালোবাসার জন তাঁর মনের মানুষ বা ইষ্টরূপে স্থান গ্রহণ করেছিল। এসমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে কবির মনে হয়েছে যে তিনিও বাউল :—

কবি আমি ওদের দলে
আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন
* *
প্রশ্ন করে কোন জাত নেই বুঝি তোমার
আমি বলি, ‘‘না’’।
* *
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ
পরিত্রাণ করো/ভেদচিহ্নের তিলক পরা
সঙ্কীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে। [পত্রপুট, ১৫]

রবীন্দ্র-জীবনচিন্তার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাউল-ভাবনার ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল। প্রচলিত স্বদেশী সঙ্গীতের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের সময় পর্যন্ত বাউলগান ও বাঙালি জাতীয়তাকে অভিন্ন বিবেচনা করেছিলেন। এসময়কার বাউল বঙ্গের মৃত্তিকার সারবান ফসল।[১০২]

কবির বাঙালি জাতীয়তাবোধ অচিরকাল মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। গোরা উপন্যাসে এ অনুসন্ধান আছে। এসময় ক্ষিতিমোহন সেন বেদ, উপনিষদ, কবীর, দাদু প্রমুখ ভক্তি-আন্দোলনের সর্বভারতীয় শাখাগুলির সঙ্গে বাউলপন্থার সম্পর্ক নিরূপণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারত-আত্মার সন্ধানের সূচনায় গোরা উপন্যাসে স্মরণ করেছেন বাউলগানকে। কবীরের দোহার তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং তারপর প্রবাসীতে তুলে ধরেন লালনকে।

রবীন্দ্রচিন্তার তৃতীয় পর্বে দেখি আন্তর্জাতিক মানবতাবাদকে। মানুষের ধর্ম ইত্যাদি রচনায় তিনি বাউল ও বাউলগানকে বিশ্ব-মানবতার আদর্শে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ত্রিস্তরের মধ্যপর্বে নিজের প্রথাবিরোধী জীবন ও চিন্তার সঙ্গে তিনি অসাম্প্রদায়িক বাউলদের মিল খুঁজে পেতেন। তাই বাউল-ভূমিকা বর্ণনা ও গ্রহণ তাঁর প্রিয় ছিল। সুকুমার সেন কবির স্পর্শকাতর জটিল জীবনচিন্তায় কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির গুরুত্বনির্ণয়ে বৈষ্টমী গল্পটি আলোচনান্তে মন্তব্য করেছেন, ‘‘সহজ সাধনপন্থী অর্থাৎ বাউল, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীদের অধ্যাত্মভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার সুগভীর মিল আছে। এ মিল আকস্মিক নয়, এ মিল মৌলিক এবং সমান্তরাল। * * এই গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিপুণভাবে আত্মকথার সঙ্গে * বৈষ্ণবীর আত্মকথা মিশিয়ে দিয়েছেন। * * (বৈষ্ণবীর) গৃহত্যাগের পেছনে ছিল তার প্রচণ্ড বিরহবেদনা। সেই বিরহটি ছিল বেশ জটিল ধরনের।’’ দুজন ছিল তার

ভালোবাসার পাত্র ; পুত্র—বৈষ্ণবীর অবহেলায় সে মারা যায়। আর স্বামীর গুরুর ভালোবাসাজ্ঞাপনে আহত হয়ে সে স্বামীকে ত্যাগ করে, "একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।"[১০৩]

কবির জীবনদেবতাতত্ত্ব, অধ্যাত্মভাবনা ও অধ্যাত্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গীতবিলাসী সাধকদের সহজ সাধনার নিবিড় ঐক্য নির্ণয় করেছেন আচার্য সুকুমার সেন।[১০৪] এই ভাবগত ঐক্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-জীবন ও সাধনার কিছু অজ্ঞাত তথ্য আমরা অনুমানের পর্যায়ে বিবেচনা করতে বাধ্য হই। পত্রপুটের পূর্বোক্ত কবিতায় তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উপনিবেশের মধ্যশ্রেণী এবং উচ্চবর্গের প্রথা ও আচারের অচলায়তনগুলির বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার সপক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যে সুতীব্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। প্রথা ও আচারের বদ্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে বাউলদের নিরন্তর সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শাস্ত্র, ধর্মাচার, জাতিভেদের তীব্র সমালোচনাগুলি ছিল বাউলদের পরম্পরাগত ঐতিহ্য। ভারতবর্ষে প্রতিবাদী ভক্তি-আন্দোলনের গোষ্ঠীগুলির অনেকে প্রথার নিগড়ে বদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলে। বৈষ্ণব সাধকদের বংশধরদের অনেকে গোঁসাইগিরির পেশায় ধর্মব্যবসায়ী এবং শোষকশ্রেণীর সেবাদাসের পরিণত হন (রক্তকরবী, পত্রপুট, ১৫ নং কবিতা)। পারিবারিক আয়ের উৎস হিসাবে শিষ্যবর্গকে যারা ব্যবহার করেন, সেসমস্ত লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের অনীহা। কবি নবীনচন্দ্র সেনের প্রশংসা সত্ত্বেও ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনাগ্রহী ছিলেন।[১০৫] বরং 'কর্তাভজা' বিশেষণটিকে তিনি নেতিবাচক অর্থেই প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতোপথ রুদ্ধ করেনি বাউলপন্থায়। মৌলবাদবিরোধী, বাউল জীবনচর্যা আকৃষ্ট করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। শিশু ভোলানাথের বাউল[১০৬] ঘরছাড়া, বন্ধনহীন, নৃত্যগীতরসে মগ্ন। সে প্রচলিত সংসার ও বিদ্যার্জনের রীতিবহির্ভূত এক ব্যক্তিত্ব। হাতে একতারা, গলায় মালা, মাথায় ঝুটিবাঁধা চুল, পায়ে নাচ, কণ্ঠে গান তার। এ গানে প্রচলিত রীতিতে, 'ভাঙ্গন লাগে'। এই বাউলের কাছে কবি, 'তালাভাঙ্গার পাঠ' প্রার্থনা করেছেন। পত্রপুটের ১৫নং কবিতার বাঁধা ছাঁচ, অর্গলিত বদ্ধতার বিরোধীশক্তি বাউল। মালা-তিলকাদি দিয়ে মানুষকে নিয়ে সে সৃষ্টি করে না স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। কীর্তিনাশা পদ্মার মতো প্রাচীন প্রাচীর ভেঙে সে কেবলই নিত্যনব পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। আর প্রেমের উন্মাদনা বাউলকে প্রতিবাদের শক্তি যোগায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে অমৃতের স্বাদ নিয়ে এসেছিল প্রেমিকা। তাকে মনেই রাখতে হয়েছিল, সমাজশাসনে, ঘরে তোলা যায়নি।[১০৭] আরোগ্যের ১৩ নং কবিতায় এই তরুণ বয়সের প্রেমস্মৃতির চারণায় কবি লিখেছেন, "চারিদিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত। তারি মধ্যে মুক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।" ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রের অনুশাসন যেখানে সহজ মানুষের স্বভাবকে পিষ্ট করে না ; বাউলদের মতো কবিও এমন প্রাচীর ও পাহারাহীন মানুষের অতিথিশালা খুঁজেছিলেন।[১০৮]

রোমাণ্টিক কবিস্বভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের মধ্যে দৃশ্যমান জগতের সমান্তরালে আর এক মনোময় জগত নির্মাণ করে, সেখানে আশ্রয় নিতেন। জীবনে সব না-পাওয়া ব্যক্তি ও বস্তু সেখানে পাওয়া যায়। যে-প্রেমিকা ঘরে আসেনি, তাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবি মনে পেয়েছেন। অথবা নিজের মধ্যে আর-একটি পরিচালক সত্তার
অন্তরঙ্গ আরোপ-সাধনার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।

এই নিগূঢ় বিষয়গুলি, সাধনাপন্থাগুলির উল্লেখাদি রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখে এবং বাউল সেজে অভিনয়াদির মধ্যে বাউলভাব গ্রহণের প্রবৃত্তি থেকে অনুমান হয় যে রবীন্দ্রনাথ বাউল সাধনপন্থার গুপ্ত বিষয়াদির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না। নিজের রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী তিনি এই সাধকগোষ্ঠীর সার সংগ্রহ করেছেন।

প্রসঙ্গত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টির সূত্রে বাউলভাবনা গুরুত্বপূর্ণ। ১২১৮ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে এক পত্রে কবি লিখেছেন, "বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈয়ারী করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অকসিজেন যেমন মেশে, তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে।" সুকুমার সেন অনুমান করেছেন যে দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল গৃহস্থ বৈষ্ণবের। প্রতিবাদী জাত-বৈষ্ণব মহিলারা (বেদ, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, শালগ্রাম যাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে লাগে না) ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করতেন।[১০৯] রামমোহন বৈষ্ণবতা ও প্রেমসাধনার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর অন্যতম প্রতিপক্ষ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শাস্ত্রানুমোদিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। উনিশ শতকের আটের দশকে বঙ্কিমের উপন্যাস-ত্রয়ী এবং কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হয়। লৌকিকতা ও নারীকেন্দ্রিক বৃন্দাবনলীলা থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি সংস্কৃতায়িত করেছেন। মদন-ধর্মোৎসবের জন্য তিনি অভিযুক্ত করেছেন জয়দেব ও তদীয় অনুসারীদের। শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব মূল্যবোধ বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের মূল ভিত্তি। বৈষ্ণব নিবৃত্তিমার্গ সৃষ্টি করেছে তাঁর অনুশীলিত সন্তানদের। কিন্তু লৌকিক বৈষ্ণব ধর্মে তার অনীহা ; নিবৃত্তিমার্গ ও ব্রহ্মচর্য তাঁর আদর্শ। দুদ্দুশাহ একটি গানে বৈষ্ণবদের সম্প্রদায় বলে, বাউলদের এ থেকে পৃথক করেছেন।[১১০] গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের দ্বিধারা। একটি ধারা হলো শাস্ত্রানুসারী বৈদিক বা বৈধী, অনুমান সাধনা। অন্যটি হলো অবৈদিক, তান্ত্রিক, রাগের ভজন বা বর্তমান সাধনা। বাউলরা দ্বিতীয় বৃত্তের অন্তর্গত। বাহ্যিক ধর্মাচারে, অন্ধ ভক্তিতে, দেবদ্বিজে তাদের অনীহা। উপনিষদের মূল সত্য আত্মানুসন্ধান বাউলপন্থারও অভিপ্রেত। তন্ত্রের মতো এরাও ইহ ও দেহবাদী। প্রেম এদের মহান ধর্ম। এই লোকায়ত বৈষ্ণবতার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না রাজনারায়ণ বসু। সেকালের নব্য শিক্ষিতদের মনোভাব ব্যাখ্যান্তে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন, "যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, সেকালে বটতলা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতা আর কোথাও পাওয়া যাইত না। বৈষ্ণব কবিতার যে সমাদর ছিল না এমন নহে, তাচ্ছিল্য ভাবও লক্ষিত হইত। উহা বটতলার নিকৃষ্ট পুস্তকালয়ে, বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের কণ্ঠে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।"[১১১] ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থে কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের নিন্দা আছে। অতিনৈতিক নব্য শিক্ষিতেরা কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিব্রত বোধ করতেন।

উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈষ্ণবসাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। *ধর্মীয় পরিমণ্ডলে কীর্তন গান এবং লৌকিক জীবনে কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণযাত্রা ছিল অতীব জনপ্রিয়।* ১৮৭০ খৃ. অমৃতবাজার পত্রিকা বৈষ্ণবদের পক্ষপাতী হয়। এ বছর প্রকাশিত হয় জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত মহাজন পদাবলী। ১৮৭৪-৭৬-এ অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত তিন খণ্ড 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। ১২৮০-তে বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসকে নিয়ে নিবন্ধ লিখলেন। ঐ বছর পৌষ সংখ্যায় স্বয়ং বঙ্কিম রচনা করলেন, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নিবন্ধ। ইংরেজ আমলের জমিদারতন্ত্রের অনেকে বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠলেন। বৈষ্ণব দর্শন, পরাধীনতাকে যুক্তিসঙ্গত রূপ দান

করল বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসাদিতে। অন্যপক্ষে স্বদেশী নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তাদের বৈষ্ণবতা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে প্রভাব ফেলেছিল। আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির অতীত চেতনায় পরম গর্বে উল্লিখিত হতে থাকল বৈষ্ণব আন্দোলন। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ অনিবার্যভাবে রচনা করলেন ভানুসিংহের পদাবলী। অহিংসা এবং প্রেম হয়েছিল তাঁর অন্যতম জীবনাদর্শ। রাধা, খ্রীষ্টান কবি মধুসূদনকে এবং ব্রাহ্ম তরুণ রবীন্দ্রনাথকে সমভাবেই আকর্ষণ করেছিল। নারীবর্জিত অনুমান সাধনপন্থা, মূর্তিপূজা, ব্রত, উপবাসাদির বৈদিক পন্থার সমান্তরালে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন জীবন্ত বর্তমানপন্থী বৈষ্ণবদের। প্রথম দল দেবার্চনা করে, দ্বিতীয় দল প্রেমপাত্রকে ইষ্ট বলে পুষ্পস্তবক দেয়। সোনার তরীর, 'বৈষ্ণব কবিতায় এ দ্বিধারাকে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রিয়কে দেবতা করে, নরদেবতাকে বন্দনার বৌদ্ধ এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যটির ইহবাদ এবং মানবতা মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথ এবং বহু শিক্ষিত মানুষকে। য়ুরোপীয় মানবতাবোধের আলোকে এই ঐতিহ্যজাত মানবতাবাদ গুরুত্ব পেল। সম্প্রদায়-বিভক্ত ভারতে সহজ সাধনার দ্বার সর্বজনের জন্য মুক্ত ছিল। বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলামে পাই সহজ সাধনার ঐতিহ্য। যুক্তিবাদ, ধর্মকে সমালোচনা করার বাউল-ঐতিহ্য আধুনিক প্রগতিশীল প্রতিবাদীদের মুগ্ধ করল। এ সমস্ত কারণে প্রতিবাদের ভাষায় ও আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বাউলদের কণ্ঠের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেলেন। নানাসূত্রে নিজেকে বাউল বলা, বাউল-ভূমিকার অভিনয়ে এ প্রবৃত্তিসমূহ কার্যকর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন সমর্থন নিয়ে ১৯২৪ সালে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদল জয়দেব মেলায় আসর করে রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের গান পরিবেশন করেছিলেন। জনতার বিপুল আগ্রহ তারা জাগাতে পারেননি। উত্তরকালে স্বরচিত গানকে এই কারণে খাঁটি বাউলগান বলে রবীন্দ্রনাথ দাবি করেননি। তিনি বাউল, বর্তমানপন্থী বৈষ্ণবদের প্রাঙ্গণে গিয়েছেন কিন্তু অন্তঃপুরে আসন পাতেননি। বাউল সাধনা এবং ইহবাদী মূল্যবোধকে স্থানবিশেষে তিনি আদর্শায়িত করেছেন। আর এই আদর্শায়িত ইহবাদ ছিল লালনে। এ কারণে লালন রবীন্দ্রচিন্তায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছেন।

তথ্যসূত্র :

(১) বাংলার লোকসাহিত্য, পৃ. ৫৩-৫৯ লোকসাহিত্য পরিবর্তনশীল, কিন্তু ধর্মসাহিত্য পরিবর্তনহীন। বাংলার প্রাচীন ছড়া, প্রবাদে 'খনা' ইত্যাদি রচয়িতার নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

(৩) শ্রীবিজয়দাস নামে প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুকে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥

চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ। প্রাচীন লেখনীয়াদের নানা গোষ্ঠী, নানারকম লিপিবৈশিষ্ট্য ছিল।

(৪) প্রিয় শিষ্যদের হস্তলিখিত খাতা উপহার দিতেন রাজক্ষ্যাপা (রাজকৃষ্ণ মিশ্র, সুপাতলা, শ্রীহট্ট/ পানিশাইল, রামপুরহাট, বীরভূম, প-বঙ্গ) রাজের শিষ্য সচ্চিদানন্দ ওরফে সতীশচন্দ্র দাশ (১২৯২-১৩৭৫) ; (বেলেডাঙ্গা, করিমপুর, নদীয়া)। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া, বোরাকুলি গ্রামের

প্রখ্যাত গায়ক ও গুরু আলেপ সর্দার (?—১৩৪৯) অনেক শিষ্যকে গানের খাতা করে দিয়েছিলেন। এগুলিতে একই পর্যায়ের নানা পাঠান্তর আছে। রাজ ও সতীশের খাতাগুলি মূলত গান ও তত্ত্বের। হরিপদ গোঁসাই-এর গান ও তত্ত্বের খাতাগুলি সচিত্র।

(৫) ভারতী, ১৩০২, ভাদ্র।

(৬) লালন স্মারকগ্রন্থ, আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ৩৭।

(৭) বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৫৩৩-৫৩৭।

(৮) পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৩।

(৯) লালন শাহ্, আবুল আহসান চৌধুরী পৃ. ৮৫।

(১০) লালন ও তাঁর গান, পৃ. ৪।

(১১) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারামণি, ৭টি খণ্ড।

১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৭ ; ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪২ ; ৩য় খণ্ড, ঢাকা ১৯৪৮ ; ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা ১৯৫৯ ; ৫ম খণ্ড, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত, ঢাকা, ১৩৬৮ ; ৬ষ্ঠ, ঢাকা, ১৩৭৪ ; খণ্ড, ঢাকা, ১৩৭১।

লালন ফকিরের গান, কলকাতা, ১৯৫০।

Folk Song of Lalan Shah, Dhaka (?) খোন্দকার রফিকউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত, যশোর, ১৯৫৫ (১ম সং)। মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র, লালন গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলকাতা ১৩৬৪ আবদুল কাদের এবং রেজাউল করীম সম্পাদিত কাব্যমালঞ্চ, কলকাতা, ১৯৪৫। মুহম্মদ কামালউদ্দীন, লালন গীতিকা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬২ ; ২য় খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৩।

আনোয়ারুল করীম, লালনগীতি, কুষ্টিয়া, ১৯৬৬ ; মোঃ রফিকুল ইসলাম, লালন শাহের পল্লীগীতি (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৬৮ ; মহম্মদ আবুতালিব, লালন গীতিকা, ২ খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৮ অন্নদাশঙ্কর রায়, লালন ও তাঁর গান, কলকাতা, ১৩৮৭ ; হামিদুল ইসলাম, বাংলার প্রিয় লালনগীতি, ঢাকা ১৯৮৫ ; এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন গীতিচয়ন, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫ ; মহম্মদ মনিরুজ্জামান, লালন ফকিরের গান, ১ম খণ্ড, কুষ্টিয়া, ১৯৮৭ ; এম. মাসুদ পারভেজ, আমার প্রিয় লালনগীতি, নরসিংদী ১৯৮৮ ; সনৎকুমার মিত্র, লালন ফকির, কবি ও কাব্য, কলকাতা, ১৩৮৬ ; তৃপ্তি ব্রহ্ম, লালন পরিক্রমা, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩ ; খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন সঙ্গীতচয়ন ঝিনাইদহ, ১৯৮৯ ; সখিনা ছাত্তার, সবার প্রিয় লালনগীতি, ঢাকা (তারিখহীন) ; মো. সুরুজ আলী, জনপ্রিয় লালনগীতির আসর, ঢাকা, (তারিখহীন); ফিরোজা পারভীন, সবার প্রিয় লালনগীতি, কুষ্টিয়া (তারিখহীন) ; মো. নুরুল আলম, নির্বাচিত লালনগীতি, খুলনা, (তারিখহীন) ; মো. ফরহাতুল বারী, লালন গীতিকা, ঢাকা, (তারিখহীন) ; সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা দেহতত্ত্বের গান, কলকাতা, ১৯৯০ ; শক্তিনাথ ঝা. জাত গেল জাত গেল বলে, রৌরব প্রকাশনী, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯১ ; আবুল আহসান চৌধুরী লালন শাহ্, ঢাকা, ১৯৯০।

Abu Rushd. Songs of Lalan Shah. Bengali Academy. Dhaka. 1964 ; M. Mizanur Rahaman. Myriad Miracle Lalans song. Dhaka. 1987 : Brother James. Songs of Lalan. Dhaka. 1987 : Alokeranjan Dasgupta and the Mary Ann Dasgupta. Roots in the void. 1977. Bauls of Bengal. Deben Bhattacharya Mirror of the sky. London. 1969 : Prithwindry Mukherjee. Chant Baul (editions Findakly. Paris) 1985.

(১২) S. M. Katre. An Introduction to Indian textual literary criticism. Poona Decan College. 1954.

(১৩) আজমত ফকির (ভোলাই-এর প্রশিষ্য), ঝাঁঝা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ ; এবং বীরেনদাস

বাউল (লালনের ঘরে দীক্ষা), চোয়া, হরিহরপাড়া (পূর্বনিবাস কুষ্টিয়া) মুর্শিদাবাদ-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে লিখিত।

খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন সাহিত্য ও দর্শন, পৃ. ১৭১-১৭২।

(১৪) গ্রন্থমধ্যে প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

(১৫) আজমত শা এবং বেহাল শা-এর প্রশিষ্য বীরেনদাস বাউলের (পূর্বোক্ত) প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় যে, অমূল্য সাহা, যশোহর জেলার মহেশপুর থানার অধিবাসী ছিলেন। ঘোষপাড়ার 'কর্তাভজা' মতের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি লালনগীতি ছাড়াও 'আইন গান' করতেন। গীতবাদ্য শেখার জন্য অমূল্য উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লীতে বহুদিন বাস করে উত্তর-ভারতীয় লৌকিক ভক্তিগানে, ভজনে দক্ষতা লাভ করেন। দেশে ফিরে গলায় ঝোলান বায়া, পায়ে নূপুর এবং হাতে একতারা নিয়ে মধুস্রাবী সঙ্গীতে তিনি মাতিয়ে তোলেন যশোর কুষ্টিয়া জেলাকে। তাঁকে গীতসম্রাট বলা হতো। বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়ক ও পদকর্তা শুকচাঁদ শা, বেহাল শা, নিমাই শা—অমূল্যের শিষ্য। তাঁর প্রদর্শিত পথে লালনের গীত-রীতিতে বায়া, প্রেম-জুরী এবং নূপুরের অনুপ্রবেশ। লালনগীতির সুরের বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন অমূল্য।

(১৬) নব চর্যাপদে ৪, ৬ এবং ৭ শ্লোকের গান আছে। পরেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাপ্রসঙ্গ, নব চর্যাপদ, পৃ. ৪৪-৪৫।

ক্ষুদিরাম দাস, বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, পৃ. ২২৩-২২৭। ৫টি শ্লোকবন্ধ, শ্লেষ-প্রহেলিকাত্মক ভাষা, বাস্তব রূপকে আবৃত গূঢ় তত্ত্ব প্রভৃতি চর্যাপদের উত্তরাধিকার লালন ব্যবহার করেছেন।

(১৭) বৈশাখ, ১৩৮৪, কলকাতা, পৃ. ২৯।

(১৮) কদমখালি, ভীমপুর, নদীয়া লালন মেলার পক্ষ থেকে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত চারটি বিভিন্ন নামের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৩-এর 'মানুষ রতন'-এ বর্তমান লেখকের লালনের গানে আত্মজৈবনিক উপাদান' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক বাউলতত্ত্ব ও সাধনা নিয়ে নানা লেখা লিখেছেন। লালনের মনের মানুষ তত্ত্ব নিয়ে তাঁর ধারাবাহিক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে ''মাতৃবাণী'' পত্রিকার জুলাই ১৯৮৪ সংখ্যা পর্যন্ত।

ড. অরুণ বসু, ইন্দিরাদেবী-সংগৃহীত লালনের স্বরলিপি দুটিতে ঢপকীর্তনের সুর চিহ্নিত করেছেন। লালনগীতিতে 'ঢপের' সুর বহুলব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে ঢপের সুর ব্যবহার করেছেন লালনের অনুসরণে—এটি তাঁর সিদ্ধান্ত। লোকশ্রুতি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৩, পৃ. ৫৪-৫৮। ড. বসুর লালন-বিষয়ক আর একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে', নন্দন, কলকাতা, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৯৮ (১৯৯১)।

রাহুল পিটার দাস ; তার নিবন্ধ-শেষে এবং আবুল আহসান চৌধুরী, 'লালন শাহ' গ্রন্থের (২য় সং, ১৯৯২) মধ্যে লালন-বিষয়ক রচনাবলীর বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন। এর অতিরিক্ত গ্রন্থাদি হলো Sanat kr. Basu. Bauls of Birbum. Calcutta. 1961 : অমিত গুপ্ত, বাংলার লোকজীবনে বাউল, কলকাতা, ১৯৮৩ ; আদিত্য মুখোপাধ্যায়, ধর্ম-সংস্কৃতির আলোকে বাউল, কলকাতা, ১৯৮৮ ; R. M. Sarkar. Bauls of Bengal. New Delhi. 1990 প্রভৃতি।

(১৯) ২৩.৫.১৯৯২ তারিখে 'দেশ' (কলকাতা) পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে, 'ভাষান্তর সমস্যা : লালনের গান'-এ অনুবাদগ্রন্থাদির বিস্তৃত পরিচয় দেয়া হয়। এ পত্র, সুধীর চক্রবর্তীর, 'লালনগীতির অনুবাদ : তথ্য ও সঙ্কট' (১৮/৪/১৯৯২, দেশ) নিবন্ধের সমালোচনায় লিখিত হয়েছিল। ড. চক্রবর্তী আমার পত্রের তথ্যাদি, 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' গ্রন্থে ঋণস্বীকার না করেই ব্যবহার করেছেন।

(২০) লালন শাহ পৃ-১০২

(২১) কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩দশ খণ্ড, পৃ. ২১৪।

(২২) Sumit Sarkar. 'Ramkrishna and Calcutta of his times, the Calcutta Psyche. Indian International Center Quarterly, edited by Geeti Sen. New Delhi. 1990-91.

(২৩) A. Karim, Bauls of Bangladesh. PP 200-203.

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), লোকসাহিত্য পত্রিকায়, (Vol. II. No. I and II. কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ) এ ধরনের বাউলগীতি-গ্রন্থের তালিকা আছে।

(২৪) কেবলমাত্র সাধারণ মানুষ বা গবেষক বাউল-সাধনার সঙ্গে সম্পর্কহীন একধরনের বাউল-গায়কদের বা গানকে 'সখের বাউল' বলে চিহ্নিত করেননি। গীত-রচয়িতাদের অনেকে বা গায়কবর্গ নিজেদের 'সখের বাউল' বলে পরিচয় দিতেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর, বাউল বিংশতি (অবিনাশ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩০৭) গ্রন্থের গানগুলি "সকের বাউল" গায়কবৃন্দের জন্যই রচিত হয়েছে। তিনি দশজন গায়ক দ্বারা গঠিত দু'দল গায়কের জন্য মোট ২০টি গান রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। নিম্নবর্গ ও নিম্নজাতীয় লোকশিল্পী থেকে এ সমস্ত গায়ক ও পদকর্তা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য-নির্দেশসূচক শব্দ হিসাবে "সখের" বিশেষণ ব্যবহার করতেন। এ সমস্ত গান ও রচয়িতা বাউল-পরম্পরায় গৃহীত হয়নি।

ফিকিরচাঁদ বা প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী বাউলগানের দল গঠন করেছিলেন। এ দলের সদস্যেরা গানের সময়ে সকলে নগ্নপদ, পরিধানে আলখেল্লা, মুখে ও মাথায় অনেকেরই কৃত্রিম চুল ও দাড়ি। অনেকে খেলকা ও টুপি ব্যবহার করতেন। নূপুর, ডুগী, একতারা, খমক, খঞ্জরি ছিল এদের বাদ্যযন্ত্র। নিজেদের গোষ্ঠীকে দু'দলে বিভক্ত করে এরা 'গানের পাল্লা' করতেন। ফিকিরচাঁদের অনুসরণে বালকচাঁদ, রসিকচাঁদ, আজবচাঁদের সখের বাউল দল গঠিত হয় এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। মীর মোসারফ হোসেন এদের উল্লেখ করেছেন। সখের বাউলদের সাধনার সঙ্গে সম্পর্ক অনিশ্চিত। অভিনেতার মতো, গানের সময়ে তারা বিশেষ সাজসজ্জা ব্যবহার করেন—অর্থাৎ বাউল সাজেন সাময়িকভাবে। এ সমস্ত দল মূলত হিন্দু সমাজভুক্ত মানুষ দ্বারা গঠিত ছিল। ইতিপূর্বে জনপ্রিয় পাঁচালি, কৃষ্ণযাত্রা, যাত্রা, ঢপকীর্তনে বহু উচ্চবর্গের মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। এ সমস্ত বাউলগানে পাঁচালি ও ঢপের সুর যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতো।

এই 'সখের বাউল' প্রবণতাটি বাউল গান ও মতবাদের জনপ্রিয়তার অন্যতর এক প্রমাণ। এনামুল হক পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ অঞ্চলে বাউল-ফকির মতাবদের প্রাবল্য চিহ্নিত করেছেন, বঙ্গে সুফী প্রভাব গ্রন্থে (পৃ. ২০০)। আমাদের উল্লিখিত দলগুলি মূলত পূর্ববঙ্গের। আমাদের পরিচিত বাউল সাধকেরা এ ধরনের পদকে বলে; 'কাঁচাপদ' ; আর গায়কদের বলে, 'সাজা বাউল'। রবীন্দ্রনাথ 'নকল' বা 'সখের বাউল' শব্দ দিয়ে এদের চিহ্নিত করেছেন। সেকালের সখের বাউলগণ আনন্দ বা মতবাদ প্রচার করতেন গানে ; জীবিকা-অর্জনের দায় এতে অপ্রধান ছিল। একালের বাণিজ্যিক-বাউলগানের বহু গায়কেরা সাজা বাউল এবং গান তাদের জীবিকা।

(২৫) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ৩৩১-৩৩২।

(২৬) ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অশ্বিনীকুমার দত্ত গানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রচারের আহ্বান জানালে, মুকুন্দদাস তাঁর গান ও নাটক রচনা শুরু করেন।

কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত, রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী, পৃ. ৬৩ দ্রষ্টব্য।

(২৭) চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃ. ৩৪-৬৮।

(২৮) কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, আবুল আহসান চৌধুরী।
(২৯) D. K. Barua. Acharya Radhagobinda Smarak grantha, edited by J. Chakraborty. p. 76.
ঠাকুরবাড়িতে বৌদ্ধধর্মের চর্চা ছিল। রবীন্দ্র-অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রমননে বৌদ্ধধর্মের নানা প্রভাব চিহ্নিত করা যায়—কালিদাস নাগ, 'রবি বাউল', রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ. ১১৫।
(৩০) ভারত ইতিহাস চর্চা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ দশ খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৪৫৩।
(৩১) পূর্বোক্ত
(৩২) D. K. Barua, op cit, pp. 75.
(৩৩) কাঙালের দু'হাজার পাতার অপ্রকাশিত দিনলিপিতে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর শিক্ষিত ছেলেদের প্রজাপীড়নের তথ্যাদি ছিল। এটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ নাকি দেবেন্দ্রনাথের জীবিতকালে এ দিনলিপি প্রকাশ না-করার অনুরোধ জানান। এ দিনলিপি আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭০, শারদ সংখ্যা এবং ১৩৭১, আষাঢ় সংখ্যায়।

আবুল আহ্সান চৌধুরী, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার এবং লালন শাহ্ (পৃ. ২৬) গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, পৃ. ৬৭-৬৮। জলধর সেনের আত্মজীবনীতে (১৩৬৩) বঙ্গ আসামে ফিকির চাঁদেরগানের বিপুল প্রসারের কথা আছে (পৃ.১২৬-১২৯)। আহামদশরীফ, সর্বশ্রেণীর উপর তাঁর গানের প্রভাব বর্ণনা করেছেন (বাউলতত্ত্ব, পৃ. ৪৬)।
(৩৪) মহাত্মা লালন ফকির, প্রকাশকের নিবেদন দ্রষ্টব্য।
জলধর সেন, কাঙাল হরিনাথ, (১ম খণ্ড), পৃ. ২৩।
(৩৫) লালন শাহ্, পৃ. ৭৯।
(৩৬) হারামণি, ৭ম খণ্ড, ভূমিকা।
(৩৭) রবি-জীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।
(৩৮) 'রবীন্দ্রনাথের দৌলতে এ সমাধি পাকাপোক্ত হয়েছে'—হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
(৩৯) আবুল আহসান চৌধুরী, লালন শাহ, পৃ. ২৯-৩৪।
(৪০) হারামণি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫।
(৪১) রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, পৃ. ৩৮।
(৪২) ঐ, পৃষ্ঠা ৩৪।
(৪৩) হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৩১।
(৪৪) ২৩/২৫ অগ্রহায়ণ, এক গানের আসরে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী গগন, সনাউল্লা ইত্যাদি লোকশিল্পীর গান শুনে তাদের কাপড়, শিশি এবং দুআনা করে পয়সা দেন। এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত ছিলেন।
রবি-জীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।
(৪৫) লালন শাহ্, পৃ. ৯২-১০৪।
(৪৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, (২য় ভাগ) পৃ. ১৪৬, ১৫৯, ২৩০-২৩৪।
ঐ, ৩য় ভাগ. পৃ. ৫২।
ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ২৮, ১৩৪।
ঐ, ৫ম ভাগ, পৃ. ১৭৭, ২২৪।

শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ পরিজন, দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্গুরু সঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯ ; ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭।

বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ, রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে প্রদত্ত সম্বর্ধনাসভায়, তীব্র ভাষায় বামাচার এবং নারীকেন্দ্রিক সাধনার নিন্দা করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃ. ২২৮-২৩১।

(৪৭) ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪দশ খণ্ড), পৃ. ১০০৫।

(৪৮) ১৯৮৫-তে ফোকালোর আকাদেমীর সম্মেলনে (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জোড়াসাঁকো, কলকাতা) পঠিত হয় এ গবেষণাপত্র। পরে ড. বসু তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন।

১৩২২ সালের (বৈশাখ সংখ্যা) প্রবাসীর পর রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের কোন স্বরলিপি না করে, "বাউলের সুরে গেয়" এ ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন নাটকাদিতে।

লালনের গান, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীরা, বিভিন্ন রীতিতে করেন। লালনের জন্মভূমিখণ্ডে, গলায় ঝোলানো বায়া, হাতে একতারা/প্রেমজুরী, পায়ে নূপুর অথবা দোতারা সহযোগে গান পরিবেশিত হয়। তাদের গান সূচিত হয় গদ্য-বিবৃতির মতো, তারপর সুর ও তাল আসে, সমাপ্তিতে সুর দ্রুত তালে চরমে উঠে হঠাৎ থেমে যায়। গায়কেরা 'ধরণ, পরণ ও চালান' ত্রিখণ্ড গানকে বিভক্ত করে পরিবেশন করেন। তথ্যসূত্র : লোকমান ফকির (পাড়দেয়ার, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ), আজমত ফকির, (ঝাঁঝা, মহেশপুর বাংলাদেশ). ইউসুফ আলী সেখ, (লালনগর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ)।

(৪৯) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ৩৩৫।

সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃ. ৯৮৯-৯০।

অধ্যাত্ম-এষণা ও সামাজিকদের প্রসন্ন করে ভিক্ষালাভ এ দ্বিবিধ উদ্দেশ্যহেতু গানেরও দ্বি অর্থ থাকত। পদাবলীর অভিসার : গানের শ্রীক্ষেত্র, পৃ. ৪।

(৫০) মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী।

(৫১) বাউল মাতানচাঁদ ছিলেন কিরণচন্দ্রের প্রাণের বন্ধু। তাঁকেই অনুসরণ করে কিরণ, 'চাঁদ' হয়েছিলেন এবং নামের শেষে দরবেশ বিশেষণ ব্যবহার করতেন। দরবেশ দরবার (১ম খণ্ড), পৃ. ২২১-২২৪ ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

(৫২) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩৩৭

লালন ও তাঁর গান, পৃ. ৫১।

লালন ফকির, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮১।

(৫৩) কাঙাল হরিনাথ (১ম খণ্ড) পৃ. ২৩।

মহাত্মা লালন ফকির, প্রকাশকের নিবেদন দ্রষ্টব্য।

গোপাল গীতাবলী, পৃ.।

(৫৪) রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি ; রবীন্দ্রায়ন (২য় খণ্ড), পৃ. ৬৯ ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৫৩।

(৫৫) মহাত্মা লালন ফকির, ভূমিকা।

(৫৬) রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা, পৃ. ১১৬।

(৫৭) ১৩১৬, পৌষ, বঙ্গদর্শনে, মনমোহন বসু কর্তৃক অনুলিখিত এ রচনাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলীতে (১২ খণ্ড, পৃ. ৭২৮) এ রচনাটি সংশোধিত হয়ে এবং লালন-প্রসঙ্গ বর্জিত হয়ে গৃহীত হয়েছে। এই সংশোধন-বর্জনের কোন কারণ প্রশান্তকুমার পাল জানাননি। রবি জীবনী (৩য় খণ্ড) ; পৃ. ১৪১ দ্রষ্টব্য।

(৫৮) রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, পৃ. ৫১।

(৫৯) তান্ত্রিক কুমারীপূজার সঙ্গে কিশোরী-ভজনার ঐক্য আছে। বৈষ্ণবের রাধা কিশোরী। পূর্ববঙ্গের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের অনুসারীরা কিশোরী-ভজনার প্রচারক। এদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল বৈষ্ণবদের

আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। মদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, সহজিয়া দলন (২ খণ্ড) গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে প্রসঙ্গটি আলোচিত।

শিলাইদহের গোঁসাই গোপালের অনুসারীদের গুরু-তালিকায় কালাচাঁদ ও রূপ কবিরাজের নাম পাওয়া যায় : তথ্যসূত্র—গুরুপদ গোস্বামী, কুমরী, করিমপুর, নদীয়া। কুমারীর উন্মেষিত প্রেমকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অজ্ঞাতসারে কুমারী-ভজনার প্রতিবাদ থাকতে পারে ; কেননা গল্পের সূচনায় বাউলের নেশাখোর বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হয়েছে।

(৬০) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১দশ খণ্ড,, পৃ. ৬৯৩-৯৪

(৬১) ঐ, ১২দশ খণ্ড, ৪৬৩-৬৪

(৬২) ভোলাই (১৮৪৫-১৯৪০) ছেউড়িয়ায় স্থায়ীভাবে থেকে যান। সাধক, পদকর্তা ও গুরু হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল।

(৬৩) লালন গীতিকা, ভূমিকা।

(৬৪) রবীন্দ্রায়ন পূর্বোক্ত।

(৬৫) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩দশ খণ্ড, পৃ. ৬৪২।

(৬৬) লালন গীতিকার ভূমিকায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ খাতা উর্দুর মতো ডান থেকে বাঁয়ে লিখিত, মন্তব্য করেছেন। খাতা না দেখে মন্তব্যটির প্রতিধ্বনি করেছেন আবু তালিব। লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা (২য় খণ্ড) পৃ. ৯৩।

(৬৬) জমিদারী সেরেস্তার কাগজ বা লেখার বিশিষ্ট টান এতে নেই। বামাচরণের লেখা কিনা, এ খাতা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু লালনপন্থা থেকে ভিন্ন বৃত্তের কেউ এটা লিখেছেন ; তিনি আধুনিক বানানে অভ্যস্ত। তাই ক্ষেত্রবিশেষে বানান আধুনিক রূপ ধারণ করেছে। লৌকিক ও সাম্প্রদায়িক শব্দের পাঠ উদ্ধারে ভ্রান্তি আছে ; কলিবিভাগ ও এক/ দু দাঁড়িয়ে ব্যবহার অনিশ্চিত। ড. মিত্র 'অবিকৃত রূপে' এ খাতার গান প্রকাশের দাবি করেছেন ; কিন্তু প্রায় প্রতিপদে নানা ধরনের ভ্রান্তি ঘটেছে, মূল পাঠ থেকে বিচ্যুতি বহু। যেমন (খাতার নম্বর, পদসংখ্যা, পৃষ্ঠা মূল খাতার)

		মূলপাঠ
১/৬৯/৩৭	১২ লাইনে সে রূপো	সোরূপে [স্বরূপে]
১/১০৩/১০৪/৫৬	২য় লাইনে জায়ে	জারে
২/৬৩/৩৪	১২ লাইনে সাদ কি (সাধ কি)	সাদকি (সাধকী)
২/৮৮/৪৭	৭ম লাইন সাঙ্গ	সঙ্গি
	৮ম লাইন এতায়	ত্রেতায়
২/৮৯/৪৭	৩য় লাইন হাব	হবি
২/৪৩/২৩	৮ম লাইন রোলিবারে	বলিবারে
২/১১৯/৬৩	৫ম লাইন পরশীরে	পরশীবে
	৮ম লাইন ধরোন	বরোন

এ উদাহরণ অজস্র ভুলের সামান্য মাত্র নিদর্শন। এছাড়া পংক্তিসজ্জায় মূলের সঙ্গে ভিন্নতা আছে ড. মিত্রের মুদ্রিত গ্রন্থের। দুর্ভাগ্য এই যে, রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতো মননশীল গবেষক এ গ্রন্থের গানকে মূলের অবিকৃত রূপ বলে গ্রহণ করেছেন। লালনতত্ত্ব : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ১৩৯৭, কার্তিক-পৌষ।

(৬৭) ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা চিঠি, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থে মুদ্রিত।

(৬৮) ধর্মীয় সঙ্গীতের পরিবর্তনের চরিত্র আলোচনা করেছেন ড. আশুতোষ ভাট্টাচার্য। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬।
(৬৯) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ দশ খণ্ড, পৃ. ৬৮৯-৭০৯।
(৭০) ঐ, ১৪ দশ খণ্ড, পৃ. ১০৪। মূল বানানে আঞ্চলিক উচ্চারণ পাই শ্যাম> সাম।
(৭১) খাতার নম্বর, গানের সংখ্যা, পৃষ্ঠা—এ সূত্রে সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। ভোলাই-এর খাতায় এ পদগুলির ক্রমিক নং ২৬, ৩৩, ২৪৩, ১১৫।
ভোলাই-এর শব্দ, চরণবিন্যাস, স্তবকের সঙ্গে রবীন্দ্রভবনের একই গানের নানা পার্থক্য আছে। খাতা-দুটির মোট গান, সূচনা, সমাপ্তি, গানের ক্রম ভিন্ন। রবীন্দ্রভবনের খাতাগুলি ভোলাই-এর অনুলিখন নয় ; বা দুটি একই মূলের অনুলিখনও নয় ; নয় একই ব্যক্তির হস্তলিপি।
(৭২) ভারতী, ভাদ্র, ১৩০২।
(৭৩) মূল পাঠের প্রসঙ্গে আমরা ভোলাই-এর খাতাকে আদর্শ ধরেছি। এ খাতার পদ ৯, ১৫৬, ২৫৭ ভারতীর সঙ্গে মেলে। রবীন্দ্র-প্রকাশিত প্রবাসীর গানগুলি এ খাতার ৪, ২৬, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৬৮, ৮৪, ৮৬/৮৮, ১০৬, ১১৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৫৬, ১৬২, ১৯৬, ২৩৭, ২৪৩, ২৫৭।
(৭৪) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩দশ খণ্ড, পৃ. ৪৫-৫১।
(৭৫) ঐ, ১২দশ খণ্ড, পৃ. ৭২৮-২৯।
(৭৬) ঐ, ১৪দশ খণ্ড, পৃ. ৯৯৮।
(৭৭) ঐ, ঐ, পৃ. ১০০৫।
(৭৮) ঐ, ঐ, পৃ. ৭৫৮-৬০।
(৭৯) ঐ, ঐ, পৃ. ৫৭৫।
(৮০) হারামণি, পূর্বোক্ত, ১ম সং, ১৩৩৪।
(৮১) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২দশ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪।
(৮২) ঐ, ঐ, পৃ. ৬১২।
(৮৩) ঐ, ঐ, পৃ. ৫৮২।
(৮৪) ঐ, ঐ, পৃ. ৫৯৫।
(৮৫) ঐ, ঐ, ৬০০।
(৮৬) ঐ, ঐ, পৃ. ৫৯৬-৬০০।
(৮৭) ঐ, ঐ, পৃ. ৬০০ ; রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪।
(৮৮) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
(৮৯) ঐ, ঐ, পৃ. ১৭৮, ২০১।
(৯০) গুরুপদ গোস্বামী, কুমরী, করিমপুর, নদীয়া, প. বঙ্গ।
(৯১) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪দশ খণ্ড, পৃ. ১৪০।
(৯২) ঐ, ঐ, পৃ. ২৩৪।
(৯৩) ঐ, ঐ, পৃ. ২৩৬।
(৯৪) ঐ, ঐ, পৃ. ৪৬৭-৬৮।
(৯৫) বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ নং ৩৮৬।
অন্য পদে পাই : বাউল মানুষ পূজে
সেথা নিত্য বিরাজে॥
(৯৬) চৈতালি কাব্যের ধ্যান, চালক ; উৎসর্গের ২২ নং কবিতায় 'আমি কে' আদি গোপন তত্ত্ব বলা হয়েছে। শ্যামলীর আমি, শেষ সপ্তকের আমি প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়।

(৯৭) গীতিমাল্য ৭৬, গীতালি ৪৩, ৮৮, ৫৩, নৈবেদ্য ২১, খেয়ার ঘাটে, খেয়া ; বলাকার ঝড়ের খেয়া ; গীতাঞ্জলির ৪৭, ১৩০ নং কবিতা স্মরণীয়।

(৯৮) পথিকসত্তা এবং ভ্রাম্যমান এক মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের ছিল। বিচিত্র প্রবন্ধে ; বলাকার শাজাহান প্রভৃতি কবিতায় এ তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

(৯৯) পরশপাথর, সোনার তরী।

(১০০) চিত্রার নগরসঙ্গীত, স্বর্গ হইতে বিদায় ; চৈতালির দুর্লভ জন্ম, বৈরাগ্য, দেবতা বিদায় ; শেষ লেখার ১১ নং কবিতা দ্রষ্টব্য।

(১০১) কবীরের ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যোগাযোগ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে মীরার ভজন। রবীন্দ্রনাথের পরম সত্তার বিচিত্র রূপ ; কবির সঙ্গে তার নানাবিধ মানসিক সম্বন্ধ ; কিন্তু কবি কখনই তার সমপর্যায়ের নন। লালনের সাঁই সর্বশক্তিমান, দয়ালু, খেয়ালি। তিনি এবং লালন এক দেহে, একত্রে থাকেন কিন্তু সমান নন। সাঁই জগতের সর্বরূপে খেলা করেন ; লালনের তিনি প্রভু, ইষ্ট।

(১০২) পূর্ববঙ্গে বাউল গানের জনপ্রিয়তার সূত্রে দেশ-ভাবনার সঙ্গে এ গানের সম্বন্ধে স্থাপিত হয়েছিল। বান্ধবে (৮ম সংখ্যা, ১২৮৯) ; কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৫৮টি গানের সংকলন গ্রন্থ, 'সঙ্গীত সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। 'বাউলের গাথা সমালোচনার একবছর পরে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন।

রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী, কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত, ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের বাউল-বিষয়ক আগ্রহ অনুপ্রাণিত করেছিল রবীন্দ্রবৃত্তের নানা জনকে। এদের অন্যতম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিখ্যাত কবিতা 'আমরা' (কুহু ও কেকা, কলকাতা, ১৩১৯)-এ লিখেছেন 'কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়াছি খুলি/মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।।

বাঙালি মনের একান্ত প্রকাশ হিসাবে কবি এখানে বাউল গানকে গ্রহণ করেছেন।

(১০৩) সুকুমার সেন, রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা পৃ. ৩৭-৩৯।

(১০৪) পূর্বোক্ত।

(১০৫) 'আমার জীবন' (১৩১৬-১৩২০) আত্মকথায়, ঘোষপাড়ার মেলা পরিচালনার পর ট্রেনে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। এ সময় নবীন ঘোষপাড়ায় মেলা এবং কর্তাভজাদের প্রশংসা করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গ সোৎসাহে স্মরণ করেছেন সত্যশিবপাল-দেবমহান্ত; ঘোষপাড়ার সতী মা এবং কর্তাভজা ধর্ম. পৃ. ১৮৩।

(১০৬) রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫-৯৭।

(১০৭) পত্রপুট, ১৫ নং কবিতা।

(১০৮) রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড: পৃ. ৩৮০, ৩৮১, ৮২০।

(১০৯) রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা. পৃ. ৬, ৯১।

(১১০) বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ নং ৩৭৯, পৃ. ৮১১।

(১১১) রবীন্দ্র ও বৈষ্ণব কবিতা, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়।। প্রথম পরিচ্ছেদ
লালনের দেশ।।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অব্যবহিত কালে লালনের জন্ম (১৭৭৪?)। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, দুধু মিঞার সংগ্রাম, নীল বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি লালনের জন্মভূমিখণ্ডকে আলোড়িত করেছিল। জীবনের সূচনা-পর্বে তাঁর, প্রচলিত হয়েছিল চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা (১৭৯৩) এবং শহরবাসী অনুপস্থিত জমিদাররা দেখা দিয়েছিলেন। তাদের আমলাতন্ত্র এবং বহু অংশীদারের পীড়নের অভিজ্ঞতা থেকেও লালন বঞ্চিত হননি। নগরবাসী ঠাকুর-জমিদারদের প্রজা ছিলেন লালন। তাঁর জীবনে নানা ঘটনা, বিয়োগান্তক নাটকের নানা দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল। তিনি পাঠগ্রহণ করেছিলেন মূলত জীবনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ঐতিহ্যবাহিত গুরু-পরম্পবায়। নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী ছিল তাঁর অনুরাগী। সমগ্র নিম্নবঙ্গে তাঁর শিষ্য-সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। বিদগ্ধ নাগরিকদের মধ্যে তাঁর বহু গুণমুগ্ধ ছিল। মুসলমান জোলাগোষ্ঠী ছিল লালনের আত্মীয় এবং মূল আশ্রয়। অবিভক্ত নদীয়ার ছেউড়িয়ায় তিনি নানা জনকে নিয়ে এক নতুন পরিবার গঠন করেছিলেন। এতে রক্ত-সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল না।

ইংরেজ শাসন ও শোষণে এবং বর্বর লুণ্ঠনে হস্তশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। আর প্রাচীন বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে মিশে গিয়েছিল নিম্নবর্গের মধ্যে। উচ্চবর্ণের লালন যুগ-পরিবর্তনে কুল হারিয়ে মিশে গিযেছিলেন জোলা হস্তশিল্পীদের সঙ্গে, জেলে মাঝি-চাষীদের সঙ্গে। রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর্যায়গুলিতে ভারতীয় সমাজে কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটত। মুসলমান সমাজে সন্ন্যাস প্রশংসিত না হলেও লালনপন্থী ও নানা ফকিরগোষ্ঠীর মধ্যে খেলাফতি / বেষ / ভেক গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল।[১] লালনের কয়েকটি গান সতর্কভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তিনিও 'খেলাফৎ' ধারী ছিলেন। জীবনের সামাজিক সঙ্কটের সমাধানহেতুই সম্ভবত তিনি 'বেষ' গ্রহণ করে জাতের এবং সমাজের সমস্যা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। লৌকিক সাধু-সাধকদের জীবন নারীবিহীন নয়। লালনের জীবনের নেপথ্যে ছিলেন এক প্রেমিকা সাধিকা নারী। ভিক্ষা করলেও লালন কর্মত্যাগ করেননি। পানের বরজ, গান প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তা উইল করে বিভিন্ন জনকে দিয়ে যান।

নতুন ভূমিব্যবস্থায় এবং সামাজিক আলোড়নে এসময় গ্রাম্য মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। লালনও অনিবার্যভাবে আপন বলতে নিজের দেহ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাননি। দেহসর্বস্ব মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি। দেহকে ভুবনের সর্বস্ব এবং অন্য ধন অপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনায় আত্মসান্ত্বনা মেনে 'দেহী'কে আল্লা বলে ঘোষণা করেছেন।

লালনের জন্মভূমি নদীয়া জেলার বাগড়ি অঞ্চলের সঙ্গে গঙ্গা-বিধৌত নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর খণ্ডের ভৌগোলিক, জনতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক নানা পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। রাজ্যপাট এবং শাস্ত্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র থেকে দূরে ছিলেন লালন। এ অঞ্চলে জল-অচল নিম্নবর্গের হিন্দুদের প্রাধান্য। মুসলমান সমাজের জোলা, কলু, নিকীরী, সর্দার, ধাওয়া প্রভৃতি গোষ্ঠী 'অর্জল' বা মুসলমান সমাজের নীচু জাত। হিন্দু বা ইসলামের শাস্ত্রীয় আচরণ থেকে একটু দূরে এদের অবস্থান। জোলাদের অনেকে নাথ-যুগীদের উত্তরপুরুষ মনে করেন।[২] এ অঞ্চলের জনজীবনে

লোকায়ত সংস্কারের প্রাধান্য। হিন্দু বা মুসলমান শাস্ত্রধর্ম থেকে এদের পাবার কিছু ছিল না। একটি গানে পাঞ্জু শাহ চমৎকার করে বলেছেন:

জাতে অন্ন নাহি দিবে
অসুখে না দেখিবে।[৩]

লালনের সমকালে হিন্দু ও মুসলমান লৌকিক সাধুদের বহু আখড়া নদীয়ার নিম্নাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। তাদের নাম ও স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৪] এই নিম্নভূমি থেকে চৈতন্য-আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন যবন হরিদাস ও শূদ্র লোকনাথ।[৫] যে আর্থ-সামাজিক বেদনা সর্বভারতীয় ভক্তি-আন্দোলনে অভিব্যক্ত হয়েছিল; বঙ্গের বৈষ্ণব আন্দোলনে তারই শতমুখ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু চৈতন্য-অন্তর্ধানের অনতিবিলম্বে সামাজিক প্রগতিচেতনা, বর্ণাশ্রম-বিরোধিতা স্তিমিত হয়ে এল। ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের সঙ্গেই মূর্তিপূজা, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি আচারসর্বস্বতায় বৈষ্ণবধর্ম মরুবালুতে পথ হারাল। সার্বজনীনতা থেকে গুপ্ত ব্যক্তিসাধনায়, অধিকারীভেদে কণ্টকিত হলো বৈষ্ণব ধর্ম। বৃন্দাবনদাস-প্রচারিত তত্ত্ব খণ্ডন করে কবিরাজ গোস্বামী প্রচার করলেন নতুন চৈতন্য অবতারতত্ত্ব। নামসংকীর্তন এখানে বহিরঙ্গ, যুগধর্ম প্রবর্তক নন মহাপ্রভু, তিনি লীলারসিক বলে বর্ণিত হলেন। চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বদানে নয়, ব্রাহ্মণ জগাই-মাধাই বা সন্ন্যাসীদের উদ্ধারে চৈতন্যের কৃতিত্ব নিরূপিত হতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই এই বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। এনামুল হক তাঁর বঙ্গে সুফী প্রভাব (১৯৩৫) গ্রন্থে নদীয়ার চারজন বিরোধী গুরুর কথা বলেছেন। তারা বাউল মতবাদের আদি প্রবক্তা। ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে আমরা সর্বধর্মের মানুষকে, এমনকি মুসলমানদের নিয়ে সংগঠিত অনেক ধর্মগোষ্ঠীকে নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। কর্তাভজা, হরিবোলা মতুয়া, বলরামী, সাহেবধনী, সৎসঙ্গী, জগদ্বন্ধু সম্প্রদায় প্রভৃতি। এ গুরুদের অনেকেই জাতপাতের সমস্যা-সমাধানে চৈতন্যের পুনরাবির্ভাবরূপে বর্ণিত হয়েছেন। বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজে রূপ কবিরাজ এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। রক্ষণশীল বৈষ্ণবদের মতে তিনি বাউল মতের প্রচারক। পূর্ববঙ্গের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার গোষ্ঠীতে এবং শিলাইদহের গোঁসাই গোপালের অনুসারীদের মধ্যে গুরু-তালিকায় রূপ কবিরাজ স্থান পেয়েছেন। এরা প্রতিবাদী বৈষ্ণবগোষ্ঠী, যুগলসাধক, মুসলমান শিষ্য করেন। এদের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর গানের খাতায় গোপাল ও তাঁর পিতা রামলালের পদ গৃহীত হয়েছে। এরা ইসলামী তত্ত্বকে গানে রূপ দেয়।[৬] হারাধন দাস এবং গোপীনাথ কবিরাজ বঙ্গের বৈষ্ণবদের বৈদিক ও তান্ত্রিক এ দুভাগে ভাগ করেছেন।[৭] যুগল সাধনা ও সহজ সাধনা তন্ত্রস্পৃষ্ট। এই চারপাশের তান্ত্রিক বৈষ্ণব পরিমণ্ডল লালনের গানেও ছায়া ফেলেছে। নিম্নবর্গের জনসমাজে প্রচলিত তন্ত্র সর্বদা জাতিভেদবিরোধী এবং নারী ও শূদ্রের ধর্মাধিকারের পক্ষে। ইংরেজ আমলের বহুনিন্দিত তন্ত্রকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন উডরফ সাহেব। তাঁর তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কুমারখালিতে থাকতেন। উডরফ বহুবার এসেছেন কুমারখালিতে। লালনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু হরিনাথ মজুমদারের কর্মক্ষেত্র এই কুমারখালি। তিনি শিবচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণসুন্দরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আবার তিনি ছিলেন শিবচন্দ্রের বাল্যগুরু। জলধর সেন ছিলেন শিবচন্দ্রের সহপাঠী। লালন-জীবনীকার বসন্তকুমার পাল শিবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ জন হিসাবে তাঁরও জীবনী লিখেছিলেন।[৮] লালনের সঙ্গে শিবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। হরিনাথের সূত্রে অক্ষয়কুমার, জলধর সেন প্রমুখের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। হরিনাথ বাউল গানকে গ্রামের সাধকগোষ্ঠী থেকে নগরের

সর্বজনের জন্য নিয়ে আসেন। শিবচন্দ্র তন্ত্রধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ। নব্যতন্ত্র ও বাউল গানের পুনর্জাগরণের ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কেন্দ্রভূমি ও নায়কদের সঙ্গে লালনের সম্পর্ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[৯] ইতিপূর্বে জোলা গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় কবীরপন্থার সঙ্গে এ গোষ্ঠীর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। কবীরের পদগুলিকে বলা হয় 'শব্দ'। লালনপন্থীদের মধ্যে বাউল গানের নামান্তর 'শব্দগান'। জাতবিরোধী 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' গানটিতে কবীরের পদের ছায়া আছে। নাথ-ঐতিহ্যের সঙ্গে সর্বভারতীয় ভক্তি-আন্দোলনের প্রভাব লালনপন্থায় আবিষ্কৃত হতে পারে।[১০]

বেঁচে থাকার জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রাম এ অঞ্চলে প্রবলতা লাভ করেছিল। বাংলার লুই ব্ল্যাঙ্ক দুধু মিঞার গণযুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন সর্বধর্মের মানুষ। শোষিত মানুষদের নিয়ে তিনি আদিম সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। নীলকরদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের নিবিড়তায় হিন্দু-মুসলমান ভেদও লুপ্ত হয়েছিল। গোরা, নাপিতগৃহে মুসলমান শিশুকে পুত্রবৎ পালিত হতে দেখেছিলেন। নীলকরবিরোধী সংগ্রামের ফসল হিসাবে রবীন্দ্রনাথ একে গ্রহণ করেছেন। নব্য শোষক জমিদারদের বিরুদ্ধে নানা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল মানুষ। পাবনার কৃষক বিদ্রোহে এই গণ-ঐক্য দৃঢ় ও প্রসারিত হয়েছিল। ফলে ধর্মসমন্বয়ের নানা গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছিল। হিন্দু বা ইসলামের সংস্কার-আন্দোলনে বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে নানা সুযোগসুবিধা দেয়া শুরু হয়েছিল। হরিনাথের ১৮৭২-এর ভাদ্রের গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ধর্মীয় সাম্য প্রচারের জন্য গৌরসভার প্রচারের উল্লেখ পাই। হরিনাথ; লালন আরও এক পদ অগ্রসর হয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদ লুপ্ত করে এক সম্প্রদায়গঠনে সচেষ্ট বলে; উল্লেখ করেছেন।

জাত, ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীর পরিচয় অস্বীকার করে, লালনপন্থীরা নিজেদের 'মানুষ' বলে পরিচয় দেয়। প্রাচীন ভারতীয় লোকায়ত বস্তুবাদ, আজীবিক মতবাদ, জৈন ও বৌদ্ধ আন্দোলন, ভক্তি-আন্দোলনের বিচিত্র মূল্যবোধ বিশেষ দেশ ও কালের পটভূমিকায় লালনপন্থার আবির্ভাবকে অনর্গলিত করেছিল। সমাজ-বিবর্তনের ধারায় এই কালিক চেতনাকে ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় বেদ, উপনিষদ, সুফী, তন্ত্র ঐতিহ্যের অন্ধ অনুবৃত্তি হিসাবেই লালনপন্থা বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাচীন ইহবাদ-দেহবাদ ও মানবতাবাদকে লালন যুগোচিত সমাজচেতনার মিশ্রণে রূপায়িত করেছেন। এবং অনধিকারীদের অনাচার থেকে, সর্বপ্রকার ইতরতা থেকে মুক্ত করে ঐতিহ্যবাহিত ইহবাদ-দেহবাদে তিনি শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ এবং রম্যতা আনয়ন করেন। উনিশ শতকে, বিরুদ্ধ উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতিনিধি শাসক-শোষকদের উপস্থিতিতে, ভারতীয় জীবন-পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছিল। জীবনপ্রবাহের নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য সূচিত হয়েছিল সংস্কার আন্দোলন। লালনও তার ফসল।

(যশোহর এবং) নদীয়া জেলার সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের মতো শিল্পী, রামপ্রসাদের মতো সাধক-গায়ক, সুরকারের ঐতিহ্য স্তিমিত হবার আগেই লালনের জন্ম। এগুলির উত্তরাধিকার ছিল লালনের। আধুনিকতার অগ্রদূত-মধুসূদন দত্ত এ অঞ্চল থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই অঞ্চল ছিল রবীন্দ্রনাথের যৌবনের উপবন। আধুনিক যুগের অন্যতম কবি ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নদীয়ার নাগরিক। নানা লোকধর্মের প্রবর্তক,

পদকর্তা ও সুরকার এই বিশেষ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আঞ্চলিক বিশিষ্ট এই পরিবেশ লালনকে পুষ্ট করেছিল।

লালনের জীবনের শেষ থেকে শুরু করা যেতে পারে। হিতকরীতে তাঁর জীবনকথা ও মৃত্যুসংবাদ ছিল। অবশ্য ভারতীতে অক্ষয়কুমার লালনের মৃত্যু-তারিখ ১৮৯১ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি মুদ্রণপ্রমাদ বলে মনে হয়। এবং গবেষকগণ সকলে ১৮৯০-এর ১৭ই অক্টোবর লালনের মৃত্যুদিন হিসাবে স্বীকার করেছেন। মৃত্যু ঘটেছিল সজ্ঞানে, চারপাশে ছিল পরিজন ও শিষ্যবর্গ, সারারাত ধরে চলেছিল গান। মৃত্যুর পর বৈষ্ণব / ফকিরের রীতি অনুযায়ী তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পুরোহিত / মৌলবী লাগেনি; হয়নি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাঁর নির্দেশমত পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম হয়নি; হয়েছে সাধুসেবা বা ভাণ্ডারা। সাধুদের নিয়ে নৃত্যগীতের মহোৎসব। শিষ্যেরা ভিক্ষা করে এটি করেছিলেন।

বাড়ি , জমি, নগদ টাকা তিনি স্ত্রী, ধর্মকন্যা পিয়ারী ও শীতলের (শিষ্য) মধ্যে বিভক্ত করে দিয়ে যান। ধর্মীয় উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি কাউকে মনোনীত করে যাননি। কাউকে তিনি সম্প্রদায়ের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেননি। লালন-পত্নী ছিলেন প্রেমিকা-সাধিকা নারী। লালন-শিষ্যদের তথাকথিত 'শিক্ষাগুরু'; মা হিসাবে তাঁর ভূমিকার উল্লেখ পাই। ছেউড়িয়ার জোলা-পরিবারের কন্যা ছিলেন এ মহিলা। কারো মতে মলম কারিগরের বোন ছিলেন লালনপত্নী। ছেউড়ের আখড়ায় স্থায়ীভাবে থাকতেন দত্তকপুত্র ও জামাতা ভোলাই এবং শীতল ও ধর্মকন্যা পিয়ারী। লালনের মৃত্যুর পর শীতল, ভোলাই আখড়াটি পরিচালনা করতেন এবং ভিক্ষা করে লালনের সমাধি বাঁধিয়ে দেন। আখড়ার বাইরেকার মনিরুদ্দীন শাহ প্রমুখ শিষ্যবর্গ লালনের মৃত্যুর পর সংগঠনের নেতৃত্ব দখলের চেষ্টা করে। এ বিষয়ে ঠাকুর-জমিদারদের সাহায্য নিতে তারা উদ্যত হয়। কিন্তু আখড়ায় ভোলাই-শীতলের নেতৃত্ব অব্যাহত থাকে। লালনের স্ত্রীর মৃত্যুর পর লালনের সমাধির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ভোলাই-পিযারী, শীতলের সমাধি হয় মাজারগৃহের বহির্দেশে।

ওয়ালী সাহেব, বিবাহ-ব্যতিরেকে নরনারীর সাময়িকভাবে একত্রে বাস করার বাউল-ফকিরদের রীতির কথা বলেছেন। ইংরেজদের আইনের ভয়ে কেউ কেউ বিবাহের অভিনয় করতেন। লুৎফর রহমান লালনকে অবিবাহিত ব্রহ্মচারী বলে বর্ণনা করেছেন।[১১] জনৈক লালনপন্থী শাহ লতীফ আফী আনহু, স্ত্রী ছাড়াও লালনের জনৈক সেবাদাসীর নাম করেছেন। এই ব্যক্তিটিই লালন-বিষয়ে বহু কল্পকাহিনীর আধুনিক জনক। আসলে মৌলবী/পুরোহিতহীন ; ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে লালনের বিবাহ উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে স্বীকৃত হতো না। যাই হোক লালনের পূর্বজীবনের স্ত্রীর দেহান্ত ঘটার বা বিচ্ছেদ ঘটার পর লালন জীবনসঙ্গিনী নির্বচন করেন। তাঁর নাম ছিল বিশখা/লালমোতি/মতি বিবি। লালনের মৃত্যুর বহু পরে তাঁর দেহান্ত হয়। পূর্বজীবনে তাঁর বিবাহিতা পত্নী সমাজভয়ে লালনের সঙ্গিনী হতে পারেননি। অল্প বয়সে এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। দেহসাধনা ও কামসাধনায় বহু নারীগমনের দৃষ্টান্ত সর্বত্র পাওয়া যায়। গানে লালন বহুগামিতাকে নিন্দা করেছেন। সমকালীন হিতকরীতে 'পরদার গমনরূপ পাপ' থেকে লালন ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের অব্যাহতি দেযা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে লুৎফর রহমানের মতো গবেষকরা যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়াই লালনের ব্যক্তিজীবনে একাধিক নারীকে আরোপ করেছেন।

লালনের জন্ম হিন্দু সমাজে। তিনি কায়স্থকুলের মানুষ। হিতকরী, অক্ষয়কুমার, মৌলবী

আবদুল ওয়ালী প্রমুখ সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীরা এ তথ্য জানিয়েছেন। লুৎফর রহমান লালনের গানের একটি শব্দ বিকৃত করে লালনকে মুসলমান প্রমাণ করেছেন। 'সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন' এ গানটি বাংলাদেশের বাউলদের 'তথাকথিত' সেক্রেটারি লতীফ আফী আনহুর হস্তলিপির আলোকচিত্রসহ মুদ্রিত হয়েছে লুৎফর রহমানের গ্রন্থে। এখানে গানের শব্দটি সংশোধিত ; ছন্দ ত্রুটিপূর্ণ। যাই হোক তিনি গানের শেষ পংক্তিতে 'লালন তেমনি জাত একখান' বদলে লিখেছেন, 'লালন তেমনি খাৎনার জাত একখান।'[১২] দুদ্দু-লিখিত জীবনীটিও আফী আনহুর সূত্র থেকে প্রচারিত।[১৩] মুসলমান বা হিন্দু হলে লালনের জীবনের বহু ঘটনা, সমস্যা সৃষ্টি হতো না। হিন্দু বংশজাত হয়েও তিনি, হিন্দু সমাজ কর্তৃক বর্জিত। অন্যদিকে তিনি 'ফকিরী দীক্ষা' নিয়েছিলেন সিরাজের কাছ থেকে। অন্নদাশঙ্কর সঠিকভাবেই এ দীক্ষাকে ইসলাম থেকে ভিন্ন করেছেন। মুসলিম গৃহে লালন পানাহার করতেন। তাঁর শিষ্যদের বড় অংশ মুসলমান সমাজ থেকে আগত। সিরাজের গৃহে বাস ও খাদ্যগ্রহণের অপরাধেই বোধহয় দরিদ্র, অসহায়, জনবলহীন লালন সমাজ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন।[১৪] লালনের না-মুসলমান না-হিন্দু অবস্থানটি বেষ/খেলাফৎ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অনিবার্য যুক্তিসঙ্গত রূপ পেয়েছিল। বেষ/খেলাফতধারীর জাত-কুল-গোত্র লুপ্ত হয়। তাঁর পূর্বজীবনের কাহিনীর ছকটি এরকম : বহরমপুরে/ পুরীতে/ নবদ্বীপে/ খেতুরির মেলায় গিয়ে ফেরার পথে বসন্ত রোগক্রান্ত হয়ে সঙ্গী/পিতামাতা (অক্ষয়কুমার) কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। সিরাজের পরিবারে আশ্রয় পেয়ে সুস্থ হন। গৃহে ইতিপূর্বে তাঁকে মৃত ঘোষণা করে শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হওয়ায় অথবা যবনের অন্নাদি গ্রহণের অপরাধে মা ও স্ত্রী তাঁকে সমাজভয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি ফিরে আসেন সিরাজের কাছে এবং খেলাফৎ গ্রহণ করে নানা দেশ-ভ্রমণান্তে ছেউড়েতে ফিরে শিষ্য অথবা শিষ্যসম গুরুভাই মলমের প্রদত্ত জমিতে আখড়া করে বাকি জীবন এখানেই অতিবাহিত করেন। ফকিরদের ভ্রাম্যমান জীবনে নানা কৌতূহলজনক পরিচয় পাওয়া যায়। লালনের গানে দিল্লী, লাহোর, নদেপুরীর উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় সন্ন্যাসীদের চার ধাম বা ধর্মপ্রাণ ফকিরদের হজে বা আজমীর শরীফে যাবার রীতি আছে। লালনের ভ্রাম্যমান জীবনের যথার্থ পরিচয় নেই। একটি গানে তিব্বতের নারীর বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। কিন্তু এসমস্ত স্থানে, মক্কা-মদিনায় তিনি গিয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু আখড়াকে কেন্দ্র করে বহুদূর পর্যন্ত তিনি

ঘুরে বেড়াতেন। গান ও বিতর্ক করতেন। নানা জেলায় বহু শিষ্য ছিল। গৃহস্থ এবং ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর মাঝামাঝি অবস্থান ছিল লালনের। বেষ/খেলাফৎ-গ্রহণকারী ফকির কর্মত্যাগ করে ভিক্ষান্নে জীবননির্বাহ করতেন। লালনের গানে ভিক্ষাকে কোথাও শ্রদ্ধেয় করে দেখানো হয়নি। বিশেষ সময়ে ভিক্ষা অহংকার নষ্ট করে, তবে প্রত্যেকের অন্ন পরিশ্রম করে যোগাড় করার রীতি আছে লালনপন্থায়। গান, কবিরাজী, কচু ও পানের চাষ ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা তিনি জীবননির্বাহ করতেন। কোনমতেই তিনি পরশ্রমজীবী ছিলেন না। পূর্বজীবনে তার পরিবার খুব সমৃদ্ধ ছিল না। তার মা নিরুপায় হয়ে ভেক নিয়ে এক বৈষ্ণব আখড়ায় জীবন অতিবাহিত করেন। লালন তাঁকে সাহায্য করতেন। জমি ইত্যাদি থাকলে এ দুর্দশা তাঁর হতো না।

লালনের দশ হাজার শিষ্যসংখ্যাটি অতিরঞ্জিত হতে পারে। এ পন্থায় হাতে ধরে সাধনা শেখান গুরু। এত সংখ্যক শিষ্যকে সাধনার নির্দেশ দেয়া সহজ নয়। গানের অনুরাগী, গানের শিষ্য প্রভৃতির

বহু সংখ্যা 'দশ হাজার' শব্দে প্রকাশ পেয়েছে। তবে শিষ্যের শিষ্য ইত্যাদি মিলে দশ হাজারের লালন-পরিবার হওয়া সম্ভব। সাধনা ছাড়াও গায়ক ও গীতিকার ও সুরকার হিসাবে তিনি অতীব প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। রামপ্রসাদের পর আর একজন গায়ক, সাধক, সুরকার, গীতিকার নদীয়া জেলা জন্ম দিয়েছিল। আর লালনের খ্যাতি ছিল গানের মাধ্যমে বিতর্কে, যা হাফ-আখড়াই বা 'বাহাস' বলে প্রসিদ্ধ। বিতর্কের মধ্য দিয়ে তিনি নিজ ব্যক্তিত্বকে অন্যের উপর আরোপ করতে পেরেছিলেন। চৈতন্যজীবনীতেও বিচার-বিতর্কের মাধ্যমে মহাপ্রভুকে মত প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে দেখা যায়।[১৫] এ পদ্ধতি লালনেরও। লালনের মতবাদ হিন্দু সমাজ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু ইসলামের শরীয়তপন্থীরা সর্বাংশে ফকিরী মতবাদের বিরোধিতা করেছিল। বাউল ধ্বংসের ফতোয়ায় এবং অন্যান্য গ্রন্থে লালনের মতবাদকে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান আছে। বৈদিক আচারসর্বস্বতা, বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকতা এবং শরীয়তপন্থার সঙ্গে বিতর্কের রীতিতে লালনের বহু পদ রচিত হয়েছে।[১৬] মুসলমান জোলা কারিগরেরা তাঁর মূল ভিত্তি ছিল। মলমের নাম গানে পাই। অন্যদিকে সুকণ্ঠ হিন্দু সমাজভুক্ত গায়ক বলাই তাঁর শিষ্য এবং প্রচারক ছিলেন। কাঙালের সাক্ষ্য-অনুসারে ১৮৭২/৭৩ সাল নাগাদ লালনের প্রভাব সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। স্থানীয় বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের একাংশের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এদের পদ গৃহীত হয়েছে খাতায়। স্থানীয় বুদ্ধিজীবীগণ ও জমিদার তাঁর সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না।

লালনের জন্মস্থান নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে হরিশপুর, মতান্তরে চাপড়া, কারো মতে ভাড়ারা। মতভেদ আছে জন্মসাল নিয়ে। ১১৬/১২৪ বছর তিনি বেঁচেছিলেন কিনা সন্দেহযোগ্য। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে এটি সত্যি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তীকালে তাঁর জন্ম এটুকু বলা চলে। গ্রামীণ নিম্নবর্গ তাদের জন্মসাল সঠিক মনে রাখে না ; বলতেও পারে না। লালনকে বড় সাধক প্রতিপন্ন করতে গিয়ে কেউ কেউ তাঁর জীবনকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ করে দিয়েছেন। লোকজীবনে এ ঝোঁক হামেশাই দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে তাঁর জন্ম ; আর উনিশ শতকের শেষার্ধে তাঁর মৃত্যু। এই দীর্ঘ সময় গ্রাম-বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের তিনি অন্যতম ব্যক্তিত্ব। মধ্যবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জুড়ে তাঁর কর্মকাণ্ড প্রসারিত ছিল। তখন নগর কলকাতায় বিদ্যাসাগর, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের ; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমাজ ও ধর্ম-আন্দোলন প্রবলতা লাভ করেছে। এ আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব ও লক্ষ্য ছিল উচ্চবর্ণ ও বর্গের হিন্দু সমাজ। নিম্নবর্ণের ও বর্গের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এতে কোন দায় ছিল না। লালনের আন্দোলন মূলত নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমানের যৌথদায়িত্বে এবং অংশগ্রহণে তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মনিরপেক্ষ এ এক অভিনব সামাজিক আন্দোলন। অন্যপক্ষে তথাকথিত রেনেশাঁ ; পাশ্চাত্ত্য শাসকবর্গের প্রসাদপুষ্ট ভারতীয় উচ্চবর্গের 'হিন্দু পুনরুত্থানে'র আন্দোলন মাত্র। লালন নতুন কোন ধর্মপন্থার/সম্প্রদায়ের পত্তন করেননি। তাঁর ধর্মচর্চা মূলত ইহজীবনবাদী। ব্যক্তিস্বার্থবুদ্ধি-কেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তি-অধিকারের অতিরেকের বিরুদ্ধেই তাঁর বক্তব্য। একরকম আদিম সাম্যবাদী সমাজ তাঁর অন্বিষ্ট। জীবনকে বহু কৃত্রিম উপকরণে আচ্ছন্ন করার তিনি বিরুদ্ধে। প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ এবং অন্য সামাজিকদের সঙ্গে ঐক্যের মধ্য দিয়েই সুখ ও শান্তি লভ্য। লালন জীবনবিমুখ বৈরাগী ছিলেন না। অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল হতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। এই প্রতিবাদী সত্যনিষ্ঠা, ধর্মের নামে বৈষ্ণবীয় ভীরুতা থেকে পৃথক এক চরিত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লালনের গানে আত্মজৈবনিক উপাদান

আজি হতে শবতবর্ষ পূর্বে লালনের মৃত্যু হয় (১৮৯০/অক্ষয়কুমারের মতে ১৮৯১)। জীবিত কালেই তাঁর জীবনকথা ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে লোকের কৌতূহল জেগেছিল। সন্ন্যাসীরা নিজের পূর্বাশ্রমের কথা বলে না ; লালনও বলতেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যেরা গুরুর কোন অলৌকিক জীবনকাহিনী বয়ন করেননি। সেকালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ; সমাজবিজ্ঞানী অবদুল ওয়ালী ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে লালন-জীবনকথা লিখেছিলেন। হিতকরী তাঁর মৃত্যু ও সামাজিক তথ্যাদি জানিয়েছিল। লালনবৃত্তের ঘনিষ্ঠ বসন্তরঞ্জন ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে লালনের প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন। অধুনাকালে লালনের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বাসস্থান, পরিবার নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের এক শ্রেণীর গবেষক জাল জীবনী, ভুয়া দলিল, কল্পিত সিজরানামা পেশ করে লালনকে মুসলমান বংশজাত, শিক্ষিত জোতদার, এবং চিস্তিয়া সুফী প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছেন।[১৭] অবশ্য বাংলাদেশের মননশীল গবেষকবর্গ এ সমস্ত লেখাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত আবুল আহসান চৌধুরীর 'লালন শাহ' (১৯৯০) গ্রন্থে বসন্তরঞ্জনের লালন-বিষয়ক তথ্যাদি প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু লালনজীবনের কোন বিস্তৃত পরিচয় নেই এখানে। আর লালনের জীবন নিয়ে বিতর্ক এবং কৌতূহল গবেষকমহলে আজও অব্যাহত। লালনের রচনাবলীতে সঙ্গত কারণেই তাঁর আত্মজৈবনিক তথ্যানুসন্ধান জরুরী বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাঁর রচনায় আত্মজৈবনিক ছিন্ন খণ্ডগুলি (১) প্রচলিত তথ্যকে দৃঢ় করে, (২) প্রচলিত তথ্যের পরিপূরক সংবাদ দেয়, (৩) প্রচলিত তথ্যকে খণ্ডন করে অজানা তথ্যের আভাস দেয়।

বৈষ্ণবতন্ত্র/কলমী পুঁথি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত নৃলোকসার চিন্তামণির ১১দশ প্রকরণটির নাম, 'নিজভাবে কৃষ্ণভাব বর্ণন'। চণ্ডীদাস বিরচিত 'এ ঘোর রজনী মেয়ের ছটা কেমনে আইল বাটে' পদটির পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে প্রেমিকা তারার [রজকিনী] সঙ্গে বর্ষাভিসারের অভিজ্ঞানের ফসল এ পদটি। শুধু চণ্ডীদাস নয়, অনেক বৈষ্ণব মহাজন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাধা-কৃষ্ণে আরোপ করে বর্ণনা করতেন। নবরসিক সহজ সাধকেরা, "নিজ ভাব গুপ্ত করি কৃষ্ণভাব গায়" [নৃলোকসার চিন্তামণি, ১১দশ প্রকরণ]।[১৮]

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের বৈষ্ণব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তিগত প্রেমস্মৃতি রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে মিশ্রিত হবার প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। প্রিয় মানুষকে তারা ভজনা করে, প্রিয়কে দেবত্বে উন্নীত করে। লৌকিক উপাসনায় ধারাটির নাম বর্তমান, রাগের ভজন, রসরতির সহজ সাধনা। লালন এ ধারাটিকে দরবেশী, ফকিরীবলেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্তমানপন্থী রসসাধক ছিলেন। সে হিসাবে নবরসিক বৈষ্ণব মহাজন এবং রসসিদ্ধা চর্যাকারদের তিনি উত্তরপুরুষ। লালনের রচনায় আত্মকথা পরোক্ষে এবং বক্র রম্যতায় প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা অধিকতর। লালনের (ক) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ, (খ) গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এবং (গ) বন্দনা বা আত্মনিবেদনের পদের একাংশকে আমরা 'কৃষ্ণভাবে'র পদ হিসাবে চিহ্নিত করে, এগুলি থেকে এবং অন্য পদ থেকে তাঁর আত্মভাবনাকে নিষ্কাষিত করার চেষ্টা করব। কৃষ্ণ বা

গৌরকথায় তিনি কীভাবে আত্ম-অনুভবকে মিশ্রিত করেছেন—এটির বিশ্লেষণই আমাদের মূল আলোচনা।

বৈষ্ণব আন্দোলন, চৈতন্যদেব এবং রাধাকৃষ্ণ লালনের গানে ও জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর অনেক বৈষ্ণব পদ অসাধারণ। একটি পদে লালন, তাঁর ভেক-সন্ন্যাসের স্মৃতিচারণ করে, কুল পরিত্যাগ করে, ঝুলি, আচলা, ডোরকৌপীন গ্রহণপূর্বক নিজের পরিচয় ঘোষণা করেছেন, "গৌরবালা" অর্থাৎ গৌরাঙ্গের কন্যা/প্রেমিকা বা দাসী।[১৯] বৈষ্ণব মঞ্জরীভাবনায় সাধক নিজেকে নারী এবং উপাস্যকে পুরুষ-প্রেমিকরূপে কল্পনা করে। লালনের গানে এ সখীভাব ও মঞ্জরীভাব স্পষ্টত আছে। বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণের নানা ধরনের একক বিগ্রহ, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে উপাসনা করা হয় এবং ইষ্টরূপে গ্রহণ করা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবান্দোলনে চৈতন্য কৃষ্ণ হিসাবে এবং রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ হিসাবে স্বীকৃতি পাবার সূত্রে গৌর-পারম্যবাদ এবং নদীয়া নাগরীভাবের জন্ম হয়। গৌরাঙ্গভজনার সূত্রধার নিত্যানন্দ, গৌর নাগরী উপাসনার প্রবর্তক হিসাবে নরহরি, লোচনদাস প্রসিদ্ধ। এ মতবাদে কৃষ্ণ বা জগন্নাথ অপেক্ষা জীবন্ত সচল বিগ্রহ গৌরাঙ্গের প্রাধান্য। গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ। যে-যুক্তিতে কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করলেন গৌরাঙ্গ, সে যুক্তিতেই বীরভদ্র, শ্রীনিবাসাদির ভক্তবৃন্দ প্রখ্যাত বৈষ্ণব নেতাদের গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় দেহ, জীবন্ত গৌরাঙ্গ হিসাবে গণ্য করতে লাগলেন। প্রথাটি প্রসারিত হয়ে জীবন্ত গুরু চৈতন্যাবতারে রূপান্তরিত হলো। কৃষ্ণ, গৌর, গুরু অভেদ হয়ে গেলেন বর্তমানপন্থায়। এবং গুরু স্থান পেলেন কৃষ্ণ বা গৌরেরও আগে। বিধিমার্গের বৈষ্ণবতা কৃষ্ণ বা চৈতন্যের চাইতে গুরুকে অধিক মর্যাদা দিতে নারাজ হলো। লালন গুরু-পারম্যবাদী। তাঁর পদে আল্লা, আদম, নবী বা গৌর-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে এক গুরুরূপে বর্তমান থাকে। জী ন্ত মানুষ ভজনাকারী লালন কল্পিত মূর্তিপূজায় রাজি নন। নবী বা চৈতন্য বর্তমানে নরদেহে মিশে আছে—এই সাকার রূপের সাধক লালন। গুরু গৌরকে দেখান, কৃষ্ণকে, আল্লাকে দেখান ; তাই শিষ্য লালন দেখেন (১৭০ পদ দ্রষ্টব্য)। লালনের গৃহবাসের এলাকায় গৌরবাদী আন্দোলন জাতিভেদ [হিন্দুদের মধ্যে] অস্বীকার করে প্রসারিত হয়েছিল। এখানে গৌরপূজার প্রাধান্য কিন্তু গুরুর গুরুত্ব নেই। লালন মন্তব্য করেছেন : 'গুরু ছেড়ে গৌর ভজি তাতে নরকে মজি।' [পদ নং ১৩]।

সুতরাং বৈধী বৈষ্ণবতার সঙ্গে লালনের যোগ অল্প। চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব সম্প্রদায় রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজাগত মানুষের কোন স্থান এখানে থাকে না। লালনের অন্যতম প্রধান শিষ্য দুদ্দু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদের থেকে নিজেদের পৃথক ঘোষণা করে জানিয়েছেন যে বৈষ্ণবদের সাম্প্রদায়িক আচরণাদি, মূর্তিপূজা, জপ থেকে লালনপন্থী বাউলরা আলাদা।[২০]

লালনের বাসস্থান, নদীয়ার নিম্নাংশে তন্ত্র এবং বৈষ্ণবতার বিশেষ প্রভাব ছিল। লালনের গানে তন্ত্র এবং বৈষ্ণবতার বহু মূল্যবোধ গৃহীত হয়েছে। অবৈদিক সহজ সাধক বৈষ্ণব গোষ্ঠীর সঙ্গে লালনের অন্তরঙ্গতার প্রমাণ হলো শিলাইদহের নবীন গোঁসাই, রামলাল, গোপালের পদ নিজের গানের খাতায় তিনি গ্রহণ করেছেন। এ গোষ্ঠীটি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের দ্বারা ভর্ৎসিত তথাকথিত 'বাউল'। দীর্ঘকেশ, শ্বেতবস্ত্র, গাঁজার পরিবর্তে তামাকসেবন, মুসলমান সমাজ থেকেও শিষ্যগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়েও লালনের ঘরের সঙ্গে এদের ঐক্য ছিল। কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের অনুগত কিশোরী-ভজনাকারী এই মতবাদ রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল

সেসময়ে।[২১] জীবনের প্রথম পর্বে কীর্তনগানের সূত্রেও লালন এই অবৈদিক বৈষ্ণবতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাধাকৃষ্ণকথাকে, চৈতন্যজীবন এবং বৈষ্ণবতাকে লালন নিজস্ব ব্যাখ্যায় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের মূল্যবোধ বৈষ্ণবতাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল। চৈতন্যদেব, লালনের গানের বন্দিত মহানায়ক কিন্তু ইনি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের চৈতন্য নন। হিন্দু-মুসলমান, যবন-চণ্ডালকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করেন তিনি। লালনও হিন্দু-মুসলমানকে একাকার করে তাঁর উপাসকমণ্ডলী গঠন করেছিলেন। লালনের গানের খাতায় দুজন শিষ্যের নাম পাই : একজন মলম, জোলা সম্প্রদায় থেকে আগত ; অন্যজন বলাই, হিন্দু সমাজভুক্ত এক সুকণ্ঠ গায়ক এবং লালনগীতির অন্যতম প্রচারক। বৈদিকতা এবং শরীয়ত পরিত্যাগ করা হতো ভেক বা ফকিরী নিয়ে। লালন ফকিরী নিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণকেও তিনি 'ফকিরী' গ্রহণ বলে অভিহিত করেছেন (পদ ১৪১)। তাঁর বর্ণনা "গোরা হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই, সদায় দিন দোরদী বলিয়া ছাড়ে হাই [পদ ৮৪]। হিন্দু বা মুসলমান থেকে পৃথক তৃতীয় এক গোষ্ঠীগত পরিচয় লালনের ; অগ্রজ গৌরাঙ্গের। এই অর্থে লালন "গৌরবালা"। কিন্তু নারীবেশধারী সোহাগী সুফী ঐতিহ্য এবং নক্সাবন্দী সুফীতত্ত্ব লালনেরও। 'গুরুবর্জোক' সহ নামসাধন এবং জোতনিহারে, রসরতির সাধনায়, পাত্রনিষ্ঠায় লালনের সাধনপন্থায় সিদ্ধ হতে হয়।[২২] ফকিরীগ্রহণের পর বিবাহ, জীবনচর্যা এবং মৃত্যুতে লালন কোন ধর্মাচার পালন করেননি। হিন্দু-মুসলমান সামাজিক বিভাজন অস্বীকার করেছিলেন তিনি। তথাপি মুসলমান সামাজিক বৃত্তে তাঁর অবস্থান। লালনের পরিজন লালমোতি, পালিতা কন্যা, শীতল, মানিক, ভোলাই প্রমুখ আখড়াবাসী শিষ্যরা সবাই মুসলমান সমাজের। মুসলমান রক্ষণশীলেরা বাউলবিরোধী আন্দোলন করে মুসলমান সমাজ থেকে লালনের প্রভাব খর্ব করতে যত্ন নেয়। প্রামাণ্য লালন-জীবনীকারেরা মুসলমান সামাজিক বৃত্তে তার অবস্থান নির্ণয় করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে লালনের ছাঁটা গোঁফ, প্রচলিত শরীয়তের অনুসরণমাত্র। বেদ এবং বৈদিকতাকে অস্বীকার করার বৌদ্ধ-সহজ বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন লালন। কিন্তু কখনও কোরাণ বা নবীকে অগ্রাহ্য করেননি। ইসলামের চার তরিক (শরীয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত) নবী মহাম্মদ প্রবর্তন করে, তাঁর প্রধান চার শিষ্যকে দান করেন। সাধনার ক্রমিক এ চার স্তর ব্যক্তিবিশেষের গ্রহণক্ষমতা ও মানসিক তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি তার বোধ-বুদ্ধি অনুযায়ী একই কোরাণের নানা ব্যাখ্যা করে, তা থেকেই বহু মত এবং উপ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব (পদ নং ৯৭, ১১৫, ১৮৫)। নবীর অবর্তমানে ইসলামের চার তরিক ও উপ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় (পদ নং ১১৬)। লালন কোরাণ এবং ইসলামের এক গুরুমুখী ব্যাখ্যা অনুসরণ করেছেন। তার নাম ফকিরী, বিলায়েত, মারফত প্রভৃতি। নবী, কোরাণ, ইসলাম, পঞ্চস্কন্ধ, চার তরিক গুপ্ত গুরুমুখী ব্যাখ্যায় প্রচলিত শরীয়ত থেকে ভিন্ন হলেও লালন কখনো শরীয়তকে অগ্রাহ্য করেননি, বর্জন করতে বলেননি। সাধনায় শরীয়ত দুপ্রকার : ব্যক্ত এবং গুপ্ত। কিন্তু সে আরেক প্রসঙ্গ। বৈষ্ণবতা এবং মহাপ্রভু যেমন লালনে গুরুত্ব পেয়েছে ; তেমনি গুরুত্বপূর্ণ নবী এবং কোরাণ। আল্লা আদম মহাম্মদ এবং রাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ ও শিব লালনের রচনায় বারবার দেখা দেয়। ইসলাম, বৈষ্ণব ও শৈব দেহসাধনা গুরুমুখী ব্যাখ্যায় সমন্বিত করে লালন গ্রহণ করেছেন।

প্রথাবিরোধী বৈষ্ণবতা ও ইসলামের সঙ্গে লালনের ঐক্য। ইসলামীয় পরিমণ্ডলের আত্মতত্ত্ব-

অনুসন্ধানী মনসুর হাল্লাজ, অসাম্প্রদায়িক বেশরা চিস্তিয়া সাধক নিজামুদ্দীন আউলিয়া, সোহাগী, নক্সাবন্দী এবং প্রেমমার্গী সালিক ঐতিহ্যের উল্লেখ আছে লালনে। গুরুবাদ ও গুরুপূজার সুফী এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক-হিন্দু-নাথ ঐতিহ্য লালনের পদে সমন্বিত হয়েছে। লালনের সাধনপন্থাটি অতি প্রাচীন রসরতির সহজ সাধনা। চীনের তাও ধর্মে, তন্ত্রে, হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলামীয় সংস্কৃতিতে নানা ভিন্ন নামে এ সাধনাটি প্রচলিত ছিল। এবং প্রকাশ্যে প্রধান ধর্মীয় ধারার সমান্তরালে গুপ্ত গুরুমুখী অপ্রধান এ ধারাটিকে অতি প্রাচীন কাল থেকেই চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানবাদী, ইহদেহবাদী, বস্তুবাদী, গুরু-পারম্যবাদী, জীবন্ত নরপূজার এ প্রবাহ মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনে আবিষ্কার করা যায়। প্রচলিত জীবনচর্যা, সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মাচারের প্রতিবাদী এই পথের পথিক ছিলেন লালন।

ভারতীয় সাধকদের, বন্দিত ইষ্টদেবতার সূত্র ধরে উপাসকের সম্প্রদায় নির্ণয় করা যায়। নবরসিকদের অনেকেরই ইষ্ট রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি বা কৃষ্ণ। চণ্ডীদাসের ইষ্ট তাঁর প্রেমিকা রামী। দেবতাকে অগ্রাহ্য করে তিনি মানবমহিমার জয় ঘোষণা করেছেন তাঁর পদে। চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য রসিক কবিরা ইষ্টদেবতার সাক্ষ্যে বৈষ্ণব। লালনের ইষ্ট কিন্তু আল্লা, নবী, গৌরাঙ্গ , কৃষ্ণ' কেউ নয় ; তাঁর ইষ্ট এদের সঙ্গে অভিন্ন কিন্তু তিনি সাঁই বা গুরু, নিরঞ্জন নামে সম্বোধিত। সাঁই শব্দের দ্বিউৎস < সংস্কৃত স্বামী ; ফারসী শায়েখ্। নিরঞ্জন শব্দের ব্যবহার বৌদ্ধ, নাথ, নানক, কবীরপন্থী ভক্তি-আন্দোলনস্পৃষ্ট। ধর্মমঙ্গল কাব্যাদির লোকপুরাণে আদি স্রষ্টা নিরঞ্জনের উল্লেখ পাই।[১৩] সাঁই নিরঞ্জন হিন্দু বা ইসলামের কোন উপ-সাম্প্রদায়িক দেবতা নন। অথচ ইনি বুদ্ধ, আল্লা-আদম-মহাম্মদ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন। তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর সঙ্গেই অভিন্ন। ইদানিংকালে জীবন্ত নরদেহভাণ্ডে এ সত্তাকে চিহ্নিত করে ধরতে হয়। এই মানুষে সে মানুষ থাকে। মনে রেখে এবং, বহুরূপের মধ্যে সেই পরমকে; অধরকে ধরার কর্মকাণ্ডে আজীবন ব্যস্ত ছিলেন লালন। হিন্দু-ইসলাম বিভাজনের হিসাবে লালনের হিসাব মেলানো সুকঠিন। তাঁর সংকেতিত ইষ্ট লৌকিক জগতের ঐতিহ্য থেকে আগত। যে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কেবলমাত্র মানুষ-পরিচয়ে এ মতবাদ গ্রহণের অধিকার ও যোগ্যতা আছে। প্রচলিত সম্প্রদায়-বিভাজনের বাইরে, এ মতবাদটির এবং লালনের অবস্থান তাঁর রচনা থেকে অনায়াসে প্রমাণিত হয়।

প্রার্থনার একটি পদে লালন বলেছেন, "বাল্যকাল খেলায় গেল" (পদ নং ৩২২)। যথোচিত শিক্ষাগ্রহণ তিনি করতে পারেননি। গ্রাম্য বালকদের সঙ্গে মাঠেঘাটে গোচারণ ও খেলায় হেলায় কেটে যেত তাঁর দিন। কৃষ্ণের গোষ্ঠবিষয়ক পদগুলিতে গ্রাম্য বালকদের মনোরম যে জীবন্ত পরিচয় পাই, তা সম্ভবত আত্মস্মৃতির কলমে লেখা।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক এক পদে পাই শচীমাতার বিলাপ, মায়ের একা পুত্র তুই রে নিমাই, অভাগিনীর আর কেহ নাই (পদ নং ৮৫)। গৌরাঙ্গের মতো লালনও মায়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন: উভয়ের পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল বাল্যে। লালনের গানের কোথাও ভাই-বোনপরিবৃত সংসারের ছবি নেই। রাধার বিলাপে শুনি, সাতের সাথী কেহ নাই (পদ নং ১৬৪)। লালনের গানে সর্বত্র নিঃসঙ্গতার বেদনা। লালনের গানে স্নেহশীল পিতার চরিত্রটি অনুপস্থিত। লালন সর্বত্র নিজেকে অনাথ অসহায় বালক হিসাবে চিত্রিত করেছেন। সাঁইরূপী খেয়ালি সত্তার স্নেহ-ভালবাসা তিনি প্রার্থনা করেছেন; তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'পরম পিতে' (পদ নং ৮৭) বলে।

প্রবল শক্তিমান এ সত্তার উপর, যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর অপেক্ষা করে তেমনভাবেই তিনি নির্ভরশীল। এই পুরুষ চরিত্রটি সম্পর্কে লালনের ধারণা অস্পষ্ট। গুরু কঠোর শিক্ষক এবং ভর্ৎসনাকারী। অনাথ বালক লালনের পিতৃস্মৃতি অস্পষ্ট (পদ নং ২০১)। শচীমাতার বিলাপে লালন জননীর কণ্ঠ চিহ্নিত করলে, আমরা বলতে পারি যে জন্মপূর্বে বা অতি-শৈশবে লালন পিতাকে হারিয়েছিলেন। পুরুষ-অভিভাবকহীন সংসারের একদিকে দারিদ্র্য; অন্যদিকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা। ফলত লেখাপড়া না শিখে খেলায়, রঙ্গে, আমোদে বাল্যকাল কেটেছিল লালনের।

প্রাগুক্ত প্রার্থনার পদে আরও পাই : 'যুবাকাল (এ) কলঙ্গ (কলঙ্ক) হল' (পদ নং ৩২২) । কলঙ্কময় এ ঘটনাবলী অক্ষয়কুমারের মতে, অতি-শৈশবে পিতামাতার সঙ্গে তীর্থ থেকে ফেরার সময় রোগাক্রান্ত হয়ে লালন বিসর্জিত হয় এবং সিরাজ সাঁই কর্তৃক পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস কবিতার প্রায় অনুরূপ এক ঘটনার আভাস আছে অক্ষয়কুমারের তথ্যে। কিন্তু লালন কলঙ্ককে যৌবনে নির্দেশ করেছেন। বসন্তরঞ্জন এবং আব্দুল ওয়ালীর তথ্যে পাই যে সঙ্গীসহ লালন বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে / নবদ্বীপে / নীলাচলে অথবা খেতুরীর মেলা থেকে ফেরার পথে বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে সঙ্গীদল দ্বারা বিসর্জিত হন। ঘরে তাঁর মা এবং স্ত্রী ছিলেন। অর্থাৎ লালন তখন বিবাহিত। সুতরাং ঘটনাকাল শৈশব নয়। লালনের নামে প্রচলিত এক গানে পাই : "ভুগতে ছিলাম পক্‌সো জ্বরে সাঁই করলেন উদ্ধার"।[২৪] বসন্তরঞ্জন এ তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। সঙ্গীরা লালনকে মৃত ঘোষণা করায় লালনের মা এবং স্ত্রী যথোচিত অশৌচাদি পালন করেন। অতঃপর অকস্মাৎ লালনের গৃহে ফেরা। তখন যবনগৃহে অন্নপানাদির ফলে অন্যতর এক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজপতিরা লালনকে জাতিচ্যুত ঘোষণা করেন। বিত্ত বা সামাজিক ক্ষমতা থাকলে লালন সমাজপতিদের রায় নিজের অনুকূলে আনতে পারতেন। পিতৃহীন এ তরুণটির প্রতি সম্ভবত সমাজপতিরাও প্রসন্ন ছিলেন না। লালনের মায়ের ছিল না তাদৃশ অর্থবিত্ত। কেননা তিনি এরপর এক ভিক্ষাজীবী সংঘে যোগ দেন—শম্ভুদাসের আখড়ায় জীবন অতিবাহিত হয় তাঁর। এ ধরনের সঙ্কটে অনেকে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়ে সমস্যার সমাধান করতেন।[২৫] কিন্তু স্থানীয় হিন্দু সমাজপতিদের প্রভাবে যবনের অন্নজল গ্রহণকারী লালনকে বৈষ্ণব ভেকাশ্রয় দিতে রাজি হয়নি বৈষ্ণব আখড়াগুলি। নিরুপায় লালন ভেক-ফকিরী গ্রহণ করেন সিরাজের কাছ থেকে। অনেক ফকিরী গ্রহণের পদ আছে লালনের। এভাবে তিনি 'জাতের ফাতা' বিসর্জন দেন; আপনজনের কাছ থেকে মরে, নতুন জীবনে যাত্রা শুরু করেন। লালনের ভেক-ফকিরী গ্রহণ নিরুপায় হয়েই। সাধনা পূর্ণ হলে, অনেকে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করে ভেক নেয়। কিন্তু লালনকে বিশেষ প্রয়োজনে হঠাৎ করে ভেক নিতে হয়। তখন খুব ভালো একটা জ্ঞান ছিল না তাঁর, সাধ্য-সাধনা বিষয়ে। সিরাজ সাঁই-এর উক্তি "আন্দাজী লালন মুড়ায় মাথা" (পদ ১২৭)। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণকুলের রোষের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। লালন অনিশ্চয় সামাজিক অবস্থানহেতু বাধ্য হয়েছিলেন ভেক নিতে। রসসাধনায় ভেক-সন্ন্যাস সংস্কারমাত্র। চৈতন্যদেবের মুখে কৃষ্ণদাস বলিয়েছেন, "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন"। মাকে পরিত্যাগ করার জন্যে তিনি রীতিমতো অনুশোচনা করেছিলেন।[২৬] তথাপি লালন এবং চৈতন্যকে সংসারত্যাগ করে গুরুকুলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। লালন এবং গৌরাঙ্গ উভয়েই বাল্যে পিতৃহীন, মায়ের একমাত্র সন্তান, যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহিত, অপুত্রক, প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রাহী। দুজনই তরুণ বয়সে

ফকিরী নেন। লৌকিক ভেক যুগলে নেয়ার রীতি। কিন্তু লালনের ভেকের গানগুলিতে একক ভেক বর্ণিত অর্থাৎ তিনিও নিমাই-এর মতো একক ভেক নিয়েছিলেন। ফকিরী ভেক / খেলাফতী প্রথায় মাথা কামানোর লোকাচার নেই; কিন্তু বৈষ্ণব ভেকের প্রভাবে লালন মস্তকমুণ্ডন করেছিলেন। নিমাই সন্ন্যাসের এবং ভেকের পদগুলিতে নিজস্ব ভেকের স্মৃতি ফুটে উঠেছে। দেহে ডোর, কৌপীন, ধড়া; হাতে করঙ্গ নিয়ে নিমাই ও লালনের ফকিরী গ্রহণ; নিজের শ্রাদ্ধ করে নিতে হয় ভেক। দরদী আত্মীয়বন্ধুরা কেউ সঙ্গের সাথী হয়নি বলে লালন দুঃখ করেছেন (১৪১ নং পদ)। সাথী হতে পারত তাঁর তরুণী স্ত্রী, কিন্তু তিনি কি লালনের সহমর্মী ছিলেন না?[২৩]

ভেকাশ্রিত হলে পূর্ব-জীবন ও পরিবার সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হয়। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পরেও মাকে দেখেছিলেন এবং মায়ের তত্ত্বাবধান করতেন। লালনের সঙ্গে মায়ের দেখা হবার প্রসঙ্গ গানে নেই। বসন্তরঞ্জনের তথ্যে পাওয়া যায় যে মাকে শম্ভুদাস / চাঁদের আখড়ায় নিয়মিত সাহায্য পাঠাতেন লালন। নিমাই সন্ন্যাসের একটি পদ থেকে লালনের ভেকাশ্রয় গ্রহণের ফলে তাঁর নিজস্ব জটিল পারিবারিক সমস্যার চিত্র পাই।

পুরুষহীন দরিদ্র সংসারের মন্দভাগ্য মা অভিযোগ জানিয়েছে : একা পুত্র তুই রে নিমাই অভাগিনীর আর কেহু নাই, কি দোশে আমায় ছেড়ে রে নিমাই ফকির হোলি এমন বয়সে রে।। মনে এহাই ছিল তোরি হবি রে নাচের ভিকারী তবে কেনে বিএ কল্লি পরের মেএ, কেমনে আইজ আমি রেকবো তারে।। (পদ নং ৮৫)

পুত্র সংসারত্যাগ করায় প্রধান সমস্যা তরুণী বধূকে নিয়ে। আয়ের সূত্রহীন, অভিভাবকহীন সংসারে বধূকে তিনি কীভাবে পালন বা রক্ষা করবেন—এই অতি বাস্তব সমস্যাটি তুলে ধরে, বিবাহের জন্য পুত্রকে এখানে অভিযুক্ত করা হয়েছে। লালন কি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন? পদটিতে এমন আভাস আছে। আর ঘরে মন বসেনি পুত্রের, বর্হিমুখ সে সুযোগ খুঁজেছিল গৃহত্যাগের? শচী মা মাতাপিতাকে ত্যাগ করা অবিধেয় বিবেচনায় নিমাইকে সন্ন্যাসবস্ত্র কৌপীন খুলে ফেলতে বলেছেন এবং লালন তা সমর্থন করেছেন: মা এর কথায় চল কৌপীন খুলে ফেল, লালন কয় জেরূপ তার মায়ে কয় রে (পদ ৮৫)। লালন নিজে গুরুকুলে আশ্রয় নিয়ে সাধুর সংসার পেতেছিলেন। সেখানে সাধিকা প্রেমিকা সঙ্গিনী ছিল; পালিতা-কন্যা জামাতা ছিল; ছিল পুত্রসম মানিক, ভোলাই, শীতল প্রভৃতি। এরা সবাই মুসলমান সমাজ থেকে আগত। কথিত হয় লালনের আত্মীয়বর্গ এ আশ্রমে এসে নিজের হাতে রান্না করে খেত। এই যবন-সংস্পর্শ স্বীকার না করতে পারায় সম্ভবত লালনের প্রথমা পত্নী সিরাজের কাজে দীক্ষা বা ভেক নেননি। লালনের গৃহত্যাগের অনতিকাল পরে তার মৃত্যু হয়। নিঃসঙ্গ লালনের মা জাতিবুদ্ধি ত্যাগ না-করায় এক বৈষ্ণব আখড়ায় যোগ দিয়ে জীবনাতিপাত করেছিলেন। লালন দূর থেকে তাকে সাহায্য করতেন। এইভাবে আপন পর হয়ে যায় লালনের জীবনে। অগ্রজ সাধক নিমাই আশ্রম নির্মাণ করেননি, সঙ্গিনীও ছিল না তাঁর প্রকাশ্যে। কিন্তু তাঁরও ছিল এক গুপ্ত সাধনা, দ্বৈত জীবন "বহিরঙ্গে ধর্ম হয় নাম সঙ্কীর্তন, অন্তরঙ্গে ধর্ম হয় রস আস্বাদন!" সংসার ত্যাগ করে চৈতন্য এবং লালন নৃত্যগীতে সময়াতিপাত করতেন। উভয়ে ভিক্ষাজীবী ছিলেন। গান ছিল লালনের বৃত্তি। চৈতন্যদেবের মতো তিনিও নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। চমৎকার এক বিশেষণ নির্মাণ করেছেন লালন "নাচের ভিকারী"।

নিদয়া জননী

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে মা আনন্দময়ী পালিত-পুত্র গোরার জন্য জাতি-সংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন। পুত্রস্নেহ জাতিবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু লালনের মা কুলধর্ম এবং সংস্কারকে বিসর্জন দিতে পারেননি। অত্যন্ত বাস্তব চরিত্র তার। বঙ্গের সাধারণ বৈষ্ণবদের জাতি-বুদ্ধি-সংস্কার প্রবল। বিশেষত মুসলমানদের হাত থেকে জল বা খাদ্যগ্রহণে কেউ রাজি হয় না। যারা জাতিভেদ অগ্রাহ্য করে, তারা বহুক্ষেত্রে অনাচারী বাউল হিসাবে চিহ্নিত হয়। সুতরাং লালনের মা যে যবন-সঙ্গকে স্বীকার করতে পারেননি, তাতে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতা সক্রিয় ছিল। এজন্যই বোধ হয় কুল এবং জাতিবুদ্ধির বিরুদ্ধে লালনের তীব্র আক্রমণ। কুল কারো সঙ্গে যায় না, কুল ত্যাগ না করলে সাঁইকে পাওয়া যায় না, কুলগর্বীরা গুরুকুলের গৌরব বুঝে না; কুলের জাতিবুদ্ধিযুক্ত সাধকের প্রতি সাঁই অপ্রসন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রবর্তক নিমাই কুলত্যাগ করেছেন, বৈদিকতা অগ্রাহ্য করে চণ্ডাল, যবনকে আলিঙ্গন দেন, যবন সমাজের দবীর খাসকে দেন গুরুপদ, "নাই তার জেতের বোল, বলে হবিবোল" (১৯২ নং পদ) এই মর্মে চিত্রিত লালনের গৌরাঙ্গ। এগুলি সবই যেন মা এবং পত্নীর প্রতি, আত্মীয়বর্গের প্রতি (যারা সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন) নিক্ষিপ্ত বাণ। সিরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লালনের বাল্য থেকেই। আর এই যবনসঙ্গ মা ও স্ত্রী মেনে নিতে পারেননি। জাতিবুদ্ধি এবং সংস্কার বিসর্জন না দিয়ে তারা বরং লালনকে বিসর্জন দেন নিরুপায় হয়ে। এজন্য এক তীব্র অভিমানের উচ্ছ্বাস জন্মেছিল লালনের অন্তরে। আর কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে আত্মভাবের বাষ্পাকুল বেদনা তির্যকভাবে অনর্গলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের যশোদা ও শচী মাতা বিগলিত করুণার এক পুণ্যস্রোত। কিন্তু লালনের শচী বাস্তবিকা রমণী; যশোদা "নিদয়া জননী"। ১৩৮ সংখ্যক পদটিতে দেখি মা যশোদা কৃষ্ণকে মেরেছেন। শিব, ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পাবার সাধনা, তাই লালন মাকে ভর্ৎসনা করেছেন কৃষ্ণ-স্বরূপ বিষয়ে অনবগত থাকার জন্য : 'তুমি জানো না এই বৃন্দাবনে' নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ; নরশিশুর মধ্যে থাকে বালগোপাল। বালগোপালকে অর্চনা করে বৈষ্ণবদের অনেকে, কিন্তু জীববুদ্ধির আচ্ছন্নতায় কৃষ্ণরূপী জীবন্ত শিশুকে পীড়া দেয়। এ পদের মা যশোদা স্নেহময়ী নন, রৌদ্রীরূপা। তাই কৃষ্ণকথায় আত্মপ্রসঙ্গ এনে লালন মাকে স্মরণ করিয়ে দেন : "সে হি কৃষ্ণধোন (ধন) তোমারি নালন, নালন বলে একি ঘোর এখানে" (১৩৮)। মায়ের প্রতি এই ভর্ৎসনা অতীতের বৈষ্ণবপদে পাই না।

মা কি লালনকে উৎপীড়ন করতেন? লালন কি বাল্যে খুব দুরন্ত এবং অবাধ্য ছিলো? বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনের আদিলীলায় দুরন্ত নিমাই-এর ছবি এবং প্রতিবেশীদের অভিযোগের নানা তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। অভিভাবকহীন কিশোর লালন সম্ভবত স্বেচ্ছাচারী, দুরন্ত এবং অবাধ্য ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে পাষাণরেখ চিত্রে অঙ্কিত নিষ্ঠুর জননীরূপ। গুরুও তাঁকে ভর্ৎসনা করে কিন্তু জননী পীড়ন করে তাকে। ৩৫০নং পদে শুনি শিশু কৃষ্ণর কণ্ঠে, লালনের বিপন্ন ক্রন্দন: আর আমারে মারিশনে মাঃ। বলি তোর চরন ধরে লনি চুরি আর করবো নাঃ।। লনির জন্য আজ আমারে মারিশনে মা বেঁধে ধরে, দয়া নাই তোর অন্তরে স্বল্পেতে গেল জানা।" গ্রাম্যজীবনে অন্য লোকেরা হামেশাই শিশুদের মারধর করে, এমত অবস্থায় শিশু ছুটে গিয়ে মাকে অভিযোগ জানালে তিনি ঘটনার প্রতিকার করেন, শিশুকে রক্ষা করেন। কিন্তু আলোচ্য পদের মা সন্তানকে অন্যে প্রহার করলে রক্ষা করতে যান না; উপরন্তু

নিজেও পীড়ন করেন তাকে। পিতৃহীন, ভাই-বোনহীন অসহায় লালনের উক্তি : "মা জননী নিদয়া হলে, কে বোজে শিশুর বেদনা"। চরণটিতে 'মা জননী' শব্দার্থে জন্মদাত্রী মাকে বোঝানো হয়েছে। স্বামীকে হারিয়ে শোকে, তাপে, দারিদ্র্যের জ্বালায় হয়তো লালনের মা উৎকেন্দ্রিক নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিলেন। লালনের দুরন্ত স্বভাব এই ত্রিতাপ জ্বালায় নূতন মাত্রা যোগ করে জননীকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। ষোড়শী ভুবনেশ্বরী তারা অবস্থাবিপাকে চণ্ডী ছিন্নমস্তায় পরিণত হতেন। সুতরাং নিরুপায় এক গ্রাম্যবধূ কিছু পরিমাণে স্নেহহীনা ক্ষিপ্তা হয়ে যাবেন অবস্থা বিপাকে, এতে অস্বাভাবিকতা নেই। অগ্রজ কবি রামপ্রসাদ পাষাণী মায়ের স্নেহহীনতার অভিযোগ এনেছেন গানে। কিন্তু এ অভিযোগের ছলে অভিমান এবং ছদ্মকলহ কার্যকরী। লালনের নিদয়া জননী এক রূঢ় বাস্তব জীবনের ফসল। আলোচ্য পদের উপসংহারের ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ : "ছেড়ে দে মা হাতের বান্ধন, জাই আমার জে দিকে জায় মন, পরের মাকে ডাকবো এখন, তোমার গ্রহে (গৃহে) আর রবনা ঃ।।" সত্যি করেই মায়ের ঘর ছেড়ে লালন অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। অবশ্যই সিরাজের স্ত্রী ছিল তাঁর মাতৃসমা। ভেকগ্রহণ করে তিনি দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করেছিলেন। দিল্লী, লাহোর, তিব্বত, নবদ্বীপ, পুরী, কাশী, মক্কা এবং মদিনার প্রসঙ্গ আছে তাঁর গানে। নবদ্বীপে নাকি এক মাতৃসমা নারীর আশ্রয় পেয়েছিলেন লালন। পরের মাকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করতেন, আপন মা হয়ে গিয়েছিলেন পর।

লালনের গৃহত্যাগের পূর্বসূত্র জননীর সঙ্গে স্নেহবন্ধনের শিথিলতায় নিহিত আছে। লালনের বৈষ্ণবভাবাপন্ন বহু পদের ভণিতায় গুরুর নাম নেই; নেই গুরুস্মরণ। এগুলি সম্ভবত তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। তখন তিনি বৈষ্ণবসঙ্গ করতেন। গায়ক এবং পদবন্ধক লালন দেশে-বিদেশে গান করে বেড়াতেন। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঘরের প্রতি তেমন টান ছিল না তাঁর। গানে বিবাহিতা স্ত্রী কখনো স্মরিত হয়নি লালনের। এবং স্ত্রীও তীব্র অনুরাগিণী বা লালনের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন না। লালনের জাতপাত-বিরোধী জীবনাচরণ, ফকিরী দীক্ষা, ফকিরদের সঙ্গ মা এবং স্ত্রী মেনে নিতে পারেননি। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার স্বরূপপুর গ্রামের এক হিন্দু মৎস্যজীবী জনৈক ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন কিন্তু তার মা এর তীব্র বিরোধী। বেলডাঙ্গা থানার গোপীনাথপুরের এক দাস মুচি-যুবক গৌরাঙ্গ হাজরা ফকির রুহুল আমীনকে গুরু ধরার অপরাধে আত্মীয়, পরিবার এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে গৃহত্যাগে বাধ্য হয়। ডোমকল থানার কুশাবেড়িয়ায়একই রকম ঘটনা ঘটে। বাউলমত নেয়ার জন্য সামাজিক অত্যাচারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকট-আত্মীয়বর্গ জড়িত থাকে; বহুক্ষেত্রে মা অত্যাচারীর পক্ষ নেয়। প্রচলিত সংস্কার এবং সামাজিক জাতিভেদের কাঠামোয় আঘাত করে বাউল-সাধনা। সুতরাং এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। বৈদিক সংস্কারের নারীরা এ সাধনা সহ্য করতে পারে না—এমন বহু ঘটনা ক্ষেত্রসমীক্ষায় পাওয়া যায়। সহজ রসসাধনাকে লালন হিন্দু ও ইসলামী দু'সমাজেই প্রবাহিত দেখেছিলেন। মহাপ্রভু এবং হজরত মহাম্মদ দু'জনই অন্তরঙ্গে এ সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। সুতরাং হিন্দু এবং মুসলমান জনতাকে হিন্দু বা মুসলমান সমাজভুক্ত যে কোন সাধককে গুরু ধরার নির্দেশ পাই লালনে : "হিন্দু কি জোবনের বালা, পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা।" (পদ নং ২২১)। আর এখানেই পারিবারিক সমস্যা, মায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লালনের। অসুস্থ হওয়ার অনেক আগেই লালন হয়তো গোপনে মতটি গ্রহণ করেছিলেন সিরাজের কাছে এককভাবে। এ মত নিতে হয় যুগলে। লালন-পত্নী তা

নিলে, অবশ্যই তিনি উত্তরজীবনে লালনের সঙ্গী হতেন এবং যুগল-ভেক নিতেন। যেহেতু তা নেননি, তাই অনুমান করা যেতে পারে যে স্ত্রীর সঙ্গে লালনের মানসিক ব্যবধান ছিল। রোগ, যবনের অন্নগ্রহণের প্রকাশ্য ঘটনায় পরিবারের সঙ্গে লালনের শিথিল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল মাত্র। লালন জীবনে, জগতে সর্বত্র কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করেন (পদ নং ২৪০)। মানসিক গোপন ইচ্ছা অবশেষে বৃক্ষ হয়ে ফল প্রসব করে (পদ নং ৩৪৯)। পূর্ব-কারণ পরবর্তী কার্য সৃষ্টি করে (পদ নং ১০২)। তাই মানসিক বিচ্ছেদ অবশেষে বাস্তবায়িত হলো। আর এতে কি লালনের অন্যবিধ দায় যুক্ত?

লালন যৌবনের এ দুঃখজনক স্মৃতি স্মরণ করেছেন ১৮৯নং পদে : ''কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ঘটিল রে একি দুর্দশা।'' অন্য একটি পদে পাই : ''জৈবন কালে রঙ্গে দিলি মন'' (পদ নং ২২৩)। গৃহজীবনের স্মৃতি স্মরণ করেছেন লালন ''নিষ্কল ছিলাম ঘরে'' (পদ নং ২২৭)। বেদনাপূর্ণ সামাজিক এ ঘটনাকে লালন কলঙ্ক কেন বলেছেন? গৃহজীবনে তিনি ছিলেন নিষ্কল—- এ কথাটিরই বা অর্থ কী? নবরসিকদের প্রায় সকলেই উচ্চবর্ণের বা বর্গের মানুষ। প্রেমের দায়ে সমাজ দ্বারা পীড়িত, লাঞ্ছিত হয়ে তাদের কেউ কেউ নিম্নবর্গের পাতা আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাদের অনেকেরই প্রেমিকা নিম্নবর্গের, নিম্নবর্ণের। তারা সাধিকা, শিল্পরসিকা, দয়িতের প্রেমের গুরু। উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের নারীর রূপানুরাগে : ''নিন্দনীয় হৈল, কেহ জাতি নাশা হৈল'' [মীরাবাঈর কড়চা][২৮] নবরসিকদের প্রত্যেকে গায়ক এবং পদকর্তা। সুপুরুষ তরুণ গায়ক লালন কি কোন গোপন প্রেম-সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন? আর সে নারীই কি উত্তর-জীবনে তার ঘরণী হয়েছিলেন? অথবা সে ঘরে আসেনি, মনেই ছিল?

সাধকদের নবরসিকদের এসমস্ত অ-সামাজিক প্রেমের তথ্য সুপরিচিত ছিল লালনের। তিনি জানতেন, ''প্রেমে মজিলে ধর্মাধর্ম ছাড়িতে হয়'' (৩৫৪ নং পদ)। প্রেমের তীব্রতায় রাজা রাজ্য ছাড়ে, শিব শ্মশানে পাগল অবস্থায় ঘোরে, উজীর রূপ-সনাতন ফকিরী নেয়, রাধার মতো কুলবতীরা কুল ত্যাগ করে (পদ নং ১০৭)। প্রেমের দায়ে চণ্ডীদাস, শিব, হরি নারীর চরণ বন্দনা করে, মাথায় তুলে নেয় (৯৩, ১৩৯ নং পদ)। রাধার কণ্ঠে লালন বলেছেন যে ভববন্ধুজন সাধনায় কোন সাহায্য করে না, তাই মনের মানুষ ইষ্টকে, ''কুলে কালি দিয়ে ভোজিব সই'' (পদ নং ৫৭)। মনের মানুষ যে পায়, সে বৈদিক আচার অগ্রাহ্য করে : ''রূপ যার নয়নে জাগে কি কাজ তার বেদ সাধনে'' (পদ ১১২)। ১০৮ নং পদে লালন ভণিতায় বলেছেন যে আগে তিনি জানতেন না যে গৌরপ্রেম সাধনায় কুলমান যাবে ; অবশ্য কুলের বালাই যাওয়াতে তিনি দুঃখিত নন। ইষ্টলাভের জন্য যুগে যুগে সাধক-সাধিকারা কুলত্যাগ করেছেন, এধরনের তথ্যে পরিপূর্ণ লালনের গান। রসসাধনায় লালন 'চেতনগুরু' নারীর সঙ্গকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন (পদ নং ১৬৩)। চেতনগুরু রামী, ভবানীর স্পর্শে চণ্ডীদাস, শিবের সিদ্ধত্ব। স্পর্শমণি রাধার স্পর্শেই শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হয়। গুরু নির্দেশ দেন লালনকে, ''কর লালন এন্নী সঙ্গ কহে সিরাজ সাই নিরোবধি'' (পদ নং ৯৩)। মনের মানুষের সন্ধানেই কৃষ্ণরূপী গৌর রস-সাধন-পাত্রীর উদ্দেশ্যে ফকিরী নিয়ে, হস্তে নিয়েছেন করঙ্গ (রসসাধনার পাত্র) (পদ নং ৮১)। রসসাধনায় যুগল প্রয়োজন, ''প্রেম পীরিতের এমনি ধারা এক মরনে দু'জন মরা, ধর্মাধর্ম চায় না তারা'' (পদ নং ৩৫৪)। রাধাবিরহের পদের ভণিতায় লালন বলেন যে মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি চাতকের মতো অপেক্ষা করেন, ''জখন রূপ স্মরন

হএ থাকে না লোক লজ্জা ভয়, অধীন লালন বলে প্রেম যে করে সেই জানে" (পদ ৩৪০) । মনঃশিক্ষার ২২৩নং পদে লালন-জীবনের অজ্ঞাত তথ্য পাই। যৌবনে রঙ্গে, আমোদে, কামে তিনি মত্ত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে 'নিষ্কল ছিলাম ঘরে'। কিন্তু একজন তাঁর মন চুরি করল, রূপ দেখে তিনি বেহুঁশ হলেন, থেকে-থেকে তাকে মনে পড়ে (পদ ২২৭)। এই রূপের কালের দংশনের তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে ৪৭ নং পদে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আকর ২১৯ নং পদটি। অনামা এক সাধিকা নারীকে স্মরণ করে লালন নিজের সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, "শে হি ধনি, অমুল্ল মানিকো মনি, করিল কৃপা, তোরে করিল কৃপা"। এই নারী কি লালনের গৃহত্যাগের পূর্বেই এসেছিলেন? ইনিই কি উত্তরকালের লালন-গৃহিণী? না এই নারী বিদ্যুৎলতার মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিলেন কালের প্রবাহে। লালনের গানের কেন্দ্রবিন্দুতে এর আসন পাতা। আর নিঃসঙ্গতার আর্তিতে লালনের গান দীর্ণ। "লালন বলে মোর পাপের নাহি ওর, আশা তাইতে পূর্ণ হলো না" (পদ ৮৩)। এই পাপচেতনার মূলে কি অসহায় জননী ও স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের অশুভ স্মৃতি?

পুনশ্চ ॥

লালন বর্তমান প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। অনুমাননির্ভর প্রমাণে তার অনাস্থা। তবে দৃষ্টান্ত দিয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন তিনি। আমরা অনেক দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছি। তথাপি অনুমাননির্ভর এ আলোচনা সত্যমূলক বলে, পাঠক গ্রহণ না করলে, বাধিত হব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।।
দেশ ও কালের পট

নিঃস্ব মানুষ হিসাবে ফকির লালন নিজেকে চিত্রিত করেছেন। কেবলমাত্র 'মানুষ' এই পরিচয়ই ছিল তাঁর মূল্যবোধে মর্যাদাব্যঞ্জক। ধন-মানের পথিকরা সত্য থেকে, সুখ থেকে দূরেই থাকতেন বলে লালন ফকিরের ধারণা। লালন ইহজীবনে আগ্রহী, 'বর্তমানপন্থী', সামাজিকদের প্রতি দায়বদ্ধ এক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব।

লালনের গান থেকে তাঁর সময়ের বহু তথ্য ও ইতিহাসের বহু উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেকালে তামাক, গাঁজা এবং মদ মাদকদ্রব্য হিসাবে সমাজে প্রচলিত ছিল।[২৯] লালন নিজে গাঁজা খেতেন কি? তাঁর শিষ্য দুদ্দু গাঁজার তীব্র বিরোধী ছিলেন।[৩০] প্রবাসীতে লালনের রচিত 'হুকার গান' নামে একটি পদ প্রকাশিত হয়েছিল। এ পদটি থেকে মনে হতে পারে যে তিনি 'হুকা' খেতেন।[৩১] লালন গাঁজা খাওয়াকে ধর্মসাধনার অঙ্গ মনে করতেন না। ২৬৪ নং পদে দরবেশী উপাসনা-পদ্ধতি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা স্বরূপকে জানতে চান ; বর্তমানে 'জোতনেহারে' সিদ্ধ হন। জপ বা মালা টিপে নয় তাদের সাধনা। লালন মন্তব্য করেছেন : 'গাঁজার দোম চোড়িয়ে মনা বোম কালি আর বলিও নারে।' সাধনায় গাঁজার ভূমিকা অস্বীকার করে তিনি বর্তমানে নরদেহে অটলবিহারীকে সন্ধান করতে বলেছেন।

সমকালীন যে সমস্ত পদকর্তার পদ লালনের খাতায় গৃহীত হয়েছিল, তাঁরা হয় লালনের অন্তরঙ্গ ছিলেন, অথবা তাঁদের পন্থার সঙ্গে লালনের ঐক্য ছিল। এর মধ্যে শিলাইদহের গোঁসাই গোপালের ১টি পদ ; তাঁর গুরু-পর্যায়ের নবীন গোঁসাই এবং গোপালের পিতা রামলালের শিষ্য রামচন্দ্রের পদ পাওয়া যায়। এরা প্রতিবাদী বৈষ্ণব রূপ কবিরাজের অনুসারী। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা রূপ কবিরাজকে বঙ্গের বাউল বা সহজ সাধনার সঙ্গে এবং চারিচন্দ্রভেদের সঙ্গে যুক্ত করে। উপরন্তু এ ঐতিহ্যে ইসলামী শাস্ত্রের চর্চা হয় এবং মুসলমানদের শিষ্য করা হয়।[৩২] সুতরাং এদের সঙ্গে লালনপন্থার অনৈক্য ছিল না। এছাড়া মদন ও নারায়ণের পদ এ খাতায় পাই। লালনশিষ্য 'সিতু' পদকর্তা ছিলেন, তাঁর রচিত একটি পদ (২৪৭) এখানে পাই। গানে দু'জন লালন-পরিজনের নাম পাওয়া যায়। মলম কারিগরের নাম পাই লালনের আখড়ার জমি-দাতা হিসাবে। ৭৩ নং পদে সিরাজ সাঁই-এর নির্দেশ স্মরণ করে লালন মলমকে সম্বোধন করে শিক্ষা দিয়েছেন। মলম তাঁর শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয় ছিল এতে সন্দেহ নেই। লালনের শিষ্য বলাই ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক এবং লালনগীতির অন্যতম প্রচারক। ২৫৭ নং পদে লালন বলাইকে ইসলামী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আর একটি পদে কৃষ্ণ কি রাখালদের উচ্ছিষ্ট খায়— এ কৌতুক-জিজ্ঞাসা শ্লেষে করেছেন বলাইকে, "বলরে বলাই তোদের ধর্ম কেমন হারে।" (ভাবসঙ্গীত, ৫২২ নং পদ, পৃ. ১৯০)। কথিত হয় যে লালন কবিরাজী চিকিৎসা করতেন। রস-রসায়ন এবং গাছ-গাছড়া দিয়ে এক গুরুমুখী চিকিৎসাবিদ্যা বাউল, ফকির, দরবেশগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভোলাই-এর খাতায় দু'টি ঔষধ প্রয়োগপদ্ধতি লিখিত আছে। ৩৪ নং পদে, রোগী কবিরাজের নির্দেশ অমান্য করে কুপথ্য করে রোগ বাড়িয়ে কবিরাজের অপযশ করেছে। ঔষধের সঙ্গে পথ্যের এবং রোগবর্ধনে খাদ্যের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের জাতীয় সচেতনা এখানে ব্যক্ত। উপরন্তু ক্রমশ আয়ুর্বেদ পিছু হঠছিল, নতুন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার দাপটে ; তাই কবিরাজের প্রতি দোষারোপ নতুন কালের মানসিকতা।

জীবিকানির্বাহের জন্য লালন কচুর চাষ করতেন, এ ধারণাকে উপেন্দ্রনাথ অস্বীকার করে, ব্যঙ্গ করেছেন।[৩৫] কচু -সংক্রান্ত লালনের একটি পদ পাওয়া যায় (১০১)। এখানে বাঙালদের কচুপ্রীতি এবং বেজেতে কচু খেয়ে দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে।

নদীয়ার অধিবাসী লালন বাঙালদের নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা করেছেন। চৈতন্য ভাগবতে (আদিখণ্ড/ ১২অধ্যায়) স্বয়ং চৈতন্যদেব বাঙালভাষা নিয়ে মজা করেছেন। বাঙালদের প্রসঙ্গ পাই পূর্বোক্ত কচুর পদে। সেখানে পাই যে বাঙালরা কচুকে বলে 'মান গোঁসাই' (শ্লেষার্থে মা গোঁসাই)। অন্য একটি পদে 'জ্ঞানছাড়া' বাঙালদের ভোড়ুয়া বলা হয়েছে (৩৫ নং)। শব্দটির অর্থ ভড় বা নিম্ন-জলাভূমির অধিবাসী, ভাঁড়, স্ত্রৈণ হতে পারে। কামরূপ অঞ্চলের নারীরা পুরুষকে ভেড়া করে রাখে এ লোকস্মৃতিতে লালন নির্বোধ স্ত্রৈণ বলে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। লালন নিজে বাঙাল ছিলেন না। বাঙাল-বিরূপতার চিত্র পাই চর্যাপদেও (পদ ৩৯, ৪৯)। উপেন্দ্রনাথ ও অনেকে বসন্ত রোগে লালনের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাবার কথা বলেছেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪০)। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে বা অক্ষয়কুমারের বর্ণনায় এই নষ্ট-আঁখির পরিচয় নেই। তাঁর মুখে বসন্তের দাগ ছিল মাত্র। নন্দলাল বসুর চিত্রটি প্রাচীন ঋষি বা রাঢ়ের জাতি-বৈষ্ণব বাউলদের আদলে লালনকে আঁকা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবিটি এক ফকিরের। তাঁর পরণে 'হাল'। লালনের গানে খেলাফতধারী ফকিরের বেশ হিসাবে এই 'হাল' বর্ণিত হয়েছে। তিনি হাতাওয়ালা সেমিজের বা আলখাল্লা বা আলখাল্লা ধরনের বেশধারী ছিলেন। 'মৃত' বা ভেকধারী ফকির ছিলেন লালন। ছিন্নকন্থার ঝুলি, নারকেল মালার 'করোয়া' পাত্র, ত্রিশূল/চিমটার পরিবর্তে বক্র লাঠি তিনি ব্যবহার করতেন। একটি পদে লালন পরিষ্কার বলেছেন যে বাহ্যিক মালা, তসবী, তিলক কণ্ঠি তাঁরা ব্যবহার করেন না, "কালা মালা নাইরে ধারণ" (১৯৭)। জটা, ভস্ম ইত্যাদি তাঁরা ব্যবহার করেন না। পরেন না বিশেষ রং-এর কাপড়। লালনপন্থীদের নিম্নাঙ্গে অন্তর্বাস থাকে, তার উপরে দু'ভাঁজ করা ধুতি/একফেরতা লুঙ্গি ; গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি বা 'হাল'। লালন মন্তব্য করেছেন "শাদা ভাব তার সাদা করন"— এ থেকে অনেকে শ্বেত বস্ত্র শান্তি ও শুভ্রতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু শ্বেত বস্ত্র লালনপন্থীদের আবশ্যিক নয়। লালনের চেহারার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়েছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : "তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্ত ভাব—" (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০)। সর্বকেশরক্ষাও তিনি করতেন না।

সামন্ত ভূমি-সমস্যা লালনের পদে ছায়া ফেলেছে। জমিপত্তনের কবুলতি নেবার সময় নিয়মিত খাজনা-দানের প্রতিশ্রুতি দিতে হতো। যে-জমিদারের অঞ্চলে বাস করত প্রজা, তার আনুগত্য স্বীকার করতে হতো। দু'জন বা বহু-অংশী জমিদার হলে প্রজাদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেত (১৭০)। প্রায়ই প্রজাদের খাজনা বাকি পড়ত ; পৌরুষ দেখালে তা মাপ হতো না। খাজনার দায়ে পাইক/ বরকন্দাজ প্রজাকে ধরে বা দড়ি দিয়ে বেঁধে আনত জমিদারের কাছে। খাজনা না দিতে পারলে প্রজার সম্পত্তি নিলাম করে জমিদার খাজনা পেতেন ; পদ্ধতিটিকে লালন 'দায়মাল' নামে বর্ণনা করেছেন। [প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে লালনের মৃত্যুর পর তাঁর আখড়াটির খাজনা না দেওয়ার দায়ে নিলামে ওঠে]। জমিদারের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারতেন 'উপর হাকিম' (১৯১)। প্রসঙ্গত বলা যায় যে কাঙালের গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় ঠাকুর-জমিদারদের অত্যাচারকাহিনী তদন্ত করতে গিয়েছিলেন ছোটলাট। এবং প্রজানিপীড়ন এর ফলে প্রশমিত হয়। 'উপর হাকিম' শব্দটিতে এই ঘটনার অনুষঙ্গ জড়িত আছে। জমিদারগণ প্রজাদের কয়েদ

করতেন, দাঁড় করিয়ে চাবুক মারতেন।[৩৪] মহাজনের ঋণে প্রজাদের অনেকে বাঁধা পড়েছিলেন। কৃষকদের উপর ঋণের বোঝা বৃদ্ধির চিহ্ন এটি। নদীয়া জেলা বিবরণীতে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতকে এখানে চুরি, ডাকাতি ও জলদস্যুদের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল এবং সরকারী ব্যবস্থায় তা প্রশমিত হয়। নিম্নবঙ্গে এসময় মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা মহা আতঙ্ক তৈরি করেছিল। লালনের গানে নদীপথে বোম্বেটের উল্লেখ আছে। ডাকাতের বহু উল্লেখ লালন করেননি কিন্তু চোর ও চুরির বহু তথ্য তাঁর গানে আছে। একশ্রেণীর রাজা/জমিদার ছিলেন চোরের পৃষ্ঠপোষক (২৩৬)। নানা ধরনের চোর এবং তাদের কৌশলী চুরির পদ্ধতি লালনের অন্যতম প্রিয় রূপক। দারোয়ান, প্রহরীদের মধ্যে থেকে চুরি করত কৌশলী চোর (২১৩)। চোরের উৎপাতে রাতে অনেকে জেগে থাকতেন ; অনেকে পেতে রাখতেন চোর-ধরা ফাঁদ। ধরা পড়লে চোর বাঁধা হতো ; পায়ে পরানো হতো বেড়ি। বিচারে তার জেল/ফাঁসি হতো। (দ্বীপান্তরের প্রসঙ্গ নেই গানে।)[৩৫]

ম্যাজিস্ট্রেট বেড়ি-পরা কয়েদির বিচার করতেন। বিচারে জেল বা ফাঁসি হতো। [এই ফাঁসি দেবার ব্যাপকতা ঘটেছিল গণবিদ্রোহগুলির (সন্ন্যাসী-ফকির, ওয়াহাবী, সিপাহী) পরে]। তখনও ইংরেজ-প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থা গ্রামজীবনকে গ্রাস করেনি কিন্তু বিস্তৃত হচ্ছে। একটি পদে মামলায় হেরে যাওয়া এবং তুকতাকের সাহায্যে মামলা জেতার প্রসঙ্গ পাই (১২২)। কলকাতার সরাসরি উল্লেখ নেই লালনে কিন্তু আলিপুরের কাছারির উল্লেখ আছে। এখানে কামান-দাগার উল্লেখ থেকে মনে হয় এটি কলকাতার আলিপুর।

লালন নাগরিক নন, গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন তাঁর গানের পটভূমিকা। কিন্তু কয়েকটি শহরের নাম পাওয়া যায় গানে। সেগুলি হলো ঢাকা, দিল্লী, লাহোর, মক্কা, মদিনা, কাশী, জগন্নাথ (পুরী) . নদেপুরী (নবদ্বীপ), আলিপুর প্রভৃতি। এসব জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। শহরের গলি, বাজারের উল্লেখ আছে। কিন্তু জগন্নাথ ছাড়া আর কোন স্থানের বিশেষ বর্ণনা পাই না গানে। বাবুদের—নাগর, সুবেশ, সুরূপ ব্যক্তিদের এবং নাগরীদের উল্লেখ করেছেন লালন (১৩৬, ১৭২)। শহরে থাকত গুণ্ডা, বদমাশ, বোম্বেটে;—গ্রামের সরল মানুষকে তারা লুণ্ঠন করত (২৩৬)। গ্রামের মানুষ পালিয়ে চলে যেত শহরে, তার সন্ধান আর কেউ পেত না (১২১)। ইংরেজ আমলের শহর মূলত শোষণের কেন্দ্র। তাই গ্রামীণ মানুযেব দৃষ্টিতে শহর বিপজ্জনক।

ত্রিবিধ প্রকারের গৃহ লালন বর্ণনা করেছেন। বড়লোক বা জমিদারবাড়ির সিংহদরজায় থাকত বন্দুকধারী প্রহরী/দারোয়ান। এ বাড়ির নানা মহল, কাছাড়িবাড়ি, বিশ্রামগৃহ (আরামখানা) অন্তঃপুর,রংমহল, দেয়ালে আয়না লাগানো আয়নামহল। অন্যদিকে অতিদরিদ্র মানুষের ভাঙা কুড়েঘর। মেসিন ঘর বা শব্দের ঘরের উল্লেখ পাই একটি পদে (১৪৪)। তৃতীয় শ্রেণীতে আছে কারখানাঘর (৭৮, ৬৯)। ব্যবসায়ীদের ও কুঠিয়ালদের নানা ধরনের কুঠি, মালকুঠি, ঘরে শতেক তালা লাগানো থাকে। গানে তালা এবং চাবির ব্যাপক উল্লেখে জানা যায় যে এসময় এগুলির ব্যবহার প্রসারিত হয়েছিল।

পারা-লাগানো দর্পণে মুখ দেখা হতো; দেয়াল সজ্জিত করা হতো। তুলা ও তেল দিয়ে বাতি জ্বালানো হতো। 'লণ্ঠনের' ব্যবহার শুরু হয়েছিল (৬২,১১৪)। একটি পদে ঘড়ি, দম দেয়া এবং ঘড়ি বাজার প্রসঙ্গ আছে (১১৮)। কিন্তু ঘড়ির সময়-সংকেতের শব্দাবলী গ্রহণ করেননি

লালন, তিনি প্রাচীন কালপরিমাপক পল, তিল, প্রহর, দণ্ড, দ্বিপ্রহর প্রভৃতি শব্দ দিয়ে সময়কে চিহ্নিত করেছেন। চান্দ্রমাস ও তিথিগুলি মানতেন হিন্দু-মুসলমান জনগণ। সন-তারিখ বাংলা সন অনুযায়ী নির্ণয় করা করা হতো। অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দিনের তিথি ইত্যাদি নির্ণয় করে শুভ/অশুভ সময় নির্ণয় হতো। কৃষির বিরল চিত্রকল্প পাই লালনের গানে। স্বল্প উল্লেখে দেখা যায় যে 'জো' বুঝে সঠিক সময়ে নানা ফসল চাষ করা হতো। ভুই বোনা (ধান্যরোপণ)-এর বর্ণনা আছে গানে। অম্বুবাচীতে চাষ নিষিদ্ধ ছিল। পঞ্জিকা দেখার রীতি ছিল সমাজে (১৩)। নদীয়া জেলা বিবরণে দেখা যায় যে, পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা দেখা দিত। কুষ্টিয়া তো খাল, বিল, নদী, নালায় পূর্ণ। নদী, কূপ, পুকুর, বিল, বাওড়, আপাএ, ডহরের পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে লালনের গানে। বন্যার জলে মাঠ, ভিটাবাড়ি, প্রায়ই ডুবে যেত (৬১)। পথে সাঁকো দিয়ে পার হতে হতো; কিছু সঙ্কীর্ণ সাঁকো পার হওয়া ছিল কষ্টকর। নদীপথের নানা বর্ণনা থাকলেও পদ্মা নয় লালন যে-নদীর নাম করেছেন তা হলো ত্রিবেণী গঙ্গা। নদী ও পুকুরে থাকে স্নানের ঘাট, নদীতে পারঘাটা ও ঘেটেলা (ঘাটোয়াল)। কড়ি দিয়ে পারঘাটায় পার হতে হয়। নদীপথ ছিল মানুষ ও মাল-চলাচলের প্রধান পথ। নদীপথে ঝড়, বৃষ্টি, জোয়ার, ভাটা ; সুবাতাস, কুবাতাস নির্ণয় করতে হতো। হাল ধরে নৌকাকে সঠিক পরিচালনা করতেন কাণ্ডারী। নদীর স্থানবিশেষে পাঁক ও ঘূর্ণিস্রোত থাকত। অভিজ্ঞ কাণ্ডারী ব্যতীত জলপথে গমন করা সহজ ছিল না। মাঝিরা হতো গোঁয়ার, কখনো বা আনাড়ি ; অবাধ্য হয়ে তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করত। ব্যবসায়ীদের মাল চলাচল করত নদীপথে। নৌকাডুবি হয়ে, মালশুদ্ধ 'ভারা মারা যেত'। মহাজনের ধনবিনাশ হতো। নানা ধরনের নৌকা, বজরা, সুলুক, শুজা, বাট্রিলা, পাল ও বাদামের বর্ণনা আছে গানে। কলের নৌকা (ষ্টীমার, পদ ১৩৬) অনায়াসে উজান-ভেটেল করে। জলে ডোবা, খাবি খাওয়া, তুফানে মারা যাওয়া, সাঁতার হাবুডুবু খাওয়া, কেশে ধরে মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করার ছবি এঁকেছেন লালন। নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেয়ার রীতি ছিল। ভাসমান মৃতদেহ ঘাটে লাগত। নদীতে কুমীর ও নানা ধরনের মাছ পাওয়া যেত (৩৫৩)।

সিন্ধু, অর্ণব, সাগর, সমুদ্রের উল্লেখ করেছেন লালন ; জোয়ার-ভাটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় রূপক। কিন্তু সমুদ্রের নির্দিষ্ট কোন বর্ণনা নেই ; একবার মাত্র সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে চুল ধরে উদ্ধারের কথা আছে। লালন এক মায়ানদীর বর্ণনা করেছেন ; যার অন্য পারে অজ্ঞাতলোক ; তিন ধারায় ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য ; পলকে বন্যা হয় সে শুষ্ক খাতে। এসময় নদীর জলধারা শীর্ণ হয়ে আসছিল, মরে হেজে যাচ্ছিল খাল-বিল। গানে পাচ্ছি চড়া পড়েছে নদীতে, প্রবাহহীন শুষ্ক নদীখাত,

খাল, বিল, নদী, বাওড়ে মাছ ধরা হতো। মাছ/মীন লালনের গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকল্প। পাঁতি, মায়া প্রভৃতি নানাপ্রকার জাল দিয়ে, জল সেচে, ফাৎনাযুক্ত ছিপ দিয়ে, ডুবারু জলে ডুবে মাছ ধরত। খাদ্য হিসাবে মাছের সরাসরি উল্লেখ নেই গানে। ডিমের উল্লেখ আছে কিন্তু গানের কোথাও পশুবলি বা মাংসের কোন প্রসঙ্গ পাই না। ডিম, মাংস অনেক লালনপন্থী খান না।

স্থলপথে চলত গরুর গাড়ি। ব্যবসায়ীগণ বলদের পিঠে চিনি ইত্যাদি নিয়ে বিক্রয় করত (১৯৫)। লাঙলে বলদ ব্যবহৃত হতো ; কলুরা তেল-নিষ্কাশনে ব্যবহার করত বলদ।

হাট ও বাজারে পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাচ্ছি গানে। কখনও দেখি বাজার উঠে যাচ্ছে। তখন

স্থায়ী দোকান দেখা দিয়েছে ; সেগুলি পণ্যসম্ভারে পূর্ণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার প্রতিষ্ঠার যুগে, মহাজন বা বড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ছোট ব্যবসায়ী ব্যবসায় মূলধন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেত। ধনীরা ও মহাজনেরাও ফতুর হয়ে যাচ্ছিল (২১৯)। সাধারণ মানুষ বা ব্যবসায়ীর মূলধন, পিতৃধন বা ঋণপ্রাপ্ত ধন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবার রূপকটির বহুল ব্যবহার (৮৬) আছে গানে। ব্যবসা ছিল মানুষের অন্যতম জীবিকা। যে-বড় নৌকায় মাল চলাচল করত, তার নাম ছিল মহাজনী নৌকা ; মালের অন্য নাম 'ভারা'। দস্যুর লুণ্ঠনে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হামেশাই বড় মহাজন ও ছোট ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে যেত। কৃষক খাজনা না দিতে পেরে 'দায়মাল' হতো। উঁচুতলার একশ্রেণীর মানুষের এবং নিম্নশ্রেণীর এই ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে সর্বস্ব হারানোর বর্ণনা লালনের সমাজবাস্তবতার মূল প্রবণতা। ফকিরী ধর্মটি এদের শেষ আশ্রয়। নিঃস্ব মানুষ 'দাসখত' লিখে দিয়ে অন্যের ক্রীতদাসে পরিণত হতো।

মেলা বা উৎসবে বাজি পোড়ানো হতো (৫০, ৯৭, ১১৮) ; ভোজবাজি (ম্যাজিক) প্রদর্শিত হতো, থাকত নাগরদোলা (৩৩০), বাজিকর পুতুল নাচাত ; পুতুলে কথা বলত (১৬১)।

বাজি ধরা ও জুয়াখেলা প্রচলিত ছিল সমাজে (৫৬)। ধনুক, বাণ, ছিলের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে এগুলি জনজীবনে ব্যবহৃত হতো। বন্দুক ও কামানোর উল্লেখ পাই গানে ; কিন্তু ধাতব অস্ত্রের উল্লেখ বিরল।

খাতা ও কলমের ব্যবহার ছিল সমাজে (২৩৭)। নানারকম খাতা—হিসাবের খাতা, গোনা-খাতা (পাপের)। কলম শব্দটি অভ্রান্ত আইন বা বিধানরূপেও ব্যবহৃত হচ্ছে ; যেমন নবীর কলম, বিধির কলম। লিখিত জিনিস খুব মূল্যবান ও প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতো। বিশ্ববিধান ও আইন/আএন, হুকুম প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা ইচ্ছা তা করতে পারেন সাঁই ; অর্থাৎ প্রচলিত বিধান বা আইনকে ভাঙতে পারেন শক্তিমান ; দুর্বল সাধারণ মানুষেরা আইনকে মান্য করে চলেন। সাঁই-এর জন্য আইন নয় ; কারণ-কার্যের সূত্রে তিনি বদ্ধ নন ; উপরন্তু তিনি খেয়ালি ; তবে হৃদয়বান ও দয়ালু, ভক্তি ও আত্মদানে তিনি বশীভূত হন।

নানাপ্রকার রোগ, বিকার এবং প্রতিবিধানের জন্য ওষুধ, পথ্যের ব্যবস্থা ছিল। শিশুদের অসুখ হতো ; অনেকে জন্মাত অন্ধ, বোবা, কালা হয়ে। একে পূর্বজন্মের কর্মফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হতো। সমাজে পাগল ও পাগলামি ছিল। প্রেমের জন্য পাগল হতেন যারা তাদের বলা হতো 'দেওয়ানা' (২৬)। পাগলকে খুশি করে শান্ত করার চেষ্টা হতো। মানসিক রোগাক্রান্ত ছাড়াও অন্য ধরনের সাধক-পাগল দেখা যেত। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, চৈতন্য নদীয়ার বিখ্যাত তিন পাগল। এদের কান্না, হাসি, নৃত্য, গান সাধারণ দৃষ্টিতে পাগলামি বলে মনে হতো। এধরনের সাধক-উন্মাদেরা জাতকুল, শুদ্ধাশুদ্ধ, আচার, আত্মপর বিচার করতেন না। আত্মভোলা এধরনের পাগলামি লালনেরও প্রার্থিত ছিল। গায়ে ছাই মেখে অনেকে পাগল সাজতেন। চার রকম পাগলের শ্রেণীবিভাগ লালনের (তিনি চিকিৎসক ছিলেন) মানসিক পাগল, প্রেমপাগল, সাধক-পাগল, সাজা পাগল।

স্কুল শব্দটি ব্যবহার করেছেন লালন। কুমারখালিতে কাঙালের বিদ্যালয় ছিল। স্কুলে পড়লে জ্ঞানের উদয় হয় (২১)। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি তিনি অপক্ষপাত। ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ আমাদের ভাষায় আসন করে নিচ্ছিল সেসময়।

রান্না বা অন্য কাজে আগুন জ্বালাবার জন্য ব্যবহৃত হতো কাঠ। কয়লা, গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানির কথা লালনে নেই।

সেকালে কুলের বৌ ঘোমটা টেনে গৃহে থাকতেন ; কুলত্যাগিনী নারী ঘোমটা-ছাড়া হাটেবাজারে, পথেঘাটে ঘুরত। ধনীদের বাড়িতে দাস-দাসী থাকত। ইচ্ছাহীন ব্যক্তিত্বের আদর্শ দাসত্বের প্রতি লালনেরও পক্ষপাত ছিল। মালিকের বা গুরুর চরণসেবা করত দাসী বা শিষ্যা ; প্রার্থিত হলে করত দেহদান।

শ্মশানে দাহ করা হতো মৃতদেহ ; মুসলমান ও সাধুদের দেহ গোর কাফন দেয়া হতো। ইসলামী ও ফকিরী পদ্ধতিতে মৃতের জন্য সমবেত নামাজ 'জানাজা' পড়ার রীতি ছিল। মৃতকে কয়েক প্রস্থ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হতো (২৫১, ৩৩৫)। জল-সমাধির রীতিও ছিল।

নানাপ্রকার যন্ত্র বাজাত যন্ত্রী ; সুবোল বাজনা শিক্ষণীয় ছিল। জয়ঢাক, রাজডঙ্কা বাজিয়ে লোককে নানা বিষয় জানানো হতো। একতারা, দোতাবা, গুপীযন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ নেই গানে। নূপুরের উল্লেখ আছে।

মানুষ কুয়োর জল পান করত ; বন্যায় কুয়ো ভেসে যেত। কচু, তেঁতুল, মানকচু, কাজি (জলদেয়া বাসিভাত), দুধ, ক্ষীর প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ছিল। দুধ মন্থন করে ঘোল ও মাখন হতো। পেয়ালা ব্যবহৃত হতো (৩৬৯) ; খাবার ঢাকার জন্য ব্যবহৃত হতো সরপোষ।

গ্রামীণ খেলার মধ্যে তাস, লুকোচুরি, সঞ্চা (৩৫৩), ডাণ্ডাগুলি ; জুয়া খেলে হেরে যাওয়া—প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। ফাঁদ পেতে পশু বা পাখি ধরা হতো।

লালনের গানে পশুর উল্লেখ (গরু ছাড়া) বিরল ; কিন্তু নানারকম পাখির উল্লেখ আছে, যেমন কাক, ময়ূর, চাতক, ফিঙে, ময়না, গৃধিণী এবং শুক। ফাঁদ পেতে পাখি ধরা হতো ; জংলা পাখিকে পোষ মানিয়ে পিঞ্জরে, দাঁড়ে বসিয়ে পোষা হতো। কীটপতঙ্গের মধ্যে কুমর/কুমরী পোকা (১৫৮), মাকড়সা, জোকের (২৪৪) উল্লেখ পাই।

বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা দেহাভ্যন্তরে অধিকতর অভিনিবেশহেতু বৃক্ষ, লতা, পুষ্পাদি লালনের তাদৃশ মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। জলসেচ করে বাগান করা, মালি গাছের উপশাখা ছেদন করে প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঐতিহ্যবাহিক। নিমগাছের উল্লেখ পাই গানে ; আর পাই এক বিশাল বনস্পতির বর্ণনা ; সন্ধ্যাগমে নানা পক্ষী যেখানে আশ্রয় নেয়, সূর্যোদয়ে উড়ে যায়। মূলহীন বিনা বীজে জাত (!) বায়ুজীবী আলোকলতার এবং মূলহীন আব এক অ-লৌকিক লতার উল্লেখ পাই লালনে ; এ বনলতায় পুষ্প বিকশিত হয়, হয় লতা-দেহ থেকে মানুষের জন্ম। অ-লৌকিক ফুল ছাড়া লতা। একটি মাত্র ফুলের প্রাধান্য গানে—তা হলো পদ্ম। বিকশিত, মুদিত, নাল, কুড়ি, কন্দ-সহ স্থির বা অস্থির জলে পদ্মের চারটি রং। পদ্ম প্রকৃতি থেকে নারী/পুরুষ দেহে, 'খ' পুষ্পরূপে আকাশে বা দেহের চক্রে বা অঙ্গে আশ্রয় পায়।

বেড়া দিয়ে জমি, বাগান, বাড়ির সীমানা নির্ধারিত হতো। স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মসর্বস্বতা সমাজে প্রকটতর হয়েছিল। অধিকাংশ মানুষ সুখের সন্ধানে ধাবমান কিন্তু অসুখী।

লালনের অন্যতম প্রিয় প্রতীক সাপ ও সাপের ব্যাঙ ধরা। কাল, কালনাগিণী. দুমুখো সাপ, মণিযুক্ত সাপ, বিষহীন সাপের প্রসঙ্গ আছে গানে। লোকবিশ্বাস ছিল যে সাপের মাথায় মণি হয়, সে মণি অপহৃত হলে সাপ বাঁচে না। পথেঘাটে ছিল সাপের ভয়। গুণিন ও ওঝারা মন্ত্র, তন্ত্র ও ঝাড়ফুক করে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করত। কালসর্প দংশন করলে ঝাড়-ফুক ব্যর্থ

হতো ; মাথায় (ব্রহ্মরন্ধ্রে) বিষ উঠে মৃত্যু ছিল অনিবার্য। গুণিনদের কাছে তুক, তাক, গুণ অনেকে শিক্ষা করত। গুণিনদের মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল। 'চৈতন্য' গুণিনরা সম্মানীয় ও আদৃত ছিল। তাঁরা মিথ্যার বেসাতি করত না। গুণিনদের অনেকে সাপের বিষ ভক্ষণ করতেন (১২)।[৩৬] ফসলের খেতে কাকতাড়ুয়া রাখা হতো কুনজরের বিরুদ্ধে।

কৃষি ও কৃষকের ছবি খুব কম গানে ; লালনের জগৎ মূলত অকৃষক এবং হস্তশিল্পীদের জগৎ। তাঁর অধিকাংশ রূপক চিত্রকল্প অকৃষি-হস্তশিল্পসম্পৃক্ত। বস্ত্রবয়ন, সুতাকাটা ; কাঠ ও বাঁশ দিয়ে চরকা নির্মাণের প্রসঙ্গ আছে ২৩৯ নং পদে। খাঁচা প্রস্তুতকারী, ঘরামি, কাঠফাড়া, ডুবরী, যন্ত্র, কারিগর, মিস্তিরি, কুমার, কামার, জহুরী, শালকর (পটুক), কোষ্টার (ছালের) বানাত বয়নকারী, মোটবাহক মুটে, গোয়ালা, গুড়মিছরিওলা (১৪), কল ও কারখানা (৫২, ৬৯, ৭৮) প্রভৃতি প্রসঙ্গ গানে আছে।

আছে ট্যাকশালের কথা (৩৬৪), সোনা গলানো ও খাদ মিশানো এবং গিল্টি করার প্রসঙ্গ পাই গানে। অ্যালকেমির লোহাকে সোনা করার চিত্রকল্পটি এবং স্পর্শমণির দ্বারা স্বর্ণে রূপান্তরেব ছবিও বারংবার লালন ব্যবহার করেছেন। এছাড়া লোহা, পিতল, পারদ প্রভৃতি ধাতুর উল্লেখ আছে। পারদের ব্যবহারে আয়নায় যে প্রতিবিম্ব হয় সে বিষয়ে লালন সচেতন ছিলেন। গরীব মানুষ ব্যবহার করত মাটির বাসন, মাটিতে তৈরি গুড়ের নাদা ব্যবহৃত হতো। হস্তশিল্পীরা পৈত্রিকবৃত্তিতে থাকতেন। পূর্বযুগের সামন্ত-পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট শিল্পদ্রব্য যেমন শাল, জহরৎ, সোনা প্রভৃতির বিনষ্টি দেখা দিয়েছিল। এসমস্ত শিল্পী হয়েছিলেন দুর্দশাগ্রস্ত। প্রাক্তন যুগের শৌখিন বস্তুসম্ভার অনাদৃত হচ্ছিল। এগুলির চাহিদা কমে আসছিল। শালপটুকের চমৎকার শাল অপেক্ষা কোষ্টার চাদর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জহরৎ ও স্বর্ণাদি উপেক্ষা করে চাকচিক্যময় পিতল কিনত মানুষ। প্রাচীন বনেদী বস্তুসম্ভারের প্রতি সাধারণের উপেক্ষা এবং হাল্কা, উজ্জ্বল, সস্তা জিনিসের প্রতি ব্যাপক আসক্তি দেখা দিয়েছিল। 'চটকে জগৎ মেতেছে' (১০৫) চমৎকারভাবে যুগের মূল্যবোধের পরিবর্তনকে বিদ্ধ করেছেন লালন। ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ও অন্যায় সূচিত হয়েছিল সমাজে ; লালন কথিত, কলির আরতির সূত্রপাত।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীব মানুষকে চিহ্নিত করেছেন লালন। ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, হস্তশিল্পী, গায়ক-বাদক, উচ্চপদস্থ আমলা (হাকিম, ম্যাজিস্ট্রেট), রাজা-জমিদার-কুঠিয়াল ও তাদের পাইক-বরকন্দাজ, আমলা, তহসীলদার, নায়েবের এবং প্রজাসাধারণের উল্লেখ করেছেন লালন। জাত-পাতে শত খণ্ডে বিভক্ত লালনের চারপাশের সমাজ। জল বা খাদ্যগ্রহণে কঠোরভাবে জাত মানা হতো কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছিল যৌথ অংশগ্রহণ। ধনী ও দরিদ্রের, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের দুই বিপরীত জগতের চিত্র আছে লালনে। একদিকের অট্টালিকায় বারামখানা, রংমহল, আয়নামহল, সিংহদরজায় প্রহরী ; শত ঘরে শতেক তালা ; অন্যদিকে ভাঙা ঘর ; নিঃস্ব মানুষ।

সমাজে অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত কিছু যুগল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের কারো বৈরী সম্পর্ক : সাপ-ব্যাঙ, রাজা-প্রজা, ধনী-ফতুর, খাতক-মহাজন। কারো সম্বন্ধ সম্পূরকের : রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী, আল্লা-নবী, আসক-মাসক, মেঘ-বিদ্যুৎ, তালা-চাবি, খাঁচা-পাখি। তৃতীয় শ্রেণীর যুগলে আছে নির্ভরতার সম্বন্ধ : চাঁদ-চকোরা, মেঘ-চাতক, সূর্য-কমল, চাঁদ-শালুক, ভ্রমর-পুষ্প প্রভৃতি। 'সামান্য-বিশেষ' এই বিতর্ক-শাস্ত্রের ও দর্শনের শব্দও লালন দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন (১৮২)।

মানুষের ভাগ্যবিশ্বাস ছিল প্রবল (৩৪৯)। জীবনের ঘটনাবলী কর্মফল দিয়ে ব্যাখ্যা করার রীতি ছিল। ভূতপ্রেতে মানুষ বিশ্বাস করত। আলেয়ার আলোকে মনে করা হতো অপদেবতা বলে। শিশু-রোগের কারণ ছিল পেঁচো-পেঁচি। অন্যান্য অসুস্থতাকে জিন, ফেরেস্তার প্রভাব বলে মনে করা হতো এবং এজন্য ওঝা বা গুণিনের শরণাপন্ন হতো লোকে। গর্ভপাত করা হতো গোপনে। মাদুলি, তাবিজ, কবচ, ঝাড়ফুক, মন্ত্রতন্ত্র, দোয়া-দুরুজের চল হিন্দু ও মুসলমান সবার মধ্যে ছিল। ভণ্ড, অভণ্ড নানাধরনের চতুর বাক্‌সর্বস্ব সাধু ছিল ; ছিল নানা বেশধারী ফকির। মাজার ও দরগায় মানত করা হতো ও সিন্নি দেয়া হতো। মাটি, কাঠ, ধাতু, পাথরের মূর্তি পূজিত হতো। একক বা সমবেতভাবে নমাজ পড়া হতো মুসলমান সমাজে। 'জামাত' ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নানাধরনের মৌলবী, মাওলানা ছিলেন। হিন্দু সমাজে সাকার-নিরাকার উপাসনা নিয়ে প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। আকার/নিরাকারের এ দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ বহু গানে আছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে বহু মতভেদ, 'অনুমান'-'বর্তমানের' মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। ব্রাহ্মধর্ম এসময় শাক্ত ও বৈষ্ণবদের তীব্র সমালোচনা করত। মুসলমান সমাজেও তীব্র ধর্মীয় বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। এসময় আহ্‌লে হাদীস বা ফারাজী মতবাদ প্রচারের সূত্রে লৌকিক ইসলাম ও হানাফী সুন্নীদের সঙ্গে প্রবল ধর্মীয় বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ওয়াহাবী আন্দোলনে নবী হজরত মহাম্মদ এবং পীরের অত্যধিক গুরুত্বকে খর্ব করা হয়েছিল। সুন্নী, হানাফী এবং লালনের মতো ফকিরেরা এ প্রচারে বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন। মৌলবী মওলানারা একই কোরাণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করতেন। শরীয়তের সঙ্গে মারফতী মতের ছিল দ্বন্দ্ব (৯৭)। লালনের সমকালের ইসলাম ধর্মীয় বিতর্কে মুখর এবং চিন্তার শতপুষ্পে শোভিত[৩৭]। দেশের সর্বত্র মাজার, দরগা, আখড়া ছিল। পীর বা গুরুবাদ ছিল চলিত প্রথা। জীবনে বেঁচে থাকা দুঃসহ হয়ে উঠায় অনেকে সাধু/ফকির হয়ে যেত (১৪১)। ভেক/খেলকা নিয়ে সাধুবেশ গ্রহণ করে অনেকে এড়াতেন সমাজের দায় (৮৭, ১২৫, ২৫১)। ধর্মস্থান ও তীর্থে গেলে পাপ ক্ষয়ে পুণ্য অর্জিত হয়, এ লোকবিশ্বাস ছিল।

সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতার বেদনা-আর্তি ব্যাপকতা লাভ করেছে লালনের গানে। আপন মনের কথা বলবার কেউ নেই (৮১, ১৯০)। চিরদিন দুখের অনলে প্রাণ জ্বলছে (৩৩৬) ; এ পৃথিবীতে কেউ কারো নয়—যেতে একা, আসতে একা ; কেউ কারো সঙ্গে যায় না কবরে ; বৃক্ষের পাখিরা উড়ে যায় আপন আপন পথে (৩৩২)। মনের মানুষের সন্ধান, তাকে পাবার আর্তি ; অপূর্ণতার হতাশা, অক্ষেপ, বেদনা এবং আত্মধিক্কার লালনের বহু পদে পাই। কিন্তু প্রাপ্তির উল্লাস বা শান্তির স্থৈর্য লালনে খুব কম। নিজের ব্যক্তিত্ব তাঁর বহু খণ্ডে খণ্ডিত। এগুলির পারস্পরিক আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব জীবন-নাটকে রক্তস্রোত অনর্গলিত করে। তাই বেদনা ও অতৃপ্তির নির্ঝর হয় গান। শোষকশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদীগণ দ্বৈত শাসনে নিম্নবিত্তের আত্মবিকাশকে এদেশে নিরুদ্ধ করেছিল। উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ও ভোগাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল শ্রমজীবী শ্রেণী। আর কৃষক-বিদ্রোহগুলি কেবলি ব্যর্থ হয়েছিল। প্রাচীন আর্থ-মানবিক সম্পর্কগুলি নষ্ট হয়ে গেছে ; নতুন কিছু গড়ে ওঠেনি—এমত নৈরাজ্য ও বিচ্ছিন্নতার মেঘে ব্যাপ্ত দেশের আকাশ—লালনের মনের মুকুরে তারই ছায়া।

প্রচলিত হিন্দু ধারণায় পাপ, পুণ্য এবং কর্মফল বিনিময়যোগ্য। সতীর পুণ্যে পতির প্রাণরক্ষা হয় ; দাতার পাপ গ্রহণ করে গ্রহীতা ; পিণ্ড-গ্রাসী ব্রাহ্মণ পাপাহারী বা শিষ্যের সব পাপ গ্রহণ

করে গুরু। কিন্তু লৌকিক ইসলাম প্রতি ব্যক্তির কর্ম ও ফলকে স্বতন্ত্র মনে করে। লালনে তার ছায়া আছে। দেহকেন্দ্রিক লৌকিক সাধনার ঐতিহ্যে একক ব্যক্তি-চিন্তার প্রাধান্য আছে। আর. এস. খারে নিম্নবর্গীয় সাধনতত্ত্ব থেকে সমাজবিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্ম এবং য়ুরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন[৩৮]। লালনের সাধনপথও একান্ত ব্যক্তিগত। উপরন্তু তাঁর সামাজিক অবস্থান থেকেও এই বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়েছে। চণ্ডীদাসের রাধা বলেছিলেন, "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন, কৈনু পর"[৩৯]। বহু গানে লালন আত্মপর ভেদ ভুলে সবাইকে আপন ভাবতে চেষ্টা করেছেন।

বাউল/ফকিরী মতবাদ গ্রহণের ফলে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা ক্রমশ পর হয়ে যায় ; গুরুকুলে নবপরিচিতেরা হয় আপন। সামাজিক সম্পর্ক ও জীবন থেকে ভিন্ন আর এক সমান্তরাল জগতে চলে যায় সাধক। তার পুরনো identity ভেঙে ; নতুন identity গড়ে ওঠে। এই ক্রান্তিপর্বটি সংবেদনশীল শিল্পী লালন ধরেছেন। তাত্ত্বিক দিকে 'পর আপন' হবার প্রসঙ্গটি মনোরম হলেও, বাস্তবে এ সাধনপন্থা মানুষকে এককে পরিণত করে।

লালন-অনুসৃত গুপ্ত রসসাধনা উচ্চবর্গের সামাজিকদের সমালোচনার বিষয় ছিল। মৌলবী ওয়ালী, হিতকরী, জে. এন. ভট্টাচার্য, অক্ষয়কুমার, দয়ানন্দ, রেয়াজুদ্দীন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লোকায়ত সাধকদের বিরুদ্ধে লালসা এবং বহুগামিতার অভিযোগ এনেছেন। হিতকরী এবং অনেকে অবশ্য লালনকে এ দায় থেকে খালাস দিয়েছেন। সরলা দেবী, লালনকে 'মহাত্মা' বলেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে গবেষক লুৎফর রহমান, 'লালনপন্থী' (!) তথ্য-সরবরাহক শাহ্ লতীফ আফী আনহু এবং জনৈক কফিলুদ্দীনের সহযোগে লালনচরিতে যৌন-বিকার আরোপ করেছেন। এদের মতে লালন, 'চিরকুমার' কিন্তু একাধিক নারী ছিল তাঁর সেবাদাসী। সেবাদাসী অর্থে কাম-সঙ্গিনী। এ ধরনের অন্তত দু'জন সেবাদাসী ছিল লালনের ; দ্বিতীয় জন ব্রাহ্মণকন্যা মতিবিবি [ব্রাহ্মণকন্যার মুসলমান-বরণের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক হীনমন্য বিকার চিহ্নিত করা যায়]। এসমস্ত তথ্যের কিন্তু কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই।[৪০]

লালনের গানে ব্যক্ত হয়েছে তার জীবনবিশ্বাস। ২২২ নং পদে বিবৃত হয়েছে যুগলসাধন-তত্ত্ব। ভক্তিপাত্র (নায়িকা) নির্ণয় করে, পাত্রনিষ্ঠার (একনিষ্ঠ) শর্তে হয় সেবাসাধনা, প্রেম-উপাসনা। দেহে-মনে একনিষ্ঠ না হলে যুগলসাধনায় পুরুষ সাধক সিদ্ধ হয় না। সুতরাং পুরোহিত/মৌলবী ব্যাতিরেকে বিবাহিত লালনের জীবনসঙ্গিনীর প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। এবং ছেউরিয়ায় মহাশয়নেও এ নারী তাঁর পাশেই আছেন। কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং কামুকদের প্রতি বিরূপতা লালনের বহু পদে পাওয়া যায়। সামন্তযুগে বহুগামিতা পৌরুষের অন্য নাম। লালন কিন্তু একে অগভীর ঘৃণিত মূল্যবোধ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কৃষ্ণের নাগরালি, বহুগামী লম্পটগিরির প্রতি রাধাসহ লালন ধিক্কার বর্ষণ করেছেন (৩১৯, ৩২০)। গোপীভাব এবং রাধাতত্ত্বের মহিমা একনিষ্ঠায় অতুলনীয় (৩৬২-৩৬৪)। ঈশ্বর সর্বঐশ্বর্যবান। কৃষ্ণ বহুগামী বলেই প্রেমের গভীরতা ও সুখানুভবকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। কৃষ্ণের আত্ম-অনুশোচনা, গৌরলীলায় ব্যক্ত হয়েছে চৈতন্যের ক্রন্দনে। অন্য কোনভাবে, শুদ্ধ প্রেম ছাড়া, লালনের সাঁই লভ্য নন। লালনের সাধনায় সাধনসঙ্গিনী প্রেমের গুরু। সাধিকা নারী স্পর্শমণি। রাধার স্পর্শে শ্যামাঙ্গ, গৌরাঙ্গ হয়। প্রেমের অন্য নামই নারীত্ব।

প্রেম সর্বস্ব ত্যাগ করে। হেতুহীন গোপীপ্রেমের ঋণের দায়ে শ্যাম হয় গৌর ; রূপ-সনাতন

ফকির ; শক্তি-হাড়গলে শিব শ্মশানবাসী। এধরনের প্রেমাবেগে সিদ্ধ সাধক চণ্ডীদাস। সুফী ঐতিহ্যে এদের 'দেওয়ানা শালিক' বলা হয়। যুগল-সাধকেরা জীবনে-মরণে অচ্ছিন্ন (৩৫৪)। খেলকা/ভেকধারী সাধকেরা সর্বদা প্রেমামোদে মত্ত। তারা সাধনায় কামের ঘরে কপাট মেরে, কামরতিকে জারণ করে প্রেমরতিতে পরিণত করে। কাম থেকে মহাকামী, অবশেষে নিষ্কামী না হলে রস বা সহজ সাধনায় অধিকার জন্মে না।[৪১]

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্ন দেবতা ও পৌরাণিক চরিত্রের এক-একজন প্রধানা স্ত্রী বা শক্তি গুরুত্বপূর্ণ প্রেম-সম্পর্ক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। খালিমপুর লিপিতে ধর্মপাল ও তাঁর মহিষীর সম্পর্কসূত্রে চন্দ্র-রোহিণী, অগ্নি-স্বাহা, শিব-সর্বাণী প্রভৃতি যুগলের কথা বলা হয়েছে।[৪২] প্রকৃতিজগতে অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত (যেমন চাঁদ-চকোর প্রভৃতি) কিছু যুগলের মহিমা-গান শুনি। চট্টগ্রামের আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ কবির রচনায় এসমস্ত যুগল বিশ্বের অন্তর্লীন প্রেম-যুগলের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এসমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষ প্রধান এবং বহু-বিবাহিত—নারী একনিষ্ঠ। সাংখ্য এবং শাক্তদর্শনে প্রকৃতি প্রধান হয়ে পুরুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে শুরু করে। অন্যদিকে সংস্কৃত মানবিক আবেগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হতে থাকে প্রাকৃতিক যুগলের তুলনায়। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ যুগলের তুলনা, প্রাকৃতিক যুগলের রাজ্যে খুঁজে পাননি।[৪৩] অবশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে তির্যকভাবে নির্দেশিত হলো 'পূর্ণ ঈশ্বর' কৃষ্ণের অভাববোধ ; উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, 'মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী'। রাধা দেবী নন, মানবী ; মানবিক প্রেম পেল অশেষ মর্যাদা। যুগলপ্রেমের প্রতীক রচনা করলেন পঞ্চ বা নব-রসিক মহাজন। দেবতা থেকে মানবে, উভয়ের একনিষ্ঠা ও তাপসহনে এ প্রেম-ঐতিহ্য বিবর্তিত হলো।

বৈদিক এবং অবৈদিক দেহসাধকেরা কামকে মনসিজ মনে করেন। উপরন্তু দেহবাদীরা সৃষ্টির মূলে কামশক্তিকে স্থাপন করেছেন। সঙ্গিনী/সঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাম এবং প্রেমকে, লোহা এবং সোনার মতো পৃথক মনে করেছেন। অন্যপক্ষে, বহু সাধক কাম ও প্রেমকে পৃথক মনে করেন না।[৪৪] কামকে সাধনায় মহাকামে এবং প্রেমে রূপান্তরিত করতে হয়। কাম জৈব অন্ধশক্তি, প্রেম মানবিক, সংস্কৃত অনুভব। সাধারণভাবে সাধকেরা মনে করেন যে, (ক) স্খলনহীন দেহমিলন প্রেম ; স্খলন জীবাচার কাম। (খ) সন্তানহীন দেহমিলন নির্হেতু প্রেম ; পুত্রোৎপাদনের দেহমিলন 'হেতু' কাম। (গ) দেহে কাম ও প্রেমসরোবর ভিন্ন ; জন্মস্থানে নিম্নদ্বার কামের, মধ্যদ্বার প্রেমের বিলাসস্থান। অটল সাধনা এবং সহজ রসসাধনা পৃথক পদ্ধতি।[৪৫] (ঘ) অনেকের মতে নারীর ইচ্ছায় এবং তাকে তৃপ্তিদানের ইচ্ছায় ঘটিত দেহমিলন প্রেম বা 'ঋণশোধ'।

দেহমিলনে আনন্দলাভ করতে গিয়ে জীব শুক্রসত্তা হারিয়ে গ্লানিবোধ করে ; বহু সন্তানের জন্মে আসে ক্ষয় ও জরা। নর-নারীর সম্পর্কের এই অতৃপ্তিবোধ থেকে, সুখ ও আনন্দের অভিলাসে মানুষ বস্তুরক্ষার সাধনা আবিষ্কার করে আনন্দের খণ্ডীভবনকে রোধ করেছে। এ সাধনায় সাধক মহাকামী, অটল হয়। কিন্তু নায়িকা (পার্বতী) মৃত্যু রোধ করতে পারেন না। কৃষ্ণকাহিনীতে নায়িকা রাধাও সাধিকা, দুজনে সমশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু অটল কৃষ্ণ আত্মসুখপরায়ণ এবং বহুগামী।[৪৬] শিবের পরনারী-লোলুপতা সর্বজনবিদিত। সামাজিক বিবাহ-সম্পর্ক থেকে নায়কেরা আনন্দের স্বাদ না পেয়ে, পরকীয়া সম্পর্ক থেকে তীব্র আনন্দকে সন্ধান করেছেন। বৃন্দাবনলীলায় এই পরকীয়া প্রেমের জয়গান।[৪৭] বহুগামী নায়কেরা, যেমন কৃষ্ণ, মানবিক সম্বন্ধ

থেকে আনন্দের স্বাদ পেতে ব্যর্থ হন; তাঁর 'তিন বাঞ্ছা' থাকে অপূর্ণ। অন্যদিকে একনিষ্ঠ রাধা 'মহাভাব বা মহাসুখ' অনুভব করেন। কৃষ্ণের জন্য আত্মোৎসর্গকারিণী গোপী-প্রেম অনবদ্য। সুতরাং নির্বিচার কামাচারের অতৃপ্তি থেকে সৃষ্টি হলো মানবিক যুগল এবং বিশিষ্ট এক সাধনা। লালন শিব, কৃষ্ণ এবং চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনার কথা বলেছেন। এরা রসসাধনার পথিক। এই বিশিষ্ট সহজ সাধনায় নরনারী স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেন সঙ্গী বা সঙ্গিনী—এ নির্বাচনে জাত, কুলাদি অর্থহীন। এবংবিধ সম্বন্ধ অবৈদিক এবং সাধারণ্যে ছিল, 'অনর্পিত'। এখানে নর এবং নারী দু'জনে একনিষ্ঠ। এদের কারো সম্পর্ক গোপনে; কারো বা কুলত্যাগ করে সমাজের বাইরে। এধরনের 'নবরসিক' যুগলের তথ্য বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বহুব্যবহৃত হয়েছে।[৪৮] দুইকে এক করে গঠিত এ যুগল। বস্তুরক্ষায় ও রসসাধনায় অতিপরিচয়ে এ প্রেম মলিন না হয়ে, 'তিলে তিলে নতুন হয়'। সমতা, সমরূপত্ব-প্রাপ্ত যুগলের জীবন ও মরণ এক হয়ে যায়। এই যুগলসাধনায় নারীরা সাধিকা, সন্তানহীনা, শিল্পরসিকা, দয়িতের প্রতিভা স্ফুরণের প্রেরণাদাত্রী। এদের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের। পুরুষ-সাধক এদের সঙ্গদোষে, 'নিন্দনীয় হৈল কেহ জাতিনাশা হৈল' (মীরাবাঈ-এর কড়চা)। ইতিপূর্বে প্রেমিকের জন্য নারী কুলশীল ত্যাগ করে কলঙ্কী হতো। এ পর্যায়ের কলঙ্ক এবং সমাজনিগ্রহ ভোগ করে পুরুষ। চণ্ডীদাসাদি প্রেমিকার প্রতি একনিষ্ঠ; প্রেমিকা তাঁদের সাধনগুরু এবং ইষ্ট। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রামী, বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি। নারীর সেবা ও সন্তোষ-উৎপাদন এদের সাধ্য বিষয়। সিদ্ধস্তরে 'নায়িকার সেবামাত্র সার'। 'নারীর সেবা করিয়া রসিক তিনি হন।'[৪৯] এই সেবার প্রতিদানে পাওয়া যায় 'কৃপা'; নারীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত রসে এ সাধকবর্গ "কৃপাসিদ্ধ।"[৫০] নারীর গুরুত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে 'যুগলসাধনা' পুরুষতান্ত্রিক সামন্ত-সমাজে প্রেমসম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় সূচিত করেছে।[৫১]

গুরুর সহায়তায়, লালনের সাধনজগতে, অনুপ্রবিষ্ট হতে হয়; উপদেষ্টা ছাড়াও গুরু ব্যতীত এ পন্থায় অগ্রগমন অসাধ্য। তাঁর সাধনা ক্রমিক স্তর-পরম্পরায় বিন্যস্ত। স্থূল, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ। এর তত্ত্ব-দর্শনের আলোচনা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রয়োগমূলক কর্মকাণ্ড : 'আসল ফকিরি মতে বাহ্য আলাপ নাইকো তাতে।' বিলাওতে বোবা গুরু কর্ম দেখিয়ে দেন; কালা শিষ্য সেগুলি করে। এ সাধনার একাংশ সর্বজনের জন্য; অংশবিশেষ বিশেষ অধিকারীর জন্য সংরক্ষিত। সহজ নামের সাধনাটি আসলে খুব সহজ নয়। সাধনা নিয়ে আছে নানা মতভেদ। একেকটি পদ্ধতি একেক জনের উপযোগী।

নারী বা যেকোন জাত বর্ণ ধর্ম গোত্রের মানুষ তার মানবাধিকারেই এ সাধনায় অধিকারী। দীক্ষায় আছে সার্বজনীন গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সাধনার্থী ও সাধকদের মধ্যে নানা স্তরভেদ লালন স্বীকার করে নিয়েছেন প্রাকৃতিক বলে। প্রকৃতি মানুষের সামর্থ্যে অসমতা সৃষ্টি করে। এর পেছনে জৈব বহু বৃত্তান্ত ক্রিয়াশীল। প্রচলিত সমাজের কর্তৃত্ব ও স্তর-বিভাজনের সূত্র পরিবার, বিদ্যা বা অর্থ ও কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা। জন্ম বা বৈষয়িক সূত্র অথবা পাণ্ডিত্য, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রচলিত সামাজিক স্তর-বিভাজনকে লালন গ্রাহ্য করেনি। লালনের স্তর ও উচ্চনীচ বিভাজনের মূল সূত্র সাধনারূপ কর্ম। কার্যকারণ সূত্রে এবং সাধনালব্ধ কর্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস লালনের। ব্যক্তির কর্মফলে শুক্রস্থিত জীবকণা বিশেষত্বপ্রাপ্ত হয়—এবং এ বিশেষত্ব বর্তায় জন্মান্তরে—অর্থাৎ পিতা থেকে পুত্রে। লালনশিষ্য দুদ্দু, উপরন্তু, পরিবেশের গুরুত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং দেশকালাশ্রিত কর্মফল ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব গঠন করে বলে লালন মনে করেন।[৫২]

কর্ম দ্বারাই মানুষ নিজে বিশেষত্বপ্রাপ্ত হয়—শ্রমজীবী মানুষের এ জীবনবাদের প্রভাবে লালন প্রভাবিত। সাধনা দ্বারাই মানুষ সমাজে বিশিষ্ট হয়। সাধনার তারতম্য সৃষ্টি করে সাধনা-জগতের কর্তৃত্বের আর এক শৃঙ্খল।

শিষ্ট উচ্চবর্গ এবং শাস্ত্রানুসারীগণের সঙ্গে লালনের বিশ্বাস ও জীবনযাপন-পদ্ধতির প্রবল দ্বন্দ্ব ছিল। দুটি মার্গ প্রায় বিপরীত ছিল। উচ্চবর্গের সংস্কৃতির প্রবল পীড়নে পীড়িত হয়েছিলেন লালন। তিনি সতত এই বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিবাদে লিপ্ত ছিলেন। লালনের গানের সর্বাঙ্গে আছে এই সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের চিহ্ন। প্রতিবাদী, বেদবিরোধী, জীবনচর্যা এবং ভিন্ন এক কর্তৃত্বস্থাপনের প্রয়াস যুগপৎ লালন চালিয়েছেন। ভারতীয় গৃহত্যাগী জনগোষ্ঠীর সাধারণ প্রবণতা হিসাবে রমিলা থাপার এর আলোচনা করেছেন বিস্তৃতভাবে।[৫৩] কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ এবং নবী হজরত মহাম্মদ লালনের গানের তিন নায়ক।

কৃষ্ণের নরলীলার বৃন্দাবন লীলা, (রাধা এবং গোপী-সহ) লালন গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন। শিশুকৃষ্ণ এবং শাসনকর্ত্রী মা বিষয়ক পদে লালনের আত্মজৈবনিক ছায়াপাত ঘটেছে। নদীয়া-মুর্শিদাবাদে সারারাত সাধুসভার পর সকালে গায়কেরা 'গোষ্ঠ' পালা ধরে। গ্রামীণ জীবনে রাখাল বালকদের বিশিষ্ট এ জীবন ছবি লালনের অনেক কটি 'গোষ্ঠে'র পদে স্থান পেয়েছে। সেকালের গ্রাম্য জনতার দাবিতেই এ পর্যায় গীত হতো। গোষ্ঠের গুপ্ত অর্থও আছে। লালনের মতে, কৃষ্ণলীলার অনন্ত রহস্য। এই রহস্য-জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়েছে একটি পদে (৪৯)—(ক) 'কৃষ্ণ' তিলার্ধ ব্রজ ছাড়া নন'; তাহলে মথুরায় রাজা কে হলেন? কেন রাধার বিচ্ছেদ-অনল?

(খ) পূর্ণ ভগবান হরি, কিসের অভাবে হলেন দণ্ডধারী সন্ন্যাসী? (গ) কেন কৃষ্ণের আগে উচ্চারিত হয় রাধার নাম? কৃষ্ণ বহিরঙ্গে নারী বা রাধা হলেন কেন? অন্যত্র তার প্রশ্ন (ঘ) কেন তিনি রাখালেন উচ্ছিষ্ট খান ও ধারণ করেন নারীর চরণ?—এ সমস্ত প্রশ্ন থেকে চৈতন্য চরিতামৃত, রূপ গোস্বামী প্রমুখ চৈতন্য-উত্তরকালের ত্বত্ত্বের সঙ্গে লালনের পরিচয় সূচিত হয়। কৃষ্ণের মানবলালী, অলৌকিকতা ও ঐশ্বর্য বাদ দিয়ে লালন গ্রহণ করেছেন।

নানা তির্যক অনুষঙ্গে রাধার মহিমা প্রচারিত হয়েছে লালনের পদে। রাধার চরণে দাসখত লিখে দেয়া, অপরাধে মার্জনা প্রার্থনা, তাঁর পদধারণ করে কৃষ্ণের অনুনয়ের মধ্যে রাধা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মানের পদগুলিতে দেখি মানের ঘায়ে বাঁকা সোজা হয়েছে, শ্যাম যোগী হয়েছে মান ভাঙাতে এবং শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হয়েছে। একনিষ্ঠা প্রেমিকা নারী রাধাকে কৃষ্ণের ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে। সকলে কৃষ্ণকে চায়; সেই কৃষ্ণের প্রার্থিত রাধা—সুতরাং রাধা আরাধ্যা। রাধা বা নারীতত্ত্বের বিশেষণে একটি শ্লেষ ব্যবহার করেছেন লালন, সেটি 'আদ' অর্থ অর্ধেক, বা আদি (আদ্যা)। লালনের রাধাই পরশমণি; তাঁরই স্পর্শে কৃষ্ণ হলেন গৌর। বহুগামী কৃষ্ণ এবং তার অটল-সাধনা লালনের সমর্থন পায়নি। বৈষ্ণবদের মতো তিনি রাসের উল্লাস বর্ণনা করেননি। একনিষ্ঠা রাধা প্রেম, একনিষ্ঠা ও নারীব্যক্তিত্বের এবং দুঃখসহনের প্রতীক চরিত্র। পৌরাণিক কৃষ্ণচরিত্রকে লালন মানবায়িত করেছেন। বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর রসের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব। বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণতত্ত্ব নয় লালনের। তাঁর বিনোদ কালা প্রতি জীবদেহে ক্রীড়ারত (৮৮)। দেহে রাধা ও কৃষ্ণপদ্মের বিকাশে এ দুই সত্তা আবির্ভূত হয়। 'এই নালন সেহি কৃষ্ণধন'

(১৩৮) এ মন্তব্য লালনের। জীব স্ফুলিঙ্গের কণা নয়; পূর্ণ বিন্দু;—ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড, সব দেব-দানবের আবাস।

গোপীভাব ও গোপীপ্রেম এবং মহিমার তত্ত্ব চৈতন্য চরিত্রামৃত অনুসরণে লালন ব্যাখ্যা করেছেন। (১৪২, ১৬৮, ১৮২, ১৮৩, ১৯৩, ২২৪, ২৩১, ২৩৩, ২৬৭, ৩০০, ৩০১, ২৯৫, ৩০৫-৩০৭, ৩৪১-৪৮, ৩৫০ পদ) বেদবিধি ও কুল-লঙ্ঘনকারী গোপীগণ আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে প্রেমের বিনিময়ে কৃষ্ণকে কিনেছেন। গোপীদের প্রেমের প্রতিদান দিতে অক্ষম কৃষ্ণ তাঁদের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী। সর্বস্ব ত্যাগ প্রেমের জন্য,আত্মসুখ বিসর্জন, সমাজ-সম্পর্ক এবং বৈদিক আচারাদি লঙ্ঘন প্রভৃতি গোপীদের প্রবণতা লালন চিহ্নিত করেছেন। বিধি লঙ্ঘন না করে রাগ-সাধনা হয় না; কুল লঙ্ঘন না করে হরি মেলে না—একথা বহুবার শুনি লালনের গানে। গোপীদের এ গুণাবলী যে সাধক অর্জন করেছেন, তিনিই মহত্তম। সে ধরনের 'গোপীর' অনুগত হয়ে অর্থাৎ মঞ্জরীভাবের সাধনায় রাধাকৃষ্ণ লভ্য।'[৫৪] শ্রীরূপ মঞ্জরীর অনুগত হয়ে গৃহের তালার চাবি বা 'রাগ' দেশে প্রবেশাধিকার-প্রাপ্তির উপায় লালন নির্দেশ করেছেন (২৪৮, ১৯৮)। অন্তত তিনটি পদে লালন মঞ্জরীভাবে রাধা-কৃষ্ণলীলায় অংশ নিয়েছেন। ৩১৮ সংখ্যক পদে মানের অতিরেকের জন্য বৃন্দা রাধাকে ভর্ৎসনা করলে, পদকৃত্য লালন এটি বর্ণনার দায়িত্ব লাঘব করার জন্য লিখেছেন, ''লালন কি জানে তারি।'' ৩২৩ নং পদে রাধার মান ভাঙাতে বৃন্দাকে সহায়তা ও সমর্থন করেছেন পদকর্তা। ৩২০ নং পদে বহুগামিতার জন্য রাধা সুতীব্র ভাষায় কৃষ্ণকে নিন্দা করেছেন। পদকর্তা এটি বর্ণনার অপরাধস্খালনের জন্য বলেছেন, ''উভয় ভালো, উভয় করি বন্দনা''।

৩৪৪ নং পদে গোষ্ঠের বর্ণনায় লালন সুদামের সঙ্গী হয়েছেন। এ পদে তার গোপাল ভাব (৮২ নং পদ)।

দেহসাধনায় ও তত্ত্বে কৃষ্ণ বা চৈতন্য ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র নয়; দেহসাধকেরা ঐতিহাসিক চৈতন্য বা কৃষ্ণে বিশ্বাসী নয়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ মন্তব্য করেছিলেন।[৫৫] লালনের চৈতন্য দেহস্থ গুপ্ত সত্তা নিশ্চয়ই কিন্তু মানবিকও। ঐতিহাসিক মহাপ্রভু চৈতন্যকেও তিনি অবজ্ঞা করেননি। তাঁর চিত্রিত চৈতন্য চরিত্রের চারটি অধ্যায়। (ক) এ অধ্যায়ে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্যের সম্পর্ক নির্ণয়ান্তে অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন ।(খ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চৈতন্যলীলা, সন্ন্যাসগ্রহণ, নদীয়া নাগর, রসরাজ চৈতন্যের পরিচয়। (গ) তৃতীয় পর্যায়ের পদে লালন চৈতন্যের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। আর (ঘ) চতুর্থ পর্যায়ে নিজের সঙ্গে চৈতন্য-ঐতিহ্যের যোগসূত্র নিরুপণ করেছেন তিনি।

কৃষ্ণই চৈতন্য। ব্রজলীলার ভ্রান্তিহেতু (বহুগামিতা?) ব্রজের নরলীলার অসুখহেতু, শ্যামরসের প্রেমসাধনার ইচ্ছায়, ব্যর্থ অতৃপ্ত প্রেমাস্বাদে ঐশ্বর্য-আভরণ ত্যাগ করে শ্যাম ছিন্ন কন্থাগলে 'চৈতন্য ফকির' হয়েছেন কুলবন্ধন ভাঙার জন্য। কলিতে জীব উদ্ধারের জন্য, বেদের অগোচর গুপ্ত সাধনা প্রকাশ করে জীবন-মুক্তির জন্য অদ্বৈতের প্রার্থনায় চৈতন্য আবির্ভূত হলেন নদীয়া নগরে। ধন্য কলিকাল (১৭৩)।

চৈতন্য অবতারের লালন-নির্দেশিত কিছু কারণ লৌকিক। যেমন প্রেমানুভবে কৃষ্ণের ব্যর্থতা ছিল। চারযুগ ধরে চেষ্টা করেও তিনি প্রেমাস্বাদে বঞ্চিত ছিলেন। হেতুহীন আত্মসমর্পণ করে

তিনি রাধার দাস হতে পারেননি কখনো। তাই অপূর্ণ ছিল 'তিন বাঞ্ছা'। বাঞ্ছাপূরণের জন্য, ঐশ্বর্য ত্যাগ করে প্রেমের দাসখত লিখে দিয়ে কৃষ্ণ হলেন চৈতন্য-সন্ন্যাসী।

লালন-উল্লিখিত তিন বাঞ্ছা হলো (১) কটিতে কৌপীন পরিব, করেতে করঙ্গ নিব; (২) মনের মানুষ মনে রাখব; (৩) কর যোগাব মনের মানুষকে (১৪৩ নং পদ)।[৫৬]

শ্যাম রাধার স্পর্শে গৌর হয়েছেন। তিনি রাধা মাহাত্ম্যের প্রচারক এবং রসসাধক। জীব-উদ্ধারের সহজ পন্থা নির্দেশের জন্য এবং রস আস্বাদনহেতু চৈতন্য অবতার। লালন নাম বা কীর্তন প্রচারের জন্য চৈতন্য অবতার স্বীকার করেননি।[৫৭] অদ্বৈতের প্রার্থনায়, আর্তিতে, হুঙ্কারে চৈতন্য-অবতারের কথা তিনি স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণ চৈতন্য, পূর্ণাবতার; অন্য অংশাবতার দ্বারা জীব উদ্ধার না হবার জন্যই চৈতন্যের আবির্ভাব (১৭৩)।

বড় জটিল গৌরলীলা। এ লীলায় নিজ মাধুরী আচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং চার যুগের লীলা একত্রে গুপ্ত আছে নদীয়ালীলায়, এজন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। লালন প্রশ্ন করেছেন যে এ লীলায় কৃষ্ণসঙ্গিনী 'রাধারঙ্গিনী' কোথায়? কেনই বা সন্ন্যাসী দণ্ডধারী চৈতন্যের দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে দিলেন নিত্যানন্দ? (ইহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তি হো কেনে ভাঙ্গায় (চৈ, চ. মধ্য, ৫ম)।

চৈতন্য অবতারের প্রামাণিকতা নিয়ে শাস্ত্রীয় বিতর্কের সঙ্গে লালন পরিচিত ছিলেন। চৈতন্য অবতারের শাস্ত্র-সমর্থনের কথা তিনি জানতেন (৫৮, ১২১ নং পদ)।[৫৮] শাস্ত্রকে প্রমাণ হিসাবে যেহেতু লালন স্বীকার করেন না, সে কারণে ১৭২ নং পদে লালন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বেদ-পুরাণে কলিতে চৈতন্য অবতারের কথা নেই, কিন্তু সমস্ত মানুষ বলে যে কৃষ্ণ গৌর হয়েছেন। শাস্ত্র অপেক্ষা মানুষের বাক্য এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণে[৫৯] বিশ্বাসী লালন ঘোষণা করলেন: 'বেদে যা নাই তাই যদি হয় পুঁথি পড়ে কে মরিতে যায়'—লালনের কাছে, শাস্ত্রের সীমাবদ্ধতা ও অপ্রামাণ্যতা চৈতন্যের বাস্তব আবির্ভাব দ্বারা প্রমাণিত হলো। এ আবির্ভাব বেদের অগোচর—এখানেই গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা। লালনের চৈতন্য শুধু 'বেদেব অগোচর নয় ; বেদবিরোধীও বটে। চৈতন্য প্রচারিত রাগতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব বেদবিধি-সমর্থিত নয়। তিনি কুলচার অগ্রাহ্য করলেন, জাতিভেদ অস্বীকার করে চণ্ডালকে দিলেন আলিঙ্গন, যবন দবীর খাস (সনাতন) তাঁর গোষ্ঠীতে পেল গুরুপদ, বৈরাগ্য দিলেন মোমিন বংশের জামালকে—তাঁর প্রেমের বোলে বর্ণ, জাতিভেদ লুপ্ত হয়ে, সব একাকারময় হলো। লালনের চৈতন্য জাত, পাত, ধর্মাচার অগ্রাহ্যকারী সমাজবিপ্লবী—হিন্দু পুনরুত্থানের নায়ক নন।

চৈতন্যলীলা নরলীলা; মানুষরূপে এসে তিনি মানুষ-সাধনার তত্ত্ব জানিয়েছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এ-চার যুগের মাঝে এ দিব্যযুগ দেখালেন মহাপ্রভু এবং অনর্পিত ভক্তিধর্মের গুপ্ত সাধনা সর্বসাধারণে বিলিয়ে দিলেন। অবশেষে এর উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন শ্রীরূপকে [এটি গুপ্ত]। চৈতন্যধর্মে প্রকাশ্য এবং আর একটি গুপ্ত সাধনা ছিল। চরিতামৃতে একেই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ধর্ম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নিমাই সন্ন্যাস, লোকজীবনের আকর্ষণীয় এক কাহিনী। এটি লালনেরও মনোহরণ করেছিল। এই সন্ন্যাসগ্রহণকে সন্ন্যাস, বৈরাগী হওয়া এবং ফকিরী নেয়া বলা হয়েছে। (৩১৭, ৩৪২ পদ)। ফকিরী নেবার জন্য নিমাই ও তাঁর পিতাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়েছে। মুণ্ডিত মস্তক, গলায় ছিন্ন কন্থা, অঙ্গে কৌপীন, হাতে করঙ্গ, মুখে হরিধ্বনি গৌর সন্ন্যাসীর। হরিনামের সিংহগর্জন ও হুঙ্কার তাঁর কণ্ঠে ; আকুল ক্রন্দনপর তিনি, আপনি কেঁদে, মেতে, জগৎ কাঁদালে, মাতালে।

কখনো তার রাধাভাব, কখনো কৃষ্ণভাব ; কখনো তিনি আকুল ব্রজলীলার সঙ্গীদের জন্য ; কখনো অধরচাঁদের জন্য। ভক্তেরা গৌরকে চায় ; গৌর কার জন্য ক্রন্দনরত—এ প্রশ্ন লালনের। লালনের গৌর ললিত লবঙ্গলতা নন, তাঁর বলিষ্ঠতা ও ঐশ্বর্য আছে ; তিনি বিতর্কপ্রবণও বটে। গৌর সন্ন্যাসে সমর্থন নেই শচীমাতার ; 'দেখা দেরে' বলে তাঁর আর্তি ধ্বনিত হয় (৩৪১) । সন্ন্যাসগ্রহণে তাঁর আপত্তি। গুরু পিতা-মাতাকে ত্যাগ করা অবিধেয়। এই শচীমাতা শাস্ত্রীয় কল্পমূর্তি বা তত্ত্বমূর্তি নন ; নন 'নিদয়া জননী' ; অতি সাধারণ বাঙালি মা।

একটি পদে লালন, 'রসরাজ চৈতন্য' [৬০] (২৫ নং পদ) বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। লালন গৌর-পারম্যবাদী ও নদীয়ানাগরী ভাবের অনেক পদ লিখেছেন। নিজেকে তিনি গৌরের প্রেমিকা "গৌর-বালা" (৭৯ নং পদ) বলে ঘোষণা করেছেন। কূল, শীল ত্যাগ করে, কাঁধে আচলা-ঝোলা নিয়ে লালন অকূলের কূল ভবতরঙ্গের তরী, অথৈ গৌরপ্রেমে ঝাঁপ দিয়েছেন। গৌরাঙ্গ সাধু তাঁর চিত্তচোর, যাদুকর (১৭২ নং পদ)। গৌররূপের কালের দংশনে তিনি আর্ত। গৌর 'লম্পটে' ধৈর্যডুরি কেটে দেয় ; স্বপ্নে দেখা দিয়ে অদর্শন হন চেতনে (২৫, ৫৭, ৬১, ১০৮, ৩৪৮ প্রভৃতি পদ)। গৌর তাঁর ইষ্ট, প্রভু ; লালন মধুর রসে তাঁকে ভজনা করেন। গৌরের বহুগামী নাগরবৃত্তির কোন ছবি লালন আঁকেননি। একনিষ্ঠায়, ত্যাগে, তিতিক্ষায়, সমাজবিপ্লবে লালনের গৌর অসাধারণ।

কৃষ্ণ ও গৌর অভেদ কিন্তু গুরু এবং গৌরের মধ্যে দ্বৈতভাবে লালনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। চৈতন্য অন্তর্হিত হয়ে কোথায় লুকালেন? এর উত্তর বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগণ দেননি। শাস্ত্রে নদীয়া আগমনের বার্তা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালের খবর নেই। লালনের গৌর-গুরু অভেদ, কেননা চৈতন্য দেহস্থ এক গুপ্ত সত্তা—এ তত্ত্বে তিনি শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবতা থেকে ভিন্ন।

রূপে, রসে লালনের গৌর-পদাবলী বৈষ্ণব মহাজনদের সমপর্যায়ে গণিত হতে পারে।

মহাপ্রভু এবং দুই প্রভু অদ্বৈত, নিত্যানন্দকে তত্ত্বমূর্তিতে চিত্রিত করেননি লালন। এঁদের তিনজনকেই জাতিকুলনাশা 'পাগল' বলে বর্ণনা করেছেন তিনি। নিত্যানন্দ শাস্ত্রীয় আচার বা সন্ন্যাসবেশেরও মূল্য না দিয়ে চৈতন্যের দণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। আপামর সাধারণের প্রতি নিতাই অধিকতর দয়ালু। যুগল সাধকগণ, জাতিভেদবিরোধী সাধকবর্গের মতো লালনও, নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ। রায় রামানন্দের সঙ্গ করেই মহাপ্রভুর পূর্ণ ভাবোদয় ঘটেছিল—এ বিশ্বাসে লালন রায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন (২৫৭)। নবী হজরত মহাম্মদ লালনের আর-এক বন্দিত নায়ক। তিনি তত্ত্ববেত্তা, স্থিরবুদ্ধির সাধক। লালনের দৃষ্টিতে নিরাঞ্জন, নবী, খোদা, নুরনবী এক। আহাদ এবং আহাম্মদের মধ্যে কেবল পার্থক্য মিম হরফের। খোদা, নুর, নিরাঞ্জন 'নীরাকার' ; নবী দেহী, সাকার। আকারে মিশে থাকে 'নীরাকার'। নবীর নুরে আমাদের জন্ম। তিনি স্রষ্টা তাই চার যুগেই জীবিত থাকেন—'হায়াত মুরসালিন'। প্রতি দেহেই তিনি বিরাজিত। খোদা-প্রাপ্তির মূল সাধনা তিনিই জানেন। লালনের নবীবিষয়ক পদের একাংশে 'নবীতত্ত্ব', অন্য অংশে ঐতিহাসিক নবীর জীবনচর্যা বর্ণিত হয়েছে।

নবী আল্লার মিলনমূলক মেহেরাজের পদে (২৮৩, ২৮৫ পদ) লালনের জিজ্ঞাসা যে, আকারধারী নবীর সঙ্গে নিরাকার আল্লার মিলন কীভাবে হয়েছিল? এর উত্তরটি গুরুগম্য। নবী চারজন ইয়ারকে, তাদের যোগ্যতানুযায়ী চার প্রকার/চার স্তরের সম্পর্কযুক্ত সাধনক্রম (শরীয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত) দান করেন। নবীর অবর্তমানে এই চার পথ ও চার মতের দ্বন্দ্ব

উপস্থিত হয়েছিল। নবীর সাধনপন্থার প্রকাশ্য জাহেরা পদ্ধতির সমান্তরালে একটি গুপ্ত বা বাতুন ঐতিহ্য ছিল। এটি মারফত ; শরীয়তের সরপোষে ঢাকা এবং গুরুগম্য। কোরাণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য। বোধ, বুদ্ধির পার্থক্যহেতু একই কোরাণের নানা ব্যাখ্যা থেকে নানা মত ও সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। লালন নিজেকে নবীর উম্মত মনে করেন এবং নবীর নির্দেশকে 'আইনের' মতো অলঙ্ঘ্য ও সত্য মনে করেন। নবী ও চৈতন্য, গূঢ়ার্থে, ক্ষেত্রবিশেষে সমার্থব। নবীর ঐতিহাসিক জীবনকথা লালনের মনে প্রবল আবেগের জন্ম দেয়নি।

লালনের বন্দিত নায়কেরা সবাই মানুষ এবং সাধক। তাদের কোন অলৌকিক কার্যকলাপ লালন বর্ণনা করেননি। আর তাদের প্রত্যেকের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের অন্তরালে ছিল গুপ্ত সাধনা। এই সাধনা সর্বজনের জন্য নয় ; এখানে অধিকারীভেদ আছে। এ সাধনায় বৈদিক, শরীয়ত, জীবত্ব, সাংসারিকতা অগ্রাহ্য করতে হয়। কিন্তু কুল, গোত্র, সংসার ত্যাগ করে এরা সাধু হন ; সন্ন্যাসী নন। সন্ন্যাসীর গৃহ, পুত্র-দারা-পরিজন থাকে না। সম্পত্তি ও নারী (অর্থ, কাম) সন্ন্যাসের বিরোধী। লালনের মতো লৌকিক সাধকদের সাজসজ্জা ও জীবনাচরণ গৃহস্থ সাধারণ মানুষের মতো নয়। আবার প্রচলিত সন্ন্যাসীর ভাবমূর্তির সঙ্গে এদের মেলে না। আসলে সংসার, মানুষ এবং নারীকে বাদ দিয়ে এ সাধনা হয় না। সাধনায় যুগল দরকার।

ভারতীয় সন্ন্যাসের বহির্বেশ ও নারীবিহীনতার প্রতি ; একক সাধনার বিরুদ্ধে বাউলগানে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নির্জনতায় একক ধ্যানে, নামজপে, নিশ্বাস-নিয়ন্ত্রণে, এরা মুক্তি খোঁজে না। নর-নারীদেহের নানা উপাদান এদের সাধনায় অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং অনিবার্য কারণে মানুষের সঙ্গ এবং সমবায় এখানে প্রার্থিত হয়। বিশেষ এক সাধনপদ্ধতি সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ থেকে এদের পৃথক করেছে। রমিলা থাপার, খারে, দুমো, রিচার্ডস প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় জনগণকে (হিন্দুদের) গৃহস্থ এবং ত্যাগী বা সন্ন্যাসী এ দুভাবে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু লালনের মতো সাধকেরা এ দুয়ের মধ্যবর্তী।[৬১] হিতকরীর বর্ণনায় লালনকে 'মধ্যবর্তী গৃহস্থের মতো' বলা হয়েছে। তাঁর ছিল নির্দিষ্ট বাসস্থান, জমি, ঘরণী, নগদ টাকা। সুতরাং বাহ্যিক বিচারে তিনি গৃহস্থ। অন্যদিকে তিনি খেলকা/বেশ/ভেকাশ্রয় করে এক ধরনের উদাসীন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশিষ্ট এক নারীকেন্দ্রিক সাধনা করতেন। বহু মানুষ তাঁকে সাধক-ফকির হিসাবে গণ্য করতেন। গৃহস্থধর্ম বা ধর্মগোষ্ঠীর শাস্ত্রীয় সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিতেন না। গৃহস্থের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সাঁইজী/মহাত্মা অথবা বেশরা ন্যাড়ার ফকির। লালন নিজেকে গৃহস্থ বলে গণ্য করেননি। আবার সমাজ দ্বারা স্বীকৃত সাধুরা (দশনামী ও অন্যান্য গোষ্ঠী), উদাসীন সুফী ফকিরেরা, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণের মতো প্রতিষ্ঠিত সাধকেরা বাউল-ফকিরদের যথার্থ ত্যাগী বা সন্ন্যাসী মনে করেন না। খাদ্যাভ্যাসে, সাজসজ্জায়, নারীসঙ্গী এ গোষ্ঠীকে ত্যাগী-আদর্শের সঙ্গে মেলানো যায় না। সাধারণ গৃহস্থগণ এদের সাধুর মর্যাদা দেয় না। রক্ষণশীল সাধুগোষ্ঠী যেখানে পায় সম্মান, সেখানে বাউল-ফকিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় মসী ও অসির আক্রমণ। অর্থাৎ বঙ্গের গৃহস্থ বা ত্যাগীবৃত্তে এদের স্থান অনিশ্চিত। এ গোষ্ঠীর অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন ঋষিগণ আশ্রমে বিশিষ্ট এক সংসার-জীবন যাপন করতেন, এরা সেই আদর্শের অনুসারী। জীবনবিমুখ ত্যাগীধর্মে বা স্থূল গৃহস্থ জীবধর্মে বাউলের অনীহা আছে। লালন হিন্দু সমাজের বাইরে, আবার মুসলমান সমাজেও অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন না। পূর্ণ ভিক্ষাজীবী বা নির্দিষ্ট বিশেষ বৃত্তি ছিল না লালনের। এর ফলে বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীবিশেষের

অন্তর্গত (কলু, চামার, জোলা) তিনি হতে পারেননি। মঙ্গলকাব্যে সন্ন্যাসী বেশধারী, স্ত্রী-পুত্রযুক্ত শিবের গৃহস্থ/ত্যাগী সামাজিক অবস্থান নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। বঙ্গের গ্রামগুলিতে জাত ও বৃত্তিবিভাগে পাড়াগুলি গড়ে উঠত। মুসলমান/হিন্দু পাড়া অথবা উকিলপাড়া, কলুপাড়া, সর্দারপাড়া, বামুনপাড়া, মোমিনপাড়া প্রভৃতি। সামন্ত গ্রামীণ কাঠামোর এ ধরনের জনবিন্যাসের বহির্দেশে, গ্রামের প্রান্তে থাকে ফকির, বাউলদের আখড়া, আস্তানা/আশ্রম। আর্থ-মানসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে লালনের মতো মানুষেরা সমাজ-বিভাগের প্রান্তঃবাসী/অন্তেবাসী। বিশিষ্ট মতবাদ, এবং জীবনচর্যা তাদের এই প্রান্তঃবাসী অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। উপরন্তু লালন ছিলেন গায়ক। দুধুমিঞা প্রমুখের সংস্কার-আন্দোলনে, আহল হাদীস মতবাদে বাদ্যসহযোগে ইসলামী শরীয়তের সমালোচনামূলক বাউলগান হারাম বিবেচিত হয়েছিল।[৬২] লালনের মতো শিল্পীরা মুসলমান রক্ষণশীল ধর্মনেতাদের দ্বারা নিন্দিত হতে হতে সমাজের এক কোণে কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করতেন। প্রাচীন ভারতে শূদ্র সন্ন্যাসী, পাষণ্ডী বেদবিরোধী কাপালিক নাচ-গান-অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত নরগোষ্ঠীকে মৈত্রী উপনিষদ তস্কর এবং স্বর্গের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিল [৭ অধ্যায়, ৮-১০ শ্লোক : চাটজট নটভট প্রব্রজিত রঙ্গাবতারিণ ঃ...তে তস্করা ঃ অস্বর্গ্যা ঃ ইতি] । এই জটিল ও বিশিষ্ট সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিত ছিল লালনের। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বিহারীলাল গোস্বামীর জাত-বৈষ্ণবদের সম্পর্কে মন্তব্য : "সেই সন্তান উদাসীন বৈষ্ণবের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে নাই এবং বৈদিক ক্রিয়াদির অভাবে কোন বর্ণমধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে নাই। সুতরাং সেই সন্তান পৈত্রিক উদাসীনের বৈষ্ণবধর্ম ও গৃহাশ্রমের ন্যায় আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। তাহারা ভিক্ষাশ্রম ও গৃহাশ্রম এই উভয় আশ্রমের সংযোগ অবলম্বন করায় সংযোগী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।"[৬৩] গৃহস্থ ও ত্যাগী-বিভাগের মধ্যে লালনকেও একধরনের সংযোগী বলা যায়।

লালন কোথাও নিজেকে বা গুরু সিরাজকে ত্যাগী বা সন্ন্যাসী বলে পরিচিত করাননি। তিনি কুত্রাপি ভেক/খেলাফৎ গ্রহণকে, ফকিরী নেয়াকে সন্ন্যাসগ্রহণ বলে ঘোষণা করেননি। যুগল দেহসাধনায় ভেক সংস্কার (বিধি) মাত্র। তবে সমাজের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য, ভিক্ষার্থে এবং বেশের মর্যাদা স্মরণে সতর্ক থাকার জন্য এর প্রয়োজন সাধকসমাজ স্বীকার করে। লালন সমধর্মী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে সময়বিশেষে সাধু, সাধুর মেল, সাধুর বাজার বলে উল্লেখ করেছেন। সাধু শব্দটি কবীরের দোহার পরিচিত সম্বোধন। অনেকের মতে, যারা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ করে সাধনা করেন, তারাই সাধু। লালনপন্থায় সাধুসঙ্গ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাধুরা গৃহস্থ বা বৈদিক সন্ন্যাসী নয়। তাদের জাত নেই, উপরন্তু তারা জীবন্ত নয়, মৃত ; সুতরাং স্বাধীন। অর্থাৎ গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী বা সম্প্রদায়-গোষ্ঠী থেকে পৃথক এক জনগোষ্ঠীকে লালন সাধু বলেছেন। বহির্বেশ দিয়ে এদের চিহ্নিত করা কঠিন। জলে মাছের মতো এরা সংসারে লুকিয়ে থাকেন। অন্তরঙ্গ পরিচয়ে জানা যায় এদের বিশিষ্ট এক সাধনপদ্ধতিকে। অর্থাৎ বহিরঙ্গে এদের চিহ্নিত করা কঠিন। বহু বিচিত্র বেশে এরা ঘুরে বেড়ায় ; গৃহস্থবেশও এদের আবরণ। পক্ষান্তরে সাধনার বিচারে এরা সমস্ত অনুমানপন্থী ভাববাদ থেকে পৃথক, "বর্তমানপন্থী" গোষ্ঠী। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই এরা বাস করেন। সেসময়কার নানা ধর্মগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের পরিচয় লালনের গানে আছে। অন্তত তিনটি পদে ব্রাহ্মদের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, ঠাকুর-জমিদার পরিবার ছাড়াও অক্ষয়কুমার প্রমুখ ব্রাহ্মসঙ্গ এবং তত্ত্বালোচনার সুযোগ লালনের

হয়েছিল। তিনি বেহ্মজ্ঞানী, বেহ্ম-খিরিষ্টানী (সাধারণ গ্রাম্য জনতার দৃষ্টিতে যারা ধর্মাচার ও খাদ্যাখাদ্যবিচার অগ্রাহ্য করে, সেই নব্য শিক্ষিতদের "খিরিষ্টানী" বিশেষণে চিহ্নিত করা তাৎপর্যপূর্ণ। টেবিলে খাওয়া ইত্যাদি প্রথা সাহেবীয়ানা) বিশেষণে ব্রাহ্মদের উল্লেখ করেছেন (১৬৭, ১৪৯)। ব্রাহ্মরা বৈষ্ণব ও শাক্তদের সমলোচনা করত ; এদের 'মূল' বিষয়ে করত কটাক্ষ।[৬৪] তাঁরা নামব্রহ্মকে গুরুত্ব দিয়ে, এক ও অদ্বিতীয় জ্যোতির্ময় ব্রহ্মরূপের প্রচার করতেন। তাঁরা মুখে জপতেন নামব্রহ্ম কিন্তু নামগণনায় ভ্রান্তি হতো। লালনের ধারণা যে ব্রাহ্মরা বর্জোকহীন নামসাধক ; ব্রহ্মকে না দেখেই এরা তাঁর নাম করে। দরবেশ ব্রাহ্মদের বস্তুজ্ঞানহীন অনুমানপন্থী নামব্রহ্মের সাধক বলে চিহ্নিত করেছেন (৩২৬)। লালন আকার বা রূপে বিশ্বাসী। গুরুতত্ত্বে তিনি জেনেছেন যে ব্রহ্ম একরূপী নন, তাঁর বহুরূপ।[৬৫] দ্বিতীয়ত, লালন জানেন "নাম সাধন বিফল বর্জোক বিনে"। এই মানবগুরুর গুরুত্ব ব্রাহ্মরা অস্বীকার করে। তৃতীয়ত লালনের কাছে নামের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ 'বস্তু'। যাকে নয়নে তিনি দেখেননি, তাকে ভজনা করেন না। ব্রাহ্মদের উজ্জ্বল প্রগতিশীল কোন সামাজিক ভূমিকার উল্লেখ লালনের গানে পাওয়া যায় না।

৩০ নং পদে প্রধান প্রধান হিন্দু সমাজের সম্প্রদায়গুলির বৈশিষ্ট্যসহ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুরূপ ধ্যান করত, মালা-তিলক ব্যবহার করত। শাক্ত করত শক্তির সাধনা। পঞ্চতত্ত্বজ্ঞানী পঞ্চোপাসনা করতেন। সপ্তপন্থী ব্যাখ্যা করতেন সপ্তরূপ। আগম-নিগমের উল্লেখ আছে গানে ; আছে জটা, লোহার ত্রিশূল, গাঁজা প্রভৃতি ব্যবহারকারী শৈব, শাক্ত সাধুদের ছবি। অনেকে গাঁজা খেয়ে "ব্যোম কালী" ধ্বনি দিতেন।[৬৬] মদ খেয়েও মাতাল হতো অনেকে। নানারকম মালা, মড়ার মাথার খুলি, হাড় ও হাড়ের মালা এরা ব্যবহার করত।

বৈষ্ণবপন্থার ভজনে ছিল ভক্তির প্রাধান্য। অনেক বৈষ্ণব কাঠের মালা, আচার-মালা (নারকেলের খোলা—হরিবোলা মতুয়াদের ব্যবহৃত) ব্যবহার করতেন।[৬৭] ফোঁটা-তিলক কাটতেন, মালাজপ করতেন, নাচানাচি করে উচ্চৈস্বরে হরিনাম করতেন। অনেকে মন খাঁটি না করে বনে কুঁড়ে বেঁধে থাকত (১৫২)। এই বৈষ্ণবদের বড় অংশ ছিল অনুমানপন্থী-বৈদিক। এরা গুরুকে মান্য না করে গৌরের মূর্তিপূজা করত। অধরকে পাবার জন্য তাদের নেই আগ্রহ, স্বরূপের সন্ধান অজ্ঞাত তাদের, তারা পঞ্চতত্ত্ব সাধন করে এবং লীলারসে মগ্ন। পঞ্চতত্ত্ব[৬৮] সাধন করে যেহেতু অধর ধরা যায় না ; তাই বৈষ্ণবদের কেউ কেউ আচলা গুদড়ি, ডোর, কৌপীন দ্বারা ভেকগ্রহণ করে কুলত্যাগ করে সাধনা শুরু করে। এরা বৈরাগ্য।[৬৯]

বৈষ্ণবদের একাংশ রসিক ভক্ত।[৭০] এরা সেবা দিয়ে ভজনা করে। বর্তমানে গুরুমূর্তি ধ্যান করে। এদের মধ্যে থাকেন ষড়রসিক ও নির্হেতু সাধকেরা (যাবা বিশেষ স্বার্থে দেবার্চনা করে না)। তারা মুক্তি তুচ্ছ করে ভক্তিপথে চলে ; ভক্তিবৃক্ষের উপশাখা ছেদন করে প্রেমফল পায়। এদের সাধনপন্থাটি অবৈদিক। টল-অটল বাদ দিয়ে সুটলের পন্থায়, দেবতা নয় মানুষকে এরা ভজনা করে, মানুষকে নিয়ে এদের সাধন, মানুষ এদের ইষ্ট। ভেকাশ্রিত বৈরাগ্যরা বৈদিক সন্ন্যাসীদের থেকে পৃথক। যে কোন ধর্মের/বর্ণের নর বা নারীর এ সাধনায় অধিকার আছে।

ন্যাড়া এবং নেড়িদের দেখা যেত পথেঘাটে।[৭১] এ দলের মেয়েরা ঘোমটা না দিয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াত (১৫৪)। ছিলেন আউলগণ। সাধনে অজ্ঞ, বিশৃঙ্খল জীবনযাপনকারী এদের অনুসরণ করতে গিয়ে লালন হারিয়েছিলেন প্রাপ্তধন।[৭২] হাস্যমুখ, কেশেবেশে পরিপাটি অসাধক,

বাক্যবাগীশ ভণ্ড, রসিকের ছদ্মবেশে কামুক ; সাজা পাগল, ভণ্ড জটাধারী, বেশধারী নানা ধরনের মানুষ দেখা যেত। বস্তুরক্ষার সাধনায় ব্যর্থতাহেতু অনেকে একক ক্ষেপা হয়ে ঘুরে বেড়াতেন (২১৯)। গ্রন্থ ও শাস্ত্রপাঠে নিমগ্ন পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিভাগ ছিল ; এদের অনেকে আত্মজ্ঞানহীন, বাস্তব বুদ্ধি বিবর্জিত। শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীদের কেউ বনবাসী, কেউ তপস্বী, কেউ বা মুণ্ডিত মস্তক। নানা মূর্তির (ধাতু, কাঠ, পাথর, মাটি), ঘট, পট, শিলা বা মাটির 'থানে' পূজা হতো। ঘণ্টা বাজিয়ে শালগ্রাম বিগ্রহের পূজা করতেন ব্রাহ্মণ। 'গৌর'পূজা প্রচলিত ছিল। দেব-দেবতায়, ভূত-প্রেত-ভাগ্যে প্রবল বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল মানুষের। এ জনগোষ্ঠী জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন, ভিন্ন ও নিম্নজাতির মানুষকে করতেন ঘৃণা। এছাড়া সাধু, মোহান্ত, যোগী, শাক্ত, শক্তিসাধক, (কপট শক্তিসাধকও ছিল), ষড়-রসিক, সাঁই, দরবেশ, বৈরাগী, মারেফতী, সহজ সাধক, রস-সাধক প্রভৃতি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন লালন। গ্রন্থে মগ্ন পণ্ডিতেরা নয়ন খুলে বাস্তবকে দেখতেন না। বই পড়ে ভূত হতে লালনের আপত্তি। গ্রন্থকীটেরা ভূতের মতো। তারা বাস্তব মানুষকে অগ্রাহ্য করে (২৭৫)। কাঙালের গ্রাম্যবার্তা প্রকাশিকায় এ অঞ্চলে গৌরবাদীদের দ্বারা জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন ও ধর্মসভা স্থাপনের বিবরণ পাই। লালন গৌরপূজকদের কথা বলেছেন। সম্ভবত এরাই 'গৌরবাদী'—গুরুকে মান্য করতেন না।[৭৩]

লালন-বর্ণিত হিন্দু সমাজভুক্ত সাধকেরা বহু ও ভিন্ন। এদের মত ও পথ পৃথক। মানুষকে এরা, স্ব-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিচার ও বিভক্ত করে। অন্য মত বা সম্প্রদায়ের সমালোচনা করে, এরা করে আত্মশ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা। এরা মূলত বৈদিক এবং অবৈদিক ; গুরু বা দেবতা, অনুমান এবং বর্তমানপন্থায় দ্বিধা-বিভক্ত। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মতভেদ, মতপার্থক্য ধর্মীয় বিতর্কের সীমা লঙ্ঘন করে না।

এসমস্ত গোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের বাইরে রয়েছে সাধুর মেল, সাধুর সভা, সাধুর বাজার।

নানা শ্রেণীর ফকিরদের পরিচয় পাওয়া যায় লালনের গানে। মোরাকেবা থেকে আমরা নক্সাবন্দী ঐতিহ্য ও সাধন-পদ্ধতির ইঙ্গিত পাই। অন্যত্র "সোহাগী ফকির"দের উল্লেখ আছে।[৭৪] ফকিরদের অনেকে গৃহস্থ, অনেকে উদাসী, অনেকে বাস করতেন দরগায়। অনেকে ব্যবহার করতেন নিশান, ঝাণ্ডা।[৭৫] গলদেশে ব্যবহৃত হতো তসবী মালা, নর-অস্থি। এদের অনেকে সিন্নিভোগ দিতেন (২৮৮, ২৯৩)। কেউ কেউ ভূত, প্রেত ছাড়াতেন, জলপড়া দিতেন, বন্ধ্যার সন্তান বা গর্ভপাত ঘটাতেন—এরা মূলত অসাধক। পাঁচপীরের উপাসক ফকিরদের দেখা যেত (৯৬)।

ফকিরদের মধ্যে খেলাফতী গ্রহণের রীতি ছিল। এটি গ্রহণের আগে, গ্রহণকারীকে মৃত গণ্য করে তার জন্য জানাজা পড়া হতো।

তারপর হাতে তুলে দেয়া হতো তাজ, তহবন, কৌপীন, ডোর, খেলকা ; তিন বা পাঁচ প্রস্থ পোষাক—যা মূলত মৃতদেহে দেয়া হয়। তাদের ব্যবহৃত হাল বা বেহাল পোষাক 'মুর্দার বেশ'। খেলাফৎ-গ্রহণের পর সংসার, কুল, গোত্র ত্যাগ হয়ে যেত ; কর্মত্যাগও করতে হতো, নির্দিষ্ট গৃহ থাকত না—ভ্রাম্যমান জীবনযাপন করতে হতো। বহু মারফতী সাধক ফকির ছিলেন। বাইরের বেশভূষা দেখে তাদের গুপ্ত সাধনা সনাক্ত করা যেত না। তাঁরা 'জিন্দা পীরের' অনুগত হয়ে, আত্মতত্ত্ব জেনে, 'জোত নেহারে', অধারচাঁদকে সন্ধান করতেন ; বেহাল ধারণ করে

প্রেমসাধনা করতেন (২৪৫)। সাংসারিক ঝামেলা এড়াবার জন্য কৌপীন, ধ্বজা নিয়ে অনেকে ফকির হতেন (১৪০)। কামুক, অপরাধী, মিথ্যাবাদী, গুরুহীন, পাগল, ভিক্ষুক প্রভৃতি নানা অসাধক ফকিরদলে মিশে যেত। ফকিরদের একাংশ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করত (১৯৭)। রক্ষণশীল ইসলামে মুনসী, মৌলবী, মওলানাগণ শরীয়ত-রক্ষাকারী ছিলেন। একশ্রেণীর মোল্লার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য তাদের "কাঠমোল্লা" বলে ঠাট্টা করা হতো।

ইসলাম-অনুসারীগণ চার তরিকে বিভক্ত ছিলেন। একই কোরাণের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করা হতো বিভিন্ন গোষ্ঠীতে। এর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল নানা সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে ছিল তীব্র মতানৈক্য। শরীয়ত এবং মারফতপন্থীগণের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল। এ দু'পন্থার মধ্যস্থতা কেউ কেউ করতেন। প্রবল ধর্মীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সেকালে ধর্মীয় বাহাস বা বিতর্কসভার সৃষ্টি করত। এগুলি ছিল জনপ্রিয়। ধর্মদ্বন্দ্ব মূলত ধর্মবিতর্কে সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রদায়িক সমালোচনা ও বিতর্কে মুখর লালনের সমাজ, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা তার কোন আভাস লালনের গানে পাওয়া যায় না।

ধর্মীয় জাতবিচারের প্রশ্নে সমাজ লালনকে শাস্তি দিয়ে সমাজচ্যুত করেছিল। সুতরাং জাতিভেদাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম লালনের অস্তিত্বের সঙ্গেই জড়িত। অন্যপক্ষে ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ গ্রামীণ অর্থনৈতিক উৎপাদনের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করত এবং বৃত্তি ছিল পুরুষানুক্রমিক। নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন লালন। কৃষি-অর্থনীতি ও সামন্ত-উৎপাদন একধরনের বদ্ধতা, কৃষকের জীবন ও চিন্তায় এনে দেয়। আমাদের হস্তশিল্পীগণ এ বদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং নানা পরিবর্তিত প্রগতিশীল মূল্যবোধের জনক ও বাহক তাঁরা। ভক্তি-আন্দোলনের বহু নেতা এই নিম্নবর্গের হস্তশিল্পী-পরিবার থেকে এসেছেন। লালন জোলা হস্তশিল্পীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিলেন এবং জীবনযাপনে নির্ভরশীল ছিলেন না কৃষির উপর। আর এসময়ের বিনষ্ট হস্তশিল্প প্রতিবাদী কৃষক ও ধর্ম-আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। সামন্ত-উৎপাদনব্যবস্থা থেকে মুক্ত ছিলেন লালন ; তাই সামন্ত মূল্যবোধের, ব্যক্তিসম্পত্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চরিত্র গঠন করেছিল। আর্থ-সামাজিক অধঃপতন তাঁর মধ্যে জাগিয়েছিল ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। আর সমাজের প্রান্তঃশায়ী জীবনে তাঁর ছিল না বিশেষ কিছু হারাবার ভয়। এই নির্ভীকতা লালনের গানে নূতন এক মাত্রা যুক্ত করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।।
মত পন্থা এবং সম্প্রদায়

লালনের সাধনপন্থা কোন পৈত্রিক বা পুরুষানুক্রমিক ধর্ম নয়। সাবালক যে কোন মানুষ গুরুর কাছ থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন। এটির দায় বর্তায় না পরিবার বা সমাজের কারো উপর। স্ত্রী বা স্বামীকে পৃথকভাবে এ মতবাদ গ্রহণ করতে হয়। এর জন্য সামাজিক ধর্ম বা বর্ণ পরিত্যাগ করতে হয় না। প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে এর মিল বা অমিল কোনটিই নেই। এ মতবাদের কোন বহির্বেশ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, মালা-তিলক, লিখিত শাস্ত্র নেই। বাহ্যিকভাবে নেই কোন কৃত্য; নেই কোন কেন্দ্র; উৎসবের নির্দিষ্ট দিন বা প্রবর্তক। যে কোন মানুষ তার মানুষের অধিকারেই এ মতবাদ গ্রহণের অধিকারী। এই গুপ্ত সাধনা এবং বাহ্য দর্শন মানুষকে এক ও অবিভাজ্য জাতি মনে করে; জগৎ, জীব ও প্রকৃতির ঐক্যের প্রচার করে। এরা হিংসার বিরোধী, প্রেমের সমর্থক এবং সর্বপ্রকার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভেদ ও অনৈক্যের বিরুদ্ধশক্তি। সমাজের জাতি, বর্ণভেদ; ধর্মদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে এ মতবাদ সতত মুখর। ব্যক্তির 'সিনায় সিনায়' এ মতবাদ সমাজের নিম্নবর্গে বয়ে চলেছে এক অমল প্রবাহরূপে।

অত্যন্ত সচেতনভাবে লালন, বর্ণ ও জাতিভেদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, জীববিজ্ঞানের মানবসৃষ্টির বৃত্তান্ত স্মরণ করে। শাস্ত্র, মতবাদ, মহাপুরুষদের ঐতিহ্য কেবলই মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বহির্বেশে, জীবনচর্যায় কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করে চলেছে। এগুলিকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে লালন মানুষের যথার্থ ধর্মপালনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বা তাঁর শিষ্যবর্গ আর একটি ধর্মসম্প্রদায় গঠন না করে, বিভেদের চক্রান্তমূলক সংস্কৃতির ফাঁদ কীভাবে এড়িয়ে গেছেন; সে প্রসঙ্গই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বা কুল-গোত্রের গোষ্ঠীচেতনা এক ভয়াবহ অশুভ শক্তি। পশ্চাৎপদ কৃষি-অর্থনীতি, সামন্ত-ভূমিসম্পর্ক এবং মানুষের জটিল সংস্কৃতির উপর নির্ভর এ ধরনের সম্প্রদায়-চেতনা এক শক্তিশালী 'মতবাদ' হিসাবে ভারতে বিদ্যমান। আচারমূলক ধর্মের উপর নির্ভরশীল এ বিভাজন; শাস্ত্র এ বিভাজনকে দৃঢ় করে। অন্যপক্ষে ঋক্‌বেদের যুগ থেকে এ ধরনের সামাজিক বিভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তারপর প্রতি যুগে এর বিরুদ্ধে ভারতীয় মুক্তবুদ্ধির মানুষদের প্রাণবান প্রতিবাদ শোনা গেছে। বস্তুবাদী লোকায়ত, চার্বাক, আজীবিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রত্যেকেই জাতি ও গোষ্ঠীভেদের বিরোধিতায় সরব। ভারতীয় দর্শনও মানুষের ঐক্যভাবনার প্রবক্তা। ধর্মান্ধদের সঙ্গে মুক্তবুদ্ধির সংঘর্ষ ভারতীয় সমাজজীবনে সতত চিহ্নিত করা যায়। আর এতে অনেক মহাপ্রাণ আহুতি দিয়েছেন তাঁদের জীবন।

ইংরেজ আমলে জনগণের অন্তর্গত ধর্মীয় অবৈরী দ্বন্দ্বকে বিদেশী শাসকগণ কৌশলে জনগণকে বিভক্ত করার কাজে ব্যবহার করেছিল। অশোকের সময় থেকেই ধর্মকে রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীভূত করার তথ্য পাওয়া যায়। অশোক থেকে আকবর পর্যন্ত অনেকেই ধর্মকে নিজ-নিজ রাষ্ট্রশাসনের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। ঔরঙ্গজীব রক্ষণশীলতার মুখোশ পরে সিংহাসন দখল করেন। শিখ ও মারাঠাগণ মোগলদের সঙ্গে দ্বন্দ্বকে ধর্মীয় আবরণে বিন্যস্ত করে। বর্গীর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মধ্যেও 'হিন্দু পাতশাহী' স্থাপনের প্রচার ছিল। বৃন্দাবনদাস তার সময়ে

রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনে ধর্মের প্রচার এবং শাসকদের তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন।[৭৬] ইংরেজ আমলের প্রায় সমস্ত স্থানীয় ও সর্বভারতীয় বিদ্রোহ-প্রচেষ্টায় ধর্মের পতাকা ব্যবহার করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রয়াস লক্ষ করা যায় (সন্ন্যাসী, ফকির বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, পাগলাপন্থী, দুধুমিঞা, সিপাহী বিদ্রোহ)। ইংরেজ শাসকেরা এই 'ধর্ম'কে দিয়ে জনগণের এবং স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে বিভাগ করে চরম অনৈক্যের সৃষ্টি করল। ফলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সমান্তরালে প্রাদুর্ভূত হলো সাম্প্রদায়িক হানাহানি। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মচারের ভিত্তিতে জনগণের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ঐক্যে সংঘবদ্ধ করে এবং জনগণকে বিভক্ত করে, পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

এই অশুভ মতবাদটির বিরুদ্ধে রবীন্দ্র নজরুল-জীবনানন্দের মতো শিল্পীদের সমালোচনা ও প্রতিবাদ আছে। কিন্তু আমাদের শিষ্ট সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ইতিবাচক জেহাদ অনেক কম। এ সমস্যা উচ্চবর্গের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু হৃদয়বৃত্তিতে আলোড়ন তোলেনি। তারা প্রায় সকলে জনগণের ধর্মীয় বিভাজন ও দ্বি-জাতিতত্ত্বকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে স্বীকার করে নিয়েছেন। নাগরিক শিল্পীদের সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনযাপনে সাম্প্রদায়িকতার প্রতাপ তেমন তীব্র নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করে নিম্নবর্গের; তাই এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ বহু লোকগীতিকার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। আধুনিককালে এ প্রতিবাদের অন্যতম উদ্‌গাতা লালন।

জাতীয় ঐতিহ্যের এক মূল্যবোধ বহন করে, মানবধর্মের পতাকা ঊর্ধ্বে রেখে, জাতপাতের দ্বন্দ্বে, এক জাতীয় বিবেকের ভূমিকা পালন করেছেন সশিষ্য লালন। ধর্মে হিন্দু বা মুসলমান হলেও তারা মূলত মানুষ; দেশ-কালের পরিচয়ে বাঙালি।

লালনের গানে নানা ধর্মগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও মতবাদে শতধা-বিভক্ত এক সমাজ দৃশ্যমান হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় বিভাগে মানুষ হিন্দু ও মুসলমান এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগের মধ্যে জাতপাতের উপবিভাগ ছিল (যেমন কায়স্থ, শূদ্র ইত্যাদি); কুলগোত্র-বংশগতির বিভাগ ছিল (যেমন—সৈয়দ, কাশ্যপ, মৈথিলী কনৌজী, শ্রোত্রিয়, কুলীন, কুরেশী), ছিল অর্থনৈতিকভাবে বিভাজিত বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীগুলি (যেমন—কলু, জোলা, নাপিত, ময়রা, কর্মকার ইত্যাদি)। এসবের বাইরে ছিল অস্পৃশ্য পঞ্চম বর্ণ 'হিন্দু' এবং শেখ-সৈয়দ-মোগল-পাঠান-বর্হিভূত 'অর্জল' অস্পৃশ্য মুসলমান জনতা।

লালন ও তার অনুসারীগণ প্রচলিত এসমস্ত ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক পরিচয় দিতে সর্বাংশে অস্বীকার করেছেন। হিন্দু বা মুসলমান, এ বিভাগ একমাত্র লালনপন্থীরাই অগ্রাহ্য করেছেন। লালনের সমকালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সংস্কার-আন্দোলনগুলি ছিল মূলত হিন্দু সমাজের জন্য। ফরাজী-ওয়াহাবী-সৈয়দ মহাম্মদের আন্দোলন ছিল মুসলমান সমাজের জন্য। প্রচলিত ধর্মীয় বিভাজনের সীমারেখা কেউ লঙ্ঘন করেননি। আমাদের প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হয় হিন্দু, না হয় মুসলমান সমাজের জন্য পরিচালিত হয়েছিল। কোন সার্বজনীন সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এ সময় ঘটেনি। তখনকার সমাজভাবনা সম্প্রদায়চেতনায় আবদ্ধ ছিল। প্রতিবাদী ধর্ম-সমালোচনাও এ বিভাজনরেখা অতিক্রম করত না। লালন ও তাঁর অনুসারীগণ শাস্ত্র ও আচারের ধর্ম, শরীয়ত ও বৈদিকতার, মৌলবী ও পুরোহিতের সমালোচনা করেছেন; সম্প্রদায়ের সর্ববিধ

গণ্ডি ভেঙে লালন হিন্দু বা মুসলমানকে একত্রে মিলিত করেছিলেন। এ মিলনের আহ্বান রামকৃষ্ণদেব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতিতে পৈতা, কালীমূর্তি উপাসনা তাঁকে হিন্দু বলে 'সনাক্ত' করায়। তিনি ইসলামের সাধনা অনুসরণ করেছিলেন। তহবন পরে নিয়মিত নামাজ পড়ে (এমনকি গোমাংস ভক্ষণে উদ্যত হয়ে) তিনি 'খোদাপ্রাপ্ত' হয়েছিলেন বলে প্রচার আছে।[৭৭] এসমস্ত বাহ্যিক আচার অনুকরণে খোদাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, লালন, নিশ্চিতভাবেই অস্বীকার করতেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রাণপুরুষ দেবেন্দ্রনাথ লালনের জমিদার ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রাদি, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব, উপনয়নাদি তিনি পরিত্যাগে রাজি ছিলেন না।[৭৮] বিদ্যাসাগর তাঁর হিন্দু পরিচয় অস্বীকার করেননি। লালনের মৃত্যুর একবছর পরে (১৮৯১) আদি ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ জনগণনা আধিকারিকের কাছে 'হিন্দু ব্রাহ্ম' বলে চিহ্নিত হবার জন্য আবেদন করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ মর্মে প্রচারিত হয়েছিল এক আবেদন।[৭৯]

নানা গোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায় থেকে সযতনে লালন নিজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। প্রত্যেকে অনুশাসনে এবং ধর্মাচার, বেশ, খাদ্য দ্বারা নিজেদের পার্থক্য রচনা করেন। এরা আবার বৈদিক ও অবৈদিক; শরীয়তী ও মারফতী, অনুমানপন্থী ও বর্তমানপন্থী গুপ্ত ও প্রকাশ্য সাধনায় দ্বিধাবিভক্ত। আবার এদের মধ্যেও নানা বিভাগ। লালনের 'রসিকের' ধারাটি এ থেকে ভিন্ন। স্বর্গপ্রত্যাশী হিন্দু বা 'বেহস্তের আশাধারী' মুসলমান কেউ রসতত্ত্ব বা ফকিরী জানে না। মানুষভজনা, যোগী, বস্তুবাদী ফকির, রসিক, ষড়রসিক, মারফতী, বেলাওতী, সহজ, সাঁই, দরবেশ, বর্তমানপন্থী, সহজ সাধক প্রভৃতি শব্দে লালন আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এগুলি সম্প্রদায়বাচক নয়; সাধনার স্তর বা ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণমাত্র। অগ্রজ রসসাধক হিসাবে কৃষ্ণ, শিব, চৈতন্য, মহম্মদ, চণ্ডীচাদ, মনসুর হাল্লাজ প্রভৃতিকে লালন প্রামাণ্য বলে মানেন। এ ঐতিহ্য ইসলামে শরীয়ত দ্বারা আচ্ছাদিত মারফতে, গুরুমুখী বৈষ্ণবতায়, চৈতন্যধর্মে, আগমে-নিগমে, সাধুসন্তদের মধ্যে কবির-রামদাসের মতবাদে, ভক্তিতত্ত্বে স্মরণাতীত কাল থেকে গুপ্ত গুরুমুখী বিদ্যা হিসাবে চলিত আছে। এ সাধনা কোন সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ বা তাদের সম্পত্তি নয়। নিজে করে জানার ও সিদ্ধ হবার এ পন্থা ব্যক্তিগুরুর 'সিনা' থেকে শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। এর দ্বার উন্মুক্ত সর্বমানবের জন্য। প্রচলিত ধর্মাচার, নির্দিষ্ট কেন্দ্র, সাজসজ্জা, খাদ্যাখাদ্য বিচার এ সাধনায় অবান্তর। দল বা গোষ্ঠী গঠন করে একান্ত ব্যক্তিগত এ সাধনার পথ প্রশস্ত হয় না। সাধুর মেল/সভা/মণ্ডলী পৃথক ব্যক্তিত্বের (প্রায় সমধর্মী সাধকদের) এক শিথিল সংঘ। এখানে স্বাধীন ইচ্ছার সাময়িক ঐক্য ঘটে মাত্র; কোন বাধ্যবাধকতার স্থান নেই এখানে। তাই লালনপন্থা সম্প্রদায়গঠনে বা সম্প্রদায়বিশেষের ঐতিহ্য দাবি করতে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। আপ্ততত্ত্বের বা সিদ্ধ হবার সাধনায় জাত, পাত, কুল, গোষ্ঠীর কোন গুরুত্ব নেই। প্রচলিত ধর্মাচারগুলিও এ সাধনায় অবান্তর।

সাধনায় নিজস্ব অর্জিত মূল্যে এ পন্থায় অগ্রগতি ও গুরুত্ব লাভ করা যায়। বড় গুরুর শিষ্যেরও এখানে মর্যাদা নেই; যদি না তিনি সাধনায় অগ্রসর হন। বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক স্তর থেকে স্বেচ্ছায় নানা ধরনের মানুষ একজন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে এক শিথিল মণ্ডলী গঠন করেন এ মতবাদে। পরবর্তীকালে শিষ্যদের মধ্যে অনেকে আবার গুরুপদ গ্রহণ করে আরেক মণ্ডলী গড়ে তোলেন। মণ্ডলীভুক্ত সদস্যদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাধনপর্যায়ের নানা ভিন্নতা থাকে। ভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য এবং ঐক্যের ঢেউ-এ ঢেউ-এ সম্প্রদায়-ব্যতিরেকে এ 'গুরুজাতীয়' ধর্ম আমাদের সমাজে রূপরূপান্তরে মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে।

ধর্মসম্প্রদায়, অতীতের ঐতিহ্য দাবি করে গুরুতালিকা বা সিজরানামা দিয়ে। আউল শব্দটি বিশৃঙ্খল সাধক হিসাবে লালনের গানে পাই। কিন্তু বাউল শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি। সুফী গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের তিনি দাবিদার নন। নক্সাবন্দীয়দের মতো 'গুরুবর্জোকের' গুরুত্ব আছে লালনপন্থায়। সোহাগী সুফীদের মতো নারীত্বলাভের সাধনায় ও নাচগানে সময়াতিপাত করেন লালনপন্থীরাও। মনসুর হাল্লাজ, নিজামুদ্দীন আউলিয়ার উল্লেখ করেছেন লালন। কিন্তু তিনি বা তাঁর শিষ্যবর্গ কেউ নিজেদের সুফী বলেননি। পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের গবেষকদের একাংশ লালনপন্থার এক সিজরানামা তৈরী করেছেন। সিরাজ সাঁই-এর গুরু হিসাবে এক 'অগোর মানিক'কে খাড়া করে লালনপন্থাকে চিস্তিয়া সুফী-তরিকার শাখা প্রমাণ করার এক সাম্প্রদায়িক অপচেষ্টা এরা করেছেন।[৮০]

হরিশপুরের সাধক ও পদকর্তা পাঞ্জু শাহ নিজেকে সুফী বলে ঘোষণা করেছেন।

"চিস্তিয়া খান্দানে আমি মুরিদ হয়েছি।
নিজামিয়া গেরো জেনে ফকির হয়েছি।।"[৮১]

চিস্তিয়াদের বহু শাখা-উপশাখা, তার মধ্যে পাঞ্জু নিজামুদ্দীন শাখার ঐতিহ্য স্বীকার করেছেন। পাঞ্জু শাহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দিলে, তিনি সন্তানহীন সাধকের মানদণ্ডে লালনপন্থায় নিন্দিত হন এবং লালনের শাখা থেকে পৃথক হয়ে সুফী-পরিচয়ে আত্মসমর্থন করেন।[৮২] লালনপন্থা, নিম্নবঙ্গের নরোত্তমপন্থায় বা শিলাইদহের গোঁসাই গোপালদের ঐতিহ্যে সন্তানের জন্ম দিলে আখড়া পরিত্যাগ করতে হয়; তার হাতে সাধুরা খায় না এবং সাধুপ্রদত্ত আসন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে দেয়া হয় না। সন্তানের জন্মদানের বিষয়ে ঘোষপাড়ায় কর্তাভজাদের সঙ্গে লালনপন্থার পার্থক্য আছে। সন্তানহীন যুগল সাধনা থেকে বিচ্যুত হবার অপরাধের স্মৃতিতে Virgin Mary-র প্রতিসাম্যে "সতী-মা" চিত্রটি চালু হয় ঘোষপাড়ায়। মা হলেও তিনি 'সতী'। সুতরাং পাঞ্জু শাহের সুফী ঐতিহ্যের দাবি কোনভাবেই লালনপন্থায় ঐতিহ্যসম্পৃক্ত নয়। বিভিন্ন সুফী ধারায়/পীরের ঐতিহ্যে সন্তানকে ধর্মীয় উত্তরাধিকার দিয়ে যাওয়া হয় এবং পরিবারবিশেষ সম্প্রদায় গড়ে, তা ধরে রাখেন। লালন-দুদ্দুর সন্তানহীন ঐতিহ্যে এমন বংশানুক্রমিক সম্প্রদায়রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। ব্যক্তি বা পরিবারের অর্থনৈতিক স্বার্থে ভক্তি-আন্দোলনের বহু শাখা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে আপোস করে সাম্প্রদায়িক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছিল। বঙ্গে ফুরফুরা শরীফ বা বহু পীর পরিবারের আয়ের উৎস মুরিদবর্গ। নদীয়ার কর্তাভজাদের 'পাল' বংশ বা হরিবোলামতুয়া (ঠাকুরনগর) গোষ্ঠীর মধ্যে বংশানুক্রমিক গুরুগিরি সম্প্রদায় ও নির্দিষ্ট কেন্দ্রগঠনে সহায়তা করেছে। লালনপন্থীদের মধ্যে গুরুগিরি করে জীবিকানির্বাহ হয় না। নীতিগতভাবে এটি সমর্থনীয় নয়। উপরন্তু নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্ত শিষ্যের অর্থদানের সামর্থ্য প্রায় থাকে না। লালন এবং ভোলাই নানা উৎস থেকে আয় করে জীবিকানির্বাহ করতেন। সুতরাং গুরুগিরির পেশায় লালনপন্থা সম্প্রদায় জন্ম নেয়নি। লালনপন্থায় গুরুদের শিষ্যসংখ্যাও সীমিত।

শুধু সুফী-পরিচয় দানের অভাব নয়; লালন বা তাঁর পণ্ডিত শিষ্য দুদ্দু কোন গুরুতালিকা বা সিজরানামা পেশ করেননি। লালনের শিষ্য ছিল হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে এবং তিনি বেসরা ফকির ছিলেন। তাঁর গুরু সিরাজ শাহ ছিলেন পাল্কিবাহক অর্জল বা অস্পৃশ্য পর্যায়ের মুসলমান। এ পন্থায় তত্ত্বজ্ঞান, সাধনশিক্ষার জন্য গুরু অনিবার্য। লালন বা তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্যগণ কেবলমাত্র নিজ গুরুর নামোল্লেখ করেছেন, কখনো গুরু-পরম্পরার উল্লেখ করেননি। এরা

গুরু-পারম্যবাদী। গুরুই গৌর, নবী, খোদা, গুরুর রূপমূর্তি বা বর্জোক ধ্যানে নিয়ে আসা, 'জোত নেহারে' সিদ্ধ হওয়া পদ্ধতিটি দরবেশীপন্থা বলে লালন উল্লেখ করেছেন। গুরু এঁদের ইষ্ট। (সাধনসঙ্গিনীও ইষ্ট হতে পারেন কিন্তু লালনপন্থায় পুরুষ-গুরুর বিশেষ প্রাধান্য)। তাঁর দেহের ১২টি স্থান (১২ বুরুজ / ১২ দেউল) ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে, অবশেষে চোখ বন্ধ করে গুরুরূপকে ধ্যানে আনা হয় এ সাধনায়। পদ্ধতিতি 'বর্তমান থেকে অনুমানে যাওয়া' বলে কথিত হয়। নিজের দেহকে গুরুর দেহ মনে করে তার সেবাপূজারূপ আরোপ করেন অনেকে। একটি বিশেষ রূপমূর্তির জন্য এবং সাধনতত্ত্ব জানার জন্য গুরু এ পন্থায় অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গুরুর গুরু বা গুরুতালিকা এ পন্থায় অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। এ কারণে লালনপন্থায় গুরুতালিকা বা সিজরানামা নেই। নক্সাবন্দী সাধনা, সোহাগীদের নারীভাবনা, মারফতী ঐতিহ্য, ফানা-খেলকার ঐতিহ্যকে লালন তার সাঁই-ফকিরী-দরবেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি আলি-আউলিয়াদের স্মরণ করেছেন, নবীর তরিকের অনুসারী বলে পরিচয় দিয়েছেন; জ্যান্ত পীরের খান্দান দাবি করেছেন কিন্তু কোন সরা বা বেসরা শাখার ঐতিহ্য স্বীকার করেননি।

লালন মৃত্যুর আগে উইলে বিষয়াদির উত্তরাধিকারী নির্দেশ করেছেন কিন্তু কাউকে দেননি তাঁর ধর্মীয় উত্তরাধিকার। কাউকে গুরু নির্বাচিত করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে লালনের সাধনা হয় না। ব্যক্তি তার স্বেচ্ছায়, শ্রদ্ধা, আবেগে গুরু নির্বাচন করবেন, এ পদ্ধতিটিই লালনপন্থায় অনুসৃত হয়।

আবেগসম্বল সাধনাহীন ভক্তি, জপ, বেশবাস, মালাতিলকাদি-যুক্ত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের সঙ্গে লালন ও দুদ্দু নিজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তাঁরা মূর্তি পূজেন না। বর্জোকহীন নাম জপেন না, ধারণ করেন না 'কালামালা' এবং পঞ্চতত্ত্বে অবিশ্বাসী। অথচ কৃষ্ণচৈতন্যে লালনের শ্রদ্ধা; নিজেকে বলেন তিনি 'গৌরবালা'। কিন্তু সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বলতে রাজি নন নিজেকে। ব্যক্তির আত্মসর্বতায় শক্তি অর্জনের পন্থা (শক্তিহরা ভাবকের কপট উদাসী, পদ ১৯৮) নয় তাঁর মনমতো। অথচ আগম-নিগমে এবং তন্ত্রানুসন্ধানে তাঁর অনাস্থা নেই (পদ ১১৮)। নারীকেন্দ্রিক যুগল-সাধনা চন্দ্রভেদ, রস-রসায়ন প্রভৃতি তো তান্ত্রিক সাধনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। শিব লালনেরও অন্যতম প্রিয় চরিত্র। লালন, শরীয়তকে কদাপি অগ্রাহ্য করতে পরামর্শ দেননি। নবীর চার তরিকের মধ্যে শরীয়ত অন্যতম। শরীয়তের সরপোষে ঢাকা থাকে বস্তু মারফত। "সরপোষ থুই তুলে ও কি দেই ফেলে লালন বস্তু ভিখারি।"

লালন গুরুকে দরবেশ, সাঁই বলেছেন ; নিজের সাধনাকে বলেছেন ফকিরী বা দরবেশী। লালনের শিষ্যবর্গ অনুরূপভাবে লালনকে সাঁই ও দরবেশ বলেছেন। অনেকে সাঁই শব্দের অতীত উৎস নাথ নিরঞ্জনী পন্থায় নির্দেশ করে বলেন যে গোস্বামী থেকে গোঁসাই বা সাঁই আসেনি।[৮৩] ফকিরী ও দরবেশী ঐতিহ্য তুর্কীস্তান, আরব-পারস্যের। তাঁদের নানা শাখা-প্রশাখা ; বহু উপসম্প্রদায়। শাস্ত্রাচারী বৈষ্ণবদের থেকে নিজেদের মানুষ ভজনার, নারীসঙ্গী ঐতিহ্যের পার্থক্য নিরূপণের সূত্রে দুদ্দু নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন লালনের দোহাই দিয়ে।[৮৪] বৈষ্ণবদের হস্তলিখিত গুপ্ত কড়চার একটি হলো বীরভদ্র শিক্ষা বা মাধবী বিবির কড়চা। গ্রন্থের বিষয় হলো : নিত্যানন্দের নির্দেশে বীরভদ্র মক্কায় গিয়ে মাধবী বিবির কাছে শিক্ষা প্রার্থনা করেন এবং মাধবী নারীদেহে নানা শক্তির অবস্থানের তত্ত্ব জানান [নিজস্ব সংগ্রহ]। দুদ্দুর সাক্ষ্যে, যুগল-সাধক বৈষ্ণবদের একাংশের সঙ্গে তাঁদের মতবাদের ঐক্য বর্ণিত হয়েছে। লালনের গানেও

বৈষ্ণবদের বর্তমান সাধনার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। দরবেশগণ বহির্ভারতীয় উপাসকগোষ্ঠী। তুর্কীস্তান ও অন্যান্য অঞ্চলে দরবেশদের বহু আস্তানা ও উপশাখার সন্ধান পাওয়া যায়। নৃত্যপর তুর্কী দরবেশগণ গান ও চক্রাকারে নৃত্যরত অবস্থায় 'দশাপ্রাপ্ত' হতেন। অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে ভারতীয় এবং হিন্দু সমাজভুক্ত দরবেশদের উল্লেখ আছে। দবীর খাস সনাতন কারাগার থেকে দরবেশের ছদ্মবেশে পলায়ন করেন। পরবর্তী কালেও তাঁকে দেখে চৈতন্য-অনুচরদের দরবেশ বলে ভ্রম হয়েছিল।[৮৫] সনাতন গৌড়ে কোন দরবেশ শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু বৃন্দাবন অঞ্চলে এবং বঙ্গে দরবেশ শাখার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সনাতনের নাম উচ্চারিত হয়।

রাঢ় অঞ্চলের দরবেশ গোষ্ঠী মূলত হিন্দু সমাজভুক্ত জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত ; এদের অন্যতম মিলনকেন্দ্র হলো দুবরাজপুরের অটলবিহারীর আশ্রম। জয়দেবের মেলার পর এখানে সমবেত হয়ে দরবেশগণ উৎসব করেন। বোলপুরের (বীবরভূম) সুরী পাড়ার বাউল-গায়ক বিশ্বনাথ দাস, দরবেশ শাখার অন্তর্গত। অর্থাৎ দরবেশগণ কেবল মুসলমান সমাজের অন্তর্গতই নন ; হিন্দু সমাজেও এর অস্তিত্ব আছে। অনুরূপভাবে ফকির বিশেষণ ব্যবহার করেছেন হরিনাথ মজুমদার বা গোঁসাই গোপাল। লৌকিক দেহসাধনার সর্বোচ্চ স্তর সাঁই। বাঁকুড়া, বীরভূম, ২৪ পরগণার নানা অঞ্চলে সাঁইদের আখড়া আছে। এরা সবাই হিন্দু সমাজের মানুষ। পানাগড়ের সমীপে কোটা আশ্রমে থাকতেন প্রখ্যাত সাঁই-গুরু অনুরাগী [গ্রন্থে দাস মহান্ত উপাধি ব্যবহৃত]। রাঢ়ের দরবেশদের মধ্যে নানাধরনের তসবী-মালা এবং বহু রং-এর তালি দেয়া আলখাল্লা ব্যবহৃত হয়। এদের একটি অংশ জাত-বৈষ্ণব পরিবার থেকে আগত। সাঁইগণ তুলসীমূলের 'হীরা' পরেন, রক্ত বা গেরুয়া বস্ত্র ব্যবহার করেন। সব কিছু খান, মদ্যাদিরও নেশা করেন, তত্ত্বগতভাবে জাতবিচার করেন না। নামকরণে, বেশভূষায় দরবেশ বলে পরিচয় দেয়। চারটি বর্ণের ও চারভূতের প্রতিচ্ছায়ায় লৌকিক সাধনারও চারটি স্তর—আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই। রামকৃষ্ণদেব এবং অনুরাগী সাঁই এ স্তর-চতুষ্টয়কে সাধনার স্তর ও ভাবের উপাধি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৮৬] এই কারণে সম্প্রদায়গঠনের ক্ষীণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই নামে কোন সম্প্রদায়, নির্দিষ্ট কেন্দ্র, সাজসজ্জা ও আচরণবিধি এবং সর্বোচ্চ কোন কর্তৃত্ব গড়ে ওঠেনি। সুতরাং লালন-ব্যবহৃত ফকির, দরবেশ বা সাঁই শব্দাবলী সম্প্রদায়বাচক নয় ; ব্যক্তিগত বিশেষণমাত্র। রসিক, সহজ প্রভৃতি শব্দেও গুপ্ত সাধনা পদ্ধতি আভাসিত হয়েছে।

যে সমস্ত ধর্মগোষ্ঠী শাস্ত্রগ্রন্থ, আচাব, বেশ-তিলক, জাতিভেদ মান্য করে ; গুরুকে অমান্য করে—লালন তাদের বৈদিক, শরীয়তী বা অনুমানপন্থী বলে দূরে রেখেছেন। বৈদিক, বৈধী, পণ্ডিত, শরীয়তী, মৌলবী, মওলা থেকে তাঁর পার্থক্য স্পষ্ট, তিনি এদের বিরোধীপক্ষে থাকেন। যারা গুপ্ত দেহকেন্দ্রিক যুগল-সাধনায়, গুরুকে মান্য করে রস-রতিতে ব্রহ্ম-চিৎকণা ও আনন্দস্বরূপকে সন্ধান করেন, এমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর লালন সমধর্মী।

রবীন্দ্রনাথ, জৈন ঐতিহ্যের প্রভাব দেখেছিলেন লালনের উপর। কিন্তু সপ্তপন্থী (ভঙ্গী) শব্দ-ব্যবহার এবং অহিংসা তত্ত্বের অতিরেকী প্রচার ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে জৈন পন্থার প্রভাব লালনে নেই। লালন মুক্তিপথ বা মোক্ষপ্রার্থী নন। নির্বাণ মুক্তিকে তিনি পশুর জীবনাবসানের মতো লয় বলে বর্ণনা করেছেন।[৮৭] জীবন দুঃখময় এবং তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নেই লালনের সাধনপন্থায়।

বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণবাদ, দুঃখবাদ বা নির্বাণতত্ত্বের কোন ছায়া লালনে নেই। বৌদ্ধতন্ত্র বা সহজ সাধনার বহু পারিভাষিক শব্দ লালন ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় আচার, বেদ-ব্রাহ্মণ অস্বীকারে এবং যুক্তিবাদে সহজযানের ঐতিহ্যের অনুসরণ আছে লালনপন্থায়। শিব লালনের প্রিয় চরিত্র। শৈব দর্শন ও মতবাদের পঞ্চীকরণের এবং পঞ্চভূতের তত্ত্ব কিন্তু লালন গ্রহণ করেননি। পঞ্চতত্ত্বের তত্ত্বটি লালনের দৃষ্টিতে 'বৈদিক' [এই পঞ্চতত্ত্ব বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেছেন ; অনেকের মতে এটি বৌদ্ধ-প্রভাবিত তত্ত্ব]। লালন চারভূত এবং চারচন্দ্র স্বীকার করেছেন। নাথপন্থা, আরব-পারস্য, ভারতীয় প্রাচীন বস্তুবাদের ঐতিহ্য নানাভাবে প্রভাবিত করেছে লালনকে। লালন, দুদ্দু নিজেদের 'বস্তুবাদী' 'বস্তুভিখারি' বলে ঘোষণা করেছেন। ধর্ম, কল্পিত ঈশ্বর, পুরোহিত, মন্ত্রাদির প্রখর সমালোচনা এবং যুক্তিবাদ, ইহবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, মানবতাকে গ্রহণের ব্যাপারে বস্তুবাদের উত্তরাধিকার বর্তেছে লালনে। পরলোক, মোক্ষ, মুক্তিতে এঁরা অবিশ্বাসী, তাই ইহবাদ এবং ইহজীবন এ পন্থায় প্রাধান্য পেয়েছে। এ সাধনা ইহজীবনকে সুখী ও মনোহর করতে সচেষ্ট। লালন মানবজীবনকে দেবদুর্লভ বলে বর্ণনা করেছেন। মানবজীবনের মাধুর্যের লোভে দেব, দানবগণ মানবজন্ম প্রার্থনা করে। গোলকনাথ কৃষ্ণ অতৃপ্ত বাসনায় জন্ম নেয় মানবগৃহে। স্বর্গের অধিকতর সুখের প্রতিশ্রুতিতে স্বর্গ থেকে দেবতাদের মর্ত্যে আগমনের দৃশ্যে ও সংবাদে মর্ত্যের ও মানবজীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্বর্গেরও ঊর্ধ্বে। লালনপন্থার ইহবাদ ও মানবতাবাদের পশ্চাৎভূমি রচনা করতে বস্তুবাদী দর্শন, আয়ুর্বেদ, দেহতত্ত্ব, বিতর্কশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্র সাহায্য করেছে। চারভূত এবং রজঃবীজের সমবায়ে দেহ ও জগৎসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে এঁরা সর্ববিধ অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্বকে পরিহার করেছেন। নাথ ঐতিহ্যের বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও হঠযোগের উৎকট দেহসাধনা লালনপন্থা গ্রহণ করেনি। রসিক লালনও রস-রসায়নের সাহায্যে সুখ, সুস্থতা, আনন্দ ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু রসায়নবাদীদের আত্মসুখসর্বস্বতা, ভোগলোলুপ আত্মমগ্নতা বা অজরামর হবার অযৌক্তিক প্রার্থনা এ সমাজে দৃষ্ট হয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং দেহীর 'অহং'চেতনাকে গুরুত্ব দিয়ে লালন মানহীনকে 'পরম ব্রহ্মের' সমার্থক করেছেন। আবার বস্তুবিশ্বের সর্বত্র 'তুমি'র মধ্যে ব্যাপ্ত দেখেছেন 'আমি'কে। নিজেকে অন্যের জন্য উৎসর্গ করার প্রেমভাবনায়, করুণা-দয়া-মৈত্রীভাবনায় এ সমাজ তন্ত্র ও মহাযান বৌদ্ধ এবং ভারতীয় বস্তুবাদের উত্তরাধিকার বহন করে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' বাঙালি কবির এই অপূর্ব মানবতাবাদী ঘোষণা ধ্রুবপদের মতো আবর্তিত হয় লালনের গানে। আজাজিলের সৃষ্ট আদমকে 'সেজদা' না-করে শয়তান হবার ইসলামী পুরাকাহিনীটি পুনঃপুনঃ স্মরণ করে লালন মানুষ ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরকে প্রায় অস্বীকার করে, মানুষকে মহিমাময় করে তুলেছেন।

এ মতবাদে কল্পনা বা অলৌকিকতা না-থাকায় ''আনুমানিক' ঈশ্বর, স্বর্গ, মোক্ষমুক্তির প্রার্থনা নেই। প্রত্যক্ষদর্শনের এ সাধনা মূলত ইহজীবনের সুখ ও শান্তির জন্য। সরাসরি জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক, নাথ, সুফী, বৈষ্ণব মতবাদ বা সাম্প্রদায়িক গুরুবর্গের নাম বা ঐতিহ্য লালন দাবি করেননি। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী নানা ধরনের ঐতিহ্য এ মতবাদে ঘনীভূত হয়েছে। এশিয়ার বস্তুবাদী চেতনা এ মতবাদের কায়া নির্মাণ করে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। যুক্তিতর্কে বাদ, বিতণ্ডা, জল্প প্রভৃতি কৌশলের ব্যবহার, ইহবাদ ও পরলোক অস্বীকার, প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ, বৈদিক-

শরীয়তী শাস্ত্রব্যাখ্যাকে অস্বীকার, ধর্মব্যবসায়ী-শাস্ত্র-আচার, অগ্নি, মূর্তিকে অগ্রাহ্য করে, শাস্ত্রকে প্রামাণ্য না মনে করে, চারভূত ও রজঃবীজযোগে জীববিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদের ঐতিহ্যে দেহ ও সৃষ্টিব্যাখ্যা, নবী-কৃষ্ণ-চৈতন্যকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করে, মন্দির-মসজিদের ধর্ম এবং মোল্লা-পুরোহিতকে অস্বীকার করে ধর্ম-প্রভাবিত সামাজিক আচারাদি অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন লালন ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ।[৮৯]

উনিশ শতকে প্রগতিশীল সামাজিক বিতর্কে রামমোহন, বিদ্যাসাগর শাস্ত্রকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করে শাস্ত্রীয় যুক্তিবিন্যাস করেছেন। সেসময় 'বৈদিক শাস্ত্র'কে প্রত্যাখ্যান করে লালন ঘোষণা করেছেন যে সত্য গ্রন্থে নেই ; মানুষে আছে। এ সমাজে সগর্বে নিজেদের অবৈদিক শাস্ত্রবিরোধী নির্গ্রন্থ বলে পরিচয় দেন। সঙ্গত কারণে, কোন লিখিত শাস্ত্রীয় ধর্মগোষ্ঠীর ঐতিহ্য দাবি করতে উদ্যত হন না এ প্রতিবাদী গোষ্ঠী। দেহই তাদের বেদ ও কোরাণ।

প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ে ধর্মান্তরের রীতি প্রচলিত আছে। এক ধর্মে দীক্ষা নিলে অন্য ধর্ম ত্যাগ করতে হয়। বাউল ফকিরী মতবাদে দীক্ষা নিলে সামাজিক ধর্ম ত্যাগ করতে হয় না ; শিষ্য পূর্ব-ধর্মেই থাকে। সুতরাং যে কোন ধর্মের মানুষ বাউল মতবাদ গ্রহণ করতে পারে তার নিজস্ব ধর্ম ত্যাগ না করে। ফলত সমাজের অসেতুসম্ভব ধর্মীয় বিভাগ হিন্দু, মুসলমান ও অস্পৃশ্য জনগণকে অনায়াসে এ মতবাদী গুরু নিজ গোষ্ঠীতে সমবেত করান এবং প্রচলিত সমাজ ভেঙে আরেক সমাজ গড়ে তোলেন। শিষ্যদের মধ্যে সামাজিক ঐক্যকে দৃঢ় করেন গুরু, সুতরাং জাতপাতহীন গুরুগোষ্ঠীর প্রসার প্রচলিত সমাজ বিধান ও শৃঙ্খলকে নষ্ট করে। রক্ষণশীল সমাজ সঙ্গত কারণেই এদের বিরোধিতা করে। রেয়াজুদ্দীন এবং দয়ানন্দ এদের বিরুদ্ধে যুগপৎ অসি এবং মসী ব্যবহার করেন।[৯০]

ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় গঠনের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন লালনপন্থীগণ। শাস্ত্রীয় সত্যগুলি কাল্পনিক, অনুমাননির্ভর ও খণ্ডিত অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ব্যক্তি-অনুভবেব ভিন্নতা দেশ ও কালের প্রভাবে এখানে বিভেদের সৃষ্টি করেছে। বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারকের দেশ ও কালের ঐতিহ্য এবং অনুভবের সীমাবদ্ধতা থেকে অনড় প্রথাগুলি জন্ম নিয়েছে। খণ্ডিত সত্য ও দেশাচারকে শাশ্বত বলে প্রচার করতে গিয়ে এবং বলপ্রয়োগে আপন মতবাদ অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার বাসনা থেকে ধর্মদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রণেতাদের দেহাবসানের পর তাদের শিষ্যবর্গ সঠিক ধর্মব্যাখ্যার অভিমানে দল ও গোষ্ঠী করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। শাস্ত্রে সত্য নেই একথা উচ্চারণ করার পাশাপাশি (লোকমতের চাপে) লালন, শাস্ত্রে সত্যের ইঙ্গিত বা ইশারা আছে, তাকে গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবার কথা বলেছেন। এরা শাস্ত্রাদিকে নিজস্ব ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত করে এবং গ্রাস করতে চায়। কিন্তু মৌলবী-পণ্ডিত এসমস্ত ব্যাখ্যাকে, "বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ" (চৈ. চ. মধ্যলীলা, ২৪ পরিচ্ছেদ)। সাধুসিদ্ধদের ধর্ম প্রয়োগমূলক এবং প্রত্যক্ষ। এজন্য প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্যগুলি একই প্রকার। তাই সাধু ধর্মে ও ফকিরীতে মতভেদ, দ্বন্দ্ব নেই।

দেশ ও কালের প্রভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের ব্যাখ্যা করেছেন লালন, "পাপপুণ্যের কথা আমি কাহারে শুধাই" পদে।[৯১] লালনশিষ্য দুদ্দু এজাতীয় ব্যাখ্যাকে পূর্ণতা দান করেছেন। প্রাচীন পৃথিবীতে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে জ্ঞানেরও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেক ধর্মপ্রণেতা অঞ্চলবিশেষের ভাষা, আচার ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে

এক-একটি ধর্মগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ ধর্মাচার দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। উপরন্তু স্বীকৃত ধর্মাচার্যদের শিক্ষায় নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। জন্মসূত্রে আচারমূলক ধর্ম কেউ পায় না। সমাজ ও পরিবেশ শিশুর উপর এগুলি আরোপ করে। এর সমান্তরালে রয়েছে সহজাত মানব-প্রবৃত্তিগুলি। এই সহজ ধর্মে আচার, দেবতা, দ্বন্দ্ব, হানাহানি নেই। আছে একের অনন্ত বৈচিত্র্য ও স্বভাবকে স্বীকার করে নেবার সহিষ্ণুতা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মে একদল অন্যের উপর তাদের মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায় এবং সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব—তা থেকে রণ-রক্ত।[১২]

লালনের মতে ধর্মের অন্তর্গত ধর্মসম্প্রদায়গুলির সৃষ্টি হয়েছে ধর্মপ্রণেতার মৃত্যুর পর এবং শিষ্যদের কারো কারো প্রধান হবার ইচ্ছা থেকে। পরম কৌতুকে এরা ব্যাখ্যা করেছেন যে ধর্মস্রষ্টারা অন্য ধর্মগোষ্ঠীতে জন্ম নিয়েছিলেন। যেমন হজরত মহম্মদের পিতা-মাতা মুসলমান ছিলেন না ; বিদ্যাগর্বে গর্বিত চৈতন্য বৈষ্ণব ছিলেন না। কুল, গোত্রের ও বৃত্তির পরিচয়ে ধর্মপ্রণেতাগণের অনেকে সামাজিক উচ্চস্থানে ছিলেন না। গরু ও ভেড়া চড়াতেন দুই রাখাল—কৃষ্ণ ও মহম্মদ। জোলা কবীর, মুচি রামদাস, বেসরা ফকির মনসুর হাল্লাজ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

লালন ও তাঁর অনুগামীগণ কদাপি, 'যত মত তত পথের' কথা বলেননি। বরং সত্যকে এক ও অদ্বিতীয় বলে প্রচার করেছেন। ধর্মাচারের ভিত্তিতে মানুষকে, তাঁরা মিলিত করা অসাধ্য জেনে, অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সাম্প্রদায়িক ধর্ম পরিত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এদের তীব্র আক্রমণ। বর্বর, অসাধু এবং শয়তান জাত, গোত্র সৃষ্টি করেছে সৃজন ধ্বংসের জন্য।[১৩] জাতির বেড়া দিয়ে মানুষকে পৃথক করা হয়েছে। সম্প্রদায়, কুল, গোত্র বিভেদমূলক ঐতিহ্যের ফসল। এর মূলে হিংসা। কুল, গোত্র, সম্প্রদায়-মান্যকারীগণ, শাস্ত্রানুসারীগণ কখনো 'অধর চাঁদকে' পায় না। লালন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "কুল না গেলে পাইনে হরি।" শাস্ত্র ও আচারমূলক ধর্মের বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণ বাউল গানের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সন্ন্যাসে, বৈষ্ণবদের ভেক এবং ফকিরদের খেলকা-গ্রহণে পূর্বনাম, কুল, গোত্রের পরিচয় বর্জন করে নতুন কুল, গোত্র, নাম গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ এক ধরনের প্রতিবাদী গোত্রান্তর/ধর্মান্তর। সমাজের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত এধরনের মানুষ। কিন্তু ইসলামে সন্ন্যাসগ্রহণ নয় বিধিসম্মত ; আর হিন্দু ধর্মাচার্যগণ নারী ও শূদ্রের ধর্মকর্মের অধিকার বা সন্ন্যাসগ্রহণ স্বীকার করেননি।[১৪] প্রচলিত সমাজকাঠামোর প্রচ্ছায়ায় বৈদিক সন্ন্যাসী ও পীর-ফকিরদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ গড়ে উঠেছিল। লালনের মতে কুল, গোত্র, সম্প্রদায় অগ্রাহ্য করেই সাধু হওয়া যায়। সাধুর জাত নেই।[১৫] তাই তারা আদমে আল্লাকে, জীবে শিবকে, নরে নারায়ণকে—মানুষ-রতনে মনের মানুষ অধারচাঁদকে পায়। লালন জৈবিক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্মবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করে মানুষকে। পিতৃবীজে এবং মাতৃরজেঃ গঠিত হয় দেহ ; আকৃতির বিচারে মানুষ একটি জাতি (যেমন গরু, ঘোড়া প্রভৃতি)। একই 'নীরাকার' বীজে এবং পদ্ধতিতে তাদের জন্ম হয়। লালন নিজেকে মানুষ জাতি বলে পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের মহিমা গায়ক দুদ্দু ঘোষণা করেছেন, "আমার কোন জাতি গোত্র নাই"।

গুরুর কাছে দীক্ষা নিলে গুরুবীজ রোপিত হয় শিষ্য-শিষ্যার দেহে। এবং সমস্ত শিষ্যা-শিষ্যা গুরুবীজে জাত এক পরিবারভুক্ত বলে গণিত হয়। আবার সব গুরুর মধ্যে একই চৈতন্যশক্তি ও রজঃবীজ বিরাজিত বলে, 'একগুরু জগৎময়।'[১৬] তাই গুরুকুলের বর্তমানপন্থী সাধকেরা এক

পরিবারভুক্ত বলে লালনপন্থায় আদৃত হয়। রক্ত-সম্পর্ক অগ্রাহ্য করে সচেতন, স্বাধীন মানবসম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে এখানে। গোত্র, কুল, সম্প্রদায়ের পরিচয় এখানে অপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ধর্মীয়, সামাজিক বিভাজনগুলি অগ্রাহ্য করে গুরুকুল গঠিত হয়। মানুষের হিন্দু, মুসলমান, অস্পৃশ্য বিভাজনরেখা অগ্রাহ্য করে সকলে মিলিত হয়ে একত্রে পানভোজন, আনন্দ-উৎসব করেন, সাধনা করেন গুরুকুলে। সম্প্রদায়, কুল-গোত্রের গর্বের সমান্তরালে অবস্থান করছেন কুললঙ্ঘনকারী, গুরুগৌরবী জনগোষ্ঠী। হিন্দু, মুসলমান, শূদ্র, সৈয়দ, ময়রা, কলু প্রভৃতি পরিচয় সাময়িকভাবে হলেও তারা অস্বীকার করছেন। এবং প্রচলিত সমাজে আরেক গুপ্ত সমাজ গঠন করে তারা বাস করেন। সামাজিক পরিচয়ের পাশাপাশি গুরুগোষ্ঠীর পরিচয় তাদের স্বাতন্ত্র্যে ভূষিত করে। সমাজকে লঙ্ঘন করেও শেষ পর্যন্ত তারা সমাজেই সংলগ্ন থাকে। গৃহস্থ সামাজিক বিধিমান্যকারী এবং গৃহহীন অবৈদ্বিক সাধক থেকে ভিন্ন এদের অবস্থান। আর প্রচলিত সমাজবিধানে পিষ্ট ও অসন্তুষ্ট মানুষের ভিড় এ মণ্ডলীতে লক্ষ করা যায়। নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দায়ে পিষ্ট বহু মানুষকে দেখা যায় এ মণ্ডলীতে।

'মুসলমান নারীদের হয় না মুসলমানী, ব্রাহ্মণীদের নেই পৈতা'—এ মর্মে গান বেঁধেছেন লালন। আমাদের ধর্ম মূলত, 'রোটি বেটী' (খাদ্যগ্রহণ ও বিবাহ) নির্ভর। সমাজজীবনে রান্না ও সন্তান সৃষ্টি করে নারী। কিন্তু তারা সংস্কৃত হয়ে মুসলমান বা দ্বিজ হয় না। বহিরাগত ধর্মের নরগোষ্ঠী ভারতে এসে সতত ভারতীয় আদিবাসী নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সন্তান পিতার ধর্মে, গোত্রে চিহ্নিত হয়। নানা কারণে, অনেক ধর্মজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে ভারতীয় সমাজে নারীর জাত নেই। বেদ ও ধর্মাচারে জাত বা ধর্মকর্মের অধিকারহীন নারীও শূদ্র। স্মার্ত বিধানে সমাজশৃঙ্খলের উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণের নারী বিবাহ করতে পারে। (বিপরীতটি নয়-শূদ্রাণী ব্রাহ্মণকে বিবাহ করতে পারে, ব্রাহ্মণী শূদ্রকে নয়)। হিন্দু বিবাহে পিতৃগোত্র হারিয়ে নারী স্বামীগোত্রে গোত্রান্তরিত হয়। নর ও নারীর বিবাহে, সন্তানজন্মে বারংবার ঘটেছে রক্তের মিশ্রণ। লালন বিশ্বাস করেন যে নবজাত সন্তানের রক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া।[৩৭] অর্থাৎ রক্তের বিশুদ্ধি তত্ত্বে পুরুষের কোন ভূমিকা নেই। জৈবিক বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেহগঠনে নারীর দান অধিকতর। কিন্তু সমাজবিধানে তার কোন স্বীকৃতি নেই। চারভূত এবং রজঃবীজের কোন জাত নেই। জাত চোখে দেখা যায় না। তাই বিভেদকামী মনুষ্যসৃষ্ট এ বস্তুটিকে লালন সদলে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে রয়েছে জৈব-রাসায়নিক এক সাধনপদ্ধতি। মূলত রজঃবীজ নিয়েই বাউল সাধনা। লালনপন্থীয় শিষ্য নিজেকে নারী কল্পনা করে গুরু/স্বামীকুলে গোত্রান্তরিত হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মের অনুকরণেই, সম্প্রদায়ের কাঠামো ভেঙে সর্বমানুষের জন্য এক আসন রচিত হয়।

লালনপন্থায়, নারী অশেষ মর্যাদায় ভূষিত। তার পূর্ণ মানবাধিকার, স্বাধীনতা, ধর্মচর্যার ও দীক্ষা নেয়ার অধিকার এ মতবাদ স্বীকার করেছে। সমস্ত মানবিক গুণের আধার নারী। তাই সাধকমাত্রেই অর্জন করতে চান নারীত্ব—সাধনার লক্ষ্য 'আকর্ষণ'শক্তি অর্জন (তিন মুদ্রার সহায়তায় অমরোলী, সহজোলী ও বজ্রোলী ; এর মধ্যে বজ্রোলী সাধনার গুরুত্ব বাউলপন্থায় অধিক)। নারীর সেবা, পূজা, এবং মর্যাদাদান বাউলের অতি আবশ্যিক মূল্যবোধ। স্থলবিশেষে নবী চৈতন্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি শব্দাবলী, নারীত্ববাচক। কৃষ্ণ সবার প্রার্থিত ; তিনি প্রার্থনা করেন রাধাকে ; ধারণ করেন তাঁর পদ ; রাধাকে দেখেই উদ্ভব হয় তিন বাঞ্ছার—এভাবেই নারীর

মর্যাদাকে লালন মহিমাময় করে তুলেছেন। খেলকা বা ভেকে এ সমাজে নারীরও অধিকার আছে। সাধনপন্থায় বা সিদ্ধিতে এখানে নারী অনিবার্য। নারী ব্যতিরেকে মুক্তি বা সিদ্ধি নেই এ ঘোষণা শাস্ত্রীয় ঘোষণার বিরুদ্ধ এক বক্তব্য।[৯৮]

লালনের সময়কাল উনিশ শতক ; পটভূমিকা গ্রাম ; কৃষি ও হস্তশিল্পযুক্ত অর্থনীতির অন্তর্গত ছিল তাঁর জীবনযাপন। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার জল-অচল, বর্ণহিন্দু এবং মুসলমানদের নানা গোষ্ঠীর যৌথ অংশগ্রহণ ছিল। সকলে পরস্পরের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করতেন। সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রায় একই প্রকার থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানে স্পষ্ট বিভাগ ছিল। আবার এই বিভাগের মধ্যে নানা উপবিভাগ ছিল। জাতাজাতির দ্বন্দ্ব ছিল ; ছোঁয়াছুয়ির জন্য 'জাত' চলে যেত। বিশেষত উচ্চবর্ণের 'জাত' অবস্থানটি দুর্বল জন্য সহজে ভঙ্গুর ছিল এবং উচ্চ অবস্থান থেকে 'জাত' হারাতেন অনেকে। গুরু সিরাজের গৃহে খাদ্যগ্রহণরূপ অপরাধে জাত হারিয়ে, অন্য কুল না পেয়ে লালন খেলকা গ্রহণ করে তাঁর সামাজিক অবস্থানকে একটি যুক্তিসঙ্গত রূপ দেন।[৯৯] কিন্তু তিনি জাতিশৃঙ্খলের উচ্চস্তরে পশ্চাতের দরোজা দিয়ে ঢুকতে চাননি। ভেকধারী বৈষ্ণব বা খেলকাধারী পীর অনেকে সময় নয়াব্রাহ্মণ বা মৌলবীতে পরিণত হয়। লালন জাতিশৃঙ্খলে এমন কোন আসনলাভের চেষ্টা করেননি। বরং প্রবলভাবে জাত ও সম্প্রদায়ের কাঠামো ভেঙে হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে চেয়েছেন। ভক্তি-আন্দোলনে এবং বঙ্গের চৈতন্যধর্মে নিহিত মূল্যবোধকে তিনি যুগোচিত রূপ দিয়েছিলেন। সমাজের অতিদরিদ্র প্রান্তঃশায়ী মানুষ, হিন্দু ও ইসলামের অস্পৃশ্য এবং অর্জল গোষ্ঠীগুলি কোন জাতপাতের মধ্যে গণিত হন না। তাঁরা ধর্ম অপেক্ষা দারিদ্র্য নামক অধর্মকে সমভাবে পালন করেন। উপরন্তু ইংরেজ শাসক-শোষকদের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক-কারিগরেরা যৌথ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। নদীয়া-পাবনা-যশোহর এলাকায় ক্রমান্বয়ে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, শরীয়তুল্লা, দুধু মিঞা, পাগলাপন্থী গুরুদের আন্দোলন, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, নীলকর ও জমিদারবিরোধী সংগ্রামের ঢেউ উঠেছিল। এই গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বৃত্তি, ধর্ম ও গোষ্ঠীয় রেখা ভেঙে শ্রমজীবী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ এক গণ-সংগঠনে পরিণত করেছিল। এই 'জনতা'গঠনের প্রক্রিয়ায় চাহিদা দেখা দিয়েছিল এক অভিন্ন সংস্কৃতির। জাতপাত অগ্রাহ্য করে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল কর্তাভজা, বলরামী, গৌরবাদী, সাহেবধনী, সৎসঙ্গী, হরিবোলা মতুয়া প্রভৃতি লোকধর্ম। এই গণমিলনের আবেগকে সর্বাপেক্ষা সুচারু ও যুক্তিপূর্ণ রূপ দান করেছেন লালন।

জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে লালন জাতকে আগুনে পোড়াতে চেয়েছেন। সেসময় জাত ও ধর্ম মানুষের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ সৃষ্টি করত। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অসেতুসম্ভব ব্যবধান ছিল। অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ, কায়স্থেরা অস্পৃশ্য হিন্দু ও মুসলমানদের ঘৃণা করত। মুসলমানদের একাংশ সৈয়দগর্বে এবং রাজ্য হারানোর অভিমানে স্বতন্ত্র থাকতেন। মুর্খ ব্রাহ্মণের গর্বে এবং দরিদ্র মুসলমানের বাদশাহী অভিমানে দুদ্দু কৌতুক বোধ করেছেন।[১০০] হিন্দু এবং মুসলমানের দ্বন্দ্বের ছিদ্রপথে এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। লালন বিশ শতকের পূর্বেই প্রয়াত হয়েছেন। মূলত ১৯০৫-এর পূর্ববর্তী সমাজভাবনা এ গানে চিত্রিত হয়েছে। ইংরেজ শাসক তখনো ধর্মকে, গণ-ঐক্য বিনষ্টির উপায় হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করেনি। দুদ্দু জাতাজাতির ফলে সৃষ্ট অনৈক্যকে জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। ইংরেজ আমলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জাত ও বৃত্তির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ; ধর্মের উপর

প্রভাব করছে অর্থনীতি। শূদ্র, চণ্ডাল (নমঃশূদ্র), বাগদী ধনসঞ্চয় করছে এবং সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছে ; মুসলমানের মোট মাথায় বহন করছে বর্ণ-হিন্দু কুলি ; স্কুলে সর্ব ধর্ম ও জাতের ছাত্রেরা একত্রে পাঠগ্রহণ করছে। আমাদের অভিন্ন অর্থনীতি ; প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ভাষা—তাই এ সামাজিক মিলনের প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এ প্রক্রিয়া প্রসারিত হলে জাতপাতের পাপ দূর হবে বলে কবি আশা প্রকাশ করেছেন।[১০১] লালনপন্থীগণ ধর্মীয় অনৈক্যের জন্য বিদেশী শাসকদের দায়ী করেননি। বরং আমাদের জনগণের এ ভেদবুদ্ধির জন্যই সমাজের হীনতা এবং পরাধীনতা। সম্প্রদায় ও ধর্মগোষ্ঠীর মিলনের পথ তাঁরা খুঁজে পাননি। তাই ধর্মের গণ্ডি মুক্ত করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এক দুঃসাহসিক সমালোচনামূলক সাংস্কৃতিক প্রচার চালিয়েছিলেন। জনতার এ আন্দোলনে বিরোধিতার সঙ্গে সমর্থনও ছিল। ধর্মের কাছ থেকে নিম্নবর্গের নিম্নবিত্তের কিছু পাওয়ার ছিল না। জাতে অন্ন দিত না ; অসুখে দেখত না। তাই এ ধরনের আন্দোলনের সামিল হয়ে তাঁরা পরস্পর-নির্ভরতার এক নূতন সংগঠন প্রার্থনা করতেন।

গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও বিভেদের অন্তরালে আমাদের মিলনমূলক এক সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমল প্রবাহ ছিল। লোকায়ত বস্তুবাদী, আজীবিক, জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, তন্ত্র, সর্ব মানুষের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছিল। এদেশে ইসলামের আগমনের পর নানা সুফী-ফকির গোষ্ঠী, ভক্তি-আন্দোলনের প্রাণপুরুষেরা সর্বজনের জন্য এক মুক্তধর্মের পরিকল্পনা করেন। হিন্দু ও ইসলামী সমাজের বাইরে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে গড়ে ওঠে শিখ প্রভৃতি সমাজ। কিন্তু অনতিবিলম্বে বৈষ্ণব বা শিখ সম্প্রদায়ে পরিণত হয় ; নিজেদের বাঁধে আচারের নিগড়ে। ধর্মের পাশ বা জাতিভেদ-ছিন্নকারী জোলা কবীর, মুচি রামদাস, মনসুর হাল্লাজ লালনের অগ্রজ নায়ক। চণ্ডালের রান্না করা অন্ন সর্বজাতি খায় জন্যই জগন্নাথ লালনের কাছে মহাতীর্থ। কিন্তু হিন্দুধর্মে ধর্মান্তর অচলিত হওয়ায় এবং ইসলাম থেকে ধর্মান্তর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রদায়ের বন্ধন ছিন্ন করে 'তৃতীয়' পক্ষের মতবাদগুলি ব্যাপকতা লাভ করেনি। উপরন্তু ভক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন গোষ্ঠী হিন্দু বা মুসলমান সমাজে সংলগ্ন হয়ে সমাজশৃঙ্খলে স্থান করে নেয়। ঔপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক অচল সমাজের এ চিত্র জীবনানন্দের ভাষায় :

> পথ নেই বলে
> যথাস্থান থেকে খসে তবুও সকলি যথাস্থানে
> —থেকে যায়।[১০২]

লালনের জীবনকালে কর্তাভজা গোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমানকে, হরিবোলা মতুয়া নিম্নবর্গের মানুষকে, সৎসঙ্গীরা সর্ববর্ণকে মিলিত করেছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই কর্তাভজা আন্দোলন পরিবারবিশেষের ধর্মীয় জমিদারীতে পরিণত হয়ে, মন্ত্র, অলৌকিকতা, ঘটপূজা প্রভৃতি আচারে আচ্ছন্ন হয়ে সামাজিক প্রগতিশীল নেতৃত্ব হারায়। প্রায় অনুরূপ ঘটনা অন্য দুটি সংগঠনেও ঘটে। আর যথার্থ উত্তরাধিকারীর অভাবে লোকচক্ষুর চলে যায় সাহেবধনী, বলরামী গোষ্ঠী। ঐতিহাসিক এ অভিজ্ঞতাগুলির সার-সঙ্কলনান্তে লালন কোন গোষ্ঠীভুক্ত হতে বা গঠন করতে, আচার দ্বারা শিষ্যবর্গকে শৃঙ্খলিত করতে বিরত ছিলেন। লালনপন্থীদের নেই কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র, কর্তৃত্ব, আচার বা সাজাপোষাক।

লালন নিজে আচারধর্মকে সম্পূর্ণত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পুরোহিত বা মৌলবীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই তিনি ভিন্ন জাতের এক নারীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্মকন্যা

পিয়ারীর জাত অজ্ঞাত; দত্তক-পুত্র ভোলাই জোলা পরিবার থেকে আগত। লালনগীতিকার প্রচারক বলাই হিন্দু সমাজাগত। লালনের শিষ্যমণ্ডলীতে নানা জাতির মানুষ ছিলেন। এই বিরাট পরিবারের মধ্যে ছিল না রক্ত বা কুল-গোত্রের বন্ধন। গোত্র-কুলের স্বার্থদ্বন্দ্ব সংসার-বিরক্ত মানুষদের গুরুকুলে আকৃষ্ট করত। এখানে হেতুহীন মানবসম্পর্কে থাকত না বন্ধন বা দাবি। লালনের ভেক বা খেলকা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের অনুমোদিত ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর আসেনি কোন মৌলবী বা পুরোহিত; হয়নি কোন ধর্মীয় শ্রাদ্ধশান্তি। জীবন দিয়ে আচারমূলক ধর্মকে প্রত্যাখ্যানের এ ধরনের দৃষ্টান্ত সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর।

তখনকার সমাজভাবনা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ ছিল। হিন্দুরা হিন্দুধর্ম ও সমাজকে এবং মুসলমান ইসলাম ও মুসলমান সমাজকে সমালোচনা করত। লালনপন্থীগণ এই সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য সবলে অস্বীকার করে সর্বধর্মের ও প্রথার নির্ভীক সমালোচনা করে সর্বজাতির মানুষের জন্য একই প্রকার জীবন ও আচার নির্দিষ্ট করেছেন। এভাবেই লালন সাম্প্রদায়িক বৃত্ত ভেঙেছেন।

চৈতন্যদেবের আন্দোলনে সর্বধর্মের মিলন ঘটেছিল। যবন হরিদাস সেখানে শ্রদ্ধেয়; জামালকে বৈরাগ্য দেন মহাপ্রভু; চণ্ডালকে করেন আলিঙ্গন; যবন দবীর খাস স্থান পায় ষড়গোস্বামীর মধ্যে। লালন স্মরণ করেছেন কবীর ও রামদাসের জাতপাতবিরোধী আন্দোলন। কিন্তু চৈতন্য, কবীর ও রামদাসের অনুসারীগণ লালনের কালে সম্প্রদায়বিশেষে পরিণত হয়ে আচারসর্বস্বতায় নিমজ্জিত হয়েছিল। তাই সম্প্রদায়ের নায়কদের মূল্যবোধকে লালন স্মরণ করেছেন, সম্প্রদায়কে পাশ কাটিয়ে।

শাস্ত্র বা ঈশ্বরকে দিয়ে জাতিভেদ ও সম্প্রদায়গঠন সমর্থিত হয়েছে ঋক্‌বেদের পুরুষসুক্তে, গীতায় এবং বহু শাস্ত্রগ্রন্থে। লালন, দুদ্দু জাতিভেদের ঐশ্বরিক সমর্থনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। দুদ্দু বলেছেন যে-ঈশ্বর জাতিভেদ সৃষ্টি করেন তিনি 'খান্নান শয়তান'।[১০৩]

সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদী শিল্পী লালন নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান; মোগল বা হানাফী; শাক্ত, বৈষ্ণব, কলু, জোলা প্রভৃতি প্রচলিত ধর্ম-আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত করাতে রাজী হননি। এগুলি অগ্রাহ্য করে তিনি উত্তরকালকে প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি মূর্তিপূজা, দেব-দ্বিজ-গোভক্তি, ভাগ্যগণনা, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। গানের অস্ত্র দিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন জাতের নামে বজ্জাতির বিরুদ্ধে; ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে; কুসংস্কার ও সর্বপ্রকার বিভেদমূলক অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। হিংসা ও দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধ-শক্তি হচ্ছে প্রেম। প্রেম মানুষকে মিলিত করে। এই প্রেমভাবনা লালনের দর্শনের মূলমন্ত্র। তাঁর সাধনার মূলে মানুষ; বিশ্বাসের মূলে মানুষ; মানুষ তাঁর ভুবনের কেন্দ্রে। মানুষের পক্ষে যা হিতকর তা লালনের ধর্ম, আর যা অহিতকর তাই অধর্ম বা পাপ। অসাধারণ সামাজিক দায়বদ্ধতা লালনের। লালনের মনের মানুষ সাঁই, এই বাস্তব মানুষে মিশে থাকে। আরশীনগরের পড়শীর অবিকল মানুষেরি মতো হস্ত, পদ, স্কন্ধ, মাথা, নাই বা নাভি। তিনি দ্বিপদ, দ্বিভুজ। দৃষ্টির আচ্ছন্নতায় আমরা দেখতে পাই না এ মানুষে সে মানুষকে; জীবে শিবকে; মানুষে আদ্যাপি ক্রীড়ারত শ্যামরায়কে, আদমে আল্লাকে। অসীম আর্তি লালনের, "আমি একদিনো না দেখিলাম তারে।"

আমাদের সাম্প্রদায়িক রক্তে ভেজা; জাতপাতের দ্বন্দ্বে শতচ্ছিন্ন সমাজে, মানুষের লাঞ্ছনা ও দুর্দশায়—লালন এক উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্র।

তথ্যসূত্র

(১) 'ভেকের গাহান' শিরোনামে পদ পাই আলোচ্য খাতায় (২৫১), এটি যেহেতু লালনের মূল খাতার অনুলিপি, সুতরাং লালনের রচনায় পদটিতে শিরোনাম ছিল ধরা যায়। জাত-বৈষ্ণবদের কৈশোরে বা বিবাহের পূর্বে 'ভেকগ্রহণ' এক প্রথা। গৃহস্থ হিন্দুদের যে-কেউ একক বা যুগলে 'ভেকগ্রহণ' করে বৈষ্ণব হয়। তাদের নতুন নাম, বেশ, গোত্র (অচ্যুতানন্দ) এবং কর্ম ও গৃহত্যাগ করে ভিক্ষাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। সামাজিক 'দশকর্মে' এরা অংশ নেয় না। 'ভেকগ্রহণ' অনুষ্ঠানে নানাবিধ প্রথা ও গান প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব 'ভেকগ্রহণ' অনুষ্ঠানের অনুসরণে লালন শাহের মাজারে এখনও অনেক ভেক নেয়। আবুল আহসান চৌধুরী, 'লালন শাহ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এরকম 'ভেক' গ্রহণের ছবি ও তথ্যাদি সন্নিবেশিত করেছেন (১৯৯২, পৃ. ৫৮-৬০)। চালচিত্র : বাংলাদেশের বাউলদের, দেশ ১৮/১/১৩৯৮, নিবন্ধে বিষয়টি আলোচিত। কিন্তু নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী জেলায় 'বেষ' বা খেলকা-গ্রহণের ইসলামিক ঐতিহ্য অনেকে অনুসরণ করেন। খেলকাধারীর কাছ থেকে 'শিক্ষার' ও সাধনার 'উন্নত' পর্যায়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষ 'মারফতী বেষ' গ্রহণ করে। সমবেত সাধকেরা 'বেষ' গ্রহণকারীর জন্য 'জানাজা' বা মৃতের জন্য নির্দিষ্ট নামাজ পড়ে এবং মৃতের জন্য তিন বা পাঁচপ্রস্থ নির্দিষ্ট পোষাক তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। গৃহ এবং বৃত্তি ত্যাগ করে নতুন বেশধারী। মুর্শিদাবাদের সমশের ফকির (নতুনগ্রাম, বহরমপুর) এবং নদীয়ার রহিম ফকির (নাটনা, করিমপুর) এ ধরনের খেলকাধারী। লালনের পদে ইসলামী খেলকা-গ্রহণ বর্ণিত হয়েছে। লৌকিক ইসলামী সমাজ খেলকাধারীকে সম্মান করে।

(২) মনসুরউদ্দীন, হারামণি, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০।

(৩) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ ৩১৫, পৃ.৭৫৭।

(৪) এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন শাহ—জীবন ও গান, পৃ.৫৯

আবুল আহসান চৌধুরী, লালন শাহ, পৃ. ১০-১১।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, ভূমিকা।

(৫) সংস্কৃতায়নের প্রভাবে উত্তরকালে দুজনের উপরেই ব্রাহ্মণত্ব আরোপিত হয়েছে। অশ্বিনীকুমার দত্ত 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় বৈষ্ণবধর্মকে গৌরাঙ্গ এবং যবন হরিদাসের সম্মিলিত প্রবর্তিত ধর্ম বলেছেন। শঙ্করনাথ রায়, ভারতের সাধক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৯৮।

(৬) গোঁসাই গোপালের ঐতিহ্যের গুরু গুরুপদ গোস্বামী (কুমরী, করিমপুর, নদীয়া)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

(৭) স্বরূপ দামোদরের কড়চা, পৃ. ১২. আসল ও বড় ভেকাশ্রিত তত্ত্ব, পৃ. ৪। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ. পৃ.২৮৫।

(৮) হিমাদ্রি, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩।

(৯) শঙ্করনাথ রায় ভারতের সাধক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫-৩০৬।

(১০) If circumcision makes you a Muslim.
What do you call your Women?
If putting on the thread makes you Brahman
What does the wife put on? Sabda-84
The sants. p. 150. কিন্তু আরবে, আফ্রিকার বহু অংশে নারীদেরও হয় সুন্নত।

(১১) লালন শাহ্—জীবন ও গান, পৃ. ৬৭-৬৮।

(১২) লালন শাহ্—জীবন ও গান, পৃ. ২০ (ক)।

গানটির দুকলি উদ্ধৃত করেছেন বসন্তকুমার পাল, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩২, পৃ. ৫০১।

(১৩) দুদ্দু শাহ্ বিরচিত লালনজীবনীর কথা সর্বপ্রথম প্রচার করেন লতীফ আফী আনহু। তিনি এটি নবদ্বীপের নিকটবর্তী চর ব্রহ্মনগর-নিবাসী রামভদ্র মণ্ডলের কাছ থকে সংগ্রহ করেছেন বলে জানান। ১৩৭১-এ পুঁথিটি হস্তান্তরিত হয় লুৎফর রহমানের কাছে এবং ১৩৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য' পত্রিকায় পুঁথিটি প্রকাশিত হয়। লালন শাহ্—জীবন ও গান পৃ. ১৭৫।

পুঁথিটির মূল লিপির অভাবে এবং নানাবিধ তথ্যবিকৃতির জন্য আবুল আহসান চৌধুরী, এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন, আহাম্মদ শরীফ এবং আরো অনেকে এটিকে জাল মনে করেন। অন্যপক্ষে পুঁথিটি প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেছেন মুহম্মদ আবু তালিব, খোন্দকার রিয়াজুল হক প্রমুখ।

(১৪) সমাজপতিদের ভয়ে, লালনের মা ও স্ত্রী লালনকে গ্রহণ করেননি। বসন্তকুমার পাল, প্রবাসী, ১৩৩২, পৃ. ৫০১-৫০২

বাউল ধ্বংস ফৎওয়াতে (২য় খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬) মন্তব্য করা হয়েছে, 'তিনি (লালন) কেবল মোছলমানের হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়াই, হিন্দু সমাজ তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল।

চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য, ২৫ পরিচ্ছেদ) মুসলমানের করোয়ায় জলপানের অপরাধে, সুবুদ্ধি রায়ের দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে। কাশীর পণ্ডিতগণ এ 'অপরাধের' জন্য তাকে তপ্ত ঘৃত খেয়ে প্রাণত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল। চৈতন্যের কথায় তিনি বৈষ্ণব হয়ে বৃন্দাবনে চলে যান।

বসন্তকুমার এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার লালনশিষ্যের প্রচারবিমুখতা এবং গুরুকে নিয়ে কল্পকাহিনী কথনে অনাগ্রহের উল্লেখ করেছেন। তাঁরা লালনের অতিলৌকিক, 'হাগিওগ্রাফি' চালু করেননি। দুদ্দুর তথাকথিত লালনজীবনীতে লালনের অলৌকিক ক্ষমতা এবং যৌনদক্ষতা বর্ণিত হয়েছে।

দুদ্দু শাহ শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। তিনি গানের বাহাস করতে গিয়েই লালনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লালন এবং লালনশিষ্যেরা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তথ্যসূত্র—ফকির আবদুল ওয়াহাব, সং শ্যামপুর, আজিদাবাদ, মেহেরপুর, বাংলাদেশ।

(১৫) চৈতন্য চরিতামৃত , মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ।

(১৬) মুন্সী এমদাদ আলীর 'রদ্দে নাড়া' (অপ্রকাশিত, ১৩২৪); রেয়াজুদ্দীন আহাম্মদের 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' (১৩৩২, ১৩৩৩, দুখণ্ড); মৌলানা আক্রাম খাঁর 'মোছলেম বঙ্গের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থে লালন-বিরোধিতার তথ্যাদি আছে। আবুল আহসান চৌধুরী এবং এস. এম. লুৎফর রহমান বিস্তৃতভাবে লালনবিরোধী গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন।

(১৭) এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যাদি পাই এস. এম লুৎফর রহমানের 'লালন শাহ—জীবন ও গান' এবং খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, 'লালন সাহিত্য ও দর্শন' গ্রন্থের নিবন্ধগুলিতে।

(১৮) চৈতন্য চরিতামৃতে সহজ সাধনা অব্যাখ্যাত থাকায় এ গ্রন্থ লিখেছেন কৃষ্ণদাস, এমন ভূমিকা পাই পুঁথির সূচনায়। এ পুঁথি সহজ সাধনার গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ। (নিজস্ব সংগ্রহ)

(১৯) পদ নং ৭৯; ভেক ফকিরী নিয়ে রচিত পদ ২০৭, ২৫১, ২৭১।

(২০) 'বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই' পদ নং ৩৭৯, বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৮১১।

(২১) গুরুপদ গোস্বামীর (পূর্বোক্ত) মতে কালাচাঁদীদের ৩৬ টি শাখা। এদের অন্যতম প্রধান শাখা চিন্তামণির ঘরের বর্তমান কেন্দ্র নবদ্বীপ। গোঁসাই গোপালের অনুগামীদের অন্যতম কেন্দ্র পায়রাডাঙা (নদীয়া)। মদনমোহন দাস ব্রহ্মচারীর 'সহজীয়া দলনে' (১ম খণ্ড) কিশোরী-ভজনা গোষ্ঠীর বিরোধী আন্দোলনের তথ্যাদি আছে।

(২২) সোহাগী গোষ্ঠীর প্রবর্তক মুসা সোহাগ। লালনগীতিকার ৪৪৩ নং পদে সোহাগীদের উল্লেখ আছে। আলোচ্য খাতার ২৫৭ নং পদে শিষ্য বলাইকে লালন নক্সাবন্দী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়াও পদ নং ৪৫, ২৬৪ দ্রষ্টব্য।

(২৩) 'যিনি আকৃতি, অনাচার, কুকাম এবং চক্ষু প্রভৃতির বিষয়পথ হইতে পৃথক সেই ঈশ্বরের নাম নিরঞ্জন।'

'নির্গত আকারাৎ সঃ নিরাকার'—দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থ প্রকাশ, পৃ. ২৩।

(২৪) লোকমান ফকিরের (পাড়দেয়ার, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ) নিকট থেকে সংগৃহীত পদটি।

(২৫) নবাব হোসেন শাহের প্রথম জীবনের প্রভু এবং উত্তর-জীবনের কর্মচারী সুবুদ্ধি রায় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৃন্দাবনে চলে যান। (সামাজিক অপরাধহেতু) বৈষ্ণব হয়ে দূর দেশে চলে যাবার নির্দেশ থাকে ভেকগ্রহণের আচারে "যদি লইবে বেশ, যাইও যেথা না থাকে কুটুম্বের লেশ"। খেলকা বা ভেকগ্রহণের জাত, ধর্ম লুপ্ত হয়ে ব্যক্তিবিশেষ সমাজের বাইরে গণিত হয়। বৌদ্ধ যুগে এদের 'সামান্য' বলা হতো। ভিক্ষুব্রত গ্রহণের ছায়া আছে 'ভেক' শব্দে ও অনুষ্ঠানে।

যবন-স্পর্শদোষে জাতিচ্যুত মানুষদের মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় দিতেন—রূপ-সনাতন এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। ফলত হিন্দু সমাজের মানুষদের ইসলামে আশ্রয় নেয়া কমে যায়।

(২৬) তার সেবা ছাড়ি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম নহে কৈল আমি নির্জধর্ম নাশ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥
চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৫ পরিচ্ছেদ।

(২৭) ভেক ও ভেকতত্ত্বের আলোচনা আছে ২০৭, ২৫১, ২৭১ এবং ৩৩৫ নং পদে।

(২৮) হস্তলিখিত, 'মীরাবাঈর কড়চা'-এর একাধিক পাঠান্তর বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। আমার সংগৃহীত বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থে (বস্তুতত্ত্ব কড়চা, পীত সন্দর্ভ, অদ্বৈত কড়চা, নৃলোকসার চিন্তামণি) মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, ষড়গোস্বামী, অষ্ট কবিরাজ এবং ৬৪ মহান্তের নিম্নবর্গের পরকীয়া নায়িকার সঙ্গে গুপ্ত সাধনার বিবরণ আছে।

(২৯) পদটির পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা ১৯০।

আলোচনায় বন্ধনীভুক্ত পদসংখ্যাগুলি ভোলাই-এর খাতার। ক্রমিক সংখ্যার মধ্যবর্তী অচিহ্নিত পদকে পূর্ব সংখ্যার 'খ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে—যেমন ১৮ (খ) ইত্যাদি। বিপর্যস্ত ক্রমকে ৭৬/৭৮ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে পাণ্ডুলিপি অনুসারে। সংখ্যাহীন পদ শেষে বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(৩০) বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ ৩৯৪, পৃ. ৮২১।

(৩১) হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩২২, পৃ. ৩৯১) পত্রিকায় 'হুকার গান' প্রকাশ করেন। কোন গীতি-সংকলনে এটি স্থান পায়নি।

শিলাইদহে গোঁসাই গোপালের ঐতিহ্যে হুকা ও তামাক ব্যবহৃত হয়।
সরোবরে আসন করে রয়েছে আনন্দময়
ও তার জীবন শূন্য সদাই মান্য স্বয়ং ব্রহ্ম তার মাথায় (দেখ)।
চক্ষু আছে নাহি দেখে, তিন মড়া একত্রে থাকে,
মুখ দিয়ে সে পরের মুখে মর্মের কথা কয় ;
ওরে একে মরা নাই তার জীবন, ও তার পেটের মধ্যে জ্যান্ত একজন,
সাধকেতে সাধে যখন ডাকলে মরা কথা কয় (দেখ)।
করছে লীলা ভবের পরে দেবের দেব পুজছেন যারে,
পদ নাই সে চলে ফেরে রসিকের সভায় ;
ওরে, সবে মজে সেই পীরিতে বিলাচ্ছে প্রেম হাতে হাতে
লালন বলে সেই পীরিতে মজেছে সব আপন ইচ্ছায়॥

নদীয়া জেলার কোথাও কোথাও ব্রহ্মা, অগ্নিভয় নিবারণের জন্য পূজিত হয়। তাই ব্রহ্মা এবং অগ্নি একাত্ম।

(৩২) চৈতন্যদাসের বিতর্কিত 'চৈতন্য কারিকা'-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়টি মুদ্রিত করেছেন মদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, সহজিয়া দলন, (২য় খণ্ড) গ্রন্থে। এখানে রূপ কবিরাজ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আছে ; পৃ. ১৮-২৩। হরিদাস দাস বৈষ্ণব অভিধানে রূপ কবিরাজের নাম বর্জন করেছেন।

তথ্যসূত্র : গুরুপদ গোস্বামী, পূর্বোক্ত।

(৩৩) বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৫৪৩।

(৩৪) পদ নং ১২৯, ১৪২, ১৭০, ১৮০, ১৮৬, ১৮৯, ১৯১, ২০০, ২৫২ দ্রষ্টব্য। সুনীল সেন, পাবনার নীল বিদ্রোহে এবং কৃষক বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের নিবিড় ঐক্যকে বর্ণনা করেছেন।

জমিদারদের প্রজাপীড়নের সরেজমিন তদন্তে এসেছিলেন জর্জ কাম্বেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরেজ আমলা। এ বিষয়ে পাবনার জেলাশাসকের মন্তব্য : 'There is hardly a portion of the district from which ryots have come in filed petitions praying for protection aganist Zamindars'–Peasant movements in India. P 13-16.

(৩৫) পদ নং ১৩৭, ১৪১, ১৫৩, ১৫৪ দ্রষ্টব্য।

(৩৬) বিষে বিষক্ষয় হয়—এটি একটি লোকবিশ্বাস। সর্পবিষের রং গাঢ় শুক্রের মতো। নদীয়ার করিমপুর থানার হোগোলবেড়িয়া গ্রামের বাদল ফকির বিখ্যাত সর্পবিদ্ ওঝা। তিনি সাপের বিষ খেয়ে নেশা করেন। গাঁজা আফিং-এর চাইতেও এ নেশা তার প্রিয়।

(৩৭) মৃত্যু ও পরলোক নিয়ে নচিকেতার সময়কাল অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকে সামাজিক বিতর্ক চলছে লালনের যুগ অবধি। ৯৭ নং পদে শরীয়ত, মারফত, কোরাণ এবং পরলোক নিয়ে সামাজিক মতভেদের তথ্য আছে।

(৩৮) R. S. Khare. The Untouchable as himself : ideology, identity and pragmatism among the Lucknow chamars. PP.5.

(৩৯) বৈষ্ণব পদাবলী, ১ম খণ্ড, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ-৫৬।

(৪০) লালন শাহ্—জীবন ও গান, পৃ. ৬৪-৬৭। লুৎফর রহমানের তথ্যপ্রদানকারীদের কেউ লালনকে দেখেননি, ছেউড়িয়া আখড়ার বাসিন্দা নন তাঁরা, নন লালন-পরিজনদের উত্তরপুরুষ। তাঁদের তথ্যসূত্রটিও উল্লিখিত হয়নি।

(৪১) পদ নং ২৪, ৩৭, ৫৬, ৭১, ৯৩, ৯৫, ৯৮, ১০৭, ১৪৮, ১৫৫, ১৮২, ১৮৩ দ্রষ্টব্য।

(৪২) Dr. R. C. Mitra, The decline of Buddhism. P.53.

(৪৩) 'কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সম নহে' চণ্ডীদাসের পদ, বৈষ্ণব পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

(৪৪) কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল। * *

* * *

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। চৈতন্য চরিত্যমৃত, আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।

বস্তুতত্ত্ব কড়চার ৪র্থ অধ্যায় পাই : 'নিজ সুখে কাম, কৃষ্ণ সুখে প্রেম' *

প্রেম হয় কামগত, কামেতে শৃঙ্গার।

'নৃলোকসার চিন্তামণি'তে শুনি :

কাম গায়ত্রী কৃষ্ণ দীক্ষা কামের আশ্রয়। *

* *

গোপীকার প্রেমভাব কাম রূপায়ণ

কামরূপা কহি তার স্বরূপ লক্ষণ (৩য় প্রকরণ)॥
* *
সর্ব চিত্ত আকর্ষক কাম * *
কামানুগা হৈয়া পাই ব্রজেন্দ্র নন্দন (১২ প্রকরণ)॥
'স্বরূপ কল্পতরু'-তে বর্ণিত আছে :
'কাম হৈতে প্রেম হয় না জানে মরম' (২য় অধ্যায়)
'ভাষ রত্নাবলী'-তে পাই : 'সহজ মানুষ হয় কামের সাধনে'।
'সহজামৃতে' আছে—'কামী জনার সাধন নহে পীরিতি ভজন'।
রাজক্ষ্যাপার গানে পাই—
'কাম পূর্ণ হয় মহাকামে, সাধনে জন্মিবে প্রেম'।

দুদ্দু শাহ বলেছেন যে সাধনায়, 'স্বীয় কামে দিয়ে ফাঁসি' (বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ নং ৩৮১)। লালনের ৫৬, ১৫৫ নং পদে কাম ও প্রেমের সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

(৪৫) দুদ্দুর মতে 'টল অটল ছাড়িয়া সাধন রসিকে হয় নিরূপণ' (বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ ৩৮৩)। অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন, 'অটল সেও তো আত্মসুখের কারণ' (নিজস্ব সংগ্রহ)।

ভাষ রত্নাবলীর মতে ইড়া নাড়ি কামের দ্বার, সুষুম্না প্রেমের পথ। আস্য মৈথুনাদি প্রেমশৃঙ্গার।

সহজামৃত ও লবঙ্গচরিত পুঁথিতে দেহে কাম ও প্রেমসরোবরকে পৃথক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে ; কাম ও প্রেমের বিলাসস্থানও স্বতন্ত্র।

আদ্যসার ১৬ কলাচূর্ণ এবং বৃহদ্‌নিগম গ্রন্থে, নায়িকা আশ্রয় করে রসাদি গ্রহণের সাধনা এবং অটল বস্তুরক্ষার সাধনাকে পৃথক বলা হয়েছে (১ম অঙ্ক)।

অটলসাধক কৃষ্ণের রস-আস্বাদনের সাধনা অপূর্ণ থাকায় তিনি গৌরাঙ্গ হয়েছেন (আদ্য কৌমুদী)। রাইদেহে রসপান হচ্ছে তার প্রেমসাধনা (নৃলোকসার চিন্তামণি, ১০ম প্রকরণ)।

উল্লিখিত পুঁথিগুলি লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ।

(৪৬) চৈতন্য চরিতামৃতে শৃঙ্গার-রসরাজ কৃষ্ণের বর্ণনা এরূপ—
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥
* *
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত।
আর, প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥
(মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ)

স্বরূপ কল্পতরুতে পাই, 'প্রেম রাধা, কাম কৃষ্ণ—ইহারই পীরিত যার প্রেম নাম কহি' (৩য় অধ্যায়)। লালনের ১৮২ নং পদে একই বক্তব্য পাই।

অপূর্ণকাম কৃষ্ণকে তিনি তৃপ্ত করান—
"কৃষ্ণকে করান শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম॥ (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ৮ম পরিচ্ছেদ)।

(৪৭) শিবায়ন, মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে ; ভারতচন্দ্রের, 'অন্নদামঙ্গলে' শিবের পরনারী-লোলুপতার তথ্য আছে।

'যঃ কৌমার হর স এব হি বরস্তা'—শ্লোকটি কাব্যপ্রকাশ (১/৪) থেকে গৃহীত। চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ ; অন্ত, ১ম পরিচ্ছেদ) সব্যাখ্যা শ্লোকটির আলোচনায় তির্যকভাবে পরকীয়া প্রেমের উল্লাস ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে।

(৪৮) 'মীরাবাঈর কড়চা' এবং 'বস্তুতত্ত্ব কড়চা'য় পরকীয়া তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। পীত সন্দর্ভ, অদ্বৈত কড়চা, নৃলোকসার চিন্তামণি প্রভৃতি পুঁথিতে বৈষ্ণব মহাজনদের সাধনসঙ্গিনীদের নাম পাওয়া যায়। যেমন মহাপ্রভুর সাধনসঙ্গিনী শাঠি-কন্যা, নিত্যানন্দের জাহ্নবা, অদ্বৈতের শ্যামলা, শ্রীরূপের মীরা, সনাতনের লক্ষহীরা, রঘুভট্টের তিরাবাঈ, জীবের কিবাঈ, গোপাল ভট্টের রমণীবাঈ, লোকনাথের মালাকার-কন্যা, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্যামলা, নরোত্তমের চন্দ্রামুখী, শ্রীনিবাসের শ্যামদাস-পত্নী প্রভৃতি। এছাড়া পঞ্চ বা নবরসিকদের সাধনসঙ্গিনীদের নাম হলো—বিল্বমঙ্গল-চিন্তা, জয়দেব-পদ্মাবতী, বিদ্যাপতি লছিমা, চণ্ডীদাস-রামী, রায়শেখর-ছায়া প্রভৃতি।
তথ্যসূত্র : শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, পাঁচ রমণী রসিকবাউলের প্রেমকথা, দেশ, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭, কলকাতা।
(৪৯) নৃলোকসার চিন্তামণি, ১১শ প্রকরণ, নিজভাবে কৃষ্ণভাব বর্ণন।
(৫০) অদ্বৈত কড়চা, মীরাবাঈর কড়চা।

স্বরূপ কল্পতরুর শেষ অধ্যায়ে কৃষ্ণের প্রেমসাধনার বর্ণনায় পাই—'নরবপু হৈয়া করে নারীর সেবন'।

মীরাবাঈর কড়চার গোপীরা গুরুমন্ত্রে কৃষ্ণকে দীক্ষা দিয়ে প্রেমসাধনায় নিযুক্ত করেছেন। এ গ্রন্থে, গর্ভযন্ত্রণায় নারীর বিড়ম্বনা স্মরণ করে চৈতন্যদেব সন্তানহীন দেহমিলন পদ্ধতিতে এবং সেবাপূজায় নারীর ঋণ শোধ করতে বলেছেন।

বৈষ্ণব কামগায়ত্রী জপ শুরু হয় নারীর চরণ থেকে। নরোত্তমবিরচিত সেবাবিধান পুঁথিতে নারী ও গুরুসেবার বিধান অলোচিত হয়েছে। 'লবঙ্গচরিত' পুঁথি সাধনায় একনিষ্ঠা আবশ্যক মনে করেছে—

'একের সঙ্গেতে প্রণয় করিবে। তবে আত্মা রামেশ্বর বুঝিতে পারিবে।।
দ্বিতীয়ের সঙ্গ হৈলে কর্ম নষ্ট হয়।।

মীরাবাঈর কড়চায় সাধনায় একনিষ্ঠার প্রয়োজন বর্ণিত হয়েছে। লালন সাধনায় 'পাত্রনিষ্ঠা'কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

(৫১) পুরুষতান্ত্রিক সন্ন্যাসের দৃষ্টিতে নারী-প্রাধান্যমূলক ভাবনা নিন্দার্হ। নারীমহিমা প্রচারকদের বিদ্রূপ করে বিবেকানন্দের মন্তব্য, "* * এই নারীগণ অর্ধাশনপীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে। আর তাহারও বলিতেছে, 'মহিলাগণ, আপনারাই জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব'। তখন আবার ঐ রমণীগণ এই প্রচারকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে, 'ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক'। আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে। এইরূপে জগৎ চলিতেছে ; কিন্তু জীবনটা তো এইরূপ তামাসা নয়।" বিবেকানন্দ রচনাবলী, ১ম খণ্ড (ভাগ), পৃ. ১০৬।

ভারতীয় সন্ন্যাসে 'কামিনী' সতত নিন্দনীয় বিষয়। রামকৃষ্ণদেব 'কামিনী কাঞ্চনের' বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে, তরুণ শিষ্যদের নারীসঙ্গ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করতেন। চৈতন্যদেবও সাধনার্থীর নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মন্তব্য করেছেন :

'প্রভু কহে সন্ন্যাসী হৈয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন'।।
চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

এজন্য কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।
(৫২) কর্মফল মানুষের ভাগ্য গঠন করে এবং নিয়তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এ ঔপনিষদিক ধারণা মহাভারতাদিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের শাপ, মৃত্যু, ভাগ্য এবং কর্মপ্রসঙ্গে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী গৌতমীর পুত্রের মৃত্যুর গল্পটি স্মরণীয় (XIII, I)। পুরাণবিদ গল্পটির সারমর্ম বর্ণনায় মন্তব্য করছেন, "...man attains only that fate which has prepared for himself by his action"–Indian literature. Vol.I.part II. P. 362.

লালনের 'সকলি কপালে করে' (পদ নং ৩১০, ৩৪৯) পদটি নিয়তির অনিবার্যতার কথা বলেছে। এর উত্তর পাই দুদ্দুর 'কপালের দোষ কেন দাও ভাই' (বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ নং ২৯৮, পৃ. ৮২৩) পদটিতে। এখানে কর্মদ্বারা ভাগ্যগঠনের তত্ত্ব আছে।

(৫৩) Ancient Indian social history, pp.63.

(৫৪) শিষ্ট বৈষ্ণবতত্ত্বে শ্রীরূপ গোস্বামী রূপমঞ্জরী। তিনি মহাপ্রভুর সাধনতত্ত্বের ভাণ্ডারী এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থকার। এছাড়াও রূপমঞ্জরী শব্দার্থের গূঢ় আভিপ্রায়িক অর্থ আছে।

কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের পরম্পরায় প্রতিবাদী বৈষ্ণবনেতা রূপ কবিরাজের নাম পাই গুরুতালিকায় এবং তিনিই রূপমঞ্জরী হিসাবে গৃহীত হন। তাঁর আনুগত্যে বা প্রদর্শিত পথেই রাধা-কৃষ্ণ লভ্য বলে তাঁর অনুগামীবৃন্দ বিশ্বাস করে।

বিধিমার্গের বৈষ্ণবেরা চারচন্দ্রভেদাদি সাধনার সঙ্গে যুক্ত রূপ কবিরাজকে নিন্দা করে এবং 'রূপমঞ্জরী' শব্দটিকে বিকৃত করার দায়ে অভিযুক্ত করে তাঁকে। সহজিয়া দলন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮-২৩।

(৫৫) They called themselves Vaishnabs, but they do not believe in Visnu or Krisna or his incarnation. They believe in Deha.

Lokayata, studies in the history of Indian Philosophy. Vol. II. edited by D. P. Chattopadhaya. p.3.

(৫৬) এখানে করোয়াধারী বাউল/ফকিরের চিত্র ফুটে উঠেছে। হাতের করোয়া মূলত রসসাধকের চিহ্ন।

শাস্ত্রীয় তিনবাঞ্ছা হলো (১) রাধার প্রেমমহিমা, (২) রাধা কর্তৃক আস্বাদিত কৃষ্ণমাধুর্যের স্বরূপ, (৩) মিলনজাত রাধানন্দের তাৎপর্য—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

(৫৭) চৈতন্য চরিতামৃতে পাই, 'নাম হৈতে হয় সব জগৎ উদ্ধার' (আদি, ১৭শ পরিচ্ছেদ)।

বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, 'কলিযুগে কর্ম হয় হরি সঙ্কীর্ত্তন।

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।

* * কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার।

* * *

কলিযুগে সর্ব যজ্ঞ হরি সঙ্কীর্ত্তন।

* * *

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম পালিবারে
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব পরিকরে।।

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

(৫৮) চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) বাসুদেব সার্বভৌম একদা চৈতন্যভক্তদের, কলিতে বিষ্ণুর অবতার না-থাকার কথা বলেছেন। এর বিরুদ্ধ-প্রমাণ হিসাবে ভক্তগণ ভাগবত এবং মহাভারত ব্যবহার করেছেন।

হজরত মহাম্মদকে যেভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা নবী প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, তদ্রূপ চৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য বৃন্দাবনদাস, রূপ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, স্বরূপ দামোদর বিপুল পরিশ্রম ও মনীষা ব্যয় করেছেন।

(৫৯) শাস্ত্রপ্রমাণ নয়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ—প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদের এ সিদ্ধান্ত লালন ও অন্যান্য বাউল মহাজন অনুসরণ করেছেন। লেখকের, 'বাউল দর্শনে ভারতীয় বস্তুবাদের উপাদান' (অনীক, ডিসেম্বর ১৯৮৫ ; জানুয়ারি ১৯৮৬) নিবন্ধে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(৬০) লালন, রসরাজ চৈতন্যতত্ত্ব প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছেন এবং লালনের চিন্তার শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব গৃহীত হয়নি বলে ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা ১৩৯৭।

লালনের সমকালে চৈতন্য চরিতামৃত লোকসমাজে বেদের মতো প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থের বহুল প্রভাব আছে লালনে। চৈতন্য চরিতামৃতে রসরাজতত্ত্ব আছে (মধ্য/৮ম)। আর লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবতার যুগ্ম প্রভাব আছে লালনে।

(৬১) Louis Dumont : World renunciation in Indian religions, contribution to Indian Sociology. 1960.

Richards Burghart : Hierarchical Models of the Hindu Social system, Man (London). 1978.

Romila Thapar. Ancient Indian social history, pp. 62. Ancient history and the modern search for a Hindu identity. Modern Asian studies, 23.2.1989. u.k.

R.S. Khare : The Untouchable as himself : ideology identity and pragmatism among the Lucknow chamars.

Way of life : King, householder and renouncer, edited by T.N.Madan.

Householder and wanderer J.C. Heesterman, do, pp. 252.

ভারতচন্দ্রের শিব পরলোকে ভীত নয় ; ভেদ করে না যবনে ব্রাহ্মণে, তাই 'বাতুল'। রুদ্ধ ব্রহ্মচর্য বা যথেচ্ছ জীবাচার তার সাধনা নয়। অন্নদামঙ্গলে শিব গৃহী হয়েও ভিক্ষাজীবি। ঘরে থাকে উমা অথচ শিব যোগী। বিস্তৃত তথ্য, O'Flaherty, pp. 110, 206—দ্রষ্টব্য।

(৬২) শরীয়তুল্লার ফারাজী আন্দোলনে এবং কেরামত আলী জুনপুরীর সংস্কার-আন্দোলনে বাউল-ফকিরদের বাদ্যযন্ত্র ও গানে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেয়া হতো। দুধু মিঞা বাউল গানের বিরোধী ছিলেন। লালনের সমকালে বা ঈষৎ পরে বহু বাউলবিরোধী গ্রন্থ রচিত হয় এবং সূচিত হয় বাউল ধ্বংস আন্দোলন। আমার বাউল ধ্বংসের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য।

Bengal district Gazetters, Faridpur by L.S.S. O Malley, p 37-46.

জসিমুদ্দীন : মুর্শিদা গান।

মুস্তাফা নুরুল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জনমত, পৃ. ১২০।

ওয়াকিল আহামেদ : উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, পৃ. ৮৩-৮৬।

(৬৩) কানুতত্ত্ব নির্ণয়, পৃ. ১২৫।

(৬৪) সেকালে সাকার-নিরাকার উপাসনা নিয়ে এক বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ভারতী পত্রিকার লালন-বিষয়ক নিবন্ধে সরলা দেবী লালনকে নিরাকারবাদী সাধক হিসাবে চিহ্নিত করে, লোক-ঐতিহ্যে নিরাকার ব্রাহ্ম উপাসনার সমর্থন খুঁজেছিলেন। রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে লৌকিক সাধকদের তীব্র সমালোচনাকে ব্যবহার করেছিলেন মাদ্রাজের ব্রাহ্ম নেতা কাশী বিশ্বনাথ মুদালিয়র, তাঁর তামিল ভাষার ব্রাহ্ম সমাজ নাটকম্ (১৮৭১) গ্রন্থে। জনৈক চরিত্রের মুখে রক্ষণশীলদের প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ সিভ ভাক্কিয়ারের কয়েকটি কবিতা তিনি ব্যবহার করেছেন। সিভ ভাক্কিয়ার অন্যতম তামিল সিদ্ধা-পদকর্তা। তারও আগে একই উদ্দেশ্যে Henry Martyn Scudder তাঁর Acompanion to native preachers (1865. American Mission. Madras-এ সিদ্ধাদের কবিতা ব্যবহার করেছেন The sants, pp 388) প্রচলিত রক্ষণশীলতার সমালোচনা এবং অসাম্প্রদায়িক এ ঐতিহ্য অনিবার্যভাবেই মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছিল। তামিল সিদ্ধারা সতত শাসকশ্রেণীর ধর্মাচার ও মূল্যবোধের বিরোধী ছিলেন। লালনও জমিদারদের ধর্মবিশ্বাসের অনুবর্তী নন। লালনের বাসভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৮ খ্রী.। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে ধর্মপ্রচারার্থে যেতেন। হরিনাথ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

(৬৫) রবীন্দ্রচিন্তায় মূর্তি এবং স্রষ্টার বহু বিচিত্র রূপ স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর ব্রাহ্ম নিরাকার কল্পনা এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বিশ্বাস থেকে সরে যাবার নেপথ্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে পত্রপুটের ১৫ নং কবিতায়। আর এ পরিবর্তনে লালনগোষ্ঠীর প্রভাব আছে।

(৬৬) তান্ত্রিকগণ, শৈব, শাক্ত, তারা-উপাসক, নাথ-যোগীগণের একাংশ গাঁজা ব্যবহার করেন। এ নেশায় বস্তু হয় গাঢ়, মন হয় একনিষ্ঠ ও উর্ধ্বগামী। তন্ত্রসারে চার প্রকার গাঁজা ও তার সেবনবিধি আলোচিত হয়েছে। তন্ত্রসার পৃ. ৪৯৯, জনৈক সাধক (অমৃতগিরি, কল্যাণপুর, বর্ধমান) গাঁজার মন্ত্র ও মহিমা নিয়ে শ্লোক বলেন : তাম্রকূট মহাদ্রব্য অশ্বমেধ ফলযোগ্যং।

(৬৭) তুলসীকাঠ ও শিকড়, বেলকাঠ, কণ্ঠি, নারকেল-মালা, রুদ্রাক্ষ, কুঁচ, হরিতকী, চন্দন, খেজুর প্রভৃতির বীজ ; নানারকম শুষ্ক ফল ও শিকড় ; পাথর, কাঁচ, পুঁতি ; নর ও পশু-অস্থি এবং দন্ত, ধাতু, রজঃনিষিক্ত বস্ত্র বা তুলা, চারচন্দ্রমিশ্রিত তুলা বা কাপড় প্রভৃতি দিয়ে নানাপ্রকার মালা নির্মিত হয়।

জয়পুর অঞ্চলে নির্মিত হয় নানারকম পাথর দিয়ে তসবী বা 'সোলেমানী' মালা। মালার প্রস্তুত, শোধন, পরিধান, বিসর্জনাদি নিয়ে বহু আচার এবং লৌকিক মন্ত্রাদি আছে।

(৬৮) চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর এবং শ্রীবাস (মতান্তরে নরহরি) বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরের মতে, তত্ত্বভাবনাটি বৌদ্ধতন্ত্র থেকে কবিরাজ গোস্বামী যুগে বৈষ্ণবতায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত পঞ্চবুদ্ধি এবং তাদের শক্তি এর মূলে আছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ, পৃ. ৫৬-৬৩।

মুসলমান সমাজের সাধকেরা নবী, আলি, ফতেমা, হাসান, হোসেনকে নিয়ে পঞ্চজন বা পাঁচ পঞ্জাতন সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চভূতের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বস্তুবাদীরা চারটি মৌলিক ভূতে বিশ্বাস করে এবং উত্তরকালে চারচন্দ্রের পরিকল্পনা এ থেকে জাত হয়। লালন, পঞ্চতত্ত্বের ধারণাটিকে বৈদিক বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমানপন্থী সাধকদের পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত বিলক্ষণ পৃথক বস্তুনির্দেশক।

(৬৯) 'বৈরাগ্য' শব্দটি প্রায় গীতিসংকলনে সংশোধিত হয়েছে 'বৈরাগী' হিসাবে। ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগণ দাস, বৈরাগ্য বা দাস-বৈরাগ্য উপাধি ব্যবহার করেন। জাতবৈষ্ণবগণও একই উপাধি ব্যবহার করেন। দু'দলের গোত্র 'অচ্যুতানন্দ'। পূর্বের জাত, গোত্র উপাধি মুছে দিয়ে এরা প্রাগুক্ত উপাধি ব্যবহার করে।

জাতবৈষ্ণব বা ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগোষ্ঠী নানা বর্ণের পাঁচমিশালী লোক দিয়ে গঠিত হয় এজন্য এদের অনেকে 'পঞ্চ পরিবার' বলে। বিহারীলাল গোস্বামী অবশ্য মনে করেন যে পঞ্চতত্ত্বের পাঁচজন গুরুর বংশধরগণ, গোস্বামী বংশ এবং শিষ্যগণ 'পঞ্চ পরিবার' নামে উল্লিখিত হয়। কানুতত্ত্ব নির্ণয় পৃ. ৭৫।

অনেকে হিন্দু চতুর্বর্ণের বাইরে বৈষ্ণবদের অবস্থান এবং বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত অস্বীকারের সঙ্গে 'পঞ্চম' শব্দটির সম্পর্ক নির্ণয় করতে চান। দক্ষিণ ভারতে রক্ষণশীল শৈব হিন্দুরা, তামিল সিদ্ধাদের 'পঞ্চমস' (Religious Panchamas) বা চারবর্ণের বাইরে অস্পৃশ্য বলে নির্দেশ করে। The Sants. Kailashpathy, pp 389.

(৭০) প্রাচীন ভারতের রস-রসায়নবাদীগণ সিদ্ধির অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে রসায়ন ব্যবহার করতেন। বৈদিক যুগ থেকে সোমরস দ্বারা অজরামর,হবার ধারণা প্রাদুর্ভূত হয়। রসেশ্বর দর্শনে পারদাদি ধাতুর মিশ্রণে দেহকে মৃত্যুহীন করার প্রসঙ্গ পাই। দেহবাদীগণ দেহরসাদি ব্যবহার করে অপক্ক দেহকে পক্ক দেহে পরিণত করতে চায়। চারচন্দ্র ভেদাদি এ পন্থায় অনিবার্য সাধনা। চর্যাপদে রসায়ন সাধনার প্রসঙ্গ আছে। (পদ নং ৪, ১৬, ২২) তাও পন্থায় অনুরূপ সাধনার বিবরণ দিয়েছেন নীডহ্যাম Science and civilisation in china, Vol v, part 5, p-300-305.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর আয়ুর্বেদাচার্য ভারতীয় রসবাদের দ্বিধারা দেখেছেন—বৈদিক ও তান্ত্রিক বিন্দুপ্রকাশে (২য় প্রকাশ, ৪র্থ শ্লোক) আছে—

স্বাত্মানমের প্রকৃতিং পুরুষং বিধায়
বিন্দুর্বিবর্ত্তয়তি যঃ সহজশ্রয়েন।

মাধুর্যকম রমণীয়ক চিত্তমিশ্রং
পশ্যন স এব সততং প্রণয়েন মুগ্ধ ঃ।।

এই দ্বিধাবিভক্ত, ব্রহ্মবিবর্তিত, রজঃবীজের সহজ প্রবাহকে স্বীকার ও সাধারণকারীগণই সহজপন্থী, রসিক, বিবর্তবিলাসী। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে, হিন্দু মুসলমান দু'সমাজে, বৈষ্ণবতায় এদের বাতুল বৈষ্ণব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ফকির, সাঁই, দরবেশদের মধ্যে এ সাধনা আছে। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-৯৯।

(৭১) বাউলদের মুসলমান সমাজভুক্ত মানুষদের অনেকে ফকির বলেন। যেহেতু তারা বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসারী, তাই সাধারণ ফকির থেকে পৃথক করার জন্য 'ন্যাড়ার ফকির' কথাটি প্রচলিত বলে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন। (মাসিক বসুমতী, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৩৭দশ বর্ষ, পৌষ, ১৩৬৫, পৃ. ৪৮১-৪৮৫)। বৌদ্ধ-প্রভাবিত হিন্দু গোষ্ঠীটি ন্যাড়ানেড়ি নামে খ্যাত বলে তাঁর ধারণা।

ফকির বিশেষণটি হিন্দু ও মুসলমান সাধকগণ নির্বিচারে ব্যবহার করেন। তুর্কী এ শব্দটি বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'নিঃস্ব দীনজন' অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'ফকির' মাত্রেই মুসলমান—এ কথা অযথার্থ। নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ বর্ণিত কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠের ফকিরগোষ্ঠী ছিল হিন্দু সমাজভুক্ত (১২দশ ভাগ, পৃ. ৬৫২)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়পাদের অনুগামীদের 'নাড়া' বলেছেন। চৈতন্য ভাগবতে, চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যকে 'ন্যাড়া' বলেছেন (মধ্য, ২য় অধ্যায়)। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' উল্লিখিত কলন্দর গোষ্ঠী সর্বকেশ, এমনকি ভ্রূ পর্যন্ত কামিয়ে ফেলত। রূপ কবিরাজের অনুগামী 'স্পষ্টদায়ক' গোষ্ঠীর মহিলারা কেশ বিসর্জন দিয়ে ক্ষুদ্র শিখা রাখতেন। মুণ্ডিত মস্তক বৈদিক পণ্ডিতও বহু। মুসলমান সমাজভুক্ত বাউল-ফকিরগণ বরং সর্বকেশ রক্ষা করেন। তাই 'ন্যাড়ার ফকির' মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুর স্মৃতিবাহী এ ব্যাখ্যা অতি সরল।

(৭২) আউলিয়াগণ ইসলামী জগতের সিদ্ধ সাধুপুরুষ। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সমাজে লৌকিক 'আউল' ঐতিহ্য আছে (<অকুল, আকুল)। অনুরাগী দাস মোহান্ত ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের 'আউল' বলেছেন (গৌর ভগবান, পৃ. ৭৭)। হরিনাথ মজুমদারের একটি গানে ঘোষপাড়ার উল্লেখ আছে (লেখকের, জাত গেল জাত গেল, সংকলনের ৩৬ সংখ্যক পদ)। লালনের জীবদ্দশায় ঘোষপাড়া কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল কিন্তু তাঁর গানে ঘোষপাড়ায় প্রত্যক্ষ কোন উল্লেখ নাই। নিজে সাধনা না করে গুরুসেবায় আত্ম-উৎসর্গকারী 'কর্তাভজা' পন্থা হয়তো ছিল না তার মনঃপুত। নিজামুদ্দীন প্রসঙ্গে তিনি 'আউলিয়া' শব্দ প্রয়োগ করেছেন (পদ নং ৮৭)। অন্য পদে 'আউল চলন'-এর ফলে প্রাপ্ত ধন হারানোর প্রসঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকারী 'আউল' হিসাবে চিহ্নিত হয়।

(৭৩) লালন গৌরবাদীদের গুরুবিরোধী, দেবপূজক—গৌরাঙ্গপ্রতিমাপূজক, অনুমানপন্থী হিসাবে গণ্য করেছেন। নিত্যানন্দ-নরহরির উদ্যোগে গৌরপূজা শুরু হয় এবং ক্রমে জগন্নাথ বা কৃষ্ণ অপেক্ষা 'সাক্ষ বিগ্রহ' গৌরাঙ্গের গুরুত্ব স্থাপিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি বিষ্ণুমূর্তির মুণ্ড অপসারিত করে সেখানে গৌরাঙ্গের মুখ স্থাপন করা হয়েছে (তথ্যসূত্র ঃ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষক, কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল এবং গবেষক)। অনুরাগী দাস মোহান্ত 'গৌরবাদী'দের ভক্তির লঘুত্বযুক্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বহির্ভূত বিবেচনা করেছেন (গৌর ভগবান, পৃ. ৫৩)। কৃষ্ণের পরিবর্তে গৌরাঙ্গের উপাসনা, নাম ও মন্ত্র নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে প্রবল বিতর্ক দেখা দেয়। বিমান বিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদানে (১৯৫৯, পৃ. ৪৩৫-৪৪৩) প্রসঙ্গটির আলোচনা করেছেন।১৩১৪ এ কাশিমবাজার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন পত্রিকায় 'বৈষ্ণব সাহিত্য' নিবন্ধে রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ গৌরাঙ্গ উপাসনা, দীক্ষার প্রাথমিক প্রাদুর্ভাব দেখেছেন ঢাকা, শ্রীহট্টের নিম্নবর্ণের মধ্যে।

বিষয়টির বিস্তৃত তথ্যের জন্য, গোবর্ধন দাস, গৌরমন্ত্রোপাসনা (৬ ও ৭ তম খণ্ড) ১৯৭১, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, দ্রষ্টব্য।

(৭৪) লালন গীতিকা, পদ নং ৪৪৩।

মুসা সোহাগের অনুগামীরা নারীবেশ ধারণ করে নৃত্য-গীতে সময়াতিপাত করত— এরাই সোহাগী।

প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে নক্সাবন্দী ঐতিহ্য আরব-পারস্যে প্রচলিত ছিল। পরে ইসলামের সঙ্গে এ মতবাদ সামঞ্জস্য স্থাপন করে নেয়। এ মতবাদ 'সরা এবং বেসরা' বিভাগে দ্বিখণ্ডিত হয়। ভারতের সিরহিন্দে শরীয়তপন্থী নক্সাবন্দীয়া ধারাটি প্রবলতা লাভ করে। ঔরঙ্গজীবের সময়ে এ গোষ্ঠী চরম রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। হাণ্টার রাজশাহী-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে প্রাচীন নক্সাবন্দীয়া গোষ্ঠীর অস্তিত্ব চিহ্নিত করেছিলেন।

Bengal District Gezetters : Rajsahi, 1916. p. 65.

এই নাচগানের ঐতিহ্য ছিল আজীবিকদের। আশোকের সমসময়ে বঙ্গদেশে এ মতবাদের প্রাধান্য ছিল। উত্তরকালে আজীবিকগণ লোকায়ত চার্বাকদের সঙ্গে মিশে যায়।

A.L.Basam History and Doctrines of the Ajivikas, pp 117.

(৭৫) মাদারী ফকির এবং মজনু শাহের বর্ণনায় এই 'ঝাণ্ডা' ব্যবহারের উল্লেখ পাই :

সাহেব সুবার মত চলন সুঠাম
আগে চলে ঝাণ্ডাবান বাউল (ঝাউল) নিশান।।

(৭৬) চৈতন্যভাগবত, আদি, ৩য় অধ্যায়।

(৭৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (অখণ্ড সংস্করণ), দিব্যভাব, পৃ. ৩১০।

(৭৮) অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ, পৃ. ৭১।

(৭৯) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

(৮০) মুহম্মদ আবু তালিব, লালন চরিতের উপাদানঃ তথ্য ও সত্য, রিয়াজুল হক সম্পাদিত, লালন সাহিত্য ও দর্শন, পৃ. ৩৬-৩৭।

(৮১) পাঞ্জুশাহ, ইস্কে সাদেকী গওহার, পৃ. ৯-১১।

(৮২) বাংলাদেশের প্রখ্যাত গায়ক প্রয়াত মহেন্দ্র গোস্বামীর নিকট প্রাপ্ত তথ্যানুসারে লিখিত।

(৮৩) 'নিরঞ্জন'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'গোঁসাই' শব্দ মধ্যযুগের বঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যার সাহিত্যে ব্যহহৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

আমাদের পারিবারিক গৃহদেবী (মাটির থান-মূর্তি) ঘর-গোসানী নামে চিহ্নিত হতেন। পারিবারিক শুভকাজে পায়রা বা পাঁঠা-বলি আবশ্যিক ছিল এ থানে (জলপাইগুড়ি জেলায় আমাদের আদি বাড়ি)।

(৮৪) বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ নং ৩৭৯।

এখানে নিত্যানন্দের-দু'ছেলে দু'ধরনের মতবাদ পোষণ করে এবং বীরভদ্র দরবেশী বাউলদের সমীপবর্তী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

হিন্দু অস্পৃশ্যদের গোষ্ঠীভুক্ত করার ব্যাপারে বিভিন্ন লৌকিক উপাসক সম্প্রদায়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং অনেক গোষ্ঠী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন-রামানন্দ সম্প্রদায়, উত্তরকালে মুসলমান সমাজভুক্ত মানুষকে গোষ্ঠীভুক্ত করার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয় এবং যারা জাত, সম্প্রদায় অগ্রাহ্য করে, তারাই বাউল হিসাবে চিহ্নিত হয়। বীরভদ্র সম্ভবত হিন্দু সমাজের বাইরে তাঁর শিষ্য করেছিলেন। বৌদ্ধ এবং মুসলমান সমাজের সঙ্গে ছিল তাঁর সম্পর্ক।

(৮৫) চন্দ্রশেখর সনাতনকে দেখে দরবেশ মনে করেছিলেন—

"তিহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে" (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ)

(৮৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ১৩৩-১৩৪; গৌর ভগবান, পৃ. ৭৪।

সাঁই এবং দরবেশগোষ্ঠীর সাজসজ্জা ও খাদ্যাখাদ্য বিচারে ভিন্নতা আছে। জাত-বৈষ্ণব ছাড়াও অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষকে রাঢ় অঞ্চলে এ সমস্ত গোষ্ঠীগুলিতে আবিষ্কার করা যায়।

(৮৭) লালন গীতিকা, পদ নং ১৩৭।

(৮৮) লালন এবং বাউল গানের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো, 'তুমি আমি'। অহং বা আমি-তত্ত্ব, এ মতে আত্মা/আত্মতত্ত্বরূপে উল্লিখিত হয়। প্রত্যেক মানুষ যেহেতু আল্লা বা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাণ্ড—তাই বহির্বিশ্বের সর্বত্র তিনি নিজেকে প্রসারিত করে, সব কিছুর মূলে 'আমি'কে চিহ্নিত করেন। এই 'আমিত্ব' 'পাকা আমি'। মনসুর হাল্লাজ নিজেকে পরম সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। লালন সেটি স্মরণ করেছেন। নিম্নতম মানহীন মানুষ, এ মতবাদে, কেবল মানুষ পরিচয়ে গৌরবোজ্জ্বল হয়। প্রবল ইহবাদ এবং মানবতাবাধ এ ঘোষণায় কার্যকর। বিশেষত নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্ণের মানুষের, এ মতবাদ, স্বাধীনতার জন্য মর্যাদাময় এক বিদ্রোহ।

লালনের/ অবশ্য দাসভাব। তিনি নিজের জন্য উচ্চ আসন দাবী করেননি।

(৮৯) বাউল দর্শনে ভারতীয় বস্তুবাদের প্রভাব, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য। লালন ক্ষেত্রবিশেষে কোরাণাদি শাস্ত্রকে অস্বীকার না করে অর্থান্তরিত করে গ্রহণ করেছেন এবং এইভাবে প্রচলিত সামাজিক ধর্মের সঙ্গে বাহ্যিক আপোষ করেছেন।

(৯০) বাউল ধ্বংস ফৎওয়া এবং সত্যার্থ প্রকাশে লৌকিক সাধনা ও সাধকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার আহ্বান ছিল। পূর্ববঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে বাউল ধ্বংস আন্দোলন পরিচালিত হয়। লালনের মতবাদীগণ এ আদোলনে পিষ্ট হয়েছিল। আবুল আহ্‌সান চৌধুরীর লালন শাহ গ্রন্থে এ সমস্ত তথ্য আছে। এর ফলে পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে বাউলের সংখ্যা হ্রাস পায় বলে 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' (১৯৩৫) গ্রন্থে এনামুল হক উল্লেখ করেছেন। 'সহজিয়া দলন' গ্রন্থে কালাচাঁদী এবং অন্যান্য লৌকিক বৈষ্ণব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের তথ্য পাই (পূর্বোক্ত) এখনও নানাভাবে এ আন্দোলন চলে। বিস্তৃত আলোচনা আছে আমার 'বাউল ধ্বংসের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে।

(৯১) ভাবসঙ্গীত, পদ সংখ্যা ৫৩৩ (৪ কলির গান)। এখানে ব্যভিচার বিষয়টিও সমাজভেদে আপেক্ষিক প্রমাণিত হয়েছে; খাদ্যাখাদ্য বিচারও দেশাচার মাত্র।

(৯২) জাত গেল জাত গেল বলে, পুস্তিকায় বিভিন্ন পদকর্তার এ ধরনের পদ সঙ্কলিত হয়েছে।

(৯৩) পূর্বোক্ত, জাতাজাতির বিরুদ্ধে দুদ্দুশাহের পদগুলি দ্রষ্টব্য।

(৯৪) ইসলামে সন্ন্যাস সমর্থনীয় না হলেও হজরত মহম্মদের সমকাল থেকে 'আহ্ছাবে সুফ' প্রভৃতি সাধুসঙ্ঘ দৃষ্ট হয়। ফকির-মিসকীনদের দান-খয়রাত করা বা ভিক্ষা দেয়াও মুসলমান সমাজে অচলিত নয়। হুমায়ুন কবীর অবশ্য ইংরেজ রাজত্বেই এ প্রবণতার প্রাদুর্ভাব চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছেন, "Hopes of reward and glory in an after-life were evoked to crowd out the consciousness of bitter defeats in the present"–The Indian Heritage, p. 102. বৈষ্ণব সমাজে বিষ্ণুসন্ন্যাস থেকে পৃথক ভেক-সন্ন্যাস প্রচলিত। হারাধন দাসের মতে (ভেকাশ্রিত তত্ত্ব নিরূপণ গ্রন্থ. পৃ. ১-৩) শূদ্র ও নারীর সন্ন্যাসে অধিকার না থাকায়, নিত্যানন্দের অনুরোধে চৈতন্য ভেকের প্রবর্তন করেন। এদের গোত্র অচ্যুতানন্দ। এরা হিন্দু দশকর্মে অংশ নেয় না। বেদ ব্রাহ্মণ অমান্য করে নিজেরা অব্রাহ্মণ হয়েও বৈষ্ণবানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে। লালনপন্থীদের মধ্যেও বৈষ্ণবীয় ভেক পদ্ধতির প্রভাব আছে। আবুল আহসান চৌধুরী, দেশ ১৮/১/১৯৯২; চালচিত্র : বাংলাদেশের বাউলদের।

(৯৫) "জাত নেই ঠাকুরের, ফকিরের, সাধুর, কুকুরের, বেশ্যার", নিকুগোঁসাই, পাটকেবাড়ি, মুর্শিদাবাদ।

(৯৬) এই বীজরোপণ অনুমানে মন্ত্র দ্বারা, বর্তমানে 'বস্তু' দ্বারা সাধিত হয়। নৃসিংহানন্দের ব্রজরসকল্পে পদ্ধটিতি বর্ণিত আছে।

(৯৭) ১৮টি উপাদানে দেহ গঠিত হয়, "বাপের চার, মায়ের চার, নিরঞ্জনের দশ"।

দশ ইন্দ্রিয় নিরঞ্জন সৃষ্ট, পিতা বা মাতা কারো মতো নয়। পিতার কাছ থেকে সন্তানপায়—হাড়, হাড্ডি (মজ্জা), মণি, মগজ। মাতৃসত্তায় সৃষ্টি হয়—গোস্ত, পোস্ত (চামড়া), লহু (রক্ত), পশম (চুল)। পিতৃসত্তাগুলি আবৃত থাকে মাতৃসত্তা দ্বারা, তাই প্রতি দেহের বাইরে রাধা অন্তঃস্থিত কৃষ্ণসত্তাকে আবরণ দিয়ে রাখে।

(৯৮) সন্ন্যাসগ্রহণের পরে, মহাপ্রভু শচীদেবীকে বলেছেন—

"কাঁদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।।
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে।।
(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

(৯৯) মুর্শিদাবাদ জেলার একটি মাহিষ্য হিন্দু পরিবার (লোচনপুর, রানীনগর) জটিল আর্থ-সামাজিক-জাতিদ্বন্দ্বের ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। পরিবারের বৃদ্ধ পিতামাতা, তাদের বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবক সন্তান ও মেয়েরা, শিশু সকলে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। এই পরিবারের একটি অবিবাহিত যুবকের বিবাহের চেষ্টায় বিশেষ জটিলতা দেখা দিয়েছে। তার 'মুসলমানী' বা 'খৎনা' না হওয়ায় গ্রামীণ কোন মুসলমান পরিবার তাকে মেয়ে দিতে রাজি নয়।

(১০০) বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ ৩৯০, ৪০৬।

(১০১) জাত গেল জাত গেল বলে, পূর্বোক্ত পদ ২৮।

(১০২) বিভিন্ন কোরাস, সাতটি তারার তিমির।

(১০৩) জাত গেল জাত গেল বলে, পূর্বোক্ত, পদ নং ২২।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ লালনের গানের ভাষা

রাঢ়ী উপভাষা-অঞ্চলের অন্তর্গত নদীয়া জেলা ছিল লালনের জন্ম ও বাসস্থান। এ ভাষাঞ্চলের প্রান্তে রয়েছে বঙ্গালী ও বরেন্দ্রীর প্রবল উপস্থিতি। তাছাড়া পরবর্তীকালে নদীয়া জেলার যে-সমস্ত অঞ্চল নিয়ে কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হয়, সে সমস্ত অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি ও জনতা শান্তিপুর-নবদ্বীপ অঞ্চল থেকে কিয়ৎ পরিমাণে ভিন্ন। তুলনায় বিদগ্ধ শিষ্টদের কৃষ্ণনগর-শান্তিপুরের ভাষা থেকে এ অঞ্চলের নিম্নবর্গের ভাষার নানা স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। জোলা প্রমুখ হস্তশিল্পীগোষ্ঠীর এবং বৈষ্ণব-বাউল-ফকির সাধকগোষ্ঠীর সামাজিক উপভাষার নানা বৈশিষ্ট্য লালনের ভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং রাঢ়ী ভাষার অন্তর্গত এক বিশিষ্ট নিম্নবর্গের সাধকগোষ্ঠীর এটি একটি সামাজিক উপভাষা। একাধিক ভাষাঞ্চলের সীমান্তে অবস্থান-হেতু এ ভাষায় একাধিক উপভাষার লক্ষণগুলি পাওয়া যায়। আবার স্থানীয় আঞ্চলিক কথ্য রূপের সঙ্গে সুফী, নাথপন্থী, বৈষ্ণব, তন্ত্রাদির ঐতিহ্যবাহিত ভাষারীতি এতে মিলিত হয়েছে।

লালনের কাব্যভাষায় তৎসম, তদ্ভব, লৌকিক গ্রাম্য, এবং বিদেশী (আরবী, ফারসী, ইংরেজী) উপাদান একত্রিত হয়েছে। তৎসম শব্দ, সন্ধি, সমাসের প্রতি সবিশেষ আসক্তি বা সংস্কৃতায়নের উৎকট প্রবণতা না-থাকলেও ; এগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। লৌকিক রীতির সঙ্গে লালন অবলীলায় শিষ্ট রীতিকে মিশ্রিত করেছেন। সংস্কৃতায়নের প্রভাব আছে লালনের ভাষায়।[১] আবার শিষ্ট ভাষারীতিকে শব্দের উচ্চারণে, পদসন্নিবেশে ও বাক্যগঠনে বহু ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করা হয়েছে। শিষ্ট ব্যাকরণ-কাঠামোর আনুগত্য অগ্রাহ্য করার ফলেই পদের ক্রম পরিবর্তিত হয়েছে, বিভক্তি লুপ্ত অথবা সংযোজিত হয়ে গঠিত হয়েছে নতুন শব্দ। লালন বহুক্ষেত্রে তাঁর একটি বাক্য বা বাক্যাংশকে অসমাপ্ত রেখে এক ব্যঞ্জনাধর্মী ঘনত্ব সৃষ্টি করেছেন। যেমন : আমার এ ঘরখানা, কে বিরাজ করে।[২] অনেক পরে জীবনানন্দ বাংলা কথ্য ভাষার এ ধরনের সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন কবিতায়। সব মিলিয়ে জীবন্ত কথ্য ভাষার সহজতা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ, নিম্নবর্গের উল্লাস ও জীবনস্পন্দন লালনের ভাষায় পাওয়া যায়। ছন্দে, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, ''এই অসাধুভাষাটা খুব জোরালো ভাষা এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে।' আউল বাউলের মুখে, ভক্তিগীতিতে, মেয়েলি ছড়ায় এ ভাষা বাংলার চিত্তকে শ্যামল করে ছেয়ে রেখেছে। দক্ষিণের বীরশৈবরা শাস্ত্রীয় আচারের মতই, শিষ্ট ভাষাকে 'স্থাবর' বলে অগ্রাহ্য করে, জঙ্গম আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করেছিলেন। (Ramanujan, p. 46).

লালনের গানের পাণ্ডুলিপিটি উচ্চারণভিত্তিক শব্দলিখন-পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এখন থেকে শতবর্ষ পূর্বে এক গ্রাম্য লেখনীয়া এটি নকল করেছিলেন।[৩] পুরনো পুঁথির দীর্ঘ আকুড়িযুক্ত 'কু' বা 'দু' অক্ষরের ব্যবহার থাকলেও এখানে মূলত আঞ্চলিক উচ্চারণরীতিকে লেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ গানের রচয়িতা নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত এক ব্যক্তি। সুতরাং লৌকিক

মুখবাহিত ভাষারীতি এবং তাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য যুগপৎ এ ভাষায় ধরা পড়েছে। পাণ্ডুলিপির বানানে নানা বৈচিত্র্য ও অস্থিরতা দেখা যায়। একাধিক হস্তাক্ষরের মধ্যে বানানের নানা পার্থক্য চোখে পড়ে, যেমন কৈ/কই/কহি/কৌ (২০৪)। কিন্তু একই হস্তাক্ষর, এমনকি একই পদে একটি শব্দ দ্বিবিধ রীতিতে লিখিত হয়েছে। -য- মাত্র একবার ব্যবহৃত ; সর্বত্র -জ-এর ব্যবহার চিহ্নিত করা যায়। শ, স, ষ, বান, ণ ; ই, ঈ ; উ, ঊ-এর পার্থক্য প্রায় লুপ্ত। এগুলির ব্যবহার যথেচ্ছ এবং নিয়মহীন।[৪]

-ত্- তিনভাবে লিখিত—চোম- ঁকার (৩২), মতচ্য, মৎস, বৎস (বশ্র ১৩৯)।

ং, ঙ, ঙ্গ ব্যবহার—রং, রঙ্গ, রোঙ্গা, গোরাং, গৌরাঙ্গ ; বানানে বিনাসিক্যীভবন, নাসিক্যভবন, নাসিক্যধ্বনির লোপহীনতা সবই পাওয়া যায়। যেমন, আদার, আঁধার (৬) ; চাঁদ, চাদ, চান্দ (৬, ১৫৭, ১৬৫, ২২৪)।

মালদহ-নদীয়া, মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষায় বিভিন্ন পুরুষে ক্রিয়া ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য আছে। এ রীতি শিষ্ট বা চলিত লিখিত ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। যেমন, আমি যায় ; সে যাই। পাণ্ডুলিপিতে পাই : (সে) জানতে পাই (২০৩) ; জে জন পাই (২০১)। এক হস্তাক্ষরে একই পদে একই শব্দ বিভিন্ন বানানে লিখিত হয়েছে গানে, সিসু (২২৬), সিশু (৩০৩), শীশু (৩০৭) ; প্রম, প্রেম, প্রমী, প্রিমি (১৮৩) ; উপাসনা (৩৬৭), উপাশোনা (২৬৪), উপসোনা (১৭) ; নৈরেকার, নরেকার (১৩৩), নয়রে কার ; আর, য়ার ; ত্রিবেনী, ত্রীবিনি, ত্রিবেনি, ত্রিবিনি, ত্রিপীনি, ত্রীপিনি ; চাইর, চার, চারি, চাড্ডি (২৯৩, ২৪১, ২৮২, ৩১১) ; বৈধিক, বৈদিক, বৈদ্গি ; কতা, কথা প্রভৃতি।

শ্বাসাঘাতের ফলে এবং দ্রুত উচ্চারণভঙ্গিতে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ব্যাপক প্রবণতা লালনের কাব্যভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন ডুব্রে, চুব্‌নি (পদ ৩৩৯), অন্ত্রে (অন্তরে, ২৩৩) , সেকান্তে (সেখান থেকে, ২১৫), মলি (মরলি, ১২১), কাজিল (কাজিয়াল, ১১৭ খ), মর (মোর, ১২৪), কবুতি (কবুলতি, ১৮৫), এমন (একমন), জিও (জীব, ১৬৮), নয়ে (নদে, ১৭১), আন (আনল, ২২৭), নিষ্কল (নিষ্কলঙ্ক, ২২৭), জোই (জোগী, ২২৭), মাকড়ার (মাকড়সার) প্রভৃতি।

লালন-ব্যবহৃত শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনাগমের দৃষ্টান্ত প্রচুর : সতন্তে (ঃ সততে ১৩৩), বিপথ্য (ঃ বিপথ), শুক্কল (ঃ শুক্র ২১৪), ওনুস্বারে (ঃ অনুসারে), ক্ষ্যায়া (খেয়া) প্রভৃতি।

নানা ধরনের স্বরভক্তি এ ভাষায় যুক্ত-ব্যঞ্জনকে পৃথক করে- বিকরমে (ঃ বিক্রমে), বরজোগ (ঃ বর্জোগ), ত্রি (ঃ তির, ৪), মিছিরি (ঃ মিশ্র ৩৪২)।

লালন-ব্যবহৃত তদ্ভব বা অর্ধ-তৎসম শব্দে যুক্ত-ব্যঞ্জন লুপ্ত, সরলীকৃত, যুগ্ম-ব্যঞ্জনে বা অন্যবিধ রূপান্তরে পরিবর্তিত হয়।[৫] যেমন (ক) সশান (ঃ শ্মশান), সরণ (ঃ স্মরণ), কন্দ (ঃ স্কন্ধ), জলে (ঃ জ্বলে), (খ) শুদ্দ (ঃ শুদ্ধ), পদ্দ (ঃ পদ্ম), দুল্লভ (ঃ দুর্লভ), জোগ্গ (ঃ যোগ্য) সত্ত (ঃ সত্য), তত্ত (ঃ তত্ত্ব), রাজ্জে (ঃ রাজ্যে, ২৮) তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের মূল যুক্ত-ব্যঞ্জনগুলির নানা ধরনের রূপান্তর এখানে হয়েছে—

ক্ষ> ক্‌খ খ বিছাখন (ঃ বিচক্ষণ, ১৪)।

দ্ব> দ দিদা (ঃ দ্বিধা, ১০)।

জ্জ্ব> জ্জ উজ্জলাময় (৪৪)।

দ্ধ, র্দ্ধ, দ্য> দ্দ উর্দ্দ, সিদ্দি (১৩), সুদ্দ (১৪), সদ্দ (ঃ সদ্য ১৪), তিলর্দ্দ (ঃ তিলার্দ্ধ ৪৮)।

ধ্য> দ্দ/দ্দ্য সাদ্দ (ঃ সাধ্য ১৪), অবাদ্দ্য (ঃ অবাধ্য ৫৬)।

জ্ঞ> গ্ন জোগ্ন।

র্গ, গ্য> জ্ঞ সজ্ঞ (১২৩ : স্বর্গ), আরাজ্ঞ (ঃ আরোগ্য ৩৪), জজ্ঞ (ঃ যোগ্য ৬৩), সৌভাজ্ঞ (ঃ সৌভাগ্য ১৩৫)।

ত্রে> ত্বে ত্বেতা (ঃ ত্রেতা ৮৪)।

মৃ> ম্রে অম্রেতো (ঃ অমৃত ১৯)।

কৃ> কি প্রকিতি (ঃ প্রকৃতি ৫)।

প্র> পে পেত্যাবি (প্রত্যয় করিবি ৬৩)।

সৃ> ছি ছিসটি (সৃষ্টি ৩২খ)।

বৃ> ভিক্ষ (১১০), ব্রক্ষ (২০)।

ম্য> ম্ভ অগম্ভ (অগম্য)।

ত্য> থ্য নিথ্য (ঃ নিত্য)।

ন্ধ> ন্দ সন্দী, সিন্দু (২৪), বেন্দবে (ঃ বান্ধিবে ৪৯)।

হৃ> রি রিদয় (ঃ হৃদয় ৪৮)।

ক্ষেত্রবিশেষে পদ-মধ্যস্থিত -হ- লুপ্ত হয়—পারা (ঃ পাহারা), কৈনে (ঃ কহিনে), তবন (ঃ তহবন), নাএ (ঃ না হয়)।

শব্দবিশেষে-র-লুপ্ত হয় বা-ল-তে রূপান্তরিত হয়—পলো (ঃ পড়িল), কল্লি (ঃ করিলি)।

সংস্কৃত-মূল শব্দের লুপ্ত হয় -ব- ; যেমন দারে (ঃ দ্বারে), ধজা (ঃ ধ্বজা), কোন কোন শব্দে -য়-লোপ পায়, যেমন হুসারে (ঃ হুসিয়ারে), অসোমার (ঃ অসময়ের ২, এখানে ধ্বনিতে ক্ষতিপুরক দীর্ঘতা পাই)।

এ ভাষায় সমধ্বনি লোপের দৃষ্টান্ত বহু ; যেমন এবের (ঃ এবারের), অগোরচোরা (ঃ অগোচরচোরা)।

বঙ্গালী উপভাষার মতো এখানেও স্থলবিশেষে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয় না—চান্দ, বান্দা, কন্দ, কান্দিলে।[৬] কোন ক্ষেত্রে যুক্ত-ব্যঞ্জনের যুগ্ম-ব্যঞ্জনে পরিণতিতে এবং যুগ্ম-ব্যঞ্জনের একটি লোপের ফলে স্বরে ক্ষতিপূরণ দীর্ঘতা যুক্ত হয় ; যেমন জম্মা (ঃ জন্ম ৪৩), কি জানে (ঃ কি জন্যে ২০৫)।

কোন কোন সময়ে তৎসম শব্দে সন্ধি বর্জিত হয় [লিপিকরের প্রমাদেও হতে পারে], যেমন গৌরঙ্গ (১৮২), অষ্টঙ্গ (২৫৩), কিন্তু দ্রুত উচ্চারণের সঙ্কোচজাত একধরনের সন্ধি লৌকিক শব্দে ব্যবহৃত হয় ; যেমন দেক্ষা (ঃ দেখ গা ৯১), মিস্পে (ঃ মিশিবে)।

লালনের কাব্যভাষায় সংখ্যা, কখনো শব্দে কখনো বা সংখ্যায় লিখিত হয় : তিন, চারি, ১৬ জনা (২৩৬)। সংখ্যা এবং অন্য বহু শব্দের ধ্বনি-পরিবর্তনের বিবিধ পর্যায়গুলিকে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে এখানে ; যেমন চার, চারি, চাইর, চাড্ডি।

সংস্কৃতায়ন প্রবণতায় লিঙ্গ-সচেতনতার শব্দ বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে এ ভাষায় ; যেমন নিস্‌কামিনী (১৫৫), নিরঞ্জনা (১৩১), সাধকি (১৭০), তারি (ঃ তারণকারী ২০১)।

স্বরসঙ্গতির ফলে শব্দবিশেষের বিচিত্র রূপান্তর এখানে দেখা যায় ; যেমন—দিখিল (ঃ দেখিল ১৮০, ২১১), মনি (ঃ মুনি ২২৪), প্রিতি (ঃ প্রতি), দুরু (ঃ দূর ২০৫), কেটীয়া (কাটিয়া ১৫০), ভেয়ে (ঃ ভাই হে ২১৫)।

এ কাব্যভাষায় স্বর-বিসঙ্গতি/বিপর্যয়ও ঘটে থাকে ; যেমন—বেকা (ঃ বাঁকা), সমায় (ঃ সময় ১৮০), তিলকে (ঃ তিলেকে ১৮৫), জে দেখি (ঃ যে দিকে ১৪০)।

লিপিকরের প্রমাদে স্থানবিশেষে অক্ষর/শব্দ/বাক্যাংশ বাদ পড়ে ; দ্বিত্ব হয় ; বিপর্যস্ত হয়ে যায় বাক্যাংশ। খাতায় এ ধরনের ভ্রম সংশোধিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। কোন কোন ক্ষেত্রে ছন্দ ও অন্ত্যমিল বিচার করে ভ্রমগুলি চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু বিশেষ ধরনের বিপর্যয় সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন :

চিত্নে (ঃ চিনতে ৩১৫), মা জোনি (মা জননী ৩১২)।

২২৩ নং পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে পাই মনরে কোন (ঃ কোন মন রে)।

২৮৯ নং পদে আছে—কারণ শুদ্রের (ঃ সমুদ্রের) পারে

৩১০ নং পদে পাই—জার জনম (ঃ যার যেমন)

একাধিক উপভাষার প্রভাব, সাধু-চলিত-কথ্য রীতির অনায়াস মিশ্রণ, অস্থির এক উচ্চারণরীতি এবং অনির্দিষ্ট এক ভাষাদর্শ লালনের কাব্যভাষার পশ্চাদ্‌পট রচনা করেছে।

রবীন্দ্র-ভাষাদর্শ বা সবুজপত্রের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার পূর্বযুগের এই কাব্যভাষা আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করতে পারে। সাধু বা চলিত শিষ্ট ভাষাদর্শের কাঠামোটির সঙ্গে এই আঞ্চলিক নিম্নবর্গের ভাষার তুলনা হতে পারে আকর্ষণীয়। লৌকিক, তৎসম উপাদানের সঙ্গে 'যাবনী মিশাল' যে ভাষারীতি ভারতচন্দ্রে পাই, রামপ্রসাদের মধ্য দিয়ে তা, লালনের গানে কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং পরবর্তী শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে কী পরিণতি লাভ করেছে—সেটিও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হতে পারে।

আবদুল হাই লালনের কাব্যভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, লালনের গান কুষ্টিয়ার উপভাষাভিত্তিক ছিল। রবীন্দ্র-প্রকাশিত প্রবাসীর লালনের গানে ; উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সংগৃহীত ১৬০টি (১ম সং, বা. বা. ও বা. গান) গানে ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ৪৬২টি গানে প্রচলিত উপভাষাভিত্তিক উচ্চারণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। মধ্য ও পূর্ববঙ্গের গায়কেরা নিজেদের উচ্চারণে স্বরের অপিনিহিতি ও অন্যান্য বিকার (জানতে > জেনতে) ঘটিয়েছেন লালনের গানে।[৭] মিশ্র ভাষাঞ্চলের রীতিতে লালনের গানে অপিনিহিতি বা অন্যান্য বিকৃতিচিহ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। এগুলি তার মাত্রা, ছন্দ, ধ্বনির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে বর্তমান কালের যে-কোন লালনগীতির সম্পাদক, এমনকি ভাবসঙ্গীতেও, লালনের কাব্যভাষাকে উচ্চবর্গের সাধু বা চলিত ভাষাদর্শে রূপান্তরিত ও শোধিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবাসীর সঙ্গে, 'ছন্দে' প্রকাশিত লালনের গানের ভিন্নতা থেকে এই সংস্কারপ্রবণতা চিহ্নিত হতে পারে। প্রকারান্তরে উচ্চবর্গের সংগ্রাহক ও সম্পাদকেরা লালনের উপরে আরোপ করেছেন শিষ্ট উচ্চবর্গের ভাষাদর্শের কাঠামো।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি এক্ষেত্রে আঞ্চলিক লালনগীতির ভাষাদর্শের প্রামাণ্য নমুনা। লালনের কাব্যভাষার বিচারে আমরা সাধু বা শিষ্ট চলিত ভাষাকে আদর্শ না ধরে বরং তার সঙ্গে লালনের ভাষার তুলনামূলক আলোচনার রীতি অনুসরণ করব। ফলত ধ্বনিলোপ, স্বরাগম প্রভৃতি শব্দ তুলনামূলক অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে স্বরধ্বনিগত নানা কুটিল বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

অ > আ ঃ ভূশান, উপার, মাহাজোনের।

অ > ও ঃ ওহি, কোমলে, বোন, কোরবি, নজোর, জগোত, দেহো, ওমনি, জখোন, উপাসোনা, শান্তো, সোনে, লোখনা, কতো, ভোলো, জোবানের (যবনের), রোণ, কোরবো, বিপদো, হোয়ে, বিন্দাবোনে, আজকোর [আজকের], তোরো, ধোনো প্রভৃতি শব্দের আদি, মধ্যে এবং অন্তে ব্যাপক ও-কার প্রবণতা এ ভাষায় দৃষ্ট হয়।

অ > ই, ঈ—আলিস্য (ঃ আলস্য), অপমানী, করণী।

অ > উ, এ—দুগদু (দুগ্ধ), ক্ষেমতা (ক্ষমতা), ক্ষেণেক (ক্ষণেক)।

আ > অ, ই, এ—অভরণে (আভরণে), পলাবে (পালাবে), ফনি (ফণা), শেরতে (সারিতে)।

আ > য়া—(য় শ্রুতি /glide) য়ার, কিয়ার (কিআর)।

ই > অ, এ, উ, ও—দের (দেরি), আএন (আইন), বেহার (বিহার) দুতিয়ায় (দ্বিতীয়ায়) জমনো (যেমনি)।

ই > য়, ঔ—দোহায় (দোহাই), কৌ (কই ২০৪)।

ঈ > অ—পক্ষ (পক্ষী)।

উ > অ, আ—ভাবক (ভাবুক), মখের (মুখের), নিরাপন (নিরূপণ)।

উ > ও—বোজাবে (বুঝাবে)।

উই > ও—দো (দুই)।

এ > অ, আ—জমন (যেমন), তন্নী (তেন্নী), সাপার (সাপের), আরাকটা (আরেকটা)।

এ > ই—কিবল (কেবল), গোলকিরি (গোলকেরি)।

ঐ > ও, আই, আয়—অকৌতব (অকৈতব), আথাই (অথৈ), অথায় (অথৈ)।

ও > অ, উ, ঔ—গপীর (গোপীর), (শতকোটি), দুষী (দোষী), চৌর (চোর)।

ও > য়—তরায় (তরাও)।

ঔ > ঐ, ও, ওউ—জৈবন (যৌবন), সওদামীনী (সৌদামিনী), গোউর (গৌর)।

ঋ> রি, র ফলা, ই—রিশী (ঋষি), রিদয় (হৃদয়), ব্রক্ষ (বৃক্ষ), বিন্দাবনে (বৃন্দাবনে)।

য় > ই, ও—উপাই (উপায়), হেলই (হেলায়), বিওগী (বিয়োগী), নওন (নয়ন), শওন (শয়ন)।

য়, য়ে > এ—ভএ (৮, ভয়), বেএ (বেয়ে, ৩২খ), বিএ (বিয়ে),

দাএমি (দায়েমী ৮), বএসে (বয়সে ৮৫), দিএছি, খাএ প্রভৃতি নিদর্শনে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির -য়- স্থলে -এ-ব্যবহারের ঐতিহ্য স্মরণে আসে। এই আঞ্চলিক ভাষায় স্বরধ্বনির ব্যবহার অনড় নয়।

এখানে সংযুক্ত স্বর যৌগিকে বা যৌগিক সংযুক্ত স্বরে পরিণত হয় এবং এ ভাষায় ঈ, উ, ঐ, ঔ-এর ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে না।

এছাড়াও এ পাণ্ডুলিপিতে—

(ক) স্বর দীর্ঘ হয়—উদায় (উদয়), চোরা (চোব), ছাটা (ছটা)।

(খ) স্বরাগম ঘটে—মনু (মন, ২০৯), সাদা (সদা, ৭৩), নুরু (নুর, ১১৭ খ)।

(গ) স্বর সঙ্কুচিত হয়ে লুপ্ত হয়—প্রণ (প্রাণ), দীব (দিবা), লা (নাও), আলে (আসিলে), জাগায় (জায়গায়)।

(ঘ) স্বরসঙ্গতির নানা বৈচিত্র্য থাকে—আমারা (আমরা), আন্ধাকার (অন্ধকার), পেতেবে (প্রত্যয় করিবে), কেন্দেলে (কাঁদিলে), লেখেছে (লিখেছে)।

(ঙ) স্বর বিসঙ্গতি ঘটে—চুমকে (চমকে), বিচ্ছাদে (বিচ্ছেদে), অটাল (অটল)।

ধ্বনি-বিপর্যয়ের বহু উদাহরণ পাই এখানে—রন্ত (রত্ন ১৩০, জমলায় (যমালয়), পিচুশে (পিশাচে ১০৪)।

তথাকথিত অপিনিহিতির ব্যবহার আছে লালনের ভাষায়—খেইল (খেলি/খেলা ২৭৬), চাইর (২৯৩), জাইত (১০২/১০৪), বইলে, আইজ (৭৫), কৈরে (২৯৫)। কিন্তু একই সঙ্গে শিষ্ট এবং চলিত রূপগুলিও তিনি ব্যবহার করেছেন (করিয়া/করে ; চারি/চার)। অভিশ্রুতি ব্যবহার লালনের ভাষায় চিহ্নিত করা যায়। যেমন—লোয়ে, বেড়ে।

-ব-এবং-য়-এ শ্রুতিধ্বনি/প্রতিফলন লালন ব্যবহার করেছেন—

সয়াল (সকল, ৫), নয়রেকার (নৈরেকার, ১৩৩), ক্ষেয়া (খেওয়া, ১২ (৬), নেবা, দেবা, খাবা (২২১)।

এ কাব্যভাষায় স্থানবিশেষে ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা ও ঘোষত্ব ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হলে, সেখানে স্বরের দীর্ঘতা চিহ্নিত করা যায়, যেমন—উটীল (উঠিল, ২২৭), সাপল (সফল, ১৪)।

পাণ্ডুলিপিতে তিনটি র/শ এর ব্যবহার যথেচ্ছ ; ঢ় ঢ, এবং ড়, ড-এর ব্যবহারও অনিশ্চিত। এখানে-ন-ও-ল-এর বিসমীভবন ঘটে এবং বানানে নালন/লালন ; লীলা/নিলা দুটি রূপকেই পাই।[৮] র, ল এখানে অভেদ নয়, কিন্তু বর্ণদ্বয় মাঝে মাঝে রূপান্তরিত হয় ; যেমন, বিজরী (১১৯), মাল্লি (মারিলি, ১৩৮), নর্খ (লক্ষ্য, ১৫২), নাঙ্গল (লাঙ্গল ২৬০), নাব (লাফ ২২২), লনিতে (ননীতে)।

লালনের কাব্যভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

ক > খ, গ—জোখের (জোকের), দিগে (দিকে), একদিগে।

খ > ক—দেক (দেখ), মুক (মুখ), নিরিক (নিরিখ)।

ছ > চ—করচে (করছে)।

জ > চ—বিচ (বীজ)।

দ্ধ, ঝ > জ—বুজি (বুদ্ধি, বোঝা), বোজাবে (বোঝাবে), মাজার (মাঝার)।

ঠ > ট—কোঠা (কোটা), কাট (কাঠ), উটীল (উঠিল)।

ত্য > থ্য—নিথ্য (নিত্য)।

থ > দ, ত—সুপদ (সুপথ), পত (পথ), কতায় (কথায়), প্রতম (প্রথম)।

দ > ড, ধ—ডণ্ডে (দণ্ডে), ডংশায় (দংশায়), সাদী (সাধি), খুদা (ক্ষুধা), সুদা (সুধা), আদার (আঁধার)।

প > ব—দিব (দীপ), প্রতিবাদে (প্রতিপদে)।

ম > ব—নাবাই (নামাই), নেবে (নেমে ২৮২), বর্ত্তবান (বর্তমান)।

ব > প, ফ—ডোফ (ডোব ৯৫), অপহেলে (অবহেলে), দেখপী (দেখবি)।

প > ফ—খারাপ (খারাপ ১০২)।

ফ > প, ব—নাব (লাফ ২২২), সাপল (সফল)।

ভ > ব—শোবা (শোভা), লোব (লোভ), সবাব (স্বভাব ১০৪)।

ড় > র—পরশী (পড়শী)।

হ > গ—সিঙ্গ (সিংহ ২১৩)।

অপৃথক স, শ, ষ-এর ব্যবহার—সিসু, শীশু, সাট, বিস (বিষ), বিসয়, বিনাষ, শেশে, খশে, শে কি।

আর শ, স ধ্বনি এখানে রূপান্তরিত হয়েছে > চ, ছ-তে—

ছিরূপ, ছিদাম, ছামনে, ছেরাজ, হাদিচি (হাদীসে), ছেপাই, ছুরাত, পচতাবি (পস্তাবি ১১৬) প্রভৃতি ধ্বনি মুসলমান সমাজের নিম্নবর্গের উচ্চারণরীতির এবং বটতলার ইসলামী পুঁথির বানানরীতির অনুগত।

বঙ্গালীর মতো স/শ এখানে হ-তে পরিণত হয়নি।

স ধ্বনি, র গুলি, য/জ এবং ন/ণ উচ্চারণ-পার্থক্য হারিয়ে একীভূত হয়েছে (merger)। ১৫৮ নং পদে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত পাই। ফলে কোন কোন স্বনিম (phonemen) অন্য স্বনিমের সঙ্গে অভেদত্ব লাভ করেছে। যেমন আত্মা > আত্তা, দোহাই > দোহায়, বেলাই > বেলায়, তরায় > ত্বরাও।

এখানে ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণতা ও ঘোষত্ব হারিয়ে অল্পপ্রাণ এবং অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—

(ক) সন্দি, কাট, অবোদ, পাচ, প্রতিশোধ, খুদা, সাদন, ভিকারী, তিতি (তিথি), লোব, বেড়ো (ভেড়ো ২০৫)।

(খ) ভেষপো, অপহেলে, দেখপী, অঘাত।

আবার বিপরীতক্রমে অল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি মহাপ্রাণতা ও ঘোষত্ব লাভ করেছে—

(ক) অঘাত (অগাধ), ঠের (টের ২১৩), সুখালে, সুখনো (১৮০), পুথলা (পুতলা ১৬০), গর্থে (গর্তে ১৩৭), সভায় (সবায় ১৩৮), ভেহেস্তেখানা (১৫১)।

(খ) বাগ (বাক্), বৈদ্দিগ, বিগারে (বিকারে), শোগানল (শোকানল), পেবসা (পিপাসা)।

শ্বাসাঘাত বা দ্রুত উচ্চারণের ফলে স্বর বা ব্যঞ্জন হ্রস্ব বা লুপ্ত হয়ে এখানে দুই বা তার গুণিতক সংখ্যার অক্ষরে শব্দের পরিণতি লক্ষ করা যায় (দ্ব্যক্ষরতা)। লালনের ছন্দের মূল পর্ব সর্বদা জোড়মাত্রার।

পাহারা > পারা; জানিতে > জেন্তে, বলিতে > বলতে, আসিবে > এস্পে, মানুষের > মান্‌ষের, অপারগের > অপারের।

লালনের কাব্যভাষায় স্বতোনাসিক্যীভবনের উদাহারণ বিরল কিন্তু বিন্যাসিক্যীভবনের উদাহরণ অনেক, যেমন—

চাদ, ঠাইয়ে (২১৪), আদার (আঁধার ৬)।

পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক উপভাষার মতো এখানেও কণ্ঠনালীয়ভবনের ফলে ভ্ > ব তে; ধ, খ্ > দ গ অন্তঃস্ফোটক ধ্বনির রূপ লাভ করেছে। যেমন—বেড়ো (ভেড়ো), সাধন (সাধন), অপরাদ (অপরাধ ৩২১), শোবা (শোভা ৫১, ১১৩, ২২৬), সুদ্দ (শুদ্ধ ৩৬৩), আদেলা (আধেলা ১১)।

তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দে তালব্যীভবনের উদাহারণ আছে এখানে: ছিষ্টি (সৃষ্টি), মত্যচ (মৎস), মিছে (মিথ্যা ১০), গানী (জ্ঞানী ২২০), বশ্র (বৎস ৩৯), বেন্নন (ব্যঞ্জন ৩১৯)।

শব্দের সঙ্কোচপ্রবণতা এখানে অধিকতর, তুলনায় শব্দের প্রসার-প্রবণতা কম; যেমন কব্বোরো, ছিস্‌টী (সৃষ্টি ২০১), বান্দর (২৯৪), নয়রেকার (নৈরাকার ১৩৩), গোরোচনা (গো (এর) চোনা ৩৩৪)।

উচ্চাবণের সমরূপতা সৃষ্টির জন্য নানা রকম রূপান্তব ঘটান শব্দে লালন, যেমন ইংগলা পিঙ্গলা (ইড়া-২৬১), আনা জাওনা (১১৯), ফিরানা ঘুরানা (১১৯), কামী প্রিমী (১৮২), কিশোরা কিশোর (১৪৫), দাপারে সঙ্গিনী রাধা রঙ্গিনী (৫৯)।

একাধিক শব্দের মিশ্রণে শব্দসৃষ্টি করেছেন লালন; যেমন ভুজঙ্গনা (ভুজঙ্গ + অঙ্গনা ৩৯), তোন ভূবনে (তন + ভুবন ৮৮), জাদুকারী (জাদু করেন যিনি ১৭২), ফাক তামোসা (ফাঁকি + তামাসা ১৭৫)।

এ কাব্যভাষায় সঙ্কর শব্দ সৃজিত ও ব্যবহার হয়েছে: যেমন অসোমার (সুমার-গণনা২), বেহাল, বেহাত (১৪৪), বেভরসা, অজান (১২০)।

এতে বিষমচ্ছেদের ফলে গঠিত হয়েছে কিছু ভুয়া শব্দ; যেমন অ নিরূপ (নিরূপ-কে মূল শব্দ ধরে নেতিবাচক অ—), কাণ্ডার (কাণ্ডারী-এর ঈ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন বিবেচিত হয়েছে ১৭৪), নিস্‌কামিনী (-কামীকে পুংলিঙ্গ বিবেচনায়, ১৫৫)।

এখানে সমীভবন ঘটেছে ব্যাপকভাবে—যেমন: তুল্লা (তুলনা ১৬৯), তত্ত (তত্ত্ব), উপাজ্জোন (উপার্জন), ভাগ্গ (ভাগ্য), জগ্গ (যোগ্য, যজ্ঞ), নিন্নয় (নির্ণয়) সমীভূত যুক্ত-ব্যাঞ্জনের একটি লুপ্ত হয়ে শব্দবিশেষ পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়নি; যেমন: কটাকে (কটাক্ষে ৯), লখন (লক্ষ্মণ ১৩), ভেবিষ (ভবিষ্যৎ ৩৬), বেপার (ব্যাপার)।

সমমুখ ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে (Convergent phonemic change) সমরূপ শব্দের প্রাচুর্য লক্ষিত হয় এ কাব্যভাষায়। সাদা > সাধা, সদা, শাঁদ; গানি > জ্ঞানী, গনিয়া, কাদেরগনি: সাধ, স্বাদ, সাধু > সাদ; হীন, দীন, দিন > দিন; শ্যাম, সাম (সন্ধ্যা) > সাম; মানুষ, মানস > মানস; পাহারা, পাড়া, পারা > পারা প্রভৃতি শব্দ শ্লেষাত্মকভাবে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে। বিমুখ ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে একই শব্দ উচ্চারণে ভিন্ন রূপ লাভ করেছে পাণ্ডুলিপিতে; যেমন—

নিরাকার, নিআকার, নৈরেকার, নরেকার, নয়বেকার; কই, কহি, কৈ, কৌ; মতচ্য, মৎচ, মৎস্য, মাছ: গৌরাঙ্গ, গৌরঙ্গ, গোরাং, গৌব, গোরা; চারি, চাইর, চার, চাড্ডি।[৫] নানা কারণে

ধ্বনিলোপের ফলে এ কাব্যভাষায় কিছু বিচিত্র শব্দের ব্যবহার চিহ্নিত করা যায়; যেমন; তৎক্ষোনা (তৎক্ষণাৎ), বেলায়ে (বেলায়েত ৩), বষ্ট (বষ্টম ১০৩), অন্তিকালে (অন্তিম কালে ৫৭), এমন (একমন), অপারকে (অপারগকে ৪৩) অনুকার/সমার্থক অনুগামী শব্দসৃষ্টিতে লালনের নিপুণতা দেখা যায়; যেমন—লুকালুকি, নাপানাপী, কাটপাটের, নাতাপাতা, আড়িগুড়ি, ভারিভুরি, দেখাদেখি, ছলচাতুরী প্রভৃতি।

লালনের কাব্যভাষায় তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, লৌকিক গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী ও দু'চারটি ইংরাজী শব্দের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই অসঙ্কোচ মিশ্রণের জন্য (গুরুচণ্ডালীর) জন্য লালনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। লোকশিল্পী লালন আঞ্চলিক লৌকিক ভিতের কাব্যভাষায় অনায়াসে আত্তীকরণ (appropriation) করেছেন সাধু শিষ্ট রীতি, চলিত শিষ্ট রীতি এবং 'যাবনী মিশাল' রীতিকে। চিরকালই নিম্নবর্গের লৌকিক রীতি সংস্কৃতায়িত করে গ্রহণ করতেন উচ্চবর্গ। আবার উচ্চবর্গের ভাষা ও সংস্কৃতি মিশ্রিত হয়ে লোকায়ত সমাজে সৃষ্টি করত নতুন 'জড়'। লোক ও শিষ্ট সমাজে দুপক্ষই সর্বদা আত্তীকরণ করে নিত অন্যপক্ষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে। একই অর্থনৈতিক ও উৎপাদনের বন্ধনে সংযুক্ত দু'বর্গের মধ্যে অসেতুসম্ভব পার্থক্য গবেষকদের কল্পনামাত্র। দু'পক্ষের নিরন্তর আদানপ্রদানের এক সচলতা আমরা বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই লক্ষ করি। সুতরাং সংস্কৃতায়ন না বলে, এ ধরনের বৈশিষ্ট্যকে 'এপ্রোপ্রিয়েশন' বলাই সঙ্গত। এ আত্তীকরণ ব্যাপকভাবেই লালন করেছিলেন। তবে তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম এবং লৌকিক উপাদানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যভাষায়।

কথ্য উপভাষায় সমাসের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। কিন্তু লালন নানা ধরনের সমাস ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের সন্ধির সঙ্গে, তিনি তদ্ভব বা লৌকিক শব্দেও সন্ধিকে পরিহার করেননি। যেমন (ক) কামাবেশে (৭১)ঃ, নিস্কল (২২৭), পরর্থে (৯১), ভাবানুসার (৭৩), ভবার্ণবে (৯২), মৃতাগতি; (খ) এক্ষানে (এক + খানে), আরাক (আর + এক ৪৬), আদমক্কা (আদি/আদম + মক্কা ৯১, ২১০) আদ ইমাম (আদি/আদম + ইমাম ঐ), বিস্মৃতে (বিষ + অমৃতে) প্রভৃতি লৌকিক সন্ধিপ্রবণতা আকর্ষণীয় এ কাব্যভাষায়।[১০]

লালনের শব্দভাণ্ডারের দেশী ও বিদেশী, মৌলিক ও আগন্তুক সমধর্মী ঐতিহ্যের শব্দের উপস্থিতি দেখা যায়। এর মধ্যে একশ্রেণীর পদে আরবী-ফারসী শব্দ, উপসর্গ, অনুসর্গের প্রাধান্য আছে। ইসলামের গুপ্ত গুরুমুখী দেহসাধন-সম্পৃক্ত এক ঐতিহ্যের স্রষ্টা দৌলত কাজী, আলাওল, আলী রাজা প্রমুখ কবিগোষ্ঠীর বহু শব্দ, যেমন ভাবক-ভাবিনী, লালন ব্যবহার করেছেন। নাথদের নিরঞ্জন, চাঁদ, চারিচন্দ্র, শম্ভুরস, বাঁকা নাল প্রভৃতি শব্দ লালনের গানে আছে। বৈষ্ণব পারিভাষিক বহু শব্দ; বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম, মুকুন্দ-রচিত কড়চার শব্দ, ভাষা, বাক্য, অনুষঙ্গাদি বিপুলভাবে লালনের রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বাবতারের মূল, 'অবতরী/অবতারি' বৈষ্ণব পরিভাষা লালন ব্যবহার করেছেন।

লালনের ৩১৮ নং পদটিতে জয়দেবের 'দেহি পদপল্লবমুদারং' শ্লোকের স্পষ্ট প্রভাব আছে। আজু (২১২), জিনিএ, দোহার, বাখানি, ভনে (১১৩), জেহি (৫৮), তিরো প্রভৃতি ব্রজবুলি শব্দ; দীর্ঘস্বরান্ত নয়ান, শয়ান, বয়ান এবং ব্রজবুলির অনুসারী পাপের নাহি ওর (৮৩), জৈছেরে

বিজরী (১১০) প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে লালন ব্যবহার করেছেন। ঔপনিষদিক/বৈদিক আব্রহ্মস্তম্ব (আবিম্বস্তমেতে ১১১) শব্দ; নারীকে ক্ষেত্রকল্পনা (১১০) লালন গ্রহণ করেছেন। তন্ত্রস্পৃষ্ট বহু শব্দ ও অনুষঙ্গ আছে লালনে। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুকে ঠকাবার জন্য মুরারী শীল যে, 'বেঙা পিতল' শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন; তা লালন দ্বারা পুনর্ব্যবহৃত (১০৫)। বৈদিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, ইসলামী, সুফী, নাথ প্রভৃতি ঐতিহ্যের অনেক শব্দ লালনের কাব্যভাষায় আছে। তবে এগুলি অর্থান্তরিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। যাই হোক প্রত্যেক, সৎ কবির মতো, লালনও প্রাক্তন ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন।

বিদেশী শব্দসম্ভারকে লালন বাংলা উচ্চাবণের অনুগত করেই গ্রহণ করেছেন। যেমন দ্বীন > দিন, হাদীস > হাদিচ, লণ্ঠন; School > ইসকুল, Magistrate > ম্যাজেষ্ট্রেরি। তিনি তৎসম শব্দের সমান্তরালে অর্ধ-তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ব্রহ্ম, ভিক্ষ (১০১); তির, তিরো (১১১); বষ্ঠ, বষ্ঠবেরো, বিষ্টু (৩০); প্রিকিত্তি (২০১); সাম (শ্যাম)।

এছাড়া তাঁর ব্যবহৃত শব্দের পরিমণ্ডলে বিকৃত তদ্ভব এবং গ্রাম্য কথা শব্দের উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। যেমন, লাটে (নষ্ট বা নিলাম) , জেনি (যেন), ভোলে (প্রভাবে), হল (গিল্‌টি), ডুরি দেওরে (বাঁধ), কুঘাবে (কু গাবে/কু ঘটাবে), জুতে (মধ্যে), খোঙ্গা (খোনা), রোঙ্গা, গুণ (মন্ত্র), বালা (সন্তান), দোভাসা, টার খাবে না (অটল), হাল (অবস্থা), তারি (পারের কর্তা), ময়াকারী (মায়াবী)।

-অ-, -না-, নাই প্রভৃতি উপসর্গের মতো ব্যবহার করে লালন নেতিবাচক শব্দ গঠন করেন; যেমন না-হক, অজান, না জানে, নাই নেহারা, না দেখিলাম, ঠিক না মেলে, কি না জানি হয় (৩২৯), নি আকার (৩৬৮), অনিরূপ।

অনেক সময় নেতিবাচক শব্দাংশ তিনি অবধারণার্থক ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করেন— মুখে সাইর নাম জপ না,/ থেকতে বাতি উজ্জ্বলাময় দেখনা (৭৯)।

বিরোধী/বিপরীত শব্দ-যুগ্মক দিয়ে পদ গঠন করা লালনের অতিপ্রিয় রীতি— জাত ছেফাত (১৭৬) দিন রজনী (১৭৯), সামান্য বিশেষ (১৮২), কামি প্রিমী (১৮২), তল উপর, সার আসার (১৬), স্বরূপ বিরূপ নিরূপ (৩২৫), শব্দ নিঃশব্দ (১১৯), আনা যাওনা (১২৯) প্রভৃতি বহু উদাহারণ এ কাব্যভাষায় আছে।

অবহট্‌ঠে প্রচলিত মনু (মনস্‌) এবং ভণ্ড / ভট্টারক থেকে জাত ভেড়ো শব্দটির লালন বহু ব্যবহার করেছেন।[১১]

এখানে লিঙ্গ-সচেতনতার কিছু অভিনবত্ব দেখা যায়। যেমন ভুজঙ্গনা (৩৯), জাদুকারী (১৭২), নিরঞ্জনা (১৩৩), ড়ুরি (১৪১ ডোর) কাণ্ডার (১৭৪), কিশোরা কিশোর (১৫৫), সাধকি (১৭০), অত্যন্ত সচেতনভাবে ও যথার্থ কারণে তিনি লিখেছেন।—শ্রীনারায়ণী (১৪২)।

তৎসম, বিদেশী এবং লৌকিক উপসর্গ ব্যবহারের মধ্যেও লালনের কিছু মৌলিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন অপার (১৩৯), অপারি (১৬৮), অজান (১২০), অবধারি (৮), অনিরূপ (১৬০), নিগুম (২১১), নিরান্তরি (১৪২), নি-আকার (৩৬৮), নিরাপন (২৫৪), বেহুসারে (৩৪৮), বেসুমার (৩২৯), বিওগী, বেভরসা (১৯৭), বেহাল (১২৪), বি-

ভালা (২০৯), বেমতি (৩১০), সদক্ষণ (২২১)। মধুসূদনের মতো 'সু'-এর প্রতি বিশিষ্ট এক ঝোঁক লালনেরও দেখা যায়। যেমন সুপদ (২২০), সুরাগ (২১৮), সুজন (৩৭), সুভাব (১), শুপত (৩), সুমাধরী।

বরাবর, বাদে, হুজুর প্রভৃতি বিদেশী অনুসর্গ এবং প্রচলিত অনুসর্গাদি ব্যবহারের সঙ্গেই অনুসর্গপ্রতিম একধরনের শব্দাংশ তিনি ব্যবহার করেছেন, যেমন ভিলকী মেরে (১৫১), এন্তেজারি (১৪১), কোন পাকে (১৩১), হুকুমের গতো (১৭০) প্রভৃতি।

কারক-বাচক অনুসর্গ-বিনা-বহুব্যবহৃত এ কাব্যভাষায়—

বিনে কাষ্টে, বিনে স্থলে (৭৯), রসিক বিনে (৮১)।

খানি,-খানা-ও -টি- নির্দিষ্ট বস্তুবাচক হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—ভেহেস্তখানা (১৫১), বারামখানা (৩০২, ৩০৩), শ্রীচরণখানা (৮৩), মনের তিনটি বাসনা (৩৪৩) অপজশটী (৩৪), ঘরখানি (২৯৩)।

লৌকিক ভাষার অনুসরণে লালন যথেষ্ট নামধাতু ব্যবহার করেছেন; যেমন বন্দবো (৫৭) উত্তাড়িলে (৩৫৫), নেহারে (২০৯), জিজ্ঞাশীলে প্রভৃতি।

সর্বনামের সুচারু ব্যবহার পাই ৭৭ নং গানে। এখানে একটি চরণে ৪টি; অন্য চরণে তিনটি সর্বনামের সুদক্ষ ব্যবহার দেখা যায়। যারে তারে, কি সে, শে যে, অন্নী তন্নী-এর বহুল ব্যবহার করেছেন লালন। অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত বস্তু বা বস্তুর বিশালতাকে প্রকাশ করার জন্য এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে (১৯, ২২ নং পদ দ্রষ্টব্য)।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষা সুলভ বট-শব্দের ব্যবহারও এখানে হয়েছে। সেই বটে উপাশোনা (১৭), অধমো পামর বটে (১৬৮খ), ও চাঁদ বটে কি (২২৭), ও দুইটি নুরের ভেদ বিচার জানা উচিত বটে (১৭৬)।

ক্রিয়া ব্যবহারে বঙ্গালী উপভাষার ঢং দেখি, সদাই করা (২৬৫) প্রভৃতি দৃষ্টান্তে।

আলোচ্য কাব্যভাষার যৌগিক ক্রিয়াগুলি নানা উপাদানে গঠিত হয়েছে;— তেজ্জ করে, গঠন গঠেছে, জেন্তে পায় (৬৩), বশে খাইলাম (৩২৮), আত্র দেখে জা (৮৬), নাব দিয়ে চাও ধরতে (২২২),....দেখীয়া দিবে (২০১)।

বিশিষ্ট এখানকার কর্মভাববাচ্যের ব্যবহার : কভুনা বাজিতে পারে (১১), ভরসা নাই কখন (১৫), না জানো সেবা সাধনা (৩৭)।

কর্মভাববাচ্যের প্রশ্নাত্মক রূপটি বিশেষ আকর্ষণীয় এখানে—না বাজাও বেজিবে কেনে (?) কুল কি কারু সঙ্গে যাবে (৭৭)

লালনের ভাষায় বিভক্তির বিশিষ্ট ব্যবহারগুলি হলো—

(১) এ/তে বিভক্তির বৈচিত্রমণ্ডিত ব্যবহার—

সাধন পথে কিনা হলো (৭৯), জন্ত্র পড়িএ (১১), তাইতে কি আলষপনা (২৬৫), প্রেম কি সামান্নেতে রাখা যায় (২৯৫), ভগ্নদশা ভারি দেখি আখেরে (৩২৯), সকলি কপালে করে (৩১০), বুঝালে না বুজে ধর্ম কাহিনী (৩২৪) নেংটি ঝারা করলে আমারে (১১৪), বৈদিগে জ্ঞান চক্ষু ঝাপা (১৯৯), পাবো বৈলে (৭৫), কররে দিশে (২৬০)।

(২) অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত এ/তে বিভক্তি—জাতে পয়দা দিনের রাসুল, নিরে নিরাঞ্জন আমার, আলেক মানুষ আলেকে রয় (১৮)।

(৩) সদ্য-অতীতকালের ১ম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়-এ- বিভক্তি (লে) : তারে চিনিলে না ভবে (৫), রেখিলে সাই কুবজল কোরে (১১)।

(৪) বঙ্গালী উপভাষাসুলভ এ-বিভক্তির ব্যবহার—মায়ে কর (৮৫), পাবো বৈলে কালোশশি (৭৫), সেই সে পাড়ি যাবে সেরে (৭৫)।

(৫) -কে-এর পরিবর্তে -রে- বিভক্তির প্রয়োগ : জেনিব তোরে (১৬)।

(৬) সম্বন্ধ পদে -র-এর পরিবর্তে ক-বিভক্তির ব্যবহার সিরাজ সাইকগুন (২৬২)।

(৭)-র- বিভক্তির বিশিষ্ট ব্যবহার : সাইর (৩৯), গোসাইর (১৩), আহাম্মদর (১৭৫)। রবীন্দ্রনাথ বুঝি এরই অনুসরণে শেষের কবিতায় লিখেছিলেন 'অমিতর'।

(৮) স্থানবিশেষে অতিরিক্ত বিভক্তির প্রয়োগ : দারিদ্রে, কোরাণেতে, তিলকেতে, কবিরাজেরে ঘোরতরে (১২৬) , বরাবরি, নিরান্তরি।

(৯) স্থানবিশেষ বিভক্তি বা সংযোগাত্মক অব্যয় লুপ্ত থাকে লালনের ভাষায়—কারু কয় (২৭), বিষামৃতো আছে মিলন (১২৬), মাসুক রূপ হৃদয় রেখে (২৮), যে ভাবে আইল হরি এই নদীয়া (১৭৩)।

পরিচিত শব্দের ইতরবিশেষের মাধ্যমে ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে তিনি তৈরি করেন নতুন শব্দ; যেমন, মৃতাগতি, মনের বুজি, ময়াকারী, ত্রিপীনি, দারিদ্রে, বেহুসার, অপার ভেবে, ঘোলা (ধন্দ), ভোলে (আচ্ছন্নতায়), তেজের ঘর, কাল রাগিনী প্রভৃতি।

পুনরুক্তবদাভাসের দক্ষ ব্যবহার দেখি লালনের কাব্যভাষায় : মা জননী (১২৪), দিনের দিনো জায় (৮৩), অন্তীম কালের কালে (৩২৯) , সিসু ছেলে।

তিনি শব্দবিশেষর পুনরাবৃত্তিতে, শব্দকে 'মোটিফ' হিসাবে ব্যবহার করে বিশেষ এক ধ্বনি বা বস্তুচিত্র আমাদের মনে গেঁথে দেন। যেমন নুর (২৭০), রূপ (১৪৬), কাল (২২৩), মন (১৪৩) , চাঁদ (১৫৭, ১৬৫, ২৭২) প্রভৃতি শব্দের নির্দিষ্ট পদে ধ্রুবপদের মতো আবর্তন লক্ষ করা যায়।

শব্দালঙ্কারের চাতুর্যপূর্ণ সংস্কৃত-প্রাকৃত চিত্রকাব্যের ঐতিহ্য ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যভাষায়। বক্রোক্তি-মার্গ নিপুণতা, অনুপ্রাসযমক শ্লেষের চাতুর্য, একই শ্লোকের বহুবিধ পাঠ ও অর্থ নিষ্কাশনের পদ্ধতি বহুলভাবে লালন ব্যবহার করেছেন কিন্তু উনিশ শতকীয় শব্দালঙ্কার ব্যবহারের জড়তা ও অতিরেক থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। ভাষার স্বাভাবিক কথ্যরীতিকে পীড়ন না করে তিনি অনায়াসে লিখেছেন'—

আগে জদি জেতো জানা জংলা কভু পোস মানে না (২৬৩), মিছে মায়ার মদ খেয়ো না (১৯০), বাদী ভেদী বিবাদী সবায় (৫৫), কেনে খুজিস মনের মানুষ বনে সদায় (১২২), মণিপুরের ঘাটে মনোহারী কল তেহাটা ত্রিপীনি তায় বাকা নল (৫২)।

যমকে স্বচ্ছন্দ তিনি : ভাবের ঘরে কি কুদরতি ভাবের লণ্ঠন ভাবের বাতি (২০৯), কালাকালে তারাই হবে কাল (২২৩), মন বুদ্ধির অগোচর চোরা (৯০)।

যমকে শব্দের সামান্য উচ্চারণবৈচিত্র্য ঘটিয়ে অর্থান্তরের সূক্ষ্ম আভাস দেন লালন : জে পরশে পরশে পরস সে পরশো চিনে লে না (১৫৮)।

প্রচলিত শব্দের একবার প্রয়োগে একাধিক অর্থ; বিভিন্ন সূত্রের সমরূপপ্রাপ্ত শব্দের জটিল শ্লেষ (নাই : নাহি, নাভি), সভঙ্গ পদ্ধতির শ্লেষ লালনের কাব্যভাষায় বিশেষ অবধানতা দাবি করে। বক্রোক্তির পৃথক ব্যবহার ছাড়াও, এ কাব্যভাষাটি বক্রোক্তিপূর্ণ।

লালনের ভাষার সংহতি ও গাঢ়তা তাঁর চরণাংশগুলিকে, ঘনীভূত অভিজ্ঞানকে প্রবাদ-প্রবচনের আদল দিয়েছে। গ্রামীণ জনতার মধ্যে অভিজ্ঞতার নির্যাসকে একধরনের ছড়ায় পরিবেশন করার প্রথা ছিল (নীলদর্পণ নাটক স্মরণীয়); ক্ষেত্রবিশেষে লালন সে পন্থা অনুসরণ করেছেন।

বিশ্বাসে মন নিকটে পায় ধন (১১৫), জদি থাকে এই কপালে রত্ন এনে দেয় গোপালে (৩১০, পদের অংশগুলিও চমৎকার), ধন্ন তোর বুকের জোর কান্দাও জগতো ঈশ্বর করে মান জারি (৩১৮), সতেক হাড়ির বেন্নন চাকা, রাই বলে ধিক তারে দেখা (৩১৯), জে আসাএ ভবে আসা তাতে হল ভগ্নদশা (৩২২), কৃষ্টেরে কান্দালে জতো সে তোমারে কান্দাবে ততো (৩২৩), বিশয়বিশে চঞ্চলা মন দিবো রজনি মত্ত, বুজালে বুজে না ধর্ম্ম কাহিনী (৩২৪), দিনে দিন ফুরাইএ গেল, রং মহল অন্দকার হল (৩২৭), শোমায় ছাড়িয়ে জানিলাম এখন গুরু ক্রেপা নৈলে ব্রথাই এ জীবন (৩৩১), আপ্নী যখন নয় আমার, কারে বল আমার আমার (৩৩২), এখানে না দেখলেম জারে, চিনবো তারে কেমন কৈরে (৩৩৪), চরণের জন্ন মন নয় (১৬৮)।

এছাড়া অনেক প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনকে লালন সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তি-দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করে, ব্যক্তি-অভিজ্ঞানকে সামাজিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়ে সমর্থন করেছেন। যেমন ঠাকুর গড়তে বান্দর হলো রে, যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলো রে, অবোধের গোবধে আনন্দ, অধর্মের ফল পাকায় লালন, জন্মিলে মরিতে হবে, বিনামূল্যে হয়ে কেনা, দেখলে চোখের পাপ থাকে না, শুদুই গিবে ফকসা মারা, শুদুই কথার ব্যবসা করা, কথায় কি বল বাজি জেতা, লোভে পাপ পাপে মরণ, বন পোড়ে তো সবায় দেখে মন পোড়ে তো কেবা দেখে, ময়ূরের নৃত্য দেখে পেচায় ফেকম ধরতে বসে, কি করে বই ভূতের বোঝা, কার মায়ায় বেড়াও নেচে, ভূতের ঘরে ঘণ্টা নাড়া, সঙ্গ গুনে রঙ্গ ধরে জেনিলেম কাজ্জ ওনুসারে, অসারকে ভাবিয়ে সার, পলি ফেরে, দায়মাল হবে, খালাস দিবে, ভাবের ভাবিক, দায়ের দায়িক, অবদ গোবোদের চটক ভারি। এ ধরনের প্রবাদ-প্রবচন লালনের কাব্যভাষাকে ঘনত্ব ও মৃত্তিকাগন্ধী বাস্তবতা দান করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বাক্‌রীতি

নদীয়া-যশোহর আঞ্চলিক কথ্যরীতিকে অবলম্বন করে কাব্যভাষা গড়েছেন লালন। অনেক সময় এ কবিতার বাক্‌রীতি কথ্য-গদ্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। যেমন—

(ক) নেংটি ঝাড়া করলে আমারে (১১৪),

(খ) লালন ভেড়ো এধার ওধার দোধারাতে খাবি খায় (২৩৮),

(গ) আবদুল্লার ঘরে বলো সেঁই নবীর জন্ম হলো,
মল দেহ তার কোথা রইলো শুধাবো কোথায়।

সংলাপধর্মী বহু পদে এ কথ্য বাক্‌ভঙ্গী অনুসৃত হয়েছে।

আঞ্চলিক কথ্যরীতির সঙ্গে চলিত রীতি এবং সাধু রীতির মিশ্রণ লালনের ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও শব্দ-ব্যবহাররীতিতে লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ শেষ বিচারে এটি কথ্য ভাষাশ্রয়ী এক কাব্যভাষা। শব্দ-ব্যবহারে বড় কবিদের মতো লালনও নিরঙ্কুশ। লালনের ক্রিয়াপদে কথ্য, চলিত শিষ্ট এবং সাধু এ ত্রিস্তরই ব্যবহৃত হয়েছে : কৈরে, করে, করিএ, করিয়া ; বলে বৈলে, বলিএ, বলিয়া, বল্লে প্রভৃতি। সর্বনামের ব্যবহারেও দেখি : তাইরি, তাহারি, তারি, তার ; আমা, আমাকে, মোকে, মোর, মর ; কারু, কারো, কাহারো, কাহারু—পূর্বোক্ত ত্রিস্তরকেই ধ্বনি ও কাব্যের প্রয়োজনে লালন ব্যবহার করেছেন।

লালনের ক্রিয়া ও নামধাতু ব্যবহারের কতগুলি বৈশিষ্ট্য এ সূত্রে তুলে ধরা যায় : হারিএ (ইয়ে), ডুবালে (আলে), পলেম (এম), জেনিলাম (লাম), বিকালে (আলে), নেবলে, এনবে, জাইএ, জুতি (জোড়া, যুক্ত), জেন্তে নারি, নাএ (না হয়), উজ্জালে, গেল চোরে, থুই তুলে, হেতড়ে, করো প্রকাশী, বেন্দেলে, কইগে জারে, থেকিতে, লেনা, কৈরে, বৈলে, তারে (তারণ করে), ভেসীছে, নিরিক দিতে, হোয়ে কিনা, লোভ হএ, ভেবে বুজে দেখ, জায় শরে, কহা, বহা, নারা (না পারা), নারি (না পারি), জেন গে, বায় জুতি, ডংশায়, ঠিক পড়ে না, ভজে, ধুড়ে প্রভৃতি শিষ্ট বা চলিত ভাষা থেকে প্রত্যয়, বিভক্তিগতভাবে এবং প্রয়োগরীতিতে ভিন্ন।

ধ্বনিগত দিক থেকে লালনের গান কখনও সাধু/শিষ্ট রীতিকে, কখনও বা কথ্যরীতিকে, বানানে অনুসরণ করেছে। অব্যয়, অনুসর্গ, নাম ও ক্রিয়াপদে, প্রবচনে, সমাস ও সন্ধিতে এবং পদ-সংস্থাপন রীতিতে এই মিশ্রণ লালনের কাব্যভাষায় চিহ্নিত করা যায়। এই মিশ্ররীতির ব্যবহারে কবি তাঁর মনোমতো ধ্বনিসুষমাজড়িত শব্দ ব্যবহারের স্বাধীনতা অনেক বেশি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের বাংলা কবিতা মূলত এই মিশ্ররীতির অনুসারী। অগ্রজ কবি লালনকে রবীন্দ্রনাথ এই মিশ্ররীতির অসঙ্কোচ ব্যবহারের জন্য কৃতিত্ব দিয়ে স্মরণ করেছেন।[১২]

আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ও সংলাপরীতির স্বাদ ও গন্ধ বজায় রেখে, লালনের ব্যবহৃত ভাষা কবিতার ভাষা হয়ে উঠেছে। প্রচলিত শব্দ ও ভাষার ধ্বনিবিন্যাস কাব্যের ধ্বনি-সচেতনতায়, সচেতন ধ্বনিসৃষ্টির অভিঘাতে এখানে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। কবিতার ছন্দ ; চরণের/পর্বের অন্ত্যমিল ও অমিল এ ভাষ্যকে, কথ্য ভাষা থেকে পৃথক করেছে।

দ্বিতীয়ত, এক বা একাধিক ধ্বনি বা অক্ষরের সঙ্গতিময় পুনরাবৃত্তির ফলে ছন্দোস্পন্দনে শ্রুতিসুভগ ছন্দ সুষমাজাত হয়েছে। যেমন তোন-ভুবনে (৮৮), সহজ-বিবেচনা (৯৬)।

তৃতীয়ত, বিষম জাতের ধ্বনি দিয়ে, ধ্বনিসংহতি ভেঙে, সংঘাতে ছন্দোস্পন্দ তৈরি হয়েছে : থেকতে হাওা হাওাখানা মওলা বলে ডাক রসনা মহাকাল বসেছে রানায়, কখন জানি কুঘটাবে॥ বন্ধ হৈলে এই হাওাটি মাটির দেহ হবে মাটি দেখে শুনে হওনা খাটী কে তোরে কতই বোজাবে॥

চতুর্থত, এ কাব্যভাষায় লিখিত বা মৌখিক ভাষার শব্দের ধ্বনিরূপ, ছন্দ বা ধ্বনির প্রয়োজনে সময়বিশেষে আংশিক বর্জিত হয়ে (clipping) একান্তভাবে কাব্যিক শব্দের জন্ম দেয় : আড়ে (আড়ালে), অনাসে, পারা (পাহারা), গোচরে, কেতা (কে তাহা), আলি (আসিলি)।

পঞ্চমত, ক্ষেত্রবিশেষে মূল শব্দে নতুন ধ্বনি যুক্ত হয়—মনু রায়, মনা, মাক্কা, শতেকো, মুল্লুকী, চাতকিনী, সুমাধুরী, কব্বোরো, বলগা।

ষষ্ঠত, মাত্রার প্রয়োজনে শব্দরূপ সঙ্কুচিত হয় (contraction)—রুহ>রু, ভাড়ুয়া>ভেড়ো, বেড়ো, দেরী কি > দের কি, জায়গায়>জাগায়, দেখিতে>দেখ্‌তে, সেখান থেকে>সেকান্তে।

সপ্তমত, ধ্বনির দাবিতে উচ্চারণের হেরফের ঘটানো হয়েছে—রোনো (রন), আলিস্য, ভেয়ে, মনু, কুঘাবে।

অষ্টমত, পরিচিত বহুব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তে গ্রাম্য বা বিদেশী শব্দ ব্যবহার হয়েছে ধ্বনির প্রয়োজনেই—

মনে না দেখলে নেহাজ কৈরে ঃ মুখে পড়লে কি হয় (১৬০),

এ মরমো না জেনে বান্দা পোড়বি ফেরে (১৬১),

চারিজুগে ঘর চাবি আটা ছোড়ান পরের ঠাঁই (১৬৩),

ভেদ, বেনা, ফানা, ফিকির, জানাজা, ত'বন (লুঙ্গি), তাজ (টুপি), কোড়া, জাড় (শীত), ধুপেরো (রোদ), রূ (হৃদপিণ্ড), দোটানা, আলাভুলা, দোভাসা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। স্থানবিশেষে শব্দ ভেঙে প্রসারিত হয়েছে—মন্তন্ত্রী (মন্ত্রী) বা মন্তরি, লমপটো, মরমো, বরজোগ (বর্জখ), আকোর সোনে, ওমিনি।

নবমত, ছন্দ ও ধ্বনির দাবিতে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে—আলসপানা, ভোলায় ভুলে, কলির আরতি, বেমতি, সার (সংশোধিত হয়), গোলা (উজ্জ্বল গোলাকার বস্তু/তরল পদার্থ), বেহুষ মুটে, কুল গৈরবী।

দশমত, আহা, মরি, বা (থাকবা), ও, গো, সেনা (১৫৫), হায়, হায় রে, লো, রে, নাক, রায়, গো, গা, নে, না, তো প্রভৃতি শব্দ বা শব্দাংশ সহযোগে শব্দের ধ্বনিতরঙ্গকে স্বতন্ত্র করে তোলা হয়েছে।

এই ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত মাত্রা ও ছন্দ-রক্ষার জন্য এবং ধ্বনি-সচেতনতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এবং কথ্যভাষা নির্ভর লালনের কাব্যভাষাকে, 'লৌকিক' থেকে 'লোকোত্তরে' নিয়ে গেছে। এই মিলন, মিশ্রণ ও নির্বাচনের পেছনে, বিষয়বস্তু এবং শ্রোতাবিষয়ে সতত সচেতন এক শিল্পীমন কাজ করেছে। নবীতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে চৈতন্যতত্ত্বের পদের ভাষাগত ভিন্নতা থেকে এ মানসিকতাকে চিহ্নিত করা যায়।

শব্দের সঙ্গে, বিভক্তি, প্রত্যয়, অনুসর্গ, উসপর্গাদিযোগে যে পদ গঠিত হয়—কবিতার ক্ষেত্রে ; সেগুলি গদ্য থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভিন্ন। গদ্যের প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে, নব নব প্রয়োগ, অহরহ হয় কাব্যভাষায়। মাত্রারক্ষার কারণে অতিরিক্ত-বিভক্তি (দারিদ্রেতে, কোরাণেতে, দেশেতে) বা বিভক্তি লুপ্ত করে একধরনের ভাষাগত ঘনত্ব সৃষ্টি করেছেন লালন। পদের বিপর্যয়, ক্রিয়া এবং বিভক্তির লোপ, বাক্য সম্পূর্ণ না করে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমেও লালন সংহত, ব্যঞ্জনাধর্মী এক কাব্যভাষা সৃষ্টি করেছেন। ছন্দ, মাত্রার জন্যই নিশ্চয়ার্থক ঈ/ই বা সম্বোধনে উ-এর অতিরিক্ত ব্যবহার পাই বাঁইরি (বাইরে), তারি (তার) অপমানি, কোপীনী, করনী, একান্তী, মনু, নরু, নুরি। প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করেই লালন লিখেছেন বালক সময়, মালঞ্চ ফোটে, শ্রীনারায়নী। কিশোরা কিশোর, কাল রাগিনী।

কোলরিজ 'Best Word-কে Best order কবিতায় ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। বহু সমার্থক শব্দের মধ্যে শব্দবিশেষকে নির্বাচনের পেছনে কবির মনস্তাত্ত্বিক, ধ্বনিতাত্ত্বিক, বিষয়

ও শ্রোতা/পাঠক-সচেতনতা প্রভৃতি কাজ করে। মুসলমান সমাজে 'ইসলামী' কতগুলি শব্দের অনিবার্য ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু সাংস্কৃতিক বহুভিন্নতাযুক্ত বঙ্গের ইসলামী সমাজে (যেখানে লালন ছিলেন) আব্বা, আম্মা, গোছল, আণ্ডা সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না। লালনও করেননি। চারভূতের নামগুলি আব, (পানি) আতস, খাক, বাদ বা তৎসংক্রান্ত ছনি, মনি, ছিয়া সফেদ ; স্মরণে বিলুপ্ত স্মৃতি বোঝাতে 'ফানা' প্রভৃতি আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ৪ ভূতে বিশ্বাস প্রাচীন বস্তুবাদী হলেও, ভারতীয় সাধকদের বড় অংশটিই পঞ্চভূতকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বেসরা সুফীদের চারভূতে বিশ্বাস ছিল জীবন্ত ; তাই লালন এই জীবন্ত ঐতিহ্য ব্যবহার করলেন। তাঁর অন্বিষ্ট সত্তার নাম গৃহীত হয়েছে চর্যা ও নাথ-ঐতিহ্য থেকে, "নিরাঞ্জন সাঁই"। পানি শব্দের সঙ্গে লালন ব্যবহার করেছেন আব, জল, নীর ; মা-এর সঙ্গে পাই জননী, মাতা প্রভৃতি।

বাংলায় বিশেষভাবে কাব্যিক কিছু শব্দ আছে ; গদ্য বা কথা ভাষায় এগুলির ব্যবহার বিরল। যেমন ওর, যেমতি, তেমতি, মোরে, নয়ান প্রভৃতি। এসমস্ত ঐহ্যবাহিত শব্দ অবলীলায় ব্যবহৃত হবার ফলে, লালনের ভাষা, কথ্যভাষা থেকে সরে গিয়ে কাব্যভাষ্য হয়ে উঠেছে। শব্দ নিয়ে খেলা, বঙ্গীয় কবিদের অতি প্রিয়। গদ্যে শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কবিতায় শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যঞ্জনার সংযোগে শব্দার্থ বিস্তৃত ও অনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। লালনের ব্যবহৃত শব্দে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঞ্জনা ও অর্থের অস্থিরতা আছে। শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যঞ্জনা ছাড়াও সম্মুখ ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে একাধিক শব্দের একটি শব্দে রূপান্তরের মধ্যে, একাধিক অর্থে সচেতনভাবে শব্দকে লালন ব্যবহার করেন। এ ধরনের ব্যবহার প্রথাসিদ্ধ অলঙ্কার থেকে ভিন্ন।

যেমন—পারা, পাড়া, পাহারা, পারা (ধাতু), পারা (মত), পাড়>পারা।

এটি বঙ্গে ঐতিহ্যবাহিত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষারীতির উত্তরাধিকার হিসাবে লালন লাভ করেছেন। সুতরাং লালন পদাবলীর শব্দার্থ গ্রহণে অতি-সতর্কতা প্রয়োজন। আরশীনগরের পড়শীর বর্ণনায় উপনিষদের নেতিবাচক অরূপ ব্রহ্মকে চিহ্নিত করে যখন অনেকে নিশ্চিত (ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাই রে), তখন স্মরণে আসে যে দেহ-বহির্ভূত সত্তা বা অরূপ ব্রহ্ম লালনের অন্বিষ্ট নয়। এখানে নাই শব্দের দ্বিঅর্থ > নাভি, নাহি। নাহি অর্থে অরূপ ব্রহ্ম ; নাভি অর্থে দেহী মানুষ। নরবপুই ব্রহ্মের স্বরূপ ; দৃষ্টির আচ্ছন্নতায় আমরা জীবে শিবকে দেখি না—এটি গানের অন্যতর আভিপ্রায়িক অর্থ।

কথা ভাষাশ্রয়ী হলেও লালনের গানে বহু কাব্যিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। (১) বিশেষ্য—উপাসনা, এস্তেজারি, খাস্তন, ঘেটেলা, ডুরি, তারি, নয়ান, পক্ষ (পক্ষী), ফুলি, বালা, বুজির, বিজরী, ভাবকে, ভাবিনী, মরমো, মনুরায়, মীন, রাজী প্রভৃতি।

(২) বিশেষণ—অন্তিকালে, অজানি, অসম্ভাব, আখিরি, আধো, গৈরবী, তার, থিয়ে, নামপাড়ান, বেহুষ, বাটা, ভেড়ে, সরোলা, সয়ালো।

কোন কোন বিশেষণকে নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন লালন ; যেমন, ভেদ শব্দার্থে অন্তর্নিহিত গুপ্ত ব্যাখ্যা (২২১, ১৬১) ; বৈদিক শব্দার্থে আরোপিত হয়েছে 'কল্পিত শাস্ত্রকথা' (অসত্য) অর্থ (বৈদিগো জ্ঞানচক্ষু ঝাপা, বৈদিগে ঘিরল হৃদয় ২১৮)।

(৩) সর্বনাম—আলা, আমায়, এবের, কোতা, জথা, তারে, মোরে, যারে, হোথা, সামান্যে।

(৪) ক্রিয়া ও নামধাতু—করলে, জায়নারে, জোমিএ, টার খাবে না, ঠিক পড়ে না, ডংশায়, ডংশীল, তার, দোষায়, না রহিল, না দেখিলাম, নিরিক দিতে, বান্দিলে, বল্লে, ভেসীচে, ভেবে বুজে দেখ, লোভ হয়।

(৫) অনুসর্গ—জথা, জমন, তথা, বিনে, বাগে, পানে, পারা, লাগি, হতে।

(৬) ক্রিয়াবিশেষণ—একলে, কভু, কিপ্রকারে, কু, কিঞ্চিৎ, জেন, তবু, নিরাবধি, নিরান্তরি, বরাবরি, মিছা, মাঝার, সদায়, সদক্ষণ, সু, সাচা প্রভৃতি।

বাংলা ভাষার কথ্যরীতি সন্ধি ও সমাসের বন্ধন ছিন্ন করে, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের পক্ষপাতী। কিন্তু লালনের কাব্যভাষায় বহুলভাবে সন্ধি, সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়ে ভাষাকে সংহতি, সংযম ও কাঠিন্য দান করেছে। ফলত লালনের ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে স্পষ্ট ঋজুতার মধ্যে ব্যঞ্জনাবহ অর্থঘনত্ব ; ধ্বনিঝঙ্কার ও চিত্রময়তা। বহু নতুন শব্দ, ধ্বনি ও শব্দচিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন। ধ্বনি ও অর্থ-সংগঠনের দিকে, নানা বৈচিত্র্য, লালন-ব্যবহৃত সমাসগুলিতে দেখা যায়। দুটি, তিনটি বা তিনেক অধিক পদের সমাস তিনি ব্যবহার করেছেন ; যেমন চাঁদ গৌরাঙ্গ ভুজাঙ্গ ফনি, নবঘাট নব ঘেটেলা, মনিপুর ঘাটে মনোহারী কল তেহাটা ত্রিবিনে তার বাঁকানল, গুরু মুখ পদ্ম বাক্য, সনিশুককুল চম্পক কলি, খোদা প্রাপ্ত মূল সাধনা, দশম দলে মৃণাল গতি গঙ্গা বয়, লোহা সর্ন্ন পরস পরশে, প্রভৃতি। ভাষার স্বভাবকে লঙ্ঘন না করেও, বাংলায় অতিদীর্ঘ সমাস ব্যবহার করা যায়, লালন তার উদাহরণ—গৌরাঙ্গ সাদু চিত্ত জাদুকারী, বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবো রজনী, জান্তে মরা ভক্ততেগী, দ্বিদলে স্থিতি বিদ্যুৎ আকৃতি ১৬ দলে বারাম জোগান্তরে, খেলকা তাজা ডোর কোপীনী প্রভৃতির মধ্যে শিল্পকুশল ধ্বনিসংহতি ও ঝঙ্কার শোনা যায়।

একটি বিশেষ্য পদকে নিয়ে তার সঙ্গে নানা পদের সংযোগে লালন, বিচিত্র শব্দ, ধ্বনিচিত্র রচনা করেছেন ; যেমন—

(ক) শ্যামচাঁদ, গৌরচাঁদ, আদ্যচন্দ্র, মূলচন্দ্র, নিজচন্দ্র, গুরুচন্দ্র, শিষ্যচন্দ্র, গরল চন্দ্র, সরল চন্দ্র, চারিচন্দ্র, অধর চন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, নষ্টচন্দ্র, দয়াল চাঁদ, নিতাই চাঁদ, নয়ন চাঁদ, সকল চাঁদ, চরণ চাঁদ, চন্দ্র-ভেদ কথা, চাঁদ চকোরা, এ চাঁদ সে চাঁদ, চাঁদের ক্ষ্যায়া, চাঁদের ফল, চাদের সুধা, চন্দ্রে মধু, চাঁদে চাঁদ ঘেরা, চাঁদের বাজার, চাঁদ ঘুরানি, চাঁদ ধরা ফাঁদ।

(খ) প্রেম শব্দ মূল নানা ধরনের সমাসপ্রতিম পদ—প্রেমঅস্ত্রে, প্রেমের ঘাটে, প্রেমের হাটে, প্রেম-ইসকুলে, প্রেমমদে, প্রেম-পাগলের, প্রেমের শিকল, প্রেম সাগর, প্রেমনয়ন, প্রেমতরী, প্রেমের মশাল, প্রেমসন্ধিস্থলে, প্রেম সিন্ধু, প্রেম ডুবারু, প্রেম ফান্দে, প্রেম-পাতি জাল, প্রেম নদী, প্রেমবান, প্রেমের অঙ্কুর, প্রেম পিরীতি, প্রেম অমূল্যনিধি, প্রেমরস, প্রেম করা, প্রেম উপাসনা, প্রেমের দায়, প্রেমের দায়িক।

(গ) রূপ শব্দ দিয়ে গঠিত পদাবলী—রূপের ফনি, রূপের কাল, রূপের গাছ, রূপের তালা ছোড়ান, রূপের বাতি, রূপ দেখা, রূপধরা, রূপের নিশান, রূপের কিরণ, রূপের দরজা, শ্রীরূপ মহাশয়, রূপ নেহারা, রূপ স্বরূপ, রূপ রস, মনমোহিনী রূপ।

(ঘ) লালনের গানে বিচিত্র ঘর—মানের ঘর, কামের ঘর, ঠিকের ঘর, শব্দের ঘর, নিঃশব্দের কুড়ে, কলের ঘর, ভাবের ঘর, আগুনের ঘর, আলেক মোকাম বাড়ি, বাড়িঘর।

(ঙ) ঘরে চুরি করে নানা চোর—ঘর চোরা, মন চোরা, মনবুদ্ধির অগোচর চোরা, চতুর চোরা, নিশিচোরা, কামচোরা।
(চ) বিচিত্র মানুষ লালনের—মানুষ আকার, মানুষগুরু, মানুষে মানুষ কামনা, মানুষে মানুষ গাতা, মানুষতত্ত্ব, মানুষ গঙ্গা, মানুষ লীলা, সোনার মানুষ, নিরূপ মানুষ, মনের মানুষ, অধর মানুষ, অদেখা মানুষ, অজান মানুষ, মানব জনম, মানুষ রতন, মানুষ মাক্কা, মানুষ অবোতার, মন-মানুষ, মানব জমিন।

এর মধ্যে অনেক পদ সমাসের সীমানা ছাড়িয়ে, রূপকের ঘাট অতিক্রম করে, শব্দচিত্রের জগতে উপনীত হয়েছে।

মহা, চির, পরম, জগৎ, ভুবন, অনন্ত প্রভৃতি শব্দযোগে গঠিত হয়েছে বিশালত্ব-বোধক সমাস—মহাকাল, মহারতি, পরমপিতা, ভববন্ধুজন, ভবতরঙ্গেরো তরি, মহারসের ধ্বনি, তন-ভুবন, অনন্ত ফল, অনান্ত ধারা, অনান্ত শহর বাজার।

এছাড়া নানা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাস লালন ব্যবহার করেছেন—
(১) অনুপ্রাসধর্মী সমাস : লোবলালসে, কলকাটি, ঘাট অঘাটায়, বিষয়বিষ, দিন দয়াময় দয়ার নিধি, নুরে নীরে নীরাঞ্জন ঘেরা, কৃষ্ণ করিম কালা, পদ্মপাতার পানি, শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ, খোদবুদ খোদা।
(২) সমিল সমাস : অরুন কিরন, চবন স্মরন, নীরে খীরে, কালামালা, করন কারন, ভেদীবাদী বিবাদী, রূপের দরোজায় শ্রীরূপ মহাশয়।
(৩) বিরোধাভাসযুক্ত সমাস : ফিরানা ঘুরানা, উজান ভাটি, জেন্তে মরা, জল আনলে, গোপ্তবেক্ত, কালাকাল, কামীপ্রেমী, অধর ধরা।
(৪) সমধর্মী শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস : সেবা সাধনা, বেদ বেদান্ত, আচার বিচার, দেবাদেবী, অবতার অবতারী, ভজন সাধন, অর্থবানী, ঠিক ঠিকানা, ভাকাভুকোয়, পথেঘাটে, ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ড, ভেবে বুঝে, বেসভূষন।
(৫) লালন অনেক রূপক ও উপমিত কর্মধারয় সমাস রচনা করেছেন : ভবকুপ, ভবসাগর, প্রাণপাখী, মনতুলসী, কর্মফাসী, কাম কুম্ভীর, কাল শমন, জ্ঞানচক্ষু, পাপ সাগোর, কৃষ্ণপদ্দ, রাধাপদ্দ, মায়ামদ, পবনআড়া, আলেক জান, দেলদরিয়া, সুখ সরোবর, দেল কোরান, সঙ্গ কুপথ্য, মনবেড়ি।
(৬) সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসের উৎস থেকে অনর্গলিত বোধে জড়ে চৈতন্য বা চৈতন্যে জড়ত্ব আরোপিত হয়েছে, একশ্রেণীর সমাসে : আক্কেল আউল দরিয়া, ডিম্ব অবতারী, পবগতি, গুরু ভবতরী, রাধাকান্তি পদ্ম, পুরুষ পরশমনি, নীরে নরে, গোপ্ত বৃন্দাবন, ইন্দ্রবারি। বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে তিনি দেহে খুঁজেছেন এবং বহির্জগতে দেখেছেন অন্তর্জগতের প্রতিরূপ।
(৭) সংহত বাক্যখণ্ডকে বিশেষণধর্মী সমাসরূপে ব্যবহার করা হয়েছে : বেদবিধি অগোচর, শ্যাম রসের উপাসনা, অটলা রূপের সরোবর, আউল চলন, তিল পরিমান জায়গা, ঘাট মারে, চেতনগুরু, জিন্দা পীর, জগৎ পয়দা, দায়মাল, কারুণ্য সমুদ্রপারে, অহিমুণ্ডে করি খেলা, ভাব রাগের করণ, জেন্তে মরে জোগ সাধিবা।

শব্দের সমাবেশে (collocation) লালন ইঙ্গিতগর্ভ চিত্রকল্প ও ভাবকল্প নির্মাণ করেছেন।

কখনো সেগুলি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাবহ, কখনো বা বস্তুবিশ্বের প্রামাণ্য তথ্যসংযুক্ত। লালনের কাব্যভাষা অংশত চিত্ররূপময়। তিনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-সচেতন। রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ-এর মধ্যে লালন দর্শন ও স্পর্শনের পক্ষপাতী। অনেক সময় একাধিক ইন্দ্রিয়চেতনা একই সঙ্গে শব্দচিত্রে মিশে যায়। কিছু উদাহরণ দেয়া যায় : নারদ কাটী, নামাজের বীজ, ভাণ্ড মিস্তিরী, বস্তুভিখারী, নাচের ভিখারী, আয়না মহল, তারার মালা, ভবের হাটবাজার, মাকড়ার আসে বন্দী, যোগবারি গোলা, বাঁকা নল, হংস গলা, সমন জালা, ভাবরাগের করণ, অটল বিহারী ; নানাধরনের পাখী, তরী, সাগর, বাজার ; জল আনলে প্রলয়, ইন্দ্রডাঙ্কা, মদন রাজার ডঙ্কা ; রসের সরোবর, অটল সরোবর ; পদ্মযুক্ত ও পদ্মহীন নদী, সরোবর ; সাধুর মেল/হাট/ সঙ্গ, বৈদিক বান/ মেঘ/ ভোল, বিনে কড়ির ধন, গরল মাখা, হল করা, বেহাল, বেজেতে কচু, রাধা নামের বাদাম, গভীর নীরনদী, নীরাকার হাকিম নিরাঞ্জন, আলেকলতা, জন্মলতা, ধৈর্যডুরি, বিচ্ছেদ বান, পারাহীন দর্পণ, সহজধারা, ফুলের ধ্বজা, জল ছেচো/ তোলাফেলা, বেসম কাল রাগিনী, চৈতন্য গুনিন, নুরের বাতি, আশাঝুলি, মুরশীদ ভজন আইন, স্বরূপ রূপের দর্পন, পিছলঘাট, ভাবক রোঙ্গা, মন বিবাগী, আজবমীন, কুদরতি খেয়াল, আশাসিন্ধুকুলে, সরপোষে ঢাকা বস্তু, কুপজল, জলদ-কালো।

বস্তুজগতের, ভাবজগতের অনেকানেক ধারণাকে লালন বস্তুদেহ দান করেছেন শব্দার্থে সমর্পিত করে। যেমন কলির আরতি; কলির সন্ধ্যা না লিখে বরং সন্ধ্যায় অধর্ম ও পাপের প্রতীক কলিকে স্বাগত জানানো হচ্ছে আরতি শব্দে।

গৌরাঙ্গের প্রেমিকা লালন নিজেকে বলেছেন 'গৌরবালা'। বালা পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্রদের উপাধি। সামন্তসমাজে পিতা বা স্বামীর নামে নারী বা বালক-বালিকা পরিচয় দেয়। সমাজে সর্বজনমান্য পিতা বা স্বামী থাকলে, তার এ পরিচয় তাকে নির্ভর করে। গৌরনাগরী মতবাদস্পৃষ্ট এ শব্দের সামাজিক তাৎপর্য আছে। প্রেমিকা লালনের বিলাপে শুনি লম্পট গৌরাঙ্গ 'ধৈর্যডুরি' কেটে দেয়। বাঙালি নারীদের কোমরে ডুরি থাকে; অশান্ত প্রেমিক তা ছিঁড়ে ফেলে দেহগ্রহণে উদ্যত; আর প্রেমিকার অধীর কামনা এবং তিরস্কার এ শব্দটির সঙ্গে জড়িত আছে।

'রূপের কাল' একটি অসাধারণ শব্দ। কাল অর্থ মৃত্যু। রূপ দেখে, রূপানুরাগের বিপুল আর্তি শব্দটিতে মিশ্রিত হয়েছে।

পদ-সন্নিবেশ দ্বারা বিশেষ এক বক্র অথচ রম্য ভাষাভঙ্গি লালন সৃষ্টি করেছেন। কথ্য ভাষানির্ভর এ ভঙ্গি এক বিশেষ 'Style'-এর জন্ম দিয়েছে। কথ্য ভাষার স্বভাবকে তিনি কদাপি লঙ্ঘন করে, শব্দের অন্বয় বা পদ-সমাবেশ রীতির এক সুচারু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন। যেমন : গেল চোরে, দিলে না নয়ন, ব্রজবাসীর হয়ে নিদয়, ভুল বুঝি পোড়েছে ভাই তোর, মনের মানুষ মনে রেকবো, সই পলো সাইর আএন মতে, কেউ বলে না একটা নিন্নয় করে, সে কুল দোসায়, ঝাড়িলে না সারে, নবীর কর মেনে সে চলে, এ লজ্জা ধুলেও তো জায় না, ফাকে ফের, দিষ্ট হয় না মনের দিদায়, জাতে মজলেম তাই যেন পাই, নিজদেশে গমন, নাম পাড়ায়, জল ছেচো এক চাকরী প্রভৃতি।

তাই, সে যে, যারে তারে প্রভৃতি অব্যয়কে, অভ্রান্ত যুক্তি, প্রমাণ, শৃঙ্খলার অঙ্গ হিসাবে লালন ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(ক) ব্রজের সে জলদ কলো যে পরসে গৌর হলো,

(খ) যারে ধরে পাবি নিস্তার তারে সদাই ভাবলি পর,

(গ) গুরুতত্তে বিধি শোনা যায় তাই তো দেখি একরূপো সে নয়। লালনের জগৎ শৃঙ্খলাপূর্ণ, কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ। আলোচ্য অব্যয়গুলি নিশ্চিত সিদ্ধান্তের শাব্দিক প্রকাশ।

কাব্যভাষার অনিবার্য দাবিতে; লালনের কথ্য রীতির, পদ-নির্বাচন, পদনির্মাণের ক্ষেত্রের মতো পদান্বয়ের ক্ষেত্রেও নানা বিপর্যাস (inversion) ঘটেছে।

সাধারণ নীতি	বিপর্যাস (লালনে পাই)
১. বিশেষণ + বিশেষ্য	১. বিশেষ্য + বিশেষণ
বিবাগী মন,	মন বিবাগী,
চিত্ত জাদুকারী সাধু গৌরাঙ্গ,	গৌরাঙ্গ সাধু চিত্ত জাদুকারী,
তিরোধারা ত্রিপিনীরো	ত্রিপীনেরো তিরোধারা
২. কর্ম + ক্রিয়া	২. ক্রিয়া + কর্তা
অনুরাগ তরি ভাসাও,	ভাসাও অনুরাগ তরি,
তবে ত্রিবিনে আইজ ফাঁদ পাতো	তবে ফাঁদ পাতো আইজ ত্রিবিনে
৩. কর্তা + ক্রিয়া	৩. ক্রিয়া + কর্তা
দরবেষ (যারা) দেল ঢুরে,	দেল ঢুরে দরবেষ যারা,
এবার আমি ঘোর সাগরে পড়েছি,	পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে,
দয়াল এসে কেশে ধরে পার করো	পার করো দয়াল আ[illegible] কেশে ধরে
৪. অধিকরণ + ক্রিয়া	৪. ক্রিয়া + অধিকরণ
ঘাট অঘাটায় ডুবালে,	ডুবালে ঘাট অঘাটায়,
ভাবের ভুবনে তার সদায় বেহার হচ্ছে	তার সদায় বেহার হচ্ছে ভাবের ভুবনে

৫. যৌগিক ও সংযোগাত্মক ক্রিয়ার দু' অংশের বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে; যেমন : দিলাম দোহাই, দেখ ধরি, হলেম চোক থেকিতে কানা, নিষ্ঠা হৈলে মিলবে তারি ঠেকেনা।

৬. না, বিশেষ্য এবং সমাপিকা ক্রিয়ার বিপর্যাস : নাইরে কালামালা ধারন, একদিনো না দেখিলাম তারে, শাম্ব বিম্ব নাই সে ফুলে, না দেখি উপায়, তারে চেনা না গেল, সে মানুষ অচিন।

এছাড়াও পদক্রমের নানা ধরনের বিপর্যাস ঘটিয়ে অতি-পরিচিত ভাষায়-লালন অপরিচিত এক ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন।

যেমন : শ্রীরূপ মঞ্জুরী গুরু সে ধামের অধিকারী,
অনুগত হৈলে তারি খুলে দিবে রাগের তালা,
যাও জদি মন সে শহরে, কেশে ধরে আএ লাগাও কেনারে,

তোমার দয়াল নামে দোষ রবে সংসারে, কেনে দাওনা কুপথ স্মরণ কৈরে, সামান্নে কে সে ধন পাবে, মেঘে রইত ছায়া ধরে ধুপেরো সমায়। পদবিন্যাসের এই ব্যত্যয় কখনো কথ্যভাষার স্বভাবকে পিষ্ঠ করেনি, ভাষাকে কৃত্রিম করে তোলেনি।

এক বা একাধিক শব্দ; সমদৈর্ঘ্যের বা সমগঠনের পদগুচ্ছের, আন্বয়িক উপাদানের পুনঃপুনঃ

ব্যবহারের ফলে, যে সৌষম্য জন্মে, তাকে সমান্তরতা বলা যায়। বাক্যে বা অনুচ্ছেদে এবংবিধ আবর্তনে সৃষ্টি হয় বিশেষ সঙ্গীত ও ঐক্য। গদ্যে, কবিতায় এবং অন্যত্র সমান্তরতা ব্যবহৃত হলেও, এ ভঙ্গিটি মূলক গানে প্রযুক্ত হয়। ধ্রুবপদ গানে পুনরাবৃত্ত হয়। কিন্তু সমান্তরতা ধ্রুবপদের পুনরাবৃত্তিজাত নয়। লালনের গানে চরণবিশেষের পুনরাবৃত্তি লিখিত হয়নি। বিশেষ শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের নানা জটিল পুনরাবৃত্তি ঘটেছে লালনের কাব্যভাষায়। আর এতে ধ্বনির বিচিত্র রূপ, কবির কুটিল নানা অভিপ্রায় আভাসিত হয়েছে। এই আবর্তন নানা ধরনের—

(ক) একটি পদের হুবহু আবর্তন ·

১. আপনি চোরা আপন বাড়ি আপ্নী সে লয় আপন বেড়ি,

২. সহজ ধারা ফেরে সহজে,

৩. নিয়াৎ বেন্দ গে মানুষ মাক্কা পানে
মানুষে মানুষ কামনা সিদ্ধি কর বর্ত্তমানে
দেখ দেখ খেলছে খেলা বিনদ কালা এই মানুষের তন-ভুবনে।

(খ) একাধিক পদ বা বাক্যবন্ধের পুনরাবৃত্তিতে একধরনের parallalism সৃষ্টি হয়েছে :

১. না পেলেম পথের গোড়া (লালন বলে মনের গোলে) না পেলেম কুল নদীর থাই,

২. পীরিতে অমল্ল নিধি * * *
এক পীরিতে শক্তিপদে মজেছিল চণ্ডীচাদে * * *
এক পীরিত ভবানীর সনে করেছিল পঞ্চাননে * * *
এক পীরিতে রাধার অঙ্গ পরশিয়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ। * * *

এখানে চরণের প্রথমাংশে ব্যবহৃত হয়েছে সমান্তরতা; কিন্তু দ্বিতীয়াংশে নেই কোন সমান্তর পুনরাবৃত্তি। আলোচ্য সমান্তরতার রীতিটি জটিল।

বাক্যের সূচনা 'এক পীবিতে' এটিকে -ক- ধরা যাক্।

এব পরে সর্বত্র পাই একজন নারীর উল্লেখ, তাকে ধরা যাক—খ;

তৃতীয়াংশে পাচ্ছি (মজেছিল, করেছিল, পরসিয়াছিল) অতীত বাচক ক্রিয়াপদ —একে-গ- ধরা যাক্; চতুর্থ বৈশিষ্ট্যে পাই একেকজন পুরুষের নাম—একে ধরা যাক -ঘ-। তাহলে পংক্তিগুলির বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ—

ক খ গ ঘ
ক খ গ ঘ
ক খ গ ঘ

এভাবে অন্তর্নিহিত সমান্তরতা আবর্তিত হয় লালনের গানে। এখানে মানুষ চণ্ডীচাঁদকে, শিব ও গৌরাঙ্গের পূর্বে স্থান দেয়ায় মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) সমান্তরতা সৃষ্টিতে লালন একই ভঙ্গিকে বা শব্দকে বহুব্যবহার করেননি। সমান্তর আবর্তনে ব্যবহৃত হয় বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বা অব্যয়াদি পদ। পদের বিভক্তি বা সংলগ্ন শব্দগুলি বদলে দিয়ে লালন নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন সমান্তর আবর্তনে। যেমন ৭৪ নং পদে—

আমি কি তাই জেনলে সাধন সিদ্দি হয়। আমি শব্দের অর্থ ভারি আমি সে তো আমি নয়।।

অনান্ত সহর বাজারে আমি, সন্দ করে আমার খবর নাই আমারে বেদ পড়ে পাগোলের প্রায়।। মনছুর হাল্লাজ ফকির সেতো বলেছিল আমি সত্য।।

৮২ নং পদ : এ ভাব দেখিরে সে ভাব তো দেখি নারে
সে ভাব কোতা রাখলিরে কিসোরো অভাবেরে।।

অন্য পদে : আছে রূপের দরজায় শ্রীরূপ মহাশয়
রূপের তালা ছোড়ান তার হাতে সদায়।।

(ঘ) ইতি বা নেতিবাচক নাম/ক্রিয়াপদ দিয়ে সমান্তরতা সৃষ্টিতে লালন বিশেষ পটু—

১. তুমি আগমের ফুল, নিগমের রছুল

২. না জানো সেবা সাধনা না জানো প্রেম উপসোনা

৩. ৮৩ নং পদের ক্রিয়া—মেলে না/সমান্তরতা নেই/ বল্লে সারে না/স. নেই/ভজলেম না/স. নেই/ চিনলাম না।

(ঙ) মনের কথা বোলবো কারে ঃ। মন জানে আর জানে মরমো মজেছি মন দিয়ে জারে ঃ। মনেরা তিনটি বাসনা। * *

* * নৈলে মনের বিওগ জায় না তাইতে ছিদাম এহাল মরে ঃ।। কাটিতে কৌপীন পোরিবো করেতে করঙ্গ নিবো মনের মানুষ মনে রেকবো, কর জোগাব মনের সিরে।। যে দায়ের দায়িক আমার মন। (৮২ নং পদ)

প্রথম গুচ্ছ সমান্তরতা বিশেষ্য পদের; মন শব্দে বিভিন্ন বিভক্তি এবং ভিন্ন সংলগ্ন পদ পাই (মন, মনের, মন দিয়ে, মনে, মনেরো)।

দ্বিতীয় গুচ্ছের সমান্তরতায় আছে সমবিভক্তিযুক্ত সমজাতীয় পদ—কারে, জারে, মোরে, সিরে।

তৃতীয় গুচ্ছের সমান্তরতা শুরু হয়েছে তৃতীয় কলি থেকে।

এখানে মোট ৪টি পর্ব। পর্বগুলির পদগঠন রীতিতে পাই—

(ক) দু'টি শব্দে অনুপ্রাস + পোরিবো জাতীয় ক্রিয়া + দেহাঙ্গ + বস্ত্র ; (খ) দুটি শব্দে অনুপ্রাস + ক্রিয়া নিবো + দেহাঙ্গ + পাত্র (বিশেষ্য পদ); (গ) তিনটি শব্দে অনুপ্রাস + ক্রিয়া রেকবো + দেহাঙ্গ (মন) + মানুষ (বিশেষ্য); (ঘ) 'র'-এর ক্ষীণ অনুপ্রাস + জোগাবে ক্রিয়া এবং বাক্য সমাপ্ত।

সমজাতীয় ক্রিয়া, পদান্বয়, বিশেষ্য ব্যবহার করে সমাপ্তিতে ক্রিয়ার বিপর্যাসে সমান্তরতা ভেঙে দেয়া হয়েছে। তিন ধরনের সমান্তরতায় ধ্বনিতরঙ্গের ঐকতান এ পদে শোনা যায়।

৭৯ নং পদে কুল শব্দের সমাস ও বিভক্তি পালটে সমান্তরতায় বৈচিত্র্য আনা হয়েছে—

গেলো, এ ছারো কুল তাতে ক্ষেতি নাই। স. নেই। কুল কি কারো সঙ্গে জাবে। মিছে .....কুলের বড়াই। কি ছার কুলের গৌরব করি, অকুলের কুল গৌরহরি। স. নেই। ছিলাম কুলের কুলো বালা কন্দে নেলেম আচলাকোলা, লালন বলে গৌরবালা আর কারে ডরাই।। বাক্যে কুল শব্দের নানা স্থান পরিবর্তন ও প্রসারণ ঘটেছে। সর্বশেষে যুক্ত হয়েছে-বালা-শব্দ। কুলরক্ষায় নারীদের গুরুত্ব হিন্দু বা অভিজাত মুসলমান সমাজে স্বীকৃত হয়। বিবাহের পর হয় তাদের গোত্রান্তর। চৈতন্যকুলে জাত-পাত নেই। গৌরবরণের মধ্যে লালনের গোত্রান্তর ঘটেছে।

লালনের পদের পুনরাবৃত্তি কেবল ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত নয়, আলোচ্য অংশটি তার প্রমাণ। (নারীর কাজ স্বামীর ধর্ম পালন; তাই লালন গৌরধর্ম-অনুসারী)।

এ ধরনের জটিল সমান্তরতার উদাহারণ বহু—

১. নিরে নিরাঞ্জন অবতার নিরেতে সব করবে সংহার,

২. কুল গৈরবী লোক যারা গুরু গৌরব কি জানে তারা,

৩. যদি মেলে রসিক সুজন রসিক জনার জুড়ায় জীবন,

৪৮ নং পদে প্রশ্নাত্মক শব্দের সমান্তরতায় পাই—

— — কে বোজে। স. নেই। — — কে তবে। শুনি। তবে ধনি কেনে। স. নেই। সে কেনে হয়। কিশারো অভাবে। স. নেই। তবে কেনে এমন। থাই দিবে কেউ সাধ্য নাই। জানি কি ভাবিয়ে কি কোরে জাই ... পলেম বিসম ভোলে।।

সমান্তরতার ক্রমে এই উদ্‌ভ্রান্তি চমৎকার। শব্দদ্বিত্ব ও একাধিক পদের জটিল সমান্তরতাও আছে লালনে—

১. মাটির ঢিপী কাটের ছবি ভূত ভেবিষ আর দেবাদেবী,

২. কেশ বিষে বেষ করলে কি হয় রশোবোধ না জদি রয় রশোবতী কে তারে কয়,

৩. মন মানুষ এই মানুষে ছাড়াছাড়ি কত সে,

৪. যে চোরের দায়ে দেশান্তরি সে চোর দেখি সঙ্গধারী,

অনেক সময় দুবার বাক্যাংশ পুনরাবৃত্ত হয়েছে—

যেমন ৬১ নং পদে ১৪ বার হরি শব্দের পুনরাবৃত্তি। অন্যত্র ১০৩ নং পদে, ৬২ নং, ৬৭ নং পদে বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি আছে। এর চমৎকার উদাহারণ—

ভুলিব না, বলি কাজের বেলায় ঠিক থাকে না

আমি বলি ভুলিব নারে স্বভাবে ছাড়ে না মোরে

বা, কি ছলে এসেছে গোরা, জানি কি ছলে এসেছে গোরা এই নদীয়া ভুবনে।

পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্ন বা উত্তর দেয়া হয়েছে—

সরারো নামাজের নিজ আরকাম আহকাম ১৩ চিজ

তোরিকতের আরকাম আহাকাম কয় চিজ বলে (৬৬)।

৮৫ নং পদের সবকটি কলিতেই প্রশ্ন; কে আইজ। কি দোষে। তবে কেনে। কে মজে আইজ। আজ জানবি কোথা;

সমান্তরতায় উত্তর বা সমাধানও আছে। যথা—

তিরোধারা তার ত্রিগুণ বিচার; ষড় দলে সেতো ষড়তত্ত্ব হয়; নুর নবীর সঙ্গে এয়ার ছিল ৪জন, নুরনবী চারকে দিলে ৪ জাজন।

ভিন্ন অর্থে শব্দের পুনরাবৃত্তি (পুনরুক্ত বদাভাস বা যমক)

১. আদম কালেবে খোদা খোদে বিরাজে,

২. বারি নামে বার এলাহি,

৩. কোন প্রেমের প্রমী ফাতেমা,

৪. লোহা সর্ন পরষ পরসে,

৫. নাই তার জেতের বোল বলে হরি বোল,

৬. কার কান্দায় কান্দ মিছে,

৭. সাথের সাথী কেউ রবে না,

লালনের কতকগুলি পদে মূল বর্ণনীয় বিষয় বা থিম একটি শব্দরূপ লাভ করেছে এবং পদে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—

৯৮ নং পদের বিষয় মনঃশিক্ষা; পুনরাবৃত্ত—মন।

৯৯ নং ,, ,, সাধুসঙ্গ; ,, ,, —সাধু।

১০০ নং ,, ,, মানুষতত্ত্ব ,, ,, —মানুষ।

১০১ নং ,, ,, কচু ,, ,, —কচু।

১০৭ নং ,, ,, প্রেমের মহিমা ,, ,, —প্রেম।

১১১ নং ,, ,, রস সাধনা; ,, ,, —বারি।

বাহ্যিক বাক্যবন্ধের আবর্তনের সঙ্গে লালন সূক্ষ্ম ধারণা এবং ভাবের সমান্তরতা সৃষ্টিতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত ৭৭ নং পদ স্মরণ করা যায়—

অনলে জল উষ্ণ হয় না জলে সে আনল নেভে না।। * *

বিনে কাষ্টে আনল জলে, জল রয়েছে বিনে স্থলে

আখেরে হবে জল অনলে প্রলয় অতি, জলে জে দিন ছেড়বে

হংকার ডুবে যাবে আগুনের ঘর।।

অনল জল, পরিবর্তিত হলো জল অনল;—এ দুয়ের দ্বন্দ্বে কাউকে প্রভাবিত করতে পারে না। বিজাতীয় দু'বস্তুর সমধর্মী বৈশিষ্ট্য হলো : এ আগুন জ্বলে বিনা কাষ্ঠে: আর জল থাকে বিনা স্থলে। এ দুয়ের সংঘর্ষ-বর্ণনায় জলের ক্রম আগে 'জল অনল'। সংঘর্ষে অনলের ঘর (দেহ) জলে ডুবে ধ্বংস হবে। প্রলয়ে সব হবে জলমগ্ন। পৌরাণিক এক চিত্র এ মর্মে পাই। জল অনলের বৈপরীত্য, সংঘাত ও পরিণাম এখানে সমান্তর ধ্বনিচিত্রে আভাসিত হয়েছে। পুরুষের অনলরূপী কাম, নারীর সৃষ্টি রূপজলের মিলনে স্থির থাকে। কখনো স্খলনে নির্বাপিত হয় কামাগ্নি। ব্রাহ্মণে, অথর্ববেদে, কুমার সম্ভবে (৮, ৯১) জল-অনল প্রতীক আছে। দীর্ঘ দেহমিলন বা মহাকামের রূপক এটি। (o'Flaherty, p. 289.)

৮৭ নং পদে সর্বশক্তিমান সাঁইকে বন্দনা করে, তাঁর দয়া প্রার্থনা করেছেন। এখানে ডোবা, ভাসা বিপরীত শব্দে মনুষ্যস্বভাবের বিপরীত বৃত্তিগুলি বর্ণিত হয়েছে। ভাসাএ ডুবাতে পারো ডুবাএ কেনার দেও কারো।। * *

নুহ্ নামে এক নবীকে ভাসালে বেসম পাথারে আর তারে

মেহের কৈরে আপ্নী লাগালেন কেনারে—।।

নেজাম নমে বাটপার সে তো পাপেতে ডুবিএ রৈতো * *

কুমতি তার গেল টেলে—।।

স্বেচ্ছাচারী শক্তি যে কাউকে ডোবাতে, ভাসাতে, কিনার দিতে পারে। নুহকে পাথারে ভাসিয়ে অবশেষে তীরে কেনার দেয়া হয়েছিল। নিজামকে ডোবানো হয়েছিল 'পাপে', সে এ থেকে রক্ষা পেল 'কুমতি' দূরে যাওয়ায়। ভাবের দিক থেকে এ ধরনের সমান্তরতার উদাহরণ

প্রচুর। বাহ্যিক ও ভাবের আভ্যন্তর সমান্তরতা সৃষ্টিতে লালন বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সমান্তর ক্রমকে হঠাৎ ভেঙে দিয়ে, সমান্তরতার লোপ ঘটিয়ে লালন সমান্তররীতিকে মনোগ্রাহী করেতও দ্বিধাহীন। ৯১ নং পদে মানুষ মক্কা (মাক্কা) বাক্যাংশের সৃষ্টি করা হয়েছে। তিন বাক্যখণ্ডে মানুষ-মক্কার তিন বৈশিষ্ট্য বর্ণিত—

১. এখানে বহু লোক হজ করছে,

২. এটি কুদরতি নুর দিয়ে গঠিত,

৩. এটি দশ-দুয়ারী।

এই মক্কার মধ্য দিয়ে মানুষের মহিমা ঘোষিত হতে হতে সমাপ্তিতে মূল বক্তব্য থেকে সামান্য সরে, সমান্তরতা ভেঙে লালন ঘোষণা করলেন 'আদি (আদ) এমাম সে মেয়ে'। মানুষ শব্দটি পুরুষবাচক। প্রকৃতি বা নারীর গুরুত্ব এ ঘোষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সমান্তরতা ও ধ্বনিঝঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত লালনের শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, পুনরুক্ত বদাভাসের ব্যবহার। সব ধরনের কেতাবী অলঙ্কারের প্রয়োগে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর সমসময়ে শব্দালঙ্কারের অতিরেক বাংলা সাহিত্যে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। মন (১৪৩), চাঁদ (১৫৭, ১৬৫, ২৭২, ২৭৪), নুর (২৭০), রূপ (২৪৬), কাল (২২৩) প্রভৃতি শব্দকে যমক-পুনরুক্তি হিসাবে ব্যবহারে এই প্রচলিত রীতির আভাস পাই। যখন তিনি লেখেন, 'জে আশায় ভবে আশা ভাঙ্গীলো সে আশার বাসা' (২৯৪) তখন যুগ-প্রবৃত্তির প্রভাব চিহ্নিত করা যায়।

যমক ব্যবহারে নিপুণতাও বিস্ময়কর তাঁর—

লোহা সর্ন পরষ পরসে বা অসার ভেবে সার দিন গেল কিংবা কালাকালে তারাই হবে কাল অনুপ্রাসের নানা ব্যবহারের মধ্যে স্মরণীয় তার শ্রুত্য অনুপ্রাসগুলি—১, ব্রহ্মার বেদ ছাড়া ভেদ বিধান সে যে [বদ, ভদ]

তাঁর ব্যবহৃত বরসা, ভরসা অন্ত্যমিল সোনার তরী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন।

লালনের এমন পদ বিরল যেখানে তিনি শব্দালঙ্কার ব্যবহার করেননি। শিল্পীর পরিমিতিবোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে শব্দালঙ্কারের মোহ থেকে রক্ষা করেছে। শ্লেষ-বক্রোক্তির স্বতন্ত্র ব্যবহার ছাড়াও, তাঁর কাব্যভাষ্যটি শ্লেষবক্রোক্তিময়।

সমান্তরতার পাশাপাশি লালনের কাব্যভাষার বিপ্রতীপতাকে স্মরণ করতে হয়।[১২] পদ-সংগঠনের বিপ্রতীপতা ছাড়াও বিপ্রতীপ শব্দ-যুগ্ম, বিপ্রতীপ বাক্যাংশ, অতর্কিত বিরোধাভাস অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করেন। আপাতদৃষ্টিতে বহুরূপযুক্ত বস্তুজগতের, জীব ও প্রাণীর পার্থক্য স্বীকার করেও, এদের অন্তরালের ঐক্যকে জানেন লালন। তাই বিরোধভাস তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। অন্যপক্ষে লালনের সত্য বা যথার্থ, প্রচলিত শাস্ত্র বা সমাজের মূল্যবোধের বিপরীত। প্রচলিত সব কিছু লালনের নিজস্ব জগতে উল্টে যায়। এই বিপরীত সত্য বহু ক্ষেত্রে বিপ্রতীপতার সাহায্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে। উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক পীড়ন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্রেও এই বিপ্রতীপতা এসেছে গানে। চর্যাপদ থেকে, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ক্ষেত্রবিশেষে, এই 'উল্টা ভাষা' কবিদের প্রিয়। কবীর প্রমুখ ভক্তি-আন্দোলনের প্রধান কবিরা এই 'উল্টাবংশী' ভাষা ব্যবহার করেছেন।

লালনের বিপ্রতীপতার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—
১. বিপরীতার্থক শব্দ-যুগলের ব্যবহার :
খবর না জানিলে (১২০)।
২. ঘটনাগত বিপর্যয় :
ঠাকুর গোড়তে বান্দর হলো রে (২৯৪) ; গাছ জদি হয় বিছের জোরে ফল ধরে না (১৮১) ;
সময়েতে সকলে সখা, অসময়ে না দেয় দেখা (৩৩২)।
৩. বিপরীতের সাহায্যে বিরোধাভাস :
হস্ত পদো নাই রে তার বেগে ধায় সে (১৩৬) ; শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হল যে প্রেমসাধনে ; আপন ঘরে পরের কারবার ; শব্দের ঘর নিসব্দের কুড়ে (১৪৪)।
৪. বিরোধে জিজ্ঞাসা :
হেথা কেনে দুঃখ সুখ পাই (৩৩৮) ; ধলা কি কালা বরণ আছি আমি এই ভুবন (১৪৬)।
এই জিজ্ঞাসা ও উদ্‌ভ্রান্তি আছে পদ ১৫১, ১৬০, ১৬১ প্রভৃতিতে। আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা (১৭৫), নিরাকারে কি প্রকারে নুর চোওায় খোদার (১৭৬), কায়াধারী হোয়ে কেনে তার ছায়া নাই (১৮৮), অদেখারে দেখে কেমনে চিনি (২০৪), রত্ন যে পায় আপন ঘরে সে কি খোঁজে বাহিরে (১০৯)
৫. বিপ্রতীপতায় উত্তর :
তোরা বলিস কালো কালো, কালো নয় সে চাঁদের আলো (১৪০), ঘর না বুজে বাইরি খুজে পোড়বি ধান্দায় (১৪৭), কামের কামি নিষ্কামিনী হয় (১৫৫), প্রাপ্ত পথ ভুলে জেও না (১৯০) , শুনতে পাই পাপ ধার্মিক সবে ইঞ্জিল সিজ্জিনে জাবে (৩৩৮), বাঁকা সোজা হবে মানের ঘাএ (৩১৯), ছিল জলদ কালো প্রেমে সেদে গৌরাঙ্গ হলো (৩৫৪)।
৬. উল্টা কথা :
জলের ভিতর জলছে রে বাতি (১৪৫), নিসব্দে শব্দেরে খাবে (ঐ), নিকট থেকে দূরে দেখায় (১৫৬), ব্রেজেরো ঐ জলদ কালো জে পরোশে গৌর হলো (১৫৮), সে য়ার লালন একখানে রয় থাকে লক্ষ জোজন ফাকরে (১৫৯), কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় (১৬০), গুরুরূপে নিরূপ মানুষ ফেরে (১৬৯), জেন্তে মরিয়ে শুজোন (২০৭), রেতে উদয় ভানু দিবসে বাতি (২৭২), এক মরনে দুজন মরা (২৯৫)। কতগুলি পদ মূলত উল্টা কথা দিয়ে রচিত ; যেমন ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬৮, ১৩৭, ৭৯, ৮০ প্রভৃতি।
৬৩ নং পদে বোবার কথা, কালার শ্রবণশক্তি, অন্ধের স্পর্শক্ষমতা, বিনে বাতাসে ঝড়, শুষ্ক খাতে বন্যা প্রভৃতি বিরোধী চিত্র সমাপ্ত হয়েছে। এ তথ্যে : 'মার উদরে পিতা, জনমে পত্নীর দুগদু খেলে সেনা' পিতৃবস্তু রজঃযোগে মাতৃজঠরে বর্ধিত হয়ে, জাত হয়ে মাতৃস্তনে পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে নাথযোগীদের কাহিনী এবং তারাপীঠের শিবমূর্তি (মাতৃকোলে স্তন্যপানরত) স্মরণীয়।
৭. বিপ্রতীপতা পরস্পরের পরিপূরক :

নবুয়াতে নিরাকার কয়, বেলাএতে বরজোক দেখায় (১৭৯), একদেহ দুই দেহ হয় তার (১৭৭খ), কামী প্রেমি সে দুজন হয় (১৮২), কুপথে ভ্রিমী কেনে দেও না সুপথ স্মরণ কৈরে (২০১),

গরল হৈতে সুধা নিতে আগুসে প্রাণ জায় (২২৯), সাধুর বচনে শুনি অগ্নির ভিতরে পানি (২৫৪), কখন ধরে আকার, কখন হয় নিরাকার (২৭৬), যা ছুইলে প্রাণে মরি এ জগতে তাইরে তরি (৩০৩), কুব্রক্ষে সুফল পেয়েছে (৩০৩)।

লালনের গানের রচনারীতির মধ্যে বিষয়বস্তু এবং পরিবেশ-সচেতনতা থেকে বিশিষ্ট কয়েকটি ভাষারূপ গড়ে উঠেছে। বিষয়ানুগত এই ভাষার ব্যবহারকে অনেক সমালোচক Register বলে থাকেন। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন এভাবে : Form a language customarily used in particular circumstances".[১৪]

লালনের বিশিষ্ট এক ভাষা পাওয়া যায় বন্দনার পদগুলিতে। গুরু, চৈতন্য, নবী এবং সাঁই-এর বন্দনা তিনি করেছেন। এতে রঙ্গ, ব্যঙ্গ নেই। চৈতন্য, কৃষ্ণ বা নবীবিষয়ক পদ থেকে এগুলি আলাদা। তাঁর বন্দিত সত্তা উন্নত, মহৎ, বিরাট এবং দূরবর্তী। কবি তাঁর ভক্ত বা দাস ; সমকক্ষ বা বন্ধু নন। তাঁর অসাধারণত্বে কবি বিস্ময়বিমূঢ় এবং সসম্ভ্রমে কৃপাপ্রার্থী। সাঁই-এর বন্দনায় (এলাহী আলামীন আল্লা ৮৭/৮৯ পদ) ইসলামী অনুষঙ্গ ও ফারসী শব্দাদির সাহায্যে গাম্ভীর্য তৈরি করা হয়েছে। অন্য দিকে গুরু/চৈতন্যবন্দনায় আরবী ফারসী শব্দ নেই ; তৎসম শব্দাদি আছে। বৈষ্ণব পুরাণ অনুষঙ্গ, পরিভাষা, সমাসবদ্ধ পদাদি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। গৌরবন্দনায় লালন প্রায় ক্ষেত্রে গুরুর উল্লেখ না করে, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গৌরের সঙ্গে স্থাপন করেছেন। (১১১ নং পদটি তৎসম শব্দ-প্রাধান্যের উদাহরণ)। দ্বিতীয় ধরনের ভাষারীতি পাই নবীতত্ত্ব, আদমগঠন, কোরাণাদি নিয়ে বিতর্কে বা শরীয়ত-মারফতের দ্বন্দ্বে। এখানে আরবী ফারসী শব্দপ্রাধান্য, ইসলামী পুরাণকথা, সুফীদের পারিভাষিক শব্দাদি প্রাধান্য লাভ করেছে। এগুলি কোন ইসলামী তত্ত্বজ্ঞের লেখা বলে মনে হয়।

তৃতীয় ভাষারীতিটি পাওয়া যায় চৈতন্য, কৃষ্ণ এবং রসরতি বিষয়ক সাধনার পদে। বিদেশী শব্দ নেই। বৈষ্ণব পরিভাষা, অনুষঙ্গ, চরিতামৃতের প্রচ্ছায়া, নদীয়ানাগরী তত্ত্ব, গুরু-পারম্যবাদের চকিত প্রতিফলন এখানে পাওয়া যায়। মনে হয় যে, এগুলি কোন সমর্পিতপ্রাণ বৈষ্ণবের লেখা।

চতুর্থত চারচন্দ্র, দেহে চন্দ্র পরিভ্রমণ, অমাবস্যা, পূর্ণিমাতত্ত্ব, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আলোচনায় নাথ-ঐতিহ্যের পারিভাষিক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিরঞ্জন সাই' শব্দের উৎস নাথ-পন্থা ও চর্যাপদ[১৫]।

পঞ্চমত গ্রাম্য শিশু ও নারীর কথ্য ভাষাভঙ্গিমা পাওয়া যায় যথাক্রমে ২৫০, ২৪৯, ৩০৮, ১৩৮, ৩১৭, ৮৪, ৩১২, এবং ৩১৮, ৩১৪, ১৪০, ৩২৩, ১৭২, ৩৩৩, ৫৭, ৩১৬, ৩১৯, ৮৭, ১৭১, ২৫ পদে। সখাদের কথা, অভিমানী শিশুর কণ্ঠ ; মা ও প্রেমিকার আর্তির ভাষা অতিশয় স্বতন্ত্র।

ষষ্ঠত বিচার, বিতর্ক, সংলাপচারিতার রীতি কোন কোন পদে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে পূর্ণ এ ভাষা।

সপ্তমত কথ্য রীতির লঘু কৌতুকে, রঙ্গে সাতিশয় গতিশীল এক ভাষা পাই ১০৪, ২০৯, বা 'এমন বেজেতে কচু' বিষয়ক পদে (১০১)।
সাধারণভাবে দেশী, বিদেশী, তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসমের মিশ্রণে লালন তাঁর কাব্যভাষা নির্মাণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য সংহত, সংযত— পদগুলির আকৃতি ছোট। শব্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারে লালন আতিশয্য পরিহার করেছেন সর্বদা। তাঁর বক্তব্য কখনই পল্লবিত হয়নি। বাউল পদকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামী তত্ত্বে নিপুণ ; কেউ দক্ষ বৈষ্ণব ভাবনায়—লালন এ দু'ধরনের পদেই অনন্য। এ কারণে হিন্দু এবং মুসলমান দু'গোষ্ঠীর মধ্যেই লালনের সমাদর আছে[১৬]।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রূপরীতি

সুপ্রাচীন কাল থেকে চূর্ণ কবিতা রচনায় বাঙালি কবিরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথম বাংলা ভাষার নিদর্শন চর্যাপদ গীতসাহিত্য হলেও প্রকীর্ণ কবিতা। বাংলা গান তথা প্রকীর্ণ কবিতার চমৎকার আলোচনা পাই নরহরির ভক্তিরত্নাকরে। অর্থযুক্ত পদসংযোগে অবয়বযুক্ত গানকে তিনি বলেছেন, 'নিবদ্ধ সঙ্গীত'। এর চরণ সমমাত্রা বা বিষম মাত্রার হতে পারে। গীতারম্ভের পূর্বে তাল-বহির্ভূত অক্ষর-উচ্চারণের রীতিকে বলা হতো, 'অনাগত'। দু'জন গায়কের (পাল্লা দেয়া পদ্ধতির) গানকে তিনি বলেছেন, 'যমল'। এ ধরনের গানের চার ভাগ—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী। গানের প্রথম অংশ উদ্গ্রাহ, মধ্যপদ ধ্রুব, তৎপরে অন্তরা, শেষাংশ আভোগ ; অথবা উদগ্রাম, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ। তিনি রাগ ও তালকে বলেছেন সঙ্গীতের অবয়ব।[১৭] লালনের গানে রাগের উল্লেখ নেই, কিন্তু তালবিভাগ অন্ত্যমিল, এক দাঁড়ি, ঃ বিসর্গ চিহ্ন এবং দু দাঁড়ি দিয়ে সুচিহ্নিত। লালনের বিভিন্ন পদসঙ্কলক এগুলি অগ্রাহ্য করে নিজস্ব ঢঙে পংক্তিবিন্যাস ও স্তবক গঠন করে কমা, সেমিকোলন, একদাঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। এ ভঙ্গির অন্যতম প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে ৫টি স্তবকবন্ধে লালনের গান সাজিয়েছিলেন।[১৮] উপেন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, 'লালন গীতিকা' প্রাচীন ছেদচিহ্ন (ঃ, ..) বা দু'দাঁড়ির পূর্ণচ্ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেননি। আবু তালিবের সংগ্রহে আধুনিক ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে ; কিন্তু অধিকাংশ গান তিন স্তবকের ; ৪ স্তবক-বিভাগের গান তুলনায় স্বল্প (১৩, ১৬, ৩৯-৪৩ পদাদি)। রফিউদ্দীনের ভাবসঙ্গীতে সম্প্রদায়ের এক-দাঁড়ি ও দু'দাঁড়িতে পূর্ণচ্ছেদের রীতি বজায় আছে। মনসুরউদ্দীনের সংগ্রহকে সম্পাদনা করেছেন হাই। সেখানে কমা, সেমিকোলনাদির সঙ্গে এক দাঁড়ি, দু'দাঁড়ি ব্যবহৃত ; কিন্তু এগুলির যুক্তি বা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনো ত্রিপদীর পংক্তিবিন্যাস করা হয়েছে। স্তবক বা পূর্ণচ্ছেদযুক্ত চরণ সংখ্যা ৩/৪/৫/৬/ (১০৫ পদ) ; এমনকি ৭টি স্তবকের পদ পাওয়া যায়।[১৯]

প্রায় সমস্ত সংগ্রহগীতিতে, পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে, অন্ত্যমিলযুক্ত ক্ষুদ্র পংক্তিগুলি দ্বারা স্তবক নির্মাণ করা হয়েছে। এসমস্ত পংক্তির মধ্যে কখনো কখনো মিত্রাক্ষর থাকে ; কখনো থাকে না। প্রাচীন পুঁথির ঢং-এর বিরতি চিহ্ন ব্যবহার করেছে ভাবসঙ্গীত। সেখানে পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন দু'দাঁড়ি ; স্বল্প-বিরতি চিহ্ন এক দাঁড়ি + ঃচিহ্ন ; বা 'ঃ' চিহ্ন। এই ছেদগুলি পংক্তির মধ্যেও

পড়ে। অর্থাৎ চরণগুলি গদ্যের মতো টানা লিখিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিত লালন গীতিকায় কোন গানে এক দাঁড়ি, দু দাঁড়ি, ব্যবহৃত (২৮১, ২৮৭, ২৮৯, ১৯৪)। কোথাও শেষ চরণে এক দাঁড়ি (৩৯৬)। কমা, সেমিকোলন ও আধুনিক পংক্তিসজ্জা আছে এখানে।[২০] সম্পাদকদের সজ্ঞান হস্তক্ষেপের ফলে লালনের গানের বাহ্যিক ঐতিহ্যবাহিত কাঠামোটির পরিচয় আমরা পাই না। ভাবসঙ্গীতে এ কাঠামোর আদলটি রক্ষিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার ভারতীতে, 'সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'—গানটি তিন স্তবকে প্রকাশ করেছেন। ১, ২, ৩ সংখ্যা দিয়ে স্তবকগুলি চিহ্নিত। কাঙালের গানের মধ্যে বা অন্যান্য বহু বাউল গায়কের খাতায় এই সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত পূর্ণচ্ছেদযুক্ত চরণ পাওয়া যায়। ভোলাই-এর খাতায় বা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের গানের খাতায় সংখ্যা ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু গদ্যের মতো লিখিত চরণে দু'দাঁড়ি ব্যবহার করে পূর্ণচ্ছেদ দেয়া হয়েছে। ভোলাই-এর খাতায় একদাঁড়ি, + ঃ চিহ্ন বা ঃ চিহ্ন দিয়ে, ছেদচিহ্ন দিয়ে তাল নির্দেশিত হয়েছে। (নরহরি তাল-সমাপ্তিকে 'মান' বলেছেন)। সাধারণ গায়কেরা এই পূর্ণচ্ছেদযুক্ত চরণকে 'কলি' বলে।[২১] ভাব ও তাল-সমাপ্তি চিহ্ন দু'দাঁড়ি দিয়ে চিহ্নিত হয়। এই দু'দাঁড়ি কলির স্মারকচিহ্ন। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ প্রভৃতি সংখ্যা দিয়ে (বামে) কলিগুলি লিখিত হয়। মুর্শিদাবাদ-নদীয়ার বাউল সাধক-পদকর্তাদের স্বহস্ত-লিখিত খাতায় এই সংখ্যাচিহ্নিত কলিবিভাগ আছে।[২২] জলধর সেন সম্পাদিত ফিকিরচাঁদের সংগীতসংগ্রহে সংখ্যাচিহ্নিত কলিবিভাগ রক্ষিত হয়েছে। 'মনের মানুষ' গানটির সংশোধিত পাঠে (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২২, প্রবাসী) রবীন্দ্রনাথ পূর্ণচ্ছেদের ডান দিকে সংখ্যা ব্যবহার করে, ৭টি কলিতে গানটি বিভক্ত করেছেন। শেষে কবির মন্তব্য, "৪র্থ ও ৬ষ্ঠ কলির সুর, ২য়ের অনুরূপ, এবং ৫ম ও ৭ম কলির সুর ৩য়ের অনুরূপ" (পৃ ৩২৪)। সাধারণভাবে চরণকে কলি বা অন্তরা নামে চিহ্নিত করেন লোকগায়েকরা। মৌখিক গানে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। এগুলি সম্পাদকদের নিজস্ব হস্তক্ষেপ। এ গানের লেখ্য রূপের ছেদচিহ্নগুলি পুঁথির ঐতিহ্য থেকে নেয়া। কলিবিভাগ এ গানের প্রাচীন রীতি।

সাধক-গায়কেরা লালনের গানকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন।[২৩]

প্রথম অংশকে বলা হয় : মুখপাত/ উদ্ভব/ধরণ। তুলনায় ক্ষুদ্র এক চরণ দিয়ে এটি গঠিত হয়। 'ঃ' ছেদ দিয়ে বা একদাঁড়ি/ ঃ। দিয়ে একে চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয় অংশের নাম : পর ধরণ/ধরণতরি/ কোল অন্তরা। এটিও ঃ। দিয়ে বা দু'দাঁড়ি দিয়ে চিহ্নিত হয়। প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড মিলে এক দাঁড়ি বা দু'দাঁড়ি দিয়ে একটি চরণ গঠিত হয়।

তৃতীয় অংশকে বলা হয়, কলি বা অন্তরা। এখানে মূল বক্তব্য বিস্তৃত হয়। লালনের গানে ২ থেকে ৪ কলি থাকে। কলিগুলি প্রথম দুটি অংশের চাইতে অনেক বড় হয়। গানের প্রথম দু'খণ্ড মিলিতভাবেও সাধারণ কলির চাইতে ক্ষুদ্র জন্য অনেকে একে, 'অর্ধকলি'/আধকলি হিসাবে গণ্য করেন। শেষ কলির শেষাংশে সর্বদা লালন ভণিতায় নিজের নাম, গুরুস্মরণ, মত বা মন্তব্য প্রকাশ করেন। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের তিনটি প্রধান বিভাগ : আলাপ, স্থায়ী, অন্তরা। প্রচলিত লালনগীতির প্রথম খণ্ড বিবৃতিধর্মী, তালমান-বহির্ভূত 'অনাহত' আলাপ। কলি বা অন্তরা লয়, তালবদ্ধ ; গানের শেষাংশে সুর চরমে উঠে শেষ হয়ে যায়।[২৪] এ

গানগুলিতে 'স্থায়ী' অংশটি স্পষ্ট নয়। গায়কেরা প্রায় সব কলিগুলিকেই ফিরিয়ে গান। লালনের সমাপ্তি অংশটি কবীর বা মীরার বা বৈষ্ণব মহাজনদের ভণিতার স্মারক। মার্গসঙ্গীতে ব্যক্তির ভাব বা আবেগ প্রকাশের পথ ছিল অবরুদ্ধ। কিন্তু লোকায়ত বাউল গানে ব্যক্তির মত, মন্তব্য, আবেগের প্রকাশ ঘটেছে জন্য বাঙালির হৃদয়-অন্তঃপুরে এদের প্রবেশ হয়েছে অবারিত। রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রাধান্য ও কাব্যরচনা এর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে চিহ্নিত করে, সুরকে গৌণ স্থান দিয়েছেন এ ধরনের গানে।[২৫] লালনের গান কথাপ্রধান ; বক্তব্যনির্ভর। লোকগায়কেরা লালনের গানের সুরকে 'সহজসুর' বলেন। রাগিণী বা অলঙ্কার কম এতে।

লালনের গানের ধরণ, পরধরণ এবং কলিগুলির মধ্যে অন্ত্যমিল থাকে— চরণান্তিক মিল বা মিত্রাক্ষর হিসাবে। পূর্বোক্ত আলোচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে ৬৮ নং গানটি উদ্ধৃত করা যায়—
(ধরণ) আমার এ ঘরখানা কে বিরাজ করে ঃ।
(কোল ধরণী) তারে জনমভরে একবার দেখলাম নারেঃ।
(কলি) (১) নড়ে চড়ে ইশান কোনে, দেখতে পাইনে এ নওনে হাতের কাছে তার ভাবের হাট বাজার ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে॥
(২) সবে কয় শে প্রানো পাখি সনে চুপে চাপে থাকি জলকী হুতাশোন মাটীকী পবন কেউ বলে না একটা নিন্নয় করে ঃ॥
(৩) আপন ঘরের খবর হয় না বাঞ্ছা করি পরকে চেনা, লালন বলে পর বল্তে পরমেশ্বর শে কেমন রূপ আমি কি রূপ ওরেঃ॥
পাণ্ডুলিপিতে এ গানটিতে যথাযথ স্থানে যথাযথ ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। কলির সংখ্যাগুলি আমাদের দেয়া। স্থানবিশেষে ছেদচিহ্ন ব্যবহারের ভ্রান্তি এ পাণ্ডুলিপিতে চোখে পড়ে। কিন্তু চরণান্তিক অন্ত্যমিল দিয়ে চরণ বা কলিগুলিকে সহজেই সনাক্ত করা যায়।[২৬] পূর্বোক্ত গানটিতে চরণান্তিক মিল করে ঃ নারে ঃ তারে ঃ করে ঃ ওরে। প্রায় সমস্ত লালনগীতিতে পূর্ণচ্ছেদচিহ্নগুলি একই মিত্রাক্ষর দ্বারা আবদ্ধ। এ গানটিকে 'সাড়ে তিন কলি'-এর গান বলা হয়। সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত কলিগুলি অপেক্ষা সূচনার কলি এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্যের। প্রথমাংশের পর্বসংখ্যা পূর্ণকলি অপেক্ষা কম। এটি আর এক ধরনের লালনগীতিকার বৈশিষ্ট্য। গায়ক এবং সাধকেরা প্রায় সকলে বলেন যে লালনের গান ২, ৩ কলির (২$\frac{১}{২}$ / ৩$\frac{১}{২}$) ; ৪ কলির গান তার তুলনায় কম। ভাবসঙ্গীতে পাপপুণ্যের কথা (৫৩৩ নং পদ) প্রভৃতি খুব কম ৪ কলির গান আছে।[২৭] দুদ্দু শাহের গান ৪ কলি বা তারও বেশি। হাউড়ে গোঁসাই বা গোপাল গোঁসাই-এর পদ বড়। প্রাচীন চর্যাপদ মূলত ১০টি চরণ দ্বারা গঠিত। দু'টি চরণ দিয়ে গঠিত হয়েছে শ্লোক ; দু'চরণে থাকে অন্ত্যমিল। পঞ্চাধিক শ্লোক দ্বাবা গঠিত চর্যাপদকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। অর্বাচীন চর্যাগানে ৪ বা ৫ কলির পদের প্রাধান্য আছে।[২৮] আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে একাধিক হস্তাক্ষরের জন্য এবং মৌখিক শিক্ষার গুরুত্ব অর্থাৎ সুর, লয়, তাল মান মূলত মুখে মুখে শিক্ষণীয় ছিল জন্য ; লেখায় কথাকে ধরে রাখা হয়েছে। বহু স্থলে ছেদ বা কলিবিভাগেব চিহ্নগুলি স্পষ্ট নয়। কখনো সূচনার দু'টি খণ্ড এক দাঁড়ি ও ঃ চিহ্ন দিয়ে ; কখনো মুখপাতে এক দাঁড়ি, ধরণে দু'দাঁড়ি পাই। কখনো দাঁড়ির পরিবর্তে ছেদ ঃ ব্যবহৃত। একদাঁড়ি পূর্ণচ্ছেদেও ব্যবহৃত হয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ পাণ্ডুলিপিতে লালনের গানের কলি দু'দাঁড়ি ও 'ঃ' এই ছেদচিহ্নে

সমাপ্ত হয়েছে। স্বল্প-ছেদের চিহ্ন ঃ ; অর্ধচ্ছেদ একদাঁড়ি, পূর্ণচ্ছেদে কলি সমাপ্ত দু'দাঁড়ি দিয়ে—এ আদর্শ নিয়ম পাণ্ডুলিপির সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। কিন্তু সাধক-গায়কেরা গানে কলিসংখ্যা স্মরণে রাখেন, মুখপাত এবং কোল অন্তরার সুরের, তালের পার্থক্য সঠিক রাখেন। উচ্চারণ-বিকৃতি বা দু'একটি শব্দের হেরফেরের জন্য লালনের গানের ব্যাহ্যিক গঠনভঙ্গি তাঁরা পরিবর্তন করেন না। কলি বর্জিত হয় না, দীর্ঘায়ত হয় না ধরণ বা কোল অন্তরা ; ভণিতায় লালনের নাম কখনো বাদ যায় না। সামান্য পরিবর্তন সত্ত্বেও, এ সমস্ত গানের মূল কাঠামোটি অপরিবর্তিত থাকে বলে, রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন।[১৯] মৌখিক লোকসাহিত্যের মতো এগুলি পরিবর্তনশীল নয় বলে মন্তব্য করেছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।[২০]

গায়কদের ধারণা যে লালনের অধিকাংশ গান তিন কলির ; বা ২ $\frac{১}{২}$ কলির ; সামান্য কিছু গান ৪ কলির—তদূর্ধ্বের গান তাঁর নেই। এ ধারণাটি যথার্থ। সূচনার ধরণ ও পরধরণকে কলি-গনণার বাইরে রেখে বা আধ-কলি হিসাবে গণনা করলে দেখা যায় যে, পাণ্ডুলিপির অধিক সংখ্যক গান ৩ কলির; ৫টি অন্ত্যমিলে আবদ্ধ।

৪টি অন্ত্যমিলের দ্বারা পরিবেশিত দু'কলির গান পাই—১, ১৪, ১৮, ৩২, ৩৮, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৯, ৬৩, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৫, ১০৩, ১০৭, ১০৮, ১১৫, ১২৯, ১৩৯, ১৪৯, ১৫৮, ১৬৭, ১৭৬, ১৮১, ১৯০, ২০০, ২০৭, ২১৫, ২৩০ প্রভৃতি পদে।

তিনটি চরণান্তিক মিত্রাক্ষরে দু'কলির গান—১০০, ১৫৫, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ২৭০, ১৮২, ১৬৮, ৪৪, ৯৫, ১৪১, ১৪২, ১৩৯, ১৪৯, ১৫২, ৩১৭, ৩১৮ প্রভৃতি।[২১]

৪ কলির পদের (৬টি অন্ত্যমিল) উদাহারণ—৯, ১০, ১৪, ১৭, ২০, ৩৫, ৮৭, ১৬০-১৬১, ২৫৯, ৩৩২-৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬-৩৬৭।

৬টি ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১০৪, ১৩০, ১৬৩, ৯১, ৯৪, ৯৭, ২৬৭, ২৭৫, ২৭৯, ২৬৩, ২৫৭, প্রভৃতি পদে—এগুলিই পাণ্ডুলিপির সর্বাপেক্ষা বড় গান।

পাণ্ডুলিপির কলিবিভাগের সঙ্গে গানের ব্যবহৃত শব্দের বা আয়তনের সম্পর্ক আছে। যেমন চার কলির গান ৯ বা ১০ নং পদে ৯০টির বেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; অন্যপক্ষে ৯৫, ১০০ প্রভৃতি পদে ৬০টির কম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[২২]

সুতরাং লালনের অধিকাংশ পদ তিন কলির; এছাড়া দুই বা ৪ কলির পদ কিছু আছে। দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া ধরণ, পর ধরণ (কলি-বর্হিভূত) এবং কলিগুলি মিত্রাক্ষর দ্বারা সমাপ্ত এবং অসমপদী কলিগুলিতে অন্তপার্বিক মিত্রাক্ষর রয়েছে জলধর সেন সম্পাদিত ফিকিরচাঁদের গীতাবলীতে, সাধক পাঞ্জু শাহের পুত্র রফিউদ্দীনের ভাবসঙ্গীতে এবং কর্তাভজা তাত্ত্বিক মনুলাল মিশ্রের ভাব-লহরী-গীতে। হাউড়ে, যাদবিন্দু, কুবের, লালন প্রভৃতির গান একদাঁড়ি ও দু'দাঁড়ি দিয়ে কলিবিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। এরা সাধনজগতের সঙ্গে জড়িত। অসাধক বুদ্ধিজীবী সংগ্রাহক ও সম্পাদকেরা আধুনিক ছেদ, চরণ ও স্তবক-বিভাগ অনুসরণ করেছেন।

লালন-পদাবলীর মিত্রাক্ষরের ব্যবহারে অভিনবত্ব আছে। কলিগুলির এবং সূচনার দু'খণ্ডের মধ্যে মিত্রাক্ষরের বহু বৈচিত্র্য লালনে। এধরনের মিত্রাক্ষরে একাক্ষরী মিলের দিকে লালনের ঝোঁক বেশি। এই ঢংটি C V হলে ঃ মেলে ঃ বলে ঃ ভুলে ঃ সুহালে;

ভেয়ে ঃ ঠায়ে ঃ পেএ ঃ ভেয়ে ঃ কায়ে;

খেলা ঃ বলা ঃ ঘোলা ঃ উজ্জালা ঃ কালা;

অথবা শুধু ব্যঞ্জনের মিল C (V)

সদায় ঃ দেয় ঃ ভাগ্নদয় ঃ দিদায়;

কর ঃ অধার ঃ বার ঃ আর;

কোন কোন গানে এক স্বরের মিল দেখা যায়;

ফিরে ঃ রাখে ঃ আগে ঃ ডাকে (৯৫);

লেখেছে ঃ মারুফতে ঃ বুজিতে, পথে (৯৪);

দিএ ঃ হএ ঃ প্রকাশিএ ঃ জেএ ঃ খেএ;

সোই ঃ নই ঃ শুধাই ঃ হই ঃ কই;

যৌগিক স্বরের মিল আছে লালনের গানে (V V)

তাই ঃ বাদাই ঃ সাই ঃ সবাই;

পাই ঃ নাই ঃ বড়াই ঃ গোসাই ঃ ডরাই;

—য়-এর সঙ্গে এ বা ই-এর অভিন্নতার সূত্রে রচিত হয়েছে মিত্রাক্ষর—

কানাই ঃ পাই ঃ ধুলায় ঃ জাই ঃ তাই;

জায় ঃ পায় ঃ হয় ঃ মহাশয়, এরাএ (য়, য়ে, এ)

আমায় ঃ গায় ঃ হত্র ঃ জায় ঃ ঘাএ;

দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণগত পার্থক্য না রেখে অন্ত্যমিল সৃষ্টি করেছেন লালন—প্যারী ঃ ধারী ঃ আহামরি ঃ পুরি ঃ হেরি ঃ সুমাধুরী।

পবিত্র সরকার অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ সমবর্গের মিলকে গ্রাহ্য বলেছেন কিন্তু র, ড়, ঢ়-এর মিল বা ঘোষবর্ণের সঙ্গে অঘোষ বর্ণের মিল তার না-পছন্দ।[৫৫]

লালনের অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণে অন্ত্যমিলের উদাহারণ—

হাটে ঃ ফেটে ঃ ওঠে ঃ ঘাটে ঃ ঘটে;

ভাবকী ঃ হবে কি ঃ আখি ঃ দেখি ঃ পাখী;

ক্ষেপা ঃ ছাপা ঃ ওফা ঃ ক্ষেপা ঃ ঝাপা;

হাতে ঃ ডেমাতে ঃ পথে ঃ মতে;

র এবং ড় এর মিল—

পারে ঃ পরে ঃ ফেরে ঃ প্রকারে ঃ ধুড়ে;

ধুড়ে ঃ পোড়ে ঃ দেখিবে ঃ কুড়ে ঃ ভেড়ে;

ঘোষ ও অঘোষ বর্ণে মিল রচনা করেছেন লালন—

কাছে ঃ গিয়াছে ঃ ধেইএছে ঃ মাজে (ঝ);

নিধি ঃ বিবাদী ঃ সিদ্দি ঃ বধি (৯৩);

ব্যঞ্জনধ্বনি-সাম্যের উপর নির্ভর করে নানা ধরনের মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে—

ক, খ, গ-এর মিল—ফিরে ঃ রাখে ঃ আগে ঃ ডাকে (৯৫, এখানে পূর্বস্বরের মিল রক্ষিত হয়েছে);

ছ, জ ও ষ-এর মিল—আছে ঃ সেজে ঃ মিসেছে ঃ শেষে ঃ খোজে;

রি ও শ্রী-এর মিল —নাগরি ঃ শ্রী (১৭১);
প, ফ, ভ-এর মিল—পাবে ঃ হবে ঃ তপে ঃ লোভে ঃ ভাবেতে (৭৪/৭৫);
ত, থ, ছ-এর মিল—লেখেছে ঃ মারুফতে ঃ বুঝিতে ঃ পথে;
নাসিক্য ব্যঞ্জনে মিল ম, ন—আমি ঃ স্বামী ঃ রহমী ঃ জানি;
চ, ছ এবং শ (স)-এর মিল—ধরেছে ঃ করেচে ঃ কাছে ঃ আশে ঃ দেসে,
কাছে ঃ জুড়েছে ঃ বশে ঃ পড়েছে ঃ মেতেছে;
অসম ব্যঞ্জনের মিলে লালন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বস্বরের মিল রেখেছেন।
লালন -রে-, না প্রভৃতি শব্দাংশযোগে অন্ত্যমিল সৃষ্টি করেছেন।
রশোনা ঃ বেচপেনা ঃ জানা ঃ ঠেকেনা (৩৮);
বারামখানা ঃ ভজল না ঃ ঠেকেনা ঃ গেল না ঃ হলো না (৩৯ খ);
কোরে ঃ কবিরাজেরে ঃ রে ঃ লালোসেরে ঃ বিগারে রে (৩৪);
শব্দ + শব্দাংশের মিল সৃষ্টি করে লালন অতিলালিত্যে এক ধরনের উপল-ব্যথিত গতির বন্ধুরতা সৃষ্টি করেছেন। যেমন—
ফুল ঃ মূল ঃ স্থূল ঃ ভূল ঃ উল (২১);
গেলোনা ঃ চোনা ঃ না ঃ টানা ঃ দোটানা;
নে ঃ মনে ঃ কেনে ঃ নয়নে;
কুদরতি ঃ বাতি ঃ রাতি ঃ অতি ঃ গতি;
মদিনে ঃ দিনে (১১৬),
আধার ঃ বার ঃ আর;
একাধিক অক্ষরের মিল সৃষ্টিতেও লালন দক্ষ—
গালায় ঃ দোলায় ঃ নালায় ঃ তলায় ঃ হেলায়;
মেতিয়ে ঃ গুতিয়ে ঃ পেতিয়ে ঃ কুতকুতিয়ে ঃ বেজেতিএ (ত্‌'+ ই'+ য়্‌'+ এ') (১০৪);
কিংবা ঃ চিনিলাম না ঃ দেখিলাম না (১৪৬);
(CVCVCVCV-এর মিল)
কল কাটী ঃ মাল কুটী ঃ ঘরবাটী (১৪৪);
বেহার ঃ নেহার (২৪৩);
অন্ত্যমিলের প্রয়োজনে শব্দে স্বর যুক্ত হয়েছে কোথাও—
কোপীনী ঃ অপমানি (২৫১);
গোরা ঃ ধরা ঃ হারা ঃ চমতকারা ঃ তারা (৮৪);
জগোতে ঃ দেক্‌তে ঃ চিন্তে ঃ চিন্তে ঃ সতন্তে;
যুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত বিভক্তি—
হাতে ঃ চোক্ষেতে.....(১০৬);
জানি ঃ কোপীনি........(১২৪), গোম্ভিরি (৫৪);
দেশেতে (১৯৪), দীপ্তকারা (৩০), বরাবরি (২৭)।
দুটি ই, উ, ন-এর ভেদ মিত্রাক্ষরে স্বীকৃত নয়। তিনটি -শ- বা -র-এর য়, য়ে, -এর মিল

লালন বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। মিত্রাক্ষরের পর্বে অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করে তিনি লালিত্য বর্ধন করেছেন এবং অতিলালিত্যকে পরিহারও করেছেন। শ্রুত্যনুপ্রাস কত অভ্রান্ত হয়, অন্তত একটি গানে লালন অভিনব অন্ত্যমিল দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন—

বুজে (ঝ) ঃ সুজে ঃ চুমকেচে ঃ বংশো জে ঃ মজে (১০১)। এধরনের মিল বাংলা কবিতায় অভাবিত। বা ঘরে ঃ ধরে ঃ দারিদ্রে (১৬৩)। লালনের মিত্রাক্ষরগুলির মধ্যে অজস্র ভঙ্গি ও বৈচিত্র্য আছে। কখনো ক্রিয়া দ্বারা গঠিত অন্ত্যমিল—হয় ঃ রয় ঃ হয় ঃ রয়ঃ জায় (১২৫); কখনো গঠিত বিশেষ্য দিয়ে—(জানি ঃ) কোপীনি ঃ গৌরমনি ঃ জননী ঃ বানী; কখনো নেতি-প্রাধান্য—মেলে না ঃ ভজলেম না ঃ হলো না (৮৩)। নির্দিষ্ট একটি প্যাটার্নের আবর্তন নেই গানে। ভঙ্গি গড়ে আবার লালন ভেঙে দেন। সুদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত সময়ের পটে রচিত গানে অভিজ্ঞতা ও অনুভবের অনেক বৈচিত্র্য লালনের।

কলির মিত্রাক্ষর ছাড়াও, কলির বিভিন্ন পর্বের মধ্যে অন্ত্যমিল আছে লালনের গানে। গানের কলিগুলিতে অনেক পর্ব এবং বিচিত্র শ্রুতিসুভগ অন্ত্যমিল পাওয়া যায়। এতে (১) সূচনায় পর্বসংখ্যা এবং অন্ত্যমিল কম, (২) শেষ কলির ভণিতায় আন্তঃপর্বিক মিলকে ভেঙে দেয়া হয়, (৩) কলির মিত্রাক্ষর এবং আন্তঃপর্বিক মিল স্বতন্ত্রভাবে ও সমান্তরালে ব্যবহৃত হয়, (৪) চরণান্তিক মিত্রাক্ষরের সঙ্গে কোন কোন সময় আন্তঃপর্বিক মিলের যোগ থাকে, (৫) কলির পর্বসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি বা অন্ত্যমিলের রকমফের ঘটে বিষয়বস্তুর দাবিতে, (৬) উনিশ শতকের অতিললিত মিলের একঘেয়েমিকে অমিল পর্ববিন্যাস করে, লালন ভেঙে দিয়ে সৃষ্টি করেন অপূর্বতা। এটি তার বিষয়বস্তুর নাটকীয়তা ও শিল্পরূপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দেয়। পূর্বোক্ত আলোচনার উদাহারণ হিসাবে ১১ নং পদটি তুলে ধরা যায়। মুখপাতে ৬টি পর্ব, মিলগুলি হচ্ছে—বরসা ঃ ভরসা ঃ দশা ঃ প্বরে ঃ চরণ ঃ ফেরে। প্রথম তিনটি পর্বের মিলে, দু'টিতে (সামান্য অমিল) CV CV CV তৃতীয় পর্বের হ্রস্ব হয়ে মিল VCV। চতুর্থ এবং ষষ্ঠ পর্বের মিল একাক্ষরীর অধিক (প, ফ) এবং এটি চরণান্তিক অন্ত্যমিলের অংশ। পঞ্চম পর্বটি মুক্ত, এ অমিল অন্য মিলগুলিকে উজ্জ্বল করেছে।

১ম কলিতে ৭টি পর্ব; প্রথম তিনটিতে আছে মিল—হএ ঃ রয় ঃ জাএ (ক্রিয়া); চতুর্থ ও সপ্তমে ভিন্ন মিল—পরে ঃ যারে (সর্বনাম); এটি চরণান্তিক মিত্রাক্ষরের সঙ্গে যুক্ত। মাঝখানে ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্বদুটি মুক্ত অমনি ঃ ব্রথা, কিন্তু এই অমিলের পূর্বে ও পরে আছে মিল। ২য় কলিতে ৬টি পর্ব; মিল ও অমিল অন্তর (অন্তরে) ঃ বৎসর ঃ যন্ত্র ঃ প্যারে ঃ যন্ত্রী ঃ মোরে—প্রথম দু'পর্বে মিল; তৃতীয় ও পঞ্চম মুক্ত; চতুর্থ ও ষষ্ঠের মিল চরণান্তিক মিত্রাক্ষরের সঙ্গে যুক্ত। ৩য় কলিতে ৭টি পর্ব; প্রথম তিনটিতে মিল—নামটী ঃ খাটী ঃ জদি; চতুর্থ ও সপ্তম চরণান্তিক মিত্রাক্ষরের সঙ্গে যুক্ত, মাঝে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব মুক্ত—বলে ঃ সাই। এ থেকে একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটেছে, তা হলো চরণের সূচনায় মিলের প্রাবল্য; চরণ-সমাপ্তিতে তা ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয় এবং সেখানে চরণান্তিক মিত্রাক্ষর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বিশেষ ঢং-এর পুনরাবৃত্তি অপেক্ষা, বৈচিত্র্যই লালনে অধিক। দাশরথি প্রমুখ রচনাকারের মতো অন্ত্যমিল তাঁর গানে পীড়াদায়ক নয়। উনিশ শতকীয় লোকসাহিত্যের কৃত্রিম যমক অনুপ্রাসের প্রসাধন লালনের সাধনসঙ্গীতে অনুপস্থিত। ড. শিশির দাশ রামপ্রসাদ-ব্যবহৃত, জাননা ঃ সোনা—অভাবিত

অন্ত্যমিলটির আলোচনা করেছেন। বহুব্যবহারে শব্দের মতো অন্ত্যমিলও মলিনতাপ্রাপ্ত হয়ে যাদুধর্ম হারিয়ে ফেলে। কিন্তু জনজীবনের অনন্ত অনুভব এবং বিচিত্র শব্দভাণ্ডার থেকে আগত লালনের অনেক মিলই অভাবিত এবং অমলিন। লালনের মিলবিন্যাস একমুখী নয়, তা বহুমুখী এবং জটিল। ঐকতানবাদ্যের মতো তা থেকে জাত হয় বহুমুখী ধ্বনিসঙ্গীতের।

৩৩৭ নং পদে কলির মিত্রাক্ষর—জানে ঃ ভুবনে ঃ মনে ঃ সেইখানে ঃ চিনে। মিলের সাধারণ সূত্র-নে-(CV); এবং পূর্বস্বরগুলি ভিন্ন (অ. আ. ই)। এ গানে পর্বান্তিক মিলগুলি, চরণান্তিক মিল থেকে স্বতন্ত্র।

মুখপাতের দুটি খণ্ডে পর্বান্তিক মিল নেই। তিনটি কলির ৭টি করে পর্বে অযুগ্ম সংখ্যার পর্বে অমিল এবং যুগ্ম-সংখ্যার পর্বে মিল আছে। মিলগুলি হলো—

বিচার ঃ প্রচার ঃ সার [২, ৪, ৬ পবে মিল; বিশেষ্য পদ, চার, চার, আর]

হয় ঃ পায় ঃ রয় [২, ৪, ৬ পর্বে মিল; ক্রিয়াপদ]

পদার্থ ঃ ভ্রান্ত ঃ মহন্ত [২, ৪, ৬ পর্বে মিল; সূক্ষ্ম ধ্বনিসাম্য থ; ত ০ ত] এখানে অতিমিল নেই; মিলের মধ্যে মুক্ত পর্বগুলি বিন্যস্ত।

২৭১ পদে চরণান্তিক মিল— জায় ঃ দেয় ঃ হয় ঃ কোথায় ঃ গলায়। পর্বান্তিক মিলও অমিল, মুখপাতে নেই পর্বান্তিক মিল।

১. শুজোন ঃ তহবন ঃ শাজায় ঃ মরিলে—প্রথম দুটিতে মিল; তৃতীয় পর্ব চরণান্তিক অন্ত্যমিলের সঙ্গে যুক্ত; পরের পর্ব মুক্ত।

২. ধরে ঃ করে ঃ জথায় ঃ হয় ঃ কথায়—প্রথমে দুটি পর্বে মিল;পরবর্তী তিনটি পর্ব কলির মিত্রাক্ষরে যুক্ত।

৩. হয়না ঃ মরা ঃ করণ ঃ ছাড়া ঃ সর্বদায় ঃ বলে ঃ করো ঃ এখানে ২ ও ৪-এ মিল, ৫ চরণান্তিক অন্ত্যমিলের সঙ্গে যুক্ত; অন্য পর্বগুলি মুক্ত।

এখানে তিনটি কলিতে ত্রিবিধ অন্ত্যমিলের রীতি অনুসৃত হয়েছে। এই বৈচিত্র্য এবং অমিল পর্ববিন্যাসের দক্ষতা লালনের মিত্রাক্ষর-যোজনার রম্য বক্রতার সৃষ্টি করেছে।
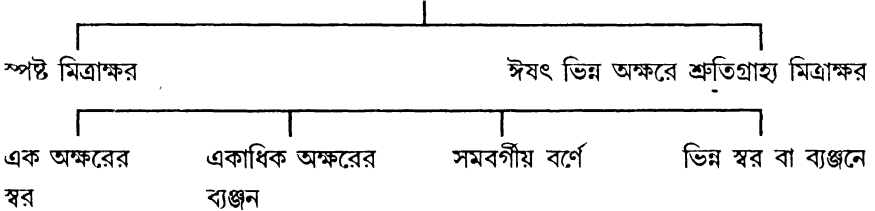
নির্দিষ্ট দু'টি ভঙ্গি লালনের গানে পাই—(১) কলিগুলি একই মিত্রাক্ষরে আবদ্ধ, (২) যুগ্ম-সংখ্যার পর্বে মিত্রাক্ষর, অযুগ্মে অমিল। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও অ্যানেক। নিয়মিত প্যাটার্ন ভেঙে মিলের মাঝে, চকিত, অমিল পর্বের বিন্যাসে তিনি ধ্বনিসংঘাত ও অভাবিত রমণীয়তা সৃষ্টি করেছেন। উনিশ শতকীয় অতিমিল ও অনুপ্রাসের ঘনঘটা লালনকেও প্রভাবিত করেছিল। শব্দবিশেষকে বহুবার পদে যমক অনুপ্রাসের ঢং-এ তিনিও ব্যবহাব করেছিলেন।

কিন্তু এধরনের ব্যবহারেও তার বিশেষত্ব আছে। উদাহারণস্বরূপ ২৯৪ নং পদটি আলোচনা করা যায়—

আমি কি দোশ দিবো কারে রে ঃ। আপন মনের দোশে পলেম সুবুদ্দি সুভাব গেলো ঃ কাগের সবাব মনের হলো ঃ তেজিয়ে অম্রেতো ফল মাখাল ফলে মন মজিলো রে।। জে আশায় ভবে আশা ভাঙ্গীলো সে আশার বাসা ঘটীলো একি দুদ্দশা ঠাকুর গোড়তে বান্দর হলো রে।।

এখানে ১ম চরণে অন্ত্যমিলের জন্য বা অনুপ্রাস হিসাবে দোশ-শব্দের উপর নির্ভর করা হয়নি। শাক্ত পদে যমক, অনুপ্রাস এবং মিত্রাক্ষর হিসাবে -আশা- শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৪] লালন তা অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তার রীতিটি স্বতন্ত্র। এখানে পর্বান্তিক মিল আশা ঃ বাসা ঃ দুর্দ্দশা। যমক হিসাবে পৌনঃপুনিক ব্যবহারে এখানে আশার অপূর্ণতা ব্যঞ্জিত হয়েছে. তাছাড়া আশা শব্দের ধ্বনিগত বৈচিত্র্য আছে আশা ঃ আশায় ঃ আশার! এই ধরণের সচেতন শিল্পরীতি, অনুপ্রাস যমকের একঘেঁযেমি থেকে তাঁর মিত্রাক্ষরকে মুক্ত রেখেছে।[৫৫]

অন্ত্যমিল ও পর্বান্তিক মিলের কয়েকটি লালন-ব্যবহৃত রূপকল্প নিম্নরূপ—১৫ নং পদ

মুখপাত : ক। খ। গ।। ঘ। ঙ। গ।।

কলি : ১ : চ। ছ। ছ। ছ। গ।।

কলি : ২ : জ। ঝ। জ। ঝ। ঝ। গ।।

কলি : ৩ : ঞ। ঞ। ঞ। ট। গ।।

১৮ নং পদ

মুখপাত : ক। খ। গ।। ঘ। ঙ। গ।।

১ম কলি : (চ)। ছ। জ। ছ। ঞ। ছ। ট। গ।।

২য় কলি : () ঠ। ড। ঢ। ড। ণ। ড। ত। গ।।

৩য় কলি : ড। থ। ড। থ। গ। থ। গ।।

বন্ধনীভুক্ত অংশগুলি অতিপর্ব।

২০ নং পদ

মুখপাত : ক। ক। খ।। () গ। ঘ। ঙ। চ। ছ। খ।।

১ম কলি : জ। ঝ। ঙ। জ। জ। ঙ। ঞ। ঙ। ঙ। জ। ঙ। খ।।

২য় কলি : ট। ঠ। জ। ড। ঢ। জ ( ) ঙ। ঙ। ণ। জ। খ।।

৩য় কলি : ( ) ক। ক। খ। ক ( ) ক। খ। ত। থ। জ। থ। জ। জ্ঞ। ঘ।।

৭১ নং পদের অন্ত্যমিল রীতি ভিন্ন—

মুখপাত : ক। ক। খ। গ ঃ।। ঘ। ঙ। চ। ঙ। ছ। ঙ। ক। গ।।

১ম কলি : জ। ঝ। ঞ। ঝ। ট। ঠ। ড। ঠ। ঢ। ঠ। ণ। গ।।

২য় কলি : ক। ত। ক। ত। ক। থ। দ। থ। ক। থ। ধ। গ।।

৩য় কলি : ন। প। ফ। প। ঠ। ব। ঠ। ব। ঠ। ব। ক। গ।।

৭৩ নং পদটির অন্ত্যমিল ও পর্ববিন্যাস নিম্নরূপ :

মুখপাত : ক। ক। খ। গ ঃ।। ঘ। ঙ। চ। গ।।

১ম কলি. ছ। জ। ক। জ। ঝ। জ। ঞ। গ।।

২য় কলি: ট। ঠ। ড। ঠ। ঢ়। ঠ। ণ। গ।।

৩য় কলি : ত। ক। ক। থ। দ। ক। দ। ক। গ।।

৭২ নং পদটির পর্ব ও অন্ত্যমিলের রীতি—

মুখপাত : ক। খ।। গ। ঘ। গ। খ।।

১নং কলি : ঙ। ঙ। চ। ঙ। ছ। ঙ। জ। খ।।

২নং কলি : ঝ। ঞ। ট। ঞ। ঠ। ঞ। ড। খ।।

৩ নং কলি : ঢ। ণ। ত। ণ। থ। ণ। দ। খ।।

২ কলির গান ১৭১ নং পদটির অন্ত্যমিল বিশিষ্ট—

মুখপাত : ক। খ। ক। গ। গ। ক।।
ঘ। ঙ। চ। ঙ। ছ। ঙ। ক।।

১নং কলি : জ। জ। ঝ। জ। ঞ। জ। ক।।

২নং কলি : ট। ট। ঠ। ড। ঠ। জ। ঠ। ক।।

মুখপাতে (ধরণ ও পর-ধরণে) পর্বসংখ্যা কম; অন্ত্যমিলের প্রভাবও ক্ষীণতর। নানা দৈর্ঘ্যের কলি ব্যবহার করেছেন লালন। কোন গানের সব কলি সমপদী নয়। কলিতে ১২/১৩টি পর্ব পর্যন্ত পাওয়া যায়। পর্বগুলির মধ্যে মিল ও অমিল দুই-ই আছে। লৌকিক ছড়ার ছন্দের চার মাত্রার মূল পর্বের ব্যবহার লালনে অধিক। এছাড়া ছড়ার ছন্দে ৩/২ মাত্রার অপূর্ণ পদও তিনি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য কবিতার ছন্দে যেখানে ৪ মাত্রার পর্ব; একতালা গানের সুরে সেখানে মাত্রার যতি ও তাল।[৫] গানের মাত্রার সঙ্গে কবিতার মাত্রার পার্থক্য আছে। লালনের পর্ববিন্যাসের মধ্যে অতিপর্বের বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত, চন্দের সূচনায়, চরণের প্রথমে অতিপর্ব ব্যবহৃত হয়ে ছন্দকে দোলা দেয়। লালন কিন্তু কলির পর্বের মধ্যে অতিপর্ব ব্যবহার করে ছন্দকে গতি দিয়েছেন। এই পর্বগুলি স্থানে স্থানে লালনের সংক্ষিপ্ত স্বগত ভাষণের মতো। গায়কেরা উপরন্তু রে, হায়, কে গো মরি, প্রভৃতি অতিরিক্ত ধ্বনি সংযুক্ত করেন গানে, লালন নিজেও এগুলিকে ব্যবহার করেছেন।

আপনি খোদা। আপনি নবি। (আপনি শে) আদম ছফি। অনান্ত রূপ। করে ধারন। কে বোজে তার নিরাকারন। নিরাকার হা। কিম নিরাঞ্জন। মুরশিদ রূপ। ভজন পথে।। (১০ নং পদ)

(সেহিজে) অধর ধরা (জদি কেউ)। চাহে তারা। চৌইতন্ন। গুনিন জারা (গুণ শেখে) তাদের দারে। সাম্যানে কী। পারে জেতে। (সেই) কু কাপের ভি। তরে।।

আপনচোরা। আপন বাড়ি। আপনি শে লয়! আপন বেড়ী। নালন বলে। এ নাচাড়ি (কৈনে)। থাকি চুপচাবে।। (৩৩)

অব্রতো ঔ। সুধি খালি। তাতে মক্তী। নাহি পালি। লোব লালোসে। ভুলে রলি (ধিক তোরো)। লালোশে রে।। (৩৪)

(বিধাতা) দেয় বাজি (কিবা)। মন পাজি হোএ। ফেরে ফেলায়। বাওনা বুজে। বাই তোরোনি। ক্রমে তলায়।। (১৫৩)

বাংলা ভাষায় নিজস্ব ধ্বনিবৈচিত্র্য, সাধু এবং গ্রাম্য শব্দের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার এবং

ঐতিহ্যবাহিত সুচেতনায় পূর্ণ লালনের শিল্পরূপ। তাঁর শিল্প-সৃষ্টিকৌশলে নেই কোন পৃথক যত্ন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'রূপরসিক' বলে মন্তব্য করেছেন : "এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেঁয়ে নয়। ছোট বড় নানাভাবে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।"[৫৭] দুর্ভাগ্য এই যে লালন গীতিকার সমস্ত প্রকাশক-সম্পাদক, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, লালনের গানকে সংস্কৃত করেছেন।

কবীর এবং বীর শৈব সন্ত-কবিদের আলোচনা করতে গিয়ে, রামানুজন, এদের রচনায়, কৃত্রিম শিল্পরচনা থেকে এক পৃথক শিল্পরূপকে চিহ্নিত করেছেন। ভাষার 'function' থেকে অপৃথক এক ছন্দ রূপ ফুটে উঠেছে এ সাহিত্যে। এই 'rhetoric of sponteneity' লালনেরও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।[৫৮] ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, লালন-সাহিত্যের এই অকৃত্রিম সাহজিকতাকে চিহ্নিত করেছেন।

লালনের রচনায় বিচার, বিতর্ক এবং প্রশ্নোত্তরী রীতির প্রাধান্য আছে। ভাগীরথী-পদ্মা অববাহিকার মুসলমান-প্রধান এলাকায় এবং লালনপন্থী সাধুসভায় একক বা বিচ্ছিন্নভাবে লালন বা অন্য মহতের পদ পরিবেশিত হয় না। বিচার-বিতর্কের ভঙ্গিতে দু'জন গায়ক নির্দিষ্ট একটি বিষয়কে গানে পরিবেশন করে লালনপন্থী সাধুসভায়। মেলায় হাটে বা বাজারে দু'জন গায়কের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে বাউল/শব্দগানের পাল্লা এতদঞ্চলে অতীব জনপ্রিয়। প্রশ্নোত্তরের রীতিতে দু'জন গায়কের এবংবিধ গানকে নরহরি দাসের ভক্তিরত্নাকরে 'যামল' বলা হয়েছে।

দু'জন গায়কের মধ্যে একজন গুরুর, অপর জন শিষ্যের ভূমিকা গ্রহণ করে গানকে এগিয়ে নিয়ে চলে প্রশ্নোত্তরী রীতিতে। সাধুসভায় বাজনা দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টির পর; গুরু, নবী, চৈতন্য, মাতৃবন্দনার গান দিয়ে সূচিত হয় অনুষ্ঠান। তারপর দু'জন গায়ক বিশেষ একটি পর্যায় বেছে নিয়ে গান শুরু করেন। শিষ্যের ভূমিকা থেকে গায়ক মূলত প্রশ্ন করে জানতে চায়। এ পদগুলিকে বলা হয়, 'শিষ্যপদ বা নিচুপদ'। নিজের অক্ষমতা জানিয়ে যেখানে সাধনা বা তত্ত্ব জানতে চাওয়া হয়, এমন পদকে বলা হয়, 'দৈন্যপদ'; আর নিজের জ্ঞান জাহির করে অধিকতর জ্ঞানের জন্য ঈষৎ আক্রমণাত্মক জিজ্ঞাসাপূর্ণ পদকে বলে, 'রাগদৈন্য পদ'। গুরুর ভূমিকা থেকে মূলত উত্তর দেয়া হয় এবং এ পদগুলিকে বলা হয়, 'গুরুপদ/শিক্ষার পদ বা উঁচুপদ'।[৫৯] স্থূল, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ (শরীয়ত, তরিকত, হকিকত, মারুফত)—সাধনার এ স্তর-চতুষ্টয়ের আবার একেকটির চারটি করে উপবিভাগ আছে। স্থূল থেকে সিদ্ধ ক্রমিক ঊর্ধ্বগমন। এর সঙ্গে দেশ (স্থান), কাল (সময়/বয়স), এবং পাত্রের বিবেচনা মিশ্রিত হয়ে প্রশ্নোত্তরী গানের ক্রম রচিত হয়। যে কোন পর্যায়ের গান স্থূলে শুরু হয়ে সিদ্ধের স্তরে যাবে। কিন্তু গানের (সাধনারও) নিম্নগমন নিন্দনীয়। পাল্লায় ক্রম নেমে গেলে গায়ক পরাজিত হিসাবে গণিত হয়। আর সাধুসভায় অনেক সময় প্রশ্নোত্তরের ক্রমরক্ষায় অসমর্থ গায়ককে বসিয়ে দেয়া হয়। পাল্লায় দু'জন গায়ক চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সাধুসভায় ছদ্মবিতর্ক এবং প্রতিযোগিতার অন্তে গায়ক দু'জন দ্বৈত কণ্ঠে একটি সমাপ্তি-সঙ্গীত গেয়ে পর্যায়টির নিষ্কাশিত সিদ্ধান্তে ঐক্য ঘোষণা করে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং কুষ্টিয়া জেলার লালনপন্থী গায়ক ও পদকর্তাগণ স্বরচিত গানকে বা ব্যবহৃত গানের খাতায় অপরের রচিত পদকে প্রশ্নোত্তরী

রীতিতে সাজিয়ে নেন। এসমস্ত খাতায় লালনের বহু গান পর্যায়ে বিন্যস্ত করে এবং প্রশ্নোত্তরের ক্রমে গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা বা গুরুপদের সূচনায়, 'বল, বল গো, বল শুনি' যুক্ত করে এগুলিকে দৈন্যপদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর দৈন্য বা শিষ্যপদের সূচনায়, 'শুন, শুন বলি' প্রভৃতি যুক্ত করে ক্ষেত্রবিশেষে এগুলিকে গুরুপদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লালনপন্থী সাধুসভায় প্রশ্ন-উত্তরের রীতিতে লালন পদাবলী ব্যবহৃত হয়। লালন নিজে গানের পাল্লা বা 'বাহাস' করতেন এবং এ সূত্রেই বিস্তৃত হয় তাঁর খ্যাতি। সুতরাং সওয়াল-জবাবের ভঙ্গি এবং বিতর্কের রীতি অনিবার্যভাবেই তাঁর গানের কাঠামো নির্মাণ করে দিয়েছে।

বঙ্গসংস্কৃতির বিতর্ক-প্রবণতা, প্রশ্নোত্তরের এ রীতির উপরে অনেকে নব্যন্যায়ের প্রভাব দেখেছেন।[৪০] চৈতন্য চরিতামৃতে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের বিচার এবং বিতর্কের বহু তথ্য পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব বিতর্কের মাধ্যমে বহুক্ষেত্রে নিজমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লালনের জীবনদর্শন প্রচলিত মূল্যবোধকে খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়। তাই বিতর্কের রীতি তার বাক্‌রীতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। নাথসাহিত্যে, বৈষ্ণব কড়চা, ধর্মের গাজন, যুগীযাত্রা, বোলান, এবং কবিগানে এই বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরী রীতির পরিচয় পাই। ভারতীয় এবং বঙ্গীয় ইসলামী সমাজে, 'সওয়াল সাহিত্যের' বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আহম্মদ শরীফ। মুসলমান ফকির সমাজে প্রচলিত, 'ফকির বিলাস', 'জ্ঞানের আলো' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রশ্নোত্তরী ঢং-এ রচিত হয়েছে। ধর্মপ্রচারের জন্য খ্রিষ্টান মিশনারীগণ, 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (১৭৪৩) গ্রন্থাদিতে এ রীতি গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শতকের 'হাফ আখড়াই' গানের প্রতিযোগিতা ছিল এক সুপরিচিত বিষয়। লালনের সমসাময়িক নদীয়ার বাউলগুরু গোলাপ বিশ্বাস (নাজিরপুর, করিমপুর) দোহার, বাদ্যকর নিয়ে 'বঁদ' গান করতেন।[৪১] মাতা, পিতা, চারভূত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দু'দলের মধ্যে এখানে প্রতিযোগিতা হতো। বাউল গানের পাল্লায় সমধর্মী বিষয়ের বৈচিত্র্য অধিকতর।

বঙ্গীয় এই প্রশ্নোত্তরী রীতির মূল পাই সর্বভারতীয় ঐতিহ্যে। তান্ত্রিক আগম-নিগমে, দরবেশ-কলন্দর প্রমুখ সুফী গোষ্ঠীর তর্জাগানে; কবীর দাদু প্রমুখ ভক্তিবাদী সাহিত্যশিল্পে প্রশ্নোত্তরী রীতিকে খুঁজে পাওয়া যায়। পঞ্চানন মণ্ডলের মতে এ ধরনের গানের আদি উৎস নাথসাহিত্য। সুকুমার সেনের মতে বৈদিক, মহাকাব্যিক যুগ থেকে ভারতীয় ঐতিহ্যে এ রীতিকে চিহ্নিত করা যায়।[৪২]

চর্যাপদের টীকায় আচার্যদের পদগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। বাউল গানে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে, গান দিয়ে (পদ দিয়ে) গান ব্যাখ্যাত হয়েছে। বৈদিক-বাহ্য শরীয়তকে পূর্বপক্ষ হিসাবে গণ্য করে বিতর্ক-বিচারের রীতিতে রচিত হয়েছে গান; বিশ্লেষিত হয়েছে তত্ত্ব। বাউল গান বিশিষ্ট এক সাধনার টীকাভাষ্যও বটে।

লালনের গানের বিষয়বস্তু বা পর্যায় নানাবিধ। সাধনার চারটি স্তর, এদের মধ্যস্থিত উপস্তর, দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গানের পর্যায় সৃষ্টি করে। আর এগুলি অসাধকদের অজ্ঞাত এক আভিপ্রায়িক ভাষায় ব্যক্ত হয়। সাধনতত্ত্বের দিক থেকে লালনের গানের ত্রিবিধ বিষয়বস্তু— আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব এবং গুরুতত্ত্ব। কিন্তু বাহ্যিক বিষয়-বিচারে নানা পর্যায়ের গান আছে লালনের। আলোচ্য খাতায় 'গোষ্ট', 'ভেকের গাহান' প্রভৃতি বিষয়ানুগ শিরোনাম পাই। লালন গীতিকায়,

'বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ'কে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, 'জালাল গীতিকা'য় চৌদ্দটির মতো পর্যায়ে গানগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে। লালনপন্থী সাধুসভায় নিম্নলিখিত পর্যায়ের গান শোনা যায়। যেমন বন্দনা, গুরুতত্ত্ব বা গুরুশিষ্য, আত্মতত্ত্ব বা তুমি-আমি, আদমতত্ত্ব, কারতত্ত্ব, ফুলের গান, নবীতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, ধড়বিচার বা দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসরতি, মনঃশিক্ষা, চারচন্দ্র, শরীয়ত-মারফত প্রভৃতি। লালনের চারপাশে ছিল বৈষ্ণব পরিবেশ; কীর্তন-ঢপ ও পাঁচালিগানের প্রবাহ। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নানা বৈষ্ণব পদসংগ্রহ গ্রন্থে (বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর, 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি'; রাধামোহন ঠাকুরের, 'পদামৃত সমুদ্র'; গোকুলানন্দের 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি) এবং কীর্তন গানে বৈষ্ণব পদাবলীকে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই পর্যায়বিভাগের চেতনা অনিবার্য প্রভাব ফেলেছিল লালনের গানে। রাঢ় অঞ্চলের বাউল গায়কদের মধ্যে এই পর্যায়-চেতনা বা গানের বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন নেই। তারা বিচ্ছিন্ন পদগুলি গান করে। সময়ে-সময়ে এক পদের ব্যাখ্যা করে অন্য পদ দিয়ে। লালনের প্রশ্নোত্তরী গানের পশ্চাদ্‌পটে এসমস্ত তথ্যাদি রয়েছে।

আলোচ্য খাতায় গানগুলি পর্যায়ে বিভক্ত করে এবং প্রশ্নোত্তরী রীতিতে সজ্জিত হয়নি। কিন্তু কোন কোন স্থলে একগুচ্ছ প্রশ্নোত্তরী পদ পাওয়া যায়। পদ নং ১৩২—১৩৫-এর ১৩৩ নং পদটি প্রশ্নের; ১৩২ নং পদটি উত্তরের; এটি 'মানুষতত্ত্ব' পর্যায়ের গান। ১৩৫ নং পদে প্রশ্ন, ১৩৪ নং পদে উত্তর; পর্যায়, 'পার' (দেহতত্ত্ব)। ১৪৬ নং থেকে শুরু হয়েছে 'আমি তত্ত্ব'—এটি প্রশ্ন, পরেরটি (১৪৭) উত্তর। এভাবে প্রশ্ন-উত্তর চলেছে ১৫৬ নং পদ পর্যন্ত। তারপর গানের পর্যায় 'পর'তত্ত্বে প্রসারিত হয়ে গেছে। এ খাতায় ১৮ থেকে ২৮ নং পদগুলি 'ফুলের' প্রশ্নোত্তরী পদ। এছাড়াও নবী, কৃষ্ণ, চৈতন্যতত্ত্বের গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশ্নোত্তরী পদ আছে; আছে প্রশ্নোত্তরের অনেক জোড়াপদ এ খাতায়। তবে লালনের গানে শিক্ষা বা উত্তরের প্রাধান্য বেশি। প্রাজ্ঞ পরিণত লালন ছিলেন 'সাঁই' বা সম্মানীয় গুরু। গানে তাঁর এ ভূমিকা প্রভাব বিস্তার করেছে। সব প্রশ্নের উত্তর বা সমস্ত উত্তরের প্রশ্নাত্মক পদ আলোচ্য খাতায় নেই। লালনের গান অন্যের রচিত পদ/প্রশ্ন বা উত্তর-নিরপেক্ষ নয়। এ সূত্রেই তিনি অন্য মহাজনদের পদকে নিজের গানের খাতায় গ্রহণ করেছিলেন। লালনের একক পদগুলির মধ্যে বিচার, বিতর্ক, প্রশ্ন, উত্তরের ভঙ্গি যথেষ্ট সক্রিয়।

লালনের প্রশ্নোত্তরী পদগুলি জটিল, তির্যক বক্রোক্তিতে রচিত। সরাসরি খোলা কথার উত্তর থাকে না তার গানে।

লালনের প্রশ্নোত্তরী পদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হতে পারে ১৫১ ও ১৫২ নং পদদ্বয়ের সাহায্যে। সাধনপথের স্থূল পর্যায়ের পদ এগুলি। পরস্পরবিরোধী মত ও পথের আলোচনা শুনে বিভ্রান্ত সাধকের দোটানা এতে বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্নের পদটি সাড়ে তিন কলির—

কি করি কোন পথে জাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না ঃ ।। দোটানাতে পড়ে ভাবি ঐ ভাবনা ঃ।।

(১) কেউ বলে মাক্কা জাইএ হজ করিলে জাবে গোনা, কেউ বলিছে মানুষ ভোজে মানুষ হনা ঃ।।

(২) কেউ বলে পোড়লে কালাম পাএ শে আরাম ভেহেস্তে খানা ঃ কেউ বলে ভাই ও সুখের ঠাঁই কাএম রয় না ঃ।।

(৩) কেউ বলে মুরশীদের ঠাই খুজিলে পাই আদ ঠেকেনা লালন ভেড়ে না বুঝিএ হয় দোটানা ঃ।।

সূচনার অর্ধকলিতে ব্যক্ত হয়েছে 'দোটানা'। তারপরের কলিগুলিতে (সংখ্যাচিহ্ন আমার দেয়া) এই বিরোধ, (দুই তত্ত্বের মধ্যে) স্পষ্টতা লাভ করেছে। প্রথম কলিতে (ক) হজ করলে পাপমোচন হবে (খ) মানুষভজনায় হবে মনুষ্যত্বলাভ—এ দুই বিরোধী তথ্য। দ্বিতীয় কলিতে পাই (ক) কোরাণের কালাম নামাজে পড়লে নিরন্ন মানুষ স্বর্গে গিয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি পায় (খ) এর বিরুদ্ধবাদীরা বলে যে স্বর্গসুখ স্থায়ী হয় না, পাপের শাস্তি পায় মানুষ। তৃতীয় কলিতে, গূঢ় আদিতত্ত্ব জ্ঞাতা মুর্শিদকে স্মরণ করে বিভ্রান্ত লালন আত্মধিকারে পদ সমাপ্ত করলেন। এখানে একদিকে বাহ্য শরীয়তের হজ, নামাজ, কালাম এবং এগুলি অনুসরণকারীর স্বর্গের প্রতিশ্রুতি। এর সমান্তরালে অন্য আর-এক মূল্যবোধ; অলীক স্বর্গসুখের অচিরত্ব, অলৌকিকে অবিশ্বাস। মানুষভজনা, মানুষগুরু জানে চরম সত্য; আর মনুষ্যত্বলাভই জীবনের উদ্দেশ্য—এই মানুষতত্ত্বকে প্রথাগত ধর্মাচারের বিরুদ্ধে স্থাপিত করা হয়েছে। ১৫২ নং পদে পূর্বোক্ত পদের উত্তর দেয়া হয়েছে।

না হৈলে মন সরোলা কি ফল মেলে কোথা ধুড়ে ।। হাতে, বেড়াই মিছে তোবা পোড়ে।।

(১) মাক্কা মদিনায় জাবি ধাক্কা খাবি মর্না মুড়ে হাজী নাম পাড়ান নর্খ তাই দেখিরে ঃ।

(২) মনে জে পড়ে কালাম তাই রি শুনাম হুজুর বাড়ে, মন খাটি নয় বেন্দলে কি হয় বনে কুড়ে।।

(৩) মন জার হয়েছে খাটী মুখে জদি গলদ পড়ে খোদা তারে নারাজ নয় রে লালন ভেড়ে।।

প্রশ্নের মুখপাতের দ্বিধার উত্তর আছে আলোচ্য পদের মুখপাতে। আচারমূলক বাহ্য শরীয়ত নয়, মনঃশুদ্ধির গুপ্ত শরীয়তই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কলিগুলিতে বাহ্য শরীয়তকে খন্ডন করা হয়েছে। প্রথম কলিতে, প্রশ্নের প্রথম কলির উত্তরে বলা হয়েছে যে অধিকাংশ লোক হাজী নামে খ্যাতির জন্যই হজে যায়। আর হজে গেলেই শুদ্ধ হয় না মন। দ্বিতীয় কলিতে, প্রশ্নের দ্বিতীয় কলির কালাম ও নামাজের বাহ্য আড়ম্বর অপেক্ষা মানসিক শুদ্ধতা এবং মন থেকে উচ্চারিত ভাবনাকে (মন্ত্র) গুরুত্ব দিয়ে, অশুদ্ধমনা ব্যক্তির অরণ্যবাসকেও অসার্থক বলা হয়েছে। কবীরের পদে এই মনঃশুদ্ধির গুরুত্ব অসীম। বাহ্য ধর্মাচার লোক দেখিয়ে পালন না করলেও ঈশ্বর শুদ্ধমনা ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন থাকেন এ তথ্য দিয়ে তৃতীয় কলি সমাপ্ত। এখানে মুখপাত এবং কলি দিয়ে, মুখপাত এবং কলিগুলির উত্তর দেয়া হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরের রীতিটি অপ্রত্যক্ষ ও তির্যক; প্রচ্ছন্ন ও ব্যঞ্জনাধর্মী। এই প্রচ্ছন্ন উত্তরের স্পষ্ট ব্যাখ্যা গুরুগম্য। সরাসরি খোলা উত্তর দেয়া মহাজন পদাবলীতে নিন্দার্হ। খোলা কথার গান রচনা করেন অসাধকেরা।

এছাড়াও একটি পদের মধ্যেই প্রশ্ন, উত্তর, বিচার, বিতর্ক রয়েছে। মনঃশিক্ষার পদে লালন সমালোচনা ও বিদ্রূপ করেছেন নিজেকে। লালনের প্রায় প্রত্যেক গানে পরস্পরবিরোধী বিবৃতি, সংঘাত, তথ্য বা ঘটনাগত দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে। পূর্বেই দেখানো হয়েছে দ্বন্দ্ব-

সংঘাতক্ষুব্ধ লালনের দেশকালসমাজকে। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তির ভেতরে বিজাতীয় মূল্যবোধের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা ঘটনার; সাধ ও সাধ্যের। লালনের গানের সর্বাপেক্ষা বড় দ্বন্দ্বটি সমাধানহীন। এ দ্বন্দ্ব হলো দুই বিপরীত মেরুর দর্শন, মূল্যবোধ ও কর্মকাণ্ডের। শরীয়তী, বৈদিক অনুমানপন্থা, নবুয়তের, বহিরঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, বর্তমানপন্থী-অবৈদিক মারফতী-ফকিরী মতের দ্বন্দ্বটি বৈরী এবং সমাধানহীন। সাংস্কৃতিক বিরুদ্ধ-মতবাদের পীড়ন, আক্রমণ, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, উচ্চবর্গের শাস্ত্রীয় আচারধর্মের বিরুদ্ধে, লালনের গান প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ রচনা করে, সময়বিশেষে বিরুদ্ধশক্তিকে আক্রমণও করেছে। বিপরীতমুখী দুই স্রোত এখানে প্রশ্ন-উত্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে শিল্পরূপ ও ভাষাভঙ্গিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

লালনের গানের সূচনা ধরণ, পরধরণ, কোলধরণ, মুখপাত নামে পরিচিত। সচরাচর ঃ। চিহ্ন দিয়ে স্বল্প-বিরতি এবং মুখপাতের সমাপ্তিতে ঃ।। দাঁড়ি দেয়া হয়। এ অংশটি কলি-গণনা বর্হিভূত, 'অর্ধকলি' হিসাবে গণিত হয়। লালনপন্থীদের গানে এ অংশ গদ্যাত্মক বিবৃতিধর্মী, গীতারম্ভের পূর্বে তালবর্হিভূত অক্ষর-উচ্চারণরীতিতে 'অনাগত' এ অংশটি বিবৃত হয়।[৪৩] এতে দুটি খণ্ড (ধরণ ও পরধরণ) মিলে পূর্ণতা সৃষ্টি করে। কলির তুলনায় এটি ক্ষুদ্র; পর্ব কম; অন্ত্যমিল থাকে দু'খণ্ডে; পর্বান্তিক মিল কম এখানে। লালনের গানের সূচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে গোটা পদের ভিত রচিত হয়; থাকে মূল বক্তব্যের সারাংশ; এবং পরবর্তী কলিতে তা হয় প্রসারিত। আভাসিত হয় প্রধান দ্বন্দ্বটি; মূল সমস্যাটি। লালনের সূচনা নানাবিধ। কখনো নাটকীয় এক ঘোষণা উপস্থাপিত হয় এখানে; পরবর্তী কলিতে তৃপ্ত হয় নাট্য-কৌতূহল। যেমন (২৭১ পদ)—মরার আগে মলে সমন জালা ঘুচে যায় ঃ। জেন গে কেমন মরা কি রূপ জানাজা তার দেয় ঃ। অথবা : আছে, আদ মাক্কা এই মানুষ দেহে দেখনারে মন ভেয়ে ঃ।। দেষ দেসান্তর দৌড়ে এবার মরিস কেন হাপীএ ঃ।। (২১০)

কখনো জিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু হয় পদ; পরবর্তীতে উত্তরের আভাস। যেমন : নবী না চিনে কি আল্লা পাবে ঃ নবি দিনের চাদ আজ দেখনারে ভেবে।। (৫)

আছে কোন মানসের বাস কোন দলে ঃ।। রে ওমন মানুষ, সভয় বলে ঃ।। (১০০)

দু'খণ্ডে এক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয় ঃ

বল কারে খুজিস ক্ষ্যাপা দেশ বিদেশে ঃ। আপন ঘর খুজীলে রতন পায় অনাসে ঃ।। (২৬৮)

আমার ঘরের চারি পরেরি হাতে ঃ। কেমনে খুলিএ সে ধোন দেখবো চক্ষেতে ঃ।। (১০৬)

কোন পদে সমস্যা উত্থাপিত হচ্ছে সূচনায়; ২য় অংশে সমস্যাটি গুরুতর হচ্ছে : মনরে আপ্তুতত্ত না জানিলে সাদন হবে না ঃ। পড়বি রে গোলে ঃ।। (২৭৫)

মন তোর আপন বলতে কে আছে ঃ। কার কান্দায় কান্দ মিছে ঃ।। (১৯০)

এই ধরনের মনঃশিক্ষার পদে লালন নিজের অপর সত্তার সঙ্গে কথা বলেন। এক্ষেত্রে তিনি অন্তর্মুখী।

লালনের বৃহৎ সংখ্যক পদ প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে। এ প্রশ্ন শ্রোতার প্রতি, প্রতিপক্ষ, নিজের মন এবং সামাজিকদের প্রতি। অর্থাৎ লালনের মুখ সর্বদা মানুষের দিকে ফেরানো। বহু পদে তিনি শ্রোতাকে (অনির্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট) সম্বোধন করে (ক) কিছু বলেছেন, (খ) উত্তর চেয়েছেন, (গ) জিজ্ঞাসা আছে, (ঘ) আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জানতে চেয়েছেন, (ঙ) প্রচলিত বিশ্বাস-

বিরোধী সত্যকে নির্দেশ করেছেন, (চ) উল্টা বক্তব্য, ব্যাখ্যা না করে, ঘোষণা করে শ্রোতাকে আকর্ষণ করেছেন।

অবশ্য লালনের, শ্রোতাকে আক্রমণে তীব্রতা নেই; অসম্মান ব্যঙ্গবিদ্রুপ নিজেকে করে, বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে এক রম্য বক্রতায় শ্রোতাকে সতর্ক করে দেন তিনি। শ্রোতাকে সম্বোধন করে সূচনার মাধ্যমে লালন শ্রোতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেন; শ্রোতার নিষ্ক্রিয়তা ও অমনোযোগ নষ্ট করে দেন। বিশেষত অনির্দিষ্ট সম্বোধনগুলির ভঙ্গিতে সমাবিষ্ট শ্রোতাসাধারণ প্রত্যেকেই সচেতন হয়ে ওঠেন।৩০৪ নং পদ শুরু হয়েছে : কারে আইজ শুদাই সে কথা....। এরপরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন শ্রোতাকে। ১৮৮ নং পদে 'ভাই' সম্বোধনে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন তিনি শ্রোতার। এছাড়া কতগুলি অনির্দিষ্ট সম্বোধন পাই জারা (৫৬), সামান্নে (৭৭), ক্ষেপা (১০৭), সবায় (৩০১), ধনি (৩৬৮), কেউ (৩৬০), তোর, তোরা, তুমি, তুই, মন, মনা মনুরায়, মন ভেয়ে, পশু, কেউ (৩৬০), গো (১০৮) প্রভৃতি। লালনের সম্বোধনে কোথাও 'আপনি' নেই; আছে তুমি ও তুই।

সূচনার প্রশ্নে পাওয়া যায় নানা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে।

ব্রাহ্মদের প্রতি প্রশ্ন : কি রূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায় (৩২৬)।

খেলকাধারীকে জিজ্ঞাসা : কে তোমায় এ বেষভুশনে সাজাইলে বল, শুনি (৩৩৫)।

বৈদিকদের প্রতি : বেদে কি তার মর্ম জানে (৩৩৭)।

সাধকদের প্রতি : করি কেমনে সে শুদ্ধ প্রেম সাদন (৩৬৩); না জেনে করণ কারণ কতাএ কি হবে (২৩০)।

শরীয়তীদের প্রতি প্রশ্ন : নবীজী মুরিদ কোন ঘরে (৩৫৫); আকার কি নিরাকার সেই রাব্বানা (১৭৫); জদি সরায় কাৰ্জ্জ সিদ্দি হয় (২৮৬); নবী না চিনে কি আল্লা পাবে (৫); মেএ্রারাজের কথা সুদাবো কারে (২৯১)।

বৈষ্ণবভাবাপন্ন প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন : চাঁদ বলে চাঁন্দ কান্দে কেনে (২৪৪); কার ভাবে সাম নদে এলো (৫৮); ও হোরি কান্দে হরি বলে কেনে (৬১); আইজ ব্রজপুরে কোন পথে জাই (১৬৪)।

অন্তরঙ্গ প্রশ্ন : একদিনে পারের ভাবনা ভাবলি নারে (২৬৫); আমার মন চো'রারে কোতা পাই (২১৭); মানুষ লুকাইল কোন সহরে (১২২)।

প্রতিপক্ষকে আক্রমণাত্মক প্রশ্ন :

নবীজী মুরিদ কোন ঘরে (৩৫৫; মহম্মদের গুরু কে?); আছে কোন মানষের বাস কোন দলে (১০২); আবহায়াতের নদী কোন খানে (২০২); আমাবস্যা দিনে চন্দ্র জেএ থাকেন কোন সহরে (১২৩); কোথা আছে রে সেই দিন দরদি সাই (১৯৬); বল কারে খুজিশ ক্ষেপা দেশ বিদেশে (১৭)।

শ্রোতাকে আহ্বান করে, অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন লালন সূচনায় : আএ দেখে জা নতুন ভাব এনেছে গোরা (৮৬), আএ গো জাই নবীর দিনে (১১৭), দেখপী যদি সোনার মানুষ দেখে জারে মন পাগেলা (২৫৩), পারে কে জাবি আএনা জুটে (১৩৪), ধররে অধার চাদেরে অধরে অধার দিয়ে (২৫৯), ও সে রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে চেয়ে দেখ না তোরা (৩৬১), দেল

দরিয়ায় ডুবে দেখ না (৬৩), আপন ঘরের খবর নে না (৬৯), একবার চাঁদ বদনে বলো রে সাই (২২১)। মুখপাতে তিরস্কার আছে : আই হারালি আমাবতি না মেনে (১০৩), অজান খবর না জানিলে কিশেরো ফকিরি (১২০), আজ রোগ বাড়ালি সঙ্গ কুপত্তী কোরে (৩৪), কেনে খুজিস মনের মানুষ বনে সদায় (১২২), (ক্ষেপারে) কাঠের মালা নেড়ে চেড়ে মিছে নাম জপা (২১৯), নাম সাধন বিফল বরজোগ বিনে (৪৬)।

সূচনা অনেক সময় নির্দেশাত্মক : (গুরুপদ/শিক্ষার পদ) ভজো মরশীদের কদ্‌ম এই বেলা (২৩৫), ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরী (২৯৩), হক নাম বল রসনা (২৯৬), হরদম পড় এলেল্লা (৩৬৬), মরে জেন্দেগীর আগে (৯৫), ভুল না মন কারু ভোলে (৪৩), পড়ো রে দায়েমি নামাজ (৮), জেনি গো জা গুরুর দারে কেন উপাসনা (২২৫), কৃষ্ণ পদ্দের কতা কররে দিসে (২২৮)। নাটকীয় বিলাপ : ভুলিব না, বেলি কাজের বেলায় ঠিক থাকে না (৯)।

নাটকীয় নির্দেশ : জা জা ফানার ফিকির জেনি গে জারে ঃ। (উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা) ভদি দেখা বাঞ্ছা হয় সে চাদেরে (৭/৮)।

শর্তসাপেক্ষে আহ্বান : পারো নিরহেতু সাধনা করিতে (১৫০), পড় পড়োরে নামাজ ভেদ বুজে সুজে (২৫৪), না হৈলে মন সরোলা (১৫২), গুরুপদে নিষ্টে জমন জার হবে (২), অনরতো বারি সে বারি অনুরাগ নলে কী (১১০)।

একটি রূপক, প্রতীক, শব্দ সূচনাপংক্তিতে থাকে, তাকে ঘিরেই রচিত হয় গোটা পদটি। এই শব্দটি পরবর্তীতে পুনরুক্ত এবং বিশ্লেষিত হয়। সূচনা পংক্তির দ্বিখণ্ডে দুটি ইতিবাচক, দুটি নেতিবাচক বা একটি ইতি, একটি নেতিবাচক বাক্যাংশ থাকে। অনেক সময় ইতি দিয়ে নেতি বা নেতির সূত্রে ইতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরা হয়; অর্থাৎ একধরনের রম্য বক্রোক্তি থাকে মুখপাতে। যেমন—নবি না চিনে কি আল্লা পাবে (৫), আছে জার মনের মানুষ সে কি জপে মালা (১৬২), কে গো জেনবে তারে সামান্নে (৯৪), দেল দোরিয়ায় ডুবে দেখ না (৬৩)।

আধুনিক গীতিকবিতার মতো একান্ত ব্যক্তিগত গভীর অনুভব, আর্তি ও বেদনা ফুটে উঠেছে অনেক সূচনা অংশে; যেমন—তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে (১৪০), সুমজে করো ফকির মনরে (১২৬), সাধুর চরণ ধুলি লেগবে গায় (৯৯), মনের কথা বোলবো কারে (৮১), বিষয় বিশে চঞ্চলা মন দিবোরজনী (৩২৪), একদিনো না দেখিলাম তারে (১৫৯)।

সুরদাস, মীরা তুলসীদাস অথবা অথবা গীতাঞ্জলির কবিতার মতো, লালনের কিছু পদে পরম এক সত্তার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। বন্দনার পদে গুরু বা সাঁইকে পাওয়া যায়। এদের প্রতি সম্বোধন, নিবেদনও পাই সূচনায়। এই সত্তাগুলি লালনের অন্তঃস্থিত; তাঁরই অপর সত্তা। সুতরাং এ পদগুলি বর্হিমুখী হয়েও অন্তর্মুখী। মনঃশিক্ষার পদগুলির লক্ষ্য নিজের মন, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে নিজেকে শিক্ষা দেয়ার ছলে। এ পদগুলি আংশিকভাবে অন্তর্মুখী; ব্যক্তিগত। লালনের ব্যাপক সংখ্যক পদ, সূচনার প্রমাণে, বর্হিমুখী, বর্হিগত। তাঁর লক্ষ্য সমাজের বিভিন্ন মানুষ; এবং নিজের সামাজিক সত্তা।

আর-এক শ্রেণীর পদে লালন রাধা, সখাদের বা শচীমাতার ভূমিকা পালন করেছেন সুচারুভাবে (৩৪১, ৪৮, ৩১৯, ১০৯, ৮৪, ৩১৭ প্রভৃতি পদ)।

লালনের কবিতার সূচনা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নাটকীয়তায়, আদেশে, অনুরোধে, বিনতিতে তিনি দর্শক এবং শ্রোতাকে টেনে নেনে। পরবর্তী মূল বক্তব্য অবশ্যই তারা শোনে। লালনের সমধর্মী সাধকদের সংখ্যা খুবই কম ছিল; সমাজের অধিকাংশ বিরুদ্ধ-মূল্যবোধের মানুষের কাছে তাই চাতুর্যপূর্ণ শিল্পকৌশলে বক্তব্যকে রাখতে হতো। লালনের মুখপাতে এ ধরনের প্রখর শিল্প-সচেতনতা আছে।

মধ্যযুগে রচিত পদাবলীতে, মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে ভাবসমাপ্তির স্থানে বা পদের সমাপ্তিতে কবি বিশেষণসহ নিজের নামোল্লেখ করেন। চর্যাপদগুলির শেষে পদকর্তার নাম ও মন্তব্য পাওয়া যায়। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীতে এই ভণিতার মাধ্যমে সাধক পদকর্তাগণ শ্যাম ও শ্যামার লীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং ব্যক্তি-পরিচয় ছাড়াও তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণে বাংলা চূর্ণকবিতার ভণিতা গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তি আন্দোলনের মীরা, সুরদাস বা কবীরের ভণিতা বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ভক্তিরত্নাকরে গানের শেষ খণ্ডকে আভোগ বলে, এর মধ্যে ভণিতার অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

ভণিতায় থাকে কবির আত্মপরিচয়, সামাজিক পরিচয় এবং রচনাকার হিসাবে আত্মঘোষণা। লালনের ভণিতায় লৌকিক, সামাজিক মানুষের কোন আত্মপরিচয় নেই; আছে সাধক লালনের প্রবল উপস্থিতি। বহু পদে তিনি নিঃসঙ্গ বা একা—লালন নামের একজন মানুষ; দেশ ও কাল দ্বারা বদ্ধ নন। বহু পদে তিনি সিরাজের আশ্রিত। গুরুর বিশেষণ সাঁই, দরবেশ/সাই দরবেশ। নিজের নামের সঙ্গে দু'ধরনের বিশেষণ তিনি ব্যবহার করেছেন—(১) মত বা সাধন-সংক্রান্ত রা দৈন্যতাজ্ঞাপক ফকির অধীন, দিনের অধীন (দ্বিন), দীনহীন, সাঁই (৬৫, ৯১, ৯২, ১৯৪, ১৫৯), দববেশ (৩৬৫), দরবেষ (নালন) সাই (২৫৭, ২০৭)। (২) আত্মধিক্কারমূলক : অবোধ, ভেড়ো (১৫১, ১৫২, ১৬২, ১০১, ১০৯, ১৯৭, ২৩৮), ভক্তিহীন (১১৭)।

এর মধ্যে দরবেশ/সাঁই দরবেশ বিশেষণগুলি সম্পর্কে আপত্তি আবু তালিব জানিয়েছেন।[৪৪] গুরুকে সাঁই, দরবেশ বলেছেন লালন। লালনের শিষ্যবর্গ (দুদ্দু প্রমুখ) তদ্রূপ লালনের নামের বিশেষণে সাঁই বা দববেশ ব্যবহার কবেছেন। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি লালনের মৃত্যুর পর তাঁব ঘনিষ্ঠ শিষ্যগণ লিখনকালে সাঁই বা দরবেশ বিশেষণ লালনের নামে যুক্ত করেছেন। অথবা গুরুর মৃত্যুর পর, লালন যখন গুরুপদে আসীন ছিলেন তখন দরবেশ বা সাঁই বিশেষণ প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণ ছিল না। সাধারণ্যে তিনি 'লালন সাঁই' নামে / 'সাইজী' নামেই পরিচিত ছিলেন। মীর মশারফ হোসেনের সঙ্গীত লহরী, প্রবাসীর হারামণি বিভাগে বা বসন্তরঞ্জন তথ্যসংগ্রহে এ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে চার ধরনের পদ ভণিতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়—(১) ভণিতাহীন : ১৬৩, ১৬৮, ২৪০, ২৫০/৫১, ২৪৯, ৩১২, ৩৫০-৩৫৩ প্রভৃতি। ভণিতাহীন বলতে ভণিতা নেই অথবা রচনাকারের নাম নেই, (২) লালন ছাড়া অন্যদের রচিত পদ, (৩) লালনের একক ভণিতাযুক্ত পদ, (৪) নিজের নামের সঙ্গে গুরু সিরাজের নামোল্লেখ বা অধীন/দিনের অধীন পরিচয়ের পদাবলী। সাধারণ্যে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে গুরুর নামোল্লেখ ছাড়া লালনের

পদ নেই। ধারণাটি সঠিক নয়। ৫৫ নং পদ থেকে ১২০ নং পদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিরাজ অনুপস্থিত। ২০০ থেকে ৩৭০-এর মধ্যবর্তী বহু পদে লালনের একক ভণিতা পাওয়া যায়। গুরুপদে সিরাজকে গ্রহণ করার আগে থেকেই তিনি পদরচনা করতেন বলে শোনা যায়। স্থূল পর্যায়ের কিছু পদে সিরাজের নাম নেই। আর গুরুর দেহান্তের দীর্ঘকাল পরেও তিনি পদ লিখেছেন। এ পদ আস্বাদন করতেন সামাজিক শ্রোতা এবং বাহাসের প্রতিপক্ষ। সেসব ক্ষেত্রে গুরু প্রামাণ্য হতেন না সর্বদা। ভক্তদের জন্য রচিত গানে গুরুস্মরণ অনিবার্য। বিষয়বস্তু সচেতনতা থেকে বিশেষ পর্যায়ের পদে সিরাজ স্থান নেননি। যেমন বন্দনার দুটি পদে (১, ৪) লালন, গুরুর মাধ্যমে নয়, সরাসরি ইষ্টকে ভক্তি নিবেদন করেছেন। গৌরপদে, যেখানে নিজেকে গৌরবালা বলে লালন কল্পনা করেছেন, বা ভণিতায় গৌর বা কৃষ্ণলীলায় অংশ নিয়েছেন, সেখানে গুরুর (মঞ্জুরীর) আনুগত্য নেই। সরাসরি লালন এতে অংশ নিয়েছেন। বৈষ্ণব তত্ত্বানুগত্য অপেক্ষা, ভক্তি-আন্দোলনে অর্জিত ব্যক্তির ঈশ্বর-সঙ্গের অধিকার এবং সহজ ভাবনার ঐতিহ্য এক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। বলাইকে নির্দেশদানের পদটিতে সিরাজকে স্মরণ করা হয়নি। কিন্তু মলমকে নির্দেশের মধ্যে সিরাজের নাম উক্ত হয়েছে। এ থেকে মনে হয় সিরাজ প্রথম জনের অপরিচিত। দ্বিতীয় জনের অতি ঘনিষ্ঠ।

লালনের একক ভণিতা সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায় যে বাংলা ও ইংরাজিতে নামটি বহু স্থলে 'নালন', (নাল অর্থ উর্বরা ভূমি) হিসাবে পাওয়া যায়। নালন সংস্কৃতায়িত হয়ে লালন হয়েছে। দ্বিতীয়ত স্থান বা সময় তার গানে উল্লিখিত না হওয়ায়, ভণিতা থেকে তাঁর প্রথম বা অন্ত-জীবনের রচনা নির্ণয় করা যায় না। পাণ্ডুলিপির সংখ্যার ক্রম থেকেও এ সময় চিহ্নিত করা যায় না। লালনের সুদীর্ঘ জীবনকালে নানা সময়ে রচিত হয়েছিল গানগুলি। ফকির/বৈষ্ণবসুলভ দীনতা লালনের পদের ভূষণ। কএ লালন, ভেবে কএ লালন, লালন বলে, বলছে লালন, (ভেবে কহে) ফকির লালন (ফকির), বিনয় করে বলছে লালন, কহে দীনদান লালন, সাই লালন বলে, লালন ফকির কয়, ভক্তিহীন লালন বলে (ভাবে, ১১৭), (অতি) বিনয় করে বলছে লালন (৯৮), লালন দরবেশে বলে, দরবেষ লালন সাঁই বলে, লালন ভাবে (১১৭), লালন ফকির যায় কয়ে (১৫৫, ২১৫), কেন্দে কয় লালন (২২৪), লালন পলো (১৬০, ১৭৯), লালন বেড়ায় (১৫৪), লালন ভাবে তাই (১৭৭), প্রভৃতি পদ্ধতিতে তিনি নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। নিজেকে নিন্দামূলক ভেড়ো এবং অবোধ বিশেষণও তিনি ব্যবহার করেছেন। বিপুল সংখ্যক পদে লালন গুরু সিরাজের উল্লেখ করেছেন প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে। সিরাজ সাই বলে রে লালন, ভেবে সিরাজ সাঁই এর চরণ, অধীন লালন কয় ছিরাজ সাইর গুণে, দরবেশ সিরাজ সাই কয় (অবোধ) লালন (ভেড়ে) প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে এবং দিনের অধীন লালন, লালন বলে গুরু অনুসারে, অধীন লালন প্রভৃতি পরোক্ষ ভঙ্গিতে তাঁর গুরু স্মরিত হয়েছেন। একাধিক গুরু, প্রেমিকা নারী চেতনগুরু এবং নিজেকে দাস বলে পরিচয়ের বৈষ্ণব/সহজিয়া পদ্ধতি নেই লালনের ভণিতায়। নেই কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার দাবি, নিজের কুল-গোত্রের পরিচয় নেই, নেই প্রিয়জনদের নামের (দুজন শিষ্য মলম ও বলাই-এর নাম বাদে) উল্লেখ। লালন গুরু-পারম্যবাদী। কিন্তু তাঁর গুরুতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। গুরুসত্তা থাকে দেহের ভেতরেই। গুরু-প্রদত্ত জ্ঞানে তাঁকে জানলে গুরু আসন নেন ভেতরে। রবীন্দ্র-

কথিত বিশ্বদেবতা হন জীবনদেবতা, এ অর্থে দেহী সিরাজ লালনের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র। আল্লা, নবী, কৃষ্ণ, গুরু, গৌর অভেদ। গুরুর ভণিতাযুক্ত পদগুলিতে দেখি :

(১) সিরাজ পদ-বর্ণিত মূল বক্তব্য লালনকে বলছেন (৩৭১, ২৯৩, ২৫৯)।

(২) সিরাজ-বর্ণিত সাধনতত্ত্ব বুঝতে বা অনুসরণ করতে অক্ষম হচ্ছেন লালন। এখানে বক্রোক্তিতে সাধনপন্থার দুরূহতা ও জটিলতা আভাসিত হচ্ছে।

(৩) এক শ্রেণীর পদে দেখা যাচ্ছে যে সাধনক্রমের বিরুদ্ধ-আচরণকারী লালনকে ভর্ৎসনা করছেন সিরাজ। আসলে এ পদগুলিতে সাধনশিক্ষার্থীদের; আত্মনিন্দার ছলে, সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এ পদগুলি লালনের মনঃশিক্ষার পদও বটে।

(৪) কোন পদের বক্তব্যকে সিরাজ সাঁই-এর শিক্ষার গুণে বা তাঁর উপদেশে সারাংশ হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে (২৬২, ২৬৯) অর্থাৎ লালনের তত্ত্বটি যে গুরু পরম্পরায় এসেছে তা প্রমাণিত হচ্ছে এখানে।

(৫) জটিল গূঢ়তত্ত্ব স্থাপনের জন্য কর্তৃত্ব এবং প্রমাণ হিসাবে সিরাজের নাম ব্যবহার করেছেন লালন। যেমন ১১১ নং পদের বক্তব্যকে 'লালন বলে গুরু অনুসারে'। এ পন্থায় লিখিত শাস্ত্র, অনুমাননির্ভর যুক্তিপ্রমাণ নয়, আপ্তোপদেশ, গুরুবাক্যকে ঈশ্বর, বেদাদি অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য লালন মনে করেছেন।[৪৫] গুরুস্মরণের পদে লালনের এক অপূর্ব দীনতা প্রকাশিত হয়েছে। আত্ম-অহঙ্কার, আত্মপ্রতিষ্ঠার এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে এখানে। এই ভণিতা থেকে পরোক্ষভাবে আমরা সংগ্রহ করতে পারি দেশ, কাল, সমাজের তথ্য, তাঁর আত্মজৈবনিক উপাদান, মানসিকতা ও মূল্যবোধ। কবির নিজস্ব মত, মন্তব্য, টীকা, টিপ্পনি; বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে; ভণিতায় প্রকাশিত হয়। এদিক থেকে সূচনাংশের উপসংহার হলো ভণিতা।

বন্দনার পদগুলি বাদ দিলে লালনের ভণিতার লক্ষ্য ত্রিবিধ—(১) গুরুনির্দেশ ও সমস্যা, (২) নিজের মানবীয় ত্রুটির জন্য দৈন্য, (৩) শ্রোতা, ভক্ত, পাঠক, বিপক্ষ নানা ধরনের সাধু, অসাধুদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রশ্ন, নির্দেশ, উত্তর, ক্ষোভ, বেদনা, অভিযোগ, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, ধাঁধা, কৌতুক। অথবা কল্পিত সংলাপ ও সম্বোধন। এ সংলাপ গুরুর সঙ্গে, নিজের অপর সত্তার সঙ্গে অথবা অন্য মানুষের সঙ্গে নিরন্তর চলেছে। মানুষের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর গান। মীরা বা সুরদাসের ভক্তিগীতির ভণিতায় তাঁরা ইষ্ট বা ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদন করেছেন। কিন্তু কবীরের ভণিতা মানুষকে লক্ষ্য করে : Kabir pounds away with-questions, prods with riddles, stirs with challenges, shocks with insults, disorients with verbal faints"[৪৬] লালন কবীরের অনুসারী। কিন্তু তাঁর মধ্যে আক্রমণের উগ্রতা রম্য বক্রোক্তিতে স্নিগ্ধ। আর কবীরের বিখ্যাত ভণিতা কহত কবীরা শুন ভাই সাধু : অর্থাৎ সমধর্মী শিষ্য-সাধক-সাধুদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত অধিকাংশ শব্দ/দোহা। লালন গৃহস্থ ছিলেন।[৪৭] আর বঙ্গে উত্তর বা মধ্যভারতের মতো সংগঠিত লৌকিক সাধুসমাজ নেই। অনিবার্য কারণে, তাঁর ভণিতায় সাধু এবং অসাধু সামাজিক উভয় সমাজের উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। শরীয়তী/বৈদিক সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে অবৈদিক মতবাদের প্রচার করতে গিয়ে, ভিন্ন রুচির শ্রোতা সম্পর্কে লালনের সচেতনতা ভণিতায় আছে।

লালনের গানে এক প্রবল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি আছে। পদের আলোচ্য বিষয়ে ভিন্নতা, দ্বন্দ্ব, মতভেদ তিনি তুলে ধরে পরিণামে নিজস্ব মত ও মন্তব্য যুক্ত করেন ভণিতায়। সাকার-নিরাকার, এক বা বহুদেবতা বিষয়ক সামাজিক মতবাদীদের বিশিষ্ট মতগুলির বর্ণনা করে, লালন ভণিতায় বলেন : গুরুতত্ত্বে বিধি শোনা জায় তাই তো দেখি একরূপে সে নয় লালন বলে জে জা বজে তাই করে (১৬৭)।

ভণিতায় বিরুদ্ধ-মত বা মতাদর্শের প্রতি সমালোচনা উচ্চারিত হয়েছে। ব্রাহ্মরা শাক্ত বৈষ্ণবদের সমালোচনা করে; ব্রাহ্ম মতবাদের সমালোচনা করে ভণিতায় লালন মন্তব্য করলেন : বস্তু জ্ঞান জার নাই নামব্রহ্মে কি পাই, লালন কয় দরবেশ একি কথা কয়।। (৩২৬)। এ সমালোচনা গুরু সিরাজ করেছেন, এ ভঙ্গিটি চমৎকার লালনের। বস্তু এবং নামের দ্বন্দ্ব, ভক্তি-আন্দোলনের প্রথাসিদ্ধ মতবাদ থেকে লালনকে পৃথক করেছে। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব নবুয়ত বেলায়তের মধ্যে আছে। লালন ঈষৎ ব্যঙ্গে মন্তব্য করলেন : লালন ফকির কয় আরেক বাঞ্ছা হয় বস্তু বিনে নামে কৌ পেট ভরে ঃ।। (২০৪)।

ভণিতার মাধ্যমেই কুল, গোত্র, জাত, ধর্মসম্প্রদায় থেকে লালন নিজেকে পৃথক করেছেন; বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর ছবি এঁকেছেন।

পদের সমাপ্তিতে অতর্কিত প্রশ্নের আঘাত করেছেন শ্রোতাকে। এ প্রশ্নগুলি প্রত্যক্ষ উত্তরের যোগ্য নয়; এগুলির মাধ্যমে লালন সৃষ্টি করেন নির্বাক চিরায়ত জিজ্ঞাসা। যেমন ৩৩৮ সংখ্যক পদে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ নিয়ে সামাজিক বিতর্কের সমাপ্তিতে লালন ইসলাম-বিশ্বাসীদের কাছে জানতে চাইলেন : যখনকার পাপ তখন ভুগি শিশু তবে কেনে হয় রুগী নালন বলে বোঝ দেখি কখন শিশুর গোনা খাতা ঃ।।

ইসলাম প্রচার করে যে প্রত্যেকের পাপপুণ্যের ফলাফল সে ভোগ করে। 'শিশু জন্মে কেন রোগগ্রস্ত হয়'—প্রশ্নটি গুরুতর।

২৮৫ পদে আল্লা নবীর মিলন বা মেএরাজ তত্ত্ব জানার জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন লালন। 'নিরাকারে (আল্লা), আকার (দেহী, মহম্মদ) মিললো কি করে' এ জিজ্ঞাসা তাঁর।

কখনো নিজের দ্বিধা সমাধানের জন্য শ্রোতার কাছে তিনি সাহায্যপ্রার্থী। বেলায়তে আকার-ভজনা, নবুয়তে নিরাকার তত্ত্ব : নালন পলো পূর্ণ ধোকায় এ ভবো মাজে (২৮৭)।

মানুষের একাকিত্ব বর্ণনা করে : অধীন নালন বলে কারূ গোরে কেউ তো জায় না থেকতে হয় একাকী (২৮৫)।

কখনো তিনি সমস্যা দর্শক-শ্রোতার বিবেচনার জন্য পেশ করেন। কৃষ্ণ প্রেমের কুরীতি, ছলনার জন্য প্রেমের স্বরূপ জানতে ব্যর্থ হয়েছেন : জেনলে প্রেম গোকুলে লোইতে কেন্তা গলে নদেয় এস্তোনা অধীন নালন বলে কর বিবাচোনা (৩১৩)।

নিজের অসহায়তা তুলে ধরেন এবং প্রার্থনা করেন সাহায্য : নালন বলে হায় কি করি উপায় পত দেখিনে (৩২৭), লালন যে তাই জেন্তে চায় (৩৩০)।

কখনো তিনি প্রার্থনা করেন সমর্থন এবং আশ্বাস। একই সত্তা নানারূপে, পুরুষ, প্রকৃতি হয়—এ তত্ত্বে বিমূঢ় : বিনয় কোরে বলচে নালন ঘোচাও আমার ঘোর অন্দকার (৩৬৮)।

অন্যত্র সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি : বলচে নালন কারে পুছি (৯৭/৯৯)।

লালন শ্রোতা বা সাধককে উৎসাহিত করে বিষয়টিতে অংশ নেয়াতে চান। ২৫৪ নং পদে তার ভণিতা : ধন্য ধন্য যে যে তাই খোঁজে।

অন্যত্র : নালন বলে দেখ নওন খুলে (২৪২)। অন্য একটি পদে শ্রোতাকে প্রলুব্ধ করছেন এই বলে যে শ্রীরূপগত হলে "অধার ধরবে তারা" (৩৬১)।

বন্ধুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা : এবার বলছে নালন ঘর ছেড়ে ধন খুঁজিস কেনে বোনে (৮৮)।

নির্দেশ : নালন ভেবে কয় সম্প্রতি দেহ খুঁজে দেখ না (৩৬৭)।

গুপ্ত সত্য উদ্‌ঘাটন : সাই নালন বলে গোপ্তে আছে....সে মেয়ে (৯১)।

ইতিবাচক বক্তব্যপ্রতিষ্ঠা : নালন সাদ মহান্ত সিদ্দি হয় আপনারে চিনে (৩৩৭)। নালন বলে নিজ মোকাম ধোড় বহু দূরে নাই [৩৩৪ (খ)]।

প্রশ্ন ছাড়াও বিস্ময় ও জিজ্ঞাসাপূর্ণ ভণিতায় তিনি নটচর্যাকারের ভূমিকা ছেড়ে, শ্রোতা-দর্শকের মাঝখানে আসন গ্রহণ করে যেন তাদের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন : নালন কয় দয়াল নাম সাই জেনবো তোরে, দেখবো তোরে (২৬৬), পর দিযে পর ধরা ধরি শে পর কৈ চিন্তে পারি, নালন বলে হায় কি করি না দেখি উপায় (১৯৫), কায়ার শরিক ছায়া দেখি জারো নাই সে লা শরিকী নালন বলে তাও উহারি বলতে ডরাই (১৮৮)।

ভণিতায় উচ্চারিত হয় সাবধানবাণী ও সতর্কীকরণ : নালন বলে সমজে করো মরার হাল গলায় (২৭১), আপ্ততত্ত সামলে সেই রোন কালে কএ ফকির নালন(২৩৪)।

প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসা : নালন বলে তাই কার আগমন শেহি জোগের সনে (২৩২); নালন বলে কে দেয় ক্ষ্যায়া ভবো মাঝারে (১২৬); সে কেমন রূপ, আমি কি রূপ ওরে (৬৮)।

অনির্দিষ্ট শ্রোতার প্রতি জিজ্ঞাসাপূর্ণ অবলোকন : নালন বলে কে জানিলে আমির বেনা (১৪৬), সে অমরি কোন ভজনে রে ভাই বলছে নালন করে পুছি (৯৭)।

উল্টো কথা দিয়ে ধাঁধা সৃষ্টি : নালন বলে সে মার উদরে পীতে জনমে পত্নীর দুগদু খেলে সেনা (৬১)।

এই সমস্ত পদ্ধতিতে সম্বোধনে, সত্যনির্ণয়ার্থে আহ্বানে, প্রশ্নে, নির্দেশে শ্রোতাসাধারণের মধ্যে সক্রিয়তা সৃষ্টি করে লালন তাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং আলোচনায় তাদের অংশ নিতে সাহায্য করেছেন।

একশ্রেণীর পদে লালনের স্বগত সংলাপ শোনা যায়। তাঁর বিভিন্ন সত্তার দ্বন্দ্ব, মূঢ়তা, বিপন্ন বিস্ময়, আত্মধিক্কার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি এগুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। নালন নিষ্ক্রিয় দর্শক বা বর্ণনাকারী নন; তিনি সক্রিয় সাধক। এই নির্দিষ্ট ভূমিকার সূত্রে ভণিতায় ক্রিয়াপদের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নিজের বিভিন্ন সত্তার দ্বন্দ্ব, সংঘাতময় পদগুলি পড়তে পড়তে ইয়েটস-এর A dialouge of self and soul কবিতাটির কথা মনে আসে।[৪২]

লালনের বহু গানে একাধিক পাত্র-পাত্রীর দ্বন্দ্ব ও সংলাপ আছে। কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যজীবনের পদগুলিতে বা গুরুনির্দেশিত সাধনের পদগুলিতে এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত দু'ধরনের পদে অদৃশ্য পাত্রপাত্রী রাধা, কৃষ্ণ, সখী, সখাদের ; চৈতন্য শচীমাতাকে সংলাপের মাধ্যমে দৃশ্য করে তোলা হয়েছে। আর এই নাট্যগীতির ভণিতার লালন উল্লিখিত কারো কারো পক্ষ সমর্থন

করছেন বা বিষয়টির উপর নিজস্ব টিপ্পনী যুক্ত করে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেছেন। সাধন-সংক্রান্ত পদে গুরু সিরাজ সাধনার নির্দেশ দেন, ভর্ৎসনা করেন, গুপ্ত তথ্য জানিয়ে দেন। বলাই বা মলমের মতো শিষ্যকে বা প্রতিপক্ষ, ভণ্ড সাধুদের লালন বিতর্কের ছলে কথা বলেন। তাঁর পদে সর্বদা জীবন্ত মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাদের বিচার, বিতর্ক, দ্বন্দ্ব, সংঘাত গঠন করেছে লালনের পদের কায়া। স্বগতোক্তির, মনঃশিক্ষার পদেও লালনের দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব মন ঃ লালন ; সে ঃ আমি—এ দুয়ের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব ও বাদানুবাদ লক্ষ করা যায়। বিপরীতের দ্বন্দ্বে লালনের পদ মুখর। ভণিতা ও দ্বন্দ্বসংঘাতে অতিরিক্ত এক মাত্রা যুক্ত করে লালনের গানকে জীবন্ত, সচল এবং সক্রিয় করে তুলেছে। এই বিপরীতের সংঘাত, নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেছে ; জাগিয়েছে নাট্য-ঔৎসুক্য। আকস্মিক ঘটনার বিবৃতি, সম্বোধন, অতর্কিত জিজ্ঞাসা, অজ্ঞাত সমস্যা এবং চরিত্রের আগমনে ও বিবরণে জেগে ওঠে এই নাট্য-কৌতূহল। এই নাটকীয় প্রত্যাশার পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে না পদে, পাওয়া যায় ব্যঞ্জনাগর্ভ ইঙ্গিত।

আমার মন চোরারে কোথা পাই (২২৭), আজব এক রোসিক নাগর ভাসচে রসে (১৩৬), আছে জার মনের মানুষ সেকি জপে মালা (১৬২)—প্রভৃতি পদে অজ্ঞাত চরিত্র এসে দাঁড়ায়, যাদের পূর্ণ পরিচয় জানা যায় না। জানা যায় না শিকড়হীন বৃক্ষকে, মূলহীন লতাকে, আজগোবী ফুলকে, আমাবস্যায় পূর্ণিমাকে। এগুলি সম্পর্কে কৌতূহল জাগে কিন্তু তৃপ্ত হয় না যে সমস্ত বাউলগানে সরাসরি প্রশ্ন বা সমস্যার উত্তর থাকে—সাধকেরা সে সমস্ত পদকে স্থূল বা কাঁচা পদ বলেন। সূক্ষ্ম, ইঙ্গিতপূর্ণ, ব্যঞ্জনাধর্মী এবং রম্য বক্রোক্তি মহাজন পদের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যে লালন মহত্তর কবি, মহাজন। আর নাট্যধর্ম লালনের পদকে, এ ধারার, অন্য কবির বর্ণনামূলক তত্ত্বপ্রধান পদ থেকে পৃথক করেছে।

লালনের পদের (১) সূচনা ও ভণিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে ; (২) তাঁর পদে একাধিক ব্যক্তির সংলাপ ও একোক্তি আছে ; (৩) পদে একটি শব্দ আবর্তিত হয়, একটি প্রতীক বা রূপককে ঘিরে পদটি গড়ে ওঠে ; (৪) যুক্তি ও সিদ্ধান্ত, বিতর্ক বিচার, সংলাপচারিতা লালনের পদের বৈশিষ্ট্য ; (৫) প্রচলিত শব্দকে বা চিত্রকে ভিন্ন গুপ্ত অর্থে ব্যবহার করা ; (৬) গুপ্ত তথ্য উদ্‌ঘাটনের ভঙ্গি থাকে কিন্তু অনাবৃত করা হয় না ; (৭) আকৃতিতে ক্ষুদ্র (৩/৪ কলির) লালনের পদ সংযত ও সংহত।

বিচার, সংলাপ ও বিতর্কের মাধ্যমে সত্য নির্ণয়ের ভঙ্গিটি মানুষের নিষ্ক্রিয়তা নষ্ট করে মানুষকে সচেতন করে তোলে, ভাবায়, প্রতিবাদ, সমর্থন বা জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ শ্রোতার উপর লালনের গান নেতি বা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি করে। মানসিকভাবে শ্রোতা এ গানে অংশগ্রহণ করে ফেলেন। জনসংযোগের এই শিল্পকৌশলের উপর নির্ভর করেই লালনের গানের অতুল জনপ্রিয়তা। লালন গ্রামীণ জনসাধারণের সাংস্কৃতিক স্তরটি জানেন। আর জানেন যে যে-সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান তা প্রচলিত মূল্যবোধ থেকে স্বতন্ত্র ; এমনকি বিরোধী। তাই প্রথমে তিনি প্রচলিত মূল্যবোধের স্ববিরোধিতা দেখিয়ে, প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে অতি সতর্কভাবে শ্রোতার মনে বপন করেন সংশয়ের বীজ। তারপর সংশয়কে প্রসারিত করেন। নিজস্ব মতের আভাস দেন, কিন্তু জোর করে শ্রোতার উপর তা চাপিয়ে দেন না। তিনি বরং মানুষের ঔৎসুক্য জাগিয়ে অপেক্ষা করেন। সংশয়সৃষ্টির এবং

পরমত-দূষণের প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদীদের কৌশলগুলি দক্ষভাবে লালনও ব্যবহার করেছেন।

'আল্লা ছাড়া সেজদা হারাম'—তাহলে আদমকে সেজদা না করার অপরাধে আজাজিল শাস্তি পেল কেন? এ সংশয় জাগিয়ে, লালন ঘোষণা করলেন, "আদম কালেবে খোদ খোদা বিরাজে"। মেয়েরাজের পদে তিনি প্রশ্ন করলেন, "নিআকারে মিলিল কেমনে?" দেহী মহাম্মদের সঙ্গে বিদেহী আল্লার মিলন কীভাবে হলো? নবী এবং চৈতন্যের অবর্তমানে তো সৃষ্টি এবং চেতনাশক্তি লুপ্ত হবার কথা। তাঁরা কি মৃত? অন্তর্হিত? এরকম অজস্র প্রশ্নে পরমত-দূষণ করেছেন লালন। লোকায়ত বিতর্কের এ কৌশলটির নাম জল্প।[৫০] বিতণ্ডার রীতি ব্যবহার করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আগুন শব্দে দাহিকাশক্তি থাকলে আগুন শব্দ লিখলে কাগজ পুড়ে কি? তাহলে বস্তু-নামে থাকে না তার গুণ ও ধর্ম। আকারহীন আল্লার নুরে কীভাবে সাকার বস্তুজগৎ সৃষ্টি হয়? "নিআকারে নুর চোয়ায় কি প্রকারে।"

সুন্নতহীন ব্যক্তি যদি মুসলমান বিবেচিত না হয়, তাহলে সুন্নতহীন বিবিরা মুসলমান কিনা? পৈতাহীন ব্রাহ্মণীরা ব্রাহ্মণ কিনা? বহু সমধর্মী অলীক দৃষ্টান্ত ব্যবহার-পদ্ধতিটি 'জাতি' নামে খ্যাত। বস্তুর নাম করলে বস্তু মেলে না ; "খাদ্যের নামে কৌ পেট ভরে?" তাই নাম অসার্থক।[৫১]

বিষমচ্ছেদ এবং লোকনিরুক্তি ব্যবহার করে শব্দকে ভেঙে সম্পূর্ণ নূতন অর্থ নিষ্কাশন করা হয়। যেমন, মুসলমান—মুসলকে (লিঙ্গ) মান দেয় যে ; হিন্দু—যেখানে নরনারী দুজনে অসাধক, হীন ; হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ হও রে প্রভৃতি। এসমস্ত ঐতিহ্যবাহিত কৌশল বাদ দিয়ে লালন-পদাবলীর পাঠগ্রহণ দুষ্কর।

পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান দৃষ্টান্তকে যুক্তি হিসাবে খুব গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় এবং সুফী মতবাদে দৃষ্টান্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাজক্ষ্যাপার শিষ্য মণি গোঁসাই একটি পদে বলেছেন, "দৃষ্টান্ত না পেলে সিদ্ধান্ত না শুনি" (নিজস্ব সংগ্রহ)। এ ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। বৌদ্ধতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সাদৃশ্যভাবনা। ভুবনের সঙ্গে দেহের, বুদ্ধের সঙ্গে মানুষের ঐক্য স্থাপন করেছেন তারা। প্রসন্নপাদ এবং চন্দ্রকীর্তি analogy বা দৃষ্টান্তকে জ্ঞানের স্বতন্ত্র উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৫২] এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ঐতিহ্য বাউল মহাজনেরা এবং লালন ব্যবহার করেন নিপুণ দক্ষতায়। লালনের দৃষ্টান্তগুলি শাস্ত্রীয় বা পৌবাণিক নয়। সামাজিক বা গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতার সর্বজনস্বীকৃত দৃষ্টান্তকে প্রমাণ ও যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে লালন সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

ভাবসঙ্গীত থেকে আকর্ষণীয় একটি বিতর্কের পদ গ্রহণ করে, লালনের বিতর্কের রীতি জনমানসে অনুপ্রবিষ্ট হয় কীভাবে, তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

পাপ পুণ্যের কথা আমি কারে বা সুধাই॥ এদেশে যা পাপ গণ্য অন্যদেশে পুণ্য তাই॥

১. তিব্বত নিয়ম অনুসারে এক নারী বহু পতি করে, এ দেশেতে হলে পড়ে ব্যভিচারী দণ্ড তায়॥

২. শুকর গরু দুটি পশু খাইতে বলেছে যীশু এখন কেন মুসলমান হিন্দু পিছেতে হটয়॥

৩. দেশ সমস্যা অনুসারে ভিন্ন বিধান প্রচারে লালন বলে বিচার করলে পাপ পুণ্যের নহি-বা নাই॥

৪. পুণ্য করলে স্বর্গবাসী পাপ হলে ভবে আসি লালন বলে নামে উদাসী নিত্য নিত্য প্রমাণ পাই।??।

[পৃ. ১৯৪, পদসংখ্যা ৫৩৩। দুবার নিজের নাম কোন পদে পাওয়া যায়-না। ৩ কলির শেষ শব্দটির অর্থবোধেও সমস্যা আছে। কলির সংখ্যা আমাদের দেয়া। গানটি ৪ কলির]।

অনির্দিষ্ট সম্বোধন করে নাটকীয়ভাবে শুরু হলো পদটি। পাপ-পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা ধারণা প্রত্যেকেরই আছে অল্পবিস্তর। মুখপাতেই লালন জানালেন যে দেশভেদে পাপপুণ্যের সংজ্ঞা বদলে যায়—এ বক্তব্যটি অভিনব সাধারণ মানুষের কাছে।

বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিলেন প্রামাণ্য যুক্তি হিসাবে। সাধারণ পদকর্তারা দ্রৌপদী, তারা, কুন্তীর দৃষ্টান্ত দিতেন। লালন তা দিলেন না। কারণ (১) ভিন্ন সময়ের, ভিন্ন কালের ঘটনা এগুলি। তাঁর বক্তব্যে সমকালে দেশভেদে পাপপুণ্যের ভিন্ন মূল্যবোধ—সমকালের দৃষ্টান্ত তাই দেবেন তিনি।

(২) পৌরাণিক কাল্পনিক চরিত্রের সত্যতা সন্দেহাতীত নয়।

(৩) দ্রৌপদী, কুন্তী, তারার বহুপতিত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। অথবা সীতা, সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বিপরীত সত্য দর্শকদের কাছে প্রমাণিত হতে পারে।

(৪) প্রত্যক্ষ প্রমাণিত সত্যই প্রমাণ, শাস্ত্র বা পুরাণকে লালন প্রামাণ্য মনে করেন না।

(৫) বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর ও সমাজের চরিত্র এরা। সার্বজনীন নয়। এদের প্রতি কটূক্তিতে উক্ত সম্প্রদায় দুঃখ পেতে পারেন। অর্থাৎ বিতর্কিত, কাল্পনিক বা খণ্ডিত হতে পারে, এমন কোন তথ্যের উপর যুক্তির ভিত তিনি নির্মাণ না করে, তিব্বতের বর্তমানকালে (লালনের সময়ে) প্রচলিত সর্বজনসম্মত সামাজিক প্রথাটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করলেন। তিব্বতে এ প্রথা সর্বজনস্বীকৃত—এই সামাজিক অবিতর্কিত সত্য ঘটনাটি প্রতিপক্ষকে বিমূঢ় করে লালনের বক্তব্যকে দৃঢ়তা দান করল। এবার আর-এক পদ অগ্রসর হয়ে শাস্ত্র/নবী বা অবতারকল্প মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রণেতাগণের মূল্যবোধ ও নির্দেশাদি যে দেশ ও কাল দ্বারা প্রভাবিত, তা প্রমাণ করার জন্য ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করলেন শ্রোতাদের। শাস্ত্রকে ব্যবহার করলেন আচারের বিরুদ্ধে। বিশেষত মুসলমান সমাজভুক্ত শ্রোতারা এ আঘাতে বিব্রত হবেন। কোরানে মরিয়ম-পুত্র যীশুকে নবী বলা হয়েছে এবং শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। আর ভারতের শাসকরা তখন যীশুর অনুগামী। তাঁরা গো ও শূকর দুয়ের মাংসই খায়। এ দুটি মাংসভক্ষণের প্রথা যীশুর ধর্মের নির্দেশজাত। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানের কাছে এ দুটি মাংস দু'পক্ষে নিষিদ্ধ।[৫৫] নবীর নির্দেশ! বিমূঢ় শ্রোতাকে এবার লালন রিলিফ (Dramatic relief) দিলেন। জানালেন, 'না, এগুলো খেতে হবে না'। দেশ, কাল অনুসারে ধর্মনির্দেশিত খাদ্যাখাদ্য বা সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এগুলি দেশাচার, শাশ্বত ঐশ্বরিক বিধান নয়। অপূর্ব কৌশলে যীশুর নির্দেশকে দেশাচার প্রমাণ করে তিনি স্বস্তি দিলেন শ্রোতাদের। আর ধরে নেয়া যায়, শ্রোতাদের সবাই খ্রীষ্টান-বিরোধী। তাই প্রবল প্রতিবাদের সম্ভাবনা কম। আর এ সূত্রেই ব্যভিচারের মতো 'মহাপাপ' সম্বন্ধে শ্রোতার মনে বপন করে দিলেন সন্দেহের বীজ। উৎসাহী শ্রোতা তিব্বতের রীতিটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে লালনের জ্ঞান ও তথ্যের অভ্রান্ততায় শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠবেন। লালন আর একটু অগ্রসর হয়ে জানালেন প্রচলিত পাপপুণ্যের ধারণাটি সঠিক নয়। লৌকিক জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে, 'তাহলে পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই?' লৌকিক বিশ্বাসে পুণ্যে স্বর্গবাস, পাপে ভবে জন্ম—এ ধারণাটি অগ্রাহ্য না করে, (অজ্ঞাত এক অর্থান্তরে) লালন স্বীকার করে বললেন 'নিত্যদিন এর প্রমাণ পাই'। এই সত্যকার প্রমাণটি জানার জন্য কৌতূহল উগ্র হয়ে ওঠে

শ্রোতার মধ্যে। উত্তরটি গানে নেই। এটি গুরুগম্য। অন্য বহু পদে অন্যভাবে স্বর্গ-সুখ ও পুণ্য এবং পাপ ও মর্ত্যদুঃখ নিয়ে লালন আলোচনা করেছেন। যুক্তি, তর্ক, সংলাপের মাধ্যমে প্রচলিত সত্যের বিপরীত সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লালনের পদের সর্বত্র দেখা যায়। সমাজবিরোধী এই অপ্রিয় সত্যকথনের ভঙ্গি ও ভূমিকার নাম সক্রেটিস দিয়েছিলেন 'good physician'-এর রীতি।

১৭দশ শতকের কয়েকজন ইংরাজি কবির আলোচনার সূত্রে Stanley Fish তাদের রচনায় প্লেটো ইত্যাদি ব্যবহৃত Dialectics-এর কাঠামো ব্যবহৃত হতে দেখে মন্তব্য করেছিলেন :

A dialectical presentation...is disturbing, for it requires of its readers a searching and rigorous scrutiny of everything they believe in and live by. It is didactic in a special sense; it does not preach the truth; but asks that its readers discover the truths themselves; and this discovery is often made at the expense not only of a reader's opinions and values, but of his self-esteem.

...The end of a dialectical experience is nothing less than a conversion, not only a changing but exchanging of minds.

...The good physician may be philosopher, minister, teacher, or even deity, but whatever its status, his strategy and intention are always the same : he tells his patients what they don't want to hear in the hope that by forcing them to see themselves clearly, they will be moved to change the selves they see.

...The end of dialectic is not so much the orderly disposition of things in the phenomenal world, as the transformation of the soulmind into an instrumental capable of seeing things in the phenomenal world for what they really are (Turning things upside down).[৫৪]

আলোচ্য পদে রক্ষণশীল হিন্দু বা মুসলমানের কাছে গো/শূকর মাংস গ্রহণের প্রস্তাব এবং ব্যভিচার পাপ নয়—এ সত্যভাষণ অতীব দুঃসাহসিক এবং আঘাতস্বরূপও বটে। জাত গেল জাত গেল বলে, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে প্রভৃতি গানে সম্প্রদায়বুদ্ধি ও জাতিভেদের প্রতি, আচারধর্মকে তিনি কষাঘাত করেছেন। নানা গোষ্ঠীর ভণ্ডামিকে, বৈদিক-শরীয়তের আচারের অর্থহীনতাকে, বেদাদি শাস্ত্রকে তীব্র সমালোচনা করে, লালন সত্যকে এগুলির বিপরীতেই স্থাপন[৫৫] করেছেন। ভণ্ড সাধু, প্রতিষ্ঠিত ধর্মগোষ্ঠী, ব্রাহ্ম জমিদার, আচারের মিথ্যাচারিতা, দেবতা, মূর্তি, ঝাড়ফুক, ভূতপ্রেত প্রভৃতি নিয়ে ধর্মব্যবসা, ধর্মীয় সাজসজ্জা, মোল্লা-পুরোহিত, প্রচলিত ধর্মব্যাখ্যা—সমস্ত কিছুতেই আক্রমণ করেছেন তিনি। কিন্তু এ আঘাতে কৌতুক, হাস্যরস, রঙ্গ, সংলাপ, যুক্তি, নম্রতা ও বিনয় থাকাতে এবং বিতর্কের রীতি অনুসরণ করায় এগুলি শ্রোতার মনে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে, তাদের ভাবায়। স্বভাবসিদ্ধ বিনয়, নম্রতা ও ধৈর্য দ্বারাই লালন গানের বাহাসে দুদ্দু শাহ প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে জয় করেছিলেন। অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য সক্রেটিসকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সমকালীন রক্ষণশীল ধর্মনেতাগণ (মূলত মুসলমান সমাজে) তীব্রভাবেই লালন এবং বাউল-ফকির বিরোধী ছিলেন। এ মতবাদের বিরুদ্ধে অঘোষিত কুৎসা এবং প্রচার সমাজে সর্বদা চলে। এ পটভূমিকায় মোহন সুরে, অপূর্ব কথাসংযোগে,

জনচিত্তের সঙ্গে সংযোগ রেখে, বন্ধুসম্মিত সংলাপচারিতার রীতিতে লালন গণচিত্ত আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি জয় করতেন বিরোধীদের। শিল্পের অপূর্ব আচ্ছাদনে অপ্রিয় সত্যও জনতার আস্বাদনীয় ছিল। লালনের গানের রঙ্গ, ব্যঙ্গ, হাস্যরস সৃষ্টির নিপুণতা, অসংগত ও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ, এগুলিকে জনতার ভোগ্য করে তুলেছিল। শব্দ নিয়ে খেলার wit বা pun এ গানকে করেছে বুদ্ধিদীপ্ত।

তাছাড়া জনচিত্তে ভক্তি-আন্দোলনের প্রভাব, বৌদ্ধ-জৈন-বেসরা-সুফী-আজীবিক সংস্কার, প্রবল বস্তুবাদী লোকায়ত ঐতিহ্য, বিচার-বিতর্ক শোনার আগ্রহ (কবিগান, জলসা, ধর্মসভায় হতো), লৌকিক ধর্ম ও দেহসাধনার আগ্রহ লালনের পথকে প্রশস্ত করেছিল। তাঁর প্রদর্শিত পথ ও মত চর্যাপদের পূর্বকাল থেকেই বঙ্গীয় জনচিত্তের ক্ষুদ্র অংশে বিদ্যমান ছিল। এই গণ-সংস্কারের ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী স্রোতের সপক্ষে লালন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহু সমধর্মী মানুষকে পেয়েছিলেন। তাঁর ঐতিহ্য ও বক্তব্য, রীতি ও প্রকৃতি আরোপিত উপদেশ নয় ; জনচিত্ত-লগ্ন, আচ্ছাদিত সত্যের সংস্কৃত পুনঃপ্রকাশ।

তথ্যসূত্র

(১) লালনের জীবনে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল। কায়স্থদের ফারসী ভাষার দক্ষতা, বৈষ্ণব তত্ত্বনিপুণতা লালনে পাই। এর সঙ্গেই পাই নিরক্ষর লোক-ঐতিহ্যের গুরুমুখী বিদ্যার বিপুল উপস্থিতি। লৌকিক মতবাদ ও সাধনাকে যুক্তি এবং শাস্ত্রভিত্তি দানের মাধ্যমে লালন এটিকে এক জীবনবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে আচারসর্বস্ব বৈদিকতা এবং দুষ্ট অনাচারী লৌকিকতার বিরুদ্ধে দ্বিবিধ সংগ্রাম করতে হয়েছে। এর ফলে একদিকে তার ভাষারীতিতে সন্ধি, দীর্ঘ সমাস, লিঙ্গ-সচেতনতা প্রভৃতি সংস্কৃতায়নের প্রভাব চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অন্যদিকে ত-যুক্ত নিষ্ঠান্ত ক্রিয়ার অব্যবহার ; সংস্কৃত পদ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া বা বাক্য, বাক্যাংশের অধ্যারোপহীনতা এবং তদ্ভব বা অর্ধ-তৎসম শব্দের সংস্কৃতায়নের চেষ্টা নেই। আছে লৌকিক বাক্‌রীতির প্রতি আনুগত্য।

চর্যাপদের তুলনায় নবচর্যাপদের ভাষায় পরেশচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃতায়নের উৎকৃষ্ট এক প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন। (নবচর্যাপদ, পৃ. ৩০-৩২) এ ধরনের কোন প্রবণতা লালনে নেই।

(২) ড. শহীদুল্লাহ-এর মতে গৌড়ী প্রাকৃতজাত গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে বাংলাভাষার জন্ম হয়েছিল। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য (ক) একটি ন, (খ) শব্দের আদিতে ও অন্যত্র য-এর পরিবর্তে জ-ব্যবহৃত হয়, (গ) কেবল স-উচ্চারিত হয়, (ঘ) -র-অপরিবর্তিত (ল হয় না), (ঙ) অতীত ও ভবিষ্যৎকালের অকর্মক ক্রিয়ায় কর্তার লিঙ্গ-বিভক্তি যুক্ত হয়, (চ) কর্তায় ও কর্মে লুপ্ত হয় বিভক্তি।

আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃ. ৩৫৫-৩৫৮।

পূর্বোক্ত অনেক বৈশিষ্ট্য লালনের কাব্যভাষায় আছে।

বিভক্তিলোপ এবং সংযোজক অব্যয় না-থাকায় এক ধরনের ব্যঞ্জনা লালনের ভাষায় সৃজিত হয়। যেমন, কারে ভজে কারে পাব ভেবে দিশে পাইনে তার (৩৬৮), সে আছে কোন অচিন শহর (৮৩), পরণ ছিল পীতধরা, কেশেরো আড়েতে যৈছে পর্বতো লুকাইয়া আছে দরশোন হল না (৯১) প্রভৃতি।

(৩) পাণ্ডুলিপির মূল লেখনীয়া জগৎ বিশ্বাসের পূর্ণ পরিচয় জানা যায়নি। কিন্তু তিনি তৎসম

শব্দগুলির বানান সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। নিরাঞ্জন, জ্ঞান, গৌরব প্রভৃতি যুক্তাক্ষর স্পষ্টভাবে লিখিত হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই তৎসম শব্দগুলি শুদ্ধ বানানে লিখিত। আবার ভিন্ন বানানও অনুসৃত হয়েছে। লিপিকার তৎসম শব্দগুলির বানান জানতেন। কিন্তু একটি লিখিত পাণ্ডুলিপির নকল করতে গিয়ে এবং মৌখিক উচ্চারণরীতিকে বানানে ধরতে গিয়েই বানানে অস্থিরতা এসেছে। সঙ্কেতচিহ্ন ছাড়া, শুধু স্বর দিয়ে উচ্চারণকে বানানে প্রতিফলিত করার কঠিন কাজে পাণ্ডুলিপির লিপিকার যথেষ্ট সার্থক। ৎ-কে লেখায় পুঁথির ভঙ্গি (চমৎকার) ; দু, কু প্রভুত দৃষ্টে মনে হয়, জগৎ, পুঁথির প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন এখানে। বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থগুলিতে অনেক সময় অনুলিখক, স্থান, সময় উল্লিখিত থাকে। এছাড়া কড়চা যিনি লেখাচ্ছেন অর্থাৎ মালিকের নামও পাওয়া যায়। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে এ ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে।

(৪) ৩৮ সংখ্যক পদে ২২ বারের -ন- ব্যবহারে ; -ণ- সর্বত্র পরিহার করা হয়েছে।

৩৭ সংখ্যক পদে : দাশী, রাশী, শেবা, সাধনা, উপসোনা, সদয়, কিশি, কেশ, বেষে, বেষ, রশোবতি, হাশী, শুজোন, শুক, বিলাশী—বানানে স, ষ, শ-এর ব্যবহার থেকে এগুলির অভিন্ন উচ্চারণ প্রমাণিত হয়।

১৪ নং পদে পাই : তিন, ত্রি, তির ; ১১১ নং পদে, তিরো, ব্যবহৃত হয়েছে। লোক-উচ্চারণ এবং সংস্কৃত মূল শব্দ ব্যবহারের স্মৃতি বানানে ভিন্নতা এনেছে একই পদে যেমন (৩৪ নং পদে) লোব লালসে ; লোভে পাপ ; শুখের শুক (১৪২)।

(৫) শব্দান্তে ব্যঞ্জনলোপের ফলে পূর্বস্বরের পরিবর্তন ঘটেছে বেহিসে < বেহিসাবী (২২৮)।

(৬) পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বঙ্গভাষায় অবহট্টের চিহ্ন হলো (১) ব্যঞ্জনের দীর্ঘত্ব, (২) নাসিক্যযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষা, (৩) যুগ্ম-ব্যঞ্জনের অসমীভূত ব্যবহার প্রভৃতি। নবচর্যাপদ, পৃ. ৩৩-৩৫। এসমস্ত লক্ষণ লালনের ভাষায় পূর্ণভাবে উপস্থিত।

(৭) হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

(৮) দু'একবার -ণ- ব্যবহৃত হয়েছে -ণ-, -ন- লুপ্ত হয়ে পূর্বস্বরকে অনুনাসিক করেছে এ ভাষায়, যেমন, চাঁদ। কিন্তু লালনের ভাষায় চাঁদ, চাদ, চান্দ, চন্দ্র ব্যবহৃত হয়েছে।

(৯) রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পৃ. ৫২৩।

(১০) "The search for a specific and exclusive pofular culture often a disappointing quest, must be replaced by the search for the differentiated ways in which common material was used." R. Chartier, Culture as appropriation : popular culture uses in early modern France–quoted by S. Sarker (the Kalki Avatar of Bikrampur), Subaltern Studies, Vol., vi, P. 49.

(১১) নবচর্যাপদ, পরেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ২৩৬।

(১২) ছন্দ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

(১৩) (বিপ্রতীপতা) কবিতার মিল ও অমিল, শিশিরকুমার দাশ, পৃ. ৭৯—৮০।

(১৪) The concise oxford dictionary, P. 874.

(১৫) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, নবচর্যাপদ, পৃ. ১৮। নিজের সাধনপন্থাকে লালন 'সহজ' বলেছেন।

(১৬) ইউসুখ শেখ এবং নজরুল শেখ প্রখ্যাত গায়ক-ভ্রাতৃদ্বয় (লালনগর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ) এ মন্তব্য করেছেন।

(১৭) 'ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্য হয়'—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২৩১—২৭২।

(১৮) ২০টি গানের মধ্যে ১৫টিতে ৫টি দাঁড়ি অর্থাৎ ১০ চরণের ৫টি শ্লোক। 'এমন মানব জনম আর কি হবে' পদটির সমাপ্তিতে দু'দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে ৪ স্তবক বা শ্লোকের গান ৩টি ; ৬ এবং ৩ স্তবক/শ্লোকের গান ১টি করে আছে। কমা, সেমিকোলন, ড্যাস, প্রশ্নবোধক চিহ্নাদি কবি ব্যবহার করেছেন।

(১৯) হারামণি (৫ম খণ্ড) এর ৪৪ নং পদে ১ম, ২য় স্তবকে এক দাঁড়ি ; ৩য় স্তবকে দু'দাঁড়ি। ৪৮ নং পদে, প্রথম দুটি স্তবকে দু'দাঁড়ি ৩য় ও ৪র্থ স্তবকে এক দাড়ি। অনেক পদের সূচনাশ্লোকে দু'দাঁড়ি (যেমন ১১ নং), সমাপ্তিশ্লোকে দু'দাঁড়ি (১১১ নং পদে)। অর্থাৎ এক দাঁড়ি বা দু'দাঁড়ি ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। শ্লোক বা স্তবক-সংখ্যাও অনিয়মিত—যেমন ৩ স্তবকের পদ—৪৪, ৪৭, ৮৯, ১০১, ৪ স্তবকের পদ—৪৫ নং ; ৪ স্তবকের পদ—৪৬ নং ; ৬ স্তবকের পদ—৫১, ৫৩, ৭৫ নং ; ৮ স্তবকের পদ—৫৪, ১৬৩ নং।

এগুলির মধ্যে অন্ত্যমিল এবং অমিত্রাক্ষর দুধরনের পংক্তিই আছে! অর্থাৎ ছন্দোবন্ধগুলি এখানে নিয়মহীন। শ্লোক বা স্তবকের পংক্তিসংখ্যাও অনিয়মিত।

(২০) পংক্তিবিন্যাসে ছন্দ ও অর্থবোধ ব্যাহত হয়, যেমন—

বেয়ে যাও ত্বরায় তরী

সুধারায় যেন ভরা না ডোবে (৪১৪ নং পদ)।

যথার্থ পাঠ হওয়া উচিত : বেয়ে যাও ত্বরায়/তরী সুধারায়/যেন ভারা না/ডোবে॥

এখানে স্তবকে সর্বোচ্চ ৮ পংক্তি পাওয়া যায় (২৭৭)। অধিকাংশ পদে চারটি স্তবক ; ৫ স্তবকের পদও আছে (৪০১, ৪০২)।

(২১) নরহরি তালের অংশকে কলা বলেছেন। (পূর্বোক্ত)

তাল দ্বারা নিয়মিত পদসমূহকে কলা বলা হয়। কলাসমষ্টির দ্বারা কলিকা রচিত হয়। কলিকার ছ'প্রকার ভেদ আছে। ১২ কলার কমে বা ৬৪ কলার অধিক পদে কলিকা রচিত হয় না, বৈষ্ণব ঐতিহ্যে।

হরিদাস দাস, শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, পৃ. ১৪৭।

(২২) লেখকের অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থে, আলেপ, বাহার, ভূগোল, নৈমুদ্দীন প্রমুখ পদকর্তাদের স্বহস্তলিখিত খাতায় এ রীতির প্রয়োগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রশ্নের পদের 'কলি'গুলিকে, উত্তরের পদে কলি দিয়ে উত্তর দিয়ে, আবার জিজ্ঞাসা রাখা হয় বিশেষ এক শ্রেণীর পদে। মুসলমান সমাজভুক্ত পদকর্তাগণ এই সংখ্যাচিহ্নিত কলিবিভাগের অধিকতর পক্ষপাতী। গায়কেরা গানের কলিসংখ্যা মনে রাখেন।

'হিতকরী'তে প্রকাশিত লালনের গানগুলিতে সংখ্যা দ্বারা কলিচিহ্নিত। প্রয়াত সাধক গুরু-গায়ক জাফর ছড়াদারের খাতায় (নূতন গ্রাম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ) লালনের বহু পদ কলিবিন্যাসে লিখিত। গায়কদের খাতায় কলি ধরণ/পরধরণ-এর পর থেকে, সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়।

(২৩) লোকমান ফকির, (পাড়দেয়াড়, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ), ইউসুখ সেখ ও নজরুল ইসলাম (লালনগর, হরিহরপাড়া মুর্শিদাবাদ), সোলেমান আলী বিশ্বাস, (জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ) আজহার আলী খাঁ, (গোরাভাঙ্গা, করিমপুর, নদীয়া), হিমু ফকির, (পাটকেবাড়ি, নওদা, মুর্শিদাবাদ) ; বীরেন দাস এবং আজমত ফকির বাংলাদেশ (পূর্বোক্ত), হৃদপদ্ম বিশ্বাস, ফুলিয়া, নদীয়া প্রভৃতি গায়কদের কাছ থেকে গৃহীত তথ্যানুসারে লিখিত।

(২৪) চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক শ্রেণীর লোকগায়কদের গানে সুর চরমে উঠে হঠাৎ থেমে যেত। Ibon Batutahs account of Bengal, appen. IV. P. 21.

(২৫) বাংলা শব্দ ও ছন্দ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪দশ খণ্ড, পৃ. ৯৯৮—৯৯৯।

(২৬) ভিন্ন হস্তলিপিতে লেখা ১৬৬—১৭০ নং পদের ছেদচিহ্নগুলি স্পষ্ট নয়। এখানে চরণান্তিক মিল দিয়ে কলিগুলিকে সনাক্ত করা যায়। ১৬৮ নং পদে অন্ত্যমিলের রীতি আলাদা—হোরি ঃ তোমারি ঃ পাবে ঃ ভাবে ঃ হবে।

(২৭) পদ ১৩, ১৬, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। পাঞ্জুশাহের ও হাউড়ে গোসাই-এর ৪-এর অধিক কলির গান আছে।

(২৮) চর্যাপদে দু'চরণে মিত্রাক্ষর, অর্থাৎ দশটি চরণ পাঁচটি মিত্রাক্ষরে আবদ্ধ (ক ক, খ খ প্রভৃতি)।

লালনের কলিগুলি একই মিত্রাক্ষরে বদ্ধ (ক ক ক ক ক)। এটি তাঁর বিশেষত্ব।

ক্ষুদিরাম দাস ৫ শ্লোক বা দশটি চরণের চর্যাপদকে মূল ও যথার্থ বলেছেন। পরেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেছেন যে এগুলির স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ছিল ১০ অথবা ৮ চরণের। বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, পৃ. ২২৩—২২৭ ; নবচর্যাপদ, পৃ. ৪৪।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত নবচর্যাপদের ৯৮টি গানের মধ্যে ৫ শ্লোকের ৭২টি ; ৪ শ্লোকের ১০টি ; ৩ শ্লোকের ৪টি, ৭ ও ৬ শ্লোকের ৩টি করে ; ৯ ও ১১টি চরণ আছে ২টি পদের ; ৯ শ্লোক বা ১৮টি চরণ আছে কয়েকটি পদের।

(২৯) বাউল গান ও খাতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে মন্তব্য করেছেন। 'মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না।' ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; নন্দলাল সেনগুপ্তকে লেখা।

(৩০) লোকসঙ্গীত পরিবর্তনশীল কিন্তু আচারনিষ্ঠ বাউলগান অপরিবর্তনীয়। বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড), পৃ. ৫৫-৫৬।

(৩১) ১৫৫ নং পদে ছেদ—সাধনে ঃ তোরা ঃ দুই জোনে ঃ ॥ টেনে ঃ॥ শুনে ঃ॥

ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা ১৭১ ও ১৭৩ নং পদে মাত্র দুটি পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ধরন পরধরণে ছেদ নেই।

১৭২ নং পদে দুটি ছেদচিহ্ন ঃ, ঃ।

১৬৬ নং পদে মাত্র ১টি ছেদচিহ্ন।

১০০ নং পদে ছেদচিহ্ন তিনটি (ঃ॥) কিন্তু চরণান্তিক মিল ৫টি।

১২৯—১৩১ নং গানে ভিন্ন হস্তাক্ষরে অত্যন্ত সুচারুভাবে অর্ধচ্ছেদ (। বা ঃ।) চিহ্ন এবং পূর্ণচ্ছেদ (ঃ॥) ব্যবহার করে কলি ও কবিতার চরণ সাজানো হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির বহুস্থলে মিত্রাক্ষরের সঙ্গে ছেদ ও কলিবিভাগ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন পদ ৯১-তে দুটি পূর্ণচ্ছেদ, তিনটি অর্ধচ্ছেদ, একটি ঃ চিহ্ন, আর একটি মিত্রাক্ষরে ছেদ নেই। (এটি পর্বান্তিক মিত্রাক্ষর মনে হয়)।

১৩৫ নং পদে ঃ হবে ঃ। কোরবি ঃ॥ ভেবে (?) নিবে ঃ॥ ভবে।

১৪১—দুনিয়াদারি ঃ। ফোকিরি ঃ॥ তোমারি (?) বরাবরি (?) ভুরি ঃ॥ তারি (?) জারি ঃ॥

৩১৮—কিশোরী ঃ॥ ভারি (?) জারি (?) হরি ঃ॥ তোমারি (?) ভুরি ঃ॥ তারি ঃ।

সুতরাং মিত্রাক্ষর দিয়ে কলিনির্ণয় সর্বক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়।

কোন কোন গানে (১৬৯) কেবল 'ঃ' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩২) ১৫, ৪৫ প্রভৃতি তিন কলির পদে শব্দসংখ্যা ৫০-এরও কম।

মুখপাত বা গানের সূচনাংশ (ধরণ ও পরধরণ) কলিগণনার বাইরে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ সূচনাংশকে 'আধ'কলি হিসাবে গণ্য করেন।

(৩৩) পবিত্র সরকার : গদ্যরীতি পদ্যরীতি : (বাংলা কবিতার মিল ও তার ব্যাকরণ) পৃ,. ৫৬।

(৩৪) রামপ্রসাদের গান : কেবল আমার আসা ভাবে আসা, আসা মাত্র সার 'হলো', শাক্ত পদাবলী, পদসংখ্যা ১৫৭; পৃ. ১০৯,

(৩৪) শিশির দাস, 'কবিতার মিল ও অমিল' গ্রন্থে অভাবিত ও অন্ত্যমিলের বিচিত্র রীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অভাবিত সুচারু মিল পাই ১৫৩ নং পদে।

(৩৬) বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, পৃ. ২০৪।

(৩৭) ছন্দ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪দশ খণ্ড, পৃ. ২৩৪-২৩৬।

(৩৮) A. K. Ramanujam. Speaking of Siva. PP 37-47.

(৩৯) নিহার/শিক্ষা ; শিক্ষা/দৈন্য এভাবেও প্রশ্ন-উত্তরের পদকে অনেক সাধু চিহ্নিত করেন।

রাঢ় অঞ্চলের এখনকার বাউল-গায়কদের অনেকেই প্রশ্নোত্তরী গান জানেন না। রেডিও, টি. ভি. এবং বিদেশে যে-সমস্ত বিখ্যাত গায়ক গান করার সুযোগ পান, তারা ভদ্রলোক ও বিদেশীদের তুষ্ট করার জন্য বিচ্ছিন্ন পদগুলি গান করেন। প্রশ্নোত্তরী গান গ্রাম্য জনতার এবং সাধুদের আস্বাদ্য। সুকুমার সেন এসমস্ত গায়কদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক বাউলদের কেউ কেউ ব্যবসাদার, কেউ সংদার, কেউ রেডিও বাউল"—শকুন্তলা, জানুয়ারি, ১৯৮৩, পৃ. ১। অথচ এ শতাব্দীর সাতের দশক পর্যন্ত কেঁদুলী ও বৈরাগীতলার মেলায় প্রশ্নোত্তরী গানের পরম্পরা রক্ষা করে গান করা হতো। (শান্তিদেব ঘোষ, শকুন্তলা, ১৫ বর্ষ, পৌষ, ১৩৯৫, পৃ. ১) শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় কখনও প্রশ্নোত্তরী পরম্পরা অনুসরণ করার নির্দেশ কর্তৃপক্ষ দেননি। রাঢ়ের নিম্নবর্গের গায়কদের গানই জীবিকা। অনিবার্যভাবেই ভদ্রলোক এবং বিদেশীদের মনোরঞ্জনের সূত্রে তারা একক পদ গান শুরু করেন।

(৪০) 'আপ্তবাক্যং শব্দ' প্রভৃতি উক্তি ন্যায়দর্শনে বহুব্যবহৃত। ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৮০।

'আপ্ত' শব্দটি লালন বহু ব্যবহার করেছেন। জল্প, বাদ, বিতণ্ডা প্রভৃতি লৌকিক বিতর্করীতি, শব্দ-ব্যাখ্যার কূটকৌশল, বস্তুকে আত্মা বলা (দুদ্দুর পদ নং ৩৭৮, বাংলার বাউল ও বাউল গান) প্রভৃতি নব্যন্যায়ের নানা ঐতিহ্য বাউলগানে যথেষ্ট সক্রিয়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, গ্রন্থে বাঙ্গালী জীবনে নব্যন্যায়ের প্রভাবের আলোচনা করেছেন।

(৪১) গোপাল বিশ্বাস, (নাজিরপুর, করিমপুর, নদীয়া) প্রখ্যাত বাউলগুরু। তিনি লালনের সঙ্গ করেছেন বলে প্রকাশ। গোপালের এবং স্ত্রী ভুবনমণির অনেক পদ পাওয়া যায়। বাদ্যকর, দোহার, মাস্টার-সহযোগে বঁদগানের দল গঠিত হতো। দু'দলে হতো ধর্মীয় বিতর্ক। বঁদ অর্থাৎ বাঁধা বা পূর্বেই রচিত পদ।

তথ্যসূত্র : পাঁচু বিশ্বাস ফকির, সুরার ধার, করিমপুর, নদীয়া।

(৪২) গোর্খবিজয়, ভূমিকা ; ঐ ; নাথপন্থার সাহিত্যিক ঐতিহ্য।

বৈষ্ণব কড়চাগ্রন্থ—অদ্বৈত কড়চা, বীরভদ্র শিক্ষাপত্র, নৃলোকসার চিন্তামণি প্রভৃতি প্রশ্নোত্তরে লিখিত। অন্যান্য বহু পুঁথির অংশবিশেষে প্রশ্নোত্তর আছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বাউল গানের প্রশ্নোত্তরী রীতি শ্রুত হয় সাধু সভায় বা অন্যত্র। ফারাক্কার পর কোচবিহার পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরী দেহতত্ত্বের গান জনতা আস্বাদন করে।

প্রশ্নোপনিষদ, অমোঘবর্ষ, প্রশ্নোত্তর মালিকার আছে প্রশ্নোত্তর। এ রীতিটি এবং সমস্যা পূরণ

বৈদিক জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদের দেবতারাও এ রহস্য ভালবাসতেন। জনপ্রিয় এ শৈলীটি অবশ্য 'অধম কাব্য' বলে বিবেচিত হত।

আদিবাসী এবং নিম্নবর্গের মধ্যে বিবাহে, ধর্মদীক্ষায় এরীতির গান ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধ, জৈন ঐতিহ্যে অন্যকে এড়িয়ে কথা বলার জন্য প্রশ্নোত্তর ব্যবহৃত হয়। এ রীতিতে সহসা জাগ্রত হয় সাধকের চিত্ত। পানিনি প্রশ্ন অর্থে জিজ্ঞাসা ; উত্তর অর্থে ব্যাখ্যা অর্থ দিয়েছেন।

Apte V. S., Practical Sanskrit English Dictionary, I, Poona, 1957, P. 312.

Ganguly O. C., Art of the Rastrakuta, Orient Longmans, 1958, P. 8.

Suzuki B. L., Mahajana Buddhism, London, 1938.

(৪৩) ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২৬৮।

(৪৪) আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা গ্রন্থে 'দরবেশ লালন' ভণিতাযুক্ত পদকে জাল বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। পৃ. ১৯০।

দরবেশ ফারসী শব্দ। তুর্কী এবং আরবী ভাষার সুফী, ফকির শেখ, Zahid প্রভৃতি এর সমার্থক শব্দ। ভিক্ষাজীবী এক ধরনের সাধকেরাই দরবেশ। কেউ বেসরা ; কেউ উন্মাদ, জপ বা দেহনির্যাতন করেন অনেকে ; কেউ অলৌকিক ক্ষমতাশালী। সুফী গোষ্ঠীর অন্তর্গত দরবেশগণ। কিন্তু সুফীবাদ এক দার্শনিক বিশ্বাস ; দরবেশপন্থা এক জীবন-যাপন পদ্ধতি।

Encyclopaedia of religion and ethics, edi. J. Hastings. Vol IV. PP 641. New York 1959. Encyclopaedia Britannica, Vol. VIII. Cambridge University Press. 1910. PP. 75.

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে মন্তব্য করা হয়েছে : 'ভারতের অনেক দরবেশই নীচ বংশোদ্ভব ও অসচ্চরিত্র ; ইহাদের অধিকাংশই বেশরা' ৮ম ভাগ ; পৃ. ৩৫৯।

লালনের গানে ফকির/ফকিরি এবং দরবেশ দরবেশী প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। লালনশিষ্য দুদ্দু "দরবেশী বাউল" শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ দরবেশদের একাংশ বাউল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে সাধকের খাতায় "বাতুল বৈষ্ণব"-এর পরিচয় পাই [নিজস্ব সংগ্রহ]। এরা 'গোস্বামী মত' মানে না ; মানে 'বাউল মত'—অর্থাৎ জাত, ধর্ম, আচারাদিকে যাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁরাই বাউল। তাই অবৈদিক ও বেশরা শব্দ বাউলের বিশেষণ। রক্ষণশীলরা বাউল-বিরোধী।

(৪৫) গুরুবাক্য বলবান, শাস্ত্রবাক্য ছাড় মন ; গুরুবাক্য মন ধর, অন্য কথা ছারখার প্রভৃতি প্রবাদবাক্য সাধুরা ব্যবহার করেন। যিনি করে জেনেছেন সাধনা ; তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয় শব্দাশ্রয়ে, গানে বা কথায়। আলোচনামূলক 'নবুয়াত' পদ্ধতি অপেক্ষা, দেখিয়ে দেয়ার 'বিলাওত' ঢং সাধনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গুরুবাক্য শিষ্যের অভিজ্ঞতায় সত্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা অনুমানমাত্র। রাজক্ষ্যাপা মন্তব্য করেছেন : পরের দেখায় কে দেখিতে পায়/যদি নষ্ট হয় আঁখি [নিজস্ব সংগ্রহ]।

(৪৬) Kabir's Rhetoric, The Sants. P. 148.

(৪৭) লালন গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন।

রমিলা থাপার এ ধরনের প্রতিবাদীদের প্রচলিত জীবন ও মূল্যবোধ থেকে স্বাতন্ত্র্যের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ ধরনের মানুষেরা বেদ অস্বীকার করে, সমাজের প্রবল প্রতিবাদী কিন্তু পরম শুদ্ধ হিসাবে দাবি করে সমাজ-কর্তৃত্ব। সমাজকে পূর্ণ অস্বীকার বা বদলানোর চেষ্টা না করে, লালনের মতো সাধকেরা সমান্তরাল আর-এক সমাজগঠনের চেষ্টা করে। থাপার মন্তব্য করেছেন, "The renouncer is identified not necessarily with a religious sect but with an order constituting an alternative lifestyle, in many ways contradictory of his origi-

nal social group" Renunciation : The making of a counter-culture, Ancient Indian Social History. PP. 62.

(৪৮) কবীরের এ ধরনের প্রশ্নাঘাতকে Hess বলেছেন 'Jab' :–Lind Hess, Kabir's Rhetoric. The Sants. P. 148.

(৪৯) Junso Sato নামে এক জাপানী ভদ্রলোক ইয়েটসকে এক তরবারি উপহারের অনুষঙ্গে কবিতাটি লিখিত।

(৫০) হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে বাদ ইত্যাদির আলোচনা করেছেন (পৃ. ১৯০—১৯৫)।

S. N. Dasgupta জল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "A kind of tricky logical discussion which is intended only to criticise the opponents thesis" (PP. 512).

চৈতন্যযুগে বিচার ও বিতর্কে এসমস্ত লৌকিক চাতুর্য ব্যবহৃত হতো। শব্দের গৌণী, লক্ষণা, তাৎপর্যা, জহৎস্বার্থা তাজহৎ স্বার্থা, জহদ্ জহদ্ স্বার্থা, মুখ্যা, অভিধা, বিতণ্ডা প্রভৃতি শক্তির সহায়তায় চৈতন্যদেব স্বীয় মত ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করতেন। কর্ণপুর, সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বিতর্ক-বর্ণনায় লিখেছেন : 'অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলে নিগ্রহাদৈ নিরস্ত ধীরপথ্য পূর্ব্ব পক্ষং—চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যম্, শ্লোক ২৫, পৃ. ২৪১।

(৫১) S. N. Dasgupta এ ধরনের কৌশলের আলোচনায় লিখেছেন যে বিপক্ষের কথার এবং যুক্তির অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষকে বিমূঢ় করা হয়। (পূর্বোক্ত)। বাউল ধ্বংসের ফৎওয়া-এর মন্তব্য : 'ইহারা কোরাণের আয়েতের বিপরীত অর্থ করে" (পৃ. ৯৯—১০০)।

ভক্তি-আন্দোলনে নাম গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু লালন নামমহিমায় তাদৃশ বিশ্বাসী নন। 'কালকর্ণী জাতকে' নামকে অসার্থক বলা হয়েছে (জাতক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮)। এই বৌদ্ধ-ঐতিহ্য বাউল গানে আংশিক প্রভাব ফেলেছে।

লেখকের বস্তুবাদী বাউল এ বিতর্কের লৌকিক ঐতিহ্যগুলির বাউল গানে ব্যবহারের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(৫২) Yoga of the guhya samaj tantra. Alex Wayman. P. 64

(৫৩) গোমাংস খেলে হিন্দুর ; শূকরমাংসে মুসলমানের জাত চলে যায়।

যীশুর গো বা শূকরমাংস খাবার নির্দেশটি বিতর্কিত। কিন্তু ভারতে খ্রীষ্টানগণ দুটি মাংসই ভক্ষণ করেন জন্য এটি যীশুর প্রচলিত নির্দেশ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

(৫৪) Self consuming artifacts : The experience of seventeen century literature. P.1-7.

(৫৫) হিন্দু সমাজে বেদের বিরোধিতা করা যায়। লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন আন্দোলনের উত্তরাধিকারী হিসাবে লালন বেদ-বিরোধী। কিন্তু নবী ও কোরাণকে অগ্রাহ্য করলে সে মুসলমান থাকে না। লালন নবী ও কোরাণকে তাই অগ্রাহ্য না করে ভিন্ন ব্যাখ্যায় গ্রহণ করেছেন। কোরাণের গুপ্ত এক লৌকিক ব্যাখ্যা লালনপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

রমিলা থাপার, ভক্তি-আন্দোলনের এবংবিধ বিশেষত্ব নিয়ে মন্তব্য করেছেন, "They objected not to the system (which was a workable. Socio-economic system) but to the Brahminical interpetation of it"–Ancient Indian Social History. P. 35.

।। চতুর্থ অধ্যায়।। সন্ধা ভাষা

বাউল গানের ভাষা একটি সাহিত্যিক ভাষা। এতে উত্তর পূর্বভারতের ভক্তি আন্দোলনের নানা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত গানের শব্দ, চরণ বাউলেরা ব্যবহার করেন বটে; তথাপি এ ভাষা তাদের কথ্য বা লালনের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নয়।

চর্যাপদের কাল থেকে, গুপ্ত এক দেহসাধনা এবং বিশিষ্ট এক কাব্যভাষায় তাকে প্রকাশ করার রীতি, বাংলা সাহিত্যে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। মূল বক্তব্যকে এবং দুরূহ দার্শনিকতাকে সামাজিক রূপকাবরণে প্রকাশ করা; সংকেত ও পারিভাষিক শব্দের প্রাচুর্য এ কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য। এ ভাষা-পরিকল্পনার প্রাচীন উৎস তন্ত্র; বিশেষত মহাযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদি ও তাদের টীকাভাষ্যে এই সাঙ্কেতিক কাব্যভাষার আলোচনা পাওয়া যায়। গুহ্য সমাজতন্ত্র এবং তার টীকাগুলিতে সাঙ্কেতিক শব্দ, অক্ষর, প্রতীক, সাদৃশ্যমূলক ভাবনা, শব্দের অর্থান্তর প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কাব্যভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। গুহ্য সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্য উত্তরকালে বাউল সাধনায় ও কাব্যভাষায় বর্তেছে। এই ভাষার অর্থভেদ বিষয়ে টীকাকার ও গুরুদের মধ্যে মতভেদ আছে। Alex Wayman মন্তব্য করেছেন, "Their sentences, although relatively simple in language complexity, continually need the gurus oral expansion and authoritative commentary. The problem is not with the individual words, which indeed mean what they aught, are employed in a range of acceptable usages and then intend other senses in arbitrary analogical system. Again the texts are essentially practical, are concern with doing things such as rites. And recipe books, even on mundane level, are notorious for requiring a teacher to tell the missing steps." এ শ্লোকসমূহের প্রচলিত অর্থকে নেয়ার্থ এবং সাধন-সম্পৃক্ত বাহ্য ব্যাখ্যাকে চন্দ্রকীর্তি নিতার্থ বলেছেন প্রদীপদ্বয়োতন টীকাগ্রন্থে। এ কাব্যভাষার অন্য নাম সন্ধ্যা/সন্ধা ভাষা। সন্ধা এবং সন্ধ্যা শব্দের সঙ্গে যোগ আছে সন্ধি শব্দের। সন্ধির শব্দার্থ হল মিলন। সন্ধ্যা ভাষার ভিতরে দ্ব্যর্থক শ্লেষ থাকে। একটি আভিধানিক, অন্যটি আভিপ্রায়িক। লালন সঙ্গত কারণে 'সন্ধি' বুঝতে বলেছেন (পদ নং ২৪)। চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস এ দ্বিভূমিক অর্থতাৎপর্যকে 'অনুবাদ' এবং 'বিধেয়' বলে চিহ্নিত করেছেন।

হেবজ্রতন্ত্রে (২য় কল্প, ৩য় পটল) সন্ধ্যাভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে এইভাবে : "সন্ধ্যাভাষং মহৎ ভাষং সময়সঙ্কেত বিস্তরম।" সময় অর্থ নরনারীর বিশেষ অবস্থা এবং গুপ্তপদ্ধতির মিলনকাল। এই গুহ্য সাধনপ্রণালী সঙ্কেতিত শব্দে অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষায় আবৃত। উদ্দেশ্য, ভব্য সত্ত্বের নিকট সময়ের সুগুপ্ত তত্ত্বকে প্রকাশ করা এবং অভব্য সত্ত্বের নিকট থেকে একে কৌশলক্রমে গুপ্ত রাখা (ভব্যসত্ত্বেষু ব্যক্তং অভব্য সত্ত্বেষু গুপ্তমিতি)।[৫] সময়সঙ্কেত বিস্তার, মহাসময়, মহাভাষা প্রভৃতি বিশেষণে হেবজ্রতন্ত্রে সন্ধ্যাভাষা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ গ্রন্থে সন্ধ্যাভাষা অধ্যায়ে বজ্রযান, সহজযানের বহু শব্দের গুপ্ত অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সন্ধ্যাবচনের সংস্কৃত ও চীনা অর্থপ্রদত্ত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ ও

দোহাকোষের আলোচনায় 'সন্ধ্যা'ভাষাকে 'আলো-আঁধারির' ভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং আরো অনেকের মতে এটি "সন্ধাভাষা", সম্যক অবধানপূর্বক একে বুঝতে হয়। এ ভাষা অভিসন্ধিমূলক। এর শব্দাদি বাইরের দিক থেকে অর্থ বহন করে, কিন্তু সঙ্কেতিত অর্থ ভিন্ন বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতীয়, নেপালী ও চীনা উৎস বিশ্লেষণ করে এ ভাষাকে abhiprayika Vacana or Neyartha Vacana বলেছেন। এ ভাষাটি secret, hidden. "It is intended to imply or suggest something different from which is expressed by the words." [৪]

Mircea Eliade সন্ধ্যাভাষাকে 'Intentional Language' বিবেচনায় মন্তব্য করেছেন "unlike the metaphysical conceit, its inherent paradoxes can not be resolved through a break down of it into 'disambiguous sentences'. *** Sandha Vasa requires a total hermeneutic of reading; an awareness in fact of the total religious and philosophical structure which infuse it." [৫]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ ভাষার ব্যঞ্জনাধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর অভ্র আবীর কাব্যগ্রন্থের ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন।

সন্ধ্যাবচনের সংস্কৃত ও চীনা প্রতিশব্দ পাওয়া সত্ত্বেও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মন্তব্য করেছেন, "I do not however pretend to say that by the substitution of these equivalents we can arrive at a clear meaning, the meaning will still remain obscure. The obscurity can be removed only when the text will be interpreted in the light of Vajrayana doctrines, unfortunately our knowledge of the Vajrayana is still very meagre" [৬]

বিরোধাভাসপূর্ণ এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বস্তুর সমাহারপূর্ণ এক বাক্‌ভঙ্গী চর্যাপদে, (২, ৩৩ পদে) বাউলগানে চিহ্নিত করা যায়। এগুলি উল্টাকথা, উল্টাপদ বলে পরিচিত হয়। লালনের অনেক গানে এ উল্টাভাষা ব্যবহৃত হয়েছে অংশত। এ ধরনের বহু পদ চণ্ডীদাস ও পদ্মলোচনের নামে প্রচলিত।[৭] পরশুরাম চতুর্বেদী কবীরের দোহা ও শব্দের এবংবিধ ভাষা ব্যবহারকে 'উল্টাবংশী' নাম দিয়েছেন। সন্ধ্যাভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক নিবিড়।[৮] তাঁর মতে, গোরক্ষনাথের রচনায় উলটি-চর্চার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। "From this it is clear that it is a style in which a point is made through unusual comparisons consequently, ultabansi may be interpreted as a word composed of two segments : ulta (inverted) and amsa (aspect or part)." [৯]। এই ভাষাকে বিজয়চন্দ্র মিশ্র আলো-আঁধারির ভাষা হিসাবে (সন্ধ্যার শাস্ত্রীকৃত ব্যাখ্যা) গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন যে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের মম্মটভট্ট নির্দেশিত ব্যঙ্গ অর্থ নিষ্কাষণ (suggestive meaning)-পদ্ধতির সাহায্যে এর অর্থভেদ করা সম্ভব। কিন্তু এ ভাষার জটিলতা সম্পর্কে তিনি সচেতন।[১০] কিন্তু ব্যঙ্গ অর্থ কোন্‌টি? আর তা নির্ণয় করবে কে? এর কোন সমাধান মিশ্র আলোচনা করেননি। বাংলায়, উল্টাভাষার বিরোধাভাস, বিশেষ তাৎপর্যে বিরোধকে অবসিত করে। অনেক সময় প্রচলিত জীবনবিশ্বাসের বিরোধী সত্যকে লালন যখন বিবৃত করেছেন, তখন তা 'উল্টাভাষা' হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে (পদ ৬১ দ্রষ্টব্য)।

বিরোধাভাসপূর্ণ 'উল্টাভাষা', প্রহেলিকা বা দ্ব্যর্থক শ্লেষ, সন্ধ্যা বা আভিপ্রায়িক ভাষা

থেকে পৃথক এক বাক্‌নির্মিতি। কিন্তু লৌকিক বা শিষ্ট সাহিত্যে এগুলির যৌথ, মিশ্র ব্যবহাব লক্ষ করা যায়। বৈদিক যুগ থেকে ধর্মানুষ্ঠান-সম্পৃক্ত সাহিত্যে হেঁয়ালিপূর্ণ প্রহেলিকাধর্মী এক ভাষা চিহ্নিত করা যায়। আমোদের জন্য বা বিতর্ক, বাদ চালানোর জন্য প্রাচীন ভারতে প্রহেলিকার ব্যাপক ব্যবহার ছিল।[১১] কবিতার গোপনীয় অর্থবিষয়ক জ্ঞান হিসাবে বাৎস্যায়ন ৬৪ কলার মধ্যে প্রহেলিকাকে স্থান দিয়েছেন।[১২] দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ১৬ প্রকার প্রহেলিকার উল্লেখ আছে (৩, ৬৭—১০৬)। বাংলায় ধাঁধা, হেঁয়ালি, প্রবাদ-প্রবচনে, কবিদের আত্মপরিচয়দানের বক্র-চাতুরিতে, নাথসাহিত্যে, ভক্তি-আন্দোলনে সন্ত কবিদের রচনায় প্রহেলিকা উপেক্ষিত হয়নি। চর্যাপদে স্থানবিশেষে প্রহেলিকাত্মক ভাষাভঙ্গী অনুসৃত হয়েছে। পদ্মালোচনের মতো বাউল পদকর্তা এ রীতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। শ্লেষাত্মক ও প্রহেলিকাধর্মী ভাষার কাব্যগত প্রয়োজন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে, সাহিত্য দর্পণকার, প্রহেলিকাকে রসের পরিপন্থী এবং যমক শ্লেষালঙ্কারবহুল দুরূহ কৌশলময় রচনাকে অকাব্য বলেছেন।[১৩]

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভট্টি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ বর্ণ ও পদবিন্যাসে এবং অলঙ্কারে চাতুর্যময় কাব্যাংশ রচনা করেছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে যমকমালায় রচিত শ্লোক আছে। হর্ষের দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনায় যে শ্লিষ্ট শ্লেষ, তার চতুর্বিধ গূঢ় অর্থ হয়। উত্তরকালে আদ্যন্ত শ্লেষ, যমক, ব্যাকরণ-নৈপুণ্যযুক্ত কাব্যাদি সর্বভারতে রচিত হয়। হিন্দু, জৈন, বৈষ্ণব কবিসমাজ এ ধরনের রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন এবং এগুলি চিত্রকাব্য নামে খ্যাত হয়। আগাগোড়া শ্লেষ বা যমকবন্ধে রচিত হতো কাব্য। বঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত শ্লেষকাব্য; আর যমকবন্ধে রচিত নীতিবর্মার কীচকবধ। এ রীতিতে অগ্রজ কবির পদবিশেষের সমস্যা পূরণার্থে রচিত হতোঅনুজ কবির রচনা অষ্টম শতকের জৈন কবি ধনঞ্জয় থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বহু কবি চিত্রকাব্য রচনা করেছিলেন।

শ্লেষপ্রধান চিত্রকাব্যের বিদগ্ধ কবিগণ শ্লিষ্ট শ্লেষ দ্বারা দ্বিবিধ/ত্রিবিধ, এমনকি সপ্তবিধ কাহিনীকে একত্রে গ্রথিত করতেন। দ্বি-অর্থপ্রধান কাব্যগুলি দ্বিসন্ধান, তিন অর্থযুক্ত কাব্য ত্রিসন্ধান নামে পরিচিত ছিল। মেঘবিজয় গণি নামে এক জৈন কবি সপ্তসন্ধান কাব্যে প্রতি শ্লোকার্থের সপ্ত অর্থ সৃষ্টি করেছিলেন। শব্দবিশেষ রাম, কৃষ্ণ, ঋষভ, শান্তিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, মহাবীরের পক্ষে একবার ব্যবহৃত হয়ে প্রযোজ্য ছিল।[১৪]। এ ঐতিহ্য লোকসমাজের বাউলগানে অত্যন্ত সজীব এবং কবিদের শিল্পকৌশলে পরম সমাদৃত। ঠারে কথা বলার রীতি থেকে 'অহিকলস' সঙ্কেতে বর্ণবিন্যাস করা এবং বররুচি ঠার, কদম্বঠার, ফুলঠার প্রভৃতি লৌকিক দ্ব্যর্থবোধক ভাষাভঙ্গী প্রাচীন লোকসমাজ ব্যবহার করতেন।[১৫] অপরাধজগতে ব্যবহৃত হতো গুপ্ত সঙ্কেতভাষা। গুপ্তচরদের বা সংবাদ-বাহকদের সাঙ্কেতিক ভাষা-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে অর্থশাস্ত্রে, কামসূত্রে। এ সমস্ত সাঙ্কেতিক ভাষাভঙ্গীর অনিবার্য প্রভাব চর্যাপদ এবং পরবর্তী বাউলগানে অনুসৃত হয়েছে।

একপদ জাতকে একটি পদের বহু অর্থবাচকতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে[১৬] দ্বাদশ শতকে সন্ধ্যাকর নন্দী সংস্কৃতে রামচরিতম কাব্য রচনা করেছিলেন। এখানে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, দুইশত শ্লোকে দ্ব্যর্থক শব্দ-সমবায়ে তিনি রামচন্দ্র এবং রামপালদেবের

বর্ণনা করেছেন। গৌড়ীয় কবির এই দ্ব্যর্থক ভাষা-ব্যবহার উত্তরকালের কবিদের প্রভাবিত করেছিল। চতুর্দশ শতকে কবি আমীর খসরু 'দোসাখুনা' রচনায় শব্দকে ও বাক্যকে দ্বি-অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইসলামীয় পরিমণ্ডলে এ ধরনের ভাষারীতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন আহাম্মদ শরীফ।[১৭] কৃষ্ণদাস-বিরচিত চৈতন্য চরিতামৃতে একই শ্লোকের বহু অর্থবাচকতার প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে এবং শ্লোকের 'অনুবাদ ও বিধেয়' এ দ্বি-অর্থের ব্যাখ্যা আছে।[১৮] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের আলোচনায় বা ঈশ্বরী পাটনীকে দেবীর আত্মপরিচয়দানে এই দ্ব্যর্থক ভাষারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহেলিকা, শ্লেষাত্মক বা আভিপ্রায়িক রীতি থেকে এই দ্ব্যর্থক ভাষাভঙ্গী পৃথক এক কাব্যভাষা। বৈদিক যুগ থেকে এই ভাষাভঙ্গী সাহিত্যে প্রচলিত আছে। লৌকিক জীবনে ও সাহিত্যে ধাঁধা, ছড়া, হেঁয়ালিতে এবং আচরণমূলক ধর্মীয় সাহিত্যে এ ভাষা খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণ কাব্যভাষা থেকে পৃথক এ ভাষাভঙ্গী চর্যাকারগণ, বাউলকর্তাগণ, ব্যবহার করেছেন। "বাউল গানের মধ্যে দু'টো অর্থ—একটি প্রদত্ত, আর একটি অন্তর্নিহিত।** অন্তর্নিহিত বক্তব্যই তার প্রাণ।"[১৯]

কিন্তু দ্ব্যর্থক, শ্লেষ-নির্ভরতাই লালনের ভাষার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। অলিখিত এক গুপ্ত সাধনার আভাষমাত্র ব্যক্ত হয় এ ভাষায়। সুতরাং একে বুঝতে হবে মূল সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে এবং সাধকের ব্যাখ্যায়। এ ভাষাকে ইঙ্গিতপূর্ণ, ইশারায় বর্ণিত, ইচ্ছাকৃত অসংলগ্নতা-যুক্ত হিসাবে বর্ণনা করে লালন একে সম্পূর্ণ গুরুগম্য বলেছেন। আবার তিনি এর সন্ধি/সন্ধী [(সং—ধা+ই) বা রহস্যভেদ; এক বিষয় বা বস্তুর অন্য বিষয় বা বস্তুর অন্তর্গত হওয়া] বুঝতে বলেছেন। লক্ষ্ণা, ব্যঞ্জনার প্রসঙ্গও উচ্চারণ করেছেন তিনি। তাঁর কাব্যভাষা কেবল দ্বি-অর্থবাচক নয়; এর বহু-অর্থবাচকতার প্রসঙ্গ লালন আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত বাইরের উপাদান দিয়ে নির্মিত অর্থের আবরণে আবৃত সাধনা, আভিপ্রায়িক এবং গুরুগম্য। শব্দের অভিপ্রায় প্রচলিত অর্থনিষ্কাশনে লভ্য নয়; এটি সাধনার কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল এবং পণ্ডিতদের অগম্য।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শান্তি ভিক্ষুশাস্ত্রী আভিপ্রায়িক ভাষা এবং একাধিক অর্থবাচক ভাষার ঐক্য নির্ণয়ান্তে মন্তব্য করেছেন, "The term Sandhya here stands for Abhisandhi, 'implied sense', on simple Sandhi, union, because it points out the meaning intended or it is an union of two meanings ordinary as well as intended one in one word."[২০]

চর্যাপদের মতো লালনের ভাষায় পারিভাষিক শব্দ, শ্লেষবক্রোক্তি, অভিপ্রায়িক শব্দ, সঙ্কেত-প্রহেলিকা, উল্টা বা বিপরীত-ভাষণ, বক্রোক্তি-অতিশয়োক্তি, নিজস্ব অর্থে শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে প্রচলিত অর্থযুক্ত সাধারণ শব্দও গৃহীত হয়েছে। নানা উপাদানে গঠিত এ ধরনের ভাষা নিয়ে Underhill-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "Under a variety of images, by a deliberate exploitation of the musical and suggestive qualities of words, often too, by the help of desperate paradoxes, those unfailing stimulants of mans intuitive power–he tries to tell others some what of veritable country which, 'eye hath not seen'."[২১]

ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে শ্লেষ-যমক-অনুপ্রাসবহুল ভাষা এবং দ্ব্যর্থক কাব্যরীতি বিশেষভাবে আদৃত ছিল। লালন ও অন্য বাউলগানে এর প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

চর্যাপদের ভাষায় সন্ধ্যা, আভিপ্রায়িক এবং দ্ব্যর্থক এ তিন শ্রেণীর শব্দকে পৃথক করা হয়েছে। সন্ধ্যা শব্দ হিসাবে যেগুলি গৃহীত হয়েছে, সেগুলি আসলে বিশেষ এক শ্রেণীর পরিভাষা। কোন কোন সাধকের মতে দেহসাধনার শাস্ত্র, তন্ত্রাদি রহস্যাচ্ছাদিত প্রচ্ছন্ন ভাষায় রচিত। এর নিজস্ব বিশেষার্থবোধক শব্দাবলী আছে (terminology)। এসমস্ত শব্দের যথার্থ অভিধা বা অভিপ্রায় জানা না-থাকলে বিশেষ্যর্থগুলি অজ্ঞাত থেকে যায়। এ শব্দগুলির অন্তর্নিহিত মূলে আছে গুপ্ত এক দেহসাধনা। এর নেই লিখিত বিবরণ; শব্দের নেই লিখিত অভিধান। সাধনাসম্পৃক্ত এ শব্দগুলি কোন্ স্থলে কোন্ অর্থে গ্রহণীয় হবে—তা কেবলমাত্র পূর্বাচার্যের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। যে যা করেননি, অর্থাৎ যে স্তরের সাধনা যার অনধিগম্য, তিনি ইঙ্গিতময় এ ভাষায় মর্মভেদ করতে পারেন না। পাণ্ডিত্য-প্রতিভার ব্যাখ্যায়, এ ঐতিহ্যে কেবলমাত্র বিকৃত, অযথার্থ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[২২]

প্রাণহরি যোগবিশারদ তান্ত্রিক দেহসাধনার ভাষা-আলোচনায় মন্তব্য করেছেন যে বিদ্যাবলে আগমাদির সঙ্কেতিত অর্থ জানা যায় না। "ইয়ং পরম্পরা বিদ্যা গুরুবকত্র বিনির্গতা"—সুতরাং গুরুমুখেই এর সঙ্কেত-সন্ধান লভ্য।[২৩]

শ্লেষে সচেতনভাবে শব্দকে একবার ব্যবহার করে দ্বি-অর্থ বোঝানো হয়। ভঙ্গ-শ্লেষে শব্দ ভেঙে নিষ্কাশন করতে হয় অপর অর্থ—এ ভঙ্গ-শ্লেষ বাউলগানের প্রিয় অলঙ্কার। কিন্তু নানা ভিন্ন শব্দ উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সমরূপ প্রাপ্ত হয় (convergent phonemic change) —এমন শব্দের অভাবিত শ্লেষ সৃষ্টি লালনের ভাষার অন্যতম বিশেষত্ব। প্রহেলিকার ভাষা ভিন্ন। শ্লেষের অর্থ শ্রোতা বা পাঠকের অগোচর থাকে না। কিন্তু প্রহেলিকার বর্ণবিন্যাস ও শব্দবিন্যাসের কৌশল আলাদা—এর অর্থ সাধারণ শ্রোতা-পাঠকের অগোচর। এগুলি আভিপ্রায়িক ভাষা থেকে স্বতন্ত্র কাব্যকৌশল।

মধ্যযুগে বাঙালি কবিরা সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে গ্রন্থ-রচনাকাল নির্দেশ করতেন। ১ = চন্দ্র, ইন্দু, ব্রহ্ম; ২ = পক্ষ; ৩ = নেত্র; ৪ = বেদ; ৫ = বাণ; ৬ = ঋতু, রস; ৭ = সমুদ্র; ৮ = বসু; ৯ = গ্রহ, রস; ১০ = দিক; ১১ = রুদ্র; ১২ = আদিত্য।

ঋতুশূন্য বেদশশী শক পরিমাণ = ৬০৪১, কিন্তু অঙ্কস্য বামাগতিতে হবে ১৪০৬ শকাব্দ।

শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর—

রাম = ৩ (রাম, বলরাম, পরশুরাম), গুণ = ৩, রস = ৬, সুধাকর = ১ = ৩৩৬১, উল্টে ১৬৩৩ শকাব্দ।

এ ছাড়াও শব্দ থেকে সংখ্যা বা সংখ্যা থেকে শব্দ নিষ্কাশনের/অক্ষর-নির্ণয়ের নানা পদ্ধতি আছে। ধাঁধা প্রভৃতিতে অক্ষর, সংখ্যা, শব্দকে কৃত্রিম কৌশলে বিন্যস্ত করে প্রতিপক্ষের বুদ্ধির সামর্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কবিগানে, কীর্তনে শৃঙ্গারাত্মক বিষয়কে আবৃত করার জন্য এ রীতিটি ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

বিরাট তনয় দেহ দান

বায়স অজ রবে তনু মন জর জর
কিতা ভেল পাপ পরান।।
বক্ত্র যার তিন দুনো তাহার বাহন জেনো
তার ভক্ষের ভক্ষ নিজ সুতে
বান দুন শির যার পুরী নষ্ট কৈল তার
সেও ভেল পাপ এস্ত চিতে।।
(ঋষি) মুনি তিনগুণ করি বেদে মিশাইয়া পুরী
দেখ সখী একত্র করিয়া
আমি অভাগিনী নারী যন্ত্রণা সহিতে নারি
গ্রাসিব যে বাণ তেয়াগিয়া।।[২৫]

১ম চরণে— বিরাট তনয় = উত্তর; দেহদান = দাও।

২য় চরণে— বায়সের (কাক) ডাক 'কা'; অজের (ছাগল) ডাক 'মে'; এ দু'অক্ষরযোগে = কামে তনুমন জরজর।

৪র্থ চরণে— বক্ত্র ৩ × ২ = ৬ = কার্তিক, তাঁর বাহন = ময়ূর।

৫ম লাইন— ময়ূরের ভক্ষ্য সাপ; সাপের ভক্ষ্য বায়ু বা পবন—তার পুত্র (সুত) হনুমান।

৬ষ্ঠ লাইন— বাণ ৫×২ = ১০, মাথা—(হনুমান দ্বারা) রাবণের পুরী দহনের মতো চিত্ত জ্বলছে।

৮ম লাইন— ঋষি/মুনি = ৭×৩ = ২১; বেদ = ৪; ২১ + ৪ = ২৫; ১১দশ লাইনের (এ থেকে) বাণ = ৫, ত্যাগ বা বাদ দিলে থাকে ২৫–৫ = ২০ = বিশ (বিষ)—আমি বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করব।

এখানে ঘুরিয়ে পাই = উত্তর শব্দটি;

বহু বক্র-জটিলতার অন্তে পাই দশাননের লঙ্কাদহন প্রতীকটি, দুটি শব্দাংশ দিয়ে গঠিত হয়, কামে শব্দটি।

শব্দ থেকে সংখ্যা, যোগ এবং বিয়োগ করে পাই 'বিষ' শব্দ। সংখ্যা থেকে বস্তু, বস্তু থেকে সংখ্যা; অক্ষরাংশ দিয়ে নতুন শব্দ নির্মাণ এ সমস্ত কৃত্রিম কৌশল প্রহেলিকা-ভাষার বৈশিষ্ট্য। সাপের ভক্ষ্য ব্যাঙ্— এ তথ্য ভাবলে আর অর্থ বোধ হবে না। এ সমস্ত লৌকিক কূটকৌশল স্থানবিশেষে বাউল-পদকর্তা ব্যবহার করেন।

বাংলায় কর্তাভজাগণ তাঁদের 'আইন' গানে এই প্রহেলিকা-ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁরা এর নামকরণ করেছেন, 'ট্যাকশালী বোল'। রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে দুলালচাঁদ এ ভাষার উদ্ভাবক এবং সমকালীন ভাষারীতি বর্হির্ভূত এ ভাষা।[২৬]

মনুলাল মিশ্র একে ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেছেন, 'ইহা বাজারের জন্য নহে অথবা দাইকের জন্য নয়; কেবল কাঙ্গালদের জন্য* * কাঙ্গাল, যাহারা দেল ফকিরী করণী করিবেক; শুদ্ধ তাহাদিগের জন্য এই বিধান, ইহা শ্রীমুখের আজ্ঞা।''[২৭] চর্যাপদ, কলমীপুঁথি, বাউল গানের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও লালশশী-রচিত পদাবলী কর্তৃত্বের ব্যাখ্যা ছাড়া সাধারণের অগম্য। এ ভাষাটি প্রহেলিকাত্মক। সহজতত্ত্ব প্রকাশে সাধকের

পালনীয় ৭৯টি নির্দেশ আছে। যেমন 'শব্দরুরু (গুরু!) শব্দ চেলা শব্দে শব্দে হয় উজ্জলা, যে স্থানে শব্দের বাস, আপি কর্তা আপি দাস' অথবা প্র. মহাশয়ের লক্ষণ কি?

উ. ম— মরা, হা— হাবা, স— সহ্য, অ— অবলা,— এই চারিভাব যুক্ত যে ব্যক্তি, তিনিই মহাশয় পদবাচ্য হন।"[২৮] শব্দাংশ দিয়ে শব্দ গঠিত হয়েছে এখানে।

এ ভাষার বাহ্য অর্থ হয় না; এবং এগুলি শেষ বিচারে কাব্যত্ব লাভ করেনি। মুদ্রিত গ্রন্থ, শুক্রবারে আবশ্যিক গানের আসর, মার্গ-বৈঠকী গানের সুরারোপ এবং বহু অনুগামী থাকা সত্ত্বেও কর্তাভজাদের গান সম্প্রদায়ের বাইরে আদৃত হয়নি। উল্টাবংশী, শ্লেষাত্মক, আভিপ্রায়িক ভাষাভঙ্গী থেকে প্রহেলিকার ভাষা স্বতন্ত্র। লালন কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নাত্মক প্রহেলিকাভঙ্গী ব্যবহার করেছেন কিন্তু তার ভাষার বাহ্য অর্থ গ্রহণের দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

বাউল গানের মধ্য দিয়ে বাউল মতবাদ প্রচারিত হয়। মূলতত্ত্বকে ঈষৎ অনাবৃত করে, সামাজিকদের আকর্ষণ জাগিয়ে পদকর্তা বিষয়কে আবৃত করেন। কিন্তু শ্রোতার মনোমতো অর্থ গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত রাখেন পদকর্তা।

আপন ভাষার গোপন কথা নিবন্ধে পবিত্র সরকার গুপ্ত ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। প্রথমত ধ্বনির সংযোগ, বিয়োগ বা রূপান্তর ঘটিয়ে শব্দ-ধ্বনিকে এ ভাষায় ভিন্নতা দান করা হয়। দ্বিতীয়ত, ভিন্ন অর্থে, প্রসারিত অর্থে শব্দ-ব্যবহার এবং নতুন শব্দ সৃষ্টি করে এ ভাষাগোষ্ঠী। আলোচনায় প্রথমটি আমাদের পক্ষে তাৎপর্যহীন; দ্বিতীয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

আর. আর. মেরহোত্রা গয়া, কাশীর পান্ডা এবং কাশীর দালালদের গুপ্ত ভাষার বৈশিষ্ট্যে দেখেছেন যে প্রচলিত শব্দের ঈষৎ বিপর্যয় ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে নতুন দু'একটি শব্দ গুঁজে দিয়ে চমৎকার ভাষাগত অন্তরাল তৈরি করা যায়।[২৯]

বাউল গান এবং লালনের ভাষায় প্রচলিত শব্দ, বাক্‌রীতি, অন্বয় মেনে; শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়ে, দু'একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করে নিপুণ এক প্রাচীরের অন্তরাল রচিত হয়েছে অনায়াসে।

এখানে প্রাচীন অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হয়; বহু অর্থ থেকে তুলনায় অচলিত অর্থ নিষ্কাশন করা হয়; অক্ষর প্রতীক ধরে অর্থ আরোপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ জনৈক সাধকের খাতা থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিষ্কাশন পদ্ধতির কথা বলা চলে।

ক্ষীর = ক্‌ + ষ + ঈ + র্‌

ক শব্দে জল, জল শব্দে জীবন, অর্থে জীবনীশক্তি, যা দ্বারা জীবনরক্ষা হয়, কৃষ্ণবীজ + ষ মস্তকোৎপন্ন স (যিনি) (মূর্দ্ধনি বসতে য ঃ স ঃ) অকারান্ত রাধা বর্জিত।। ক + ষ উভ-শক্তিযুক্ত যে রতি তাহাই ক্ষ; ঈ = সম্বন্ধজ্ঞাপক; উহাতে ক্ষ-তে সম্বন্ধ হইলে যে -র- বা রতি হয় তাহাই ক্ষীর। এ শব্দটির কাল্পনিক অর্থ উপেন্দ্রনাথ ও অনেকে দিয়েছেন তাতে কোন স্পষ্টতা নেই।

এর ভিন্নার্থ; কৃষ্ণসেবার্থে যে ব্রহ্মশক্তি ভক্ত প্রেরণ করে তাহাই ক্ষীর।

নন্দন— নন্দ আনন্দিত করা, পুত্র ভেক বিষ্ণু।

যে আনন্দিত করে, যে নন্দকে -ন- অর্থে ধ্বংস করে।

হর— বহনকারক, হরণকারী।

কুসুম— (কুম—দীপ্তি পাওয়া) ফুল, চক্ষুরোগ, নারীর রজঃ। কুসুমিত—রজস্বলা নারী।

ডোর— কণ্ঠের লাল মঙ্গলসূত্র; গলায় বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ কুণ্ঠা বা দ্বিধারহিত অবস্থায়। এ সমস্ত পদ্ধতি ব্যাকরণসম্মত ঢঙে চালিত হয়েছে।

চর্যাপদের সন্ধ্যা/সন্ধা শব্দের নিহিতার্থগুলি নিয়ে এক শ্রেণীর অভিধান তিব্বতী ভাষায় রচিত হয়েছিল।[৩০] এখানে শব্দের আভিপ্রায়িক অর্থগুলি স্ব-কপোলকল্পিত নয়। ঐতিহ্যানুসারী অর্থ নিষ্কাশনের গুরুমুখী পদ্ধতিতে বৈয়াকরণিক পদ্ধতি এখানে গৃহীত হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রাদি বা সাহিত্যিক ছড়া ইত্যাদিতে শব্দকে অনেকে অর্থহীন মনে করেন। কিন্তু আধুনিক সমাজসচেতন গবেষক, ছড়ার মধ্যে অসংলগ্নতার অন্তরালে প্রোথিত সামাজিক তথ্য উদ্ধার করেন। বৈদিক নিরুক্তকারগণ বেদের শব্দ, মন্ত্রকে সার্থক মনে করতেন। তবে বৈদিক শব্দ বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে পরোক্ষ অর্থ প্রকাশ করে। পরোক্ষপ্রিয়তা বা বক্র-রম্যতার জন্য শব্দার্থ ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে অতিক্রম করে যায়। সেক্ষেত্রে শব্দের অন্তর্লীন ক্রিয়া বিচার করে বা অন্য কোন ক্রিয়ার স্বর/ব্যঞ্জন বা অর্থসাম্য ধরে শব্দের অর্থ নিরূপণ করা হতো। চর্যাপদের সন্ধা শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ এই প্রাচীন নৈরুক্ত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন।

(১) ব্যুৎপত্তির সঙ্গে যুক্ত কিন্তু আভিধানিক অর্থ নয়

—দুলি, বহুড়ী, হরিণী প্রভৃতি শব্দ ব্যাখ্যাত হয়েছে এ রীতিতে।

(২) গূঢ়ার্থ লক্ষণা শব্দ শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাত অর্থ—

নই, ডোম্বী, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি।

(৩) রুঢ়ি লক্ষণায় সিদ্ধ; হরি হর ব্রহ্মা, পুলিন্দা প্রভৃতি।[৩১]

সাহিত্য দর্পণে অভিধা, লক্ষণা, তাৎপর্য এবং ব্যঞ্জনারূপ অর্থ শক্তির কথা আলোচিত হয়েছে (৫ম পরিচ্ছেদ, ১— ১০ শ্লোক)[৩২]। নৈয়ায়িক টীকাকার এবং বৈয়াকরণগণ বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের এ সমস্ত অর্থের অতিরিক্ত আভিপ্রায়িক অর্থ নিষ্কাশন করতেন। চৈতন্য চরিতামৃতে বাসুদের সার্বভৌম একটি শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করেন। চৈতন্যদেব এর অতিরিক্ত আরো ১৮টি অর্থান্তর বিশ্লেষণ করেন। সনাতনকে তিনি একটি শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করে শোনান। আত্মারাম শব্দটির তিনি ৫৮টি অর্থ দেন। তাঁর মতে ভাগবতাদি গ্রন্থের 'প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ হয়।' সাহিত্যদর্পণকার কথিত অর্থের অতিরিক্ত মুখ্য, গৌণ, গর্হা, বিতন্ডা, ছল, নিগ্রহ পদ্ধতিতেও শব্দ থেকে নানা ধরনের অর্থ নিষ্কাশন করা হতো।[৩৩] শঙ্করের বেদান্তভাষ্য ও বাসুদেবের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে চৈতন্যদেবের অভিযোগ ছিল এই যে তাঁরা মুখ্যার্থ ছেড়ে কাল্পনিক গৌণার্থে; অভিধা বৃত্তি ছেড়ে লক্ষণার আশ্রয়ে স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে বেদান্তকে আচ্ছন্ন করেছেন। ব্যাসের বেদান্তসূত্র থেকে এটি ভিন্ন। আর চৈতন্যদেবের গুরুমুখী ব্যাখ্যাও স্বতন্ত্র।[৩৪] এ থেকে ব্যক্তিবিশেষে অর্থবোধ ও অর্থগ্রহণের ভিন্নতা থেকে গুরু-পরম্পরায় সাম্প্রদায়িক টীকার জন্মসূত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। বৌদ্ধ সহজযানে বা বজ্রযানে শব্দার্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়। বৌদ্ধ-তন্ত্রগ্রন্থে এবং আচার্যদের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা বিষয়ে গুরুতর

মতভেদ ছিল। মর্মকালিক তন্ত্র ও হেবজ্রপঞ্জিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখানে ভগ (bhaga) শব্দের নানা ব্যাখ্যা আছে। আলি (Ali) ও চান্দা (canda) শব্দেরও ৫ প্রকার ব্যাখ্যা পাই।[৩৫] পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে কোন বিষয়ের অর্থ নিষ্কাশনের তিনটি পদ্ধতি আমরা লক্ষ করি; (ক) পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা, (খ) তার্কিক ও লৌকিক রীতি, (গ) আভিপ্রায়িক পদ্ধতি। এই 'অভিপ্রায়' ব্যাখ্যার ঐতিহ্য গুরু-পরম্পরায় বাহিত হয়। সন্ধা, সঙ্কেত শব্দ ছাড়াও শব্দের অভিপ্রায় থাকে সাধারণ শব্দেও। মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত এ পদ্ধতিতে সম্প্রদায়বিশেষে সর্বজনস্বীকৃত গুপ্ত ব্যাখ্যা থাকে—তা গুরুর কাছ থেকে পরম্পরাগত ঐতিহ্যে গ্রহণ করতে হয়। মূলত একটি বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এগুলি উদ্ভট হলেও প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু সম্প্রদায়ভেদে, সাধনভঙ্গীর পার্থক্য হেতু অর্থনির্ণয়ে মতান্তর ঘটে। বাউল-বৈষ্ণব-সাধুদের মধ্যে (যারা যুগলসাধনা করেন ও চন্দ্রভেদ করেন) দেহকেন্দ্রিক ইহবাদী সাধনার ভিত্তিতে নির্ণীত শব্দার্থগুলি স্থানবিশেষে উদ্ভট হলে সর্বজনস্বীকৃত। মুসলমান বাউল-ফকিরদের মধ্যে কোরাণ, হাদীসের গুপ্ত ব্যাখ্যায় সাধারণ ঐক্য আছে। শব্দবিশেষের আভিপ্রায়িক অর্থনির্ণয়ে অধিকাংশ সাধক ঐক্যমত পোষণ করেন। যেমন বিসমিল্লা কথাটির লোকনিরুক্তিগত অর্থ নিষ্কাশন হচ্ছে; "বীজ বা শুক্রতে (মে) আল্লা আছেন।" কিন্তু বহু ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা যেমন ব্যক্তিগত এবং মতভেদযুক্ত; তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অর্থ নিষ্কাশনের ভিন্নতা থাকে। এমনকি একই সম্প্রদায়ে ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি ও সাধনার স্তর অনুযায়ী শব্দার্থ ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। দু'জন সাধকের 'করা' সাধনার আলোচনা মিলে যায়। কিন্তু 'শোনা' বা চিন্তা, অনুভবের ক্ষেত্রে থাকে ফারাক, মতভেদ। পরম্পরা ও ব্যক্তির মধ্যে নিরন্তর এই ঐক্য ও মতভেদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। আভিপ্রায়িক শব্দ-নিষ্কাশন পদ্ধতিতে এর ছায়া আছে। এ ধরনের অর্থের অস্থিরতা 'আলো-আঁধারি' বিশেষণটিকে স্মরণে আনে। আভিপ্রায়িক ভাষা সাধন-সংক্রান্ত গুপ্ত অর্থজ্ঞাপক। এই সাধনা অলিখিত, গুপ্ত— তাই সাধনার বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে এ সমস্ত গানের অর্থভেদ জানতে হয়। তাঁরা সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেই এর অর্থ ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতের ব্যাখ্যা থেকে সাধুর ব্যাখ্যা ভিন্ন। সাধুর হাটে পণ্ডিতের ব্যাখ্যা অচল। কিন্তু সাধুদের ব্যাখ্যায়ও থাকে নানা ভিন্নতা। প্রাচীন তন্ত্রাদিতে সন্ধা শব্দ এবং সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। চর্যাপদে এরই সঙ্গে রূপক, উপমা, শ্লেষ-বক্রোক্তি এবং দৈনন্দিন জীবনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র সন্ধ্যা শব্দ বা সন্ধা ভাষা দ্বারা রচিত নয় চর্যাপদ। ফলত চর্যাপদের আভ্যন্তরীণ বক্তব্য তুলনায় প্রকটতর। বাউল গানে গুপ্ত দেহসাধনা ও মূল্যবোধ চর্যাপদের তুলনায় স্পষ্টতর।

বাউল গানে অর্থ বিশেষ শব্দনির্ভর এবং অভিপ্রায়ে সে ভিন্নার্থক। অলিখিত এক গুপ্ত সাধনার আভাসমাত্র এখানে ব্যক্ত হয়। সুতরাং একে বুঝতে হলে মূল সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে এবং সাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির ব্যাখ্যায় এ ভাষাকে বুঝতে হবে। এ ভাষা কেবল দ্বি-অর্থবাচক নয়; এর বহু অর্থ হতে পারে; কিন্তু সাম্প্রদায়িক সাধন-সংক্রান্ত অর্থ গুরুগম্য।

ড. সুকুমার সেন মনে করেন যে নটচর্যার গান চর্যাপদের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাউল

মারফতী গানে নতুন রূপ পেয়েছে। এ গান সামাজিকদের প্রসন্ন করে ভিক্ষার প্রয়োজনে রচিত : "এই গান যাঁরা নিজের প্রয়োজনে তৈরি করেছিলেন তাঁরা তা দু'কাজে ব্যবহার করতেন। এক কাজ হল তাঁদের অধ্যাত্ম এষণা; আর এক কাজ হল তাঁদের ভিক্ষা অর্জন। গানে দুটি পৃথক অর্থ থাকত। এক অর্থ তাঁদের শাস্ত্রগত, অপর অর্থ জনসাধারণের মনোমত।"[৩৬] বাউল গানের বাহ্য অর্থ একটি মাত্র নয়। এ গানের ভাষায় অনাবৃতকে আবৃত করে, স্পষ্ট সহজকে রহস্যময় করে, নিকটকে দূর, পরিচিতকে জটিল করে তোলার শিল্পপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সার্থক বাউল গান অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত রচনা। এ গানের ইশারা, ইঙ্গিত, বক্রোক্তি, সঙ্কেতগুলির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। এর নানাধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রত্যেকে নিজের বোধের স্তর ও উপলব্ধি অনুযায়ী এ গানকে গ্রহণ করেন। অর্থের অস্থিরতা ও অনির্দিষ্টতা বাউল গানের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের ও সাধারণ মানুষের আকর্ষণের অন্যতম কারণ।[৩৭]

বাউলদের মনের মানুষকে ক্ষিতিমোহন, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ এ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করে মন্তব্য করেছেন; "বাউলের মনের মানুষ মানুষ নয় *** মরজগতের মানুষ নয়; একটা আধ্যাত্মিক ভাবলোকের ধোঁয়াটে অতিমানুষ।"[৩৮] বুদ্ধিমান বাউল সাধক সাধনাকে আবৃত করে; গায়ক জিজ্ঞাসুর মনোমতো উত্তর দিয়ে তাকে প্রসন্ন করে। এ দু'ধরনের মানুষই সামাজিকদের কাছে সাধ্যবস্তু গোপন করে ব্যাখ্যা দেয়। এ সমাজ কোন ব্যাখ্যারই প্রতিবাদ করে না। ভারতীর সম্পাদিকা গগন ও লালনকে নিরাকার ব্রহ্মবাদী বলে মনে করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মনে করতেন যে মূর্তিপূজা না করে এরা জীবন্ত মানুষের পূজা করে। হিপি আন্দোলনের অনেকে বাউলদের তাদের সমধর্মী মনে করতেন। হাল আমলে প্রখ্যাত একজন জার্মান গবেষক ও অনুবাদক বাউল ভক্তিগানের সঙ্গে চার্চের গান অভিন্নতা বোধ করে দু'জন বাউল গায়ককে জার্মানীতে নিয়ে গিয়ে চার্চে গান করার সুযোগ করে দেন।[৩৯] আধুনিক বাউলদের মধ্যে নানা স্তরের মানুষ আছে। অসাধক, বেশধারী, নেশাখোর, ভিক্ষুক, গায়কগণ; ব্যবসাদার, সংসার, রেডিও-বাউলগণ আপন উপলব্ধি অনুযায়ী যেভাবে গানকে গ্রহণ করেন ও ব্যাখ্যা দেন তার মধ্যে নানা পার্থক্য দৃষ্ট হয়।[৪০] গানের নিহিতার্থ বাউলপন্থদের কাছে সর্বদা একার্থে গৃহীত হয় না।

বাউল গানে দেশ, কাল, পাত্রের বিচার গুরুত্বপূর্ণ।[৪১] সমগ্র সাধনপদ্ধতি ৪টি স্তরে (স্থূল, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ) এবং প্রতিটি স্তর আবার চারটি করে উপবিভাগে বিভক্ত (স্থূলের স্থূল, স্থূলের প্রবর্ত্ত, স্থূলের সাধক, স্থূলের সিদ্ধ)। আবার আমিতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব), পরতত্ত্ব (নারীতত্ত্ব) এবং গুরুতত্ত্ব (মূলবস্তু—রজঃবীজতত্ত্ব) অনুযায়ী বিভাগ হয় বিষয়বস্তুর। বাহ্যিক দেহতত্ত্ব, সূক্ষ্ম রস-রতিতত্ত্ব এবং ভাবের প্রেমতত্ত্বের পর্যায়গত ভিন্নতা আছে বাউলগানে। বিষয়বস্তু এবং সাধনার পর্যায় অনুযায়ী শব্দের ও বাক্যের অভিপ্রায় নির্ণয় করেন সাধক। ফলত এই বিভাগগুলি বিভিন্ন স্তরে একই শব্দ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। দেশ কাল পাত্র এবং বিষয় ও প্রসঙ্গের সূত্র ধরে বাউল গানের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ের অর্থ নিষ্কাশন করা হয় সাধকদের মধ্যে। সম্প্রদায়ের নিজস্ব অর্থনিষ্কাশনেও

ব্যক্তির সাধনার স্তর, বিদ্যা, বুদ্ধি ও অনুভবক্ষমতার পার্থক্যহেতু মতভেদের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই মতভেদযুক্ত ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাগুলিকে বহু সাধক গুরুর দোহাই দিয়ে চালান। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাও সমর্থিত হয় গুরু-পরম্পরার অজুহাত দিয়ে। আর এতে গুরুতর কোন ক্ষতি হয় না সাধনপন্থার। কারণ বাউল গান থেকে কেউ সাধনা করেন না। এ গানে সাধনার আভাস আছে; আছে মতবাদের প্রচার। সুতরাং এ গান সাধ্য নয়; আস্বাদ্য। ভক্তি-আন্দোলনের মতবাদগুলি গানের মাধ্যমে প্রচারিত হতো। বাউল গান সে দৃষ্টান্তের অন্যতম প্রমাণ। সাধারণ মানুষ, বিজাতীয় ও স্বজাতীয় সাধক, সদ্যোদীক্ষিত সাধনার্থীর জন্য বাউল গান রচিত হয়। গানে জ্ঞান থাকে বটে;[৪২] কিন্তু সাধুসঙ্গ সাধনার জন্য অধিকতর মূল্যবান। বহিরাগতদের বাউল গান আকৃষ্ট করে; সামান্য সাধকদের অভিনিবেশ দাবি করে; আর সন্ধিচ্ছেদ-কৌশলী সাধক এ গানে খুঁজে পায় সাধনতত্ত্বের আভাস। বাউল গানের একদিকে আছে সাধনা ও মূল্যবোধ আবৃত করার ভঙ্গী—এগুলিকে ঈষৎ অনাবৃত করে আবৃত করা হয়। এ ভঙ্গীটিকে বলা যায় 'লিখিয়া ঢাকিল'। সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য রজঃসাধনা ও রজঃবীজের মিলনপদ্ধতির স্পষ্ট ও অনাবৃত বর্ণনা আছে মুকুন্দ দাসের সহজমঞ্জরী, সিদ্ধ চম্পককলিকা, নামবস্তু সার, মহাগুর গ্রন্থে; নরোত্তমের স্বরূপকল্পতরু; বংশীবদনের ভাষ রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে।[৪৩] সঙ্কেত ও গুহ্য ভাষণকে ব্যাখ্যা করে এগুলিতে অনাবৃত করা হয়েছে। এর সঙ্গে পূর্ণিমা-অমাবস্যার প্রতীক বা 'মানসের করণ সে কিরে সাধারণ' গানটির ভাষাভঙ্গীর তুলনায় দেখা যাবে যে কুটিল আভিপ্রায়িক ভাষায় লালন এ গানে রজঃবীজের বিশেষ যোগে যোগসাধনা সামান্য আভাসিত করেই আবৃত করছেন। এ ভাষায় সন্ধা, সঙ্কেত, আভিপ্রায়িক শব্দ তুলনায় কম। লালনের গানে অন্তর্নিহিত সাধনতত্ত্ব বক্র রম্যতায় আচ্ছাদিত। যে সমস্ত বাউল গান গুপ্ত সাধন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রচিত, তার সঙ্গে সামাজিক বিচার বিতর্কের গানের ভাষার পার্থক্য আছে। জাতিভেদ, মূর্তিপূজা, আচার-জপতপ, অনুমান, শাস্ত্রবিরোধিতা, মানুষ ও নারীর মহত্ত্বপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত গানের ভাষায় কুটিল অভিপ্রায় কম। এগুলি স্বচ্ছ; সর্বজনবোধ্য ভাষায় রচিত। এ ধরনের গানে সন্ধা ভাষা/আভিপ্রায়িক পদ্ধতি প্রায় অনুসৃত হয়নি। সাধন-সংক্রান্ত গানে পরোক্ষ সঙ্কেত, অভিপ্রায় প্রবল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাপদকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা/আভিপ্রায়িক ভাষার আলোচনা শুরু হয়েছিল। শশিভূষণের সংগৃহীত নবচর্যাপদে এবং আধুনিক নেপালে বজ্রাচার্যদের ঐতিহ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবন্তভাবে বয়ে চলেছে। বাংলার বাউল গানে এ সাধনা ও ভাষারীতির উত্তরাধিকার বর্তেছে। কিন্তু চর্যাপদের এবং আধুনিক বাউল গানের মাঝখানে এই বিশিষ্ট সাধনা ও সাহিত্য লুপ্ত ছিল না। বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্য চরিতামৃতে এবং বৈষ্ণব তান্ত্রিক গ্রন্থাদিতে এই ঐতিহ্য রক্ষিত হয়েছিল। কড়চা/সহজিয়া/কলমী পুঁথির এক বিশাল ভাণ্ডার শিক্ষিতজনের অগোচরে, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় হস্তলিখিত অনুলিপির মাধ্যমে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কিছু অংশ

সংগৃহীত হয়েছে। এগুলির কয়েকটি, সংস্কৃতায়িত রূপে বটতলা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। এ পুঁথির নানা পাঠান্তর এবং বড় অংশটি শিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নাগালের বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এ ধরনের পুঁথিগুলি টীকা, টিপ্পনি, ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে লিখিত। সহজসাধনা, রসসাধনা, চারচন্দ্রভেদ, যুগলসাধনার তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি বৈষ্ণবীয় পরিবেশে এখানে বর্ণিত হয়েছে। চর্যাপদের মুনিদত্তের টীকার চাইতেও এগুলিতে প্রাঞ্জলতর ভঙ্গীতে সাধনাকে অনাবৃত করা হয়েছে। মনীন্দ্রমোহন বসু এবং সাম্প্রতিক কালে পরিতোষ দাশ সংস্কৃতায়িত কয়েকটি পুঁথি নিয়ে কাজ করেছেন। লৌকিক দেহসাধনা ও মূল্যবোধের প্রতি বিরাগহেতু শিষ্ট গবেষকগণ এ ধরনের পুঁথিকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির নানা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এগুলিতে নিহিত আছে। এই পুঁথিগুলিতে বর্ণিত তত্ত্ব, সাধ্য এবং ভাষাভঙ্গী বাউল গানে সংক্ষেপে ও সঙ্কেতে ব্যক্ত হয় সময়ে-সময়ে। বাউল গানের অনেক পারিভাষিক শব্দ, আভিপ্রায়িক ব্যাখ্যার রীতি এ পুঁথির ঐতিহ্য থেকে আগত বলে মনে হয়। কোন কোন পুঁথি বাউল গানের পর্যায়বিশেষের টীকা হিসাবেও গৃহীত হতে পারে। সঙ্কেতভাষা ব্যবহারের কারণ, এবং সাধ্য বস্তুকে বিশেষ ভাষারীতিতে প্রকাশের পুঁথির ঐতিহ্য লালন ও অন্যান্য বাউল সাধকের পূর্বতন ঐতিহ্য হিসাবে অবশ্যই বর্ণনীয়। এগুলির আলোকে, লালনের ভাষাগত রূপরীতি বুঝতে সুবিধা হবে।

সাধ্য সাধনতত্ত্ব : পূর্ব কবিশ্বরগণ স্পষ্ট না লিখিল।
সহজবস্তু ঠারে মাত্র প্রকাশ করিল।।

* * *

লোকভয়ে বেদভয়ে স্পষ্ট নাহি কহে।

[ভাষ রত্নাবলী, অমৃত রত্নাবলী (মুকুন্দ দাস)-এর টীকা, রচয়িতা বংশীবদন।] তাই রচয়িতা ব্যাখ্যা করলেন সাধনাটি সহজ-সাধনার্থীর জন্য। কিন্তু সমাজের কাছে এ পুঁথি গুপ্ত —এর চল যোগ্য সাধকদের মধ্যে। প্রায় সমস্ত পুঁথিকার অসাধকদের হাত থেকে এগুলি রক্ষা করার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন; দোহাই দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণের/চৈতন্যের।

গোপনে রাখিবা গ্রন্থ শুনে ভক্তগণ।
সহজরূপের ধর্ম সর্বদা গোপন।।

* * *

রাগের কথা বৈদিক ভক্ত নাহি লয়

* * *

কেবল নিতান্ত ইহা রসিকের ধন।
মায়ের জারবৎ রাখিবে গোপন।।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে অন্যে না দেখাবে
সর্বদা গোপন গ্রন্থ শুন ভক্ত ভাই
ব্যক্ত যদি কর গ্রন্থ রাধা কৃষ্ণের দোহাই।।

(পূর্বোক্ত)

ব্রজরসকল্প গ্রন্থে নৃসিংহানন্দ (মুকুন্দের শিষ্য), কৃষ্ণদাস কবিরাজের এ তত্ত্বকে স্পষ্ট না করার কারণ : 'জীবের ভয়ে গোঁসাই লিখিয়া ঢাকিল', তিনি তত্ত্ব অনাবৃত করলেন; যোগ্য জনকে নির্দেশ দিলেন তত্ত্ব জানাতে 'তোমা হৈতে পাবে তত্ত্ব যার অধিকার।' কিন্তু অযোগ্যজনের সম্মুখে, 'তত্ত্ব নাহি ব্যক্ত কর রাখ সাবধানে।'

আদ্যসার রসসংগ্রহে মুকুন্দ দাস উপহাসের ভয়ে, সহজ তত্ত্ব মর্মে রেখে ইঙ্গিতে তাকে বর্ণনা করতে বলেছেন। সহজ সংগ্রহ গ্রন্থে কৃষ্ণদাসের মন্তব্য "বিজাতীয় শুনিলে হৈবে উপহাস।" নৃলোকসার চিন্তামণিতে চৈতন্য চরিতামৃতের অব্যাখ্যাত তত্ত্ব-ব্যাখ্যান্তে কৃষ্ণদাসের বক্তব্য : "জীব বৈরাগী বৈষ্ণব বৈধী ইহা না লৈবে। থাকুক লইবার কাজ নিন্দা আচরিবে।" সুতরাং

"সাবধান হৈয়া ইহা করিবে গোপন।।
জীব হইয়া শুনিলে হৈবে সর্বনাশ।
বাউলের ধর্ম এই লোকে উপহাস।।[৪৪]
(১ম প্রকরণ)

এ গ্রন্থে নিজদেহে যুগলমূর্তি দেখিয়ে মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলেছেন :

অন্তরে রাখিবা কারে না কর প্রকাশ।
আমার বাউল চেষ্টা লোকে উপহাস।। (১ম পরিচ্ছেদ চৈ. চ.)

রক্ষণশীল বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বৈদিক বিধিমান্যকারী, শাস্ত্রানুসারী সামাজিক মানুষ আলোচ্য মতবাদ ও সাধনাকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করে এবং অগ্রাহ্য করে। বেদবিহিত ধর্মের সঙ্গে এ মতবাদের প্রবল দ্বন্দ্ব আছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ 'লোকভয়ে' এ সাধনা গুপ্ত, আবৃত। বাউল-ফকিরগণও নিজের সাধনকথা যথাতথা বলে না সমাজের ভয়ে।

সামাজিক নিগ্রহের ভয়ে এ মতবাদের পুঁথিগুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে। এ ধরনের সাধকগণ গুপ্ত সমিতি গঠন করেন এবং তার যোগ্য সদস্যগণ এসমস্ত পুঁথি ব্যবহার করার অধিকারী। আদ্যসারসংগ্রহে, মৃত্যুকালে গুরুর যোগ্য শিষ্যকে গ্রন্থদানের প্রসঙ্গ আছে। যোগ্য শিষ্য গ্রন্থের অনুলিপি পাবার অধিকারী। এইভাবেই গ্রন্থগুলি সাধকবর্গের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। পূর্বাচার্যদের রচনার ব্যাখ্যা এবং সহজতত্ত্ব ("ভাঙ্গিতে") বিবৃত করার উদ্দেশ্যে এসমস্ত পুঁথি রচিত হলেও; এগুলি স্থানবিশেষে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে এবং এ ব্যাখ্যা গুরুগম্য। এ গুলির অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় গুরু-পরম্পরায় লভ্য।

বৃহৎ নিগম গ্রন্থে ত্রিলোচনদাস, 'যঃ কৌমার হর" মাধবেন্দ্রপুরীর উচ্চারিত এবং চৈতন্য-ব্যবহৃত এ শ্লোকের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেছেন। তথ্যসূত্র : চৈতন্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদর এ ব্যাখ্যা পেয়েছেন মহাপ্রভুর কাছে; তিনি এ অভিপ্রায় জানালেন রূপকে—তিনি গ্রন্থে অভিপ্রায় গোপন করে বাহ্য অর্থ/অনুবাদ প্রকাশ করলেন; কিন্তু রঘুনাথ দাসকে "অন্তস্ফুট তত্ত্বকথা তেঁহ শুনাইল।" রঘুনাথ এ গুপ্তভজন জানালেন কৃষ্ণদাস কবিরাজকে; তিনি চরিতামৃতে :

"বস্তু লুকাইয়া ভাষায় করিল প্রকাশ।

বস্তু না লিখিয়া মাত্র লিখিলা আভাস।।"

এই হচ্ছে কবিরাজ গোস্বামী স্টাইল বা ভাবপ্রকাশের রীতি। এ রীতিকে মান্য করেছেন বাউল পদকর্তাগণ। মূল সাধনা গ্রন্থে/পদে বর্ণিত হয় না। সাধুগুরুর কাছ থেকে যোগ্যজন এ সাধনা জ্ঞাত হন। সিদ্ধি কড়চায় নরোত্তম এসমস্ত গ্রন্থ পাঠ করতে বলেছেন; কিন্তু সাধ্যতত্ত্ব নেই গ্রন্থে :—

অতি গুপ্ত কথা ভাই আছে ভক্তকণ্ঠে।
তাহা নাহি লিখে শাস্ত্র পুরাণাদি গ্রন্থে।।
সেই কথা অনুরোধে রসিক বলয়।।

তাই শিষ্যকে 'স্বজাতীয় সাধুসঙ্গ' করতে বলা হয়েছে। সাধুদের মধ্যেও এ সাধনার বিরোধী অনেক। এই সমাজ-বিরোধিতার জন্য এ সমস্ত পুঁথির ভাষাভঙ্গীর গোপনীয়তা সৃষ্ট হয়েছে। আর নিঃশেষে এ মতবাদটি লিখিত না হবার কারণ সমাজপীড়নের ভয়। তৃতীয়ত, গ্রন্থাদিতে এ মতবাদের বাহ্যিক 'অনুবাদ'রূপ পাওয়া যায়—মূল সাধনা মানুষের মুখবাহিত হয়ে বয়ে চলেছে। মুসলমান ফকির-বাউল-বেসরা সুফীগণ এ পরম্পরাকে 'সিনায় সিনায়' রক্ষিত বলে বর্ণনা করেন। হজরত মহাম্মদ থেকে > আলী-ফাতেমা > হাসান বস্‌রী হয়ে এ মতবাদ বয়ে চলেছে। কোরাণে গুপ্ত সাধনার ইঙ্গিত আছে আবৃত ভাষায়। সাধারণ মানুষের জন্য বিধিমার্গই কোরাণের বাহ্যধর্ম বা শরীয়ত—মারফত গোপন।

প্রাচীনকালে রহস্যব্যাখ্যায় ভারতীয়দের খ্যাতি ছিল। বসরায় রচিত ইসলামের প্রাচীন বিশ্বকোষে আদর্শ মানুষের কল্পনায় ভারতীয়দের রহস্যব্যাখ্যার গুণ গৃহীত হয়েছিল।[৪৫] ভাষার সঙ্কেত-অর্থ ব্যাখ্যার এবং আভিপ্রায়িক অর্থ-নিষ্কাশনের এক ঐতিহ্য আমাদের বিচার-বিতর্কে, শাস্ত্রালোচনায় ছিল। ভাগবতাদি গ্রন্থের 'প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ হয়' (মধ্য, ২৪)—তাই চৈতন্য প্রতিটি শ্লোকের নানা ব্যাখ্যা এবং অর্থ-নিষ্কাশনের নানা সূত্রের উল্লেখ করেছেন।[৪৬] এগুলি থেকে শব্দার্থব্যাখ্যার অভিধানবহির্ভূত জটিল ও কুটিল এক রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে এ ঐতিহ্যের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে জন্য এটি আমাদের অপরিচিত বোধ হয়। মালিনী নাটকে সুপ্রিয় মন্তব্য করেছে : 'শতার্থক শাস্ত্র।'[৪৭] একই গ্রন্থ বা শ্লোক বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হয়ে সম্প্রদায় সৃষ্টির কথা লালনও স্বীকার করেছেন।[৪৮] শব্দার্থ নিষ্কাশনের নানা রীতির উল্লেখ চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায়। এ ধরনের ব্যাখ্যার একাংশকে চৈতন্য পাণ্ডিত্যপ্রতিভার ব্যাখ্যা বলেছেন। মহাপ্রভুর মতে টীকা, পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধি দিয়ে ভাগবতাদির মর্ম জানা যায় না; ভক্তি দ্বারা ভাগবত বোধব্য হয় (মধ্য, ২৪), বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে বিতর্কে এ ধরনের ব্যাখ্যাকে তিনি 'অভিপ্রায়' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন—

কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বৈ শ্লোকের আর আছে অভিপ্রায়।। (মধ্য, ৬)

এ ধরনের আভিপ্রায়িক ব্যাখ্যা পণ্ডিত ও সামাজিকেরা গ্রহণ করতেন না—

বাতুলের প্রলাপ করি কে মানে প্রমাণ।।

আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়।। (মধ্য, ২৪)

অর্থাৎ আভিপ্রায়িক অর্থ গৃহীত হতো কেবলমাত্র স্বজাতীয় সাধকদের মধ্যে। এ ধরনের অভিপ্রায় যারা গ্রহণ ও প্রচার করতেন তারা সামাজিক দৃষ্টিতে 'বাতুল/বাউল।'[৪৯] শাস্ত্রবাক্যের দু'ধরনের বিরোধী ব্যাখ্যা বিরোধী শব্দযুগ্মক (Binary words) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে; যেমন বাহ্য, অন্তরঙ্গ, অনুবাদ, বিধেয়; প্রাকৃত, অপ্রাকৃত; স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি। এর মধ্যে অন্তরঙ্গ, বিধেয়, অপ্রাকৃত সূক্ষ্ম পর্যায়ের ব্যাখ্যার সঙ্গে অভিপ্রায়ের সম্পর্ক আছে; এগুলি গুরুগম্য এবং সমধর্মী সাধকমণ্ডলী দ্বারা গৃহীত হয়। কৃষ্ণদাস তাঁর ব্যাখ্যায় গুরুবর্গের ঋণের কথা বলেছেন। চর্যার নির্মলগিরা টীকায় বা সরহ প্রমুখের পদে এ ভাষার মর্মার্থ 'গুরু সম্প্রদায়াৎ বোদ্ধব্যঃ' বলা হয়েছে। লালন এ সাধনার ভেদ জেনেছিলেন গুরুর কাছ থেকে; শ্রোতা/পাঠককেও তিনি 'গুরু ধরার' পরামর্শ দিয়েছেন। চতুর কবিরাজ গোস্বামী সাধনতত্ত্বের আভাসমাত্র দিয়ে, 'লিখিয়া ঢাকিল'—সাধনতত্ত্ব প্রকাশের এই রূপ ও রীতি লালনও অনুসরণ করেছেন।

বর্তমানপন্থী যুগলসাধনা, রসসাধনা, সহজ সাধনার কাব্যের অভিপ্রায় ইহ, দেহ এবং বিশিষ্ট সাধনা। এর আভিপ্রায়িক অর্থটি দেহসাধনাসম্পৃক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং দেশ (সাধনার স্তর বা স্থান), কাল (সময় বা বয়স) ও পাত্র (নায়ক-নায়িকা, একক, গুরুশিষ্য প্রভৃতি) নির্ভর। দেশ কাল পাত্রানুযায়ী বাক্যের অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে পুঁথিগুলিতে। প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদে, তন্ত্রে এবং অন্যত্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুকে ভাণ্ডে বা দেহে নির্ণয় করা হয়েছে। দেহসাধনাসম্পৃক্ত আলোচ্য কাব্যভাষায় ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় নাম ও ক্রিয়াগুলি চূড়ান্ত অভিপ্রায়ে দেহসংক্রান্ত। ৪টি বেদ, ৪টি কোরাণ, চতুঃশ্লোকী গীতা, দু'পাতার ভাগবত সবকিছু দেহে আছে। রাম, রাবণ, সীতা, কৃষ্ণ, চৈতন্য, নবী, ফেরেস্তা, শয়তান সবকিছুকে দেহে পাওয়া যায়। বাহ্যিক ভুবনে বর্ণনা অভিপ্রায়ে দেহভুবনের বর্ণনামাত্র।

নৃলোকসার চিন্তামণি গ্রন্থে,[৫০] গ্রহ, নক্ষত্রাদি, চন্দ্রসূর্য, চার বেদ, দেবতাদিকে দেহে নির্ণয় করে দেখানো হয়েছে। লবঙ্গচরিতে মুকুন্দ দাস[৫১] সিন্ধু, নদী, ফুল-ফলকে সব কায়ার ভিতর নির্ণয় করে দেখিয়েছেন। রূপ-বিরচিত বস্তুতত্ত্ব কড়চা এবং নবধাবস্তু কড়চা[৫২] গ্রন্থে মন্ত্র এবং অক্ষরাদিকে দেহে নির্ণয় করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস-বিরচিত বীরভদ্র শিক্ষাপত্রে ইসলামী, বৈষ্ণব, শাক্ততত্ত্ব, দেবতা ইত্যাদি দশ অবতার, নবী—মাধবীবিবি নিজ দেহে নির্ণয় করেছেন।[৫৩] বংশীবদনের ভাষ রত্নাবলী, সহজামৃত; নরোত্তমের প্রেমভক্তির[৫৪] সটীক টীকায় বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব, দেবতা, পরিভাষা, মন্ত্র, কামবীজ, কামগায়ত্রীর দৈহিক-শৃঙ্গারাত্মক ব্যাখ্যা আছে। এরা অনেকে সহজ সাধনা ও রসসাধনাকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থরচনার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। নৃসিংহানন্দের মতো কেউ কেউ চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেছেন গ্রন্থে।

এ ধরনের পুঁথিতে প্রায়শই পূর্বমহাজন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ষড়গোস্বামী; শাস্ত্রবচন, ভাগবত, তন্ত্রাদি এবং অগ্রজ গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম, মুকুন্দদাস প্রভৃতির

রচিত শ্লোক বা গ্রন্থাংশ শৃঙ্গারসাধন/রস/সহজ সাধনার অভিপ্রায় হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিচার, বিতর্ক ও শাস্ত্রব্যাখ্যার নানাপ্রকার রীতিপদ্ধতির উল্লেখ কলমীপুঁথিতে পাওয়া যায়।

ভাবপ্রেমরস আশ্রয় কড়চা[৫৫] দুই প্রকার মতবাদের ভিত্তিতে দ্বিবিধ সাধনা এবং শাস্ত্রব্যাখ্যার দুই রীতির উল্লেখ করেছে—

অনুমান বর্তমান দুই মত হয়

* * *

অনুমানের সিদ্ধান্ত হয় শাস্ত্র যুক্তি লৈয়া—বর্তমানে করা হয় রসসাধনা। এই দু'প্রকার মতে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা—বাহ্য, গূঢ়; অনুবাদ, বিধেয়।

বেদশাস্ত্রে যদি আছে সেহ ব্যাখ্যা নয়
তর্ক মতে ব্যাখ্যা করি জ্ঞানীগণ কয়—

কিন্তু সাধকের ব্যাখ্যা এ থেকে ভিন্ন।

আদ্যসার রসসংগ্রহে রঘুনাথ দাসের শ্লোকার্থ বিচারে, 'সহজ ভেঙ্গে' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুতত্ত্ব কড়চা ও নৃলোকসার চিন্তামণিতে অনুমান, বর্তমান; এবং অনুবাদ, বিধেয় দু'শ্রেণীর ব্যাখ্যার পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছে। 'বর্তমান বিধেয় সে জীবে নাহি লয়।' এ গ্রন্থদ্বয়ে দেহসাধনা সম্পৃক্ত ব্যাখ্যাগুলি বর্তমান, বিধেয়, অন্তঃ, গূঢ়, গুহ্য, অভিপ্রায় নামে চিহ্নিত হয়েছে। নৃলোকসার চিন্তামণিতে কর্ণামৃত ও ব্রহ্মাপুরাণের একটি শ্লোক বর্ণিত হয়েছে—

অর্ধ্বরাত্রে দিবসার্দ্ধে কৃষ্ণপক্ষ সীতাষ্টমী।
রাবণে হরতি সীতা অর্ধ্বচন্দ্র অর্ধ্ব ভাস্করে।।

এখানে, 'অনুমান বর্তমান আচ্ছাদন করে' আছে। চৈতন্য এর দুটি ব্যাখ্যা সনাতনকে বিবৃত করেছেন; সাধক এ ব্যাখ্যা-দুটি অগ্রাহ্য করে। চৈতন্যদেব, এ শ্লোকের অভিপ্রায়ে দেহমিলনকালে কামরূপী রাবণের ছায়াসীতা হরণের গুহ্যতত্ত্ব আছে বলে, মন্তব্য করেছেন।[৫৬]

এ পুঁথিতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দু'টি পদের অভিপ্রায় বিশ্লেষিত হয়েছে।

(ক) গোপী অনুগত পাইয়া লেশ। দিবসে দিবসে দেখায় দেশ।।
এখানে যাজন করিলে মিলে। এদিক ওদিক মন না চলে।।
নিজধন দিয়া ভজিল যারা। ভুবনে কে আছে তাদের পারা।।
গ্রাহক বুঝিয়া সপিবে ধন। শ্রীরূপ ধরমে রাখিয়া মন।।
চণ্ডীদাস বলে শুন হে ভাই। পরে পর দিলে ব্রজকে পাই।।

এ পদে তথাকথিত সন্ধা শব্দ বা পরিভাষা নেই। মহাপ্রভু চৈতন্য এখানে সনাতনকে গোপী-আনুগত্যের সাধনার গুপ্ত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের মিলনাপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দ অনুভব করাই গোপীভাব। এ পদের শব্দার্থ— দেশ—সাধনার স্তর; এখানে— ইহজীবনে, বর্তমানে রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখা যায়; নিজধন— কন্যা বা বিবাহিত স্ত্রী (সামন্ত— মূল্যবোধে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি); গ্রাহক— যোগ্য সাধক; পরে

পর— (যমক অলঙ্কার) অন্যকে, পরের মেয়ে বা স্ত্রী দান; ব্রজ—রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের লীলাব স্তরটি। কিন্তু শব্দার্থে উদ্‌ঘাটিত হয় না পূর্ণ অভিপ্রায়। সাধক সাধু বা বৈষ্ণবকে (গ্রাহক) নিজের নারীকে দান করে, নির্বিকারচিত্তে তাদের মিলনে সখী হিসাবে সহায়তা করবে এবং বস্তুরক্ষার দীর্ঘস্থায়ী মিলন দেখবে। এই হচ্ছে বিধিমার্গ ত্যাগ করে, রসাশ্রয়ে কৃষ্ণ (কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞের) সেবা। এ ধরনের সেবার পর ভক্তযুগল মিলনের রসাদির প্রসাদ পায়। এতে দেহ হয় নিষ্কাম। সনাতনের সংস্কারে এ সাধনা প্রবল আঘাত করায় এখানে তাকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ''জীব হৈয়া শুনিলে হৈবে সর্বনাশ।''

সমার্থক ব্যাখ্যা পাই বিদ্যাপতির পদের—

(খ) পরের ঝিয়ারি বিভা করি আনি সেই ত আপন দেহ

* * *

সেই ধন দিলে কৃষ্ণ ধন মিলে সাক্ষাতে স্বরূপ দেখি
পুরুষ হৈয়া প্রকৃতি হৈবে এই আরাধনে ভাই
প্রকৃতি হৈয়া রসাশ্রয় পাবে নায়িকা সাধন এই।।[৫৭]

গোপীরা নিজ দেহ দিয়ে কৃষ্ণভজনা করে। এখানে 'অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রী' নিজ দেহ। কৃষ্ণধন—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সাধু/গুরু; স্বরূপ-রাধাকৃষ্ণের অটল মিলন বর্তমানে দেখা; রসাশ্রয়-শব্দে 'প্রসাদ' গ্রহণের ইঙ্গিত আছে।

সাধকের গোপীভাব এবং 'অদ্যাপিও সেই ক্রীড়া করে শ্যাম রায়' ভাগ্যবান কর্তৃক তদ্দর্শনের স্থূল এ ব্যাখ্যা এখানে পদদ্বয়ের অভিপ্রায়ে নিষ্কাশিত হয়েছে। (লালনের সাধনা পৃথক ধরনের)।

নৃলোকসার চিন্তামণি রস ও রতির সাধনাকে বাউলপন্থার সঙ্গে যুক্ত করেছে, 'রতিরসে মত্ত সদা বাউলের প্রায়' (কিন্তু কৃষ্ণচরিত হলো 'নিরন্তর কামক্রীড়া')। এগুলি বিপরীত বা উল্টা-সাধনা বলে অভিহিত।

এই লৌকিক, সমাজনিন্দিত সাধনা, অভিপ্রায়ে আবৃত হয় লোকের উপহাসের ভয়ে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত প্রাচীন অর্থ গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণদাস; যেমন রাম— রমণ; কৃষ্ণহরি—হরণকারী; হরে (রাধা)—যার হরণ করা হয়। রাম নামে উদ্ধার— রমণে উদ্ধার।

আদ্যসার রসসংগ্রহে মুকুন্দ ভাববাদী তত্ত্বকে আত্মসাৎ করে শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটিয়েছেন। দেহতাত্ত্বিকে বলেন সব কিছু রজোঃবীজে জাত। এই দুই মিলে এক ব্রহ্ম; আর জল, বাতাস, আগুন, মাটি এ পঞ্চই ব্রহ্মাতত্ত্ব। এ তত্ত্বে শূন্য নেই।[৫৮] ব্রহ্ম, পঞ্চভূত ভাববাদী শব্দের নূতন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে।

সাধারণী, সামঞ্জস্যা, সামর্থার অবস্থান নারীযোনির তিন দ্বারে (প্রেমরত্নসুধা)। এ তিন দ্বারের চরিত্রবিচার করে পাওয়া যায় সধবা, বিধবা ও কুমারী এ তিনজনকে (বীরভদ্র শিক্ষাপত্র) ক্রমিক ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধঃদ্বারে পাওয়া যায় ঈশ্বর, মানুষ ও জীবকে বা অটল সুটল টলকে/অযোনিজ, সংস্কারা, যোনিজ তিন মানুষকে। অনেক কড়চায় এই তিন দ্বারে তিন নারী (নাড়ি) ও তিন মানুষতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

দুটি শব্দ দিয়ে তৈরি করা হয় নূতন শব্দ। যেমন শোণিত—রজঃ এবং শুক্র বা শুক্ল (শ্বেতবর্ণ পদার্থ); মিলে হলো শনি-শুক্র। (দুটি গ্রহ বা বারের নাম)।

রজঃসাধনার বিস্তৃত বিবরণ এবং নানাধরনের বিশেষণের ব্যবহার পুঁথিগুলিতে আছে। ব্রজরসকল্পে বিভিন্ন সম্প্রদায় পুরুষশুক্রকে কীভাবে ব্যবহার করে তার বর্ণনা এবং গুরুবীজ-রোপণের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। বিশিষ্ট দেহমিলন পদ্ধতি এবং শৃঙ্গারে উপচিত নানা-প্রকার রস শ্যামরস, অমিলা রস, মিশ্রণ, জারণ, মারণ ও গ্রহণপদ্ধতির বর্ণনাও পুঁথিতে আছে। শুক্র রজঃ এ দ্বিচন্দ্র এবং তার সাধনায় নানা মতভেদ ও সমস্যা থাকায় তা স্থানবিশেষে ইঙ্গিত বর্ণিত মন্ত্রসহ।

(ক) আধ্যাত্মিক শব্দকে দেহের বস্তুবাচক অর্থে ব্যবহারের ব্যাপক নিদর্শন আছে পুঁথিসাহিত্যে।

চুম্বনেতে সৎশক্তি মর্দ্দনেতে চিৎ
মিলনেতে আনন্দময় ভগবান রীত [অমুদ্রিত, স্বরূপ দামোদরের কড়চা][৫১]

অথবা মাংস—ব্রহ্মা, অস্থি—হর, মজ্জা—বিষ্ণু [ভাষ রত্নাবলী]। তিনদিনের রজঃধারাকে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সত্ত্ব, রজঃ, তমো, হরি, হর বিষ্ণু, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলা হয়।

(খ) প্রথাগত পঞ্চবাণ ছাড়াও নানাধরনের বাণ এবং দেহমিলনে এই বাণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে সহজমঞ্জরী প্রভৃতি রচনায়। আবার বাণ ও গুণ আকৃতিসাদৃশ্যে নরনারীর যৌনাঙ্গে কল্পিত হয়েছে। গুণ ও ধর্ম বা আকৃতি-সাদৃশ্যে দুই বস্তু অভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। যেমন বাঁকা নদী—যোনি, সহজপুর; ভৃঙ্গ রতি—শুক্র; রজঃরক্ত—লতা; [ভাষ রত্নাবলী]।

(গ) মতবাদস্পৃষ্ট শব্দ-ব্যবহার : শুক্র-পরমাত্মা, নিত্যবস্তু [ঐ]।

(ঘ) বর্ণনামূলক শব্দ : রতি—শ্বেতবর্ণ রসবস্তু [ঐ]।

(ঙ) আরোপিত আভিপ্রায়িক অর্থ নিষ্কাশন

(১) অক্ষরপ্রতীক : রাম—রা শব্দে কণ্ঠবক্ষ, মা শব্দে স্তন [ভাবপ্রেমরস আশ্রয় কড়চা]।

(২) ষড়অক্ষর মন্ত্রবীজ : কৃষ্ণ রাম হরে : আকর্ষণপূর্বক রমণে রসবস্তু হরণ করা [ঐ]।

(৩) লোক শব্দে মদন কহি ত্রিভূবনবিখ্যাত [প্রেমভক্তির সটীক টীকা, ১ম অধ্যায়]।

(চ) অনুষঙ্গে অর্থব্যাখ্যা : অজ্ঞান শব্দে তম ঃ কহি তমঃ শব্দে কাম [ঐ]।

(ছ) একই শব্দের নানা অর্থে ব্যবহার :—
পদ্মশব্দে প্রণয় পীরিতি রসময় [ঐ],
পদ্মশব্দে কহি এই নায়িকার দেহ [সহজামৃত]।

(জ) নতুন সৃষ্ট শব্দ : শুক্রের ভিতরে গন্ধ বিন্দুমণি; রজেঃ মেদনী বিন্দুমণি—দুটি একশব্দে হলো গন্ধমেদনী [আদ্যসার রসসংগ্রহ]।

(ঝ) একই বস্তুর নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্য নানা শব্দে বর্ণিত :— লতা—বাহ্য যোনি, অনঙ্গমঞ্জরী, তেতুলীর তলা, রতনপালঙ্ক, অনঙ্গমোহন, নিত্য বৃন্দাবন, প্রেমরসকূপ, গন্ধরাজ, চাঁপাকলি, বেতসীর বন, প্রেমসরোবর, কামসরোবর, কুম্ভকারের চাকা, আকাশের চাঁদ, আনন্দধাম, পিরীতের ফাঁদ, লজ্জাশক্তি, মন্মথমদন, বটপত্র, লাউফুল, বেণুকূপ, হরি, অষ্টপদ্মের পদ্ম, জগমনমোহিনী, আভীরতনয়া, গুপ্তচন্দ্রগ্রাম, ব্রহ্মাপত্নী প্রভৃতি বহু নাম স্বরূপ কল্পতরু বর্ণনা করেছে [৮ম অধ্যায়]।

(ঞ) মহাজন অনুবাদ, গৌণ এবং বাহ্য অর্থে শব্দ প্রযুক্ত করেন; এ থেকে বিধেয়,

মুখ্য এবং অন্তরঙ্গ অর্থ নিষ্কাশন করতে হয়—স্বরূপ কল্পতরু চৈতন্য-জীবনাচরণগুলিকে অন্য অর্থে গ্রহণ করেছে। তাঁর তীর্থভ্রমণ জগন্নাথ, বৃন্দাবন, দক্ষিণ ভারত শব্দগুলি অনুবাদ ও গৌণ—তিনি তীর্থাদি ভ্রমণের ছলে রস আস্বাদন করতেন। তাঁর শেষ দশার প্রলাপগুলি আভিপ্রায়িক অর্থে দেহমিলনের স্মৃতিচারণ [৮ম অধ্যায়]।

(ট) আভিপ্রায়িক ভাষার অর্থনির্ণয় আপনার ইচ্ছামতো করা চলে না; [তাতে 'হাত-গড়া আইন' তৈরি হয়] গুরুবাক্য এবং সাধুশাস্ত্রের [এ ধরনের পুঁথি] সঙ্গে মিলিয়ে এর অর্থভেদ করতে হয়। [ঐ]।

এখানে 'অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ হে' শ্লোকটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চৈতন্য থেকে এ গুপ্ত অর্থ স্বরূপ > রূপ > রঘুনাথ > কৃষ্ণ দাস ক্রমে উত্তরপুরুষে সঞ্চালিত। শ্লোকটি মাধবেন্দ্র পুরী অন্তিমকালে উচ্চারণ করেছিলেন। শিষ্য রামচন্দ্র পুরী[৬০] এর গুপ্ত অর্থ না-বুঝে মথুরানাথকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তি বলে ভ্রম করেছিলেন। মথুরানাথ মাধুর্যময়ী কিশোরী। অন্তিমকালে এই কিশোরী-ভজনার স্মৃতি স্মরিত হয়েছে এ শ্লোকের অভিপ্রায়ে। [ঐ; ৫ম অধ্যায়]।

বর্তমানপন্থী সাধকের কাছে ভুবনের সমস্ত কিছু এবং মানুষের নাম, তত্ত্ব, ক্রিয়া, দেহস্থ বস্তুবাচক, শৃঙ্গারাত্মক এবং রসাত্মক। এইভাবে সাধক তাঁর অভিপ্রেত অর্থ নিষ্কাশন করেন। প্রয়াত গুরু ষষ্ঠিচরণ ধর নদীয়া জেলার করিমপুর থানার মুরুটিয়ার একজন সাধক ছিলেন। তাঁর গুরু নিকটবর্তী মাদপুর-বেলেডাঙ্গা গ্রামের সচ্চিদানন্দ ওরফে সতীশচন্দ্র দাস বৈরাগ্য। ষষ্ঠিচরণের অন্যতম এক শিষ্যের খাতায় পাওয়া গেছে যে তাদের মতটি গোস্বামীমত নয়, "বাউলমত"। এ সমস্ত খাতায় রসরতি, দেহমিলন ও চারচন্দ্রভেদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এখানে নানা শব্দের সঙ্কেত ও আভিপ্রায়িক অর্থ লেখা আছে। সাধকেরা কীভাবে শব্দ ও গানকে গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করেন তার নিদর্শন হিসাবে এর অংশবিশেষ আলোচিত হলো।

শাস্ত্রীয় শব্দের আত্মীকরণ (appropriation)

(১) • +v +ও সৎ+চিৎ+আনন্দ
শুক্র + পুরুষ + নারী।

(২) ব্রহ্মা—নিঃশ্বাস; বিষ্ণু—কুম্ভক; প্রশ্বাস—শিব।

(৩) ৮ পদ্ম—নয়ন, মুখ, পৃষ্ঠ, হস্ত, হৃদয়, নাভি, চরণ, লিঙ্গ।

(৪) ত্রিভুবন : স্বর্গ—মাথা; মর্ত্য—বুক, পাতাল—গুহ্য।

(৫) গিরিবর ২টি—ভগ ও লিঙ্গ; কুচযুগল।

(৬) ভগবান—ভগ+বান = নারী+পুরুষ।

(৭) ত্রিবেণীঘাট কাহাকে বলে—ভগ; সেইখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—ত্রিমোহনা।

(৮) স্বত্বঃ—পিতা (ব্রহ্মা), শাদাবর্ণ; তমঃ—গুরু, শিব (নিগূঢ় শ্যামবর্ণ); রজঃ—মা, বিষ্ণু (রক্তবর্ণ)

(৯)	সত্য	ত্রেতা	দ্বাপর	কলি
	নারায়ণ	রাম	বিষ্ণু	চৈতন্য
	মাথা	কণ্ঠে	বুক	লিঙ্গ

বৈষ্ণব তত্ত্বের দৈহিক অবস্থান

৫ প্রকৃতি—অস্থি, মজ্জা, মগজ, ত্বক, লোম।

৫ রতি—শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র, ঘাম/স্বেদ।

৫ আত্মা—	ভূতাত্মা	জীবাত্মা	পরমাত্মা	আত্মারাম	আত্মারামেশ্বর
	নাভি	গলা	মস্তক	লিঙ্গমূলে	লিঙ্গ
	অদ্বৈত	শ্রীবাস	চৈতন্য	নিত্যানন্দ	গদাধর

ছয় গোস্বামী—

রঘুনাথ দাস, (শব্দমঞ্জরী) কর্ণে; রূপ গোস্বামী (রূপমঞ্জরী) নয়নে; রঘুনাথ ভট্ট (রসমঞ্জরী) মুখে; গোপাল ভট্ট (গন্ধমঞ্জরী) নাক; সনাতন (নবনীমঞ্জরী) বুকে; শ্রীজীব—(স্পর্শমঞ্জরী) অঙ্গে। [গদাধরের নাম নেই এ তালিকায়]।

অদ্বৈত—সুষুম্না; বলরাম—বলবান লিঙ্গ।

মহাপ্রভু সাড়ে তিনজন লইয়া রস (বীর্যকে) আস্বাদন করিয়াছিলেন।

(১) স্বরূপ গোঁসাই—শ্বাসপ্রশ্বাসে সুষুম্নার আশ্রয়ে অটল হয়ে এবং মদন মাদনে।

(২) রূপ গোঁসাই—স্তনযুগল; সুধা আছে, মেন্‌স সুধা।

(৩) রায় রামানন্দ গোঁসাই—রমণে আনন্দে।

মাধবীদেবী আধখানা হইল কেন? রাধাকে মা বলে না কেন? কারণ রসাস্বাদন করিতে হইলে মেন্‌স লইবে; তাহার জলীয় বীর্য স, হ দ্বারা থাকিতে সেই স : হ : অর্ধ্বখানাকে মা বলে না। সন্তান গর্ভে এলে, মা হলে 'মেনস' থাকবে না; তাই সাধক রাধাকে মা বলে না। রাধা আধার বা পাত্র সাধকের তাই তিনি আধা; পূর্ণতার অর্ধ্বেক। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ঃ সুবল—অধরামৃত।

শ্রীরাধিকার প্রিয় সখী ঃ ললিতা—মেন্‌স

সঙ্কেত শব্দ/প্রতীক

টাট্টুঘোড়ার শিং—দুইটা অন্ডকোষ

ঘুড়ির শিং—উদ্‌গত স্তনযুগল

এ উদাহরণ থেকে নানাজাতের শব্দ ও তত্ত্বকে দেহ, রস ও শৃঙ্গারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা স্পষ্ট। পঞ্চরস, ভাব, নবরস, বাণ, চক্র ইত্যাদির দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসহ গুরুর দুটি পদ ও পারিভাষিক শব্দার্থ লিখে রেখেছেন সাধক ষষ্ঠিচরণ।

(ডায়েরির পাতার তারিখ : জুলাই ২৭, ২৮, ২৯, ১৯৭৭)

বিচক্র বিষ্ণুবাণ শুন ওহে মন। সত্তারূপ এই বাণে করে আকর্ষণ।।
শিক্ষাগুরুর কৃপায় পাইবে সন্ধান। বাণ শিক্ষা না হলে না হবে সাধন।।
পঞ্চবাণ উপাসনা সহজ ভজন। সম্মোহনে মোহিত প্রকৃতির মন।।
আচক্র আনন্দ রতি শুন ওহে মন। স্তম্ভন বাণ জুড়ে থাকিবে অনুক্ষণ।।
মোহনে যোগিনীচক্র চাপিয়া রাখিবে। বিচক্রে সুচক্র ভাব ধারণ করিবে।।
মদন মাদন দুই নয়নেতে স্থিতি। তত্ত্ব জানিয়া হও সাধনেতে ব্রতী।।
না জানিয়া না ভাঙ্গিয়া জীবের জীবন। অকারণ ভব মাঝে হতেছে পতন।।

সচ্চিদানন্দ বলে শুনরে ষষ্ঠি। সত্য উপাসনা এই সাধনের মুষ্টি।।

দেবত্বের শিবত্বের ঊর্ধ্বে মানুষের করণ। এই তো জানিবে সাধন রসিকের ভজন।।

গুরুর এ পদটির পারিভাষিক শব্দার্থগুলি ষষ্ঠি লিখে নিয়েছেন।

চক্র ৪টা : আচক্র— আনন্দশৃঙ্গার, যাতে বিন্দুপতন হয় না।

বিচক্র—বলবান, লিঙ্গ, পুরুষ।

সুচক্র—নারীর ভগ, নারী।

যোগিনীচক্র—স্তনযুগল।

স্তম্ভন—শৃঙ্গারে স্থিতি।

মোহন—স্তনে হস্তস্থাপন।

আধার—যোনি; অষ্টদল—যোনি; সত্তা (৩)—বীর্য, মেন্‌স, রস।

রজঃ—রক্ত; স্বতঃ—জল, তমঃ—জল, সংহার করে।

নবরস : ষড় দলে—পঞ্চরস।

৬। নয়নে—প্রেমরস

৭। মাথায়—বীর্যরস

৮। দেহে—রক্তরস

৯। জিহ্বায়—উপাসনারস

শান্তভাব—পিঙ্গলায় নিঃশ্বাস বহে যতক্ষণ, কোন কার্য করিবে না।

দাস্য—ইড়ায় নিঃশ্বাস আসিলে, দাস্য অর্থাৎ কার্য আরম্ভ; প্রাণ, অপান যোগ করিয়া কার্য করা প্রথম অবস্থা।

সখ্য—ইড়াকে কুম্ভক করিয়া এবং সমস্ত বাণ বন্ধ করিয়া রাখিবে।

বাৎসল্য—কুম্ভককে আশ্রয় করিয়া ভক্তিসহকারে থাকিবে।

মধুর ভাব—কুম্ভককে পুনরায় প্রাণের টানে স্তম্ভন বাণ করিয়া ভক্তিসহকারে আনন্দ ভোগ করিবে...... (অস্পষ্ট)

নবধা ভক্তি নবরস এই হয় প্রকাশ

সবে বলে ভব নদী হতে হবে পার।

কোথা ভব নদী বল শুনি সমাচার।।

ভবনদী পার হওয়া অশিক্ষাতে নয়।

ত্রিবেণী ঘাটে নামা বড়ই সংশয়।।

ঘাটেতে নামিতে যদি পা পিছলে যায়।

অমনি জলেতে পড়ে পরাণ হারায়।।

নৌকাহীন ভবে আসি না জানি সাঁতার।

ভবনদী পাড়ি দেওয়া কঠিন আমার।।

চৈতন্যের সমসময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে তান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। লালনের সন্নিকটে শিবচন্দ্র ছিলেন তন্ত্রাচার্য। বঙ্গীয় তান্ত্রিক ঐতিহ্যে সঙ্কেত শব্দ ব্যবহারের এবং ব্যাখ্যার কিছু উদাহরণ তন্ত্রসার থেকে নেয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতি চর্যাপদ, বাউলগানের পদ্ধতিরই অভিন্ন অংশ।

(ক) অক্ষর প্রতীক :
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পঞ্চভূত প্রকাশক[৬১]
স্ চন্দ্রের ষোড়শ কলার প্রতীক।
অগ্নি—দশকলা সমন্বিত
সূর্য—দ্বাদশ কলা
চন্দ্র—১৬ কলা
সপ্তধাতু—৭ অক্ষর।

দেহের বিভিন্ন স্থানে ন্যাস ও অক্ষরের অবস্থানগুলি বর্ণিত হয়েছে।[৬২] পুং—পুরুষ, সঃ—প্রকৃতি।[৬৩]

সপ্তাক্ষর মন্ত্র—বাল; অষ্টাক্ষর—কুমার; ষোড়শাক্ষর—যুবা; ২৪ অক্ষরাত্মক মন্ত্র—প্রৌঢ়; ৩৬ অক্ষরযুক্ত মন্ত্রকে—বৃদ্ধ বলে। মন্ত্রের আদি, মধ্য, অন্তে চতুর্বর্ণ থাকলে তাকে বলে মলিন; ১৭ দশাক্ষর মন্ত্র-মধ্যে ফটকার পঞ্চকাদি থাকলে তাকে বলে মদোন্মত্ত[৬৮] ইত্যাদি।

এ গ্রন্থের কুলাচার অংশে[৬৫] যে-মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে, তার সঙ্গে লালন প্রমুখের জীবনদর্শনের মিল আছে। জগতে, জীবনে এবং সাধনায় এখানে নারীর গুরুত্ব ও মহিমা। নিজেকে নারী কল্পনা করতে হয় সাধককে।

আভিপ্রায়িক শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি এক্ষেত্রে—

পর্বত শব্দের অর্থ স্তন; পদ্ম—মুখ, বিম্ব—অধর, খঞ্জন—চক্ষু, শিখর—মস্তক, চামর—কেশ, রবিবিম্ব—সিন্দুর, তিলফুল—নাক, সরোরুহ—নাভি, ত্রিশূল—ত্রিবলী 'বলিয়া জানিবে'। কুলবার—মঙ্গল ও শুক্রবার; কুলতিথি—৪র্থী, ৮মী, ১২ দশী, ১৪ দশী।

কুলবৃক্ষ : রমণীর পদাঘাতে অশোক; বদনমদিরায় কেশর ও কর্ণিকা; দর্শনে বিম্ব; হস্তস্পর্শে আম্র; সঙ্গীতে তিলক, নামেরু ও পিয়াল; বাক্যে কর্ণিকা, আলিঙ্গনে কুরুরক; স্পর্শে সিন্ধবার ও কদম্ব;।

শ্রুতি-উল্লিখিত কুলবৃক্ষের এই গূঢ় অর্থ [পৃ. ৪৯৮]।

চন্দ্রের ১৬টি কলাকে নারীর বিভিন্ন দেহাঙ্গে স্থাপিত করা হয়েছে। নারীদেহের যোনিপদ্মে তিন নাড়ি থাকে। চান্দ্রী জলদ্বার, সৌরী পুষ্প (রজঃ) দ্বার এবং আগ্নেয়ী নাড়ি বীজ ক্ষরণ করে। জ্ঞানার্ণব উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে এ পূজায় শীৎকার মন্ত্রজপ, চুম্বন কর্পূর, নববিধ পুষ্প দেহমিলনের গুপ্ত সঙ্কেত মাত্র। এখানে নাড়ি, চক্র, বায়ু প্রভৃতি দেহতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। তন্ত্রসারে দেহকেন্দ্রিক তথ্য ও সাধনা ভিন্ন শব্দাবরণে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি লৌকিক তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বহুবিধ তন্ত্রগ্রন্থ'-প্রণেতা ভৈরব শাস্ত্রী রচনা করেছেন কামতন্ত্র। ভূমিকায় উপনিষদাদির শ্লোক দ্বারা লেখক ''কামই আধ্যাত্মিক সাধনা'' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। অতঃপর কামতন্ত্র বিশারদ গ্রন্থ থেকে গৃহীত, 'গুহ্য আধ্যাত্মিক অর্থ' দেয়া হয়েছে বহু শব্দের। যেমন, পরশপাথর—যোনিমুখ, নদী—নায়িকা, বারবেলা—রমণে অনিচ্ছুক নারী প্রভৃতি[৬৬] সর্বত্র দেহসংক্রান্ত সাধনা অন্য শব্দসঙ্কেতে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্র শব্দটির অর্থ এখানে—কুলনায়িকার ঋতুমতী হওয়ার দিন। 'অমাবস্যায় পূর্ণিমা'

এই তত্ত্ব নিয়ে সমরেশ বসু লিখেছেন উপন্যাস; উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নানা ব্যাখ্যা করে তত্ত্বটিকে জটিল করেছেন। 'অমা' তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। ষোড়শী অমাকলার আবির্ভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত নারীদেহ রজঃস্বলা হয়—এই হচ্ছে অতিসরল তথ্যটি।

মুসলমান সমাজভুক্ত উপাসকগণ অনুরূপভাবে ইসলামী শাস্ত্র, তত্ত্ব, ঘটনা, পুরাকাহিনীকে অর্থান্তরিত করে দেহে নির্ণয় করেন। বঙ্গের ফকির-দরবেশদের মধ্যে কোরাণের এক গুপ্ত গুরুমুখী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এ ব্যাখ্যারও এক পরম্পরা আছে। কথিত হয় যে নবী আল্লার সঙ্গে মেয়েরাজের ফলে ৯০ হাজার কালাম প্রাপ্ত হন। তার তিরিশ হাজার কোরাণে জাহেরা (প্রকাশ্য); তিরিশ হাজার তিনি দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের; আর তিরিশ হাজার পেয়েছিল আলি এবং ফতিমা। আলির শিষ্য হাসান বস্বরী-ক্রমে এ গুপ্তজ্ঞান সুফী-ফকিরদের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এদের কোরাণ, হাদীসের ব্যাখ্যা শরীয়তের সমান্তরালে বয়ে চলেছে। এসমস্ত সাধকেরা দেহকেন্দ্রিক সহজ ও রসসাধনার সমর্থন খুঁজে পান কোরাণ হাদীসের আভিপ্রায়িক ব্যাখ্যায়। যোগ কালন্দর, অমৃতকুণ্ড, চট্টগ্রামে দৌলতকাজী-আলাওল-আলীরাজার রচনাবলীর মধ্যে ইসলামী ব্যাখ্যায় দেহতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আধুনিককালে বেশ কিছু মারফতী গ্রন্থ বটতলা-চিৎপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে; যেমন ফকিরবিলাস। আধুনিককালে বাংলাদেশে মনসুর-রশিদ আল চিস্তিয়াগোষ্ঠী তাদের বাতন ব্যাখ্যা দিয়ে, 'ছেরওলকোরাণ', 'জ্ঞানের আলো' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বিচারালয়ের মাধ্যমে তাদের মতবাদের 'স্বীকৃতির জন্য' চেষ্টা করেছেন। বর্ধমানের খাঁপুকুরের ফকিরগোষ্ঠী, 'মওলা হি মওলা' নামে বৃহৎ এক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বীরভূম, সন্ধিগড়া, রামপুরহাটের বিখ্যাত প্রয়াত গুরু আবদুল জব্বার প্রকাশ করেছেন অনেক কটি বই। মুর্শিদাবাদের, নিমতিতা থেকে সুফী আবদুল গনি, ইসলামের দেহতাত্ত্বিক ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সুখশান্তি দর্শন, গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তার অন্য আর এক গ্রন্থ 'মুক্তিপাথেয়' (১৯৮৮)। গ্রন্থ-বর্ণিত মতবাদ প্রচারের সূত্রে, ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে, ঔরঙ্গাবাদের সুখশান্তি প্রচারকেন্দ্রে এই বৃদ্ধকে শারীরিক নিগ্রহ করে ধর্মান্ধগণ।[৬৭] শাস্ত্রীয় রক্ষণশীল ইসলামের প্রতাপে এবং বাউল ধ্বংস আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেহতত্ত্ব ও সাধনাকে লিখিত রূপ দিয়ে গড়ে ওঠেনি ইসলামের কোন সহজিয়া কলমী পুঁথি। মুসলমান সমাজে সাধকদের মধ্যে এ ঐতিহ্য মৌখিক। কিন্তু সাধকগণ ব্যক্তিগত খাতায় নানা বিষয় সংগ্রহ করে রাখেন। ষষ্ঠিচরণের মতো বহু খাতা মুসলমান সমাজভুক্ত সাধকের কাছে পাওয়া যায়। এমন খাতা ও তাদের শব্দার্থ ব্যবহার ও নিষ্কাশন পদ্ধতির আলোচনা আমার গবেষণাগ্রন্থে করা হয়েছে। এ ধরনের শব্দ-ব্যবহার লালনে আছে। সমাজপীড়নের ভয়ে ইসলামে এ সাধনা ও মতবাদ অধিকতর আবৃত। জাত নেই দেহধর্মের; শৃঙ্গার, রস, সহজ সাধনাটি অসাম্প্রদায়িক। এরা প্রয়োজনে তন্ত্রে, বৌদ্ধতন্ত্রে, বৈষ্ণবতায়, ইসলামের মারুফতে মিশে যায়। মৌখিক ঐতিহ্যে এ মিলনের সম্ভাবনা অধিকতর। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ ইসলামের সাধকগণ মান্য করেন, পুঁথির দেহতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের পরম্পরা তাঁদেরও। আর মতবাদকে, 'লিখিয়া ঢাকিল' ভঙ্গীটি তাঁরাও অনুসরণ করেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে নাথ ঐতিহ্য বহন করেছিলেন বঙ্গের ইসলামী সমাজেরই এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। পঞ্চানন মণ্ডল, নাথপন্থার ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাউলগানে ব্যবহার চিহ্নিত করেছেন। নাথপন্থার জানপদ সাধনার মিশ্রণ আছে বাউলপন্থায়।[৬৮] আর প্রাচীন

ভারতীয় কামশাস্ত্র, বস্তুবাদী চার্বাক, লোকায়ত, কাপালিক ঐতিহ্যের প্রভাব বাউলপন্থায় প্রবল।[৬৯]

নাথ, হিন্দু শৈবতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, লৌকিকতন্ত্র, বৈষ্ণবতার সঙ্গে প্রাচীন বস্তুবাদী ঐতিহ্য, ইসলামের বেসরা সুফী ফকিরের ঐতিহ্যের নানা শব্দ, পরিভাষা, অনুষঙ্গ মিশ্রিতরূপে বাউল গানে (লালনে) পাওয়া যায়। এগুলি দিয়ে বক্তব্যকে আচ্ছাদিত করেন লালনের মতো পদকর্তা। অসাধক জ্ঞানী পণ্ডিতেরা এসমস্ত ঐতিহ্য, সাধনা ও পর্যায় না জেনে বাউল গানের মর্মভেদ করবেন কীভাবে? এ বিষয়ে Zen Koan-এর চমৎকার একটি মন্তব্য আছে : "A problem students can not solve and can not escape * * * In which a transparent turth lies hidden"।[৭০]

বাউল গানের প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত অর্থ ইহ, দেহ এবং বিশিষ্ট রস-রতির/চার-চন্দ্রভেদের সাধনার সঙ্গে যুক্ত। এই সাধনপদ্ধতির সহায়তা ব্যতীত এসমস্ত আভিপ্রায়িক অর্থ নিষ্কাশন করা যায় না।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত নারীকেন্দ্রিক যৌনসাধনা এবং নিম্নগামী পুরুষ-শুক্রকে উর্ধ্বগামী করার উজানসাধনা—অর্থাৎ দেহমিলনের মাধ্যমে উর্ধ্বরেতা হবার সাধনা, বাউলতত্ত্ব বলে নির্দেশ করেছেন[৭১]। বাউল গানে পুনঃপুনঃ তাদের সাধনাটি টলের বা 'অটলের' (বস্তুরক্ষার) নয় বলা হয়েছে। বস্তুরক্ষার স্থান এখানে আছে কিন্তু এ সাধনাটি মূলত রস ও রসায়নের সাধনা। দৈহিক সমস্ত রসাদি আস্বাদন করেন যিনি, তিনিই সাধু। পুরুষ-শুক্র এই রস-রসায়নে আবশ্যিক। দুই, তিন বা চারচন্দ্রের গ্রহণ ও বাহ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় এ সাধনায়। দেহের বস্তু দিয়েই এরা দেহস্থ বস্তু ও মনকে শুদ্ধ, পরিবর্তিত করেন। নিঃশ্বাস, নাম, মন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে দেহশোধনের ঐতিহ্যগুলি এব সমান্তরালে বয়ে চলেছে। দেহবস্তুর ব্যবহারের, রস-রতির সাধনাটি রসের সাধনা বা সহজ সাধনা নামে উল্লিখিত হয়। হারাধন দাস মন্তব্য করেছেন :

"সহজ সাধন বলি রসিকে বলিল।
কুলাচার ধর্ম বলি তন্ত্রেতে লিখিল।।[৭২]

রজঃবীজের মুখাদি দিয়ে গ্রহণের উল্লেখ করে তিনি এর বিরোধীপক্ষে যোগ দিয়েছেন। চর্যাপদের যুগ থেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যৌগিক সাধনার সঙ্গে রস-রসায়ন সাধনার ভিন্নতা চিত্রিত হয়েছে। রসপন্থ সমর্থন করেননি যোগ (বায়ু) পন্থীরা।

"জা এখু জাম মরণে বিসঙ্কা। সো করউ রস রসানেরে কংখা।
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি। তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি"

(২২ নং চর্যাপদ)।

হারাধন দাস বায়ুর সাহায্যে অটল সাধনার পক্ষপাতী। চর্যার যুক্তি তাঁরও, যে, দোহা দুধ বাটে প্রবেশ করে না—

★ ★ভক্ষণে কি ফল তায়। সাধনের বলে শোষলিঙ্গনালে
সেই করণ সার।। তাহা নাহি করি খাও বাটি ভরি
রাধাকৃষ্ণে কোথা যোগ।।

তাঁর মতে রসাদি গ্রহণের সাধনা অবৈষ্ণব—

সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের নহে এসব সাধন

এসব করণ হয় তন্ত্র অনুগামী
লিখিয়াছে দীপিকায় শ্রীদাস গোস্বামী।।[৭৩]

নারীদেহে চন্দ্রোদয়কালে পুরুষ-শুক্রকে সে দেহে সমর্পিত করে, রজঃমিশ্রিত বস্তুগ্রহণের সাধনা বাউলপন্থায় সাধক স্তর পর্যন্ত অনুসৃত হয়।

উপেন্দ্রনাথ ও শশিভূষণ মূলত যোগপন্থার (বায়ুসাধকদের) উজান সাধনা বর্ণনা করেছেন। রস-রসায়নের সাধনায় রসের মিলন, মিশ্রণ, জারণ, মারণের পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এখানে 'Sexo-yogic' পদ্ধতি নয়, দেহ সম্পর্কে রসসংগ্রহ ও আস্বাদন মূল সাধনা। এ দেহমিলনে পুরুষ নারী হয়। বিশেষ সময়ে দেহমিলনে অনুসৃত হয় বিপরীত বিহার। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের ঔপরিষ্টক অধ্যায়ে যে সমস্ত আস্যমৈথুন (Oral sex) বর্ণিত হয়েছে —রস-সংগ্রহের সাধনায় এসমস্তই ব্যবহৃত হয়। সময়বিশেষে এই অবৈদিক দেহমিলন পদ্ধতিগুলিই উল্টা এবং রসপানাদির বিশেষ যোগাদির উজান সাধনা হিসাবে চিহ্নিত হয়। রস-রসায়নের এ সাধনায় Sexo-yogic ভঙ্গী থাকতে পারে, নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ বা বস্তুরক্ষার স্থানও এতে আছে কিন্তু এ সাধনার নায়ক অটলবিহারী কৃষ্ণ নন—এর 'অন্তরঙ্গ ধর্ম হয় রস আস্বাদন'। এই কারণে কলমী পুঁথিগুলিকে আমরা বাউল সাধনার সমধর্মী সহায়ক টীকাভাষ্য বলে গ্রহণ করেছি। বাউল সাধনাটি অবৈদিক, অশাস্ত্রীয়, লৌকিক এক গুপ্ত সাধনা। এদের দেহশোধন ও দেহমিলনেও বিশিষ্টতা আছে। গবেষণাগ্রন্থে এগুলি চিহ্নিত হয়নি। আর কেন্দ্রীয় মূল সাধনায় ঐক্য থাকলেও বাউল/বর্তমানপন্থী রসসাধনায় অজস্র মতভেদ, স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নাম, জপ, নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণও এতে যুক্ত হয়েছে কোন ক্ষেত্রে। কেউ কেউ নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক গতির সঙ্গে মিলিয়ে 'অজপা' জপ করেন। লালনের সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ গুরুর 'বর্জোক'। এই 'বর্জোক' রসসাধনায় পুরুষের বীজ এবং তার দ্বারা নির্মিত বাহ্য রূপ।[৭৪] বাউল গানের অভিপ্রায়ে আমাদের অজ্ঞাত এই লৌকিক সাধনা থাকার ফলেই এর অন্তর্নিহিত অর্থ আমাদের গোচরে নেই।

বাউল মতবাদ নানা অবৈদিক ও লৌকিক উপাদানে পূর্ণ। আমাদের দেশের সাঁওতাল প্রমুখ নরগোষ্ঠী অলঙ্কারবহুল এক বক্রোক্তিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেন। লোক-মানসিকতায় বিরুদ্ধ-ভাবনাগুলি Binary যুগ্মকে ধরা থাকে; মানুষ, প্রাণী, নিসর্গ জড়জগৎ সংবর্তন (transformation) ও সঞ্জননের (generation) ফলে এক অখণ্ড সত্তায় দেখা দেয়। এক বস্তুকে অন্য বস্তুর রূপকে বা সঙ্কেতে এসমস্ত আদিম ভাষায় ব্যবহার করা হয়। এদের রূপক ও সঙ্কেত-ভাষণে থাকে নিজস্ব যুক্তিবোধ। সংশ্লিষ্ট জনজীবন ও সংস্কৃতি না জানলে, এ ভাষা দুর্বোধ্য বা অসংলগ্ন মনে হতে পারে। প্রসঙ্গানুযায়ী এখানে প্রতীকের অর্থ নিষ্কাশন করতে হয়। এই অস্ট্রিক লোক-ভাষারীতির রূপক, সঙ্কেত ব্যবহাররীতির সাধর্ম আছে বাউল গানের ভাষার সঙ্গে।[৭৫]

বুদ্ধি, অনুভবক্ষমতা ও তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞ মানুষেরা ধাঁধা-প্রহেলিকায় এক বুদ্ধিদীপ্ত বক্রতা ও আচ্ছাদন ব্যবহার করতেন; বাউল পদকর্তাগণ এ ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন।

ভারতীয় সাধনায় ও জনজীবনে সর্বত্র প্রতীক ব্যবহৃত হয়। প্রতীক দিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের ধ্যানধারণা। ছোট বালিকা এক কাষ্ঠখণ্ডকে তার মেয়ে কল্পনা করে। এই প্রতীকপ্রিয়তা বাউলগানের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বৈদিক যুগ থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এক ধরনের সঙ্কেতভাষণ দেখা যায়। কখনো গুপ্ত সাধনাকে এর দ্বারা কুলবধূর মতো রক্ষা করা হয়। কখনো ধ্বনিত হয় সাধ্যবস্তু সম্পর্কে ভীতি; তাই অন্য বস্তু বা নামের আড়ালে সেগুলিকে গোপন করা হয় সুভাষিত বা Kenning-এর মাধ্যমে।[৭৬] অনেক সময় এ ধরনের অনুষ্ঠানের যৌন অনুষঙ্গ াদিকে আবৃত করার জন্যও সঙ্কেতভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করা হতো। পরবর্তীকালে দেহ ও দেহাঙ্গ বিষয়ক আলোচনা এবং দেহমিলনের বর্ণনা অশ্লীল বিবেচিত হওয়ায় এগুলিকে আবৃত করার পদ্ধতি ভাষায় গড়ে ওঠে। বাউল গানে রূপ, রস, রতি, মাটি, বাণ, গুণ, লতা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে এ ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল। উপরন্তু বাউল গান সাধুসভার অনুষ্ঠানের (সাধুসেবা) সঙ্গে জড়িত। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক এখানে থাকতে পারে।[৭৭]

যখন কোন বাস্তব কারণে বক্তা সরাসরি মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না, তখন সে অপ্রত্যক্ষ ভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক সময় সমাজ-রাষ্ট্রক্ষমতার দুর্বলতর শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ ও সঙ্কেতভাষণের প্রবণতা দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েলী ভাষায় (ক) সুভাষণ (খ) বিপরীত ভাষণ (চাল বাড়ন্ত) (গ) নিন্দাবাচক শব্দ পরিহার (pejorative) (ঘ) সম্বোধন দিয়ে কথা বলা[৭৮] প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য নিম্নবর্গের বাউল-ভাষায় পাই। বাউলের সাধনার লক্ষ্য পুরুষের নারীভাব অর্জন। এ মানসিকতা তাদের ভাষাভঙ্গীর পশ্চাদ্‌ভূমি রচনা করেছে।

যে সমাজে, দুর্বল, নিজস্ব সব কিছুকে হারাবার ভয়ে থাকে এবং আক্রান্ত হয়, তারা গোপনীয়তা সৃষ্টি করে সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। বিশেষত বহিরাগত সংখ্যাগুরুর প্রবল (বৈদিক/শাস্ত্রীয়) সংস্কৃতির আক্রমণের ভয় (লোকভয়, বেদভয়, শাস্ত্রভয়) এবং স্বাতন্ত্র্যলোপের সম্ভাবনা বাউল গানের ভাষাভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষার মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে এর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। এ ভাষার অর্থভেদের জন্য গুরুদের দ্বারস্থ হতে হয় পণ্ডিতদেরও। গুহ্যভাষণে স্বজাতীয় সাধককে চিনে নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়।[৭৯] যুগলসাধক বৈষ্ণবদের নামপত্রে এ ধরনের সঙ্কেত থাকে। এবং এ সঙ্কেত অনুসরণেই সমমতের সাধককে চিহ্নিত করা যায়। এবং এইভাবেই বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধ করে মতটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এরই মধ্যে মতটিকে ঈষৎ আভাসিত করে প্রকাশ করে প্রচারও চালাতে হয়। ফলত দ্বি বা একাধিক অর্থ নিষ্কাশনের সুযোগ রেখে এক বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যভাষা হিন্দু ও ইসলামী লৌকিক সংখ্যালঘু মতবাদীরা গড়ে তুলেছিলেন। উচ্চবর্গের বস্তুজ্ঞাপক শব্দাদির অর্থান্তর ঘটিয়ে নূতন শব্দ সঙ্কেত সৃষ্টি করে, শব্দার্থ, বাক্যবন্ধে ইঙ্গিতাত্মক এক ভাষা চর্যাপদের কাল থেকে বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছিল। সামাজিক দ্বন্দ্বের জটিল রেখায় চিহ্নিত এ কাব্যভাষার পূর্ণ কর্তৃত্ব, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যারা ক্ষমতাহীন ও নিঃস্ব তাদের হাতে। উচ্চবর্গের পণ্ডিতেরা এখানে অসহায়। সাধকদের মধ্যে প্রবাদ আছে : সাধুর হাটে পাণ্ডিত্য অচল।[৮০]

উচ্চবর্গের সমাজ-নিয়ন্ত্রকগণ ভাষা ও ব্যাকরণ, অভিধানের মাধ্যমে মানুষের আবেগ-প্রকাশকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চান। শব্দার্থকে তারা নির্দিষ্ট করে দেন; বাক্‌রীতিকে করেন অনড়। বাউলগানের ভাষায় নিম্নবর্গের মানুষ নিজেদের ব্যবহারের জন্য বহু নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। প্রচলিত শব্দের উচ্চবর্গ নির্দিষ্ট অর্থকে পরিত্যাগ করে ভিন্ন অর্থ আরোপ করেছেন শব্দে। নিজস্ব গ্রাম্য শব্দ ও উচ্চারণরীতিকে ব্যবহার করেছেন তারা।

এইভাবেই ভাষা ও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে শিষ্টাদর্শ লঙ্ঘন করে নতুন এক কাব্যভাষা বাউল মহাজনেরা গড়ে তুলেছেন। প্রচলিত শব্দ থেকে নিষ্কাশন করেছেন ভিন্ন অর্থ। সব মিলিয়ে বাউলগানের যে ভাষা, তার কর্তৃত্ব সাধকদের হাতে। এ ভাষার বেড়া দিয়ে তারা অনধিকারীর অনুপ্রবেশ রোধ করেছেন; মতবাদকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেছেন; উপরন্তু এ ভাষার শিল্পচাতুর্যে তারা আকর্ষণ করেছেন শিষ্ট মানুষদের।

লামা অনাগরিক গোবিন্দ সিদ্ধাচার্যদের ভাষা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন; তা বাউলগানের ভাষা প্রসঙ্গেও স্মরণীয় : "In which very often the highest was clothed in the form of lowest, the most sacred in the form of ordinary, the transcendent in the form of most earthly, and the deepest knowledge in the form of most grotesque paradoxes. It was not only a language for initiated, but a kind of shock therapy against the over intellectualization of the religious and the physical life of these times. They revolt against the dogmatism of a priviledged priestly class."[৮১]

লালনের কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য হলো :

প্রথমত, লালন প্রাত্যহিক জীবনের চিত্রকল্পগুলিকেই উল্টাভাষণে ব্যবহার করার ফলে সেগুলি বিপ্রতীপতায় অপরিচিত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে।

দ্বিতীয়, লালনের শব্দ ব্যবহার সময়ে-সময়ে : "Language in which words are on purpose semantically polyvalent."[৮২]

তৃতীয়ত, দীক্ষা ও তৎপরবর্তী গুপ্ত সাধনা এবং ঐতিহ্যবাহিত গুরুমুখী জ্ঞান থেকে যে রূপক-প্রতীক, মিথ, ইতিহাসবোধ জন্মায়, তা সাধারণের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন। লালনের কাব্যভাষায় 'গুপ্ত দেশের' অভিজ্ঞান ভাষারূপ লাভ করেছে। যেমন জঠরে প্রতিজ্ঞা, চণ্ডীচাঁদ, শিব, কৃষ্ণের প্রেমসাধনার ইতিহাস; কৃষ্ণের সমস্যা এবং গৌরাঙ্গ তত্ত্ব। ময়ূর বা চাতক সম্পর্কে ধারণা প্রভৃতি।

চতুর্থ, লালনের সাধনায় দেহমিলন ও রসাদির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বত্র সঙ্কেতে ও আবৃত ভাষায় প্রকাশিত।

পঞ্চমত, উচ্চবর্গের সংস্কৃতি ও ভাষারীতি, ব্যাকরণের শৃঙ্খলাকে অগ্রাহ্য করে লালন স্থানীয় লোকভাষাকে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু লোকসমাজ থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন। তাঁর সাধনা ও জীবনযাপন বিশিষ্ট। দৈনন্দিন সারল্যের সঙ্গে জটিলতা এখানে মিশ্রিত। ভাষা ও কাব্যভঙ্গীতে এই জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, সামাজিক বিশিষ্ট অবস্থান স্বতই প্রতিফলিত হয়েছে। শিষ্ট বা লৌকিক বাক্‌রীতি থেকে পৃথক "it was a private or group diction"[৮৩] লালন একে সঙ্গতভাবেই 'সাদ (সাধু) ভাষা' বলেছেন।[৮৪]

ষষ্ঠত, ভাষা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু শব্দসহায়ে মনোভাব গোপন করা যায়, 'ছল' ব্যবহার করে উদ্দেশ্যকে আবৃত করে ভ্রান্ত অর্থ আভাসিত করা যায়। নিজের গোষ্ঠীতে এ সমাজ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। কিন্তু বহিরাগতদের ভাষা দ্বারা ভ্রান্ত অর্থবোধের দিকে চালিত করার এক সচেতন উদ্দেশ্য লালনের কাব্যভাষায় মিশে থাকে।

ডিমক, The place of Hidden moon-এর ভূমিকায় এ ভাষায় সচেতনভাবেই

বহিরাগতদের বিরুদ্ধে অন্তরাল সৃষ্টির আলোচনা করেছেন। সচ্চিদানন্দ, সাধনপ্রদীপ গ্রন্থে (পৃ. ৭২) অনধিকারী ব্যক্তির বোধাতীত রাখার সূত্রে এ সঙ্কেত ব্যবহারের ঐতিহ্য নিরূপণ করেছেন—

'সঙ্কেতার্থং শিবপ্রোক্তং কথং জ্ঞাস্যন্তি সূরয়ঃ।'

বাউল পদাবলী গীতসাহিত্য হলেও এখানে কথা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[৮৫] বাউল মহাজন তাদের প্রমাণিত বর্তমান সাধনাকে, সাধনপদ্ধতির ভাবনাগুলি শব্দাশ্রয়ে প্রকাশ করেন। 'আপ্ত' বা রস (দেহ) সাধনায় সিদ্ধদের বাক্যই 'শব্দ'; ন্যায়-দার্শনিক গোতমের এ সূত্রানুসারেই লালনপন্থীগণ তাদের গানকে শব্দ-গান বলেন।[৮৬] প্রচলিত সমাজ ও মূল্যবোধ এখানে উল্টে যায়। এ দেশ আলাদা। শরীয়ত এবং বৈদিকতার প্রায় বিপরীতে সাধকেরা সত্যকে আবিষ্কার করেন।[৮৭] প্রচলিত জীবন ও মূল্যবোধের বৈপরীত্য থেকে অনিবার্যভাবে জন্ম নেয় বাউল গানের বিরোধাভাস, উল্টা ভাষাভঙ্গী (inversion)। ব্যঞ্জনা, বক্রোক্তি, ব্যঙ্গ এবং অভিপ্রায় নির্ণয় করে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গ্রহণ করতে হয়। বিপর্যস্ত ক্রম, ব্যাকরণ ও চিন্তার হেরফের এখানে সচেতনভাবে সৃষ্টি করা হয়। লালন মন্তব্য করেছেন যে 'পাগ্লা ছলে' এ ভাষায় বহু কিছু বলা হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট এ অসংলগ্নতাহেতু সাধারণের পক্ষে এ ভাষা বোঝা কঠিন। তিনি বিশেষত্বপূর্ণ এ ধরনের সামাজিক ভাষার নাম দিয়েছেন 'সাধুভাষা' (সাদ ভাষা) অর্থাৎ সাধুগোষ্ঠীর এক ধরনের উপভাষা এটি (পদ ১০২)। এ ভাষাটি সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য না হবার কারণ হিসাবে লালন তুলে ধরেছেন :

(১) ইশারায় শাস্ত্রে যে সমস্ত কথা আছে, সেগুলি এখানে তুলে ধরা হয়। এ ভাষাটি স্পষ্ট বস্তুনির্দেশক নয়—বরং ইশারা এবং ইঙ্গিতপূর্ণ (পদ ১৯২, ২৮৪)।

(২) সাধারণ সামাজিক মানুষ লক্ষণা, ব্যঞ্জনার অন্তর্নিহিত মুখ্যবস্তু নির্ণয় করতে পারে না। আবার বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রগ্রন্থের লক্ষণা অর্থটিকে সাধারণ্যে মুখ্য হিসাবে গ্রহণ করে।[৮৮] এ বিষয়ে শব্দার্থ গ্রহণপদ্ধতিতে সাধুদের সঙ্গে সাধারণ সামাজিক ভাষা-ব্যবহারকারীদের পার্থক্য আছে।

(৩) ব্যক্তির বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক, আর্থ-সাংস্কৃতিক পার্থক্যহেতু সামাজিক মানুষেরা কোরাণের/হাদীসের মতো গ্রন্থাদি পড়ে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। 'বুজির দ্বারে' বোধের তারতম্যে অনুভবে এবং ভাষাপ্রকাশে ঘটে পার্থক্য। বিশেষ সাধকগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাষাগত অর্থগ্রহণে ও ব্যাখ্যায় সাধারণ সামাজিকদের গুরুতর পার্থক্য আছে (পদ ৯৭)। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অসম সাংস্কৃতিক বিন্যাস থেকেই এ পার্থক্য অনিবার্য হয়ে ওঠে।

(৪) 'ছল' ব্যবহার করে সামাজিকদের এ ভাষা বোঝার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে, এ মতবাদের গুপ্ত সত্য তাদের জানতে দেয়া হয় না (পদ ১০২)। ধাঁধা (ফাক) এবং তামাশার ঢং ব্যবহৃত হয়ে এ ভাষাটি হয় কুটিল (১৭৫ নং পদ)।

সুতরাং সাধুগুরুর কাছ থেকে সাধনতত্ত্বের ভেদ জেনেই একমাত্র এ ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ জানা যায়। বহু পদে লালন এ ভাষার তাৎপর্যকে গুরুগম্য বলেছেন। অর্থাৎ এ ভাষাটির ব্যবহারে ও ব্যাখ্যায় গুরুদের পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। গুরুদের সাধনস্তর এবং বোধগম্যতার পার্থক্যহেতু এ গানের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা ঘটতে পারে। এমন ইঙ্গিতও লালন দিয়েছেন (পদ ৯৭)। শাস্ত্রানুসারী বৈদিক/শরীয়তী ব্যাখ্যা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু

মতবাদীদের সাধনাটির প্রতি প্রবল উষ্মা ও আক্রমণের সম্ভাবনায় এ ভাষাটি প্রচ্ছন্নতার আশ্রয় নিয়েছে। গুরুদের কর্তৃত্বরক্ষার পদ্ধতি এ ভাষা। কিছু সাধনা আছে যেগুলি অনাবৃত করে বললে কুৎসিত শোনায়, আবরণে শোভন হয়—এ ত্রিবিধ উদ্দেশ্যে রম্য বক্রভাষারীতি ব্যবহারের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথাও লালনের গান থেকে জানা যায়।

সাধনপন্থা এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একশ্রেণীর ভাষাবিদ ও গবেষক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বাউল পদগুলিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনের ব্যাখ্যাগুলি তাঁদের মনের মাধুরী মিশিয়ে করা। মণীন্দ্রমোহন বসু চণ্ডীদাসাদির পদ; রস ও সহজ সাধনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে আভিপ্রায়িক অর্থ নেই। গবেষকের পাণ্ডিত্য এবং উচ্চবর্গের আদর্শ এতে আরোপিত হয়েছে। বাউল গানের কোন লিখিত টীকাগ্রন্থ নেই। জীবিত সাধকদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা সংগ্রহ করেননি কেউ। আর সাধকদের ব্যাখ্যায়ও যে থাকতে পারে মতভেদ—এ আভাস জানাননি কেউ। তবে, বহু সাধক, এ গানের মূল অভিপ্রায় আচ্ছাদিত করে সমাজ-সমর্থিত ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা নিজেদের সামাজিক অস্তিত্বকে এইভাবে আইনসঙ্গত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন [legitimization]।[৮৯]

বাউল সাধনা বা মতবাদকে লিখিত রূপ দেওয়াতে সাধকদের ঘোরতর আপত্তি থাকে। সাধকদের ঘনিষ্ঠ বসন্তকুমার পাল লালন-জীবনীতে গানের ব্যাখ্যায় শিষ্ট রুচিকে ভাববাদী ব্যাখ্যা দিয়ে তৃপ্ত করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে এ ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, পণ্ডিত ও গবেষকদের নিজস্ব মতবাদ ও ব্যাখ্যা বাউল গানে আরোপিত হবার ফলে এই সাধন পন্থা-সম্পৃক্ত তত্ত্বাদি অতিপ্রাকৃত, অবোধ্য, 'মিস্টিক' হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে।

লালন গীতিসংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলিতে, যেমন আব্দুল হাই, আবু তালিব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লালনগীতিকা প্রভৃতিতে গ্রন্থশেষে গানের শব্দার্থ দেওয়া আছে। এগুলি মূল্যবান। কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত শব্দার্থ অন্য শব্দের সহযোগে স্পষ্ট হয় এবং অর্থান্তর লাভ করে—এটি সমস্ত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু বাউল গানে দেশ, কাল, পাত্র এবং সাধনস্তরের সঙ্গে শব্দ ও রূপক চিত্রকল্পের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। তাই অনড় অর্থে বাউল গানের শব্দকে গ্রহণ করলে ঘটে অর্থবোধে বিপত্তি। সুধীর চক্রবর্তী বাউল গানের সঙ্কেত ব্যাখ্যায় পদ্মকে 'উর্বরতার প্রতীক' গণ্য করেছেন।[৯০] বৌদ্ধ অনুষঙ্গে পদ্ম জ্ঞানের প্রতীক; শুদ্ধতার প্রতীক। আলাওল, দৌলত কাজীর রচনায় সূর্য-পদ্ম যুগলের প্রতীক। লালনের গানে (ক) দেহের চক্র/লতিফাকে ষড়পদ্ম বলা হয়েছে (খ) গুরুর চরণ, মুখ, বাক্য পবিত্র জন্য পদ্ম (গ) পদ্মাকৃতি দেহাঙ্গ, করনখ, পদনখগুলি পদ্ম (ঘ) নারীর দেহাঙ্গে পদ্ম বিকশিত হয়; তার নানা রং (ঙ) পদ্ম-অলি, পদ্ম-সূর্য যুগলের প্রতীক।

এছাড়া নানা অর্থে পদ্ম শব্দের ব্যবহার আছে।

সৃষ্টি, প্রজনন অর্থাৎ উর্বরতা বাউলসাধনার লক্ষ্য নয়; সন্তানসৃষ্টি এ মতে জীবাচার; সৃষ্টিরোধই সাধনা সাধকদের। সুতরাং পদ্মকে উর্বরতার প্রতীক ধরলে গান বুঝতে সাহায্য করে না। চাঁদ, মানুষ প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন বা একই পদে নানা অর্থে লালন ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থে দেয়া অর্থ তালিকা কত অনর্থ ঘটাতে পারে তার উদাহরণ সনৎ মিত্রের গ্রন্থশেষে দেওয়া শব্দার্থ তালিকা।[৯১]

কুপেচে—কুপথে (হওয়া উচিত কু প্যাঁচে), করঙ্গে—করছে (সাধকদের ব্যবহৃত ফলের খোলা দ্বারা নির্মিত পাত্র হওয়া উচিত); নিস্বদে—নিঃস্বাদে (হবে—নিঃশব্দে), রঙ্গে—রাখো (রং/বা মজা হবে), শার্জ্জনে—সাযুজ্যে [হবে সর্জনে বা সৃজনে], সন্নিতে—সম্বিতে [হবে—শোণিতে, শনিতে/শুনিতে], এ ধরনের অর্থপ্রদানের উৎস কোন সাধক বা অভিধান নয়। গ্রন্থ কেনা, পাঠ করার সম্ভাবনা দরিদ্র বাউল-সাধকদের খুব কম। আর প্রতিবাদ করার সামাজিক ক্ষমতাও তাদের নেই। ফলত যে কোন অর্থব্যাখ্যা বাউল গানের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়।

এই ধরনের আরোপিত উদ্ভট ব্যাখ্যার ফলে বাউল গান অবোধ্য এবং রহস্যময় 'মিস্টিক' রচনা বলে সাধারণ্যে পরিচিত হয়েছে। নিজেদের অর্থ নিষ্কাশনের সীমাবদ্ধতাকে, অক্ষমতাকে আবৃত করার জন্য গবেষকগণ এ ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করে বাউল গানের নিজস্ব অর্থব্যাখ্যার অপূর্ণতাকে যুক্তিসিদ্ধ করেছেন। তাঁরা পারিভাষিক শব্দাবলীর অর্থ না জেনে, বিরোধাভাস-প্রতীকগুলি না হৃদয়ঙ্গম করে, উপমা রূপক অতিশয়োক্তির উপমেয় নির্ণয় না করে বহু বাউলগানকে উল্টাকথা, বাজে কথা (nonsense) হিসাবে চিহ্নিত করে, ব্যাখ্যার দায় এড়িয়েছেন। ফলে বাউল গান 'বোবা-কালা' সংবাদ,[১২] অবোধ্য এবং অজ্ঞেয় বলে প্রতিভাত হয়েছে। ইহবাদী, বস্তুবাদী, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়নির্ভর সাধনপন্থাটি অজ্ঞেয়, রহস্যময় বলে প্রচারিত হয়েছে। উনিশ শতকে আমাদের সাহিত্যে বা রেনেসাঁপর্বে য়ুরোপে প্রাচীন মিথ ও পুরাকাহিনীগুলির ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা হয়েছিল। বাউলগানের উপর এধরনের বহু ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা আরোপিত হয়ে, উচ্চবর্গের মতবাদ ও দর্শনের রঙে রঞ্জিত হয়েছে। কোরাণ, পুরাণ, বেদ, উপনিষদের চিন্তার উত্তরাধিকার আবিষ্কৃত হয়েছে এ গানে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের ব্যাখ্যার সুযোগ থাকলেও, এর ফলে বাউল গানের ব্যাখ্যা তার মূলভিত্তি অর্থাৎ সাধন প্রসঙ্গ থেকে সরে গেছে। এবং অর্থবোধ স্পষ্ট হয়নি। আংশিকভাবে, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিশেষ সাধন প্রসঙ্গ বাউল গানের সঙ্গে যুক্ত করে আলোচনা করেছেন, একথা অনস্বীকার্য।

প্রবোধ বাগচী, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন প্রমুখ গবেষক চর্যাগীতি প্রণেতা সিদ্ধা-চার্যদের উত্তরপুরুষ হিসাবে বাউলদের গ্রহণ করেছেন। চর্যার সাধনা ও ভাষারীতির কালিক যুগোচিত বিবর্তন কিন্তু তারা আলোচনা করেননি।

বাংলাভাষী শিষ্টজনদের বাউল চর্চার প্রথম যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে বাউল গান বা সাধনাকে কোথাও রহস্যময় বলেননি। তাঁর গ্রন্থে কয়েকটি বাউলগান উদ্ধৃত হয়েছে। এগুলির ব্যাখ্যা অশ্লীল হয়ে যাওয়ায় তিনি এগুলি ব্যাখ্যা করেননি। নগেন্দ্র বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে[১৩] বলা হয়েছে যে বাউল সঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতি সাধনতত্ত্ব সংক্রান্ত অনেকানেক শব্দ থাকায়, এজন্য অর্থবোধ হয় না। 'যাহা বুঝা যায়, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে নিতান্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে।' সুকুমার সেন চর্যাপদে সচেতনভাবে বাহ্য ও আভ্যন্তর অর্থসৃষ্টির শিল্পকৌশলের উল্লেখ করেছেন। এই আভ্যন্তর অর্থ সকলের কাছে স্পষ্ট নয় এবং তা সাধনপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত। এ ধরনের দু'একটি হেবজ্রতন্ত্রের প্রতীক আলোচনা করে চারচন্দ্রভেদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করে, তিনি মূলত বাহ্য অর্থ বিচারে মনযোগ দিয়েছেন, কারণ, "যেটুকু বোঝা যায় সেটুকু খুলিয়া বলাও সর্বক্ষেত্রে শোভন ও নিরাপদ নহে।"[১৪]

মির্চা এলিয়াদ[৯৫] এবং অঘেদানন্দ ভারতী সন্ধ্যা-ভাষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যৌনজীবন এবং দেহসংক্রান্ত যে কোন বিষয় বাংলার শিষ্ট ও অন্য দেশের সামাজিকদের কাছে অশ্লীল বলে প্রতিভাত হয়। সুতরাং চর্যা বা বাউলপন্থের সাধনা উচ্চবর্গের কাছে অশ্লীল— কুৎসিত। কিন্তু সাধকদের কাছে দেহ মন্দির, দেহমিলন পূজা/নামাজ; দৈহিক রসাদি অপরূপ এবং মূল্যবান। যারা এ মতে বিশ্বাস করেন তাদের কাছে এ সাধনা শ্লীল এবং সত্য। এ বিষয়ে সুমন্ত ব্যানার্জী চমৎকার এক আলোচনা করেছেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকার (১৩ই জৈষ্ঠ্য, ১২৯২) এক নিবন্ধকার, বাঙালির পূর্ব-ঐতিহ্যে, শ্লীল/অশ্লীলতার ধারণা নিয়ে আলোচনায় মন্তব্য করেছেন যে, এখন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির যে সমস্ত পদে আমরা অশ্লীলতা আবিষ্কার করছি—প্রেমের কবিতার দেহ ও দৈহিক ক্রিয়াকলাপে অস্বস্তি বোধ করি—পূর্বে এগুলিতে সাধারণ মানুষ "could not perceive any obscenity"[৯৬] চর্যাপদ বা বাউল গান ছন্দে, অলঙ্কারে কোনভাবেই অশ্লীল নয়, আর অন্তর্নিহিত ভাবটি অশ্লীল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বাউল গানে সাধারণ অর্থ ও গভীর অর্থের সমান্তরাল উপস্থিতির কথা বলেছেন "গভীর অর্থটির সহিত বাউল সম্প্রদায়ের গোপনীয় সাধনা পদ্ধতিব যোগাযোগ আছে বলিয়া উহা সাধারণ্যের বোধগম্য নহে।"[৯৭] সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাউল গানে মিস্টিকতা অস্বীকার করে মন্তব্য করেছেন, "দৃষ্টিবহির্ভূত সুদূরলোকের কাল্পনিকতার কুহেলিকা তার বর্ণনাকে আচ্ছন্ন করেনি। প্রত্যক্ষ বর্তমান নিয়ে বাউলের আলোচনা।"[৯৮]

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বাউল গানের দ্বি-অর্থের মধ্যে বাইরের অর্থকে ক্ষেত্রবিশেষে বোধ্য বলেছেন। কিন্তু নিহিতার্থ কেবল বাউলপন্থদের কাছে স্পষ্ট। "অর্ধ্বচন্দ্র অর্ধ্বভাস্করের তত্ত্ব সঙ্কেতের আড়ালে প্রকাশিত হয় বাউল গানে।[৯৯]

হিন্দু ও মুসলমান সমাজভুক্ত সাধকেরা মনে করেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে গুপ্ত সাধনা ও ধর্মাচার (যা সর্বজন সহজে গ্রহণ করতে পারে/বিশেষ অধিকারীর জন্য) প্রচলিত আছে। সামাজিকদের শ্রেণী, বোধের স্তরানুযায়ী স্থূল, সূক্ষ্ম সাধনা তাদের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। বেদ, পুরাণ, কোরাণ প্রভৃতি লিখিত শাস্ত্রে প্রকাশ্য মতবাদটি রূপ পেয়েছে। গুপ্ত সাধনা গুরু-পরম্পরায় বাহিত হয়; এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে তা দেয়া হয়। সাধকদের মধ্যেও নানা শ্রেণী ও স্তর আছে। এ মতবাদীগণ নিজেদের বিশেষ এক গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করেন। গুরুর কাছ থেকে যারা মতবাদ গ্রহণ করেছেন, তারা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত। আলোচ্য ভাষাটি তাদের বিশেষ ভাষা। এসমস্ত পরিবার দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত প্রথা, মূল্যবোধ, শব্দ বব্যহার করে, তা সামাজিকদের থেকে পৃথক। (যেমন খাওয়াকে বলা হয় 'সেবা')। সামাজিকগণ এ সাধনা সহ্য করতে পারবেন না। কারণ এখানে অধিকাংশ মূল্যবোধ প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। উপরন্তু এদের গুপ্ত সাধনার একাংশ (১) অতি ঘৃণিত যেমন চারচন্দ্রভেদ; (২) কিছু শাস্ত্রনিন্দিত যেমন রজঃসাধনা ও রজঃকালীন দেহমিলন [কোরাণ ও মনুসংহিতায় যুগপৎ নিন্দিত]। (৩) কিছু সাধনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ—যেমন আস্যমৈথুন প্রভৃতি।[১০০]

সমাজনিন্দিত এ সাধনাগুলিকে অনিবার্য কারণে গোপন করে এক গুপ্ত ভাষা এ সমাজকে গড়তে হয়েছে। বহু পূর্ব থেকেই তন্ত্র এই গোপনীয়তার তথ্য জানিয়েছে। এই গোপনীয়তার পশ্চাদ্‌পটে আছে সমাজপীড়ন ও আক্রমণের সম্ভাবনা। স্তরে স্তরে, পরীক্ষা

করে এবং সাধনায় যুক্ত করে তত্ত্ব দেয়া হয় এখানে শিষ্যদের। ভাষার মধ্যেও এই প্রতিরোধের ব্যূহ। এই গোপনীয়তাকে এক প্রাকৃতিক সত্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, প্রকৃতিতে তাই গোপন। বিশেষ জ্ঞানে তা জানতে হয়। হজরত আলীর ভাষায় :

গোপন রয়েছে খোদা তারে চিনি নি।
আপে গোপন রয়েছে খোদা সাই কাদের গণি।।

১. আরস গোপন কুরস গোপন লহু কালাম সবই গোপন
দেহেতে মক্কা গোপন সব জানাজানি
২. কাম গোপন প্রেম গোপন লীলানিত্য সবই গোপন
আরশে আল্লা গোপন নীরের নিশানি
৩. জলেতে মীন গোপন ঝিনুকে মুক্তা গোপন
ফুলেতে গন্ধ গোপন আপে রব্বানী।।
৪. আদমে আহাদ গোপন মিমেতে নুর গোপন
কোরাণে কালমা গোপন আপে গোপনী
৫. নিজেতে নিজে গোপন দুগ্ধেতে ননী গোপন
দেলেতে মাটি গোপন কোরাণের বাণী।।
৬. হায়াত গোপন মউত গোপন রেজাক দৌলত সবই গোপন
নামাজে মারফুত গোপন তাই জান নি।।
৭. কোরাণ পুরাণ গোপন ষাট হাজার কালমা গোপন
হজরত আলীর দেহ গোপন আপে কামিনী।।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

জ্ঞানসাগরে আলী রাজা বলেছেন, "জেই বস্তু গোপন, মহিমা তার বড়"।[১০১]

আর্থ-সাংস্কৃতিক ভিন্নতায় এবং সাধনপন্থার কর্মের ফলে সামাজিকদের বোধ ও বুদ্ধির পার্থক্যকে প্রাকৃতিক ও অনিবার্য বলে এ সমাজ স্বীকার করে। সাধারণের সমান্তরালে থাকেন মুষ্টিমেয় অসাধারণ সাধক—এই গুপ্ত সত্যে কেবলমাত্র তাদেরই অধিকার। সমাজের উচ্চবর্গের বিভাজন-নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে এ সমাজ নূতন আরেক বৈষম্যের জন্ম দেয়—এদের ভাবাদর্শে সে চিহ্ন আছে।[১০২] গুপ্ত সাধনা ও ভাষায় চিরকালই মুষ্টিমেয়র অধিকার। সাধারণের কাছ থেকে এ তত্ত্বকে ভাষার অন্তরালে আচ্ছাদিত করা হয়। শব্দের অভিপ্রায়, সাধনার মূল সত্যে অধিকার নেই অদীক্ষিত সাধারণের। সুতরাং বাউল গানের ভাষায় একদিকে গণতান্ত্রিক সর্বজনীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে সর্বজনের বোধব্য আর-এক অর্থ তারা আভাসিত করেন। এটি তাদের পক্ষে গৌণ। নবী হজরত মহাম্মদ এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন বলে লালনের ধারণা (পদ ২৮৭)। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানসিকতা, বোধ, বুদ্ধি অনুযায়ী তিনি চার তরিক প্রবর্তন করেছিলেন। এই বোধ, বুদ্ধি, অনুভবক্ষমতার পার্থক্য এবং সাংস্কৃতিক দিকে সাধকদের প্রাগ্রসরতা লালন মেনে নিয়েছেন অনিবার্য বলে। বেদকে অস্বীকার করলেও, লালন, কোরাণ অস্বীকার করেননি। কোরাণে তাঁর সাধ্য তত্ত্ব 'এসারায় লেখা' এবং এসারায় বিচার আছে (১৯২ পদ)। কোরাণের হয় নানা অর্থ (৯৭ পদ)। 'লাম' শব্দটির

দ্বি-অর্থ; একটি সরায় প্রচারিত, অন্যটি মারুফতে গুপ্ত (২৮৪)। গুপ্ত ভেদের কথা বলতে লালনের মর্মে ব্যথা লাগে; কিন্তু জীবের নিস্তারের জন্য এ তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে (২৩২ পদ)।

প্রাচীন সুফীরা কোরাণের কিছু আয়েতের নিজস্ব ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাদের মতবাদ প্রচার করতেন। এই সুফীদের পারিভাষিক বহু শব্দ লালনের গানে আছে। উদাহরণস্বরূপ ২৫৭ নং পদটি স্মরণ করা যায়। অজুদ, ছিনা, কালমা ছাবেদ, ২৪ হরফ, বন্দেগী, নক্সাবন্দী, আলেপ, হে, মিম, দাল, আলেক, ফেরেস্তা, আনল হক প্রভৃতি পরিভাষা আমাদের অপরিচিত। ইসলামীয় পরিমণ্ডলে পাঁচ জন ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের কথা বর্ণিত আছে। সুফীরা কী অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করতেন তা জানি না। প্রয়াত বাউলগুরু বদি শার একটি খাতায় পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে পাঁচ ফেরেস্তা বলা হয়েছে। সুফী আবদুল গনি, সুখশান্তিদর্শন গ্রন্থে ইসলামের পাঁচ ফেরেস্তাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে বিন্যস্ত করেছেন।[১০৩] ৮ নং পদে পাই দায়েমী নামাজ, মাশুক রূপ, আসক বাতি, ফরজ, জাত, সেফাত প্রভৃতি শব্দ। আসক-মাসক সুফীদের ব্যবহৃত শব্দ। প্রচলিত অর্থ প্রেমিকা-প্রেমাস্পদ। সাধকেরা মনে করেন যে আকর্ষিত হয় (নারী বা পুরুষ) সে প্রেমিকা, আর যিনি আকর্ষণ করেন তিনি প্রেমাস্পদ (নারী বা পুরুষ)। অর্থাৎ নুর, বর্জোগ, আল্লা-আদম-মহাম্মদ, নবী, খোদা প্রভৃতি সমস্ত শব্দই লালনের গানে গুপ্ত ব্যাখ্যায় অর্থান্তরিত হয়েছে। এই অর্থান্তর সুফীতত্ত্বসম্মত কিনা তা বলা কঠিন।

কিছু আরবী-ফারসী শব্দ বঙ্গের ইসলামী সমাজ ব্যবহার করেন। এগুলি সাধারণ পাঠকদের অপরিচিত। যেমন তালের সুমার (তাল গণনা, ৪৬ পদ), নেঘাবান দু'জন (১৪৩), সরপোষ (৫ পদ, খাবারের ঢাকনি)।

কোরাণের আয়েতের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন লালন, যেমন কুল্লে সাই মোহিত, আলাকুল্লে সাই কাদিরো (১০ পদ), সেজদার (প্রণাম) আলোচনায় 'সোগোল রাবেতা' স্মরণ (২৩৮ পদ)।

আহাদ এবং আহাম্মদ নামের আরবী বানান এবং পার্থক্য একাধিক পদে আলোচিত হয়েছে।[১০৪]

ইসলামী ধর্মীয় অনুষঙ্গ মিশে থাকে লালনের গানে।

এ অনুষঙ্গ না-জানা থাকলে, বোঝা যায় না বিষয়টি। যেমন ৩৩৮ নং পদে শিশু কেন অন্ধ, বোবা, কালা হয়ে জন্মায়? তার তো 'গোণা খাতা' নেই। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না। প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মের হিসাব থাকে। তাই জন্মের পর, পাপের হিসাবের খাতা থাকে শিশুর। খাতায় হিসাব রাখার এ দৃষ্টান্তটি ইসলামী বিশ্বাসজাত। কিন্তু যার কর্ম শুরু হয়নি অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুর পাপ/পূণ্য শুরু হয়নি; তার নেই কোন 'খাতা'। সে কেন শাস্তি পায়? এ প্রশ্নের মাধ্যমে লালন, পিতার কর্মফল শুক্রবাহিত হয়ে কীভাবে সন্তানে বর্তায়, তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১০৫]

আব হায়াতের নদীর প্রসঙ্গ অর্থান্তরিত হয়েছে দেহে (২১৭)। মনসুর হাল্লাজের প্রসঙ্গ এবং তাঁর ঘোষিত 'আমিই আল্লা' আনাল হক তত্ত্বটি লালনেরও দর্শন। আমি আল্লা বলার অপরাধে হাল্লাজকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এ তত্ত্ব বেদান্তের সোঽহং তত্ত্ব নয়। কেননা বেদান্ত জগত এবং মানুষের দেহকে অলীক, নশ্বর, প্রতিভাস ঘোষণা করে।

মনসুর বা লালন দেহেই ব্রহ্মান্ড ও স্রষ্টাকে খোঁজেন। 'আমি' তত্ত্ব লালনের গানে ভিন্ন মাত্রায় বর্ণিত। বেদান্তের প্রতিবাদী এ তত্ত্ব। ইহবাদ এবং দেহীর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে এতে। 'আমি' সবার মূলে বক্তব্যটি লালনের এক বিশিষ্ট বক্তব্য।

১৭৫ নং পদে আলোচিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব। আল্লার নুরে নবী, নবীর নুরে সারা জাহান সৃষ্টি হয় ও হচ্ছে। কিন্তু নবী হজরত মহাম্মদ তো মারা গেছেন এবং মদিনায় তাঁর কবর আছে। কোরাণের বক্তব্য 'হায়াতুল মুরছালিন' নবী অমর। তিনি এখনো সৃষ্টি করছেন। নবীতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে অনেক পদে। ইসলামের প্রখ্যাত চরিত্র নুহু (নোয়া—বাইবেল বর্ণিত), নিজামুদ্দীন আউলিয়া, মনসুর হাল্লাজ প্রভৃতির নাম যখন লালন বর্ণনা করেন, তাঁদের কর্মকান্ডের অনুষঙ্গ অজানা থাকায় হিন্দু শ্রোতার কাছে এ গান যথেষ্ট সহজ মনে হয় না। ইসলামী তত্ত্বের মতভেদগুলি : নবুয়াত বা বিলায়েত, শরীয়ত মারফত, আজাজিলের শয়তান হওয়া ও আদম গঠন লালন বর্ণনা করেন। দুরূহ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন শ্রোতা বা পাঠককে : নবীর ছায়া নেই কেন; মে রাজে সাকার নবী নিরাকার আল্লায় মিলল কীভাবে?

বিশেষভাবে, লালনের কাকুবক্রোক্তিগুলি মিশ্রিত হয়েছে ইসলামী অনুষঙ্গের সঙ্গে—যেমন আদম অধর ধরার সুতো (২৬৯)। আদমকে গঠন করেছিল আজাজিল; তারপর স্বয়ং আল্লা আদমে মিশে যান। আদম সন্তান মানুষে আল্লা (সাঁই) আছেন। এই সাঁই মীনরূপে আবহায়াত নদীতে খেলা করেন, আদম দেহকে সুতো হিসাবে ব্যবহার করে সে মীন ধরা যায়। অন্যত্র শুনি : সে কলম আর কে ফিরায় (২৪০) বা নবীর কর সে মেনে চলে।—কর বা কলম দিয়ে লিখিত হয়েছে কোরাণ। হাকিমের আইনের মতো, কোরাণের নির্দেশই আইন— অভ্রান্ত এবং মান্য।

আরবী ফারসী শব্দকে তিরস্কার/অপ্রীতিকর বর্ণনায় ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ আঘাতের দায় এড়িয়েছেন লালন। ৮৭ নং পদে সাধারণ মৌলবীগণ এক ও অদ্বিতীয় আল্লার প্রতি বিশ্বাসকে ইসলাম বলে প্রচার করে। আল্লার একত্বে বিশ্বাসী খ্রিস্টান বা ইহুদিগণ ইসলাম-বিরোধী। নবী হজরত মহাম্মদকে যারা মান্য করেন তারাই মুসলমান। সুতরাং নবী এবং আল্লা এ দুজনকে মানতে হয় মুসলমানদের। এ সময়ে আহলে হাদীস মতবাদস্পৃষ্ট ওয়াহাবী আন্দোলনে নবীর গুরুত্ব কম ছিল। নবী না মেনে শুধু একেশ্বরবাদী যারা, তারা মওয়াহেদ অর্থাৎ একেশ্বরবাদী কাফের। আদি কাফেরগণ (কুফার নাগরিক) বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী এবং নবীর বিরোধী ছিলেন। আমাদের অপরিচিত, মওয়াহেদ শব্দটির অর্থ জানার পর চাবুকের মতো তা আঘাত করে একেশ্বরবাদীকে।

গুপ্ত চারচন্দ্রভেদের অভিপ্রায় আবৃত হয়েছে সুফী চার পেয়ালার সাধনাচ্ছলে ৩৬৯ নং পদে।

চারচন্দ্রভেদ নিয়ে সাধকসমাজের বিতর্ক এবং লালনের মতামত আলোচিত হয়েছে ২৪১ সংখ্যক পদে। পাটুলি ঘরের মুকুন্দস্রোতের সাধকেরা একচন্দ্র রজেঃর সাধনা করে। এদের কেউ কেউ রজেঃ চারচন্দ্র (গরল, সরল, নষ্ট, পূর্ণ) কল্পনা করেন। তন্ত্রাদির লিখিত শাস্ত্রে রজঃ ও বীজ এ দ্বিচন্দ্রের সাধনা প্রকাশ্যে বর্ণিত; অন্য দ্বিচন্দ্র গুপ্ত। পদটি মূল বর্ণনীয় বিষয় আবৃত করে বর্ণনা করার গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গীর নিদর্শন।

সুফী এবং আরবী ফারসী শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়ে লালন এগুলিকে মূল বক্তব্যপ্রকাশের

চমৎকার আবরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে বেসরা-সুফী ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। তৃতীয়ত তাঁর চারপাশের মানুষদের ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তত্ত্বালোচনার রীতিপদ্ধতির প্রতিফলন অনিবার্যভাবেই এ শব্দানুষঙ্গের মধ্যে ঘটেছে।

লালনের গানের অলঙ্কার, রূপক, প্রতীক, অভিপ্রায়গুলি এবং পারিভাষিক শব্দাবলী কোন না কোনভাবে ইহজগৎ, দেহ এবং দেহসাধনার সঙ্গে যুক্ত। গানের আভিপ্রায়িক অর্থ, রূপক প্রতীকের বর্ণনীয় প্রকৃত বিষয় দেহের অঙ্গ, অংশ, ক্রিয়া, কর্ম বা চরিত্রকে প্রকাশ করে। বাহ্য বস্তুকে বা ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে আকৃতি বা প্রকৃতির সাদৃশ্যে ভাণ্ডে বা দেহে নির্ণয় করা হয়েছে লালনের গানে। অর্থাৎ তাঁর গানের অভীষ্ট শব্দার্থ শেষ বিচারে স্পষ্ট বস্তুবাচক। লালন বলেছেন যে-লীলা ব্রহ্মাণ্ডে হয়, তা ভাণ্ডে নির্ণয় করা যায় (১৭ পদ)। ১৩১ নং পদে বহির্জাগতিক সত্যকে তিনি দেহে খুঁজতে বলেছেন। মক্কা, মদিনা, বৃন্দাবনের সন্ধান তিনি করতে বলেছেন দেহে (২১৫ পদ)। আকাশের চাঁদ নয়, দেহচন্দ্রকে সন্ধানের পরামর্শ তিনি দেন (১২৩ পদ)। ঘড়িকে মিলাতে বলেন দেহের সঙ্গে (১১৮ পদ)। ব্রহ্মাণ্ডে অনুসন্ধেয় বস্তু খুঁজে পাওয়া ভার, তাই লালনের মতে ঘর না বুঝে (দেহ) বর্হিজগতে অনুসন্ধেয় বস্তু খুঁজলে ঠকতে হবে (১৪৭ পদ)। অর্থাৎ লালনের সকল গান ইহ ও দেহকে কেন্দ্র করে; উপমেয় দেহ, উপমান বর্হিজগত।

সাম্প্রদায়িক সাধকেরা এই দৃষ্টে লালনের গানের অর্থ জানেন। লামা গোবিন্দ অনাগরিক বলেছেন যে যখন বলা হয় সাধক চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি বাম ও ডান নাকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আলো-আঁধারি, সঙ্কেত, অভিপ্রায় শেষ বিচারে কিন্তু স্পষ্ট বস্তুবাচক। ফুল, ত্রিবেণী, অধর, নিরাঞ্জন, মক্কা, সাঁতার, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রতি, সাই—ক্রিয়া বা বিশেষ্যপদ মাত্রেই দৈহিক-ঐহিক বস্তুবাচক' দৈহিক বস্তুসত্যের আবার ত্রিস্তর : (ক) বাহ্যিক স্থূল দেহ বা দেহতত্ত্ব—নাড়ি, হাড়, চক্র, পদ্মাদির বর্ণনা, (খ) সূক্ষ্ম দেহরস—রতি, রজঃবীজাদির বর্ণনা, (গ) এ থেকে জাত ভাব বা আবেগ-অনুভূতির বর্ণনা—এ ত্রিস্তরের পর্যায়ে রূপক-প্রতীকের শব্দার্থের অভিপ্রায় পাল্টে যায়। অর্থাৎ লালনের গানের বাহ্যিক প্রকৃতি পরিবেশ-সংক্রান্ত শব্দের বাহ্য অর্থ ছাড়াও দেহেও এর স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুর অর্থনির্ণয়ের সম্ভাবনা আছে। গবেষক রমাকান্ত চক্রবর্তী লালনের গানের পারিভাষিক এক শব্দ-তালিকা প্রণয়ন করেছেন।[১০৬] পরিভাষা না বলে তিনি এগুলিকে 'সাধন-সংক্রান্ত' শব্দ বলেছেন। লালনের গানের প্রায় সমস্ত শব্দই সাধন-সংক্রান্ত। তার মধ্যে বিশিষ্ট এক শ্রেণীর শব্দকে আমরা পারিভাষিক শব্দ হিসাবে গণ্য করতে পারি। এগুলি সাধনা ও আলোচ্য বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিশেষ অর্থবাহী শব্দ। এর মধ্যে প্রাক্তন সুফী, শৈব, নাথ, বৈষ্ণবদের বহু শব্দ অর্থান্তরিত হয়ে লালনের গানে গৃহীত হয়েছে। এ পরিভাষার অর্থও স্থান, কাল পাত্রানুযায়ী বদলে যায়। আর শুধু পরিভাষার অর্থ জানলেই অনধিকারী অসাধক লালনের গানের মর্ম বুঝবেন না। আলাদা স্কুলে এর পাঠ নিতে হয়।

লালনের ব্যবহৃত শব্দ ও পরিভাষা দেহস্থ বস্তুজ্ঞাপক; অলঙ্কার, প্রতীকও স্থূল দেহ বা রাগ-দেহের (সূক্ষ্ম দেহ—রসরতি) পরিচয় দেয়। ইহজীবনে বিশ্বাসী এবং প্রত্যক্ষমূল অভিজ্ঞতাবাদী লালনের অনুসন্ধান মূলত দেহকেন্দ্রিক। তাই ফুল, সাঁই, মনের মানুষ

প্রভৃতি সমস্ত কিছুই আভিপ্রায়িক অর্থে দেহস্থ সত্তা। শ্রোতা বা সাধকদের প্রতি লালন সবকিছুই দেহে নির্ণয় করার পুনঃপুনঃ আবেদন জানিয়েছেন।

বাউল গানের ভাষায় বিশিষ্ট দেহসাধনা-সংক্রান্ত বহু পারিভাষিক শব্দ আছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ বা অর্থান্তর এতে লক্ষ করা যায়। অনেকে এগুলি প্রচলিত আভিধানিক বা ভাববাদী অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেমন আলেক সাঁই শব্দটির উৎস নির্ণয় করা হয়েছে < অলক্ষ্য স্বামী; কিন্তু অলখ/আলেক শব্দের আরবী ভাষায় অর্থ শুক্র; সাঁই শব্দ নাথপন্থী বা সুফীগণ শাহান্‌শাহ=সর্বময় কর্তা অর্থেও ব্যবহার করেন। বাউল গানে ঐতিহাসিক ব্যক্তিনাম-গুলি চৈতন্য, মহাম্মদ, নবী, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিত্যানন্দ অর্থ নিত্য আনন্দে থাকেন যিনি/নিত্য আনন্দময় স্থান/নিত্যা (প্রকৃতি/নারী) দেহস্থ অঙ্গবিশেষ (নৌকার আকৃতি—যার সাহায্যে নিতাই নদী পার করে)। অদ্বৈত = দ্বৈত-জ্ঞানহীন ব্যক্তি /পুরুষাঙ্গ প্রভৃতি।

বাক্যে শব্দের অর্থ অন্যান্য শব্দযোগে পরিস্ফুট হয় এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী শব্দার্থ নির্ণয় করা বুদ্ধিদীপ্ত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য—এটি লালনের গানের ক্ষেত্রেও সত্য। এর আগে আরশীনগরের পড়শীর বর্ণনায় নাই শব্দের দ্বি-অর্থ ব্যবহারে এবং অর্থভেদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। নানা সূত্র থেকে আগত ভিন্ন শব্দের (convergent phonemic change) সমরূপ ব্যবহারগুলি, সভঙ্গ শ্লেষগুলি লালনের গানে বিপুল অর্থান্তর সূচিত করে। ৯ নং পদের ২য় কলিব শেষে পাই 'গুণারি জোনা' শব্দটি। এর নানা অর্থ : (ক) নৌকার গুণ টানে যে (স্রোতের বিরুদ্ধে যাবার সময়); (খ) গুণ বা মন্ত্রতন্ত্র জানা ব্যক্তি; (গ) গুণ বা মোহসৃষ্টির, অরি যিনি বা গুণ বা নারীর জননেন্দ্রিয়ের প্রতি যিনি অনাসক্ত; (ঘ) সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ এ ত্রিগুণের পরপারে, নির্বিকার নিষ্কামী সাধক প্রভৃতি।

জঠর জ্বালা যায় (১২৫)—খিদে/কাম; বা জঠরে জন্মের জ্বালা যায়। ১৫ নং পদে ২ কলিতে আছে সদায়ে কেনা— (ক) পূর্ববঙ্গে সদাই অর্থ জিনিসপত্র কেনা; (খ) সব সময়। ২৮ নং পদে ব্যবহৃত 'ইন্দ্রডাঙ্কা' শব্দটি। ইন্দ্র বা রাজার ডঙ্কানিনাদিত ঘোষণা এর এক অর্থ। অন্য অর্থে ইন্দ্রিয় = (ইন্দ্র গুলির উচ্চ চিৎকার বা কামনাবাসনার প্রাবল্য)।

লালনের গানের এ ধরনের শ্লেষাত্মক শব্দ-ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এ ধরনের ব্যবহার যথেচ্ছ।

সাধারণ ও কাকুবক্রোক্তিগুলি লালনের কাব্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তোমার দয়াল নামে দোষ রবে সংসারে (২৭০)—এ নিন্দার ভয়ে লালনকে দয়া করা প্রয়োজন।

সে কলম আর কে ফিরায়—কলমের লিখন অলঙ্ঘ্য (২৪০)। সামান্য পরোশের গুণ লোহার কাছে গেল জানা (১৫৮)—লোহা দ্বারা পরীক্ষিত হলে প্রমাণিত হলো যে এটি স্পর্শমণি নয়, সামান্য বস্তু। দেহকে স্বর্ণে পরিণত করে দিলে এ বদনাম থাকবে না। এখানে পরশ ও লোহা শব্দে শ্লেষ আছে : (ক) পরশমণি, (খ) দেহস্পর্শ। লোহা (ক) ধাতুবিশেষ (খ) লৌহবলয়পরিহিত নারী। লালনের সমস্ত পদগুলি এ ধরনের রম্য বক্রোক্তিতে পূর্ণ; এ ভঙ্গীই তাঁর বাক্যকে, কাব্য করে তুলেছে।

সাধন-সংক্রান্ত বিশিষ্ট শব্দগুলি আমরা সংস্কৃত করাব ফলে তাদের যথার্থতা হারিয়ে ফেলে। যেমন; আপ্তুতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব!), সন্দি (সন্ধান!), ত্রিপীনি (ত্রিবেণী!), বুজি (বুদ্ধি!), বিচমেল্লা (মূল তিন অর্থ, ৬৪ পদ দ্রষ্টব্য), মেএ (মিএগা!) প্রভৃতি শব্দের অর্থ-

তৎসম রূপগুলি সতর্কভাবে পর্যালোচনা না করায় লালনগীতির সংগ্রাহকগণ শব্দগুলিকে বিকৃত করেছেন এবং অর্থ পাল্টে গেছে। যেমন আবু তালিব কেঁতা (১০৯) শব্দটি কে তা লিখে, অর্থ দিয়েছেন। এটি কন্থা < কাঁথাজাত। আত্মস্তম্ভ বাশে (৪৪/৪৫ পদ, আব্রহ্মাস্তম্ভ) প্রভৃতি।

লালন-ব্যবহৃত কথ্য গ্রাম্য শব্দগুলির প্রতি অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

আড়া (২৬৩), কোট (৩৩৩), ডালান (২৩৪), দেহের বলন (১১৯), জেন্‌গানী (২২০, জান জ্ঞানী; জিন্দা+নী=জীবিত/জীবন) আপাএ (৯), জুতি (৪৪), রাই রাঙ্গা (৩৩)[১০৭] হল করা দিন দোনে (দ্বিন ও দুনিয়া)।

লালনের কথ্য গ্রাম্য এক বিশেষ বাক্‌ভঙ্গী আছে, যেমন লক্ষ্মী সে তো গা তুলেছে (৩০৯, লক্ষ্মীছাড়া); দেখে জন ভুজঙ্গনা (সাপিনীর মতো দেখতে ৩৯খ), নবি বিনে পথে গোল হল (নবীর অবর্তমানে সাধনাবিষয়ের পন্থানির্ণয়ে মতভেদ হলো, ১১৬, ঘুরে মুলি বেদের বিদয় (বেদ-বিধানে ঘুরে মরলি, ১১৪), হাজিনাম পাড়ান নর্থ তাই দেখিরে (হাজী নামে খ্যাত হওয়াই উদ্দেশ্য, ১৫২) বিভক্তি ইত্যাদি লোপের ফলে সঠিকভাবে না পড়লে তাঁর গানের অন্বয় হয় না, যেমন—এপারকে আনিল ওপারকে নেবে বলো (২৩৫) =এপারে, কে আনিল? ওপার(এ) কে নেবে বলো?

আবার তৎসম শব্দের শিষ্টরীতির ব্যবহারও তিনি করেন—

চন্দ্র জমন ঢাকা মেঘের পাশে (দলে, বহুবচন, ২৬৮)। প্রচলিত ব্যবহার থেকে ভিন্নার্থে শব্দ-ব্যবহারের ক্ষমতা তাঁর ছিল, যেমন অবোধের প্রতিসাম্যে শব্দসৃষ্টি গোবোধ (গরুর মতো বোধ যার) প্রচলিত প্রবাদে শব্দটি গোবধ (গোহত্যা)।

কতকগুলি বিষয় লালনের স্বজাতীয় সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই সূত্রনির্দেশগুলি অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

(ক) দুশে সে আদম ছপী আজাজিল হল পাপী (৬৫)। ইসলামের কাহিনীতে পাই যে আজাজিল স্বর্গের ফেরেস্তা ছিল। আদি মানুষ আদমকে সে গঠন করে। আল্লা যখন আদমকে শ্রেষ্ঠ বলে 'সেজদা' করতে নির্দেশ দেয়; তখন আজাজিল সৃষ্ট আদমকে সেজদা করে না এবং শয়তান হিসাবে পরিগণিত হয়ে আল্লা দ্বারা অভিশপ্ত হয়। মানুষভজনার প্রামাণ্য সূত্র হিসাবে এ অনুষঙ্গ বহুবার লালন ব্যবহার করেন।

(খ) নিগূঢ় খবর জানা গেল পুরুষ হৈতে নারী হৈল (৪৯)। ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে লিখিত আছে যে কৃষ্ণলোভের জন্য ত্রেতাযুগের মুণিগণ দ্বাপরে গোপী হয়ে জন্মায়। অন্যদিকে 'তিন বাঞ্ছাপূরণের জন্য কৃষ্ণ, রাধিকার 'ভাববর্ণ', 'প্রেমদেহ', 'ভাবকান্তি' অঙ্গীকার করে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।[১০৮]

(গ) 'জননীর জঠরে যখন অধঃমুন্ডে ছিলে রে মন' (৫০)—তখন জন্মের মুহূর্তে ভজন করার প্রতিজ্ঞা করে মানুষ (৯২)। এ অনুষঙ্গটি সাধন-সংক্রান্ত। কামের শাস্তি হিসাবে মাতৃজঠরে মূলবস্তু শুক্র ভ্রূণ হিসাবে হেঁটমুখে, ঊর্ধ্বপদে; মলমূত্রাদি পরিবৃত হয়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। জন্মের পূর্বে, সে স্খলনবিহীন সাধনার প্রতিজ্ঞা করলে, নারী তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দেয়। নারী জন্মস্থানের স্থানবিশেষ জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করে সে জন্ম নেয়। তারপর কামের তাড়নায় সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে, ঝাঁপ দেয় অগ্নিকুন্ড নারীদেহে।

প্রাক্তন সংস্কারের অনুষঙ্গ পাই, সত্তার ৮৪ লক্ষ যোনিভ্রমণের পর মানবজন্মলাভের তথ্যে (২১৭)। অবশ্য ৮৪ শব্দে ৮৪ আঙুল (নিজ নিজ আঙুলের মাপে) দেহকেও বোঝানো হয়।

(ঙ) প্রকৃতিজগতের কতকগুলি লোকসংস্কারের 'মিথ' লালন ব্যবহার করেছেন।

(১) স্পর্শমণির পরশে লোহা সোনা হয়।

(২) চাতকের প্রাণবিয়োগের উপক্রম হলেও সে মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল খায় না (২৯৭)।

(৩) কুমরীপোকা অন্য পোকাকে কুমরীতে পরিণত করে (১৫৮)।

(৪) ময়ূর-ময়ূরীর (মাছের) দেহমিলন হয় মুখে মুখে।

(৫) আলোকলতা বিনা বীজে জন্মে (৭৬)—এতে ফুল আছে কিন্তু ফল হয় না (বনস্পতির উল্টো)।

(চ) ঐতিহ্যবাহিত কাহিনীসূত্রের (না জানায়, এ পদ উল্টাকথা বলে মনে হয়) ব্যবহার দেখি—মনসুর হাল্লাজ, দস্যু নিজামুদ্দীন প্রভৃতির ক্ষেত্রে।

নাথদের গোরক্ষবিজয়ের কাহিনীতে দেখি যে বিবাহের সময় গোরক্ষনাথ শিশুতে পরিণত হয়ে স্ত্রীর স্তন্যপান করেছে। তারাপীঠের আদি খোদিত মূর্তিতেও পার্বতীর স্তন্যপানরত শিবের ছবি দেখা যায়। ৬৩ নং পদে মার উপরে পিতার (পিতৃবস্তু—শুক্র) জন্ম এবং সে জন্মে পত্নীর দুগ্ধ খায়—এ বর্ণনা আছে।

কলমীপুঁথি, চৈতন্য চরিতামৃত, এবং বৈষ্ণব কাহিনীসূত্র; কোরাণ ও সুফীদের আলোচিত বহু বিষয় এবং পারিভাষিক শব্দে লালানের গান পূর্ণ [এগুলি আবার অর্থান্তরিত হয়েছে]। উদাহরণস্বরূপ ২৪৮ নং পদটির কথা বলা যায়—

রূপ, স্বরূপ, শ্রীরূপ, দুইরূপ, অটল রূপ, হল করা, অনুরাগী, রাগের দেশ, শুদ্ধরাগ, রাগের করণ, রাগের তালা ছোড়ান, বিধি, নিত্যলীলা, নেহারা, লীলারূপ, পঞ্চতত্ত্ব, রূপের দরোজা, অধার—প্রভৃতি পরিভাষা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৩১ নং পদের পরিভাষাগুলি হলো—রাগের করণ, কৃষ্ণ গৌরবর্ণ হয়, টল, অটল, ভাব, সেবা, সঙ্গ, রসিক, অকৈতবধন, ব্রজ, শ্যামরস।

২৫৯ নং পদে পাই—অধর, চাঁদ, কারণবারি, ফুল, অচিন দল, চকোর, লীলাবাস, মায়ের পুত্র ধরে খাওয়া, পঞ্চাবাণের ছিলা, প্রেমঅস্ত্রে কাটা, রণ, রণখোলা, বৈদিক বান, স্বরূপ হাট প্রভৃতি।

১৪ নং পদের শব্দাবলী রসরতি সাধনার—সাড়ে তিন রতি, তিন রস, ৩৬০ রস, রসবিভাগ, উজান, ভেটেল, ত্রিপীনী, তিরনালা, ভিয়ান, মিছরি, ওলা প্রভৃতি।

ইসলামী তত্ত্ব ও কোরাণের পরিভাষা বহু পদে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ৮ নং পদটি স্মরণ করা যায়; এখানে পারিভাষিক শব্দাবলী হলো : দাএমি নামাজ, মাশুক, আশুক, ছালেক, দেওনা, ফানা, আশাঝুলি, জাত, এলাহী, অদেখা তরিক, বরজক, প্রভৃতি।

এই বিশেষ পরিভাষাগুলির অভিপ্রায়, পদের নির্ণয় করে, এবং সাধকদের ব্যাখ্যায় গ্রন্থশেষে সংযোজিত হয়েছে।

প্রাচীন ধর্মাদর্শে ও মতবাদে জ্যোতির্বিদ্যা, জীব ও উদ্ভিদবিদ্যার অভিজ্ঞতার সার-সংকলন করে, মানুষের জীবনকে তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে সম্পৃক্ত ভেবে অ্যাস্ট্রোবায়োলজির

বিশ্বাস এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। বাউল গানে উপরন্তু ব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্র রূপ হচ্ছে দেহ। তাই বহির্জাগতিক সমস্ত কিছু সাধকেরা দেহে বর্ণনা করেছেন। লালনের গানে দেহে চন্দ্র-সূর্যের, রোহিণী, স্বাতী নক্ষত্রাদির, অমাবস্যা, পূর্ণিমার উদয়-বিলয়ে যোগ, মহাযোগ, কুযোগ; এগুলির পরিভ্রমণ, পূর্ণতা ও বিলয়ের নানা তথ্য পাওয়া যায়। বহু পুরাণকাহিনী ও প্রাচীন সাধনপন্থার ঐতিহ্য এখানে লুকিয়ে আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষের এগুলি সংস্কারবহির্ভূত বলে এগুলি উদ্ভট, রহস্যময় বলে প্রতিভাত হয়। প্রচলিত সংস্কৃতি ও সাধনপন্থা থেকে বিচ্ছিন্নতাহেতু গবেষকগণ কেউ কেউ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেছেন এগুলির।

গোর্ক্ষবিজয়, কলমীপুঁথি, মীননাথ-রচিত স্মরণদীপিকায়, সাধকদের খাতায় দেহে চন্দ্র বা কামের একেক তিথিতে একেক অঙ্গে পরিভ্রমণের তথ্য আছে।[১০৯] দেহ-পরিক্রমায় পূর্ণিমায় চন্দ্র নারীর জন্মস্থানে প্রকাশ্য হয়; অমাবস্যায় দেহ থেকে চন্দ্র অন্তর্হিত হয়ে মস্তকের মণিপুরে 'অমার' সঙ্গে থাকে। তাই লালন প্রশ্ন করেছেন যে অমাবস্যায় চন্দ্র কোন্ শহরে থাকে। অমাবস্যায় পূর্ণিমা তত্ত্বটি লালনের গানে উল্টাপদ বলে পন্ডিতদের ধারণা। লালন বলেছেন যে পন্ডিতেরা ১৫ দিন করে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ বিভাগ করেছেন। কিন্তু ১৫ দিনে চাঁদের ষোল কলা পূর্ণ হয় কীভাবে। ১৫ দিনের পক্ষবিভাগ মান্য করলে পূর্ণিমা সর্বদা হয় কৃষ্ণপক্ষের ১ম দিনে এবং অমাবস্যা হয় শুক্লপক্ষে। কারণ ১৬ দিনে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হয়। এবং চাঁদে 'অমা' বসলে হয় পূর্ণিমা।[১১০]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অমাবস্যা মানে অন্ধকার, মানে কাম বা রজঃপ্রবৃত্তি এরকম বিচিত্র গোঁজামিলের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১১১] অথচ তাঁর বর্ণনায় রজঃবিকাশ পূর্ণিমাতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত দেখা যায়। 'অমা' তন্ত্রের ও বাউল দেহসাধনার গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শাশ্বতী কবিতার শেষাংশে পাই : "অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা"। চন্দ্রমন্ডলের ক্ষয়োদয়রহিতা ১৬ কলার নাম অমা। অন্য পঞ্চদশ কলা ক্ষয়োদয়যুক্তা, কিন্তু ষোড়শী কলা নিত্যা। চণ্ডীতে আদ্যা, অর্ধ মাত্রা অমার বন্দনা আছে। মাধবীয় সংহিতায় একে বলা হয়েছে দেহীর মূল।

স্বামী সচ্চিদানন্দের পুরশ্চরণ প্রদীপ, গুরুপ্রদীপ; ললিতারহস্য [ললিতা—রজঃ, আধা—ষষ্ঠিচরণ ধর, পূর্বোক্ত], কৌলাবলী, ভাবচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থে অমাতত্ত্ব, কামতত্ত্ব এবং রজঃবিকাশের ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা আছে। গোপীনাথ কবিরাজ স্বসংবেদন ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ গ্রন্থে অমাতত্ত্বের জটিল ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ভারতীয় তন্ত্রে রজঃবিকাশ ও তার সাধনা গুরুত্বপূর্ণ। এই রজঃসাধনা লালনপন্থার গুরুত্বপূর্ণ চারচন্দ্রের এক চন্দ্র। অমাতত্ত্বে এ সাধনাসংশ্লিষ্ট। ষোড়শী অমাকলার ভিতরে থাকে অনন্তকোটি ভুবনের বীজ। অমার অভ্যন্তরে থাকে নির্বাণকলা, তার ভেতরে পরম নির্বাণকলা, তন্মধ্যে বিসর্গ ও বিন্দু। নারীদেহের সাম্যভঙ্গ হয়ে এই ত্রিখন্ড তিন দিনের রজঃস্রোতে বহির্গত হয়। সূক্ষ্ম বিসর্গ-বিন্দু বহির্মুখী হলে সৃষ্টির সূচনা এবং রজঃবিকাশ। এটি ব্রহ্মের রাগদেহ; সৃষ্টির কারণবারি। শিবের ললাটের অর্ধচন্দ্র, ইসলামের চাঁদতারা, কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ সাধকের দৃষ্টিতে অমার প্রতীকমাত্র।[১১২] পুরাণকাহিনীতে বর্ণিত আছে যে প্রজাপতির ২৭টি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেছেন। এই কন্যাদের, বিশাখা, অনুরাধাদির

সঙ্গে তিনি একদিন করে থাকেন। নক্ষত্রবিশেষের সঙ্গে থাকাকালীন চন্দ্রের পূর্ণিমা ঘটলে সে মাসের নাম হয় নক্ষত্রের নামে। যেমন বিশাখার পূর্ণিমামাস বৈশাখ প্রভৃতি। এ নক্ষত্রমালার প্রথম নাম বিশাখা, শেষ নক্ষত্র স্বাতী। ২৭ দিন ২৭ জন স্ত্রীর সহবাসে চন্দ্রের ক্ষয় হয়। তাই ২১/২ দিন তিনি গুপ্ত মণিপুরে গিয়ে অমার সঙ্গে বাস করেন এবং অমার সহবাসে পূর্ণ হয় তার ক্ষয়। চান্দ্রমাসে মোট ২৯১/২ দিন থাকে। আড়াই দিন অদৃশ্য থেকে পূর্ণচন্দ্র আবার উদিত হয়। এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা চান্দ্রমাস। পঞ্চদশ কলার পর ষোড়শী কলা অমা যখন চন্দ্রে বসে, তখন হয় পূর্ণিমা, (নারীদেহে 'পূর্ণ-মা')। রজঃবিকাশ চান্দ্র-ঘটনা। তার উদয়, বিলয়, ক্ষয়, পূর্ণতা প্রভৃতি ফুলের গান ও অন্য পদে বর্ণিত হয়। নারীদেহের মতো পুরুষদেহেও রজঃকাল, তার ক্ষীণতা ও পূর্ণতা আছে।[১১৩] রজঃবিকাশে দুই পক্ষ মাস, তিথি ইত্যাদি গণিত হয়। গানে সবগুলিই দেহের। অমার সংস্পর্শে ক্ষয়িত চন্দ্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে পুনরুদিত হয় এবং চন্দ্রে অমা বসলেই ঘটে পূর্ণিমা। গোর্ক্ষবিজয়ে 'চন্দ্রের ষোড়শপূর্ণ অমা কলা'-এর উল্লেখ আছে।[১১৪] ষোড়শ দিনের অন্তে রজঃস্রোতে আবির্ভূত হয় ষোড়শী কলা অমা বা রাধাবিন্দু, 'পূর্ণচন্দ্র মা জহুরণ' (ovam)। এটি ব্রহ্মার অন্ড, এ দিয়ে গঠিত হয় দেহভুবন। নাথপন্থীরা একে জানতেন :

> অতি সুনির্মল যেন ডিম্বের কুসুম
> তার মধ্যে দেখিবা যে আব্রহ্মস্তোম।[১১৫]

লালনের গানে রজঃ গঙ্গাধারারূপে কল্পিত। রজঃ ও গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অমা। শিবের জটা থেকে গঙ্গা, মাথার মণিপুর থেকে রজঃ নির্গত হয়। গঙ্গার পূর্বে গঙ্গা, মধ্যে সরস্বতী, পশ্চিমে যমুনার ধারা বহে। রজঃস্রোতের তিন ধারা। গঙ্গার মতো এখানেও জোয়ার-ভাঁটা হয়। জোয়ারকালে দেহতরী উজানে যায় অবলীলায়। সুবাতাসেও পাল খাটিয়ে বিনা আয়াসে উজানে যাওয়া যায়। [উজান সাধনার যোগ—এ যোগে অনায়াসে উজান সাধনা হয়।] নদীতে কুবাতাসে, ঝড়ে নৌকাডুবি হয়; কামকুম্ভীরে জীবকে ধরে খায়। মীন অবতার, অধরচাঁদ, সাঁই, রাধাবিন্দু এ স্রোতে ভেসে আসেন। তিনিই অক্ষয় দেহসত্তা (অমা)। তাকে ধরার সাধনা রসপন্থায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ষোড়শী কলা অমার প্রতীক, ১৬ অক্ষরের কামগায়ত্রী। এর মূল চার অক্ষর (চার ভূত —যা দিয়ে সব কিছু গঠিত হয়)। ২৭টি নক্ষত্র ক্রমানুসারে দেহের রজঃবিকাশের দিনগুলির ক্রমিক সংখ্যাবাচক। রসসাধনায় রোহিনী ও স্বাতী নক্ষত্রের নাম গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকাজে চাষীরা তিথি, নক্ষত্র মেনে চলতেন। গ্রীয়ারসনের[১১৬] বর্ণনায় দেখি জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রের উদয়ে বর্ষার সঙ্কেত পেয়ে কৃষক চাষ করে বীজ বুনত। কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষে স্বাতী নক্ষত্রের উদয়ে বর্ষার অবসান গণিত হতো। স্বাতী নক্ষত্রের লগ্নে বৃষ্টি হলে ফসল বহুগুণ বর্ধিত হয়। লোকবিশ্বাস যে স্বাতীর জলে ঝিনুকে মুক্তো, সর্পফণায় মণি, হাতির মাথায় গজমুক্তা জন্মে। দেহে রজঃবিকাশের সূচনায় অমার আবির্ভাব। এদিন অম্বুবাচী। এ দিনের দেহমিলন পুরুষের আয়ু হ্রাস করে। লালনে.. মন্তব্য : "আই হারালি অমাবতী না মেনে" (১০৩ নং পদ)। এ পদে দেহে ও ক্ষেত্রে বীজবপনের নির্দিষ্ট সময়সঙ্কেত আছে। শিশুর দুর্বল, অসুস্থ হয়ে জন্মাবার ইঙ্গিত ও ব্যাখ্যা আছে। দেহসাধনায় শনি, মঙ্গল, মঘা, অম্বুবাচী, অমাবস্যার দেহমিলন ক্ষতিকর বলা হয়। এগুলি নারীদেহের রজঃবিকাশ ও তৎপরবর্তী দিনের সঙ্কেত। প্রাগুক্ত নক্ষত্রগুলির

এক-একজন দেবতা থাকেন। আশ্লেষা নক্ষত্রের দেবতা মঙ্গল, সুতরাং এ দিনটি মঙ্গলবার। চিত্রা নক্ষত্রের দেবতা শনি। সুতরাং এ দিন শনিবার। নদীতে এ তিথি বা দিনগুলিতে কুবাতাস (প্রবল আকর্ষণশক্তি) এবং কামকুম্ভীর আসে সুতরাং দেহমিলন এড়িয়ে একাদশীর উপবাস পালন করার রীতি প্রবর্ত্ত ও সাধক স্তরে গৃহীত হয়। রোহিণী নক্ষত্রটি সংখ্যাবাচক। রজঃবিকাশের ২য় দিনে রোহিণীচাঁদের উদয়। এদিনের রজঃসাধনা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের মতে, কুমারীর প্রথম ঋতু রোহিণী নক্ষত্র (বা ১৬শ বর্ষীয়া কন্যার ঋতু) এবং নারীর শেষ ঋতুস্রাব (৪৮ বছরে) স্বাতী নক্ষত্রের জল। মতান্তরে ২৭ দিনে রজঃবিলুপ্তির পূর্বমুহূর্তের রজঃরসই স্বাতী নক্ষত্রের জল। তন্ত্রসারে রজঃসূচনাকে পুষ্পবিকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুষ্পের বর্ণ, গন্ধ, মধুর মতো (১১৭) রজেঃর পদ্মে নানা বর্ণের, গন্ধের উপমা লালন দিয়েছেন। স্রোতে পদ্ম হয় না। কিন্তু দেহপদ্ম স্রোতে ফোটে। এ পদ্মের আকর্ষণে কৃষ্ণ (কাম) ভ্রমর আসে; আসে শ্বেতবর্ণ (পুংশুক্র) ভ্রমর। পূর্ণিমার দিন চাঁদ, বিশেষ নক্ষত্র এবং সূর্য এক সরলরেখায় অবস্থান করে। সূর্যের আলো ও ক্ষমতায় শক্তিশালী হয়ে চন্দ্র আকর্ষণ করে জলকে (দেহের জলীয় পদার্থ বা পুরুষ-শুক্রকে)। নদীতে এবং দেহে সূচিত হয় জোয়ার। এই হলো উল্টা সাধনা বা উজান বাওয়ার সময়।[১১৮] এসময় চন্দ্রের ছায়া প্রতিফলিত হয় সূর্যে; তাই সূর্যগ্রহণ। সূর্যকেও পূর্ণচন্দ্রের অমা স্পর্শ করে। গোর্খ বিজয়ে পাই :

চন্দ্রের অমাবস্যা দেখ প্রতি মাসে মাসে
সূর্যের অমাবস্যা লাগে পূর্ণিমা দিবসে। (পৃ. ১৭১)

সুতরাং অনুষঙ্গ, পুরাণকাহিনী, প্রতীক এবং সাধনার অভিপ্রায় না-জেনে লালনের এরকম পদের পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। পূর্বালোচিত কলমীপুঁথিতে তিন দিনের রজঃসাধনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে বহু বৈচিত্র্য, অনেক মতভেদ (১ম দিন বা তিনদিন দেহমিলন হবে কিনা? অন্য তিন চন্দ্র এখানে ব্যবহৃত হবে কিনা—এসমস্ত নিয়ে, এর কোন্ অংশে গরল আসে? নানা ঢেউ আসে, তার কোনটিতে স্নান করতে হবে?) দৃষ্ট হয়, পুঁথিগুলিতে। আর মীন, বিন্দু বা রাধাবিন্দু ধরার অতীব সূক্ষ্ম, গুপ্ত সাধনা কোথাও অনাবৃত হয়নি। অবশ্য দু'দেহের সমতাস্থাপনের প্রসঙ্গ কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। একনিষ্ঠ যুগলসাধকের দেহে একই সঙ্গে নারীতে রাধাবিন্দু, পুরুষে কৃষ্ণবিন্দুর উদয় হয়। এই মহাযোগ (একক শরীরে রজঃযোগ)। দুয়ের মিলনে সৃষ্টি হয় একদেহী (সন্তান)। এ দুই সত্তাকে মিলিত করে দেহে রাখতে পারলে কাম নির্বাপিত হয়, বিন্দুর স্থৈর্য সাধিত হয় এবং দেহের ভেতরে জন্ম হয় আরেক সিদ্ধ দেহের (পুরুষের পেটে ছেলে' উল্টাভাষণে এ তত্ত্ব আভাসিত হয়েছে)।[১১৯] রূপকে, প্রতীকে, সঙ্কেত ও অভিপ্রায়ের অনবদ্য শিল্পকৌশলে লালন এ সাধনাকে আভাসিত করেছেন ২৯ নং পদে। বিভিন্ন সংকলনে শব্দাদি পরিবর্তনের ফলে পদটি অনর্থক হয়ে গেছে। পদটি আলোচনার সূত্রে আমরা লালনের কাব্যভাষা ও শিল্পকৌশলের একটি রূপরেখা পাব।

শিক্ষার এই পদটি, সাধকের সাধক স্তরের। মুখপাত দুই অংশে বিভক্ত অন্য পদের মতো; তাছাড়াও এতে আছে তিনটি কলি। পাঁচটি চরণান্তিক মিলের ব্যবহার এবং অন্তে সাধনার কাঠিন্য ও আত্মনিন্দার ভণিতায় পদের সমাপ্তি।

মানসের করণ সে কি রে সাধারণ জানে রসিকো জারাঃ।।

টলে জীব বিবাগী অটল ঈশ্বর রাগী সেও রাগ লেখে বৈদিক রাগেরো ধারা ঃ।।

জদি ফুলের সন্দী ঘরে, বিন্দু পড়ে ঝরে, আর কি রসিক ভেয়ে হাতে পায় তারে, নিরে খিরে মিশায় সে পড়ে দুর্দ্দসায়, না মিসলে হিন অঙ্গ বিফলো পারা।।

হলে বানে বান ক্ষেপনা বিশের উপজ্জনা অধপতে গতি উভয় শেষখানা পঞ্চবাণের ছিলে প্রেম অস্ত্রে কাটিলে তবে হবে মানসের করণ করা।।

ও সে রসিক শিখরে যে মানুষ বাস করে হেতু সন্ন করন সে মানসের দারে, নিরহেতু বিল্লাসো মেলে সে মানুষো অধীন লালন ফকির হেতু কামে জায় মারা।।

মানুষের করণ বা সাধনা সাধারণ নয়; রসিকেরা এ সাধনা জানে—এ ঘোষণা দিয়ে পদটি শুরু হলো।

চৈতন্য চরিতামৃতে জীব (টল), ঈশ্বর (অটল), মানুষ (সুটল)-এর প্রসঙ্গ আছে। তিন মানুষের তিন শ্রেণীর যৌনাচরণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে কলমীপুঁথিতে। দেহমিলনে শুক্র স্খলন ও সন্তানের জন্ম দেয় যারা তারা জীব (টল)। পুত্রার্থে স্ত্রীসঙ্গ বৈদিক নির্দেশ। যিনি অটল, তার কামনাবাসনা নেই, তিনি নির্বিকার ঈশ্বর পদবাচ্য। ব্রহ্মচর্যরক্ষা; প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ বৈদিক সন্ন্যাসের মূলমন্ত্র। 'লেখে' অর্থাৎ এ দুটি পন্থাই শাস্ত্রের লিখিত নির্দেশে পাওয়া যায়। দুটিই বেদ-শাস্ত্র-সমর্থিত পদ্ধতি। এখানে বক্রোক্তিতে পাওয়া যায় যে, এ দুটির একটিও মানুষের করণ/রসিকের সাধনা নয়। কিন্তু মানুষের কর্মপদ্ধতিটি বিবৃত হলো না।

প্রথম কলিতে পাওয়া গেল সম্পৃক্ত সাধনসমস্যা। ফুলের সন্ধান যে-ঘরে পাওয়া যায় অর্থাৎ রজঃবিকাশের স্থানে (নারীর জন্মদ্বারে) যদি পুরুষের বিন্দু বা শুক্র পতিত হয় তাকে কি আর সাধক (রসিক ভাই) ফিরে পায়? চর্যাপদে বা স্বরূপ দামোদরের কড়চায় সমস্যাটি আলোচনা করে দোহা দুধ পুনঃ বাটে প্রবেশ করে না, মন্তব্য পেয়েছি। কিন্তু এখানে প্রশ্নে, কাকুবক্রোক্তির সম্ভাবনা আছে। (আর উজান সাধনার সঙ্গে জড়িত রস-রসায়নের সাধনার্থীরা জানেন যে এ বিন্দু পাত্রান্তরিত হয়ে শক্তিশালী হয়ে ফিরে পায় সাধক)। নীর—জলীয় পদার্থ গঙ্গাজল, এখানে নারীর রজঃরস; ক্ষীর-সাধকের আবর্তিত ঘন বস্তু তাই শ্বেতবর্ণ পুরুষ-শুক্র; বা রজঃবীজ। এ বাক্যের তিন অর্থ—(১) শুক্রস্খলনে পুরুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়, (২) এর ফলে শুক্র হারায়, ফিরে পায় না বিন্দুকে, (৩) ফলত গর্ভসঞ্চার হলে আর রজঃ বা ফুলকে পাওয়া যায় না। সন্তানজন্মে ঘটে নানা দুর্দশা।

পরের বাক্যাংশে চমৎকার শ্লেষ আছে। রজঃবীজের মিলন মূল সাধনা। এ মিলন না করলে সাধনা অঙ্গহীন হয়, বিফলপ্রায় (পারা = মতো)। এ দুটিকে না মিলালে অঙ্গাদি হীনতাপ্রাপ্ত হয়, পারদবস্তু (শুক্র) বিফল/চাঞ্চল্যযুক্ত থাকে (সুফল—স্থৈর্য)। এ দ্বন্দ্বের কোন সমাধান নির্দেশিত হলো না। দুর্দশা এড়িয়ে কীভাবে এ সাধনা করা যায় তা অনুক্ত থাকল।

দ্বিতীয় কলিতে সাধনসম্পৃক্ত আর-একটি সমস্যা এল। ইতিপূর্বে আমরা কলমীপুঁথিতে পঞ্চবাণ বা নরনারীর পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ উন্মাদনাময় দীর্ঘস্থায়ী দেহমিলনের প্রসঙ্গ পেয়েছি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে এটি কাপালিকদের সাধনপন্থা।[২০] নরনারীর দীর্ঘ কামোন্মত্ত দেহমিলনে, পুষ্পবাণের (কামগায়ত্রীতে শব্দটি আছে) পরস্পরকে আঘাতের ফলে, বাণের আঘাতে দেহে বিষ জন্মে শেষপর্যন্ত দু'জনকে অধঃপথে বা মণিপুর থেকে শুক্র অধঃগামী

হয়ে, নারীর অধঃপথে (জন্মস্থানে) নেমে আসবে। নরের মতো নারীর শুক্রস্খলন কামোন্মত্ত দেহমিলনে ঘটে। এ পন্থা মানুষ বা রসিকের নয়। একটি দৃষ্টান্ত, প্রতীকের সাহায্যে পঞ্চবাণের ছিলা অর্থাৎ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ উত্তেজনা, প্রেম-অস্ত্রের দ্বারা কেটে দিতে বলা হলো। তীব্র কামনার প্রাবল্যে রসসাধনা হয় না। এ সাধনায় সাধক হবে 'জীবন্তে মরা' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকবে না। কিন্তু 'প্রেমঅস্ত্র' বা ইন্দ্রিয়প্রাবল্য প্রশমনের পদ্ধতিটিও অনুক্ত থাকল। এটিই মানুষের করণ।

ষষ্ঠিচরণ ধর খাতায় লিখেছেন যে প্রাণ অপান 'হংস' বায়ু গুরু; আর রজঃবীজ শিষ্য। শিষ্য দু'জন এক দেহে নিত্যবৃন্দাবন যায়। প্রকৃতিদেহে এ দুয়ের মিলনে জীবজগতের উৎপত্তি; পুরুষদেহে এদের মিলনে নিত্যবৃন্দাবন।

৩য় কলিতে জানা গেল রসিকের শিখরে বা ঊর্ধ্বদেশে (জিহ্বা?) মানুষের দ্বারে 'হেতুশূন্য করণ', নির্হেতু বিলাসে মানুষকে পাওয়া যায়, লালন হেতুকামে মারা যায়। অর্থাৎ নির্হেতু বিলাস, হেতুশূন্য করণ কাম নয়, প্রেম। সে সাধনা না-জেনে মিলনে লালনের মৃত্যু ঘটে। ইতিপূর্বে আমরা হেতু ও নির্হেতু তত্ত্ব আলোচনা করেছি।

জীবের টল বা ঈশ্বরের অটল সাধনায় নয়, বাণযুদ্ধে নয়, হেতুকামে নয়;—মানুষের করণ বা সাধনায় মানুষকে পাওয়া যায়। প্রেম-অস্ত্রে কামের উত্তেজনা কেটে, নির্হেতুকরণ ও বিলাসের সাধনাটি কী? নীরে ক্ষীর মেশানোর, এক দ্বন্দ্বের জটিলতার অস্পষ্ট অভিপ্রায় পদে আছে। কিন্তু মানুষের প্রেম-সাধনার কোন পরিচয় নেই পদটিতে। এটি প্রচ্ছন্ন এবং সম্পূর্ণত গুরুগম্য। লালনের পদটিতে টল ও অটলের সাধনাবহির্ভূত মানুষের সাধনার তথ্য সামাজিকদের এই গুপ্ত সাধনা জানতে আগ্রহী করে তোলে। নিজের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে লালন সাধনার দুরূহতা নির্দেশ করেছেন। নীর ক্ষীরের মিশ্রণের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন তিনি। এ পদে বিচার আছে, সাধনার ইঙ্গিত আছে কিন্তু কোনমতেই লালন সাধনাকে অনাবৃত করেননি।

বাউল সাধকদের মধ্যে ঈষৎ ভিন্ন ব্যাখ্যা শোনা যায় এ পদটির। সাধকগণ গান নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। একে 'হরিকথা' বা 'নাম' প্রচার বলা হয়। এ পদ পড়ে কেউ সাধনা করেন না। কিন্তু বিশিষ্ট রজঃসাধনার সমর্থন হিসাবে পদটিকে অনেকে স্মরণ করেন মহৎ বাক্য বলে।

এখানে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে। দেহমিলন অপেক্ষা রসসংগ্রহ ও মিশ্রণের অভিপ্রায়ে এগুলির অর্থ নিষ্কাশন করা হয়। আর দেহাঙ্গ বা দেহমিলন সর্বদা অতিশয়োক্তি, প্রতীক বা বক্রোক্তিমূলক শব্দাশ্রয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ফুলের সন্দীঘর, বিন্দু, বাণে বাণ ক্ষেপনা, বিষের উপার্জন, অধঃপথে গতি, ছিলা, প্রেম-অস্ত্র, হেতু, নির্হেতু, শিখর প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারে এক বক্ররম্যতা পদটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখানে বক্রোক্তি আছে, অপরিচিত বেশে শ্লেষ আছে। এ গানের প্রতিটি শব্দ বিশেষ অবধানতা দাবি করে।

Kenning বা সুভাষণ ছাড়াও দৈহিক বস্তুসত্তাগুলির প্রত্যক্ষ উল্লেখ পরিহার করে লালনে অন্য বস্তুর রূপে, প্রতীকের মাধ্যমে এবং সর্বদা পরোক্ষ রীতিতে, বক্র উক্তিতে দেহসংক্রান্ত বস্তুনিচয়কে প্রকাশ করে। যেমন—পরোক্ষ, বক্ররীতি—যে ধনের উৎপত্তি প্রাণধন, সে ধনের হল না যতন (৩৯খ)।

এ রীতির সঙ্গে মিশ্রিত অন্য বস্তুরূপ : বাপের ধন তোর খেল সর্পে (২১৮), পৈত্রিকী ধন গেল **চোরে** (৮৬)

অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয় **মহাজন** সে দিনে উদয় (১৮১)।

বস্তুসত্তার উপমেয় লুপ্ত রেখে অতিশয়োক্তির ভঙ্গীতে কেবল উপমানের উল্লেখ বা প্রতীক রীতিগ্রহণ : জন্মলতা (১৮), হীরের সাকো (১৫) প্রভৃতি।

ভাণ্ডের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই কোন না কোনভাবে সাদৃশ্যযুক্ত এবং অভেদ। বস্তুজগতের সবকিছুই চার ভূত এবং রজঃবীজে সৃষ্ট। সুতরাং সর্বপ্রাণবাদী, সর্ব-ঐক্যবাদী দৃষ্টিতে লালন বাহ্য ভেদের অন্তরালে অতি সহজে ঐক্য খুঁজে পান।

এই ঐক্য মূলত মানবসত্তার সঙ্গে বাহ্যবস্তুর; দেহভুবনের সঙ্গে বিশ্বভুবনের। সবসময় দেহ উপমেয়, ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুনিচয় উপমান। বিজাতীয় ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে লালন পঞ্চবিধ ঐক্যসূত্র নির্ণয় করেছেন : (ক) বাহ্যিক আকৃতির সাম্য, (খ) উচ্চারণগত ধ্বনিসাম্য, (গ) গুণসাম্য, (ঘ) ক্রিয়াসাম্য, (ঙ) ব্যঞ্জনাধর্মী ভাবসাদৃশ্য।

বিজাতীয় দুই বস্তুর মধ্যে ভেদ বর্তমান থাকে অভেদের মধ্যে, উপমায়। তাই উপমা লালনের প্রিয় অলঙ্কার নয়। সাধারণ ধর্মের সূত্রে বিজাতীয় উপমেয়-উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পিত হয় রূপকে। রূপক লালনের প্রিয় অলঙ্কার। সাঙ্গ, পরম্পরিত প্রভৃতি সব ধরনের রূপক-অলঙ্কারের ব্যবহার লালনে পাই। এধরনের ব্যবহারে দুটি সমান্তরাল অর্থ ফুটে ওঠে, একটি বাহ্য; অন্যটি গূঢ়। উপমেয়-উপমানের অভেদ কল্পনার রূপক ব্যবহারের বহুলতা আছে কাব্যভাষায়। উদাহরণস্বরূপ ৯৪ নং পদটির উল্লেখ করা যায় : মীন রূপে সাঁই; কারুণ্য বারি, মানুষ-গঙ্গা প্রভৃতির মধ্যে অভেদ কল্পনা। লালন-ব্যবহৃত রূপকের এক স্বতন্ত্র তালিকা হতে পারে। এছাড়াও তিনি ব্যবহার করেছেন রূপক সমাসবদ্ধ বহুপদ-আরশীনগর, মন-পাগেলা প্রভৃতি। উপমেয়-উপমানের ভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায় অতিশয়োক্তিতে। রূপকাতিশয়োক্তিতে ক্ষীণভাবে উপমেয় উল্লিখিত হয়। যেমন ২৫৩ নং পদে আরশীনগরের পড়শীর বর্ণনা। কিন্তু উপমেয় উল্লিখিত না-হয়ে কেবলমাত্র উপমান (অপ্রকৃত) বর্ণিত হয় অতিশয়োক্তিতে। যেমন ১৫৩ নং পদে কাশী যেতে সাধ, কর্মফাঁসী গলায় বেঁধে, নাগোবদোলা, ডিঙ্গা, জন্মনালা, বাও না বুঝে তরণী বাওয়া, তরণী ডোবা প্রভৃতির উপমেয় লুপ্ত। তবে ব্যঞ্জনায় এগুলি বোধব্য। কিন্তু এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সঙ্কেতে প্রকাশ করতে গিয়ে, বস্তুদ্বয়ের সংযোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে, মনন দ্বারা সম্পর্ক-মূল অনুধাবনের চেষ্টা করতে হয় যেখানে, সেখানে কাব্যভাষায় প্রতীকধর্ম প্রকট হয়।

নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রাচীনকালে সর্বভূতে প্রবাহিত এক 'মানা' শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন। লালন সর্বভূতের অন্তরালে রজঃ-বীজের লীলাখেলা চিহ্নিত করেছেন। অসদ্ থেকে সতের জন্ম হয়; আবার চেতনা মৃত্যুতে জড়বর্গে মিশ্রিত হয়।[২২] ভাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের অভেদতত্ত্বের সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কিছু, তাদের আকৃতি, গুণ ও ধর্ম অনায়াসে লালন দেহে চিহ্নিত করতে পারেন। নদ-নদী, প্রান্তর, বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ সমস্তই আছে দেহে। ফ্রেজার প্রাচীন যাদুবিশ্বাস এবং যাদুকরদের আলোচনা করেছেন। অলৌকিক ঈশ্বর, দেবতার কল্পনা এবং তাদের তুষ্ট করে জীবনের অনুকূলে ঘটনা ও প্রকৃতিকে নিয়ে আসার বিশ্বাস থেকে জন্ম হয়েছে ধর্মগুলির এবং

শাস্ত্রের। সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন মন্ত্র, তন্ত্র, আচারবিদ্ পুরোহিতেরা। প্রাচীন যাদুকরেরা মানুষের অলৌকিক শক্তি দ্বারা প্রকৃতি ও ঘটনার নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করতেন। লালন প্রমুখ সাধক অলৌকিক ঈশ্বরাদিতে অবিশ্বাসী এবং সিদ্ধ মানুষের দুর্জয় ক্ষমতায় বিশ্বাসী (অলৌকিকে নয়—লৌকিক ক্ষমতায়)। ফ্রেজার প্রাচীন যাদুধর্মের দু'ধরনের প্রকৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। Homoeopathic magic এবং Contagious magic। প্রথমটিতে সদৃশ মূলের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে সম্পর্কসূত্র।[১২২] লালন পদাবলীতে যে কোন আকৃতিগত বা সম্পর্কের সূত্রে ভিন্ন বস্তুদ্বয় অভেদ হয়ে যায়। এ ধরনের জীবনবিশ্বাস, ভারতীয় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার-চেতনা, এবং এক বস্তুকে অন্য বস্তুর রূপে 'আরোপ' করার সাধনার অনায়াস-চেতনা লালনের গানের প্রতীকগুলির পশ্চাদ্‌পট রচনা করেছে।[১২৩]

আধুনিক প্রতীকচেতনা এবং প্রতীকী আন্দোলনের বহু পূর্বেই নিরবয়ব ভাবনা ও অদৃশ্য জগতকে আদিম মানুষ দৃশ্যবস্তুর মাধ্যমে রূপায়িত করত। এ প্রতীককে প্রাচীন সমাজ বাস্তব বলেই মান্য করত। রূপক প্রতীকের সীমাবদ্ধ রূপ; নির্দিষ্ট অর্থ প্রসব করে রূপক। পক্ষান্তরে প্রতীক বহু অর্থবহ। একই প্রতীক, পটভূমিকার ভিন্নতায় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। Schneider চাঁদ প্রতীকের বিভিন্ন পটভূমিকায় নানা অর্থসঙ্কেত ব্যাখ্যা করেছেন।[১২৪]

অন্য বস্তুর সহযোগেও প্রতীকের অর্থ পরিবর্তিত হয়। যেমন একটি ছুরি = বিপদ; আড়াআড়ি করে রাখা দুটি ছুরি = রেস্তোরাঁ।[১২৫] দেশ, কাল, পাত্র এবং সাধনা ও গানের পর্যায় অনুযায়ী লালনের প্রতীকগুলির অর্থ-তাৎপর্য ও আভিপ্রায়িক অর্থ পরিবর্তিত হয়। এ বিশিষ্টতা ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি।

আকৃতি বা প্রকৃতির সূত্রে জন্ম নেয় প্রথাগত প্রতীক। যেমন পদ্মাকৃতি দেহাঙ্গের সূত্রে লালন দেহে পদ্ম কল্পনা করেন। পত্র, ফল, ফুল, ডালপালার ঐক্যে দেহ হয় বৃক্ষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীকে বস্তুর ভিন্নতার মধ্যে পরিবর্তনের পর্যায়ে সাময়িক ঐক্য ধরা পড়ে। নদী বা সমুদ্রে, জোয়ার আসার সূত্রে এবং জোয়ারের জলে ভেসে আসা 'মীন'-এর আবির্ভাব ঘটে রজঃকালীন নারীর দেহে রাধাবিন্দুর আগমনে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীকে উপমেয় এবং উপমানের জটিল সূক্ষ্ম ঐক্য ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে। যেমন চাতকের প্রতীকটি; চাতক মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল খায় না; সাধক রজঃপ্রবৃত্তির সময় ছাড়া নারীদেহ স্পর্শ করে না। দুমুখো সাপের প্রতীকটিও জটিল। দেহতত্ত্বে মুখ ও লিঙ্গ বা যোনি দুটি। ত্রিবেণী, দ্বিদল দুটি করে। মুখ এবং যোনি সমার্থক; আলজিহ্বা, যোনিনাসা ঐক্যবদ্ধ। তিনি দু'মুখে দংশন করবেন—এ সূত্রে প্রতীকটি সৃজিত হয়েছে। আধুনিক যুগের সূচনায় ফ্রান্সের চিত্রশিল্পে প্রতীক আন্দোলন সূচিত হয়। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে প্রতীকল্পনা ও সৃষ্টি গণমানসে অতি পরিচিত বিষয়। এ প্রতীক ঈষৎ স্বতন্ত্র স্বাদের। দু'টি বস্তুর নানাবিধ সম্পর্ক প্রতীকে রূপলাভ করে।[১২৬] এই প্রতীকের নানা ধরনের ব্যাখ্যার ঐতিহ্য আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। গবেষকগণ প্রতীকী বাক্যগঠন রীতিতে চার ধরনের কার্যকারিতা লক্ষ করেছেন। এগুলি লালনের কাব্যভাষায়ও আবিষ্কার করা যায়। ইয়ুং প্রতীকের চার ধরনের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন।

(ক) The successive manner : দু'টি প্রতীক মিলিত হয়ে যৌথ অর্থের পরিবর্তে নতুন অর্থের জন্ম দেয়। নদী—নিঃশ্বাস বা রজঃধারা; নৌকা—দেহ বা নৌকার

আকৃতিযুক্ত যোনি। লালনের গানে নৌকায় নদী পার এক প্রতীক, সাধক পর্যায়ে দেহমিলনে মূল বস্তুকে রক্ষা করে নিরাপদে থাকা।

(খ) The composite manner : দু'টি প্রতীক মিলিত হয়ে এক জটিল অর্থের জন্ম দেয়। যেমন ৭৩ নং পদে দেখি তিনটি রাগের ধারা, নবঘাটে নব ঘেটেলা, দশমে যোগ বারির গোলা। রজঃবিকাশের ত্রিধারা, দশমী দুয়ার দিয়ে সহস্রার থেকে গলিত কারণবারি প্রকাশিত হচ্ছে। যোনিতে বিদ্যুৎশক্তিধরের আকর্ষণ ও জ্যোতিপ্রকাশ।

(গ) The progresive manner-এ বিভিন্ন স্তবে প্রতীকগুলির অর্থ পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের উদাহরণ পূর্বালোচিত।

(ঘ) The dramatic manner : দুটি বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধে এ ধরনের প্রতীক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

লালনের জল-অনলের প্রতীকের পদটি এর দৃষ্টান্ত (৭৭ নং পদ)।[১২৭]

লালনের গানে বাহ্যবস্তুতে, প্রতীকটির একরকম অর্থ; স্থূল দেহে তার অর্থ আলাদা; দেহের সূক্ষ্ম রসরতিতে একই প্রতীক ভিন্ন অর্থ প্রসব করে। যেমন, গঙ্গার ত্রিধারা—পুরাণকাহিনীতে পূর্বে গঙ্গা, মধ্যে সরস্বতী ও পশ্চিমে যমুনাধারার প্রসঙ্গ পাই। স্থূল দেহে ত্রিধারা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার বায়ুপ্রবাহ। রসরতির পর্যায়ে রজেঃর ত্রিধারা—এ অর্থে সাধকেরা এটিকে গ্রহণ করেন। লালনের গানে প্রতীক দ্বারা অনুবিদ্ধ বস্তুটির সঙ্গে অর্থাৎ উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ স্থাপিত হয়।

লালনের কাব্যভাষায় প্রতীকরচনায় তিনটি মূল সূত্র অনুসৃত হয়েছে। (ক) ভাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎস একই। বিশ্বের সূক্ষ্ম পরিণতি দেহ, দেহের সূক্ষ্ম সত্তা মূলবস্তু; (খ) দেহ, চেতনা এবং মূলবস্তুকে বহির্জগত প্রভাবিত করে; (গ) চেতনাশক্তি বস্তুজগৎকে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়াও কিছু চিন্তাচেতনা লালনের প্রতীকনির্মাণে জড়িত। যেমন, (ক) কোন কিছু অর্থহীন বা নিষ্ক্রিয় নয়, সব কিছুই তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ; (খ) ব্যক্তি বা বস্তু বিচ্ছিন্ন নয়, একে অপরের সঙ্গে জড়িত; (গ) পরিমাণ ও গুণের মধ্যে সম্পর্ক আছে; (ঘ) জাগতিক বস্তুনিচয় কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ এবং ক্রমে বিন্যস্ত। পূর্ববর্তী কারণ পরবর্তী কার্য সৃষ্টি করে। লালন বিকলাঙ্গ শিশুর মধ্যে পিতার কর্মফলকে সক্রিয় দেখেছেন। জগতের ক্রমবিন্যাস সংখ্যায়, ছেদ, ধারাবাহিকতায়, গতি, কেন্দ্রিকতা, ঐক্যে এবং সমগ্রতায় প্রকাশিত হয়।

লালনের প্রতীকগুলির কাঠামোয় দু'টি দিক লভ্য। (ক) বস্তুটির পরিচয়; (খ) বস্তুটি দ্বারা বাধিত প্রতীক-অর্থ। প্রথম সূত্রে জানা যায় বস্তুটির বহির্কাঠামোর পরিচয়। দ্বিতীয় স্তরে ত্রিমাত্রিক বস্তু বিশ্বের অন্য বস্তুর তুলনায় প্রতীক-অর্থের ভূমিকা (function) নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রতীকী অর্থটি 'বাতন' বা আভিপ্রায়িক এবং গুরুগম্য।

লালনের প্রতীকগুলি (ক) নিসর্গকেন্দ্রিক—ফুল, বৃক্ষ, নদী, বীজ, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, মেঘ, বর্ষাঋতু প্রভৃতি।

(খ) প্রাণীবাচক—কুমীর, ব্যাঙ, সাপ, চাতক, ময়ূর, মাছ, কুমরীপোকা।

(গ) ধাতুবিষয়ক—সোনা, পিতল, লোহা।

(ঘ) অন্যান্য বস্তুকেন্দ্রিক—পরশমণি, রং, আলো, অক্ষর, ঘর, ফাঁদ, দ্বার, কল প্রভৃতি।

(ঙ) মানবিক—চোর, সেপাই, পিতৃধন, মা, পুত্র প্রভৃতি।

তিনি চারপাশের অতিপরিচিত দৃশ্যমান জগত থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীকসমূহের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু বক্রতায়, তির্যক ভাষণে এবং ক্রম-বিপর্যয়ে অতিপরিচিত এখানে অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

প্রাগুক্ত পাঁচটি স্তর থেকে একটি করে প্রতীক বেছে নিয়ে সেগুলির তাৎপর্য ও নির্মাণকৌশল আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায় থেকে, ফুল প্রতীকটিকে বেছে নিয়ে, আমরা লালনের প্রতীকী ভাষা-ব্যবহারের রীতিকে সামান্য বিশ্লেষণ করতে চাই। এই ফুল প্রতীকটিকে পাই ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ নং পদে। অন্য পদে এ প্রতীকটি আছে কিন্তু আমরা প্রাগুক্ত ৫টি পদে এ প্রতীকটির তাৎপর্য আলোচনা করব।

এখানে ফুলের নাম নেই; (তবে ভ্রমরের উল্লেখ থেকে এটি পদ্ম বলে অনুমিত হতে পারে) একে 'আজগোবি' (২১ নং পদ) বলা হয়েছে। গন্ধ, রূপ এবং আকৃতি—ফুলের তিনটি দিক। ফুলের বিভিন্ন রংকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন হলুদ (কমলা) সূর্যের; লাল প্রাণীজীবন ও আবেগের, নীল অ্যালকেমিতে কেন্দ্রের প্রতীক।[১২৮] অ্যালকেমির মতো লালনেও ফুল কেন্দ্র—যা থেকে সৃষ্টি সূচিত হয়। আদিস্রষ্টা ত্রিদেব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আদি জননী এ ফুল (২০ নং পদ)। তন্ত্রে রজঃবিকাশকে পুষ্পবিকাশ হিসাবে গণ্য করে নানা সঙ্কেত ও প্রতীক নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন খ্ব পুষ্প—রজঃ, স্বয়ম্ভু, পুষ্প (আপনা-আপনি আসে—স্বয়ংভূত)—প্রথম রজঃ, কুণ্ডপুষ্প-সধবার রজঃ, গোলকপুষ্প—বিধবার রজঃ, বজ্রপুষ্প—চণ্ডালিনীর রজঃ।[১২৯] দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে উপমা চর্যাকারেরা দিয়েছেন (১নং চর্যা)। জননী নারীদেহ ও ফল-ফুল প্রসবিনী বৃক্ষদেহ গুণসাম্যে অভেদ কল্পিত হয়েছে। (ক) বৃক্ষে হয় পুষ্পবিকাশ, তারপর ফল, বীজ ইত্যাদি; (খ) নারীদেহে হয় রজঃবিকাশ, তারপর সন্তানাদি। এ দু'টি বাক্যের ক্রিয়া, কর্ম এবং কর্তা ভিন্ন। কিন্তু (ফল-ফুলের এবং রজঃ ও সন্তানের) নারীত্বের বিশিষ্ট লক্ষণে ভিন্ন বস্তুদ্বয়ের ঐক্য স্থাপিত হলো এবং বস্তুদ্বয়ের অভেদ-সম্পাদনের সূত্রে একটির কর্তা ও কর্মের সঙ্গে ক্রিয়ার সঙ্গেও অভেদ দেখা দিল অন্যটির। একটির যে কোন বিশেষত্ব, অন্যটির উপর আরোপিত বা কল্পিত হতে থাকল। উপমেয় নারীদেহ লুপ্ত হয়ে মিশে গেল বৃক্ষ ও ফুলে। উপমেয়ের যে কোন কর্ম, গুণ, বৈশিষ্ট্য স্থান-পরিবর্তনের অধিকার পেল উপমানে বা তদ্‌বিপরীতে। ফলত নতুন বাক্য-গঠনরীতিতে এটি দাঁড়াল এরকম : (ক) দেহে পুষ্প বিকশিত হয়, (খ) বৃক্ষ হয় রজঃস্বলা।[১৩০] লালনের মূল বর্ণনীয় বিষয় (নারীদেহ ও রজঃ—উপমেয়) লুপ্ত—বৃক্ষদেহের ফলে, ফুলে লুপ্ত উপমেয়ের নানা বৈশিষ্ট্য প্রতীকী ভাষায় রূপায়িত হয়েছে।

এ ফুল বেদের অগোচর (বেদ রজঃসাধনার বিরোধী); ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, পুরন্দরের মাতৃফুল; এ ফুলেই নবীর জন্ম (যে কোন ধর্মের আদি)। এ ফুলের মধ্যে অধর চোরের মতো লুকিয়ে থাকে। জন্মপথে এই ফুলের ধ্বজা থাকে; এ ফুলে গুরু পূজা হয় (রজেঃ গুরুর অধিকার আছে; শিষ্যা রজঃ নিবেদন করে গুরুকে)। এ ফুল সাধনার মূল বস্তু (রজঃসাধনা) এবং এ সাধনায় ভবদুর্গতি (কামনাদি) দূর হয়। এ ফুলে মধু থাকে, ফলে (স্তনে) থাকে অমৃতসুধা। ভ্রমর এসে এ ফুলের (সাধকের লিঙ্গ বা জিহ্বা) মধু খেয়ে যায়;

সে মধু চাইতে গেলে সে দেয় হুল (অসাধক পায় কামের দংশন)। নীরের স্রোতে ভাসমান এ ফুল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয় (রজঃস্রোতে আসে নানা ঢেউ)। এ ফুলের গাছ বা ডাল বা মূল অদৃশ্য থাকে। মূলহীন লতায় এবং ডাল ছাড়া পাতায় ফুল ফোটে (রজেঃর উৎস অজানা, পাতা আকৃতিসাম্যে যোনি; লতা রজঃরক্ত)। মানসরোবরে এটি ফোটে। কারণবারির মধ্যে (সৃষ্টির কারণে রজঃ) ভেসে বেড়ায়, আসে মাসান্তে প্রেমের ঘাটে। এর চার রং (রজঃর ত্রিবর্ণ; অবশেষে নীলাভ শ্বেত রং—এই চার)। এতে হয় জগতের গঠন; এর দ্বারা সৃষ্ট শনিশুক্র (শোণিত, শুক্র)। গোম্‌ফানিবাসী শ্বেতবরণ (শুক্র) এক ভ্রমর এসে (সহস্রার থেকে) এর মধু খায়।

গুরুর কৃপায় এ ফুলের মূল তত্ত্ব জানলে; এ ফুলের যত্ন ও সাধনা করলে জন্ম-ভোগ (সন্তানজন্ম) ভুগতে হয় না।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে শুদ্ধ বা পবিত্র মনে করে পদ্ম আবিষ্কৃত হয় মুখে, চরণে, নখে বা অন্যত্র। কিন্তু ফুলের গানের অভিপ্রায় ও প্রতীকী ভাষায় রজঃসাধনার সঙ্কেত আভাসিত হয়। এই বিশিষ্ট সাধনাটি শাস্ত্রনিন্দিত; এ কারণে অধিকতর আবৃত।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতীকের অন্যতম সাপ চান্দ্রপ্রাণী। সে আবির্ভূত, অন্তর্হিত হয় এবং খোলস বদলে চাঁদের মতো নবজন্ম লাভ করে। অ্যালকেমিতে পুরুষসত্তার মধ্যে নারীসত্তার প্রতীক সাপ। চাঁদের সম্পর্কসূত্রে নাগিনীর সঙ্গে নারীর যোগ আছে। উর্বরতা, অফুরন্ত শক্তির প্রতীক সাপ; সে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের এবং প্রাণ-নির্ঝরিণীর রক্ষক।[১৩১]

লোকসমাজে ও সাধকদের মধ্যে এ ধারা প্রচলিত যে, সাপ সাধক। কুম্ভক করে বায়ু খেয়ে সে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। দ্বিতীয়ত, তার রক্ত শীতল, সহজে তা উত্তেজিত হয় না। বৎসরে একবার মাত্র তার দেহমিলন হয়। তৃতীয়ত, সাপ ধনাদি, গৃহের প্রাকৃতিক রক্ষক। নারী গৃহলক্ষ্মী শ্রী, তার দেহ প্রায় সিদ্ধ; রজঃবিকাশের প্রকাশ ও অন্তর্ধান চান্দ্র ঘটনা ও সাপের স্বভাবের অনুরূপ।

যে সাপ বস্তুরক্ষা করে, তাদের মাথায় জন্মে মণি। ফলত তীব্র আকর্ষণশক্তিতে চুম্বকের মতো সে খাদ্যবস্তু (প্রাণী)-কে টেনে আনে। সাপের চোখে থাকে আকর্ষণশক্তি। এই চৌম্বক আকর্ষণশক্তি নারীসত্তার ধর্ম। পুরুষ সাধনায় তা অর্জন করে।

মূলাধার চক্রে সার্দ্ধ তিন প্যাঁচে কুলকুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে আছেন। তিনি জাগলে চেতনা ও শক্তি সৃষ্টি হয়। তিনি যোনিমুখ দ্বারা ভেক (লাফায়)-রূপ পুরুষাঙ্গকে তীব্র আকর্ষণে টেনে নেন। কামে হতজ্ঞান হয় পুরুষ। যোনিমুখ দ্বারা দেহের সত্তা শুক্রকে তিনি গিলে খান। "বাপের ধন তোর খেল সর্পে" (পদ ২১৮)। যোনিমুখে লিঙ্গকে এবং মুখে জিহ্বাকে গ্রহণ করে 'দোমুখে' তিনি দংশন করেন (পদ ২৩৪)। দুমুখো সাপের প্রসঙ্গ পাই গোর্খবিজয়ে [পৃ. ৯০]। যোনিমুখের আকৃতির সঙ্গে সাপের ব্যাদিত মুখের আকৃতিসাম্যে স্থানটিকে সর্পমুখবিবর বলে কল্পনা করা হয়। সঙ্কোচ ও প্রসারণধর্মটি এখানে কার্যকরী অন্যত্র লালন রূপের কাল বা এক কালরাগিনীর প্রসঙ্গ এনেছেন। (পদ ৪৮)।

রূপানুরাগের, আকর্ষণের মানবিক প্রতিক্রিয়া যেন সর্পদংশনে হতজ্ঞান হওয়া বা বিষজ্বালায় জ্বলা। চৈতন্যদেব, জীবনীগ্রন্থে, বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের আলোকে চিত্রিত। রাধা বিলাপে ও বিরহে বিধুর। লালনের পদেও বিরহ ও অপ্রাপ্তির হাহাকার। মনের মানুষকে পাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা; তার অভাবে, স্মরণে যে-জ্বালা—তাই যেন রূপের কালের দংশনের

প্রতিক্রিয়া। 'কাল' অমোঘ অদৃষ্টলিপি, অলঙ্ঘ্য নিয়মের প্রতীক। ক্রুদ্ধ সাপিনী যেন রুষ্টা সাধিকা নারী —তার ক্রোধে ধ্বংস হয় পুরুষসাধক। সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসাদির প্রতীকও লালন গ্রহণ করেছেন।

(৩) সোনা : অ্যালকেমির গুরুত্বপূর্ণ ধাতু সোনা, পরিবর্তনের তিন স্তর পরে সৃষ্টি হয়। স্বর্ণ সূর্যজাত। আগুনে পুড়িয়ে এবং গলিয়ে সোনার মল দূর করা যায়। আগুনে পোড়ানো বা গলানোর সূত্রে দেহমিলনে/নারীদেহের অগ্নিকুণ্ডে পুরুষদেহকে মলহীন সিদ্ধ দেহে পরিণত করা যায়।

দ্বিতীয়ত, রসব্যবহারে "শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ" হতে পারে। এ রস নারীদেহের। ভারতীয় রসায়নের স্বর্ণসৃষ্টিতে নারীদেহরসের ভূমিকা আছে।[১৩২]

তৃতীয়ত, স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা সৃষ্টি হয়।

সিদ্ধ দেহের স্পর্শে বা মিলনে অনেক দেহ সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ত্রিবিধ সাধনা পদ্ধতিতে সিদ্ধ দেহ বা সোনার দেহ লভ্য। সোনা এবং সিদ্ধ দেহ মহামূল্যবান এবং জরা-মরণ-ক্ষয়ের প্রভাবমুক্ত, শুদ্ধ। এই বৈষ্ণবদের 'নিত্যদেহ' লাভ। সোনা এবং জহুরীর মূল্য একালে হ্রাসমান; চকচকে সস্তা পিতল গণমন হরণ করছে—এ তথ্যে যথার্থ সাধকের অনাদর এবং নকল সাধুদের সমাদর চিহ্নিত হয়।

(৪) স্পর্শমণি : অ্যালকেমিতে সদাচঞ্চল দেহ ও মনের শক্তিগুলিতে সংহতি ও স্থিরত্ব দেয় 'ফিলজফারস স্টোন'। বিভিন্ন ধর্মে, পাথর স্থানু সংহতির প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। মক্কার কাবায় 'আসোয়াদ' প্রস্তরে চুম্বন করার রীতি আছে। দীর্ঘস্থায়িত্ব ও কাঠিন্যের প্রতীক পাথরের স্পর্শে দেহে এর গুণাবলী সঞ্চারিত হতে পারে বা বিভিন্ন পাথর দেহে প্রভাব বিস্তার করে তার রং ও গুণ দিয়ে।[১৩৩] আমাদের লোকবিশ্বাসে স্পর্শমণির কথা বহুশ্রুত। এ পাথরের স্পর্শে দেহ/যে কোন ধাতু স্বর্ণে পরিণত হয়। বৈষ্ণব কবিরা স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা না হয়ে, স্পর্শমণি হবার কথা বলেছেন।[১৩৪] সমজাতীয় জিনিস সমজাতীয় বস্তুর জন্ম দেয়- –এ সূত্রে লালনও পরশের স্পর্শে 'পরশ' (মণি) হবার কথা বলেছেন। স্পর্শ খুব গুরুত্বপূর্ণ লালনের সাধনায়। সিদ্ধ দেহের স্পর্শে সিদ্ধত্ব সংক্রমিত হতে পারে—এ বিশ্বাস পরশমণির প্রতীকে আছে। চৈতন্য বা কৃষ্ণকে তিনি পরশমণি বলেননি। 'পরশমণি স্বরূপ গোঁসাই'—স্বরূপ গোস্বামী ব্যক্তিনামের সঙ্কেত অর্থে সম্ভবত সাধিকা নারী, তার দেহরস আভাসিত হয়।

(৫) চোর : লালনের চোর 'চতুর' সত্তা। দেহে দশেন্দ্রিয় ও ষড়রিপুকে ফাঁকি দিয়ে সে 'পিতৃধন' (শুক্র) চুরি করে। এ চোর কৌশলী এবং অবশ্যই নারীসত্তা। একই সত্তা রস আস্বাদনের জন্য দ্বিধা হয়েছে নর ও নারীরূপে। তাই নারী পুরুষের 'মূলধন' হরণ করে নেয়। সে হরি। কিন্তু নিজের অপর সত্তার ঘরে সে চুরি করে। লালনের ভাষায় 'আপনি চোরা, আপন বাড়ি'। চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে এবং শাস্তি পায়, কয়েদ বাস করে। সম্ভবত সন্তানের জন্ম ইত্যাদি এ প্রতীকে আভাসিত। এই চোরকে ধরার জন্য নিম্নদ্বারকে 'অটল' করতে হবে; তারপর 'হাওয়ার ফান্দ' পেতে (বায়ু-সহায়তায়) তাকে (নারীসত্তাকে) ধরতে হবে? ইনি কি মীন? মানুষ? অধর? যাকে 'আধারে অধর' দিয়ে ধরতে বলা হয়েছে? (পদ ৩৩, ৩৫, ৯০)।

সংখ্যা বা সংখ্যা শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত তত্ত্বব্যাখ্যানের ও সংখ্যা-প্রতীকের আলোচনা

পাওয়া যায় অ্যালকেমিতে। প্রাচীন গ্রীসে পিথাগোরাস ও প্লেটো সংখ্যা-প্রতীক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাও মতবাদে সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা পাই।[১৩৫] সংখ্যা-প্রতীকে সংখ্যাগুলি নিজস্ব ভাবশক্তিকে প্রকাশ করে। প্রত্যেক সংখ্যা (গ্রীকমতে ১০ পর্যন্ত; প্রাচ্যমতে ১২ পর্যন্ত) নিজস্ব ভাবকে প্রকাশ করে। সমস্ত সংখ্যা এক থেকে সৃষ্ট। লাও-ৎ-সে-এর মতে পরবর্তী সংখ্যা পূর্ব-সংখ্যাগুলির সমবায় বা গুণফল মাত্র। কিন্তু পরিমাণগত বৃদ্ধি গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়। তাঁর মতে এক থেকে দুই হয়; দুই হয় তিন; আবার তিনে এক হয়। নতুন সংযোগে গড়ে ওঠে পরবর্তী সংখ্যা (৩+১=৪)।[১৩৬] বাউল গানে এবং লালনের পদে তিনে এক বা একে তিন তত্ত্বটি বহুব্যবহৃত।[১৩৭] বিরোধী সংখ্যার দ্বন্দ্ব থেকে জাত হয় নতুন সংখ্যা; প্রত্যেক সংখ্যা তার সীমা অতিক্রম করতে চায় এজন্যও সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। সাধারণত জোড়-সংখ্যা নেতিবাচক, নিষ্ক্রিয় গুণবিশিষ্ট; বিজোড় সংখ্যা ইতিবাচক ও সক্রিয়।[১৩৮] যোগ এবং গুণফল সংখ্যাসৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধকদের খাতায় তিথি ও নক্ষত্রের বা চন্দ্রকলার সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করে ৫ যোগ করে ৭ দিয়ে ভাগ করা হয়। ভাগশেষটি হবে সংখ্যার মূল সত্য। যেমন :

(৮মী × ২) + ৫ ÷ ৭ বা ২১ ÷ ৭ = ভাগশেষ ০; ধ্বংস—দেবতা রুদ্র।

১৪ × ২ + ৫ ÷ ৭ বা ৩৩ ÷ ৭ = ভাগশেষ ৫; পঞ্চমীর দেবতা হর, তাৎপর্য হরণ।[১৩৯]

অন্য পদ্ধতিতে দেখা যায় যে প্রশ্নকর্তার নামের অক্ষর, গণকের নামের অক্ষরের সঙ্গে মাস, বার, তিথি একত্র করে ১০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ/মতান্তরে ভাগফল ৭/ ৫/৩ শুভ; ৯/১ সদ্য ফল; ৬ অশুভ; ২/৮ নষ্ট।

এ পদ্ধতিতে ৪০ ÷ ৩ (জীবন-মরণ); (৩৪ ÷ ৩ জয়-পরাজয়); (৩২ ÷ ৩ গর্ভসন্তান) ; সুখদুঃখ/গমনাগমন (৩৮ ÷ ৩)-এর ভাগফল : সাত পাঁচ তিনে কুশল সাত নয় একে হাতে হাতে/কি করিবে ছয় বটে; কার্য নষ্ট দুয়ে আটে।।

কাকের ডাক শুনে দ্বিগুণ করে ৭ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল থেকে প্রতীক-তথ্যাদি নির্ণয় করা হয়।[১৪০]

অঙ্কের 'বামাগতি'র প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। একাধিক সংখ্যাযুক্ত সংখ্যার যোগ-ফলের একক সংখ্যা হচ্ছে তার যথার্থ রূপ। যেমন ৩৭৪ = ৩+৭+৪ = ১৪ = ১+৪ = ৫।

(২) ডানের সংখ্যাকে বামের ফল বা পরিণতি হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন ২১ = ২ দ্বন্দ্বের প্রতীক; এর ফল ১ বা মিলন।

২৩ = ২ দ্বন্দ্বের প্রতীক; তার ফল আরেকটি নতুন অনৈক্য।[১৪১]

লালনের গানে ঐতিহ্যবাহিত সংখ্যা দ্বারা বস্তুনির্দেশের (যেমন একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ ইত্যাদি) পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে। তিনি সংখ্যা-প্রতীকে সাধনজগতের নানা বস্তু নির্দেশ করেন। যেমন প্রচলিত ঐতিহ্যে, 'পাঁচে পঞ্চবাণ'। কিন্তু লালন 'পঞ্চজন' অর্থে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (পদ ১২৯); পঞ্চকুটরি (পাঁচ পঞ্জাস্তন —হস্ত, পদ. গলা, দেহ, মস্তক; পদ ৬৭); পঞ্চতত্ত্ব (চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস/ বা পঞ্চগব্য—দুধ, দই, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র; পদ ৪০)[১৪২] প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করেন। পঞ্চমুখে (২০ নং পদ) শব্দটি শিবের বিশেষণ এবং বাগ্‌বহুলতার অর্থ বহন করে। লালনের সংখ্যা-প্রতীকের

অনড় নির্দিষ্ট অর্থ নেই। (যা ঐতিহ্যবাহিত সংখ্যা-প্রতীকে আছে)। সচেতনভাবে ঐতিহ্যবাহিত সংখ্যা-প্রতীককে তিনি ভেঙে ফেলে, এর নানা বৈচিত্র্য নির্দেশ করেন। যেমন 'একে চন্দ্র'কে, মান্য করে তিনি মূলচন্দ্র/কৃষ্ণচন্দ্র/ গৌরচন্দ্রের উল্লেখ করেই, দু'চন্দ্র, চারচন্দ্র, গরলচন্দ্র; লক্ষ লক্ষ চন্দ্র, এ চাঁদ, সে-চাঁদ, চাঁদের গাছ, চাঁদের ফল প্রভৃতি বর্ণনা দ্বারা (পদ ২৪১)—'একে চন্দ্র' সিদ্ধান্তটি প্রসারিত ও পরিবর্তিত করলেন। তিনি ৪ বেদ অগ্রাহ্য করেছেন। ৮-এ অষ্টবসু না গ্রহণ করে লালন লিখলেন, অষ্টবেদ, ৮ সখী। (পদ ৩৭০)। প্রায় অধিকাংশ সংখ্যা-প্রতীকে অনড় অর্থকে পরিত্যাগ করে; দেহসাধনার নতুন প্রতীককে চিহ্নিত করেছেন লালন।

ঈষৎ অর্থান্তরিত দু'টি সংখ্যা-প্রতীক দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন নতুন আর একটি সংখ্যা-প্রতীক। যেমন ১৬ জনা বোম্বেটে = (৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্মেন্দ্রিয়) = ১০ ইন্দ্রিয় + ৬ রিপু (পদ ২৩৬; ১৬ জন সেপাই—পদ ২১৩)।

প্রাগুক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের দশটি দ্বার দেহে পরিকল্পিত হয়। তাই 'দশ দুওয়ারী মানুষ-মক্কা' (পদ ২১০)।

সংখ্যা-প্রতীকের ক্রমানুযায়ী 'নবম দ্বার'—জননেন্দ্রিয়ের (মূলত নারীর যোনিদ্বারের) প্রতীক। নব ঘাট, নবম দ্বার, নবদ্বীপ শব্দে শ্লেষাত্মকভাবে নারী-জননেন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে এ দ্বীপটি জাত হয়। এই নয় সংখ্যাটি (৩×৩) তিনের গুণিতক। তাই ত্রিবেণী, ত্রিপিনি, তেঘাটা, তিরনালা, তিনবারি, তিন যোগ প্রভৃতি শব্দগুলি নবম (দ্বার)-সম্পৃক্ত। 'দশে দিক' লালন গ্রহণ করেননি। দশম ইন্দ্রিয় মন বা চৈতন্য। যে গুপ্তদ্বার দিয়ে, রজঃ + শুক্র নির্গত হয়, সেটি 'দশমী দুয়ার' নামে আখ্যাত। দশমে 'যোগ' (রজঃপ্রবৃত্তি) বারির গোলা [রজঃমিশ্রিত (গোলা) বারি] নির্গত হয় (পদ নং ৭৩)।[১৪৩] মন বা চৈতন্যের সঙ্গে রজঃবীজের ঐক্য এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

বৈষ্ণবীয় পঞ্চবিধ রস অষ্টপ্রকার বা বারো প্রকার ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের রস-পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে তিনি আয়ুর্বেদের কটু, তিক্ত, অম্লাদি ষড়রসকে গ্রহণ করেছেন। এগুলি ইন্দ্রিয়বেদ্য বাস্তব। তিনি ৩৬০ রসের কথা বলেছেন। ৩৬০টি প্রধান শিরা বা নারি দ্বারা বাহিত রস বা ৩৬০ দিনের বছরে (চান্দ্র-বছর) যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকার রস দেহে পাওয়া যায়। এর অর্থ : সর্বদা দেহে মূত্ররস লভ্য। অভিপ্রেত অর্থে নারীর স্তনদুগ্ধ, রজঃ বা মূলবস্তু শুক্র দেহের ৩৬০টি প্রধান নাড়ি দ্বারা বাহিত সমস্ত সারের মিশ্রণে তৈরি হয়, তাই এগুলি ৩৬০ রস।[১৪৪] এই রসের মধ্যে তিন দিনের দিন রস লালনের পদে গুরুত্বপূর্ণ বলে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে (পদ ১৪ ইত্যাদি)। এভাবেই সংখ্যা-প্রতীকে ভাববাদী সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে দেহতাত্ত্বিক এবং আয়ুর্বেদের বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐতিহ্যকে লালন গ্রহণ করেছেন বহু স্থলে।

সংখ্যাবাচক শব্দ দিয়ে লালন দৈহিক বস্তুসত্তাকে নির্দেশ করেন; বাহ্যিক অনুষঙ্গ স্মরণ করেন। যেমন :

৪ জনকে দিলেন চার জাজন (পদ নং ১১৬)। চার ইয়ারকে (আলী, আবুবক্কর, ওসমানাদিকে) তরিকত, হকিকত, শরীয়ত, মারফত সাধনা জানালেন। তিন মানুষের করণ (পদ ১০০)— যোনিজ, অযোনিজ, সংস্কারা এই তিন মানুষের সাধনা বা করণ, টল, অটল, সুটল।

৪ ভেঙে দুই হলো পাকা (৪৬) (চারভূত থেকে রজঃবীজ)

তিন তার (১৩১)— ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ঘিরিলো ৪৯ (৩২৮ পদ) = উনপঞ্চাশটি বায়ু আক্রমণ করল। চার যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি কিন্তু এ শব্দগুলির গুপ্ত অভিপ্রেত অর্থ আছে। দেহস্থানবিশেষকে ঐতিহ্যবাহিত পরিভাষায় তিনি উল্লেখ করেন—ত্রিবেণী, দ্বিদল, ষড়দল, ১৬ দল, দশম দল, শতদল, সহস্র দল (১১১ পদ)। অনেক সময় সংখ্যা-প্রতীক উহ্য রেখে বস্তুসত্তার উল্লেখ করেন তিনি; যেমন : ছনি, মণি, লাল, জহর (পদ ৪৪) —কথিত হয় নবী মহাম্মদ মৃত্যুসময়ে চার পেয়ালায় রক্ষিত চার ধরনের বস্তু চারজন ইয়ারকে দেন। তা থেকে চার মত বা চার ধরনের বস্তুকে নিয়ে সাধনার সৃষ্টি। এখানে চার রং-এর উল্লেখ থেকে বস্তুনিচয় এবং পেয়ালা ও চার ইয়ারের অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। এ ইঙ্গিত চারচন্দ্র-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত।[১৪৫]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; নবী, আদম, খোদা; সাধু গুরু বৈষ্ট (পদ ৬৪, ১০৩)—এ নামগুলি দিয়ে তিন দিনের তিন রস বা ত্রিগুণ, তিন সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ৬৪ ও ১০০ নং পদে বলা হয়েছে যে আদি এক বিসিমিল্লা থেকেই এ তিনের জন্ম। অনেক সময় সংখ্যা-প্রতীকের বস্তুসত্তার নাম তিনি নিজেই করেছেন; যেমন সাধু, গুরু, বৈষ্ট তিনে (১০৩)।

দু'জনা নুরি— পুরুষ, নারী (২৮১)। তিন রাগ-সাধক, সিদ্ধি প্রবর্ত্ত (পদ ৭৩)। সংখ্যা-শব্দের সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রে লালন অন্য শব্দযোগে প্রতীকনির্মাণ করেন। এই পরবর্তী অংশ বদলে প্রতীকের অর্থান্তরও তিনি ঘটান। যেমন চার জুগ, চার রূপ, চার চন্দ্র, চার ইয়ার, চাররূপো ফানা।

অনেক সময় সংখ্যা-শব্দে মিশ্রিত শব্দাংশ পরিত্যক্ত হয়ে শুদ্ধ সংখ্যাটি উল্লিখিত হয় মাত্র। যেমন তিনের সাধন (পদ ১৮১, তিঁন রসের সাধন); চৌরাশী (পদ ১৮৪, ৮৪ লক্ষ যোনি)। সংখ্যা-প্রতীকে মিশে থাকে দেহসাধনার পরিভাষা ও জটিল অনুষঙ্গ; ক্ষেত্রবিশেষে তার আভিপ্রায়িক অর্থান্তর। লালন ও তাঁর অনুসারীদের গানে 'চার কার' শব্দটি পাওয়া যায়। এঁদের সাধুসভায় ও গানের খাতায় 'কারের গান' নামে একটি পর্যায় পাওয়া যায়। এটি চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। ধর্মমঙ্গলে, শূন্যপুরাণে, উপনিষদের নাসদীয় সূক্তের ঐতিহ্যানুরূপ এ বর্ণনা নাথসাহিত্যে লভ্য। শূন্য থেকে কীভাবে সৃষ্টি হলো—এ বর্ণনাই কারের গানে পাই। অন্ধকার, কুয়োকার, ধন্দকার, নীরাকার এ চার 'কারে' সৃষ্টি। নীর বা জলীয় শুক্রবস্তুর জন্মবিবরণ হিসাবেও কারের গান গৃহীত হয়। এটি লৌকিক পরিভাষা।[১৪৬] জন্মান্তরবাদীগণের বিশ্বাস যে ৮৪ লক্ষ যোনিতে জন্মলাভের পর জীব জন্মচক্র থেকে মুক্ত হয়। তাই বাউল গানে ৮৪ লক্ষ যোনির প্রসঙ্গ-অর্থ পুনর্জন্ম। হাতের আঙুলের প্রস্থের মাপে দেহ ৮৪ আঙুল। সুতরাং ৮৪ অর্থ দেহ; শুক্র থেকে দেহগঠনের জীবাচারই ৮৪তে ঘুরে মরা বা লক্ষযোনি ভ্রমণ। অর্থান্তরে, কেউ কেউ বলেন যে দেহসাধনার লক্ষ্য যোনিসাধনা। কারো মতে ৮৪ লক্ষ যোনিতে জন্মের পর দুর্লভ মানবজন্ম হয়।[১৪৭] ২০৮ নং পদে লালন লিখেছেন ১৬ আনা বাকি পল। পূর্বে ষোল আনায় এক টাকা হতো; চন্দ্রের ষোলকলায় পূর্ণিমা; চারভূতের ৪টি করে গুণের সমবায় ১৬, সব মিলিয়ে ১৬ আনা / ১৬ শব্দটি লালন পূর্ণ/সম্পূর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন।

বহুত্ব, অগণ্য বোঝাতে লালনের ব্যবহৃত সংখ্যা-শব্দ হলো : (ক) অনন্ত (অনান্ত

কোটি চন্দ্র,২২৪ পদ) (অনন্ত রূপ, পদ ১০); (লক্য জুনিতে১৯৪); (নানা পক্ষ-পক্ষী, পদ১৯০)।

(খ) শব্দ-দ্বিত্ব : লক্ষ লক্ষ (লক)[২], পদ ১১৫); শতশত (কুটরি কোটা, ২১৬ পদ); লাখলাখ হাজী (২১০) (গ) নেতিবাচক বাক্যগঠনে ও বক্রোক্তিতে বহু বোঝানো হয়; একরূপো সে নয় (অর্থাৎ বহুরূপ)।

লালনের ব্যবহৃত সামান্য পরিমাপক শব্দ হচ্ছে : দন্ডেক (পদ ১৮১), এক রতি (২০২ ও ২০৯ পদ); তিল পরিমান (২১৬ পদ); ক্ষেণেক (পদ ২২০), তিলেক (পদ ২৫২), তিলার্ধ (পদ ৪৮), একদিনো (পদ ১৫), একবারের জন্যও নয়, ২২১ নং পদে একবার ও একদমের ব্যবহারে 'একও নয়' অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সময়-গণনার তিল, দন্ড, প্রহর (১১৪), যুগ (১০২, ১৬৩ পদ) প্রভৃতি শব্দ ব্যাপকভাবে লালন ব্যবহার করেছেন।

ভগ্নাংশের ব্যবহার তিনি করেছেন : তিলার্ধ; আদ মক্কা, আধ লীলা, আধ ইমান (পদ ১৮, ২১০)—শেষ তিনটি শব্দে অবশ্য শ্লেষে 'আদি' অর্থ দ্যোতিত হয়। লালনের গুরুত্বপূর্ণ সাধনতত্ত্ব ভগ্নাংশ আশ্রিত : আধরতি/সাড়ে তিন রতি (১৪ পদ)।[১৪৮]

অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাতে লালন কত, কেউ (পদ ১৬৭), কিসের একটা (১৬৯) প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন।

সংখ্যা দিয়ে ভৌগোলিক বর্ণনা : বারো ভাটি বাঙ্গলায় (পদ ১৪৬)। আধুনিক রাজনৈতিক বিভাগ : এক শহরে ২৪ জেলা (পদ ২০৯, ৯০) সংখ্যার ক্রমবর্দ্ধনে সাধনা/বিকাশ/সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে : এক দুই হয় গঠিতে সংসার; চারেতে আহাম্মদ (পদ ১৭৭ খ; মূল বস্তু থেকে নরনারী; চারভূতে গঠিত হয় দেহ)। একের জুতে তিনটি লক্ষণ (পদ ২৪৫); একেতে হয় তিনটি আকার (পদ ৩২৫); একে একে ৪ রূপো ফানা (পদ ২০৬)।

অপরোক্ষ বর্ণনায় সংখ্যার সাহায্যে স্থান, কাল, পাত্র নির্দেশিত হয় গানে : তেঘাটা ত্রিপিনী তায় বাঁকা নল (৩৫৬ পদ); অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়ার প্রথম সে তো (পদ ২৩২); মাসান্তরে (২৮১); নবঘাট নবঘেটেলা (পদ ৭৩); পঞ্চজন বেরাদব তার ১৬ জনা (১২৯ পদ)।

সংখ্যা-শব্দ দ্বারা রচিত বিরোধাভাস ও উল্টা কথা : নানা পক্ষ এক ব্রক্ষে বয় (১৯০ পদ); একটি সর্পের দুটি ফোনি দোমুখে কামড়ান তিনি (পদ ২৩৪); তিল পরিমান জাগা বলা যায় শত শত কুটরি কোটা তায় (পদ ২১৬); এক মরণে দু'জন মরা (পদ ২৯০)।

কুড়ি শব্দের গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যবহার তিনি করেননি। তাঁর ব্যবহৃত সংখ্যা-শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো।

এক : একেতে (৩২৫), একডালে (২৭০), এক মরণ (২৯০), একবার/ একদিন/ একদিনো (২৫৩, ১৫, ২২১), এক চন্দ্র (২৪১), একের জুত, এক রাজা (২৩৬), এক সাপ (২৩৪), একদম (২২১), একরতি (২০২, ২০৯), একা (১৯০), এক রূপ (১৭০), এক রসিক নাগর (১৩৬)।

এক নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও, লালন মূলত দ্বন্দ্বহীন. নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক হিসাবে সংখ্যাটিকে

ব্যবহার করেছেন। একের দু', তিনে, পাঁচে, চারে—পরিণাম বা বিবর্তন বর্ণনা করেছেন।

নির্দিষ্ট এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রাজা লালনের বর্ণনায় এক। একের বিবর্ত বহু। বহুর মধ্যে তিনি একের সন্ধানে রত। তবে বহুকে অগ্রাহ্য করে নয়।

২/ দুই/ দো : দুকুল (১৮৩), দোটানা (১৯১), দোভাসাভাবে (১৯৪), দুটিনেহার, দুইরূপ (২৩৮), দোমুখ (২৩৪, যোনি ও মুখ), দুই নুর (১৭৬), দুচন্দ্র (২৪১, রজঃবীজ) , দুপক্ষে (১৫১), দুজনা নুরি (২৮১), দ্বিদল (২৪২)। যৌনাঙ্গে দ্বিদল পরিকল্পিত। দুটি পাতার গ্রন্থ হিসাবে এর উল্লেখ পাই। দুই থেকে সৃষ্টি গণ্য করেছেন লালন। এক মূলবস্তু বা ব্রহ্মবস্তু থেকে নর ও নারী—তা থেকেই সৃষ্টি। দুই, তাঁর গানের বহুক্ষেত্রে সমস্যা, দ্বন্দ্ব, সংশয়ের প্রতীক।

তিন : তিন রাগ—সাধক, সিদ্ধি, প্রবর্ত্ত (৭৩), তিন তাল (৯৬), তিন মানুষ/ করণ (১০০) ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না তিন মানুষ; সুষুম্নার সঙ্গ করে মানুষ হওয়া যায় (ষষ্ঠিচরণ ধর) ত্রিধারা, ত্রিগুণ : কথিত হয় গঙ্গার পূর্বে গঙ্গা, মধ্যে সরস্বতী ও পশ্চিমে যমুনার জলধারা বহে। এ তিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য পৃথক। এই ত্রিধারাপ্রবাহ নিঃশ্বাস ও রজঃসম্পৃক্ত (১১১)। তিন তার (১৩১)— ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। তিনরস (১৪), তিরনালা, ত্রিপীনি (১৪), তিন দিন, তিন মর্ম (২৩২), তিন সময় তিন যোগ (৪৪)— রজঃের তিন দিনের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ত্রিপথে আগত ধারাগুলি। ত্রি-পানি বা তিন ধরনের রসের সঙ্গে যুক্ত; ত্রিকোণ যোনিকে 'তেঘাটা ত্রিপীনি' (৩৫৬) বলা হয়; তারতিরো ধারা (২১৪)। তিনের সাধন (১৮১) এই।

ত্রিজগৎ, ত্রিভুবন (৩৩, ১১৪, ২২৪) : স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল--- মাথা বা গলার ঊর্ধ্বে স্বর্গ, বুক (নাভির ঊর্ধ্বে) মর্ত্য; নাভির নিম্নে পাতাল। তিনের ঘর, তিন লক্ষণ, তিনের মর্ম (২৪৫)— যোনি ও রজঃসাধনাসম্পৃক্ত শব্দ।

(একেতে হয়) তিনটি আকার (৩২৫)— মূলবস্তু থেকে নর, নারী নপুংসক সৃষ্টি হয়।

তিন বাসনা (৩৪৩)— চৈতন্য চরিতামৃতে তিন বাঞ্ছার প্রসঙ্গ আছে। চোখে রূপ দেখা, স্তন ও যোনির প্রতি আকর্ষণ মানুষের কখনো তৃপ্ত হয় না।[১৪৯]

লালনের গানে 'তিন' সংখ্যাটি সাধনার প্রসঙ্গে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিধারা ত্রিগুণে সমস্ত সৃষ্টি। ত্রিভুজ, ত্রিকোণ জন্মস্থান। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আল্লা আদম মহম্মদ, আলেপ লাম মিমের লীলা এ বিশ্ব ও দেবভুবনে।

হাতের ত্রিকোণ মুদ্রায় লালনপন্থীরা 'সেজদা' (প্রণাম) দেয়। সত্ত্ব রজ তম, বায়ু পিত্ত কফ, তিন নাড়ি, ত্রিরজঃধারা, তিন শ্বাসপ্রশ্বাস—নাকে, বুকে এবং যোনিতে এই ত্রিসত্তা লভ্য।

৪ : ৪ কার (২৭৩), ৪ চন্দ্র (গুহ্য. মূত্র, শুক্র, রজঃ)[১৫০] ৪ পেয়ালা (২৩৫)—জহুরি (রং লাল), জব্বুরি (জরদ), ছত্তরি (সিয়া), নুরি (সফেদ)। এতে জিব্রাইল, মেকাইল, আজরাইল, ইস্রাফিল থাকে। এছাড়া আছে এক বেখুদি পিয়ালা; তা গুরুগম্য। ৪ নুরি ইমাম ৪ দ্বারে থাকে।

৪ ইয়ার, ৪ যাজন-শরীয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত-এ চার পন্থা নবী আবুবক্কর ওসমান, আলীকে দিয়েছিলেন।

৪ যুগ (১০২, ১৬৩) : কলি, দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য। ১২ বছরে এক যুগ পরিকল্পনা

করে (বিশেষত নারীর রজঃবিকাশের অন্ত পর্যন্ত) ৪৮ বছরকে চারটি যুগে ভাগ করা হয়। ১২ বছর পর্যন্ত কলি (অবিকশিত মাতৃদ্বার); ১২ থেকে ২৪ দ্বাপর (দ্বিপ্রহরের মতো প্রখর যৌবন); ২৪-৩৬ বছর ত্রেতা (প্রৌঢ়); ৩৬-৪৮ সত্যযুগ [কাম নয় প্রেমের প্রাধান্য]। অনেকে ১২ থেকে ২৪ হিসাবে কলি গণনা করে; সত্যকে স্থাপন করেন ৪৮-এর পরে।

১৬-কে একক হিসাবে ধরে ৪৮-কে তিনভাগে বিভক্ত করে 'ত্রিকাল' পরিকল্পিত হয়। রজঃর উদয়-বিলয় এ পরিকল্পনার মূল সূত্র।

৪ ভূত : আব, আতস, খাক, বাদ = জল, আগুন, মাটি, বাতাস-এ চারটি মৌলিক ভূত এবং সমস্ত বিশ্ব এ চারের বিবর্ত বা পরিণামমাত্র। এ চারের প্রতি পক্ষপাতে এককে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ৪টি; কোরাণ ৪টি, বেদ ৪টি, সম্প্রদায় ৪টি, সাধনপন্থা ৪টি, (স্থূল, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ বা আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই বা শরীয়ত, হকীকৎ, তরিকত, মারফত)। পুরুষ বা নারী চার ধরনের। শৈব, নাথ, সুফীদের ৪ গোষ্ঠী। চার সংখ্যাটি সমস্ত বিভাজনের মূলে সক্রিয়। হিন্দু বা মুসলমান চার ধরণের : শেখ, সৈয়দ মোগল, পাঠান, ব্রাহ্মণাদি। চারভূতই নামগানের মূলের চার অক্ষর, কোরাণের চার কালমা। এই চারভূতাত্মক নর, নারী (লিঙ্গ, যোনি), রজঃ, বীজই চারবেদ। চার সর্বনিম্ন পূর্ণতার প্রতীক।

৪ দেশ : স্থূল—রজঃবীজে পিণ্ডদেহ ক্রমবৃদ্ধিতে পরিণত হয় স্থূল দেহে। এ দেহে জীবস্বভাব বর্তমান থাকে। বৈদিক ক্রিয়াদি, পুত্রোৎপাদন, ভোগ ও ক্ষয় স্থূলদেশের ধর্ম।

প্রবর্ত্ত : প্রবর্ত্তের স্থূল, প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত, প্রবর্ত্তের সাধক, প্রবর্ত্তের সিদ্ধ-এ চার স্তর। গুরুর কাছে নাম, মন্ত্র, দীক্ষাদি গ্রহণ করে দেহ শোধন করে সাধনার যোগ্যতা অর্জনের স্তর। সাধনা এ স্তরে শ্রুত; অনুভূত নয়।

সাধক (৪ স্তর)—গুরুনির্দেশে সখীর চরণাশ্রয়ে দেহকেন্দ্রিক দেহমিলনের সাধনার পথে অগ্রসৃতি ও বস্তুরক্ষায় সফলতা লাভ।

সিদ্ধ : (৪ স্তর) কামসাধনার অন্তে; রস ও প্রেমসাধনার স্তর।

দেশ জীবের বাসস্থান, এ অর্থে পৃথিবী ও মাতৃজঠর।

৫ : পঞ্চজন (১২০)— ৫ ইন্দ্রিয় (৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় : নাসা, জিহ্বা, কর্ণ, চর্ম, চক্ষু। ৫টি কর্মেন্দ্রিয় : হাত, পা, জিহ্বা, পায়ু, উপস্থ)।

৫ ফেরেস্তা : (৪ + খোদা) জিব্রাইল—(বাসস্থান) লাহুত—জিহ্বা বা মুখ। ইস্রাফিল—নাহুত—(ঐ) নাক। আজরাইল—মালকুত—কান। খোদা—ছাদরাতন মন্তাহা—মস্তিষ্কে।

৫ ইমান : বেলগায়েব—না দেখে বিশ্বাস করা। ইনসান একীন—দেখে বিশ্বাস। আক্কেল একীন—দেখার পর দৃঢ় বিশ্বাস। হক্কেল একীন—তদন্ত করে বিশ্বাস। হুয়াল একীন—পরীক্ষা ও বারবার প্রমাণ পেয়ে দৃঢ় বিশ্বাস।

এই শেষোক্ত বিচার ও বিশ্বাস বাউল-সাধনায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ/বেলায়ত বলে উল্লিখিত।

৫ দরিয়া/সরোবর : অক্ষয়—মস্তিষ্কের সহস্রারে, মানস—উদরে, ক্ষীরোদ—উদরের নিম্নভাগে, পৃথু/কাম—তারও নিম্নে, প্রেম/কাম—জননেন্দ্রিয়ে।

তন্ত্রের ৫ ম-কারে ষষ্ঠিচরণ প্রদত্ত ব্যাখ্যা : মদ—মূত্র, মুদ্রা—বীর্য, মৎস—কুম্ভক, মৈথুন—দেহমিলন, মাংস—রজঃ—এই পঞ্চতত্ত্ব।

পঞ্চতত্ত্ব : ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তাখ্য এবং ভক্তশক্তি। এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ গৌরলীলায় যথাক্রমে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি, গদাধররূপে অবতীর্ণ। ইসলামের ব্যাখ্যায় নবী, আলি, ফাতেমা, হাসান, হোসেন পঞ্চতত্ত্ব।[১৫১]

পঞ্চবায়ু : ৪৯ বা প্রায় ৮০ প্রকার বায়ু শরীরে থাকে; এদের মধ্যে ৫টি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ। এ বায়ুর নিবাস ও কর্মকাণ্ড নিম্নবর্ণিত :

প্রাণ—নাসিকা—নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস; অপান—নাভি থেকে মূলাধার—মল, মূত্রাদিত্যাগে সাহায্য; সমান—নাভিদেশ—খাদ্যাদি পরিপাক; উদান—কণ্ঠে—হিক্কা, হাই; ব্যান—সর্বশরীরে—রস, রক্তাদির সঞ্চালন।

পঞ্চ আত্মা : জীবাত্মা বৈসে গুহ্যদেশে, ভূতাত্মা বৈসে লিঙ্গ-যোনিতে; পরমাত্মা বৈসে কুণ্ডলিনীতে; আত্মারাম— ১৬ দল পদ্মে কণ্ঠ বা হৃদয়ে; আত্মারামেশ্বর—সহস্রদল পদ্মে, মস্তিষ্কে।

এদের খাদ্য, কর্ম, বর্ণ ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায় মুদ্রিত ও কলমী পুঁথিতে। ফকিরদের মধ্যে পঞ্চ নফস এবং পঞ্চ রুহুর ধারণা আছে। [রহ্‌মানি, মোমোইনা, সোয়েম্মা, মলহেমা, আম্বারা; হায়ানি, ইনসানী, নবাতি, মোমেইনা জমাতি। হায়ানীতে আল্লা; ইনসানীতে আজাজিলের স্থান।]

৫ বাণ : মদন, বৈসে বাম নেত্রকোণে—বাম নাকের দম; মাদন, বৈসে ডান নেত্রকোণে—ডান নাকের দম। শোষণ; অধরে, শুধিয়া লওয়া।
স্তম্ভন; শৃঙ্গারে—জন্মস্থান শোষণ।
মোহন; বক্ষে ও যোনিতে (কটাক্ষে); আনন্দে মগ্ন হওয়া। মতান্তরে দাবন, ক্ষোভন, আকর্ষণ, বশীকরণ, সম্মোহন এই পাঁচ বাণ।[১৫২]

পঞ্চকুঠরী (৬৭ পদ) : চর্যাপদে (১ নং পদ) কায়া-তরুর পাঁচটি ডালের কথা আছে। মাথা, গলা, দেহ, হাত, পা প্রভৃতি বিভিন্নভবে দেহবিভাগের পরিকল্পনা পঞ্চ কুঠরীতে হয়।

৫ জন ধনী : ঐশ্বর্যপূর্ণ পঞ্চইন্দ্রিয়—সতেজ (পদ ২৩৬) থাকে—তাই ধনী।

চারভূত ও মূলবস্তু; শরীরের চার অংশ ও মাথা; বস্তুর পঞ্চবিধ দৈহিক পরিণাম লালনের ৫ প্রতীকে স্থান পেয়েছে।

৬ সংখ্যাটি দেহতত্ত্বে ষট্‌চক্র এবং সে স্থান বিশেষ শক্তি/সত্তার বাসকে চিহ্নিত করে।

৬ জন মন্তন্নী (মন্ত্রী) (২৬৬) : ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রেরণা বা উত্তেজনা দান করে—কাম (মস্তকে বাস), ক্রোধ (নেত্রে রয়), লোভ (বক্ষে স্থিতি), মোহ (নাভিতে বসতি), মদ (কণ্ঠে বাস), দম্ভ/মাৎসর্য (গুহ্যেতে প্রকাশ)।

৬ ঐশ্বর্য (পদ ২৯০)—ষড়ৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ৬ পরিচ্ছেদ)।

ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য (যৌবন-মতান্তরে)।

৬ রস—মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল, কটু। বিভিন্ন রসে এ স্বাদ পাওয়া যায়। ষড়রসিক—এই ৬ প্রকার রস যিনি আস্বাদন করেন।

সাধারণভাবে পঞ্চরসিক/নবরসিক বা ৩৬ জন রসিক সাধকের বিবরণ পাওয়া যায়।

রসিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। তন্ত্র এবং নারীকেন্দ্রিক রসসাধনা, রজঃবীজের গুরুত্বে এদের সহজ সাধক বলে অনেকে মনে করেন।[১৫৩]

ষড়রিপু, তাদের ছ'টি কেন্দ্র এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসাবে ৬ সংখ্যার ব্যবহার ; ষড়বিধ দৈহিক তরল পদার্থও এর অন্তর্গত। পদ্ম বা চক্র প্রতীকে এ সংখ্যার ব্যবহার লালনে খুব বেশি নয়। পদ্ম, চক্র, লতিফা হিসাবে দেহের ছ'টি স্থান নির্দেশিত হয়। নফস—নাভির নিম্নে ; কালব—বাম স্তনের দু' আঙুল নিচে (ফতেমার স্থান) রুহু—ডান স্তনের দু' আঙুল নিচে (আলির স্থান) ; ছের—কালবের দু' আঙুল নিচে ; খোফী—ভ্রূদ্বয়ের মাঝে ; আকফা—ব্রহ্মাতলুতে। নাথ বা তন্ত্রের ষট্‌চক্র এ থেকে ঈষৎ ভিন্ন।

৭ : লোকজীবনে সাতের বহু ব্যবহার, বহুত্ব বোঝাতে। লালনের সপ্ততালা (২২৬) দেহ-পরিকল্পনা তারই স্মারক। দেহে সপ্তধাতুর স্তর আছে খাদ্য → রস → রক্ত [মেদ] → মাংস → অস্থি → মজ্জা → শুক্র।

দেহে আছে ৭টি করে দ্বীপ, সমুদ্র, নদী, সেফাত ; বয় সপ্তধারা : মল, মূত্র, শুক্র, থুথু—লালা, চোখের জল, নাকের রস, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। নর ও নারীর সাড়ে-তিন ফোঁটা করে মোট সাত ফোঁটা বস্তু দিয়ে সপ্তধাতুর সপ্তস্তর সৃজিত হয়।

৮ প্রহর : প্রাচীন ভারতীয় সময়-বিভাগে ১ প্রহর = ৩ ঘণ্টা। সুতরাং আট প্রহর (১১৪) কথাটির অর্থ দিনরাত—সর্বদা।

৮ বেদ (৩৭০) শব্দ অষ্টসখীদের স্মারক। সখীগণ রাধাকৃষ্ণলীলার সহায়তা করে। দেহমিলনকালে বিভিন্ন দেহাঙ্গে (স্তনাদি) অষ্টসখীর অবস্থান কল্পনা করা হয়।

৪টি মূল ভূতের ৪টি করে গুণের সমবায়ে ১৬টি উপাদানের অর্ধেক ৮টি উপাদান নর বা নারীদেহে আছে।

৮ ধরনের সেবা আছে—এই পালনীয় ধর্ম। (তৈল, তাম্বুল ও তামাক, অন্ন, পদ, অঙ্গ, চিত্রনয়ন, নিজ মনোমতো, গুরুমনোমতো)।

নব দ্বার : ২ চোখ + ২ নাক + ২ কান + মুখ + গুহ্যদ্বার + লিঙ্গদ্বার (২১৬, ৬৭ পদ) = নব দ্বার। অনেক সময় কুমারীর যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে যোনিদ্বারবিকাশকে নতুন (নব) দ্বার হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

দশম : (৬৭) এই নবদ্বারের অতিরিক্ত দশমী দুয়ার দিয়ে রজঃ ও মূলবস্তু শুক্র নির্গত হয়। এ দ্বার বন্ধ থাকে ; সময়বিশেষে হয় স্বভাবে। এ 'প্রেম-তালা', গুরু-প্রদত্ত চাবি দিয়ে খোলা যায়। এ দ্বার জীবে চেনে না ; সাধুসন্তের ধ্যানস্থল।

১২ সংখ্যাটি সূর্যের সঙ্গে জড়িত— পুরুষশক্তি। ১২ ভাটি (১৪৬)—দ্বাদশ দেউল বা দ্বাদশ আয়তন দেহে বারটি বুরুজ কল্পনা করা হয়। গুরুদেহের ১২টি অঙ্গের বৈশিষ্ট্য অবলোকন করে, মনে সেগুলির স্মরণে গুরুর নক্সা ভেসে ওঠে। এইভাবে গুরুমূর্তি স্মরণে আনা যায়।[১৫৪] ১২ বছরে দেহে শুক্রের আগমন ঘটে ; রজেঃরও। এজন্য সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ।

১৩ চিজ (৬৬)—চোখে ২ ধারা + নাকে ২ ধারা + কানে ২ ধারা + মুখে ১ ধারা + গুহ্য, মূত্র, শুক্র = ধারা। এর সঙ্গে রজেঃর তিন ধারা বা লালা, ঘাম ও রজঃ-এ তিনের যোগে ১৩টি ধারা হয়।

নারীদেহের পঞ্চস্থানে পাঁচটি সেজদা দিয়ে হয়। পায়ে, যোনিতে (মক্কা), নাভিতে (মদিনায়)

, বুকে (বেহেস্তে), কপালে (আরসে)। ঋতুকালে ৩ দিনে মোট (৩×৫) ১৫টি সেজদা দেবার কথা। কিন্তু (১ম দিনে ১টি এবং) তৃতীয় দিনে পায়ের সেজদা মাফ হওয়ায় মোট ১৩টি সেজদা কোরাণে উল্লিখিত আছে। অনেকে নারীর আলেপে এক সেজদা বিয়োগ করে এইভাবে : আলেপে ১ + তৃতীয় দিনে পায়ের সেজদা ১ = ২ ; ১৫ – ২ = ১৩টি কোরাণ-বর্ণিত সেজদার বাউল-সাধকের ব্যাখ্যা।[১৫৫]

১৪ ভুবন : ৩$\frac{১}{২}$ হাত। পূর্বে ৪ পোয়ায় ১ সের হতো। দেহকে তরল কল্পনা করে ৩$\frac{১}{২}$ এ হয় ১৪ পোয়া (এর সঙ্গে দুপোয়া রজঃ+বীজ = ১৬)। দেহে ৭ স্বর্গ + ৭ পাতাল = ১৪ ভুবন আছে।[১৫৬]

১৬ : ১৬ দল—কণ্ঠে নির্দেশিত পদ্মের ১৬ দল ১০ ইন্দ্রিয় + ৬ রিপু বা ১৬ কলা, ১৬ আনা পূর্ণত ; পূর্ণযৌবন এবং প্রবলতার প্রতীক। ১৬ জন সেপাই (২১৬) পরিকল্পনায় সমকালীন সামন্তপ্রভুর বলবান লাঠিয়ালদের প্রতিচ্ছবি আছে ; বোম্বেটে কল্পনায় দস্যুর প্রতিচ্ছবি। ১৬টি স্বরবর্ণ এবং চন্দ্রকলার ১৬টি মাত্রা তন্ত্রে ও দেহতত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৬টি চন্দ্রাত্মক, নারীশক্তি ও কামকলার সঙ্গে যুক্ত।

১৮ মোকাম : পূর্বোক্ত ১৪ ভুবন + নাছুত, মালকুত, লাহুত, জবরুত অথবা মায়ের ৪টি বস্তু (রক্ত, গোস্ত, পোস্ত, চুল), + বাপের ৪ (হাড়, হাড্ডি, মণি, মগজ) + নিরঞ্জনের ১০ (দশ ইন্দ্রিয়) = ১৮।

আঠারোটি স্থানে বিভিন্ন শক্তির বাস, এ নিয়ে সাধু/ফকিরদের মধ্যে অনেক ছড়া-গান প্রচলিত :

চূড়ায় চূড়ামণি ব্রহ্মা করেন স্থিতি। পদমধ্যে মহাবিষ্ণু করেন বসতি॥
চক্ষুমধ্যে কালাচাঁদ করিছেন ধ্যান। কর্ণেতে চৈতন্যচন্দ্র করেন সাবধান॥
নাসিকাতে নিত্যানন্দ করেন মধুপান। জিহ্বার নীচে গয়াগঙ্গা ৩২ সোপান॥
আলজিহ্বায় নারদঋষি কোন্দাল যোগান। জিহ্বাতে শ্রীহরি কণ্ঠেতে সরস্বতী॥
গলায় গোলকেশ্বর করেন বসতি। সতত বাহুতে বাস করেন বলরাম॥
পাজরের বারটি কাঠি বারুণী সমান। নাভিতে গৌর ব্রহ্মা রনের অবস্থান॥
ভগেতে ভগবতী লিঙ্গে সদাশিব। পরমানন্দে খেলা করে ব্রহ্মাণ্ডের জীব॥
হাঁটুতে করিছে বাস চলন শকতি। পাদপদ্মে সদা বাস করেন বসতি॥
আঠারো মোকামের কথা শুন হে পার্বতী।
আঠারো মোকামের কথা যেই জন জানে। গন্ধর্ব মনুষ্য কেন দেবতা তারে মানে॥[১৫৭]

২৪ জেলা (৯০, ২০৯ পদ/২৪ হরফ, ২৫৭ পদ)।

সাংখ্যদর্শনে ২৫টি মূল তত্ত্বের পরিচয় আছে। সাধকেরা ২৪+$\frac{১}{২}$ রজঃ বীজ এভাবে ২৫ গণন করেন। কামগায়ত্রীর ২৪টি (২৪১/২টি) অক্ষর দেহে বিন্যস্ত আছে ; নারীত্ব $\frac{১}{২}$; পুরুষত্ব $\frac{১}{২}$ এর মর্যাদা পায়। তন্ত্রে দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অক্ষর পরিকল্পিত হয়েছে। কোরাণের সূচনায় পাই আলেপ, লাম, মিম—এ মহাবাণী। আলেপ থেকে মিম পর্যন্ত আরবী বর্ণমালায় ২৪টি অক্ষর। ফকিরবিলাস এই চব্বিশ অক্ষরে দেহগঠন বর্ণনা করেছে। মনসুরের গ্রন্থে আরবী বর্ণমালা দিয়ে একটি দেহ গঠিত হয়েছে।[১৫৮] এ অর্থে অক্ষরবিশেষ দেহাঙ্গ বা দেহাংশের প্রতীকমাত্র। কামগায়ত্রীর সংখ্য ব্যাখ্যা বা দেহস্থানে তা বিন্যাস করার আলোচনা পুঁথিতে লিখিত এবং সাধকদের মধ্যে বহু আলোচিত। হাত-পায়ের ২০টি নখ +

যোনি, নাভি, স্তন, গণ্ড এবং কপালে অর্ধচন্দ্র ধরে মোট ২৪ ১/২ অক্ষর জপের বৈষ্ণবীয় রীতি আছে।[১৫৯]

আরবীতে ব্যঞ্জনবর্ণ ২৪টি ; স্বর ছ'টি পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়। লায়লাহাইলিল্লা মহাম্মদ রসুলাল্লা—২৪ অক্ষরাত্মক ; অর্থ দেহ। দেহকে দেশ হিসাবে গণ্য করে, তার ২৪টি জেলা কল্পনা করা/বা এক শহরের ২৪টি বিভাগ—আধুনিক রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক বিভাগের প্রভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। ইংরেজদের এদেশে রাষ্ট্রীয় সীমানাবিভাগের রীতিতে জেলাবিভাগ হয়েছিল। এইসঙ্গে প্রাচীন অঞ্চলবিভাগের স্মৃতি আছে লালনে—১২ ভাটি। ভাটি বা নিম্নবঙ্গের ১২টি অঞ্চলে বারো ভুইঞার অবস্থান ছিল। এই নিম্নবঙ্গ বঙ্গ/বাঙ্গেলা নামে অধিক খ্যাত ছিল। তাই ১২ ভাটি বাঙ্গেলায়'।

৮৪ লক্ষ যোনি = শব্দটিকে শ্লেষে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন ষষ্ঠিচরণ ধরের মতে : ডিম্বজ, স্বেদজ, জরায়ুজ, বৃক্ষজ (?) এই চারিভাবে ৪ ধরনের প্রাণী সৃষ্ট হয়। কর্মফলে এ চারের মধ্যে জন্মলাভই 'চারে আসি'। অন্য অর্থে সর্বপ্রাণীর যোনির প্রতি লক্ষ্য বা আসক্তি। সাধনার চার স্তরেই যোনিতে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে সাধনা করতে হয় প্রভৃতি ব্যাখ্যা শোনা যায়।

শূন্যের ব্যবহার বা শূন্য-কল্পনা লালনের চারভূতে নেই। কিন্তু শূন্য শব্দকে তিনি আকাশ বা ফাঁকা জায়গা, আকারহীনতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করেছেন (পদ ২৮, ৭৬, ৯৬)। প্রকৃতি, নারীসত্তা, রাধাবিন্দু 'শূন্যাকারবিশিষ্ট্য' পদার্থ প্রভৃতি অর্থে শব্দটির ব্যবহার লালনে স্পষ্ট নয়। আকারের বিনষ্টি এবং বস্তুরূপহীনতাই লালন-ব্যবহৃত শূন্য শব্দের তাৎপর্য।

৮৪ ঊর্ধ্বে নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যবহার লালনের গানে অসুলভ। অনির্দিষ্ট বহুত্ববাচক শব্দ হিসাবে শত, হাজার, কোটি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত সংখ্যা-প্রতীকগুলি স্পষ্টত দেহ ও সাধনাস্পৃষ্ট।

লালনের কাব্যভাষায় বিজাতীয় দু'টি বস্তুর মধ্যে ব্যঞ্জনায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সৃজিত হয় দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত লালনের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে, দৃঢ়তা দেয়। লালন সচরাচর অবিতর্কিত, প্রমাণিত সামাজিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করেন। এগুলি সত্য বলে জনসাধারণ মানার ফলে, অতি সহজে লালনের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য হয় তাদের কাছে। লালনের দৃষ্টান্তগুলি আহরিত হয় গ্রামীণ জীবন, নিম্নবর্গের বৃত্তি এবং প্রকৃতি থেকে। এই দৃষ্টান্তমূলক যুক্তিতে সাধারণ দ্বারা বিশেষ বা বিশেষ দ্বারা সাধারণ সমর্থিত হয়।

দেহের অদৃশ্য নিয়ন্তা বাজীকরের মতো : পুথলা নাচায়, কথা কহায় (পদ ১৬১)।

দেহ ও প্রাণের সম্পর্ক : নানা পক্ষ এক ব্রক্ষে রয়, যাবার বেলায় কে কারে কয় (১৯০ পদ)।

বহুগামিতার জন্য তিরস্কার করে কৃষ্ণকে রাধা বলেছেন : গাছ কেটে জল ঢাল পাতায় (পদ ৩২০)।

কাম ও প্রেম : যে স্তনেতে দুগ্ধ খায় রে সিশু ছেলে, জোখের মখে সেথা রক্ত এসে মেলে (পদ ২৪৪)।

সৃষ্টিতত্ত্ব : মূল হৈতে হয় ডালের সেজ্জন, ডাল ধল্লে হয় মূল অন্যসোন। (৩২৫ পদ) নবীজী গাছ, সাইজী ফল (৫ নং পদ) আল্লা নবী দুটি অবতার, গাছ বীজরূপে দেখি যে প্রকার (২৬২) পদ)।

শরীয়ত মারফত : দুগ্ধেতে মিশানো মাখন (২৮৬ পদ)।

বস্তুরক্ষা করতে হবে : পারাহীন দর্পন, তাতে কেমনে হয় রূপ দরশন (পদ ৯৮) [শুক্র পারদের মতো চঞ্চল এবং রংও পারদের মতো।

সাধু অসৎকে সৎ করে : কুমরিতে পরকে জমন ধরায় সে আপন বরণ (পদ ১৫৮)।

নামসাধনার গুরুত্বহীনতা : কথায় যদি ফলে কৃষি, তবে বীজ কেন রপে, গুড় বল্লে কি মুখ মিঠ হএ, দীপ না জ্বেলে আধার কি যায় (পদ ২৩০)।

অসময়ে হয় না সাধনা : খালে বিলে মীন থাকে না জল শুকালে ** গাছ যদি হয় বীজের জোরে ফল ধরে না (পদ ১৮১)।

সাধনার ভ্রষ্টতা : তেজিয়ে অমৃত ফল মাকাল ফলে মন মজিল
ঠাকুর গড়তে বাদর, যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলো (পদ ২৯৪)।

রসিকের সাধনা : মারে মৎস্য না ছোয় পানি রসিকের তেমন কোরনী (পদ ১৮৪)। এখানে বিরোধাভাস নেই। জেলেরা জাল বা অন্যান্য উপকরণে জলে নেমে ভিজে মাছ ধরে ; ছিপ দিয়ে মাছ ধরায় জলে নামতে বা ভিজতে হয় না। চণ্ডীদাস সম্পর্কিত লোককাহিনীতে এই 'ছিপ' ফেলে পুকুরে বসে থাকার কথা আছে।

জলে ও দেহে মাছ লুকিয়ে থাকে : খাড় কৈরে মীন রয় চিরদিন প্রেম সন্দিস্থলে (পদ ১২১, নরম মাটিতে গর্ত করে থাকে মাছ)।

বিষ অমৃত একত্রে থাকে : অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা শুধা তন্নী গরল মাখা (১২৬)।

গুরু যন্ত্রী : যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন যেমত বাজাএ বাজে তেমন (৩ পদ)।

সঙ্গ : সঙ্গ গুনে রঙ্গ ধরে (৯ পদ)।

লালনের ভাষায় সাধনার বেগ এক সংযত প্রসাধনকলার জন্ম দিয়েছে। সংহত সংযত তাঁর ভাষা। শব্দ দিয়ে চিত্রকল্প রচনায় তিনি পারদর্শী কিন্তু এ চিত্র অতি সংক্ষিপ্ত। ভাষার চিত্রধর্ম অপেক্ষা সঙ্গীতধর্মে এবং ব্যঞ্জনায় তিনি অধিক মনোযোগী। ধ্বনিসৃষ্টিতে তাঁর সচেতনতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

বাংলা কবিতায় শিল্পী হিসাবে লালন একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কবিতার সংহতিসাধনে, এবং জীবনবোধের নানা প্রভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল প্রমুখ উত্তরকালের কবিসমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি সেই বনস্পতি, যার ছায়া প্রসারিত হয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র :

(১) Alex Wayman, Yoga of Guhya samaj tantra. p. 54.

অক্ষরপ্রতীক : এ = মা, ব = পিতা, ম্ = শুক্রবিন্দু।

পঞ্চবুদ্ধ/ পঞ্চশক্তি পঞ্চকুল/পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে একাত্ম করে বর্ণনা। চাব্রচন্দ্র, আরোপসাধনা ; সঙ্কেত-শব্দ ব্যবহারের গুহ্য সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্য উত্তরকালে বৈষ্ণব পুঁথি ও বাউল সাধনায় অনুসৃত হয়েছে।

(২) Do. p. 64.

অসঙ্গ, গুহ্য সমাজতন্ত্রে আপ্তবাক্য বা গুরুবাক্যকেও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত এবং গুরুবাক্যকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন লালন।

চর্যাগীতির ভূমিকা, পৃ ১৯৬।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, "সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো আঁধারির ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার

ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধনভজন করেন, তাহারাই সে কথা বুঝিবেন।" সভাপতির অভিভাষণ, ১৩২১ ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড), পৃ ৩২৫।

বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী একে 'Guru Padesad Abhisandhya মনে করেছেন।

পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের মতে বঙ্গদেশ সন্নিহিত সন্ধ্যা দেশের লোকভাষা এটি (বিশ্বভারতী, ১৯২৪, পৃ. ২৬৫)। চর্যাপদের তিব্বতী ও সংস্কৃত টীকায় সন্ধ্যা/সন্ধা-এর প্রতিশব্দ হিসাবে অভিপ্রায়, ব্যাজ, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় অভিধান (২য় খণ্ড)।

(৪) Indin historical quarterly, 1928. pp. 287 ff.

(৫) M, Eliade, pp. 169. 249.

(৬) The sandha bhasa and sandha vacana in the tantras, part I, pp, 27.

(৭) বাউল পদ্মলোচন, জয়দেব রায়, মাসিক বসুমতী, ১৮ বর্ষ, ভাদ্র ১৩৬৬, পৃ ৮৮০-৮৮১।

সহজিয়া সাহিত্য (মনীন্দ্রমোহন বসু) গ্রন্থে অনেক উল্টা পদ গৃহীত হয়েছে।

(৮) কবীর সাহিত্য কি পরখ, পৃ. ১৫৪।

(৯) quoted by B. C Misra, Tagores Kabir. The sants. pp. 169.

(১০) do

(১১) বাংলা ধাঁধার ভূমিকা, পৃ. ২-২৮, ৯৭-১০০। নট, নাট্য, নাটক দ্রষ্টব্য।

(১২) কামসূত্র, পৃ. ৬৭।

(১৩) 'রসস্য পরিপন্থীত্বাৎ নালঙ্কার প্রহেলিকা'। সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি গ্রন্থে ; পৃ. ২২৫। দণ্ডী, অভিপ্রেতার্থ গোপনকারী বাক্যকে প্রহেলিকা বলেছেন। শিষ্ট সাহিত্যে প্রহেলিকা অবজ্ঞাত কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলায় এটি আদরণীয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩-৯৪।

(১৪) ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮, পৃ. ১৭৮-১৮৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা গ্রন্থে এ ধরনের চিত্রকাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

(১৫) বাংলা ভাষায় অভিধান, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট।

(১৬) জাতক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

(১৭) সওয়াল সাহিত্য, ১৯৭৬।

(১৮) আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ। জ্ঞাত বস্তু 'অনুবাদ', আর অজ্ঞাত বস্তু 'বিধেয়' বলে কথিত হয়েছে।

(১৯) ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পৃ. ২০৬-২০৭।

(২০) Carya Gitikosa, prefacc, XII.

(২১) চর্যাগীতির ভূমিকা (গ্রন্থে উদ্ধৃত), পৃ. ২০০

(২২) যোনিতন্ত্রম্, পৃ. ৯-১৪

(২৩) কামশাস্ত্র বা রোহিণীতন্ত্র, পৃ. ১০১।

(২৪) ভাষাবিদ্যা পরিচয়. পৃ. ২২৫।

(২৫) কবিগায়ক আফাজুদ্দীন আহাম্মদ (রাধার ঘাট, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ) স-ব্যাখ্যা পদটি কবিগানে ব্যবহার করেন। তিনি এ পদটি আমাকে দিয়েছেন।

(২৬) ড. চক্রবর্তীর অনুবাদ 'Mint Language'–

vaisnabism in Bengal. p. 367.

ট্যাকশালায় তৈরি মুদ্রা নির্দিষ্ট রাজ্যে চলে ; তেমনি সাধু বা ভক্তদের মধ্যে প্রচলনের জন্য এ শব্দাদি কর্তৃত্ব তৈরি করেছে। শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবজী, পৌড়ী ৩৮, এ ট্যাঁকশালী বুলির ব্যাখ্যা পাই— ইন্দ্রিয় সংয ভাঁটি, ধৈর্য স্বর্ণকার, শুভবুদ্ধি নেহাই, শাস্ত্রানুশাসন হাতুড়ি, ঈশ্বরের ভয় হাপর, তপস্যারূপ অগ্নিতাপে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গুরু উপদেশরূপ সত্য ঢেলে সত্য ট্যাঁকশালে 'শব্দ' তৈরী করেন।

ঘড়িঐ সবদু সচী টকশাল।

হারানচন্দ্র দেবশর্মা চাকলাদার, ১৩৬৪, বহরমপুর, গঞ্জাম, পৃ. ৮১।

(২৭) সহজতত্ত্ব প্রকাশ, পৃ. ৮৬-৯২।

অসুখের দায়ে পড়ে অনেকে ঘোষপাড়ায় মানত করে এবং যায় ; গ্রহণ করে কর্তাভজা মতবাদ। এরা অসাধক ভক্ত। এ ধরনের অসাধকদের জন্য এগুলি নয়। এগুলি মুলত সাধকদের জন্য রচিত। তথ্যসূত্র : শশিশেখর মণ্ডল, কুমীরদহ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

(২৮) সহজতত্ত্ব প্রকাশ, পৃ. ৯৩।

(২৯) ভাষা দেশ কাল, ১৯৮৫, পৃ. ৬২-৭১। জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা

Sociology of language. 1977. Indian Institute of advance study. Simla.

(৩০) তথ্যসূত্র : অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক, প্রাক্তন অধ্যাপক, টিবেটোলজি বিভাগ, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন।

(৩১) চর্যাগীতির ভূমিকা, পৃ. ২০৪-২০৬।

(৩২) শব্দশক্তি ত্রিবিধ—(ক) অভিধা—প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ, (খ) লক্ষণা—অভিধেয় বাধিত হলে মুখ্যার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ প্রকাশিত হয় লক্ষণায়, (গ) ব্যঞ্জনা—অভিধেয় অর্থের অতিরিক্ত অর্থাগম ঘটে এখানে। শব্দের নিহিতার্থ বা আভিপ্রায়িক অর্থ প্রায়ই লক্ষণায় সিদ্ধ। অভিধেয় অর্থের সঙ্গে সামীপ্য, সারূপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য এবং ক্রিয়াযোগে পঞ্চপ্রকার লক্ষ্যার্থ পঞ্চীকৃত হয়ে বহুপ্রকার হয়। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ ৮০ প্রকার লক্ষণার উদাহরণ দিয়েছেন ২।২৩

(৩৩) চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদে বিচার ও বিতর্কে শব্দের মুখ্য/গৌণ বৃত্তি এবং সহজার্থ, লক্ষণা অর্থ নিষ্কাশন পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে।

ন্যায়দর্শনে ত্রিবিধ শব্দশক্তি (লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও গৌণী) নিয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪।

(৩৪) চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(৩৫) S. B. Dasgupta. An introduction to tantric Buddhism. p. 112.

(৩৬) ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্যে জানা যায় যে অনেক গ্রামীণ মানুষ গানের অর্থ জানার সূত্রে গুরু ধরে, বাউল মত গ্রহণ করেছেন।

(৩৮) শকুন্তলা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, জানুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১ বাউল ইহবাদী-দেহবাদী ; সুতরাং তাদের মনের মানুষ দেহস্থ সত্তাবিশেষ অথবা ভালোবাসার জনের মানসীমূর্তি।

(৩৯) সাধক নন, গায়ক বাসুদেব ও গোপাল দাস বোলপুরের অদূরে গ্রামে থাকেন এবং গান করেন। এরা রবীন্দ্রনাথের খ্যাতনামা অনুবাদক ড. মার্টিন কেম্পসেনের আনুকূল্যে জার্মানিতে গিয়েছিলেন।

(৪০) 'আধুনিক বাউলদের কেউ ব্যবসাদার, কেউ সংদার কেউ রেডিও-বাউল'—সুকুমার সেন, শকুন্তলা, জানুয়ারি, ১৯৮৩, পৃ. ১।

(৪১) বৈষ্ণব/বাউল সাধনায় চারটি স্তর। প্রতিটি স্তরে আবার চারটি উপবিভাগ। মোট সাধনা-স্তরের বিভাগ ও উপবিভাগ ১৬টি। স্থূলে—নামমন্ত্রাদি গ্রহণ ও দীক্ষাগ্রহণ। মূলত বেদবিহিত আচারের অনুসরণ এবং মূল সাধনার দিকে অগ্রসর হওয়া। প্রবর্তে সাধনতত্ত্ব জানার সূত্রপাত, দেহশোধন ও মূল সাধনার প্রস্তুতি। সাধকে—সাধনা ; সিদ্ধে—সিদ্ধি-অন্তে প্রেম ও রস আস্বাদন। এ চার স্তরে চারটি দশা—জীব, প্রবর্ত্ত, পরম (ঈশ্বর), মানুষ (সাধক)। নিজের ধড়বিচার বা দেহতত্ত্বজ্ঞান (স্বরবর্ণ) ; পরতত্ত্ব/পরমতত্ত্ব বা নারীদেহতত্ত্বজ্ঞান (ব্যঞ্জবর্ণ) ; এবং মূলবস্তু শুক্র বা গুরুতত্ত্ব বা আপ্ততত্ত্বজ্ঞান (যুক্তবর্ণ) এবং ভাব-প্রেমের জ্ঞান—চারটি পর্যায়।]

বিষয়বস্তু অনুযায়ী গানের বিভাগও আছে, যেমন কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা (সিদ্ধ স্তরের গান) গোষ্ঠ, রস-রতি, পারের গান, ফুলের গান (সাধক স্তরের গান), আদম গঠন, নবীতত্ত্ব, কার, অনুমান-বর্তমান, তুমি-আমি, নবুয়ত (কথায় শিক্ষা দেয়া)—বিলায়ত (দেখিয়ে শিক্ষা দেয়া) প্রভৃতি।

উপরন্তু লালনের ইসলাম-সম্পৃক্ত দু'টি বিভাগ এবং তাদের দুটি করে উপবিভাগের মোট চারটি ভাগ আছে।

(ক) শরীয়ত—দু'টি উপরিভাগ (১) ব্যক্ত শরীয়ত : —রোজ, নামাজ, কালমা, হজ, জাকাত এই পাঁচের প্রথম তিনটির আবশ্যিক অনুশীলন। ১৬৬ নং পদে লালন বলেছেন, 'ব্যক্ত এহি কাজ'। (২) গুপ্ত শরীয়ত : নিন্দা, হিংসাদি পরিহার করে শুদ্ধ হওয়া।

(খ) মারুফত : এ স্তরে সুফীদের দুটি স্তর, (১) ব্যক্ত মারুফত :—তরিকত বা গুরু বা মুর্শিদের কাছে দাখেল হওয়া আর হকিকত হচ্ছে সত্য/হক সাধন করা। (২) গুপ্ত মারুফত : দায়েমী নামাজকে কায়েম করা এবং গুপ্ত সাধনা। এ প্রসঙ্গে মনসুরের (বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিস্তিয়া সাধক) একটি পদ উদ্ধৃত করা যায়।

শরীয়ত মূল সত্য কথা ছাড়ো হিংসা নিন্দা বড়াই ক্রোধ মিথ্যা কথা।
ক্রোধ দেমাক সবুর হলে তবে শরীয়ত আদায় হয়॥
তরিকতে হয় মুর্শিদ ধরা হকিকতে হক
মারুফতে চাই পুশিদার ঐ জেকের করা দায়েমী নামাজ জানা
মুর্শিদ ধরে তা জানতে হয়॥
কালাম হল ৯০ হাজার তার ৩০ হাজার শরীয়ত জারী
ইসলামী কারবার
আর নামাজ রোজা হজ জাকাত তারে ফরজ আইন কয়॥
এলমে নাদুনী যার হবে নজর সেই জানতে পারে বাতুনের খবর
মনসুর তাই কয় সে যে কুদরতের ভয় ডুব দিয়া দেখ দেল দরিয়া॥
তথ্যসূত্র : বীরেনদাস বাউল, পূর্বোক্ত।

গানের ক্ষেত্রে স্তরবিভাগগুলির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে রবীন্দ্রনাথ দাস বাউল (কাশিমবাজার,

মুর্শিদাবাদ) মন্তব্য করেছেন যে স্থূল ও প্রবর্তে সাধক অজ্ঞান থাকে এবং বিবৃত হয় মায়িক জগতের কথা। স্থূলের প্রবর্তে থাকে ভাব, ঐ সাধকে থাকে ভক্তি ; স্থূলের সিদ্ধিতে থাকে যোগ ও কর্ম। প্রবর্তে জ্ঞানের ভাব ও চেতনার আগমন ঘটে। প্রবর্তের সাধকে থাকে করণের আলোচনা ; প্রবর্তের সিদ্ধে দশেন্দ্রিয় ও রিপুসমূহকে পরিচালনা করবার তত্ত্ব বিবৃত হয়। (আজাহার খাঁ-এর মতে প্রবর্তে সাধকের মন পরিবর্তনের প্রসঙ্গ থাকে) সাধক স্তরে আলোচিত হয় শ্বাসের কাজ, যুগলমিলন প্রভৃতি সাধনার কথা। কৃষ্ণের বাৎসল্য সাধকের স্থূল পর্যায়ে যাবে ; মধুর রসের কৃষ্ণকথা যাবে সাধকের সিদ্ধে। সিদ্ধের স্থূলে গৌরলীলার সাধারণ পদ ; ভাবের পদ সিদ্ধের প্রবর্তে ; রাগ সিদ্ধের সাধক পর্যায়ের পদ। অনুরাগ, প্রেম এবং মানুষতত্ত্বের পদ সিদ্ধের সিদ্ধ পর্যায়ে গণ্য হবে। বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে, চৈতন্য চরিতামৃতে সাধনার এ স্তরগুলি বর্ণিত আছে।

বিবেকানন্দ সঙ্গীত গ্রন্থে স্থূলকে বেদবিধি-সমর্থিত গার্হস্থ্য জীবন ; প্রবর্ত্তকে সাধনার্থীর দীক্ষাদিগ্রহণরূপ বাণপ্রস্থ, সাধককে সাধনারাজ্যের ব্রহ্মচর্যপালন এবং সিদ্ধকে সন্ন্যাসধর্মের নিরাসক্ত স্তর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃ. ৯২-৯৪।

বৈষ্ণবদের হস্তলিখিত পুঁথি ও পরিচয়পত্রে দেশ, পাল, পাত্রের আলোচনা থাকে। সাধনার স্থান, বয়স এবং সাধক/ সাধিকার সম্পর্কের সঙ্কেতপত্র এগুলি।

(৪২) মনমোহন দাস বৈরাগ্য, সাঁটুই, মুর্শিদাবাদ ;

(৪৩) বিভিন্ন সাধকের কাছে এবং আখড়ায় এ ধরনের হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত হয়। গুরু মৃত্যুর পূর্বে এগুলি দিয়ে যান প্রিয় শিষ্যকে। যোগ্য ব্যক্তিকে এগুলির অনুলিপি করতে দেয়া হয় আশ্রমে বসে। অনেক পুঁথি যথার্থ সংরক্ষণের অভাবে যায় লপ্ত হয়ে। অপটু লিপিকারের ভ্রান্তিতে বিপর্যস্ত হয় পাঠ। নদীয়ার (নন্দনপুর, করিমপুর) প্রয়াত শিক্ষিত গুরু দেবানন্দ গোস্বামী প্রায় ৪০টি কলমীপুঁথি আমাকে বুঝতে ও লিখতে সাহায্য করেছিলেন। নানা সূত্রে অন্যান্য পুঁথিগুলি সংগৃহীত। বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়গুলিব নিজস্ব কলমীপুঁথি আছে। যেমন নৃসিংহানন্দের অনুসারীগণ ব্যবহার করেন ব্রজরসকল্প ; পাটুলি ঘরে (স্রোতে) মুকুন্দদাসের গ্রন্থাধি ; নরোত্তমেব ঐতিহ্যে নরোত্তমের বচনাবলী ; বীরভূমের একচক্রের গুরুবর্গ ব্যবহার করেন, 'সঙ্গমসার'।

(৪৪) ইনি কবিরাজ গোস্বামী নন। নৃলোকসার চিন্তামণি কবিরাজ গোস্বামীর নামে চলে।

(৪৫) The history of philosphy in Islam. Dr. J.J.De. Boer. p. 63-64.

(৪৬) চৈতন্য চরিতামৃত (মধ্য, ৬ষ্ঠ) এবং কবি কর্ণপুরের গ্রন্থ।

(৪৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক, ১ম দৃশ্যে সুপ্রিয়ের উক্তি।

(৪৮) পদ্যাংশ ৯৭

(৪৯) চৈতন্য চরিতামৃতে লজ্জা, ধর্মহীনতা (আদি/১২) ; নাচ, গান হাসি-কান্না ভাবাবেগ বাউলের লক্ষণ বলে চিহ্নিত (মধ্য/১৬)। নিজের গুহ্যশাস্ত্র ব্যাখ্যার রীতিকে চৈতন্য বাতুল বচন বলে মন্তব্য করেছেন : কিবা প্রলাপিলাম তারে নাহি কিছু মনে (মধ্য/২৪)।

হেমচন্দ্র সুরীর নামমালা গ্রন্থে প্রলনশীল বাউলের উল্লেখ আছে, (বাউল্লো পলবিরএ)। চর্যাগীতির ভূমিকা, পৃ. ১৪৮।

(৫০) দীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্য পূর্ণ এই পুঁথির ভূমিকায় বলা হয়েছে যে চৈতন্য চরিতামৃতে রস ও সহজ সাধনাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করতে পাবায় কৃষ্ণদাস এ গ্রন্থ রচনায় বাধ্য হয়েছেন।

(৫১) কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য সিদ্ধ মুকুন্দদেবকে সহজ সাধনার অন্যতম তাত্ত্বিক গ্রন্থকার বলা হয়। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের রচনায় এ পন্থা বহুলীকৃত হয়েছে। মুকুন্দদাসের নামে প্রচলিত বহু কড়চা গ্রন্থ একাধিক জনের রচিত বলে মনে হয়।

(৫২) ষড়গোস্বামীর অন্যতম রূপ সংস্কৃত রচনায় সহজতত্ত্বকে আবৃত করেছেন, এ গ্রন্থ সহজতত্ত্ব স্পষ্ট করার দায়ে রচিত বলে মন্তব্য আছে সূচনায়। রক্ষণশীল বৈষ্ণবগণ, এ ধরনের রচনা রূপ কবিরাজের (বাউলপন্থার প্রবর্তক) বলে মনে করেন। এগুলি অন্যায়ভাবে রূপ গোসবামীর উপর আরোপিত হয়েছে বলে তাদের ধারণা।

(৫৩) এ গ্রন্থকর্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী থেকে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। বীরভদ্র পিতৃনির্দেশে মক্কায় তত্ত্ব জানার জন্য মাধবী বিবির সমীপে উপনীত হন। মাধবী তাকে নিজ দেহতত্ত্ব বিবৃত করেছেন।

(৫৪) জাহ্নবার দত্তকপুত্র রামভদ্রের বাঘনাপাড়া কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বংশীশিক্ষার রচয়িতা বংশীবদন। ঠাকুর নরোত্তম উত্তর-চৈতন্যকালের ত্রয়ী বৈষ্ণবগুরুর একজন। তিনি সাধক, গায়ক এবং খেতুরী সম্মেলনের প্রাণপুরুষ। টীকাগ্রন্থটি তাঁর কোন শিষ্যের রচনা হতে পারে।

(৫৫) গ্রন্থকারের নাম নেই।

(৫৬) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর শ্লোকটি নিয়ে মন্তব্য : "শুদ্ধঅর্ধচন্দ্র অর্ধভাস্করের তত্ত্ব রূপকের আসলে সঙ্কেতময় ভাষায় বাউল গানে ছড়িয়ে রয়েছে'—শকুন্তলা, ১২বর্ষ, পৌষ, ১৩৯২, পৃ.৩।

(৫৭) ১৯৫ নং পদে আছে : পর দিয়ে পর ধরাধরি পরকে কৈ চিনতে পারি, নালন বলে হায় কি করি না দেখি উপায়।

(৫৮) প্রাচীন বস্তুবাদীরা ৪টি ভূতে বিশ্বাসী ছিলেন।

(৫৯) হারাধন দাসের গ্রন্থ থেকে এটি বিলক্ষণ পৃথক।

(৬০) চৈতন্যদেবের ভোজনাদির বিরূপ সমালোচক রামচন্দ্রপুরীর মথুরানাথ শ্লোকটি নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার বর্ণনা আছে চৈতন্য চরিতামৃতের, অন্ত্যলীলার, অষ্টম পরিচ্ছেদে।

(৬১) তন্ত্রসার, পৃ.২৯২।

(৬২) ঐ, পৃ.১৪৩—১৫০।

(৬৩) তন্ত্রসার, পৃ. ৫২০।

(৬৪) তন্ত্রসার, পৃ. ৩৯০।

(৬৫) তন্ত্রসার, পৃ. ৪৯০—৫২০।

(৬৬) কামতন্ত্র, পৃ. ১৩—২০।

(৬৭) আবদুল গনি (১৯০৬—১৯৯৬), ইংলিশ, মহেশাইল, ঔরঙ্গবাদ, মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নিজেকে ইমাম মেহদী মনে করতেন। তথ্যসূত্র : সাধক সুফী আবদুল গনি, মোজাফ্ফর ইসলাম, কলকাতা, ১৯৯২।

(৬৮) চান্দ সূজ্জ, মনুরায়, মনপবন, রবিশশী, গঙ্গাযউনা, বেঙ্কানাল, জীবন্ত মইল, মটকা, হংস, তিরপিনী, দমঘর, নাগিনী, অজপা, নিরঞ্জন, চারচন্দ্র, অমিলা, শাম্ভু, গরল প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ নাথপন্থার ঐতিহ্য থেকে বাউলগানে এসেছে। পঞ্চানন মণ্ডল, গোর্খবিজয়, ভূমিকা।

(৬৯) বাউল দর্শনে ভারতীয় বস্তুবাদের উপাদান, পূর্বোক্ত।

(৭০) Quoted by Linda Hess, kabir's rhetoric, the sants, p. 153.

(৭১) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত Obscure religious cult গ্রন্থে বাউল ও সহজ সাধনার বিবরণ দিয়েছেন।

এ সাধনার অজস্র বৈচিত্র্য ও মতভেদের পরিচয় বিশ্লেষিত হয়েছে 'Car Candrabhed' শীর্ষক নিবন্ধে। রচনাটি প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত জ্যাকেরিয়া স্মৃতি স্মারক সেমিনারে পঠিত এবং ড. রজত কান্ত সম্পাদিত, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে, Mind bodg and soceity (1995) pp 65–108. গ্রন্থে প্রকাশিত।

(৭২) স্বরূপ দামোদরের কড়চা, পৃ.৩৬।

(৭৩) ঐ, পৃ.১২।

(৭৪) বিপরীত রতিতে নারী পালন করে পুরুষের ভূমিকা ; আস্যমৈথুনে নারীদেহাঙ্গ পুরুষশরীরে অনুপ্রবেশ করে ; রজঃকালে নারীশরীর বিসর্গধর্ম বা পুরুষত্ব পায়—বিপরীত বতিতে এ রজঃ গমন করে পুরুষদেহে—এসমস্ত উল্টা সাধনা। দেহনির্গত 'চন্দ্র'গুলিকে দেহে ফিরিয়ে দেয়াও 'উল্টা'সাধন।

(৭৫) Totemism গ্রন্থে লোকভাষা নিয়ে আলোচনা আছে, pp. 175. সাঁওতালী ভাষায় অপ্রত্যক্ষ ভাষণ প্রচলিত। যেমন 'পাত্রীকে কোকিল, হরিণ, ফুল, ফল, মাটির পাত্র প্রভৃতি সঙ্কেতে প্রকাশ করা হয়। W. G. Areher., Betrothal dialogues, Man in Indin. Vol. XXIII. No. 2. june. 1943. pp, 147. বাউলগানেও বিভিন্ন দেহাঙ্গকে বহুবিধ ভিন্ন রূপকে প্রকাশ করা হয়।

(৭৬) H. Read English prose style, pp. 31.

ভয় বা ট্যাবু ছাড়াও কৌতুক বা কাব্যিক প্রকাশভঙ্গির সূত্রে ভাষায় false Kenning ব্যবহৃত হয়।

লালন এ ধরনের রীতিকে 'ফাক তামোসা' এবং 'লক্ষণাব্যঞ্জনা' বলেছেন।

(৭৭) সাধুসভায় বাউল গান পরিবেশিত হয়। অধিকাংশ সাধুসভা সাধকবিশেষের মৃত্যুতিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ বা পাঁচের গুণিতক পরিমাণে চাল, পান, সুপারি ইত্যাদি নববস্ত্রাদি সহযোগে বেদীতে দেয়া হয় ; ধূপ, ধূনা, পান, তামাক, তৈলসেবা পায় সাধুরা। 'আসনে' বসেন একজন। সূচনায় 'নামাজে' নিজ নিজ গুরু স্মরিত হয়। বন্দনা দিয়ে শুরু হয় গান ; সকালে গীত হয় গোষ্ঠ ; কুঞ্জভঙ্গ দিয়ে হয় গানের সমাপ্তি।

যৌনসাধনা এবং প্রসঙ্গগুলি আবৃত করার পেছনে একরকম অপরাধবোধও সক্রিয় থাকে।

(৭৮) The Golden Bough, part VI. p. 121. Sarat chandra Mitra, Riddle current in Bihar, the journal of Asiatic Asiatic society of Bengal. vol Lxx, part III. No.I. 1901, pp.33.

(৭৯) সাধকেরা বলেন যে সাড়ে চার পারা কোরাণ গুপ্ত। এগুলি মূলত চারচন্দ্রের সাধনাসম্পৃক্ত। চারচন্দ্রভেদের প্রতি রামকৃষ্ণ বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। পরকীয়া সাধনার দায়ে রামকৃষ্ণ অভিযুক্ত করেছেন 'কর্তাভজাদের'। অক্ষয়কুমার দত্ত, জে. এন. ভট্টাচার্য, দয়ানন্দ সরস্বতীর রচনায় এ সমস্ত সাধনা আক্রান্ত হয়েছে। কিশোরীভজনা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং মুসলমান বাউলদের বিরুদ্ধে এসব ঘৃণা সাধনাব অভিযোগের অছিলায়

পরিচালিত হয়েছিল রক্ষণশীলদের আক্রমণ। শিষ্ট সাধুগণ এবং বৈদিক-শরীয়তী সামাজিকগণ এ সাধনা গ্রহণ করতে পারে না। এ সাধনার গোপনীয়তার কারণ ব্যাখ্যা করে রাজক্ষ্যাপা লিখেছেন—

'পূর্ব মহাজন দেখে শুনে সব করেছে গোপন।
মূল্যবান বলে গোপন, জীব সমাজে বিকাবে না।।

পূর্ব মহাজন যারা সেই জন্যে গোপনে তারা
রেখেছে ধন আছে পোরা বের করে না মোটে।।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

(৮০) পণ্ডিতরা শাস্ত্রীয় ভাবমার্গ ও আচারধর্মের অনুসারী ছিলেন। ক্রমশ বাস্তব জীবনের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল গ্রন্থকীটদের যোগসূত্র। জীবনমুখী ইহবাদী ভক্তি-আন্দোলনে, পরলোকভিত্তিক শাস্ত্রীয় জ্ঞানচর্চা উপেক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু গুরুমুখী গুপ্ত জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল মূল্যবান। কবীর, দাদুর পদের মতো, লালনের গানেও পণ্ডিত, মুন্সী মৌলবীদের প্রতি বিদ্রূপ শোনা যায়।

(৮১) Foudation of Tibetan Mysticism. p. 99.

(৮২) Poets of power, quoted by K. Kailaspaty. The writings of tamil Siddhas. The sants, p. 394.

(৮৩) Do. p.399.

(৮৪) সাধু বলতে এখানে সধর্মী, 'স্বজাতীয়—বর্তমানপন্থী, নারীকেন্দ্রিক রসসাধক ; চারচন্দ্র-ব্যবহারকারী ফকির বা বৈরাগীদের বুঝিয়েছেন।

জন্মের বা কর্মের বা জাতগোষ্ঠীর দ্বারা মানুষকে বিভক্ত না করে; লালন সমধর্মী ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করেছেন।

ফকিরি নেয়া বা বেশধারী সন্ন্যাসীরাও তাঁর মতে সাধু নয়। ৩০৫ নং পদে চৈতন্যের সন্ন্যাস নেয়াকে তিনি, "ফেরে পরে সন্ন্যাস" গ্রহণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এতে আত্মজৈবনিক ছায়া আছে।

(৮৫) মহাজনদের গানের পদ/কথা অবিকৃত রেখে সুরের পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য ঘটালে সাধকগণ তাতে আপত্তি করে না। সুরে নানা ঢং ও বৈচিত্র্য অঞ্চলবিশেষের বাউলগানে শ্রুত হয়।

ফিকিরচাঁদী বাউলগানে বিলাবল পর্যায়ের রাগের প্রভাব নির্ণয়ান্তে, এতে ছন্দ ও তালবৈচিত্র্যের বিশিষ্টতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য, লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২১৬—১২২০।

পূর্ববঙ্গে, মধ্যবঙ্গে, রাঢ়ে বাউলগানের গায়কী ও সুর-তাল ঈষৎ ভিন্ন। গায়কেরা নির্দিষ্ট কোন স্বরলিপি অনুসরণ করেন না। একই লালন সঙ্গীত ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন গায়ক ভিন্নভাবে গান। বাউলগানে কবিতা ও গানের মিশ্রণ চিহ্নিত করে প্রখ্যাত গায়িকা রাজেশ্বরী দত্ত মন্তব্য করেছেন : Often, however, the syllables of words are lengthened or shortened to suit the melody, thus weakening the rhythmic structure of the poem–The religious aspect of the Baul songs of Bengal, journal of the Asian studies. May 1978.

(৮৬) দাদু এবং কবীরের পদগুলিকে 'শব্দ' বলা হয়। দাদু, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ. ৫৪৫।
(৮৭) নরোত্তমের স্বরূপ কল্পতরু (৫ম অধ্যায়) পুঁথিতে গ্রন্থকার ঘোষণা করেছেন—
জগৎ যারে মন্দ বলে আমি বলি আনন্দ। জগৎ যারে ভাল বলে আমি বলি মন্দ॥
জগৎ যারে পিতা বলে আমি বলি মাতা। জগৎ যারে সত্য বলে আমি বলি মিথ্যা॥
জগৎ যারে সুখ বলে আমি বলি দুঃখ। * * *
জগৎ যারে ধর্ম বলে সে আমার অধর্ম। জগৎ যাকে অধর্ম বলে সে আমার ধর্ম॥
জগৎ দেখিলে যারে করবে ন্যক্কার। সেই ত পরমধন ঠাকুর আমার॥
জগত যারে গ্রাহ্য বলে সে আমার অগ্রাগ্য। জগৎ যারে কার্য বলে সে আমার অকার্য॥
জগত যারে কুপথ বলে সে আমার সুপথ। জগৎ সুপথ বলে আমার কুপথ॥
* *
* *
জগৎ যারে ছোট বলে আমি বলি বড়। কায়মনোবাক্যে করিয়াছি দড়॥

এখানে 'জগৎ' অর্থে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সামাজিক মূল্যবোধকে বুঝতে হবে। উচ্চবর্গের সমস্ত মূল্যেবোধকে এখানে বিপরীত (inversion) করে দেওয়া হয়েছে।

Dominance willout hegemony and its historiography (Subaltern studies. Vol. VI pp. 229) প্রবন্ধে রণজিত গুহ পরাধীন সামন্ত ভারতে নিম্নবর্গের সঙ্গে উচ্চবর্গের বিরোধ ও সহাবস্থানের আলোচনা করেছেন।

পার্থ চ্যাটার্জী এবং বিধ বিদ্রোহে সমাজ ও কর্তৃত্বের বন্ধন থেকে নিজের দেহকে মুক্ত করার প্রয়াস চিহ্নিত করেছেন।

(Caste and subaltern consciousness. Do, pp. 203)

(৮৮) পদ নং ১৫৬, লালন গীতিকা-(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বোক্ত)—পদ ৪ দ্রষ্টব্য।

(৮৯) বহিরাগত মানুষ বা প্রাথমিক পর্যায়ে নবাগত শিষ্যদের গোপন সাধনা বলা হয় না। বরং 'যদি যাইবে দক্ষিণে, বলিবে উত্তরে' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কুলার্ণবতন্ত্রের, একাদশ উল্লাসে পাই :

"অন্তঃশাক্তা বহিশ শৈবা সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নানা রূপ ধরা কৌল বিচরন্তীহ মহীতলে॥

তন্ত্রসারে, কুলসাধনা গোপন করার জন্য, অপরিচিত বহিরাগত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার জন্য উচ্চৈস্বরে হরিনাম করতে বলা হয়েছে। পৃ. ৪৯৮।

গুপ্ত সাধনার সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং তজ্জনিত সামাজিক অত্যাচারের ভয়, মুসলমান সমাজভুক্ত উপাসকদের সর্বদা সচেতন করে রাখে। প্রচলিত আচার অনুসরণে, ধর্মীয় সাজপোশাকে এরা আত্মগোপন করতে দক্ষ। হিন্দু বা ইসলামী ধর্মীয় মূল্যবোধের আবরণ এরা বর্মের মতো ব্যবহার করেন। বাউল ধ্বংসের ফতোয়ায় শুনি যে এদের কেউ কেউ হিন্দুবেশে নবদ্বীপে তীর্থ করে ; আবার প্রয়োজনে নামাজ রোজার ভাণ করে। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তের কাছে সাধনা পরম স্পষ্টতায় বর্ণিত হয়।

(৯০) বাংলা দেহতত্ত্বের গান, পৃ. ২০।
(৯১) লালন ফকির : কবি ও কাব্য, পৃ. ২৭৬-২৭৯।
(৯২) ৪০ নং চর্যাপদে গুরু বোবা, শিষ্য কালা এবং সাধনাটি বাক্‌পথাতীত হিসাবে চিহ্নিত

হয়েছে। বিলাওত বা বর্তমান সাধনায় কথা নেই ; গুরু সমস্ত কিছু হাতে-কলমে করে দেখিয়ে দেন শিষ্যকে। বাউল সাধনাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ; এখানে রহস্য নেই। বাউল প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদের উপাদান, নিবন্ধে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

(৯৩) ১২দশ ভাগ, পৃ. ৭২০।

(৯৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

(৯৫) Mircea Eliade. Yogo : Immortality and freedom

(৯৬) The parlour and the streets, p. 141.

(৯৭) ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড।

(৯৮) বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন, পৃ. ৬০।

(৯৯) শকুন্তলা, ১২ বর্ষ, পৌষ ১৩৯২, পৃ. ৩।

(১০০) সাধনায়, 'পুরুষ প্রকৃতি হবে' অথবা 'প্রকৃতি হয়ে প্রকৃতির সঙ্গ' করার নির্দেশ লালন ও অন্য বাউলগানে পাওয়া যায়। কর্তাভজাদের নির্দেশ : 'নারী হিজরে, পুরুষ খোজা তবে হবে কর্তাভজা'। এ ধরনের বহুবিধ দেহমিলন ও আস্যমৈথুন বাৎস্যায়ন ঔপরিষ্টকম অধ্যায়ে (৯ম অধ্যায়, পৃ. ৪২৪) বর্ণনান্তে মন্তব্য করেছেন 'ইহা শাস্ত্রনিন্দিত'। কামসূত্র : সম্পদনা, ত্রিদিবনাথ রায়।

রামায়ণে আস্যমৈথুন (৭।৭৩।৪৩) নিন্দিত অপরাধ ; এ ধরনের নারীর নাম 'মুখে ভগা' (৩।১৮৮।৪১)।

মহাভারতে সমকামিতা দণ্ডনীয় অপরাধ (৩।১৭, ৪।১৩)। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতে অপরাধতত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান, পৃ. ১২১।

কোরাণে রজঃকালীন দেহমিলন নিষিদ্ধ। সুরাবাকারাহা, ২নং সুরা, দ্বিতীয় পারা, ২৮ রুকু।। ২২২—কোরাণ শরীফ, অনুবাদক মাওলানা মোবারক করীম জওহর, পৃ. ৩৭।

হিন্দু ও মুসলমান লোকবিশ্বাসেও রজঃ অশুচি এবং এ সময় দেহমিলন অপরাধ।

Beliefs and fertility in Bangla Desh. pp. 149

(১০১) শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পৃ. ৬২।

(১০২) সম্প্রদায়, জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে শত্রুদের মতাদর্শ, নিজের অজ্ঞাতে গ্রহণ করে ফেলে, এ ধরনের সাধকেরা, গোষ্ঠীবিভাজনে উদ্যোগী হন। শত্রুদের রূপে ঘটে নিজেদের রূপান্তর।

ব্যক্তির বোধ ও গ্রহণক্ষমতার তারতম্যকে লালন অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু এ পার্থক্য সত্ত্বেও মূল সাধনার কাঠামোটিতে ঐক্য আছে। ফলত সমধর্মী ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের 'করা' জিনিসের অভিজ্ঞতাগুলি মিলে যায়। কিন্তু অসাধকদের মধ্যে 'শোনা' জিনিসগুলি মেলে না। মতভেদ, দ্বন্দ্ব এবং গোষ্ঠীবিভাগ অসাধকদের মধ্যে বেশি।

শিষ্যদের মধ্যে স্তরবিভাগ থাকে। চৈতন্য চরিতামৃতে (আদি, ১ম পরিচ্ছেদ ও অন্ত্য, ২য় পরিচ্ছেদ) সাধক, পারিষদ, অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ প্রভৃতি বহুপ্রকার ভক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

প্রাচীন পুরোহিতদের মতো, চিকিৎসা ও সঙ্কেতবাক্যের জ্ঞানভাণ্ডার বাউলগুরুদের অধিকারে থাকে: 'The tendency to keep things secret, to make a cult and mystery of them, and so to gain an advantage over the generality of man, has always been strong in mans mind.' H. G. Wells–The outline of history, Part I. p. 134.

(১০৩) প্রকাশক, কালিকুমার সেন, ঔরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পৃ. ৩৫-৩৬।

(১০৪) আল্লা অদেখা ; নবী প্রত্যক্ষ। নবীকে মান্য করাই কোরাণের অভিপ্রায় বলে সাধকেরা মনে করেন। ধর্মতত্ত্ব নয় মহাজনকে মান্য করা উচিত বলে মহাভারতে ভীষ্ম মন্তব্য করেছেন। চরিতামৃতে পীরের সঙ্গে চৈতন্যদেবের ধর্মলোচনায় সাকার নবীকে মান্য করার ইঙ্গিত আছে। চৈতন্যভক্তগণ চৈতন্যকে 'জীবন্ত ঈশ্বর' বলে গ্রহণ করতেন (মধ্যলীলা, ১৮ পরিচ্ছেদ)।

আহাদ আল্লার একটি নাম ; আহ্ম্মদ মহম্মদের অন্য নাম। আহামদ থেকে মিম বর্জিত হলে পাওয়া যায় আহাদ।

নজরুল লিখেছেন :আহ্মেদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ মন
আদাহ সেথায় বিরাজ করেন হের গুণিজন।।
যে চিনতে পারে রয়না ঘরে হয় সে উদাসী।
সে সকল ত্যজি ভজে শুধু নবীজীর চরণ।।

মুজফ্ফর আহ্মদ : কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, পৃ. ২৪৮।

(১০৫) কর্মফল দেহধাতুর সূত্রে বাহিত হয়—দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশে এ বিশ্বাস ব্যাপক জনগণের মধ্যে আছে। Beliefs and fertility in Bangal Desh. p. 168.

(১০৬) মোট ৮৫টি, 'যৌন যোগসাধন সংক্রান্ত, সাধন বিষয়ক' শব্দতালিকা তিনি দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, কলকাতা-৩৪, কার্তিক পৌষ, ১৩৯৭, পৃ. ২৩৫-২৩৭।

(১০৭) আবুতালিব রাই রাঙ্গা-এর উৎস উল্লেখ করেছেন রায় রায়ান। এটি ভুল নয়। রাই রাঙ্গা বা গৌরী রাধিকা কুল বা গৃহ ভেঙে দিয়েছেন। বা রজঃরক্ত দেহ (গৃহ) ভেঙে নিষ্ক্রান্ত হয় প্রভৃতি নানা অর্থ শব্দটির উৎসে থাকতে পারে।

(১০৮) চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ। বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা আছে, কানুতত্ত্ব নির্ণয় গ্রন্থে, পৃ. ২০-২৫।

গোপীনাথ কবিরাজ পুরাণ-বর্ণিত পুরুষসাধকদের গোপীজন্মের তথ্য আলোচনা করেছেন ; শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পৃ. ২২৩-২২৫।

(১০৯) পদ নং ১২৩, ২১৪, ৩৫৭। দেহে চন্দ্রের পরিভ্রমণের নানা তথ্য পাই সাধকদের খাতায়।

পুরুষদেহে শুক্লপক্ষে মণি ওঠে ডানদিক দিয়ে, নামে কৃষ্ণপক্ষে বামে। নারীর তদ্‌বিপরীত অর্থাৎ ওঠে বামে, নামে ডানে।

শুক্লপক্ষ	কৃষ্ণপক্ষ
১ম দিন—পায়ের বুড়া আঙুলে	১৬ দিনে মাথা
২য়—পদতলে	১৭ " চোখ
৩য়—পায়ের ঘোটনায়	১৮ " গালের উপর
৪র্থ—রাঙের নিচে	১৯ " ঠোঁটের উপর
৫ম—কোমরে	২০ " গলা
৬ষ্ঠ—কটির উপরে	২১ " ডান বুক
৭ম—নভিতে	২২ " পিঠ
৮ম—বাম বুকে	২৩ " পাছনি
৯ম—গলায়	২৪ " গর্দান

১০ম—মুখে	২৫ " জানু
১১শে—অধর/নিচের ঠোঁট	২৬ " চুতড়
১২শে—কানেব লতি	২৭ " এড়ি
১৩শে—কপাল	২৮ " লিঙ্গ/যোনি
১৪শে—চাঁদি	২৯ " পায়ের তালু

বদি সা-এর খাতা থেকে [স্বরূপনগর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ]। কমলীপুঁথি ও অন্যত্র স্থানগুলি ঈষৎ ভিন্ন।]

(১১০) লালন গীতিকা—পদ ১৫, ২৩, ৩০, ৭৪, ১৪৫।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ১১২ নং পদে লালন দেহে তিথি, নক্ষত্র, অমাবস্যার মর্ম, পূর্ণিমা ও স্বাতী নক্ষত্রের যোগ নির্ণয় করতে বলেছেন।

(১১১) 'বাউলরা প্রকৃতির রজঃপ্রবৃত্তির সময়কে অমাবস্যা বলে। ইহা ঘোর অন্ধকার কামের সময়।' বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩৯১। ২৭ দিনে স্বাতী নক্ষত্রের উদয়, তারপর দিন অমাবস্যা তারপরে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।

(১১২) পারুলবালা পাল (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ) এবং বদি সা-এর হস্তলিখিত খাতা এবং বহু সাধকের বক্তব্যের ভিত্তিতে, লেখকের গবেষণাগ্রন্থে 'রাধাবিন্দু' ধরার রজঃসাধনা বিশ্লেষিত হয়েছে। রজঃবিকাশের তিনদিন অন্তে গুরুত্বপূর্ণ সাধনার কথা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন (পূর্বোক্ত)। কিন্তু 'জল শুকালে' লালনের সাধনা হয় ন। পুঁথি এবং সাধকদের বর্ণনায় রজঃবীজের গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রণের সাধনা, রজঃসূচনার ২৪ ঘণ্টা পরে, দ্বিতীয়ায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে, অমা ও রজঃসাধনার, কামকলার ব্যাখ্যা আছে। পৃ. ৮৪-১৫৮, ১৭২, পূর্বোক্ত।

সহকর্মী অধ্যায়ক অধীরকুমার চক্রবর্তী অমাতত্ত্ব বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করে, সচ্চিদানন্দের গ্রন্থগুলির সন্ধান দেন। ছিন্নতাহেতু প্রকাশকাল দেয়া গেল না।

চাঁদ/রজঃবিকাশের ২৭ দিনটি শিবপূজা বা 'মেহেরাজ' মিলনের দিন। এদিন সংগৃহীত হয় 'স্বাতী নক্ষত্রের জল' ; রজঃবিকাশের (তের প্রহরের এক জটিল হিসাব আছে) দ্বিতীয়ার অনেকে 'শূন্যদেশে' করেন নীর ও ক্ষীরের মিলন ; আর রজেঃর ৮মীতে বিশিষ্ট এক রজঃ উদিত হলে তাকেও ধরেন সাধক ; অনেকে দেন ৮মীর বলি। প্রথমদিন দেবীব আগমন জন্য সপ্তমী ; দ্বিতীয় দিন অষ্টমী তিথি।

(১১৩) লালন ২২৮ নং পদে কৃষ্ণপদ্মের সন্ধান করতে বলেছেন। নারীদেহে রজঃবিকাশের মতো পুরুষদেহে রজঃবিকাশ হয় বলে বাউলগানে উল্লেখ পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ায় এ নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। ১৯৭৮-এ ২৮-৪-এর The Statesman পত্রিকায় এ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ফকির গায়কদের নিয়ে, নারী ও পুরুষদেহের পুষ্পবিকাশ বিষয়ে ফুলের গান বিষয়ক এক ৩০ মিনিটের কথিকা কলকাতা বেতারকেন্দ্রে আমি পাঠ করেছিলাম। আমার অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে (পৃ. ৪৯০-৪৯৬)।

(১১৪) পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-৩৫।

(১১৫) নাথধর্ম ও সাহিত্য, পৃ. ৫৩।

(১১৬) Behar peasant life, p. 272-280.

(১১৭) হরিদাস চক্রবর্তীর মতে, রজঃরক্তই চরক-উল্লিখিত পুষ্পমধু ; তা সব ঔষধের সঙ্গে সেব্য। 'সমাজের বিরাগে পৃথিবীতে গড়ে ৪০০ কোটি ড্রাম ঔষধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে' ; পাঞ্চভৌতিক চিকিৎসা, পৃ. ৭৮।

(১১৮) আকর্ষণ নারীসত্তার ধর্ম। পুরুষ এই আকর্ষণক্ষমতা সাধনায় অর্জন করে। বিকর্ষণ পুরুষশুক্রের ধর্ম। রজঃকালে নারীদেহ পুরুষত্ব লাভ করে (কালী কেবল মেয়ে নয় ; মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনও কখনও পুরুষ হয়)। এসময় বিপরীত বিহারে তাঁর রজঃরক্ত পুরুষ গ্রহণ করতে পারে ; এমনকি ; রজঃমিশ্রিত বীজ যা দিয়ে নারী-জরায়ুতে নরদেহ গঠিত হয় ; তা-ও পুরুষ গ্রহণ করতে পারে। লিঙ্গনাল দিয়ে শোষণে বা 'আধারে অধর দিয়ে' অথবা সহজে বিপরীত রতিতে তা পুরুষদেহে প্রবিষ্ট হয়। দেহের বাতাস নির্ণয় করে এ যোগাসাধনা করতে হয় তাহলে পুরুষদেহে উজানস্রোত বইবে।

কলমীপুঁথিতে বা তন্ত্রসারে রজঃবীজের মিলন ও গ্রহণপদ্ধতি বর্ণিত আছে। পৃ. ৫০৬-৫০৮।

ত্রিবেণীর ঘাট বর্ণন নামে এক হস্তলিখিত পুঁথিতে তিনদিনের রজঃসাধনার রূপ, বৈশিষ্ট্য, পূজাবিধি বর্ণিত আছে। এখানে পাই রজঃকালীন দেহমিলনের গূঢ় সাধনা : 'বাণ নালে সত্তা সুধা কর আকর্ষণ। নাগবায়ু যোগে ঊর্ধ্বে করিবে গমন।। দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি অপানে যোগ হয়। চতুর্দ্দলেতে বস্তু যাইবে নিশ্চয়।। সমানবায়ু যোগে যায় দশম দলে। প্রাণবায়ু যোগে গমন দ্বাদশ দলে।। উদানবায়ু যোগে ষোড়শ দলে গতি। কূর্মবায়ু যোগে হবে তীর্থে অবিস্থিতি।। ব্যানবায়ু যোগে হইবে সর্বাঙ্গে ব্যপিত। ধনঞ্জয়বায়ু যোগে নাদকোষে নীত।। পুরুষ সাধকের 'বাণের' ছিদ্রপথ দিয়ে সত্তা (শুক্র?) এবং সুধা (রজঃ?) দেহের পাঁচ প্রকার বায়ুযোগে বিভিন্ন অঙ্গে প্রবিষ্ট হবার বর্ণনা পাই এখানে।

নাগবায়ুর ধর্ম উদ্‌দার ; অপান গুহ্যে থাকে, ধর্ম মলমূত্রত্যাগে সাহায্য ; সমানবায়ু নাভিতে থেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে ; প্রাণবায়ু হৃদপিণ্ডে ; উদান কণ্ঠে ; কূর্মবায়ু মিলনে সাহায্য করে ; ব্যান সর্বাঙ্গে থাকে ; ধনঞ্জয় হিক্কা সৃষ্টি করে।

(১১৯) এটি বাউলসমাজে একটি প্রচলিত প্রবাদ। সাধনায় সাধকদেহের অভ্যন্তরে এক সিদ্ধদেহ গঠিত হয়। তাও সাধনায় এধরনের দেহাভ্যন্তরের সিদ্ধদেহের ছবি পাওয়া যায়। J. Needham, Science and Civilisation in China.. Vol. V. Part V. p. 83-90.

(১২০) Lokayata, Studies in the history of Indian. Philosophy, Vol. II. p. 28-31. দীর্ঘ দেহমিলন-ক্ষমতায় কাপালিকদের সিদ্ধি নিরূপিত হতো।

(১২১) 'অসতো সদ্‌জায়তে'— ঋগ্বেদ, ১০ম সুক্ত।

(১২২) Homeopathic magic is founded on the association of ideas by similarity ; contagious magic is founded on the association of ideas by contiguity'–Golden Bough. p. 12.

(১২৩) চণ্ডীদাসের বহুব্যবহৃত একটি পদে বলা হয়েছে : 'ছাড় জপতপ করহ আরোপ'। বৈষ্ণব সাধনায় আরোপ গুরুত্বপূর্ণ। লালনও একে প্রবর্ত স্তরে অগ্রাহ্য করেননি। এক বস্তু বা দেহকে, অন্য বস্তু বা দেহ কল্পনা করে ; কল্পনাকে যথার্থ জ্ঞানে আচরণ করাই অরোপ সাধনা। জনৈক সাধক আরোপ ব্যাখ্যা করে শিষ্যকে এক চিঠিতে লিখেছেন যে অদেখা বস্তুর কল্পনার চেষ্টাকে বলে ধ্যান ; দৃশ্যবস্তুর কাল্পনিক সাযুজ্য হচ্ছে আরোপ। "নিজের দেহকে গুরুর দেহ মনে করে সর্বদা তাকে সেবাযত্ন করবে। স্নান করাবে, খাওয়াবে, বাতাসে করবে। তাহলে ক্রমে দেহ গুরুর সঙ্গে অভেদ হয়ে যাবে।" (নিজস্ব সংগ্রহ)।

পুঁথিতে বা তন্ত্রসারের কুলসাধনা পর্যায়ে নিজেকে সুন্দরী নারী হিসাবে কল্পনা করতে বলা হয়েছে (পৃ. ৪৯৩)।

ভাব ও ভাবনা দ্বারাই দেহ রূপান্তরিত হয়, বৌদ্ধ সাধনায় এমত বিশ্বাসকে বলে, 'ভাবময়ী পণ্যা'। কৃষ্ণকে ভাবতে-ভাবতে রাধা অন্তরে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন ; তিনিই চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত। নিজের দেহে ইষ্ট, গুরু, প্রেমিকাকে আরোপ করা যায়। আবার অন্য দেহেও এগুলি আরোপিত হতে পারে। 'এক গুরু জগৎময়' ধারণায় দ্বিতীয় ধরনের আরোপ হয়।

(১২৪) Cirlot, Introduction XLIX.

(১২৫) এ ধরনের অনেক উদাহরণ আলোচিত হয়েছে Outline of history (Part I) গ্রন্থে (pp. 131).

(১২৬) Cirlot,. Introduction. XXXVIII.

(১২৭) Do. Do. IIV.

(১২৮) Do. pp. 109.

(১২৯) কামশাস্ত্র বা মোহিনীতন্ত্র, পৃ. ১০১।

(১৩০) When their function coincide and reveal their allegiance to one essence, both objects, although different on the existential plane and therefore interchang able'–Cirlot, Intoduction. XLI.

(১৩১) Cirlot, pp. 285.

(১৩২) ব্রাহ্মণ ব্যায়ালি পুনঃপুনঃ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সোনা তৈরিতে ব্যর্থ হবার পর, আকস্মিকভাবে নিম্নবর্গের এক নারীর দেহরস তার রসায়নপাত্রে পতিত হয়ে পাত্রস্থ উপাদানকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেয়। কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় Foundation of Tibetan Mysticism গ্রন্থে (pp 50).

(১৩৩) Cirlot, pp. 313.

(১৩৪) বৈষ্ণব পদাবলী (পৃ. ২৬৬) তে পরমানন্দের পদে পাই :

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে
　　পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
　　পরশ হৈল কতজনা॥

(১৩৫) Cirlot. pp. 230.

(১৩৬) Do.

(১৩৭) পদ নং ১১১, ২৪৫, ৩২৫ দ্রষ্টব্য।

(১৩৮) Cirlot. p. 230.

(১৩৯) তথ্যসূত্র ; অধীরকুমার চক্রবর্তী, ইংরাজি বিভাগ, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প. বঙ্গ।

(১৪০) রাজকৃষ্ণ মিশ্রের (ক্ষ্যাপা) হস্তলিখিত পুঁথি থেকে উদ্ধৃত।

(১৪১) Cirlot. p. 230.

(১৪২) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুরের মতে বৈষ্ণবীয় পঞ্চতত্ত্বের ধারণাটি বৌদ্ধ প্রভাবিত।— পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৬২। ৩৫১ নং পদে পঞ্চবাণের উল্লেখ আছে।

(১৪৩) পদ নং ৩৫৬, ২৪৫, ২৩২, ২১৪, ১৪।

(১৪৪) তথ্যসূত্র : লোকমান ফকির।

(১৪৫) পদ নং ২৩৫ দ্রষ্টব্য। তথসূত্র : আমীরুদ্দীন বাউল, মামদালিপুর, হরিহরপাড়া মুর্শিদাবাদ।

(১৪৬) বস্তুবাদী বাউলে পর্যায়ের গানের সংগ্রহ ও আলোচনা আছে।

(১৪৭) পদ নং ৯৬, ১৮৪, ১৯৪, ২১৭ দ্রষ্টব্য।

তথ্যসূত্র : আজাহার আলী খাঁ, গোরভাঙা, করিমপুর, নদীয়া।

(১৪৮) একটি দেহ গঠিত হয় রজেঃবীজে। রজঃ তাই অর্ধেক হিসাবে গণ্য হয়। সাধকদের মতে দেহমিলনে উভয়ে (নরনারীর) ৩$\frac{১}{২}$ ফোঁটা করে শুক্র স্খলনে মোট ৭ দিয়ে গঠিত হয় দেহ।

নারীদেহে অমার আগমনে রাধাবিন্দু/ডিম্ব রজঃস্রোতে ভেসে আসে। লোকমুখের ছড়ায় শুনি :

এক দুই সাড়ে তিন
অমাবস্যা ঘোড়ায় ডিম॥

(১৪৯) তথ্যসূত্র : মনমোহন দাস, সাঁটুই, শক্তিপুর মুর্শিদাবাদ। তিনবাঞ্ছার প্রসঙ্গ আছে চৈতন্য চরিতামৃতে (আদি, ১ম পরিচ্ছেদ)।

(১৫০) চন্দ্র শব্দটি নানা অর্থে গানে ব্যবহৃত হয়। নীল, রূপ, পিয়ল, শ্বেত প্রভৃতি ২৪টি চন্দ্রের নাম পাই পূর্ণক্ষ্যাপার হস্তলিখিত খাতায়। প্রতাপনগর, নবদ্বীপে তাঁর আশ্রম ছিল।

প্রয়াত গুরু বদি শা (স্বরূপপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ)-এর হস্তলিখিত খাতা থেকে গৃহীত তথ্য।

(১৫১) চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।

(১৫২) শ্রী কিরাসার পুঁথিতে (নিজস্ব সংগ্রহ) বাণের আলোচনা আছে।

কন্দর্পেব বাণ · মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, মোহন।

রতির বাণ . কুসুম, সুসুম, চঞ্চলা, আকর্ষিণী, সৌদামিনী।

কৃষ্ণের বাণ : আহরণ, সমারণ, কটাক্ষন, প্রেড়দল, সর্বপূরণ।

শ্রীমতীর বাণ · অঙ্গন (নিষ্ঠাগুণে), অঙ্গদ (সেবাগুণে), বিকলা (মমতায়), স্তম্ভন (মমতাগুণে), মনমোহন (মধুর গুণে)।

পঞ্চগুণে (দুপক্ষে) দশবাণ।

শব্দে—স্তম্ভন, অঙ্গদ।

গন্ধে—সম্মোহন, বিকলা।

রূপে—শোষণ, সম্মোহন।

রসে—অঙ্গন, উচাটন।

স্পর্শে—মোহন, মাদন, স্তম্ভন।

প্রেমদাসেব বংশীশিক্ষায় (নিজস্ব সংগ্রহ) পঞ্চশর ও তাদের প্রভাব বর্ণিত হয়েছে—

সম্মোহন—গৃহাদি বিস্মরণ ; সমুদ্বেগোন্মাদ—তীব্র উন্মাদনা সৃষ্টি করে আকর্ষণ ; শোষণে—দেহরস শুষে অবশ করে ; তাপন স্তম্ভনে—দেহজারণ ও দেহদগ্ধ ; চৈতন্য হরণে—অজ্ঞানতা।

যষ্ঠিচরণের খাতায় লিখিত নারীর ৫ বাণ : তাড়ন, ভর্ৎসন, মোহন, নয়ান, যৌবন।

সহজমঞ্জরীতে বাণ : (কামের ধনুক দ্বারা নিক্ষিপ্ত)।
নায়কের—স্তম্ভন, শোষণ, উচাটন, মাদন, সম্মোহন।
নায়িকার—স্তম্ভন, সম্মোহন, অঙ্গন, অঙ্গদ, বিকলা এই ৫ বাণ রসযুক্ত।
দেহের ভিন্নঅঙ্গে এ বাণের ক্রিয়া ও যুদ্ধ এ পুঁথিতে বর্ণিত।
পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত বস্তবাদীরা স্বীকার করেন না।
চারভূতের সঙ্গে, রজঃ+বীজ=(এই এক) মিলে পাঁচ।
আদ্যসার রসসংগ্রকে মুকুন্দ দাস (২য় চম্পকে) লিখেছেন :—
আদিব্রহ্ম সত্তাযোগে গন্ধমেদেনী স্থিতি॥
গন্ধমেদেনী রূপে রসব্রহ্ম শুনি।
রজঃবীজ পুষ্টিযোগে জন্মে সর্বপ্রাণী॥

সেই রজঃবীজ তথি পঞ্চবিধ হয়। ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আদি কয়॥ এই পঞ্চ পূর্ণরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব কয়। ক্ষিতি জলাদি পূর্ণ পঞ্চব্রহ্ম হয়॥

সমস্ত দেহের ৫ পঞ্চবিভাগ/আত্মা এই পঞ্চসত্তার সঙ্গে জড়িত। পঞ্চের উদ্ভব রজঃবীজ থেকে। পুরুষ/প্রকৃতি অনাদি।

(১৫৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, পূর্বোক্ত পৃ. ৯৯—১০৩, ১৪০-১৪৫।

(১৫৪) প্রয়াত গুরু বদি শা-এর খাতায় পাই :

হামাল (মাথার আকৃতি), ছুর (গর্দান), জওজা (হাতের বাজু), আছোত (আকৃতি), ছোম্বলা (চেহারা), ছুরতন (সুরাত), হুত (পায়ের জঙ্গী), জাঙ্গিও (কোমর), দলবে (পেট), কুচ (বুক), আঁখ (চোখ), মিজান (পায়ের পাতা)—এ ১২টি স্থান ভালোভাবে 'নিহার' করে পরে চোখ বন্ধ করে, দ্বাদশ স্থানের রূপবৈশিষ্ট্য স্মরণ করলে ধীরে মূর্তিটি ভেসে উঠবে।

১২টি বৈশিষ্ট্য দিয়ে নক্সাটি অঙ্কিত করা হয় মনে। ১২টি অঞ্চলে বিভক্ত দেহ। ছবি বা ম্যাপ আঁকার এক লৌকিক পদ্ধতির আভাস পাই এখানে।

দশ ইন্দ্রিয়+মন+নিষ্কাম কর্ম ইন্দ্রিয়=১২ ইন্দ্রিয় (ষষ্ঠিচরণের খাতা)।

(১৫৫) তথ্যসূত্র : আমীরুদ্দীন বাউল, পূর্বোক্ত।

তিন খণ্ড দেহ, ত্রিভুবন (মাথা, নাভি পর্যন্ত বুক, নাভির নিম্নভাগ—স্বর্গ, মর্ত, পাতাল)। এর মধ্যে নাভির ঊর্ধ্বে ৭টি ও নিম্নে ৭টি ভুবন কল্পিত হয়।

ব্রহ্মতালু—সত্যলোক।	পদতল—পাতাল
মস্তক—স্বর্লোক	পায়ের উপরপিঠ—রসাতল
গলা—অন্তরীক্ষ	গুল্ফ—সুতল
স্কন্ধ—পৃথিবী	হাঁটু—তলাতল
বক্ষ (চোখ)—মহালোক	জঙ্ঘা—তল
পৃষ্ঠ (ভ্রূমধ্যে)—জনলোক	গুহ্য—বিতল
কটিদেশ (ললাট)—তপলোক	যোনি/লিঙ্গ—তলাতল/তপোদেশ

পুঁথি বা সাধকদের খাতায় এ তালিকার সামান্য ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়।

২ চোখ + ২ কান + ২ নাক + মুখ + কটি + গুহ্যদ্বার + উপস্থ + বুক + স্তন + নাভি + ব্রহ্মরন্ধ্র = ১৪ ভুবন।

দেহের ১৪টি স্থান বা দলে ১৪দশ মঞ্জরী কল্পিত হয়, যেমন নেত্রে—রূপমঞ্জরী, ললাটে—

ভানু, নাকে—কস্তুরী, জিহ্বায়—রস, নাভিতে—লবঙ্গ, কটিতে—কিঙ্কিনী, যোনি/লিঙ্গে—রতি, উরুতে—মোহন, পায়ে—পদ্ম, হাতে—বিলাস, হৃদয়ে—প্রেম, আর তিন মঞ্জরী গুপ্ত।

১৪ ভুবন আছে দেহে—এ অতিশয়োক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের চাইতে ভাণ্ডের অধিক মহিমা ঘোষণা করা হয়েছে।

(১৫৭) প্রয়াত পারুলবালা পাল, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদের খাতা থেকে গৃহীত। এখানে দেহে সর্বদেবতার বাস দেখানো হয়েছে।

বদি শা-এর খাতায় ১৮ মোকাম হচ্ছে : জিহ্বা, আলজিহ্বা, নাক, দন্ত, চোখ, ললাট, কান (শ্রীকোলার হাট), নাভি (নবঘনতাল), বুক, পিঠ, হাড় ও পেশী, মূত্রদ্বার, শুক্রদ্বার, গুহ্যদ্বার, তলপেট, হাত, পা, মুখ।

এই ১৮ মোকামে ৫ ভূত ও ৫ ভূতের ৫টি করে গুণ থাকায় = ১৮×৫×২৫=২২৫০ ; আবার দেহে ৪০ গঞ্জের মাল (৫ ওজুদ+৫ নফস + ৫ রুহু + ৫ মোকাম + ৫ ভূত + ৬ লতিফা + ৯ দ্বার) থাকায় ২২৫০ × ৪০ = ৯০,০০০ দেহতত্ত্বের বিষয়বস্তু। এই ৯০ হাজার কথা নবীর সঙ্গে আল্লার হয়েছিল। তাই আদি কোরাণ ৯০ পারা। ৩০ পারা জাহেরা বা প্রকাশ্য ; ৫০ পারা বাতন ; ১০ পারা (১০ ইন্দ্রিয়) নবীর সিনায় পোরা ছিল। এর পূর্ণজ্ঞান অদ্যাবধি মানুষ পায়নি। কোরাণে মোট ৬৬৬৬টি অক্ষর আছে, পূর্বোক্ত ১২ (বুরুজ) দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ৫৫৫ ; অবশিষ্ট ৬। তাই ৬ লতিফা ও রিপু ; আর ৫ নফস, ৫ রুহু, ৫ ওজুদ।

৩০ হাজার পুরুষের দেহতত্ত্ব এবং ৩০ হাজার নারীদেহতত্ত্ব, এই ৬০ হাজার বাতনে বা গুপ্ত আছে।

ষষ্ঠিচরণের খাতায় ১৮ মোকাম ও অধীশ্বরগণ হচ্ছেন—ব্রহ্মা—মাথায় ; মহাবিষ্ণু—কপালে ; কালাচাঁদ—চোখে ; নিত্যানন্দ—নাকে ; চৈতন্য—কানে ; বীরভদ্র (ভদ্রা)—মুখে ; নারদ—জিহ্বায় ; আলজিহ্বায়—সরস্বতী ; কৃষ্ণ-বলরাম—বাহুতে ; গদাধর—হৃদয়ে ; ব্রহ্মা—নাভিতে ; শিব—লিঙ্গে , গোপাল—গুহ্যে ; শক্তি—হাঁটুতে, বসুমতী—পায়ে ; জগন্নাথ—সর্বাঙ্গে ; কানাই—গলায়। [সম্ভবত কৃষ্ণ+বলরাম=দুই ধরলে (২ বাহু)=১৮ হয়]।

(১৫৮) লেখকের বস্তুবাদী বাউলে এ ছবিটি আছে।

(১৫৯) শেষ চারটি অক্ষরের স্থাননির্ণয়ে মতভেদ আছে। কেউ, দু'স্তন ও দু'চোখে/কেউ নাভি, স্তন, গণ্ড, কপালে/চোখে ৪ গণনা করেন।

ষষ্ঠিচরণের খাতায় ৫ ভূত + ৫ কর্মেন্দ্রিয় + ৫ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় + ৬ রিপু + ৩ অহঙ্কার = মোট ২৪টি তত্ত্ব।

অন্যত্র পাই : ৫ কর্ম-ইন্দ্রিয় + জ্ঞান-ইন্দ্রিয় (= নাসা, জিহ্বা, চর্ম, চক্ষু, কর্ণ, বাক্‌, পাদ, পানি, পায়ু, উপস্থ) + এদের অধিষ্ঠাতা দেবগণ (দিকপাল, বায়ু, অর্ক, বহ্নি, প্রচেতা, উপেন্দ্র, ইন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার) + রজঃ তম সত্ত্বজাত অহঙ্কার + মন = মোট ২৪ তত্ত্ব। আরবীতে ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণকে এই দেহতত্ত্বের বিষয় হিসাবে সাধকেরা গণ্য করেন।

।। চতুর্থ অধ্যায়।।

পরিশিষ্ট

।। সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে লালনের যোগসূত্র।।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'আমরা' কবিতায় কীর্তন এবং বাউল গানে বাঙালির আবেগের আত্মপ্রকাশ চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু প্রাক্ চৈতন্যযুগেও কীর্তন ছিল। বাউল শব্দের ব্যবহার ছিল চর্যাপদের কাল থেকেই। হিন্দু বৌদ্ধ ইসলামি ঐতিহ্য বাউল শব্দের এবং সাধনার নানা প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। দেহতত্ত্বের গান নানাভাবেই তন্ত্র সংশ্লিষ্ট। প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনাও বাউল গানে ফেলেছে দীর্ঘছায়া। বঙ্গের বৈষ্ণব বা শাক্ত আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলন থেকে সযত্নে পৃথক করে রাখা হয়। মহাপ্রভু চৈতন্য স্বয়ং দক্ষিণভারত ভ্রমণ করে নানা ভক্তিবাদের গ্রন্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন। উত্তরপূর্ব ভারতের বৈষ্ণবসংস্কৃতির সঙ্গেও তার গভীর পরিচয় হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সমসময়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচনা করেছিলেন "তন্ত্রসার"। উড়িষ্যা এবং পূর্ববঙ্গ—কামরূপের তান্ত্রিকতার সঙ্গে চীনাচারের মিশ্রণে গড়ে ওঠে রাঢ়ের তারাপীঠ। রামপ্রসাদের গানের অন্যতম চরিত্র ছিলেন এই তারা। কিন্তু সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের বিবিধ গোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব, শাক্ত ; এমন কি বাউলদের সম্পর্ক নিরূপণের কোন গুরুত্ব পূর্ণ প্রচেষ্টা হয়নি।

ইংরেজ আমলে 'এসিয়াটিক সমাজের' অচলায়তনের এক বিকৃত ধারণা বুদ্ধিজীবীদের গ্রাস করে। য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে, পণ্ডিতেরা, ইংরেজ আমলে গঠিত প্রদেশ সমূহকে এবং ভাষা গোষ্ঠীগুলিকে স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবতে শুরু করেন। ইংরেজী শিক্ষিত জনতার প্রযত্নে বাঙালি, উড়িষা, অসমীয়া প্রভৃতি উপজাতীয়তাবাদ/জাতীয়তাবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। অন্যপ্রদেশ এবং ভাষাগোষ্ঠী থেকে পৃথক সংস্কৃতিগুলিকে পণ্ডিতেরা নির্দ্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করেন। সাংস্কৃতিক ভিন্নতায় ভারতীয় জনতাকে বিভক্ত করা উপনিবেশবাদেরই এক সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা ছিল। বাস্তবে সমধর্মী আর্থ সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার গর্ভে অতিঘনিষ্ঠ কথ্যভাষা এবং সংস্কৃতি থেকে আর্যাবর্তের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী তাদেব সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ এবং নির্মাণ করেছিলেন। দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক প্রভৃতি দেশজ উপাদান এতে মিলিত হয়েছিল। উত্তর কালে খ্রিস্টান, ইসলামি, বেসরা সূফি সংস্কৃতির টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে আমাদের মিশ্রসংস্কৃতি। বাউল তত্ত্ব এর ব্যতিক্রম নয়।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির প্রাক্ ইংরেজ আমলে থেকেই সাধু-ফকিরেরা ছিলেন সামাজিক সচলতার মূর্ত প্রতীক। ভেক/ সন্ন্যাস নিলে দূরবর্তী দেশে স্বজন পরিবার ছেড়ে যেতে হয়। তীর্থে-মেলায় পরিভ্রমণও এ জীবনের অংশ বটে। স্থায়ী গৃহবাসে এদের বহু আপত্তি। এ জীবন চর্যায় সাধুসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বহু সাধকের বিচিত্র সংস্কৃতির সঙ্গে এদের পরিচয় হয়, হয় লেনদেন। বুরহানপুরের নাথদের, মাদারি ফকিরের, যাযাবর কলন্দরের, অযোধ্যার রামানন্দী, নিম্বার্ক বৈষ্ণব, নিরঞ্জনী, নানাকপন্থীদের প্রাচীন শাখা সমূহ প্রসারিত হয়েছিল বঙ্গে। লালন পন্থায় দেশ ভ্রমণ এবং সাধুসঙ্গ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রথমপর্বে লালন বহু দেশভ্রমণ করেছিলেন। সাধক-গায়ক হিসাবে সমধর্মী ভক্তি বাদীদের কথা, সুর, গীতরীতিকে তিনি অবশ্যই অগ্রাহ্য করেননি। লালনের পদে সগনচৈতন্য, কবীর, রুইদাস, রায়রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের উল্লেখ আছে। লালনের পরবর্তীকালে উত্তর-

পূর্ব ভারতের সুরদাসের গীতরীতি এবং একতারা ও কোমরে বাঁধা বায়ার যন্ত্রানুসঙ্গ প্রচলিত হয় লালনগীতে। অমূল্য সাহা ছিলেন এর পথিকৃৎ। একটি পদে লালন স্বর্গসুখ এবং জগৎ ও জীবন থেকে মুক্তির সাধনাকে অগ্রাহ্য করে সাঁইএর কাছে ভক্তি প্রার্থনা করেছেন। ভোগ এবং মুক্তি জরামৃত্যু যুক্ত যমের ঘর (পদ নং ৩৭১)। লালনের নির্দেশ—'মুক্তিপদ ত্যজিয়ে সদাই ভক্তিপদে রেখ হৃদয়' (পদ নং ১৫০)[১]।

গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত সাধনা, তত্ত্বদর্শন, গান এবং প্রতীকরূপক মিথের এক মৌখিক সর্বভারতীয় সাধুশাস্ত্রের ভাণ্ডার বহন করতেন ভ্রাম্যমান সাধুরা এবং লৌকিক উপাসকেরা। এর একাংশ নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের আচার অনুশাসনে বদ্ধ হয়ে সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল। অন্য অংশটি ছিল মুক্ত এবং সচল। এ প্রবাহ থেকে উপাসকেরা তাদের সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ করতেন। বঙ্গের গ্রামেগঞ্জে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে আসতেন নানা সাধুফকির। যারা রসসাধনা, সহজ সাধনা, নারীকেন্দ্রিকতার সঙে যুক্ত ছিলেন ; জাত-পাত-সম্প্রদায়ের, শাস্ত্র ও আচারের প্রতিবাদ তারা করতেন। সে সমস্ত 'স্বজাতীয়' সাধক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল এক ঐক্যের স্রোত। মুর্শিদাবাদে বিপুল সংখ্যক কবীরপন্থী গোপ থাকেন। বহরমপুর শহরে নিরঞ্জনীদের বহু অনুগামী ছিলেন। সর্বভারতীয় চর্মকারদের মধ্যে রুইদাস, জোলাদের মধ্যে কবীর, অন্যান্য নিম্নবর্গের মধ্যে তুলসীদাস এক সচল প্রবাহ রূপেই বিদ্যমান আছেন। বঙ্গের গ্রামেগঞ্জে হত রামায়ণগান।

নদিয়ার বৈষ্ণবান্দোলন, ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদের নানা প্রভাব আছে লালনে। তন্ত্র এবং আগম নিগমের উল্লেখ করেছেন লালন। লালন পদাবলীর বহু রূপক, চিত্রকল্প এবং তত্ত্বভাবনার পূর্বসূত্র পাই অগ্রজ ভক্তিবাদী পদকর্তা কবীর, রুইদাস, তুলসীদাসের রচনায়। এ উপাদানগুলিও হয়তো তৎ-পূর্ববর্তী সাধকদের ঐতিহ্যের বিস্তার ছিল। লালন এগুলি হয় পরম্পরা সূত্রে পেয়েছেন অথবা নিজে সংগ্রহ করে গানে সংযোজন করেছিলেন। 'জাতিতে জোলা' কবীরের উল্লেখ আছে লালনের গানে[২]। কবীরের হিন্দু-মুসলমান শিষ্যছিল। লালনের মত তিনিও জোলা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবীরের মত লালনের সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিতর্কিত। লালন বহুগানে তাঁর সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে অস্বীকার করে মানুষ হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত গান, 'সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'।[৩] এগানের অতিখ্যাত পংক্তি 'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান নারীর তবে কি হয় বিধান। বামন চিনি পৈতে প্রমাণ বামনী চিনি কি প্রকারে।।' এ যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত অগ্রজ কবীরের—If Circumcision makes you muslim what do you Call your woman?

If putting on the thread makes you Brahmim what does the wife put on?"[৪]

কবীর পদাবলীর অংশ বিশেষ 'শব্দ' নামে প্রসিদ্ধ। গঙ্গাপদ্মার মধ্যভূমিতে দেহতাত্ত্বিক বাউল গান 'শব্দগান' নামে চিহ্নিত হয়।

কবীরের পদে পাই, "কায়া মধ্যে বীজ বিরাজে বীজ মধ্যে কায়া"[৫] নবিকে, লালন বীজ, বৃক্ষ, ফলের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন এবং সাঁই ও নবির সম্পর্ক বর্ণনায় লিখেছেন—(ক) বীজ মালেক সাঁই, বৃক্ষ নবি (খ) নবিজি গাছ সাঁইজি ফল (গ) আল্লা নবি দু'টি অবতার গাছ বীজ রূপে দেখি যে প্রকার।[৬]

কবীরের দোহায় শুনি, 'আপা মদ্ধে আপৈ বলে আপৈ সিরজন হারা'[৭]

লালনের গানে এর প্রতিধ্বনি শুনি—

(ক) আপ্নিগুরু আপ্নি চেলা (খ) আপনি ঘর সে আপনি ঘরি (গ) দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সে রবে (ঘ) তুমি আপনি আল্লা ডাক আল্লা বলে[৮]

পঞ্চভূতাত্মক দেহে কাজী-পণ্ডিতদের মূলসত্তা 'আমি' কে নির্ণয় করতে আহ্বান জানিয়েছেন কবীর—

অগ্নি পবনপানি পিরথি নভ, তা বিন মিলৈ নাহি

কাজী পণ্ডিত করো নিরনয় কোন আপা মহী।[৯]

নিজের দেহ—ঘরে কে বিরাজ করে? সরার পণ্ডিতেরা কেউ তা লালনকে বলতে পারে না। "জল কি হুতাশন মাটি কি পবন কেউ বলে না একটা নিন্নয় করে।"[১০]

তন্ত্র এবং দেহ তাত্ত্বিকে ভাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ করতেন। বিশিষ্ট রীতিতে কবীর লিখেছেন, "য়্যা ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর য়্যাহী মে নদ্দীনারা

য়্যা ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা, য়্যাহী যে ঠাকুর দ্বারা"[১১] লালনও তাবৎ ভুবনের সর্বতীর্থ, নদনদী, সমুদ্র, মূল সত্ত্বাকে দেহের ভিতর খুঁজতে বলেছেন এবং খুঁজে পেয়েছেন। কবীরের মতে মূলসত্ত্বা এবং জাগতিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমূহকে বহির্বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যায় না।

'ঘর যে বস্তু নজর নাহি আবত

বন বন ফিরত উদাসী।।[১২] অনুরূপ মন্তব্য লালনেরও—

(ক) ঘরে হারিয়ে বনে খুঁজে ধন (খ) বল কারে খুজিস ক্ষেপা দেশবিদেশে (গ) আমার কি হল ভ্রান্ত মন বাইরে খুঁজি ঘরেরি ধন (ঘ) কেন খুজিস মনের মানুষ বনে সদায়[১৩]

মক্কা-কাশী তীর্থ ভ্রমণের বিষয়ে কবীর ভক্তকে সতর্ক করেছেন—"কোই যাবৈ মক্কে কোই যাবৈ কাশী

দৌউকে গল বিচে পড়ৈগে ফাঁসি।"[১৪]

মক্কা কাশী যাওয়ার নিরর্থকতার কথা বলেছেন লালনও। কবীরের অনুসরণে তিনিও লিখেছেন, "যেতে সাধ হয় রে কাশী কর্মফাঁসি বেদলো গলায়"।

'মক্কাতে ধ্বাক্কা খেয়ে যেতে চাও কাশীস্থলে'।[১৫]

এ মানব জন্ম দুর্লভ, মহার্ঘ। এ জন্মের সদব্যবহার নিয়ে লালনের বহু গান আছে। 'এমন মানব জন্ম আর কি হবে। মন জা কর ত্বরায় করএ ভবে।'[১৬] অগ্রজ সাধক কবীর লিখেছেন—

your chance of human birth

Does not come time and again

once the ripe fruit falls

you cannot stick it back on the branch[১৭]

নানক পন্থার গান, রীতি বঙ্গের সাধুসমাজে উপনীত হয়েছিল নিশ্চয়। ফকিরদের সঙ্গে নানক পন্থীদের নানা সম্পর্ক ছিল। পদসংকলন গ্রন্থকে 'আইন' বইএর মর্যাদা দিয়ে প্রণাম করে বাংলায় কর্তাভজারা। ভাবের গীতে আভিপ্রায়িক 'গুরুবচন'কে বলা হয়েছে 'ট্যাকশালী বোল'। ট্যাকশাল রূপকটি 'গ্রন্থসাহিব'—এ পাওয়া যায়। 'ঘড়ি ঐ সবদু সচী টকশাল'—গুরু সৎ উপদেশে সত্য টাঁকশালে 'শব্দ' তৈরি করেন।[১৮] এ ট্যাকশালের প্রতীক লালন ব্যবহার করেছেন।[১৯]

রুইদাস/রামদাস মুচির ছেলে ছিলেন। তার অনুপম ভক্তির কথা জানতেন লালন। তার এক পদে দেহকে খাঁচার রূপকে, বৃক্ষের উপমার বর্ণনা করা হয়েছে। আর প্রাণ তো পাখি—

The walls are made of water, pillared by Air

Sealed together with the morter of Blood
A Shell of veins and meat and bones
A Cage to hold this poor bird
Who comes what is yours of mine
For we rest in this tree briefly"[20]

খাঁচা পাখি এবং বৃক্ষে বসা পাখির চিত্রকল্প লালনের গানে বহু। অবিকল দেহ-খাঁচার নির্মাণ তিনি রবিদাসের মতই ব্যাখ্যা করেছেন। 'আবে খাকে পিঞ্জরা বর্ত আতসে হৈল পোক্ত, পবন আড়া সেই ঘরে আছে শুক পাখি সেথা'[২১]। উপনিষদের কাল থেকে লালনের কালের সীমায় বৃক্ষে থাকে পাখি—

(ক) ক্ষণেক পক্ষ যেমন থাকে বৃক্ষ ডালে (খ) দেখ মনুরায় নানা পক্ষ এক বৃক্ষ রয়।[২২]

প্রাচীন রামোপাসক বৈষ্ণবদের শাখা প্রশাখা বঙ্গে বিস্তৃত হয়েছিল। নিম্নবর্গের জনতার মাধ্যমেও তুলসীদাসের দোহাবলী বঙ্গে উপনীত হয়েছিল। শিলাইদহের গোঁসাই গোপালের মতো বহু পদকর্তার পদে তুলসীদাসের সরাসরি প্রভাব নির্ণয় করা যায়। তুলসীদাসের বিখ্যাত এক দোহায় পাই, 'নির্গুণ হেয়, সো পিতা হামারা সগুণ হেয় মাহতারি"[২৩]। গোপাল লিখেছেন, "বেদ সে মাতা, নির্বেদ পিতা/নির্গুণ পিতা সগুণ সে মাতা।" কলিযুগে চৈতন্যাবতার হয়েছেন জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা "প্রশমোহ কলিযুগ সর্বযুগ সার" বলেছেন। কিন্তু তুলসী দাস দেখেছেন কলিযুগে সত্য প্রহৃত হয়, ঝুঠা জগৎ ভুলায়। দুধ কেউ একটা কেনে না, মদ মুহূর্তে বিক্রি হয়ে যায়। লালনও দেখেছেন মানীর মান থাকে না ; ছদ্মবেশী ধূর্তদের প্রাদুর্ভাব ; প্রাচীন বনেদী শিল্প অনাদৃত থাকে ; নকল, চটকদার পণ্য লোক টানে ; ধর্মের নামে আচারের প্রাবল্যে কলির আরতি শুরু হয়েছে (পদ নং ১০৫)।

তুলসীদাসের দোহায় শিশুর স্তন পান এবং জোকের প্রসঙ্গ এসেছে। 'পিয়ে রুধির পয় না পিয়ে লগী পয়োধর জোক'।[২৪]

অনুরূপ লালনের বর্ণনা, 'যে স্তনেতে দুগ্ধ খাএ রে শিশু ছেলে
জোকের মুখে সেথা রক্ত এসে মেলে।' (পদ নং ২৪৪)

লোক বিশ্বাসে পাওয়া যায় যে চাতক মেঘের জল ছাড়া অন্য জল খায় না। এ সূত্র থেকে একনিষ্ঠার প্রতীক নির্মাণ করেছেন তুলসীদাস।

(ক) গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাত সমুদ্দর ভরপুর
তুলসী চাতক্‌কে মতে সোঁয়াৎ বিণে সব ধুর

(খ) চাতক তুলসীকে মতে স্বাতীহুঁ পিয়ে ন পাণি।[২৫] লালনের বহু গানে এ চাতক-স্বভাবের কথা আছে।[২৬]

মনে কলুষ রেখে বাহ্যিক ধর্মাচার, সাজসজ্জা, মালাজপার সমালোচনা করেছেন তুলসীদাস, 'মালা ফেরত্ জুগ গয়া পায় না মনকা ফের
করকা মনকা ছাড়িকে মনকা মনকা ফের।'[২৭]

লালনও মালা তিলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে লিখেছেন—

(ক) কাঠের মালা নেড়ে নেড়ে মিছে নাম জপা

(খ) মর কেন হড়িবড়ি কাঠের মালা টিপিয়ে হারে[২৮]। মনঃশুদ্ধি লালনের সাধনায়ও গুরুত্বপূর্ণ।

রাজহাঁসের নীর থেকে ক্ষীর বেছে নেওয়া প্রভৃতি ভক্তিবাদী সন্তদের দৃষ্টান্ত-প্রতীকাদি লালনের মত বাউল মহাজনেরা ব্যবহার করেছেন। এগুলির অর্থান্তরিত রীতি পদ্ধতির বিশ্লেষণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গুরুর গুরুত্ব, সাধুসঙ্গের মহিমা, জাত-পাত-সম্প্রদায় বিরোধী জেহাদ, নিছক শাস্ত্রাচারের প্রতিবাদ সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনে শোনা যায়। এ সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে লালন সর্বভারতীয় 'সন্ত' দের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্রীয় ভাষা সংস্কৃত/ আরবীর পরিবর্তে লালন কথ্য আঞ্চলিক ভাষায় পদ রচনা করেছেন। এ 'বহতা নীর' সন্ত সাহিত্যেরও অমল প্রবাহ। ভিন্ন প্রদেশ, এলাকার ভক্তি আন্দোলনের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে লালনের ঐক্য এবং সমান্তরাল চিন্তার সাদৃশ্যের বিশ্লেষণ আমাদের গণ-সংস্কৃতি এবং গণ-ঐক্যের ক্ষেত্রে এক জরুরী আলোচ্য বিষয়।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থের প্রথমভাগের

(১) পদ নং ২৯৬, ৩২২, ১৪৮ দ্রষ্টব্য। ১৬৮ নং পদে লালন বলেছেন যে অনিত্য মুক্তি দিয়ে সাঁই জীবকে ভুলিয়ে রাখেন।

(২) লালন গীতিকা, পদ নং ৫৩, ৫৫, পৃ. ৩৬-৩৮। পূর্বোক্ত পদ নং ৭৮

(৩) লালন গীতিকা, পদ নং ৫৪, পৃ. ৩৮

(৪) The Sant, edited by K. Schomer and W. H. Mcleod, Motilal Banarasi Das, New Delhi, 1987, p. 150

(৫) দোঁহাবলী, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পদ নং ৩৩০, পৃ. ১১৫

(৬) গ্রন্থোক্ত ; পদ নং ৫, ২৬২, ২৭৩

এসব চিত্রকল্পে, আবু রু শদ, (Songs of Lalan Shah) অনৈস্লামিক পৌত্তলিকতার সন্ধান পেয়েছেন।

(৭) দোঁহাবলী, পূর্বোক্ত, পদ নং ৩৩০, পৃ. ১১৫

(৮) গ্রন্থোক্ত, পদ নং ৩২, ৩৩, ১২২, ১৩৭

(৯) দোঁহাবলী, পদ নং ৩৩০

(১০) গ্রন্থোক্ত, পদ নং ৬৮/৭০ ; ১২৯ নং পদে মুনসী মৌলবীদের প্রতি প্রশ্ন আছে।

(১১) দোঁহাবলী, পদ নং ৩২৯

(১২) ঐ, পদ নং ৩৫১

(১৩) গ্রন্থোক্ত, পদ নং ১৭, ১২২, ৩৭৪

(১৪) দোঁহাবলী, পদ নং ৩৫৮

(১৫) গ্রন্থোক্ত, পদ নং ৭৮, ৯৬/৯৮, ১৫৩

(১৬) ঐ, পদ নং ৪

(১৭) Songs of the Saints of India, J. S. Howley and M. J. Smuyer, o. u. p., 1988, p. 58

(১৮) গ্রন্থোক্ত শিল্প, ৩য় অধ্যায়, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, তথ্যসূত্র ২৬ নং দ্রষ্টব্য

(১৯) ঐ, পদ নং ৯৬, ৩৬৪

(২০) Songs of the Saints of the India, p. 28

(২১) গ্রন্থোক্ত, পদ নং ৬৭/৬৯,
(২২) ঐ, পদ নং ১৯০, ২২০
(২৩) দোঁহাবলী, পৃ. ১
(২৪) ঐ, দোহা ২৮৩, পৃ. ১০০
(২৫) ঐ, দোহা ৫০২, ৫৮৭
(২৬) গ্রন্থোক্ত পদ নং ১৩, ২৯৭
(২৭) দোঁহাবলী, পদ নং ৩১৫, পৃ. ১০৮
(২৮) গ্রন্থোক্ত, পদ নং ২৬৪, ১৬২

গ্রন্থপঞ্জি।। সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা

অধিকারী শচীন্দ্রনাথ, পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৫২।
শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৮০।
কবি মিলন, প্রবর্তক, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৫১।
আবদুল কাদের এবং রেজাউল করীম সম্পাদিত, কাব্য মালঞ্চ, কলকাতা, ১৯৪৫।
আবদুল কাদের, বাংলার পল্লীগানে বৌদ্ধ সাধনা ও ইসলাম, বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৫।
আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।
আহাম্মদ ওয়াকিল, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।
আহাম্মদ মুজফ্ফর, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৯।
আহাম্মদ শরীফ, সওয়াল সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।
বাউলতত্ত্ব, ঢাকা, ১৩৭৯।
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮‍৭।
আহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন, বাউল ধ্বংস ফৎওয়া, রংপুর, ১ম খণ্ড, ১৩৩২ ; ২য় খণ্ড, ১৩৩৩।
উচিত কথা ও বাউল ধ্বংস ফৎওয়া, একত্রে ১৩৩২-এ কলকাতার মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড থেকে প্রকাশিত হয়।
ইসলাম মযহারুল, ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, লোকলৌকিক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২। কবি পাগলা কানাই, ঢাকা, ১৩৬৬।
ইসলাম মোজাফ্ফর, সাধক সুফী আব্দুল গণি, ব্লক এফ ৫৫৩, সেক্টার, ১, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪. ১৯৯২।
ইসলাম মোঃ রফিকুল, লালনশাহের পল্লীগীতি, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৮।
এ-এইচ-এম-ইমামুদ্দীন, বাউল মতবাদ ও ইসলাম, কুষ্টিয়া, ১৯৫৯।
কবিরাজ কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরিতামৃত, সুকুমার সেন সম্পাদিত, বইপত্র, কলকাতা, ১৯৮৩।
কবিরাজ গোপীনাথ, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৬৭; রচনা সংকলন, ভাদাইনী, বারাণসী, ১৯৯০।
তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, ১৯৮৩।
করীম আনোয়ারুল, লালনগীতি, কুষ্টিয়া, ১৯৬৬।
বাউল কবি লালন শাহ, ঐ ১৯৬৬।
ফকির লালন শাহ, কুষ্টিয়া, ১৩৮২।
বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, কুষ্টিয়া, ১৯৭১।
রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, কুষ্টিয়া, ১৯৭৭।
কাজী আবদুল ওদুদ, বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা, একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত, যশোর, পূর্ব পাকিস্তান, ১ম সংস্করণ ১৯৫৫, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৬।

খোন্দকার রিয়াজুল হক (সম্পাদিত), লালন সাহিত্য ও দর্শন, ঢাকা, ১৯৭৬।

লালন সঙ্গীত চয়ন, যশোহর, বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

গুপ্ত অমিত, বাংলার লোকজীবনে বাউল, কলকাতা, সংবাদ পাবলিশার্স, ১৯৮৩। (সম্পাদিত) শকুন্তলা (কলকাতা থেকে জয়দেব মেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়) বাউলের দেহতত্ত্ব এবং বাউল ও গবেষক, সমকালীন, কলকাতা, ১৯৮২।

গুপ্ত নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, বিদ্যাপতি পদাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৪২

গোস্বামী জয়গুরু, চারণকবি মুকুন্দদাস, কলকাতা ১৯৭৮।

গোস্বামী বিহারীলাল, কানুতত্ত্ব নির্ণয়, ভাজনঘাট, নদীয়া, ১৩০৭।

ঘটকচৌধুরী রথীন্দ্রকান্ত, কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

ঘোষ ঈশানচন্দ্র (অনূদিত), জাতক, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩২৩ ; ২য় খণ্ড, কলকাতা ১৩২৭।

ঘোষ শান্তিদেব, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা, কলকাতা, ১৯৭২।

ঘোষাল শান্তিময়, লালন ফকির, কলিকাতা, ১৯৮৪।

চক্রবর্তী অবিনাশ (সম্পাদিত), বাউল বিংশতি, কলকাতা ১৩০৭।

চক্রবর্তী জাহ্নবীকুমার, চর্যাগীতির ভূমিকা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮২।

চক্রবর্তী নরহরি, ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা, ১৯৮৭।

চক্রবর্তী প্রফুল্লরচণ, নাথধর্ম ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৫৫।

চক্রবর্তী সুধীর, সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান, কলকাতা, ১৯৮৫।

বাংলা দেহতত্ত্বের গান, কলকাতা, ১৯৯০।

ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলকাতা, ১৯৯২।

চক্রবর্তী সুবোধ, বাংলার বাউল লালন ফকির, কলকাতা, ১৩৮৩।

চক্রবর্তী হরিদাস, পাঞ্চভৌতিক চিকিৎসা, চিন্তামণিকুঞ্জ, নবদ্বীপ, ১৩৯৫। (সম্পাদিত) সটীক পঞ্চতত্ত্ব ও জ্ঞানামৃতকথা, ঐ, ১৩৯০ (৫ম সং)।

চতুর্বেদী পরশুরাম, কবীর সাহিত্য কি পরখ, ভারতী ভাণ্ডার, এলাহাবাদ, ১৯৬৪।

চৌধুরী আবুল আহ্সান, (সম্পাদিত), লালন স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৭৪। কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

লালনশাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০ (২য় সং ১৯৯২)।

চট্টোপাধ্যায় পশুপতি, বাউলসঙ্গীত, কলকাতা, ১৯৬৪।

ছাত্তার সখিনা, সবার প্রিয় লালনগীতি, ঢাকা (তারিখহীন)।

জসিমুদ্দীন, মুর্শিদা গান ঢাকা, ১৯৭৭। লালন ফকির, বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

জোয়ারদার রাসবিহারী, গোপাল-গীতাবলী, ২য় সংস্করণ, কুষ্টিয়া, ১৩৬৪।

ঝা শক্তিনাথ, মুর্শিদাবাদ জেলার বস্তুবাদী মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ের সমাজ, দর্শন এবং সাহিত্য (১৯৮৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের পি.এইচ.ডি-এর গবেষণাপত্র।) বস্তুবাদী বাউল, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯। বাউল ফকির, ধ্বংসের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, ১৪০৮, সুবর্ণরেখা কলকাতা।

জাত গেল জাত গেল বলে, রৌরব প্রকাশনী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯১।

আউল, সপ্তাহ, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, কলকাতা। লালন এবং রবীন্দ্রনাথ, সপ্তাহ, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, কলকাতা।

মুর্শিদাবাদ জেলার বৈষ্ণব ধর্মের ইতিবৃত্ত, মুর্শিদাবাদ চর্চা, প্রতিভারঞ্জন মৈত্র সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯৫।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, (১-১৪ দশ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬৮।

ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ, প্রাচী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৩৯৪ (১ম সংস্করণ ১৩৭৮)।

দত্ত অক্ষয়কুমার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড ১৮৭০, ২য় খণ্ড ১৮৮৩, কলকাতা।

দত্ত ভূপেন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব ধর্মের সমাজতত্ত্ব, কলকাতা, ১৯৪৫।

দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র ও আবীর, কলকাতা, ১৯১৬। কুহু ও কেকা, কলকাতা, ১৩১৯ (১৯১২)।

দাস পরিতোষ, সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, কলকাতা, ১৯৭৮।

চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি, কলকাতা, ১৯৮৮।

দাস পূর্ণ, আমার ছেলেবেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই মে, ১৯৮৬, কলকাতা।

দাস বৃন্দাবন, চৈতন্য ভাগবত (কাঞ্চন বসু সম্পাদিত) রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৩।

দাস মুকুন্দ, মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, (তারিখ নেই)।

দাস হারাধন, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, (১০ম সংস্করণ), মণীন্দ্রনাথ অধিকারী কর্তৃক ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনী, মালদহ থেকে প্রকাশিত, ১৩৯১।

আসল ও বড় ভেকাশ্রিত তত্ত্ব, ঐ।

ভেকাশ্রিত তত্ত্ব নিরূপণ গ্রন্থ, ঐ।

দাস হরিদাস, শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, নবদ্বীপ, ৪৮৩ গৌরাব্দ।

শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ, ১ম খণ্ড— ৫০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ২য় খণ্ড— ৪র্থ খণ্ড, ৫০১ চৈতন্যাব্দ।

দাস তারাচাঁদ, বাউল সাহিত্য কলকাতা ১৯৬১। দাস নিত্যানন্দ প্রেমবিলাস, রামদেব মিশ্র কর্তৃক বহরমপুর, মুর্শিদাবাদে, রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত, বৈশাখ, ১৩১৮।

দাস ক্ষুদিরাম, বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৯।

দাস মোহান্ত অনুরাগী, গৌর ভগবান, কোটা, বর্ধমান, ১৩৫৬।

দাস বৈরাগ্য বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ সঙ্গীত, চর জিজিরা, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩৯৪।

দাশ জীবনানন্দ, সাতটি তারার তিমির, কলকাতা, ১৯৪৮।

দাশ মতিলাল ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, লালন গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

দাশ মতিলাল, লালন ফকিরের গান, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, কলকাতা, ১৩৪১।

দাশ শিশিরকুমার, কবিতার মিল ও অমিল, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৭।

দাশগুপ্ত শশিভূষণ, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, বিশ্বভারতী, ১৩৮৪। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা, বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ, রসচক্র সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ১৫৬-৯৭

দে অমলেন্দু, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, ১৯৭৪।

দেব অনাথকৃষ্ণ, বঙ্গের কবিতা, কলকাতা, ১৩১৮।

দেব চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ : লালন ফকিরের গান, পরিচয়, চৈত্র, কলকাতা, ১৩৬৪।

দেবী ইন্দিরা, বাংলার সাধক বাউল, কলকাতা, ১৩৬২।

দেবী পুতুল, সঙ্গীতচয়ন, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯২।

নাগ কালিদাস, রবি বাউল, রবীন্দ্রস্মৃতি, সম্পা বিশ্বনাথ দে, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬১।

নিজামী (আবদুল জব্বার), বিশ্বরবি, মাঝারিপাড়া, পো সন্ধিগড়া, বীরভূম, ১৯৬২। একই ঠিকানা থেকে ১৯৬২-এর আগে ও পরে প্রকাশিত হয়েছিল—প্রাতঃসমীরণ, এজিদবধ কাব্য, অখিলচন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতি গ্রন্থ।

পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন, বাংলার বাউল সম্প্রদায়, কলকাতা।

পারভেজ এম. মাসুদ, আমার প্রিয় লালনগীতি, নরসিংদী, ১৯৮৮।

পাল প্রশান্তকুমার, রবি জীবনী, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৪।

পাল বসন্তকুমার, মহাত্মা লালন ফকির, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, শান্তিপুর, ১৩৬২।

লালন শাহ্, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৫, কলকাতা।

তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কুচবিহার, ১৩৭৯।

পাল হরেন্দ্রচন্দ্র, বাউলতত্ত্বের পূর্বাভাষ, সাহিত্য পত্রিকা, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত, ১১ দশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত, ১৩৭৪।

বাউলগানে বর্জখ শব্দ, পূর্বোক্ত, বর্ষা, ১৩৭৬।

ভট্টাচার্য আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, কলকাতা, ১৩৮০। বাংলার লোকসাহিত্য (২য় সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৫৭ ঐ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬২। লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ৩য় খণ্ড, এ. মুখার্জী এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৬৭। 'রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিচার', রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদনা—দেবীপদ ভট্টাচার্য, ইস্টলাইট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬১।

ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউলগান, (১ম সংস্করণ ১৩৬৪), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৩৭৮।

ভট্টাচার্য পরেশচন্দ্র, ভাষাবিদ্যাপরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৯।

ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, কলকাতা, ১৩৫৮।

ভৌমিক নির্মলেন্দু, বাংলা ধাঁধার ভূমিকা, বর্ণালী, কলকাতা, ১৯৮৮।

মণ্ডল পঞ্চানন (সম্পাদিত), গোর্খবিজয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬।

মহম্মদ মনিরুজ্জামান, লালন ফকিরের গান, ১ম খণ্ড, কুষ্টিয়া, ১৯৮৭।

লালন জীবনী ও সমস্যা, ঐ, ১৯৭৮।

মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনূদিত), কোরাণ শরীফ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪।

মিত্র সনৎকুমার, লালন ফকির : কবি ও কাব্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৮৬।

মিশ্র মনুলাল, সহজতত্ত্ব প্রকাশ, (১ম সংস্করণ, ১৩৩২), কলকাতা—৪, ৫ম সংস্করণ, ১৩৯৩।

ভাবলহরী, কলকাতা, ১৩৩৪।

মুখোপাধ্যায় আদিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৮।

মুখোপাধ্যায় অমিতাভ, জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ, কলকাতা, ১৯৮১।

মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬১।

মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭।

মুহম্মদ আবদুল হাই, লালন শাহ্ ফকীর, ঢাকা, ১৯৮০।

(সম্পাদিত) হারামণি, ৫ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৪।

পাল দেব মহান্ত সত্যশিব, ঘোষপাড়ার সতীমা এবং কর্তাভজা ধর্ম, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯০।

বটব্যাল উমেশচন্দ্র, বাউল সম্প্রদায়ের আদি, সাহিত্য, কলকাতা, ১৩০৮।

বসু নগেন্দ্রনাথ, (সম্পাদিত), বিশ্বকোষ, ৮ম ভাগ, কলকাতা, ১৩১৪। ১২দশ ভাগ, ঐ, ১৩১৮।

বসু মণীন্দ্রমোহন, সহজিয়া সাহিত্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২।

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৮ (সম্পাদিত)।

ঐ, নব চর্যাপদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গেশচন্দ্র, শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ পরিজন, শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, পুরুলিয়া ; ১ম খণ্ড, ১৩৯৪ ; ২য় খণ্ড ১৩৯৪ ; ৩য় খণ্ড, ১৩৯৬।

বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৮।

বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র, প্রাচীন ভারতে অপরাধতত্ত্ব ও যৌন বিজ্ঞান, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৯।

বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশ চন্দ্র এবং রমলা দেবী, ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৯২।

বন্দ্যোপাধ্যায় সোমেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন, কলকাতা, ১৯৬৪।

বন্দ্যোপাধ্যায় হরিদাস, ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৮৬।

বন্দ্যোপাধ্যায় হিরণ্ময়, লালন ফকির, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, শ্রাবণ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৮১, কলকাতা।

বাগচি প্রবোধচন্দ্র, বাউলের ধর্ম, উত্তরা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

বিদ্যানিধি নীলকমল (অনূদিত), তন্ত্রসার, বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সমুন্নত সাহিত্য প্রকাশ কার্যালয় থেকে, দর্জিপাড়া, কলকাতা, প্রকাশিত, ১৩১০।

বিদ্যারত্ন রামনারায়ণ (অনূদিত ও সম্পাদিত), চৈতন্যচরিত মহাকাব্যম্, রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত, বহরমপুর, ১৩৩২।

বিশ্বাস স্বপন, লালনের সাঁইজী, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯২।

বিশ্বাস হেমাঙ্গ, লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, কলকাতা, ১৩৮৫।

ব্রহ্ম তৃপ্তি, লালন পরিক্রমা, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি., ১৯৯৩।

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ, সদ্‌গুরুসঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৩।

ব্রহ্মচারী মদনমোহন দাস, সহজিয়া দলন ও শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রেমধর্মের দীক্ষা শিক্ষাগুরুর মীমাংসা, রামচন্দ্র গোস্বামী রোড, শান্তিপুর, নদীয়া, ১ম খণ্ড, ১৩৮৯ ; ২য় খণ্ড, ১৩৯১।

মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৬৮ ; ২য় খণ্ড, ১৯৬৮। লালন পরিচিত, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৮।

মুহম্মদ কামালউদ্দীন, লালন গীতিকা, ঢাকা, ১ম খণ্ড ১৯৬২ ; ২য় খণ্ড ১৯৬৩।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারামণি, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩৭।

ঐ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪২। ঐ, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৪৮। ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৫৯। ঐ, ৫ম খণ্ড (আবদুল হাই সম্পাদিত) ঢাকা, ১৩৬৮। ঐ, ৭ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৮।

লালন ফকিরের গান, কলকাতা, ১৯৫০।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; ১ম খণ্ড (১ম মুদ্রণ ১৯৬৫), ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩ ; ২য় খণ্ড (১ম মুদ্রণ, ১৯৬৫) ; ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪।

মোহাম্মদ সুরুজ আলী, জনপ্রিয় লালনগীতির আসর, ঢাকা, (তারিখহীন)।

মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ, মোছালেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা, ১৩৭২।

মৌলিক সরোজকুমার, মরমীয়া লালন, (প্রকাশক, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, কলকাতা ২৫), ১৮ই এপ্রিল, ১৯৯২।

যোগ জীবনানন্দ তীর্থনাথ, যোনিতন্ত্রম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৭।

যোগবিশারদ প্রাণহরি, কামশাস্ত্র বা রোহিণীতন্ত্র, কলকাতা টাউন লাইব্রেরী, ৭ম মুদ্রণ, কলকাতা-৬, (তারিখহীন)।

রহিম এম. এ., বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

রহমান এস. এম. লুৎফর, লালন শাহ—জীবন ও গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

লালন জিজ্ঞাসা, ঢাকা, ১৯৮৪। লালন গীতিচয়ন, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫।

রায় অন্নদাশঙ্কর, লালন ও তাঁর গান, শৈব্যা, কলকাতা, (১ম সংস্করণ ১৩৮৫), ১৩৮৭।

রায় অমরেন্দ্র নাথ, (সম্পাদিত) শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১ম সংস্করণ ১৩৪৯), ১৩৫৯।

রায় ত্রিদিবনাথ, (সম্পাদিত), কামসূত্রম, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০।

রায় ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল

রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা, ১৩৮২।

'রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা', রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক, দেবীপদ ভট্টাচার্য, ইস্ট লাইট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬১।

রায় শঙ্করনাথ, ভারতের সাধক, কলকাতা ; ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৩৯২।

রায় সীতানাথ, বৃহৎ বাউল সংহিতা, কলকাতা, তারিখ নেই।

রায় মন্মথ, লালন ফকির, কলকাতা, ১৩৭৮।

রায় মতিলাল, জীবনসঙ্গিনী, (৩য় সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৬৮।

লাহিড়ি দুর্গাদাস, বাঙ্গালীর গান, কলকাতা, ১৩১২।

শ' রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৮।

শাস্ত্রী দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২।

স্মৃতি : আচার ও ধর্ম, অয়ন, কলকাতা, ১৯৭৭।

শাস্ত্রী ভৈরব, কামতন্ত্র, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা-১ (তারিখহীন)।

শাস্ত্রী হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, (সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত) ১ম খণ্ড ১৯৮০, ২য় খণ্ড, ১৯৮১।

শাস্ত্রী হরপ্রসাদ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য, সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮।

শাহ্ পাঞ্জু, ইস্কে সাদেকী গওহার, ১৯০৭।

শাহ্ মোহাম্মদ মনসুর আলি আল চিশ্‌তি, ছেররোল কোরাণ, উদিবাড়ি দায়রাপাক, পো. জগতী, কুষ্টিয়া, ১৩৫৬ ; রশিদিয়া লাইব্রেরী। উক্ত প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'মারফতের চাবুক', মনছুরের বাণী, নেয়ামতে খোদা, মুক্তির আলো, স্বর্গীয় প্রেম, উচিত বাক্য প্রভৃতি গ্রন্থ।

শীল নন্দলাল, বাউল সংহিতা, কলকাতা, তারিখ নেই।

শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, কলকাতা, কথামৃত ভবন, (পুনর্মুদ্রণ) ১৩৬৬।

ঐ, ৩য় ভাগ, ঐ, ঐ, (নবম পুনর্মুদ্রণ) ১৩৮১।

ঐ, ৪র্থ ভাগ, ঐ, ঐ, (অষ্টম পুনর্মুদ্রণ) ১৩৮১।

ঐ, ৫ম ভাগ, ঐ, ঐ, (পুনর্মুদ্রণ) ১৩৬৮।

সমাদ্দার রণজিৎ কুমার, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব, কলকাতা, ১৩৮২।

সরকার পবিত্র, গদ্যরীতি, পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৫।

ভাষা দেশ কাল, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫।

সরস্বতী দয়ানন্দ, সত্যার্থ প্রকাশ, (সম্পাদনা ও অনুবাদ—প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ), আর্য সমাজ মন্দির, কলকাতা, ১৩৮৭।

সরস্বতী সচ্চিদানন্দ, (সৌম্যানন্দ নাথ সম্পাদিত), সাধনপ্রদীপ, নব ভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৭।

সিংহ কাশীনাথ (সম্পাদিত), দরবেশ দরবার, কলকাতা-৫০, ১ম খণ্ড, ১৩৮২ ; ২য় খণ্ড, ১৩৮৪।

সুফী আবদুল গণি, সুখশান্তি দর্শন, ঔরঙ্গাবাদ, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ, ১৩৮৪ (১৯৭২)।

মুক্তিপাথেয়, পূর্বোক্ত, ১৯৮৮।

সেন জলধর, কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩২০।

(সম্পাদিত) বাউল সঙ্গীত, কলকাতা, ভাদ্র ১৩২৩।

সেন নবীনচন্দ্র, আমার জীবন, কলকাতা, ১৩১৬-১৩২০।

সেন পুলিনবিহারী, রবীন্দ্রায়ন, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৮।

সেন রঞ্জিত কুমার, বাউলরাজা, কলকাতা ১৩৭৩।

সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৪৮ ঐ, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৮।

নট, নাট্য, নাটক ; কলকাতা, ১৩৭২।

পদাবলীর অভিসার : গানের শ্রীক্ষেত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

রবীন্দ্রশিল্পে প্রেম চৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৩

সেন ক্ষিতিমোহন, বাংলার বাউল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪।

ভারতের সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫০।

বাংলার সাধনা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।

কবীর, অ্যাসোসিয়েট প্রেস, কলকাতা, ১৯১০।

বাংলার প্রাণবস্তু, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৭।

সেনগুপ্ত নন্দগোপাল, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৫৮।

সেনগুপ্ত শিশিরকুমার, দরবেশ দর্শন, ১ম খণ্ড, বারাকপুর, কলকাতা, ১৩৭৯।

স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৯।

স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ২ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৩।

হক এনামুল, বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলকাতা, ১৩৩৫।

হোসেন মীর মসারফ, সঙ্গীত লহরী, ১৮৮৭ (৮৯ নং গানে লালন ও অন্যদের উল্লেখ, পৃ. ৬৮)।

অভিধান ও পত্রপত্রিকা।

দাশ জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বাংলা ভাষার অভিধান, ২ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৯।

ভারতকোষ (৫ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৭৩।

বিশ্বকোষ, (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত) ৮ম ও ১২ দশ খণ্ড, কলকাতা, ১৩১৪, ১৩১৮।

অনীক, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৫ ; জানুয়ারী ১৯৮৬।

আনন্দবাজার, কলকাতা, ২৯/৪/১৯৪১।

উত্তরা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

চতুষ্কোণ, কলকাতা, ১৩৭০ শারদ সংখ্যা ; ১৩৭১ আষাঢ়, সংখ্যা

দীপিকা, কলকাতা, আষাঢ়, (৪ঠা, ১৫ই, ৩২শে) ১৩৩৯।

দেশ, কলকাতা, ২৬/১২/১৯৮৭; ১৮/১/১৯৯২; ১৮/৪/১৯৯২; ২৩/৫/১৯৯২।

নন্দন, কলকাতা, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৯৮।

প্রবাসী, কলকাতা; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন এবং কার্তিক সংখ্যা ১৩২২; চৈত্র ১৩৩১; শ্রাবণ ১৩৩২; বৈশাখ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩৯; বৈশাখ ১৩৮৪।

প্রবর্ত্তক, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৫১।

বঙ্গদর্শন, কলকাতা, পৌষ ১৩১৬।

বঙ্গবাণী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৩৩।

বিচিত্রা, কলকাতা, চৈত্র ১৩৩৫।

বান্ধব, ঢাকা, ৮ম সংখ্যা, ১২৮৯।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ১৯২৪।

ভারতী, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩০২।

মাসিক বসুমতী, কলকাতা, পৌষ, ১৩৬৫; ভাদ্র, ১৩৬৬; শ্রাবণ ১৩৪১।

মাতৃবাণী, বীরভূম, ১৯৮২-১৯৮৪ সংখ্যাগুলি।

লোকশ্রুতি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৩।

লোকসাহিত্য পত্রিকা, কুষ্ঠিয়া, বাংলাদেশ, Vol. II, No. I and II.

লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, কলকাতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৭।

লালনপ্রয়াণ শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, ভীমপুকুর, আসাননগর, নদীয়া, ১৯৯০। এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় লালন-মৃত্যুদিবসে স্মারকগ্রন্থ—১৯৯১-তে 'অচিন পাখি'; ১৯৯৩-এ 'মানুষ রতন'॥

শকুন্তলা, কেন্দুলি মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৩; পৌষ ১৩৯২।

সাহিত্য, কলকাতা; ১৩০৮।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮১।

সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৭৪; বর্ষা ১৩৭৬।

হিমাদ্রি, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩।

Bibliography—English

Abu Rushid, Song of Lalan Shah, Bangla Academy, Dhaka, 1964.

Appadurai Arjun, Gender, gener and power in South Asian expressive tradition, University of Pennsylvania press, Philadelphia, U.S.A. 1991.

Ahmad Imtiaz, (edited) Caste and social stratification among the Muslims, Delhi, 1973.

Bagchi P.C, Studies in the tantras, part I, University of Calcutta, 1975.

Bagchi P.C. and S.Bhiksu Sastri (edited), Carya Gtti Kosa, Visvabharati, 1956.

Barati Agehananda, Intentional language of tantras, Journal of the American Oriental Society, 81 (1961) : 261-70.

Basu Sanatkumar, Baul songs of Bengal, Folk-music and folk-lore, Calcutta, 1961.

Basam A.L., History and doctrines of the Ajivikas, Motilal Banarasidas, Delhi, 1981.

Barthakuria Apurbachandra, The Kapalikas, Sanskrit Pustak Vandar, Calcutta, 1984.

Barua D.K., Acharya Radhagobinda Smarak grantha, edited by Janardan Chakraborty, Sadhana Prakasani, Calcutta, 1973.

Banerjee Pranab, Bauls of Bengal, Calcutta, 1987/89.

Banerjee Sumanta, the Parlour and the street: The elite and popular culture in 19th Century Calcutta, Calcutta 1989.

Bandyopadhya Sudhansumohon, Baul songs of Bengal, United writers, Calcutta, 1976.

Bhattacharya Deben, The Mirror in the sky, George Alien and Unwin LTD, Ruskin house museum street, London, 1969.

Bhattacharya Deborah P., Paglami : ethno-psychiatric knowledge of Bengal, Syracus University, New York, 1986..

Bhattacharya J.N., Hindu castes and sects, (1st edition, 1896), Calcutta, 1968.

C.Maloney, K.M.Asraful Aziz, P C. Sarkar, Beliefs and fertility in Bangla Desh, Dacca, 1981.

Cirlot, J.E (trans. by Jack Sage), A Dictionary of Symbols, Routledge and Kegan Paul, London, U.K., 1981 (1st edition 1962).

Chakraborty Ramakanta, Vaishnavism in Bengal, Calcutta, 1985.

Chakraborty Surathchandra, Bauls the Spiritual Vikings, Firma KLM Private LTD, Calcutta, 1980.

Charles Capwell, The Music of the Bauls of Bengal, Kent, Ohio, Kent state university press, 1986.

Chattopadyaya.D.P. (edited), Studies in the history of Indian philosophy, Vol. II and III, Calcutta, 1978.

Das Rahul Peter, Problematic aspect of the sexual rituals of the Bauls of Bengal, Journal of the american oriental society, (112 : 3) 1992.

Dasgupta Alokranjan and Mary ann, The roots in void : The Baul songs in Bengal, K.P.Bagchi and Co, Calcutta, 1977.

Dasgupta Sashibhusan, Obscure religious cults, (1st edition, 1946) Calcutta, 1964.

An introduction to tantrik Buddhism, University of Calcutta, (Reprint), 1974.

Dasgupta S.N., History of Indian Philosophy, Vol. III (1st edition, 1922), Motilal Banarasidas, New Delhi, 1975.. Hindu Mysticism, Motilal Banarasidas, New Delhi, 1982.

Datta Rajeswari, The religious aspect of the Baul songs of Bengal, Journal of Asian studies. Vol. xxxvii, no. 3, May, 1978.

D.D.Kosambi, Myth and Reality, Studies in the formation of Indian culture, Popular Prakasan, Bombay, 1962.

De Boer, T.J., The history of philosophy in Islam, (trans. .by E.R.Jones), London, 1933.

Dey H.N. (translation), edited by P.N. Ghosh, Ibon Batutah's account of Bengal, Calcutta, 1978. 1

Dimock Edwar C., The place of hidden moon, The University of Chicago press, U.S.A., 1966.

Rabindranath Tagore—the greatest of the Bauls of Bengal, Journal of the Asiatic society, XIX, No I : 33-51.

Eliade Mircea, Yoga—Immortality and freedom, (trans. by W.R.Trask), New york, 1958.

Encyclopaedia Britanica, Vol. VIII, Cambridge University Press, U.K., 1910.

Fish Stanley, Self consuming artifacts, Barkeley University of California Press, 1972.

O'Flaherty W. D. Asceticism and erotics in the Mythology of Siva, O. U. P. London, 1973.

Frazer J.G.; The golden Bough, (reprint), London, 1976.

Grierson G.A, Behar peasant life, London, 1985.

Guha Ranjit (edited), Subaltern studies, Vol. VI; Oxford university press, Delhi, 1989.

'Hanif H.M, North Indian notes and queries, July, 1892.

J.Hastings, (edited), Encyclopaedia of religion and ethics, Vol. IV, New york, U.S.A.,1959.

J.Moussaieff Masson, The Psychology of the Ascetic, Journal of the Asian studies, XXXV, No.4; August, 1976.

Kabir Humayun, The Indian heritage, Asian Publishing house, Bombay, 1955.

Kakar Sudhir, Shamans, mystics and doctors, Oxford university press, Delhi, 1986.

K. Schomer and W.H.Mcleod (edited), The sants, Motilal Banarasidas, New delhi, 1987.

Karim Anwarul, The Bauls of Bangladesh, Dacca, 1980.

Katre, S.M., An introduction to Indian textual literary criticism, Poona, Decan College, 1954.

Lama Anagarika Gobinda, The foundation of tibetan mysticism, London, 1960.

L.Strauss, (trans.) Totemism, London, 1964.

Lynnteskey Dentou, Varieties of Hindu female asceticism, role and rituals for hindu woman, edited by Julia leslie, Delhi, 1992.

Madan T.N., Non-renunciation, Oxford university press, Delhi, (1st. edition, 1987), 1988.

Way of life : King, householder and renouncer, (2nd edition), Sage Publication, Delhi, 1988.

Merhotra R.R., Sociology of secret Language, Simla, Indian institute of advance study, 1977.

Mukherjee Prithwindra, Chant Baul, editions. Findakly, 22 avenue J.Aicard, 75011, Paris, 1985.

Rahaman M.Mizanur, Myriad Miracle : Lalan's song, Dhaka, 1987.

Ramanujan A.K., Speaking of Siva, Penguin U. K., 1973.

Raychoudhury Tapan, Europe reconsidered, Oxford university press, Delhi, 1988.

Roy Rajatkanta, Mind body and society, O. U. P. 1995, Calcutta.

Read H., English prose style, London, 1931.

Risley H., Tribes and castes of Bengal, Vol.1,1st edition 1891, Firma K.L.M., Calcutta, 1981.

R.S. Khare, The untouchable as himself : ideology, identity and pragmatism among the Lucknow chamars, Cambridge university press, 1984.

Sarkar D.C., Studies in the religious life of ancient and medieval India, Motilal Banarasidas, New delhi, 1977.

Sarkar R.M., Bauls of Bengal, Gian publishing house, New delhi, 1990.

Sarkar Sumit, 'Renaissance' Kaliyuga and kalki : Construction of time and history in colonial Bengal, (Paper presented at International round table of historians and anthropoligist, Bellagio, 1989). Ramakrishna and the Calcutta of his times, The Calcutta psyche, India international centre quarterly, Vol. 17, Nos. 3-4, New delhi.

Sen Sunil, Peasant movement in India, K.P.Bagchi, Calcutta, 1982.

Sen Ksitimohan, The Bauls and their cult of man, Visvabharati quarterly, January, 1929, pp. 410-431.

Sri Anirban, Letters from a Baul : life within life, Calcutta, 1983;.

Sri Anirban and Lizelle Reymond, To live within, teaching of a Baul, U.K., 1984.

Scudderdder H.Martyn, A companion to native preachers, American mission, Madras, 1865.

Sudhir Khastgir, (Collection of paintings), State Lalitkala academy, U.P.

Thapar Romila, Ancient Indian social history, Orient Longman Ltd, New Delhi, 1978.

'Dissent and protest in the early Indian tradition' in Studies in history, 1,2, pp.-177-195, New delhi, 1979.

The householder and the renouncer in the Brahmanical and Buddhist traditions' in T.N.Madan (edited), 1988.

'Ancient history and the modern search for a Hindu identity,' Modern Asian studies, 23.2. pp. 209-231, 1989.

Tofayell Z.A., Lalan Shah and the lyrics of the Padma, Ziaunnahar, Dacca, 1968.

Van Meter rachel R., 'Bankimchandra's view of the role of Bengal in Indian civilization' in Bengal : regional identity, edited by David Kopf, occasional paper No 9., Asian studies centre, Michigan state university, U.S.A, 1969.

Wali M.Abdul, On curious tenets and practices of a certain class of Faqirs in Bengal, Journal of the anthropological society of Bombay, Vol.V, No. 4, 1900.

Wayman Alex, Yoga of the guhya samajtantra : The arcane lore of forty verses, Motilal Banarasidas, New Delhi, 1991 (1st edition, 1977)...,

Wells H.G., Out line of history, George Newnes Ltd, London, Part-I

Wilden Anthony, System and structure, Tavistock Publication, London, 1980.

Wilson H.H., A sketch of the religious sects of the hindus, Asiatic researches, Vols. XVI and XVII, 1846.

Winternitz M., A history of Indian literature, (Trans. by S.Ketkar), Vol. I, part I (3rd edition) University of Calcutta, 1962. Vol. I, Part II (2nd editions), University of Calcutta, 1978.

W. D. O flaherty, Asceticism and eroties in the Mythology of Siva, Oxford University press, Landoan 1973

Woodroffe sir John, Shakti and Shakta, Ganesh and Co., Madras, 1951. (Avalon Arthur) (Edited) Principles of Tantra, Part I, Ganesh and Co., Madras, 1969 (1st edi. 1914). Do, Part II, Ganesh and Co., Madras, 1970 (1st edition 1915).

Dictionary, Encyclopaedia and Periodicals.

The Concise Oxford Dictionary, Oxford university press, Bombay, 1988.

Encyclopaedia Britanica, Vol., VIII, Cambridge university press, 1910..

Bengal District Gazetters, (edited by L.S.S. Omally.) Faridpur, Calcutta, 1925.

Do, Rajsahi, Calcutta, 1916.

The Statesman, Calcutta, 28/4/1978.

Journal of the American Oriental Society, (112.3), 1992; (81).

The Journal of the Asiatic Society of Bombay, Vol V., No., 4, 1900

The Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol., LXX, Part-3, No. I, 1910.

Journal of the Asian Studies, Vol. 33, No. 2., 1974; May, 1978.

Man, Londan, 1978.

Man in India, Vol. XXIII, No. 2, June 1943.

Indian historical quarterly, 1928.

Visvavarati Quarterly, January, 1929.

Contribution to Indian Sociology, 1960.

Indian International Centre Quarterly, Edited by Geeti Sen, New delhi, 1990-1991.

National Journal of Performing Arts of Bombay, 1979.